

الْفِقْهُ الْمُبَشَّرُ

আল ফিকরুল
মুয়াস্সার

فِي ضَوْءِ الْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ

কুরআন ও মুন্নাহর আলোকে মহজ ফিকহ

মূল

সৌদি আরবের ইরশাদ, দাওয়াহ, ওয়াকফ ও ইসলাম ধর্ম
বিদ্যার মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম

অনুবাদ ও সম্পাদনায়

শাহীখ খলীলুর রহমান শিক্ষা গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক
নির্বাচিত ওলামায়ে কিরাম

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

আল-ফিকহ মুরাস্সার

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সহজ ফিকহ

মূল

সৌদি আরবের ইরশাদ, দাওয়াহ, ওয়াকফ ও ইসলাম ধর্ম
বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম

অনুবাদ ও সম্পাদনায়

শাইখ খলীলুর রহমান শিক্ষা গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক
নির্বাচিত ওলামায়ে কিরাম

আত তাত্ত্বিদ

প্রক্ষেপ

আল-ফিকহুল মুয়াস্সার

কুরআন ও সুন্নাহৰ আলোকে সংজ্ঞ শিকছ

প্রকাশক : মাহদী হাসান মুহাম্মাদ ইউনুস

গ্রন্থস্বত্ত্ব © সর্বস্বত্ত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

মিথিত অনুমতি ব্যতীত নইটির উভয় বা কোনো অংশ পরিবর্তন ও
পরিবর্ধন করে মুদ্রণ ও ফটোকপি করা এবং পিডিএফ প্রচার নিষিদ্ধ

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২১, সফর ১৪৪৩ হিজরী
তৃতীয় প্রকাশ: নভেম্বর ২০২২ ই., রবিউল আউয়াল ১৪৪৪ হি.

অক্ষর বিন্যাস : আত তাওহীদ কম্পিউটার্স

বিনিময় মূল্য: ১০৮৫ (এক হাজার পঁচাশি) টাকা মাত্র
Price : 1085 Taka | 60 SAR | 25 USD

প্রকাশনায়

আত-তাওহীদ প্রকাশনী

বিবির বাগিচা ঢনং গেইট, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৮।

০১৭১২ ৫৪৯৯৫৬, ০১৮৪১ ৫৪৯৯৫৬

atpbdo4@gmail.com | fb/ATP.BD

الْفَقِيرُ الْمُبِينُ
আল ফিকুল
মুয়াস্সার

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সহজ ফিকহ

শম্পাদকমণ্ডলী

শাইখ মুফত্যাবল হসাইন মাদানী

উপাধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়া, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
ও সহযোগী সম্পাদক, মাসিক তর্জমানুল হাদীস

শাইখ আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হসাইন

অধ্যক্ষ, জামিআ দারুল হাদীস আল-আরাবীয়া, গাজীপুর
নির্বাচিত সম্পাদক, সাংগৃহিক আরাফাত

শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী

বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক
মুহাম্মদিস, মাদরাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়া, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

শাইখ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

মুহাম্মদিস, মাদরাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়া, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
দাঙ্গি, ধর্ম মন্ত্রণালয়, সৌন্দি আরব, বাংলাদেশ অফিস

শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুল জলীল মাদানী

দাঙ্গি, উচ্চল হামাম, রিয়াদ, সৌন্দি আরব
মহাপ্রিচালক, রায়িয়া হিফয়ুল কুরআন এভ
ইসলামিক একাডেমী, দিলাজপুর

সহযোগী সম্পাদকবৃন্দ

শাইখ আনোয়ারুল ইসলাম মাদানী

লিসাম, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌন্দি আরব

হক্কেয মাহদী হাসান মুহাম্মাদ ইউনুস

অধ্যয়নরত, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌন্দি আরব

ভাষণরে

হক্কেয আশিক সাউন্ড

দাওরায়ে হাদীস, মাদরাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়া
মুদারিস, দোলেশ্বর ইসলামিয়া মাদরাসা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

হক্কেয ইমরান বিন রামাজান

দাওরায়ে হাদীস, মাদরাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়া
মুদারিস, মাদরাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়া, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

হক্কেয মাহদী হাসান মুহাম্মাদ ইউনুস

দাওরায়ে হাদীস, মাদরাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়া
অধ্যয়নরত, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌন্দি আরব

হক্কেয আব্দুর রহমান আনোয়ার

দাওরায়ে হাদীস, মাদরাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়া
মুদারিস, দারুল হৃদা আল-জামিয়া আল-ইসলামীয়া, ঢাকা

হাসানুল ইসলাম

দাওরায়ে হাদীস, মাদরাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়া
মুদারিস, দোলেশ্বর ইসলামিয়া মাদরাসা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

সহযোগিতায

মাহফুজুর রহমান বিন মোস্তফা সালাফী
শানীম রেজা, আব্দুল্লাহ আল-গোমান, জালাল উদ্দীন

সমন্বয়ক : হক্কেয সারিবর রায়হান তাহসীল, অধ্যয়নরত, উচ্চতর গবেষণা বিভাগ

كتاب
الفقه الميسر
في ضوء الكتاب والسنة

إعداد : خبرة من العلماء وهم:
الأستاذ الدكتور عبد العزيز مبروك الأحمدى
والاستاذ الدكتور فيحان بن شالي المطيري
والأستاذ الدكتور عبد الكريم بن صنيتان العمري
والأستاذ الدكتور عبد الله بن فهد الشريف الهجاري

الأستاذ الدكتور علي بن محمد ناصر فقيهي
الدكتور جمال بن محمد السيد

تقديم
معالى الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ
وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة
والإرشاد بالملكة العربية السعودية

মংকলক

প্রফেসর ডক্টর আব্দুল আয়ীয় মাবরুক আল-আহমাদী
প্রফেসর ডক্টর ফাইহান বিজ শা-লী আল-মুত্তাইরী
প্রফেসর ডক্টর আব্দুল কারীম বিজ সুজীতান আল-উমরী
প্রফেসর ডক্টর আব্দুল্লাহ বিজ ফাহাদ আশ-শারীফ আল-হাজজারী

মন্ত্রিপাদক

প্রফেসর ডক্টর আলী বিজ মুহাম্মাদ নাসির ফাকীহ
ডক্টর জামাল বিজ মুহাম্মাদ আস-সাইয়িদ

সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, বিশিষ্ট লেখক, অনুবাদক, মুহান্দিস
ও স্থায় শাহীখ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদালী হাফিয়াগুল্লাহর

অডিমত

সকল প্রশংসা বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য এবং সলাত ও সালাম নাফিল হোক নবীদের সরদার আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের ওপর, তাঁর পরিবারের ওপর ও তাঁর সকল সাথীর ওপর।

অতঃপর “আল-ফিকহল মুয়াস্সার” গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত ও সহজ ইসলামী ফিকহ বিষয়ে একটি মূল্যবান গ্রন্থ। সারা বিশ্বের মুসলিমদের জন্য কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জীবন পরিচালনা করার সহায়ক হিসেবেই রচিত হয়েছে বইটি। এটি রচনা করেন মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থিত ‘বাদশা ফাহাদ কুরআন মুদ্ৰণ’ প্রকল্পের গবেষণা বিভাগের তত্ত্বাবধানে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানীত ও স্থায়গণ। বিশেষজ্ঞ ‘আলেমগণের সংকলন ও সম্পাদনায় রচিত বইটি বাংলা ভাষায় অনুদিত হওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত হলেও এতে ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ স্থান পেয়েছে এবং কুরআন ও হাদীসের তথ্যসূত্রসহ লিপিবদ্ধ হয়েছে। এজন্য এটি সমৃদ্ধ সহীহ ফিকহ গ্রন্থ হিসেবে ইতোমধ্যে সারবিশ্বে সমাদৃত হয়েছে। আশাকরি বাংলাভাষী মুসলিমরাও এই গ্রন্থ থেকে উপকৃত হবেন।

বইটির অনুবাদ করেছে আমাদের নবীন একদল আলেম। যাদের অনেকেই আমার স্নেহের ছাত্র। ব্যন্ততার ভীড়ে তাদের অনুবাদ যতটুকু পড়া ও দেখা সম্ভব হয়েছে, আলহাদুল্লাহ বিষয়বস্তু ঠিক রেখে প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ করেছে। আল্লাহ রক্তুল আলামীন তাদের খেদমত কবুল করে নিন। এছাড়াও সকলের সুপরিচিত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ‘আত-তাওয়াদ প্রকাশনী’ বইটির প্রকাশনা করছে, তাদেরকেও মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

আশাকরি এ গ্রন্থটি ছাত্র, শিক্ষক, ‘আলেম ও সাধারণ মুসলিমদের জন্য পাথেয় হবে। আল্লাহ রক্তুল আলামীন প্রস্তুতকারী, স্নেহের অনুবাদকবৃন্দ, সম্পাদকমণ্ডলী এবং যে-কোনো পর্যায়ে সহযোগিতা দানকারী ও পাঠকবৃন্দ; সকলের হিদায়াত ও নাজাতের অসীলাহ হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

-আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদালী

সঠিপ্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, সাম্প্রাহিক আরাফাতের নির্বাহী সঠিপ্পাদক, বিশিষ্ট আলেমেন
দ্বীন ওস্মায় শাহখ মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন হাফিজ্যাহুল্লাহুর

অডিমত

..إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَىٰ أَلَّهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

“আল-ফিকহুল মুয়াস্সার” একটি সংক্ষিপ্ত ও সহজ ইসলামী ফিকহ গ্রন্থ। এটি সউদি আরবের মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থিত ‘বাদশা ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ’ প্রকল্পের গবেষণা বিভাগের তত্ত্বাবধানে একদল নির্বাচিত বিশেষজ্ঞ ‘আলেম সংকলন ও সম্পাদনা’ করেছেন। গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত হলেও এতে ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ স্থান পেয়েছে এবং কুরআন ও হাদীসের তথ্যসূত্রসহ লিপিবদ্ধ হয়েছে। এজন্য এটি সমৃদ্ধ সহীহ ফিকহ গ্রন্থ হিসেবে ইতোমধ্যে সকলের নিকট সমাদৃত হয়েছে।

বাংলা ভাষায় এরূপ একটি মূল্যবান গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে। ‘আত-তাওহীদ প্রকাশনী’ এটির প্রকাশনায় এগিয়ে আসে। আমাদের নবীন একদল ‘আলেম এটির অনুবাদ করেছেন। আর আমরা স্নেহস্পদ ‘আলেমগণের অনুবাদ সংশোধন, পরিমার্জন ও সম্পাদনা করে দিয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ।

আশাকরি এ গ্রন্থখন ছাত্র, শিক্ষক, ‘আলেম ও সাধারণ পাঠকের জন্য প্রয়োজনীয় ইলমী খোরাক যোগাবে। মহান আল্লাহ গ্রন্থটিকে সেভাবে কবুল করন! আমীন!!

-আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সম্পাদকীয়

الحمد لله الذي أكمل لنا الدين، وأتم علينا النعمة، وجعل أمة الإسلام خير أمة، وبعث فيها رسولاً أميناً يتلو عليها آيات ربه، ويزكيها، ويعلّمها الكتاب والحكمة، صلى الله عليه وعلى آلـه وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:

সকল প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিমিত্তে, যিনি সকল ভালো কাজের তাওফিক দান করেন। দুরাদ ও সালাম বর্ধিত হোক প্রিয় নাবী মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ এর প্রতি; তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহাবীগণের উপর। অতঃপর একজন ওস্তায়ের জন্য এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, তার ছাত্ররা উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের জন্যও তাই খুশীর বিষয় স্নেহের ছাত্ররা উপ্রাহর জন্য কাজ করতে উদ্বৃক্ষ হয়েছে, আলহামদুল্লাহ। আল-ফিকহুল মুয়াস্সার গ্রন্থটি তাদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ বিশেষ। আশাকরি, আল্লাহ রবুল আলামীন তাদেরকে উপ্রাহর খিদমতে স্থায়ী করবেন।

পর বিষয়, আল-ফিকহুল মুয়াস্সার গ্রন্থটি মূলত সৌদি আরবের দাওয়াহ, ইরশাদ, ওয়াকফ ও ইসলাম ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃপক্ষের অধীনে বাদশাহ ফাহাদ কুরআন কমপ্লেক্সের অন্যতম কল্যাণকর একটি কাজ। ভাষা, বর্ণ, শ্রেণিভিত্তে সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য সহজ পদ্ধতিতে ইসলামের মৌলিক বিধিমালা সম্পর্কে জানানোই এই উদ্যোগের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বিশেষজ্ঞ আলেমদের মনোনীত করা হয় বইটি প্রস্তুত করতে। বর্তমান পৃথিবীতে ইলমের কেন্দ্র মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রফেসর ডক্টর আব্দুল আয়ীয় মাবরুক আল-আহমাদী; প্রফেসর ডক্টর ফাইহান বিন শা-লী আল-মুত্তাইরী; প্রফেসর ডক্টর আব্দুল কারীম বিন সুনীতান আল-উমরী; প্রফেসর ডক্টর আব্দুল্লাহ বিন ফাহাদ আশ-শারীফ আল-হাজারী বইটি প্রস্তুত করেন। এরপর তা সম্পাদনা ও আনুবঙ্গিক বিষয়াবলি সংশোধন করেন প্রফেসর ডক্টর আলী বিন মুহাম্মদ নাসির ফাকীহ; ডক্টর জামাল বিন মুহাম্মদ আস-সাইয়িদ। বইটির ভূমিকা লিখেন সৌদি আরবের দাওয়াহ, ইরশাদ, ওয়াকফ ও ইসলাম ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রী শাইখ সলেহ ইবনে আব্দুল আয়ীয় ইবনে মুহাম্মদ আলুশ-শাইখ।

বাংলা ভাষায় এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা কষ্টকর কোনো বিষয় নয়। কারণ সংক্ষিপ্ত, জটিলতা ও দীর্ঘায়িত মুক্ত, সহজতর ভাষা ও দলীল ভিত্তিক এমন একটি গ্রন্থ প্রতিটি মুসলিমের পাঠ করা আবশ্যিক। একদিকে ভাষার সহজতা সকল মাসআলা বুঝতে সহযোগিতা করবে, অন্যদিকে সংক্ষিপ্ত হওয়ায় সহজে বহনযোগ্য হবে। এছাড়া প্রতিটি মাসআলা দলীল ভিত্তিক হওয়ায় সন্দেহাত্তীতভাবে প্রমাণিত, ফলে মুসলিমগণ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জীবন গড়তে সহায়তা পাবেন, ইনশা-আল্লাহ।

কর্মপদ্ধা: স্নেহের ছাত্ররা বইটির অনুবাদের বিভিন্ন পর্যায়ে পরামর্শ গ্রহণ করে কাজটি সম্পাদন করে। এত বড়ো কাজের সময় ও সংশোধন করা সত্যিই কষ্টসাধ্য ছিল। কেননা অনুবাদকদের সংখ্যা অনেক হওয়ায় তাদের ভাষাগুলো একটি পদ্ধতিতে ব্যবহারের বিষয় জড়িত ছিল। এছাড়াও মহামারি করোনার ফলে বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞার কারণে সকল সম্পাদকের একত্রে বসা স্তর হয়নি। এরপরও আমরা সম্পাদনার

কাজটি যত্নের সাথেই আঞ্চাম দেওয়ার চেষ্টা করি। সম্পাদকমণ্ডলীর প্রতি সদস্যকে কয়েকটি করে অধ্যায় সম্পাদনার জন্য দেওয়া হয়। যেহেতু বইটির দাবি ছিল, দুর্বোধ্যতা এড়িয়ে সহজতর উপস্থাপন; আলহামদুলিল্লাহ সেই বিষয়টি সকলেই সর্তকর্তার সাথে পর্যবেক্ষণ করেছেন। বিশেষ করে পরিভাষাজগলো যাতে বুঝতে সহায়ক হয়, সেই লক্ষ্যে যথাসত্ত্ব ভাষার উচ্চতর শব্দগুলো এড়িয়ে সহজাত শব্দ প্রয়োগের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। প্রমাণপঞ্জির ক্ষেত্রে আরবি বইটি যথেষ্ট সমৃদ্ধ। তবুও কিছু কিছু স্থানে হাদীসের নফর বা গ্রন্থের ভূলগুলো সংশোধন করা হয়েছে। লক্ষণীয় হচ্ছে, অনেক স্থানেই হাদীসের অর্থগত বর্ণনা নিয়ে আসা হয়েছে। সেসব ক্ষেত্রে অনুবাদকদের সাথে সাথে আমরাও যথাসত্ত্ব তাখরীজ দেখে নিশ্চিত হয়েছি। এসব কাজের পর অনুবাদ ও মূল বইয়ের সমন্বয় করা হয়েছে। সবশেষে নির্বাচিত একদল ছাত্রকে বইটি পড়তে দেওয়া হয়, যাতে করে কোনো দুর্বোধ্য কিছু না থাকে এবং সকল শ্রেণির মুসলিমের জন্য বুঝতে সহজ হয়। আলহামদুলিল্লাহ, অনুবাদের মান যথেষ্ট সমৃদ্ধই ছিল। তবুও যেসব অবাগত বিচ্যুতি ছিল, যথাসত্ত্ব সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

এই বিরাট কাজের স্ফূর্তি ও সাহসিকতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি নবীন আলেমে দ্বীন স্নেহের ছাত্রদের। হাফেয আশিক সাঈদ, হাফেয মাহদী হাসান মুহাম্মাদ ইউনুস, হাফেয ইমরান রমায়ান, হাফেয আব্দুর রহমান আনোয়ার, হাসানুল ইসলাম ও হফেয সারিন রায়হান। আল্লাহ রক্তুল আলামীন তাদের কর্মস্ফূর্তি বৃদ্ধি করে দিন। এছাড়াও সহযোগী হিসেবে যারা সহযোগিতা করেছে, সকলকেই আল্লাহ রক্তুল আলামীন উত্তম বিনিময় দান করুন। এই কাজের একমাত্র লক্ষ্য বাংলাভাষী মুসলিম জনসাধারণকে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী বিধিমালা সহজতর পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। বিরাট এই কাজকে নির্ভুল করার শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মানুষ হিসেবে ভুল থাকা স্বাভাবিক। তাই যে-কোনো ত্রুটির সংশোধনকে স্বাগত জানানো হবে, ইনশা-আল্লাহ।

আল্লাহ রক্তুল আলামীন বইয়ের মূল উদ্দ্যোক্তা তাওহীদের ভূমি সৌন্দি আরব, প্রস্তুতকারক, সম্পাদকসহ অনুবাদক, সম্পাদক ও যে-কোনো ধরনের সহযোগিতা দানকারী, পরামর্শক, প্রচার-প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলের জালাতের অসীলাহ হিসেবে কবুল করুন। পাঠকদের সকলকেই হিদায়াতের পথে পরিচালিত করুন। আমীন।

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে-
আবু ফুয়াদ মুফায্যদুল হুসাইন মাদানী

বৰ্ষ অৰ্থাৎ ৩৯ এ ৪০ তম ব্যাচের ছেটো ভাইদের প্রতি ও কৃতজ্ঞতা জনাচ্ছি, যারা শেষ নুহতে উদ্যোগস্থ গান্ধুলিপি পাঠ কৰার মাধ্যমে ক্রটি সংশোধনে সহযোগতা কৰেছে। সকলের জন্য খুব সহজভাৱে উপহাপন কৰার লক্ষ্য এবং ভাষাস্তুৱে কলেবৱেৱের আকৃতি সমতা রাখা; উভয়ের প্রতিই দৃষ্টি দেওয়া হৈল। জটিলতা ও দীর্ঘায়িত না কৰে সহজতাৰ কৰাকে প্ৰধান উদ্দেশ্য কৰা হয়।

কুৱআনেৰ আয়াত অনুবাদ কৰাৰ ক্ষেত্ৰে স্থানভেদে একই শব্দেৰ অনুবাদে প্ৰতিশব্দ ব্যবহাৰ কৰতে হয়েছে। এক্ষেত্ৰে আল-বাহিসুল কুৱআনী অ্যাপসেৰ মাধ্যমে বিভিন্ন তাফসীৰ, উলুমুল কুৱআন থেকে উপকৃত হয়েছি। শ্ৰদ্ধাভাজন অনেক মুফাসিসিৱেৰ তাফসীৰ মুতাআলার মাধ্যমে নিজেদেকে সমৃহ কৰাৰ চেষ্টা কৰেছি। একই ভাৱে হাদীসেৰ অনুবাদ ও তাৰীঞ্জেৰ ক্ষেত্ৰে আমৰা মাকতাবা শামেলা ও আল-বাহিসুল হাদীসী অ্যাপস এবং আৱৰীৰ বিভিন্ন ব্যাখ্যা গ্ৰন্থেৰ সহযোগিতা নিয়েছি। হাদীসেৰ ক্ৰমিক নং এৰ ক্ষেত্ৰে প্ৰশিক্ষ হাদীসগুলোৱ তাৰীঞ্জে বাংলা হাদীস ওয়েবসাইটেৰ মাধ্যমেও উপকৃত হয়েছি। অষাগত দৈনতা কাটাতে মুজামুল আৱৰ, আল-মাআনী ও আল-ওয়াফি অ্যাপস এবং বাংলা একাডেমিৰ অভিধানেৰ সহযোগতা গ্ৰহণ কৰেছি। বাংলা ভাবাৰ বানান যেন বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে মুক্তি পাচ্ছে না, আমৰা ও পাইনি। সন্ধানিত ওন্তায়গণেৰ পৰামৰ্শ, বিশেষজ্ঞদেৱ মতামত ও বই-পুস্তকেৰ আলাকে আমৰা একই শব্দেৰ ব্যবহাৰ কৰতে চেষ্টা কৰেছি। বাংলা শব্দেৰ বানান বাংলা একাডেমিৰ বানান রীটি, আৱৰীৰ শব্দেৰ ক্ষেত্ৰে উচ্চারণ ঠিক রেখে শব্দেৰ ব্যবহাৰ ও সমশ্বেশণিতা রক্ষাৰ চেষ্টা কৰেছি। প্ৰচলিত ও বহুল ব্যবহৃত শব্দেও নৃতল বানান ব্যবহাৰ হয়েছে। আল্লাহৰ রক্তুল আলামীন সংশ্লিষ্ট সকলকেই উন্নত বিনিময়ে ভূষিত কৰুন। আমীন।

কিতাবটিৰ বিষয়ে বিস্তাৱিত আলোচনা কৰেছেন সৌদি সৱকাৱেৰ দাওয়াহ, ইৱশাদ, ওয়াকফ ও ইসলাম ধৰ্ম-বিষয়ক তৎকালীন মাননীয় মন্ত্ৰী সন্ধানিত শাইখ সালিহ বিন আব্দুল আয়ীহ বিন মুহাম্মাদ আলুশ শাইখ। এছাড়াও সন্ধানিত সন্পাদক ওন্তায়গণ বিস্তাৱিত বিবৱণ উল্লেখ কৰেছেন তাই এই বিষয়ে আৱ কিছু লেখাৰ প্ৰয়োজন নেই বলেই মনে কৰছি।

আশা কৰছি, এই সংক্ষিপ্ত অথচ দলীল ভিত্তিক গ্ৰন্থটি বাংলাভাষী মুসলিমদেৱ দীনেৰ ব্যাপারে অজ্ঞতা, অক্ষত, অসহায়ত্ব দূৰ কৰতে সহযোগী হবে। সেই সাথে ক্ষুদ্ৰ কলেবৱে এত বিৱাট ইলম শিক্ষাৰ মাধ্যমে বিশৃঙ্খলতা বিদূৰিত কৰে জ্ঞানেৰ আলোয় উত্তোলিত হবে। ফলে সে হিদায়াত ও আলোৱ পথগুৰুষ হয়ে তাৰ প্ৰতিপালকেৰ ইবাদত কৰবে, ইন শা আল্লাহ। মহান আল্লাহ বলেন:

فَلَمْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

“বলুন, যারা জানে আৱ যারা জানে না, তাৱা কি কখনো সমাজ হতে পাৱে?” (সূৱা যুমাৰ : ৯)

পৰিশেৰে, আমাদেৱ ক্ষুদ্ৰ এই প্ৰচেষ্টাৱ ভুল-আভিৱ জন্য আল্লাহৰ নিকটে ক্ষমা চাচ্ছি ও তাৰোৱা কৰছি। দুআ কৰছি, বৱকতময় দেশ সৌদি আৱবেৰ সৱকাৱ, ওলামায়ে কিৱাম ও সৰ্বপোৱি মুসলিম উল্লাহকে আল্লাহ তায়ালা হিফায়ত কৰুন। সমন্ত কল্যাণকৰ কাজ কৰাৰ তাৰোৱীক দান কৰুন। বিভিন্নদেৱ নিকটে যে-কোনো ভুটি পৱিলক্ষিত হলে কিংবা সদুপদেশেৰ সাদৰ সভাবণ জানাতে কাৰ্পণ্য হবে না, ইন শা আল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়া তা'আলার নিকটে সকলেৰ জন্য কল্যাণ ও হিদায়াতেৰ প্ৰাৰ্থনা কৰছি। মহামাৰি ও ঘত মুসিবত রয়েছে, সবকিছু থেকে নিৱাপণা চাচ্ছি। এই বইয়েৰ উদ্যোগ্তা, প্ৰণয়ন, নিৰ্বাচন, অনুবাদ, সন্পাদনা, মুদ্ৰণ ও পৱামৰ্শদাতা এবং পাঠকদেৱ সকলকে আল্লাহৰ রক্তুল আলামীন হিদায়াতেৰ পথে পৱিচালিত কৰুন এবং পৱকালে জান্নাতুল ফেৰদৌসেৰ স্বাচ্ছন্দ্য জীবন দান কৰুন। আমীন।

দু'আ প্ৰার্থী-
অনুবাদক পৱিষ্ঠদেৱ সদস্যবৃন্দ

সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, বাংলাদেশে নিষ্পত্তি সৌন্দি আরবের ধৰ্ম মুসলিমদের দান্ড,
ওম্বায শাহীখ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল হালিম মাদালী হাফিয়াহল্লাহ

অভিমত

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى أَكْبَارِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَا بَعْدَ
বিশ্বজগতের শ্রষ্টা, প্রতিপালক মহামহিয়ান আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসন করাত্তি। অতঃপর দুর্দল ও সামান
বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ও নাবীদের সরদার মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ সা. এর প্রতি, তাঁর পরিবারবর্গ, তাঁর
সাহাবীগণের প্রতি ।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, সাধারণ আরবদের মাঝে যে গ্রন্থটি অঙ্গতা ও তাকুলীদে শাখার্বী বিদ্যুরিত করতে
ভূমিকা রেখে আসছিল, সেই আল-ফিকহল মুয়াসসার-এর বাংলা ভাষায় রূপান্তর হয়েছে, আলহামদুল্লাহ।
আশাকরি বাংলাভাষী মুসলিমগণ একই রকম উপকৃত হবেন। আল-ফিকহল মুয়াসসার গ্রন্থটি সারাবিশ্বের
মুসলিমদের জন্য কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জীবন পরিচালনা করার সহায়ক হিসেবে রচিত। বইটি
প্রস্তুতের সাথে সম্পৃক্ত বিশেষজ্ঞ আলেমদের মাঝে সকলেই মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শিক্ষক। প্রফেসর
ডক্টর আব্দুল আয়ীয় মাবুরুক আল-আহমাদী, প্রফেসর ডক্টর আব্দুল কারীম বিন সুনাইতান আল-আমরী ও
প্রফেসর ডক্টর আব্দুল্লাহ বিন ফাহাদ আশ-শারীফ আল-হাজ্জারী হাফিয়াহল্লাহর নিকট ফিকহ পড়েছি।
প্রফেসর ডক্টর ফাইহান বিন শা-লী আল-মুত্তাইরী হাফিয়াহল্লাহর বিভিন্ন দারনে বসছি। প্রফেসর ডক্টর আঙ্গী
বিন মুহাম্মদ নাসির ফাকীহি নিকট আকীদাহ ও হাজ্জের দারস গ্রহণ করেছি। এ সকল বিষ্ণ ওম্বাযদের প্রদ্বা
ও ইলমী যোগ্যতা মুসলিম উন্নাহর জন্য একত্রে এই বইটিতে দীপ্তমান হয়েছে। আরেকটি আনন্দের বিষয়
হচ্ছে, বইটির অনুবাদের সাথে সম্পৃক্ত সকলেই আমার স্নেহের ছাত্র। তাদের এই পথচারী নিজেকে সম্পৃক্ত
করতে পেরে আবারও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি, আলহামদুল্লাহ।

বইটি অনুবাদের শুরুর পরই স্নেহের ছাত্রাব বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ গ্রহণ করে। অতঃপর অনুবাদ শেষে তা
পাঠ করার জন্য প্রেরণ করে। করোনা মহামারির কারণে অন্যান্য ব্যক্ততা কম থাকায় তাদের জন্য দীর্ঘ সময়
দেওয়া সম্ভব হয়। আলহামদুল্লাহ। আশাকরি, বিষ্ণ আলেমদের রচিত ও সম্পাদিত, স্নেহের ছাত্রদের
অনুদিত বইটি বাংলাভাষী মুসলিমদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জীবন পরিচালনা করার ক্ষেত্রে
সহায়ক ভূমিকা রাখবে, ইনশাআল্লাহ। বইটি সংক্ষিপ্ত হলেও সকল গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা একত্রিত হয়েছে
দলীলের ভিত্তিতে। তাই নির্বিধায় সকলে জীবনের প্রতিটি মাসআলায় এর সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবেন।
পরিশেষে মহান আল্লাহর নিকট বইটির প্রস্তুতকারী, অনুবাদের সাথে জড়িত স্নেহের ছাত্রবৃন্দ,
সম্পাদকমণ্ডলী এবং যে-কোনো পর্যায়ে সহযোগিতা দানকারী ও পাঠকবৃন্দ সকলের দুনিয়ার হিন্দয়াত ও
আখিরাতে নাজাতে অসীলাহ হিসেবে আলাহ রক্তুল আলামীন করুন, এই দুআ করে শেব করছি।

- মুহাম্মদ ইবন আব্দুল হালিম মাদালী

অনুবাদক পরিষদের কথা

الحمدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللّهُ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَئِمَّةِ أَجْمَعِينَ. وَيَعْدُ
বিশ্ব অধিপতি ও প্রতিপালক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্যই সকল প্রশংসা। সলাত ও সালাম
বর্ষিত হোক প্রিয়নাবী ও রহমাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মাদ ইবনে আবুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের
প্রতি; তাঁর পরিবারবর্গ সাহাবীদের প্রতি। অতঃপর বিশ্বস্তা, প্রতিপালক, মহামহিয়ান আল্লাহর বাণী:

فَلَا يَنْهَاكُلُّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَقَهَّرُوا فِي الدِّينِ وَلَيُنْبَرُو وَلَيَقُولُوا إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَخْدَرُونَ

“তাদের প্রত্যেক বড়ো দল থেকে ছোটো দল কেজ বের হয় না, যাতে তারা দ্বিনের গভীর জ্ঞান অর্জন
করতে পারে এবং তাদের নিজ সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে এলে তাদেরকে সতর্ক করতে পারে,
যেন তারা সতর্ক হয়।” (সূরা তাওবা : ১২২)

এবং নাবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস:

مَنْ يُرِدُ اللّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقِهُ فِي الدِّينِ

“আল্লাহ যে ব্যক্তির কল্যাণ চাই, তাকে দ্বিনের গভীর জ্ঞান দান করেন।”

এর উপর ভিত্তি করেই পিতামাতার চাওয়া এবং ওন্তায়দের পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ; সর্বোপরি মহান আল্লাহর
তাওফীকে দ্বিনের কিছু জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ হয়েছে আমাদের। নিশ্চয়ই দ্বিনের গভীর জ্ঞান অর্জন
করা, শরীয়তের বিধিমালা জানা পৃথিবীর সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট কাজ। আল্লাহ রঞ্জুল আলামীন তার থেকে
ক্ষুণ্ডাতিক্ষুণ্ড অংশ আমাদেরকে শিক্ষার সুযোগ দিয়েছেন। মহান আল্লাহর বাণীর ভিত্তিতেই ইসলামের
ক্ষুণ্ডাতিক্ষুণ্ড অর্জিত অংশকে জনসাধারণের নিকট পোঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আমাদের এই প্রচেষ্টা। এতে
যা কিছু ভালো সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং যা কিছু খারাপ ও সংকীর্ণ, সবই আমাদের ভুল।

নভেম্বর ২০২০ সালে দ্বিনের কিছু কাজ করার লক্ষ্যে আমরা কয়েকজন সম্প্রতিত হই। সেই দলটির
অনেকেই এই বইয়ের অনুবাদে অংশগ্রহণ করি। আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবতার আলোতে প্রকাশিত
হতে সহায়ক হিসেবে এগিয়ে আসেন আমাদেরই সম্মানিত ওন্তায়গণ হাফিয়াল্লুল্লাহ। তাদের অনুপ্রেরণায়
একে একে অনেকগুলো কাজের সমাপ্তি হয়, আলহামদুল্লিল্লাহ। তবে জনসাধারণের নিকটে সর্বপ্রথম
প্রকাশিত হচ্ছে, মুসলিম উপরাহ জন্য তাওহীদের দেশ সৌদি আরবের দাওয়াহ, ইরশাদ, ওয়াকফ ও
ইসলাম ধর্ম-বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকল্প ও বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মাজীদ মুদ্রণ কমপ্লেক্স
কর্তৃক প্রকাশিত **الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة** বা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সহজ ফিকহ
বইটি, আলহামদুল্লিল্লাহ।

এই গ্রন্থটি কুরআনুল কারীম ও সুন্নাতে নাবী থেকে সহীহ দলীলের আলোকে ইবাদাত ও মু'আমালাত
সংক্রান্ত ফিকহী বিধিবিধানকে একত্রিত করেছে। যেসব বিষয়ে অনেক মুসলিমই সমাধান করা এবং তা
থেকে উপকৃত হতে সক্ষম নয়। সংক্ষিপ্ত, নির্বাচিত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ত্রুটিমুক্ত ও সুস্পষ্ট রাখার চেষ্টা
করা হয়েছে, যাতে মানুষ খুব সহজেই দ্বিনের বিধানগুলো জানতে পারে। আমরা অনুবাদের ক্ষেত্রে
সবচেয়ে সহজ ও প্রচলিত শব্দকে প্রাধান্য দিয়ে প্রাঞ্জল করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। বইটির অনুবাদ শেষ
হয় মার্চ ২০২১। এরপর থেকে কঠিন ভাষাগুলো সহজতর করে সকলের পাঠ উপযোগী করার চেষ্টা করা
হয়। সম্পাদক ওন্তায়গণ বিভিন্ন পরামর্শ ও সংশোধনী দেওয়ার মাধ্যমে কিছু স্থানে নৃতন অনুবাদ/ভাষার
কৃত্তা সংশোধন করেন। বিশেষ করে ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপৌষ্ঠ মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ার কুলিয়া দুই

—❖ মুচিপত্র ❖—

ভূমিকা	১৭
বইটি সাজানোর পদ্ধতি	২০
মুখ্যবক্তা	২২

প্রথম অধ্যায় : পরিবেশ

প্রথম অনুচ্ছেদ: পরিবেশ এবং পানির বিধান	◆ ২৭
প্রথম মাসআলা: পরিবেশের পরিচয়, তার গুরুত্ব ও প্রকারসমূহ	২৭
দ্বিতীয় মাসআলা: যেসকল পানি দ্বারা পরিবেশ অর্জন হয়	২৮
তৃতীয় মাসআলা: পানির সাথে নাপাকি মিশ্রিত হওয়া	৩০
চতুর্থ মাসআলা: পানিতে যদি কোনো পরিবেশ জিনিস মিশ্রিত হয়	৩০
পঞ্চম মাসআলা: পরিবেশ অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পানির বিধান	৩১
ষষ্ঠ মাসআলা: মানুষ এবং চতুর্পদ জলের উচ্চিষ্ট	৩২
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: তৈজসপাত্রের বিধান	◆ ৩৪
প্রথম মাসআলা: পরিবেশ অর্জনের ক্ষেত্রে স্বর্ণ-রৌপ্য এবং অন্যান্য জিনিস দ্বারা তৈরী পাত্রের ব্যবহার	৩৪
দ্বিতীয় মাসআলা: স্বর্ণ-রৌপ্য দিয়ে জোড়া দেওয়া পাত্র ব্যবহারের বিধান	৩৫
তৃতীয় মাসআলা: কাফেরদের পাত্র	৩৬
চতুর্থ মাসআলা: মৃত প্রাণির চামড়া থেকে তৈরী পাত্রে পরিবেশ অর্জন	৩৬
তৃতীয় অনুচ্ছেদ: প্রয়োজন পূরণ (মলমুত্ত ত্যাগ) ও তার শিষ্টাচার	◆ ৩৮
প্রথম মাসআলা: পায়খানা-প্রস্তাবের পর পানি ও চিলা কুলুখ ব্যবহার করা এবং পানি ও চিলা-কুলুখ একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হওয়া	৩৮
দ্বিতীয় মাসআলা: প্রয়োজন পূরণের সময় (প্রস্তাব পায়খানা করা অবস্থায়) কিবলামুখী হওয়া এবং কিবলাকে পিছনে রাখা	৩৯

তৃতীয় মাসআলা: টয়লেটে প্রবেশকারীর করণীয় সুন্নাতসমূহ	৪১
চতুর্থ মাসআলা: মলমৃত্ত ত্যাগকারীর জন্য যে কাজগুলো করা হারাম	৪২
পঞ্চম মাসআলা: প্রকৃতিক প্রয়োজন পূরণকারীর জন্য অপছন্দনীয় কর্মসমূহ	৪৩
চতুর্থ অনুচ্ছেদ: মিসওয়াক, সৃষ্টিগত স্বভাবসমূহ	◆ ৪৫
প্রথম মাসআলা: তার বিধান	৪৫
দ্বিতীয় মাসআলা: কখন মিসওয়াক করবে?	৪৬
তৃতীয় মাসআলা: কী দ্বারা মিসওয়াক করবে?	৪৬
চতুর্থ মাসআলা: মিসওয়াকের উপকারিতা	৪৭
পঞ্চম মাসআলা: সৃষ্টিগত স্বভাবসমূহ	৪৭
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : ওযু	◆ ৫১
প্রথম মাসআলা: ওযুর পরিচয় এবং হৃকুম	৫১
দ্বিতীয় মাসআলা: ওয়াজিবের দলীল, কার উপর ওয়াজিব? কখন ওয়াজিব?	৫২
তৃতীয় মাসআলা: ওযুর শর্তসমূহ	৫৩
চতুর্থ মাসআলা: ওযুর ফরযসমূহ (মোট ৬টি)	৫৪
পঞ্চম মাসআলা : সুন্নাহসমূহ	৫৫
ষষ্ঠ মাসআলা: ওযু ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ	৫৭
সপ্তম মাসআলা: যে সকল কাজের জন্য ওযু করা ওয়াজিব	৫৯
অষ্টম মাসআলা: যে সকল কাজের জন্য ওযু করা মুন্তাহাব	৬১
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: মোজা, পাগড়ি এবং ক্ষত স্থানের প্লাস্টারের উপর মাসাহ করা	◆ ৬৩
প্রথম মাসআলা: মোজার উপর মাসাহ করার হৃকুম এবং দলীল	৬৩
দ্বিতীয় মাসআলা: মোজার উপর মাসাহ করার শর্তসমূহ এবং তার স্থলাভিষিক্ত	৬৪
তৃতীয় মাসআলা: মাসাহ করার পদ্ধতি এবং তার বর্ণনা	৬৫
চতুর্থ মাসআলা: মাসাহ করার সময়কাল	৬৬
পঞ্চম মাসআলা: মাসাহ ভঙ্গকারী বিষয়াবলী	৬৬
ষষ্ঠ মাসআলা: মাসাহ এর সময় শুরু হওয়া	৬৭
সপ্তম মাসআলা: ভাঙ্গা হাড় যথাস্থানে বসানোর জন্য বেঁধে রাখা কাঠ, পাগড়ি এবং মহিলাদের গুড়নার উপর মাসাহ করা	৬৭
সপ্তম অনুচ্ছেদ: গোসল	◆ ৬৯
প্রথম মাসআলা: গোসলের অর্থ হৃকুম এবং দলীল	৬৯

দ্বিতীয় মাসআলা: গোসলের বর্ণনা এবং পদ্ধতি	৭১
তৃতীয় মাসআলা: মুস্তাহাব গোসলসমূহ	৭৩
চতুর্থ মাসআলা: গোসল ওয়াজিব হওয়া ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য হকুমসমূহ	৭৪
অষ্টম অনুচ্ছেদ : তায়াম্মুম -----◆	৭৫
প্রথম মাসআলা: তায়াম্মুমের হকুম এবং তা শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল	৭৫
দ্বিতীয় মাসআলা : তায়াম্মুমের শর্তসমূহ এবং তার বৈধ কারণসমূহ	৭৬
তৃতীয় মাসআলা: তায়াম্মুম ভঙ্গকারী বিষয়াদি	৭৮
চতুর্থ মাসআলা: তায়াম্মুমের পদ্ধতি	৭৯
নবম অনুচ্ছেদ : অপবিত্রতা এবং তার থেকে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি -----◆	৮০
প্রথম মাসআলা: অপবিত্রতার পরিচয় ও প্রকারভেদ	৮০
দ্বিতীয় মাসআলা: যে জিনিসগুলো অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে	৮১
তৃতীয় মাসআলা: কীভাবে অপবিত্রতাকে পবিত্র করা হবে	৮৩
দশম অনুচ্ছেদ: হায়েয (খুতুশ্বাব) ও নিফাসের (প্রস্তুতি অবস্থা) -----◆	৮৫
প্রথম মাসআলা: হায়েয শুরু এবং শেষ হওয়ার সময়	৮৫
দ্বিতীয় মাসআলা : হায়েযের সর্বোচ্চ এবং সর্ব নিম্ন সময়সীমা	৮৬
তৃতীয় মাসআলা: হায়েযের অধিকাংশ সময়সীমা	৮৬
চতুর্থ মাসআলা: হায়েয এবং নিফাসের কারণে যা হারাম	৮৭
পঞ্চম মাসআলা : হায়েযের আবশ্যক বিষয়	৮৯
ষষ্ঠ মাসআলা: নিফাসের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন সময়	৯০
সপ্তম মাসআলা: ইস্তিহায়ার রক্ত	৯০

দ্বিতীয় ভাঁধ্যায় : সলাত

প্রথম অনুচ্ছেদ : সলাতের পরিচয় ফয়েলত এবং পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের আবশ্যকতা -----◆	৯৫
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: আযান এবং ইকামত -----◆	৯৮
প্রথম মাসআলা: আযান ও ইকামতের পরিচয় ও হকুম	৯৮
দ্বিতীয় মাসআলা: আযান ও ইকামত সহীহ হওয়ার জন্য শর্তসমূহ	৯৯
তৃতীয় মাসআলা: মুয়ায়িয়নের মুস্তাহাব গুণাবলী	৯৯
চতুর্থ মাসআলা: আযান ও ইকামতের পদ্ধতি বর্ণনা	১০০
পঞ্চম মাসআলা: আযান শ্রবণকারী যা বলবে এবং আযানের পরে যে দুআ করবে	১০২

তৃতীয়ত অনুচ্ছেদ: সলাতের ওয়াজিবসমূহ	◆	১০৩
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : সলাতের শর্তসমূহ, রুকনসমূহ, দলীলসমূহ এবং সলাত পরিত্যাগকারীর বিধান-	❖	১০৭
প্রথম মাসআলা: ফরয সলাতের সংখ্যা		১০৭
দ্বিতীয় মাসআলা: কার উপর সলাত ফরয		১০৮
তৃতীয় মাসআলা: সলাতের শর্তসমূহ		১০৮
চতুর্থ মাসআলা: সলাতের রুকনসমূহ		১১১
পঞ্চম মাসআলা: সলাতের ওয়াজিবসমূহ		১১৫
ষষ্ঠ মাসআলা : সুন্নাতসমূহ		১১৮
সপ্তম মাসআলা : সলাত (বাতিল) বিনষ্টকারী বিষয়াবলি		১১৮
অষ্টম মাসআলা: সলাতে যে কাজগুলো করা মাকরাহ		১২০
নবম মাসআলা: সলাত পরিত্যাগকারীর বিধান		১২৪
পঞ্চম অনুচ্ছেদ: নফল সলাত	❖	১২৫
প্রথম মাসআলা: নফল সলাতের ফযীলত এবং শরীয়ত সন্মত ইওয়ার দলীল		১২৫
দ্বিতীয় মাসআলা: নফল সলাতের প্রকারভেদ		১২৬
তৃতীয় মাসআলা: যে নফল সলাতগুলো জামাআতের সাথে আদায করা সুন্নাত		১২৭
চতুর্থ মাসআলা: সুন্নাতে রাওয়াতিব সলাতের সংখ্যা		১২৭
পঞ্চম মাসআলা: বিতর সলাতের বিধান, ফযীলত এবং সময়		১২৯
ষষ্ঠ মাসআলা: বিতর সলাতের পদ্ধতি এবং তার রাকআত সংখ্যা		১৩০
সপ্তম মাসআলা: নফল সলাতের জন্য নিষিদ্ধ সময়সমূহ		১৩২
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: সাহ সাজদা, তিলাওয়াতের সাজদা এবং শুকরিয়ার সাজদা	❖	১৩৬
প্রথম মাসআলা: সাহ সাজদার শরীয়ত সন্মত ইওয়া এবং তার কারণসমূহ		১৩৬
দ্বিতীয় মাসআলা: কখন সাহ সাজদা ওয়াজিব?		১৩৭
তৃতীয় মাসআলা: কখন সাহ সাজদা করা সুন্নাত?		১৩৯
চতুর্থ মাসআলা: সাহ সাজদার স্থান এবং পদ্ধতি		১৪০
পঞ্চম মাসআলা: তিলাওয়াতের সাজদা		১৪০
ষষ্ঠ মাসআলা: শুকরিয়ার সাজদা		১৪৩
সপ্তম অনুচ্ছেদ: জামাআতে সলাত আদায করা	❖	১৪৪
প্রথম মাসআলা: জামাআতে সলাত আদায়ের মর্যাদা এবং তার বিধান		১৪৪
দ্বিতীয় মাসআলা: বেগনো ব্যক্তি ফরয সলাত আদায়ের পর মসজিদে প্রবেশ করলে আদায়কৃত সলাত পুনরায় জামাআতের সাথে আদায করা কি তার উপর আবশ্যিক?		১৪৭

তৃতীয় মাসআলা: জামাআতের জন্য সর্বনিম্ন সংখ্যা	১৪৮
চতুর্থ মাসআলা: কীসের দ্বারা জামাআত পাওয়া যাবে?	১৪৮
পঞ্চম মাসআলা: জামাআত ত্যাগের জন্য কার ওয়র ধর্তব্য হবে?	১৪৯
ষষ্ঠ মাসআলা: একই মাসজিদে একাধিক জামাআত করা	১৫১
সপ্তম মাসআলা: ফরয সলাতের ইকামত দেওয়া হলে অন্য সলাত আদায়ের বিধান	১৫২
অষ্টম অনুচ্ছেদ: সলাতে ইমামতি করা	◆ ১৫৩
প্রথম মাসআলা: ইমামতির কে বেশি হকদার?	১৫৩
দ্বিতীয় মাসআলা: যার ইমামতি করা হারাম	১৫৫
তৃতীয় মাসআলা: যার ইমামতি করা মাকরহ	১৫৬
চতুর্থ মাসআলা: মুক্তাদী থেকে ইমামের অবস্থান	১৫৬
পঞ্চম মাসআলা: ইমাম মুক্তাদীর যে দায়িত্ব নিবে	১৫৮
ষষ্ঠ মাসআলা: ইমামের আগে কোনো কাজ সম্পাদন করা	১৫৮
সপ্তম মাসআলা: ইমামতি ও জামাআত বিষয়ে বিভিন্ন বিধান	১৫৯
নবম অনুচ্ছেদ : অপারগ ব্যক্তিদের সলাত	◆ ১৬২
প্রথমত: চার রাকা'আত বিশিষ্ট সলাত কসর করা	
প্রথম মাসআলা: কসরের হকুম	১৬৩
দ্বিতীয় মাসআলা: যেসব সলাতে কসর জায়েয	১৬৫
তৃতীয় মাসআলা: কসর সলাতের জন্য সফরের দূরত্ব ও এর প্রকারভেদ	১৬৫
চতুর্থ মাসআলা: অবস্থান করার নিয়তে সফর করলে কি কসর করা যাবে?	১৬৬
পঞ্চম মাসআলা: মুসাফির ব্যক্তির যেসব অবস্থায় সলাত পূর্ণ করা ওয়াজিব	১৬৬
দ্বিতীয়ত. দুই সলাত একত্রকরণ-	
প্রথম মাসআলা: দুই সলাতের মাঝে জমা করা শরীয়ত সম্মত এবং তা বৈধ	১৬৮
দ্বিতীয় মাসআলা : শরীয়তসিদ্ধ জমাকৃত সলাতের পরিসীমা	১৬৯
দশম অনুচ্ছেদ: জুমুআর সলাত	◆ ১৭০
প্রথম মাসআলা: এর হকুম ও দলীল	১৭০
দ্বিতীয় মাসআলা: কাদের উপর ওয়াজিব?	১৭১
তৃতীয় মাসআলা: জুমুআর সলাতের সময়	১৭১
চতুর্থ মাসআলা: খুতবা	১৭২
পঞ্চম মাসআলা: খুতবার সুন্নাতসমূহ	১৭২

ষষ্ঠ মাসআলা: জুমুআর দিনে নিষিঙ্ক কার্যাবলী	১৭৩
সপ্তম মাসআলা: জুমআর সলাতে কতটুকু পেলে জুমুআ পাওয়া যাবে?	১৭৪
অষ্টম মাসআলা: জুমুআর দিনে নফল সলাত	১৭৫
নবম মাসআলা: জুমুআর সলাতের পদ্ধতি	১৭৬
দশম মাসআলা: জুমুআর সুন্নাতসমূহ	১৭৬
একাদশ অনুচ্ছেদ : সলাতুল খওফ বা ডয়-ভীতির সলাত -----◆	১৮০
প্রথম মাসআলা: ভীতির সলাতের বিধান, শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল ও এর শর্তসমূহ	১৮০
দ্বিতীয় মাসআলা: ভীতির সলাতের পদ্ধতি	১৮১
ঘাদশ অনুচ্ছেদ: দুই ঈদের সলাত -----◆	১৮৩
প্রথম মাসআলা: ঈদের সলাতের হকুম ও এর দলীল	১৮৩
দ্বিতীয় মাসআলা: শর্তসমূহ	১৮৩
তৃতীয় মাসআলা: সলাত আদায়ের স্থানসমূহ	১৮৪
চতুর্থ মাসআলা: সময়	১৮৪
পঞ্চম মাসআলা: ঈদের সলাতের পদ্ধতি এবং সলাতে যা তিলাওয়াত করা হবে	১৮৪
ষষ্ঠ মাসআলা: খুতবার স্থান	১৮৫
সপ্তম মাসআলা: ঈদের সলাত কায়া করার বিধান	১৮৬
অষ্টম মাসআলা: এর সুন্নাহসমূহ	১৮৬
অয়োদশ অনুচ্ছেদ: সলাতুল ইন্সকুা বা বৃষ্টি প্রার্থনার সলাত -----◆	১৮৮
প্রথম মাসআলা: ইন্সকুার সংজ্ঞা, হকুম ও দলীল	১৮৮
দ্বিতীয় মাসআলা : এই সলাতের কারণ	১৮৯
তৃতীয় মাসআলা : এই সলাতের সময় এবং পদ্ধতি	১৮৯
চতুর্থ মাসআলা: সলাতের উদ্দেশ্য বের হওয়া	১৮৯
পঞ্চম মাসআলা: ইন্সকুার সলাতে খুতবা	১৯০
ষষ্ঠ মাসআলা: সলাতে যে সুন্নাতগুলো পালন করা উচিত	১৯১
চতুর্দশ অনুচ্ছেদ: সলাতুল কুসুফ তথা চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের সলাত -----◆	১৯৩
প্রথম মাসআলা: কুসুফের সংজ্ঞা ও এর তাৎপর্য	১৯৩
দ্বিতীয় মাসআলা: সলাতুল কুসুফের হকুম ও এর দলীল	১৯৩
তৃতীয় মাসআলা: সলাতুল কুসুফের সময়	১৯৪
চতুর্থ মাসআলা: পদ্ধতি এবং পঠিতব্য ক্রিয়াআত	১৯৪

পঞ্চদশ অনুচ্ছেদ: জানায়ার সলাত ও মৃতব্যক্তির বিধিবিধান	→	১৯৬
প্রথম মাসআলা: মৃতব্যক্তিকে গোসল করানোর হকুম ও পদ্ধতি		১৯৬
দ্বিতীয় মাসআলা: কে গোসলের দায়িত্ব নিবে?		১৯৮
তৃতীয় মাসআলা: কাফন দেওয়ার হকুম ও পদ্ধতি		১৯৯
চতুর্থ মাসআলা: মৃত ব্যক্তির জানায়ার সলাত		২০১
পঞ্চম মাসআলা: জানায়ার সলাতের শর্ত, রুকন ও সুন্নাত সমূহ		২০১
ষষ্ঠ মাসআলা: জানায়ার সলাতের সময়, ফাঈলত ও পদ্ধতি		২০২
সপ্তম মাসআলা: মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে চলা		২০৪
অষ্টম মাসআলা: মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা, ক্রবরের বর্ণনা এবং এ সংক্রান্ত সুন্নাহসমূহ		২০৬
নবম মাসআলা: শোক প্রকাশ করার বিধান ও পদ্ধতি		২০৮

তৃতীয় অধ্যায়: যাকাত

প্রথম অনুচ্ছেদ: যাকাত প্রাথমিক আলোচনা	→	২১৩
প্রথম মাসআলা: যাকাতের পরিচয়		২১৩
দ্বিতীয় মাসআলা: যাকাতের হকুম ও দলীল		২১৩
তৃতীয় মাসআলা: যাকাত অঙ্গীকারকারীর হকুম		২১৫
চতুর্থ মাসআলা: কৃপণতাবশত যাকাত আদায়ে অঙ্গীকৃতি প্রদানকারীর হকুম		২১৫
পঞ্চম মাসআলা: যেসব সম্পদে যাকাত ওয়াজিব		২১৬
ষষ্ঠ মাসআলা: যাকাত ওয়াজিব করার হিকমাহ ও যাদের উপর ওয়াজিব (যাকাত ওয়াজিবের শর্তসমূহ)		২১৯
সপ্তম মাসআলা: যাকাতের প্রকারভেদ		২২১
অষ্টম মাসআলা: ঋণের যাকাত		২২১
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত	→	২২২
প্রথম মাসআলা: স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাতের হকুম ও এর দলীল		২২২
দ্বিতীয় মাসআলা: পরিমাণ		২২৩
তৃতীয় মাসআলা: যাকাতের শর্তসমূহ		২২৪
চতুর্থ মাসআলা: স্বর্ণ-রৌপ্য একটি আরেকটির সাথে মিলিয়ে যাকাত আদায় করা		২২৫
পঞ্চম মাসআলা: গহনার যাকাত		২২৫
ষষ্ঠ মাসআলা: ব্যাবসায়িক পণ্যের যাকাত		২২৬

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ভূমি থেকে উৎপন্ন সম্পদের যাকাত -----	❖ ২২৮
প্রথম মাসআলা: যাকাত কখন ওয়াজিব হবে? তার দলীল	২২৮
দ্বিতীয় মাসআলা: যাকাতের শর্ত	২২৯
তৃতীয় মাসআলা: ওয়াজিব পরিমাণ	২২৯
চতুর্থ মাসআলা: মধুর যাকাত	২২৯
পঞ্চম মাসআলা: রিকায (গুণ্ঠন)	২৩০
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : চতুর্পদ জন্মের যাকাত -----	❖ ২৩১
প্রথম মাসআলা: চতুর্পদ জন্মতে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ	২৩১
দ্বিতীয় মাসআলা: ওয়াজিবের পরিমাণ	২৩৩
তৃতীয় মাসআলা: ওয়াজিবের বর্ণনা	২৩৬
চতুর্থ মাসআলা: চতুর্পদ জন্মতে অংশীদার	২৩৬
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : যাকাতুল ফিতর: যাকে বলা হয় সাদাকাতুল ফিতর -----	❖ ২৩৮
প্রথম মাসআলা: সাদাকাতুল ফিতরের বিধান ও প্রমাণ	২৩৮
দ্বিতীয় মাসআলা: শর্তসমূহ এবং যাদের উপর ওয়াজিব	২৩৮
তৃতীয় মাসআলা: ওয়াজিব করণের তাৎপর্য	২৩৯
চতুর্থ মাসআলা: ওয়াজিবের পরিমাণ ও কী দিয়ে আদায় করতে হবে?	২৪০
পঞ্চম মাসআলা: ওয়াজিব এবং আদায় করার সময়	২৪০
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : যাকাত গ্রহীতা -----	❖ ২৪২
প্রথম মাসআলা: যাকাত গ্রহীতা কারা? এর দলীল	২৪২
দ্বিতীয় মাসআলা: যাদেরকে যাকাত দেওয়া হবে না	২৪৩
তৃতীয় মাসআলা: যাকাত বণ্টন করার সময় উল্লিখিত আট শ্রেণিকে একত্রে অন্তর্ভুক্ত করা কি শর্ত?	২৪৫
চতুর্থ মাসআলা: যাকাত এক শহর থেকে আরেক শহরে স্থানান্তর করা	২৪৬

চতুর্থ অধ্যায় : সিয়াম

প্রথম অনুচ্ছেদ : সিয়ামের প্রাথমিক আলোচনা -----	❖ ২৪৯
প্রথম মাসআলা: সিয়ামের পরিচয় ও তার রুকুনসমূহের বর্ণনা	২৪৯
দ্বিতীয় মাসআলা: রমাযানের সিয়ামের হ্রকুম ও তার দলীল	২৫০
তৃতীয় মাসআলা: সিয়ামের প্রকারভেদ	২৫১

চতুর্থ মাসআলা: রমাযান মাসের সিয়ামের ফযীলত এবং তা শরীয়ত সন্তুষ্ট হওয়ার তাৎপর্য	২৫২
পঞ্চম মাসআলা: রমাযানের সিয়াম ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ	২৫৩
ষষ্ঠ মাসআলা: রমাযান মাসের শুক্র ও শেষ যেভাবে সাব্যস্ত হবে	২৫৪
সপ্তম মাসআলা: সওমের নিয়তের সময় এবং নিয়তের হকুম	২৫৫
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: যে সকল কারণে রোজা ভঙ্গ করা বৈধ ও রোজাদারের রোজা ভঙ্গকারী বিষয়-❖	২৫৭
প্রথম মাসআলা: রমাযানের সিয়াম ভঙ্গ করার বৈধ ওয়রসমূহ	২৫৭
দ্বিতীয় মাসআলা: রোজাদারের রোজা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ	২৬০
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : সিয়ামের মুন্ডাহাব (সুন্নাহ) ও মাকরাহ বিষয়সমূহ -----❖	২৬৪
প্রথম মাসআলা: রোজার মুন্ডাহাব বিষয়সমূহ	২৬৪
দ্বিতীয় মাসআলা: রোজার জন্য মাকরাহ (অপছন্দনীয়) কাজসমূহ	২৬৭
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : সিয়ামের কায়া, নফল সিয়াম, হারাম ও মাকরাহ সিয়াম -----❖	২৬৮
প্রথম মাসআলা: সিয়ামের কায়া	২৬৮
দ্বিতীয় মাসআলা: মুন্ডাহাব (সুন্নাত) রোজা	২৬৯
তৃতীয় মাসআলা: যে রোজা রাখা হারাম এবং যে রোজা রাখা মাকরাহ	২৭২
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : ই'তিকাফ -----❖	২৭৬
প্রথম মাসআলা: ই'তিকাফের পরিচয় ও তার হকুম	২৭৬
দ্বিতীয় মাসআলা: ই'তিকাফের শর্তসমূহ	২৭৭
তৃতীয় মাসআলা: ই'তিকাফের সময়, তার মুন্ডাহাব ও ই'তিকাফকারীর জন্য যা বৈধ	২৭৮
চতুর্থ মাসআলা: ই'তিকাফ বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ	২৮০

পঞ্চম অধ্যায় : হাজ্জ

প্রথম অনুচ্ছেদ : হাজ্জের প্রাথমিক আলোচনা -----❖	২৮৩
প্রথম মাসআলা: হাজ্জের পরিচয়	২৮৩
দ্বিতীয় মাসআলা: হাজ্জের হকুম ও ফযীলত	২৮৩
তৃতীয় মাসআলা: জীবনে কি একবারের বেশি হাজ্জ করা ওয়াজিব	২৮৪
চতুর্থ মাসআলা: হাজ্জের শর্তসমূহ	২৮৫
পঞ্চম মাসআলা: উমরার হকুম ও তার দলীল	২৮৮
ষষ্ঠ মাসআলা: হাজ্জ ও উমরার মীকাত	২৮৮

ছিতীয় অনুচ্ছেদ: হাজের রূক্ন ও ওয়াজিবসমূহ	◆ ২৯০
প্রথম মাসআলা: হাজের রূক্নসমূহ	২৯০
ছিতীয় মাসআলা: হাজের ওয়াজিবসমূহ	২৯১
তৃতীয় অনুচ্ছেদ: বিধিনিষেধ, ফিদয়া ও হাদীর পশ্চ	◆ ২৯৩
প্রথম মাসআলা: ইহরামের বিধিনিষেধ	২৯৩
ছিতীয় মাসআলা: নিষিদ্ধ কাজসমূহের ফিদয়া বা জরিমানা	২৯৪
তৃতীয় মাসআলা : হাদী ও তার বিধান	২৯৬
চতুর্থ অনুচ্ছেদ: হাজ ও উমরার বিবরণ	◆ ২৯৯
পঞ্চম অনুচ্ছেদ: মদীনার যে সমস্ত স্থানে যিয়ারত করা সুন্নাত	◆ ৩০৪
প্রথম মাসআলা: নাবী ﷺ এর মসজিদ যিয়ারত	৩০৪
ছিতীয় মাসআলা: নাবী ﷺ এর কবর যিয়ারত	৩০৫
তৃতীয় মাসআলা: মদীনার আরও যে সমস্ত জায়গায় যিয়ারত করা সুন্নাত	৩০৭
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : কুরবানি	◆ ৩০৯
প্রথম মাসআলা: কুরবানির পরিচয়, বিধান, শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল ও শর্ত	৩০৯
ছিতীয় মাসআলা: যে সমস্ত চতুর্পদ জন্মের মাধ্যমে কুরবানি করা বৈধ	৩১০
তৃতীয় মাসআলা: কুরবানির পশ্চে ক্ষেত্রে শর্তসমূহ	৩১১
চতুর্থ মাসআলা: কুরবানির পশ্চ জবাই করার সময়	৩১২
পঞ্চম মাসআলা কুরবানির পশ্চের গোশত কি করবে এবং কুরবানি দানকারীর যিলহাজ	
মাসের দশদিন কি কি করা আবশ্যিক	৩১৩
সপ্তম অনুচ্ছেদ : আকীকা	◆ ৩১৫
প্রথম মাসআলা: আকীকার পরিচয়, বিধান ও সময়	৩১৫
ছিতীয় মাসআলা: আকীকায় যা যবেহ করা হবে তার পরিমাণ	৩১৬
তৃতীয় মাসআলা: নবজাতক শিশুর নামকরণ, মাথা মুণ্ডন, তাহনীক করণ	
এবং কানে আয়ান দেওয়া	৩১৭

ষষ্ঠ অধ্যায় : জিহাদ

প্রথম অনুচ্ছেদ : জিহাদের পরিচয়, ফযীলত, হকুম, শর্ত এবং কে কে জিহাদ করা থেকে বিয়োগ হবে	◆ ৩২১
প্রথম মাসআলা: জিহাদের সংজ্ঞা, ফযীলত, তাঁৎপর্য, বিধান এবং কখন সেটি নির্দিষ্ট (করবে আইন) হবে?	৩২১

ছিতীয় মাসআলা: জিহাদের শর্তসমূহ	৩২৪
তৃতীয় মাসআলা: যাদের উপর জিহাদ ফরজ নয়	৩২৬
ছিতীয় অনুচ্ছেদ : বন্দী এবং গণীমত	◆ ৩২৮
প্রথম মাসআলা: কাফের বন্দীদের হকুম	৩২৮
ছিতীয় মাসআলা : গণীমতের মাল বণ্টন	৩২৯
তৃতীয় মাসআলা: ফায়-এর সম্পদ ব্যয়ের খাত	৩৩২
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : যুদ্ধ বিরতি, জিম্মা এবং নিরাপত্তা	◆ ৩৩৩
প্রথম মাসআলা: কাফেরদের সাথে যুদ্ধবিরতির চুক্তি	৩৩৩
ছিতীয় মাসআলা: জিম্মার চুক্তি এবং জিয়িয়া প্রদান	৩৩৫
তৃতীয় মাসআলা: (নং৪১) নিরাপত্তার চুক্তি	৩৩৬

সপ্তম অধ্যায়: লেনদেন

প্রথম অনুচ্ছেদ: ক্রয়-বিক্রয়	◆ ৩৪১
প্রথম মাসআলা: ক্রয়-বিক্রয়ের পরিচয় ও তার হকুম	৩৪১
ছিতীয় মাসআলা: ক্রয়-বিক্রয়ের রুকন	৩৪২
তৃতীয় মাসআলা: ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা	৩৪২
চতুর্থ মাসআলা: ক্রয়-বিক্রয়ে ইচ্ছাধিকার	৩৪৩
পঞ্চম মাসআলা:- ক্রয়-বিক্রয়ের শর্তসমূহ	৩৪৫
ষষ্ঠ মাসআলা: নিষিদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়সমূহ	৩৪৭
সপ্তম মাসআলা: ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি বাতিল করা	৩৫০
অষ্টম মাসআলা: লাভ করার চুক্তি সাপেক্ষে ক্রয়-বিক্রয় করা	৩৫১
নবম মাসআলা: কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করা	৩৫২
ষিতীয় অনুচ্ছেদ : সুদ	◆ ৩৫৪
প্রথম মাসআলা: সুদের পরিচয় ও তার হকুম	৩৫৪
ছিতীয় মাসআলা: সুদ হারাম করার রহস্য	৩৫৫
তৃতীয় মাসআলা: সুদের প্রকার	৩৫৬
চতুর্থ মাসআলা: সুদ সম্পর্কিত কতিপয় মাসআলার ধরন	৩৫৭
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : খণ	◆ ৩৫৯
প্রথম মাসআলা : খণ এর পরিচয় এবং তা শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলিল	৩৫৯

দ্বিতীয় মাসআলা: ঝণের শর্ত এবং ঝণ সংশ্লিষ্ট কিছু বিধান	৩৬০
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : বন্ধক রাখা -----	◆ ৩৬১
প্রথম মাসআলা: বন্ধকের অর্থ এবং তা শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল	৩৬১
দ্বিতীয় মাসআলা: বন্ধক সংক্রান্ত বিধান	৩৬২
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : বাইয়ে সালাম -----	◆ ৩৬৩
প্রথম মাসআলা: বাইয়ে সালামের অর্থ এবং তা শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল ও তার হিকমাহ	৩৬৩
দ্বিতীয় মাসআলা: বাইয়ে সালামের শর্তসমূহ	৩৬৪
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : হাওয়ালা -----	◆ ৩৬৫
প্রথম মাসআলা: হাওয়ালার অর্থ এবং তা শরীয়ত সম্মত হওয়ার প্রমাণ	৩৬৫
দ্বিতীয় মাসআলা: হাওয়ালা সঠিক হওয়ার শর্ত	৩৬৬
সপ্তম অনুচ্ছেদ : প্রতিনিধি নিযুক্ত করা -----	◆ ৩৬৭
প্রথম মাসআলা: তার পরিচয়, হকুম এবং তা শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল	৩৬৭
দ্বিতীয় মাসআলা: প্রতিনিধি নিযুক্ত করা সংক্রান্ত বিধিবিধান	৩৬৮
অষ্টম অনুচ্ছেদ : জিম্মাদারী এবং দায়িত্ব -----	◆ ৩৬৯
প্রথম মাসআলা: জিম্মাদারীর পরিচয় এবং তা শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল	৩৬৯
দ্বিতীয় মাসআলা: ঘামকা এর রূকন ও শর্ত	৩৭০
তৃতীয় মাসআলা: দায়িত্ব গ্রহণ করার কিছু হকুম	৩৭১
চতুর্থ মাসআলা: দায়িত্ব গ্রহণ করা	৩৭১
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা -----	◆ ৩৭৩
প্রথম মাসআলা: নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার অর্থ এবং তা শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল ও তার প্রকারভেদ	৩৭৩
দ্বিতীয় মাসআলা: প্রথম প্রকার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে বিধিবিধান; নিষেধাজ্ঞা আরোপিত ব্যক্তির কল্যাণের জন্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ	৩৭৪
তৃতীয় মাসআলা: দ্বিতীয় প্রকারের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধিবিধান; অন্যের কল্যানের জন্য কারো উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা	৩৭৬
দশম অনুচ্ছেদ : অংশীদারিত্ব -----	◆ ৩৭৭
প্রথম মাসআলা: অংশীদারিত্বের পরিচয় এবং তার হকুম ও শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল	৩৭৭
দ্বিতীয় মাসআলা: চুক্তি করার মাধ্যমে অংশীদারিত্ব গ্রহণ করা প্রকারভেদ	৩৭৮

একদশ অনুচ্ছেদ : ভাড়া দেওয়া -----	◆ ৩৭৯
প্রথম মাসআলা: ভাড়া দেওয়া অর্থ এবং তা শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল	৩৭৯
দ্বিতীয় মাসআলা: ইজারার শর্তসমূহ	৩৮০
তৃতীয় মাসআলা: ইজারার সাথে সম্পূর্ণ বিধানসমূহ	৩৮১
ষাদশ অনুচ্ছেদ : বরগাচাষ ও ফসলের বরগাচাষ -----	◆ ৩৮২
প্রথম মাসআলা: বরগাচাষ ও ফসলের বরগাচাষ এর অর্থ ও হ্রকুম	৩৮২
দ্বিতীয় মাসআলা: এ দুটির শর্ত	৩৮৩
তৃতীয় মাসআলা: এ দুটি বিষয়ের সাথে সম্পূর্ণ বিধান	৩৮৩
অয়োদশ অনুচ্ছেদ: শুফ'আহ ও প্রতিবেশী -----	◆ ৩৮৪
প্রথম মাসআলা: شفشا অর্থ এবং তা শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল	৩৮৪
দ্বিতীয় মাসআলা: শুফ'আহ এর সাথে সম্পূর্ণ হ্রকুম	৩৮৫
তৃতীয় মাসআলা: প্রতিবেশীর বিষয়ক বিধিবিধান	৩৮৬
চতুর্থ মাসআলা: রাস্তা সম্পর্কে আলোচনা	৩৮৭
চতুর্দশ অনুচ্ছেদ : আমানত রাখা এবং তা নষ্ট করা -----	◆
প্রথম মাসআলা: তার পরিচয় এবং তা শরীয়ত সম্মত হওয়ার প্রমাণ	৩৮৮
দ্বিতীয় মাসআলা : আমানত সঠিক হওয়ার শর্ত	৩৮৯
তৃতীয় মাসআলা : আমানতের সাথে সম্পূর্ণ বিধান	৩৮৯
চতুর্থ মাসআলা: ধৰ্ম বা নষ্ট করা	৩৯১
পঞ্চদশ অনুচ্ছেদ : জোরপূর্বক কিছু নেওয়া -----	◆
প্রথম মাসআলা: তার পরিচয় ও হ্রকুম	৩৯৩
দ্বিতীয় মাসআলা : بصل এর সাথে সম্পূর্ণ বিষয়াবলি	৩৯৪
ষেডশ অনুচ্ছেদ : সঞ্চি -----	◆ ৩৯৫
প্রথম মাসআলা : তার অর্থ এবং তা শরীয়ত সম্মত হওয়ার প্রমাণ	৩৯৫
দ্বিতীয় মাসআলা : সাধারণ সঞ্চির প্রকারসমূহ	৩৯৬
তৃতীয় মাসআলা : সঞ্চির সাথে সম্পূর্ণ হ্রকুম	৩৯৮
সপ্তদশ অনুচ্ছেদ : প্রতিযোগিতা -----	◆ ৩৯৯
প্রথম মাসআলা : তার অর্থ ও হ্রকুম	৩৯৯
দ্বিতীয় মাসআলা : তার সাথে সম্পূর্ণ বিধিবিধান	৪০০
তৃতীয় মাসআলা: مصالح এর ক্ষেত্রে বিনিময় নেওয়ার শর্ত	৪০১

অষ্টাদশ অনুচ্ছেদ : ধার নেওয়া -----	◆ ৪০১
প্রথম মাসআলা: ধার-এর অর্থ ও তা শরীয়ত সম্বত হওয়ার প্রমাণ	৪০১
দ্বিতীয় মাসআলা: ধার এর শর্তসমূহ	৪০৩
তৃতীয় মাসআলা: সংশ্লিষ্ট কতিপয় বিধানাবলি	৪০৩
উনবিংশ অনুচ্ছেদ : অনাবাদি জমি আবাদি করা -----	◆ ৪০৫
প্রথম মাসআলা: তার অর্থ ও হকুম	৪০৫
দ্বিতীয় মাসআলা: অনাবাদি জমি আবাদি করার শর্ত এবং যেভাবে তা অর্জিত হবে	৪০৬
তৃতীয় মাসআলা: এর সাথে সম্পৃক্ষ কিছু মাসআলা	৪০৭
বিংশ অনুচ্ছেদ : মজুরী, পারিশ্রমিক -----	◆ ৪০৮
প্রথম মাসআলা: তার অর্থ ও তার হকুম	৪০৮
দ্বিতীয় মাসআলা: মজুরী, পারিশ্রমিকের সাথে সম্পৃক্ষ বিধিবিধান	৪০৯
একবিংশ অনুচ্ছেদ : কুড়িয়ে পাওয়া বস্ত্র ও শিশু -----	◆ ৪১০
প্রথম মাসআলা: ﴿طَفَّ﴾ এর অর্থ এবং তার হকুম	৪১০
দ্বিতীয় মাসআলা: ﴿طَفَّ﴾ এর প্রকারভেদ	৪১১
তৃতীয় মাসআলা: কুড়িয়ে পাওয়া বস্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান	৪১২
চতুর্থ মাসআলা: কুড়িয়ে পাওয়া শিশু	৪১৩
ঘৰবিংশ অনুচ্ছেদ : ওয়াকফ -----	◆ ৪১৪
প্রথম মাসআলা: তার অর্থ ও বিধান	৪১৪
দ্বিতীয় মাসআলা: এর সাতে সম্পৃক্ষ হকুম	৪১৫
অয়োবিংশ অনুচ্ছেদ : হিবা ও দান -----	◆ ৪১৬
প্রথম মাসআলা: তার অর্থ এবং দলীলসমূহ	৪১৬
দ্বিতীয় মাসআলা: ﴿بَلَّ﴾ এর শর্তসমূহ	৪১৭
তৃতীয় মাসআলা: হিবার সাথে সম্পৃক্ষ বিধান	৪১৭

অষ্টাম ঋধ্যায় : মিরাস, অসীয়ত ও দাস মুক্তি

প্রথম অনুচ্ছেদ : কুণ্ঠ ব্যক্তির খরচ করা -----	◆ ৪২১
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: অসীয়ত -----	◆ ৪২৩
প্রথম মাসআলা: অসীয়তের পরিচয় ও তা শরীয়ত সম্বত হওয়ার দলীল	৪২৩

ହିଟୀୟ ମାସଆଲା: ଅସୀଯତ ସଂଶିଷ୍ଟ ବିଧିବିଧାନ	228
ତୃତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ : ଦାସ ମୁକ୍ତି, ମୁକାତାବ ଗୋଲାମ ଓ ମୁଦାକାର ଗୋଲାମ	◆ 828
ପ୍ରଥମ ମାସଆଲା: ଦାସ ମୁକ୍ତିର ପରିଚୟ, ଶରୀଯତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦଲୀଲ, ତାର୍ ଫୟୀଲତ ଏବଂ ଶରୀଯତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହେଉଥାର ହିକମାହ	828
ହିଟୀୟ ମାସଆଲା: ଦାସ ମୁକ୍ତିର କୁଳକଣ ଶର୍ତ୍ତ ଓ ଶବ୍ଦାବଳି	830
ତୃତୀୟ ମାସଆଲା: ଦାସ ମୁକ୍ତିର ନୀତିମାଳା	831
ଚତୁର୍ଥ ମାସଆଲା: ଆତ-ଆଦବିର ତଥା ମୁଦାକାର ଗୋଲାମ	833
ପଞ୍ଚମ ମାସଆଲା: ମୁକାତାବ ଗୋଲାମ	838
ଚତୁର୍ଥ ଅନୁଚ୍ଛେଦ: ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଂଶ ଓ ଉତ୍ତରାଧିକାର	◆ 837
ପ୍ରଥମ ମାସଆଲା: ତାର ଅର୍ଥ ଓ ତା ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ	837
ହିଟୀୟ ମାସଆଲା: ଉତ୍ତରାଧିକାର ସମ୍ପତ୍ତି ସଂଶିଷ୍ଟ ଅଧିକାର, ଉତ୍ତରାଧିକାରେର କାରଣ ଓ ତାର ପ୍ରତିବନ୍ଦକତାସମ୍ମୂହ	838
ତୃତୀୟ ମାସଆଲା: ଉତ୍ତରାଧିକାରେର ପ୍ରକାର	839
ଚତୁର୍ଥ ମାସଆଲା: ଉତ୍ତରାଧିକାର ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଦେର ପ୍ରକାର	842
ପଞ୍ଚମ ମାସଆଲା: ଆସାବା ବାନାନୋ	888
ସଞ୍ଚ ମାସଆଲା: ବାଁଧା ଦେଓୟା (ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କେ ତାର ଉତ୍ତରାଧିକାର ଥେବେ ବାଁଧା ଦେଓୟା)	886
ନଞ୍ଚମ ମାସଆଲା: ନିକଟାଜ୍ଞୀୟଦେର ସମ୍ପର୍କେ	888

ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ : ବିବାହ ଏବଂ ତାଲାକ

ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ : ବିବାହ	◆ 851
ପ୍ରଥମ ମାସଆଲା: ବିବାହେର ପରିଚୟ ଏବଂ ତା ଶରୀଯତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦଲୀଲସମ୍ମୂହ	851
ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସଆଲା: ବିବାହ ଶରୀଯତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଏବଂ ତାର ଶିଷ୍ଟାଚାର	853
ତୃତୀୟ ମାସଆଲା: ବିବାହେର ହୁକୁମ ଏବଂ ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ	853
ଚତୁର୍ଥ ମାସଆଲା: ବିବାହ ପ୍ରତାବେର ନିୟମନୀତି ଏବଂ ତାର ଶିଷ୍ଟାଚାର	855
ପଞ୍ଚମ ମାସଆଲା: ବିବାହ ପରିଚୟ ଏବଂ ତାର ବିଧାନ	856
ସଞ୍ଚ ମାସଆଲା: ବିବାହ ଶର୍ତ୍ତ ଓ କୁଳକଣସମ୍ମୂହ	857
ନଞ୍ଚମ ମାସଆଲା: ବିବାହ ନିଷିଦ୍ଧ ନାରୀଗଣ	859
ଅଟେମ ମାସଆଲା: କିତାବୀ ନାରୀଙ୍କେ ବିବାହେର ବିଧାନ	866

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : মোহর, বিবাহের অধিকার, স্বামীর কর্তব্য এবং বিবাহের অলীমা -----◆	৪৬৭
প্রথম মাসআলা: মোহরের পরিচয়, মোহরের বৈধতা এবং তার বিধান সম্পর্কে আলোচনা	৪৬৭
দ্বিতীয় মাসআলা: মোহরের নির্ধারিত পরিমাণ, তার তাৎপর্য এবং তা নির্ধারণ	৪৬৯
তৃতীয় মাসআলা : মোহর নিয়ে বাড়াবাড়ির হুকুম	৪৭১
চতুর্থ মাসআলা: বিবাহিত জীবনের অধিকারসমূহ	৪৭২
পঞ্চম মাসআলা: বিবাহের কথা প্রচার করা	৪৭৮
ষষ্ঠ মাসআলা: বিবাহের অলীমা	৪৭৮
সপ্তম মাসআলা: অলীমার দাওয়াত করুল করার বিধান	৪৭৯
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : খোলা তালাক -----◆	৪৮১
প্রথম মাসআলা: খোলার অর্থ এবং তা শরীয়তসম্মত হওয়ার দলীলসমূহ	৪৮১
দ্বিতীয় মাসআলা: খোলা তালাকের সাথে সম্পৃক্ত বিধান এবং এর সংশ্লিষ্ট হিকমাহ	৪৮২
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : তালাক -----◆	৪৮৪
প্রথম মাসআলা: তালাকের অর্থ, শরীয়তসম্মত হওয়ার প্রমাণসমূহ এবং তালাকের হিকমাহ	৪৮৪
দ্বিতীয় মাসআলা: তালাকের হুকুম এবং কার মাধ্যমে তালাক সংঘটিত হবে?	৪৮৬
তৃতীয় মাসআলা: তালাকের শব্দ	৪৮৬
চতুর্থ মাসআলা: সুন্নাত তালাক এবং তার বিধান	৪৮৭
পঞ্চম মাসআলা: বিদআতী তালাক এবং তার বিধান	৪৮৮
ষষ্ঠ মাসআলা: ফিরিয়ে আনা	৪৮৯
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : ইলা (কসম) -----◆	৪৯৩
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: যিহার -----◆	৪৯৬
সপ্তম অনুচ্ছেদ : লিআন -----◆	৪৯৮
প্রথম মাসআলা: লিআনের পরিচয় এবং তা শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল ও হিকমাহ	৪৯৮
দ্বিতীয় মাসআলা: লিআনের শর্ত ও পদ্ধতি	৫০০
তৃতীয় মাসআলা: লিআনের সাথে সম্পৃক্ত হুকুমসমূহ	৫০১
অষ্টম অনুচ্ছেদ : ইদ্দত এবং শোক পালন -----◆	৫০২
প্রথম মাসআলা: ইদ্দত এর পরিচয়, তা শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল এবং তার তাৎপর্য	৫০২
দ্বিতীয় মাসআলা: ইদ্দতের প্রকার	৫০৪
তৃতীয় মাসআলা: ইদ্দতের সাথে সংশ্লিষ্ট আবশ্যকীয় বিষয়াবলী এবং ইদ্দত পরবর্তী ফলাফল	৫০৬
চতুর্থ মাসআলা: শোক পালন	৫০৯

নবম অনুচ্ছেদ: দুধ পান করানো -----	❖ ৫১১
প্রথম মাসআলা: স্তন্যপানের পরিচয়, শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল এবং বিধান	৫১১
দ্বিতীয় মাসআলা: হ্যারামকারী দুধপান-এর শর্ত এবং দুধপানের কারণে তৈরি আত্মীয়তার বন্ধন	৫১৩
তৃতীয় মাসআলা: দুধপান সাব্যস্তকরণ	৫১৫
 দশম অনুচ্ছেদ: লালনপালন এবং তার বিধিবিধান -----	❖ ৫১৬
প্রথম মাসআলা: حضانة এর সংজ্ঞা, তার হৃকুম এবং এটা কার জন্য?	৫১৬
দ্বিতীয় মাসআলা: حاضن এর শর্ত ও লালন পালনের প্রতিবন্ধিকতাসমূহ	৫১৭
তৃতীয় মাসআলা: حضانة সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ	৫১৮
 একাদশ অনুচ্ছেদ: খোরপোশ বা খরচ করা -----	❖ ৫২০
প্রথম মাসআলা: حفظ এর সংজ্ঞা এবং তার প্রকার সমূহ	৫২০
দ্বিতীয় মাসআলা: দাস এবং চতুর্পদ জন্তুর খরচ	৫২৩

দশম অধ্যায় : অপরাধবিধি

প্রথম অনুচ্ছেদ: অপরাধবিধি -----	❖ ৫২৭
প্রথম মাসআলা: حبائل বা অপরাধ পরিচিতি ও প্রকারভেদ	৫২৭
দ্বিতীয় মাসআলা : ব্যক্তির উপর আঘাত করা	৫২৮
তৃতীয় মাসআলা: হত্যার প্রকারভেদ	৫২৯
চতুর্থ মাসআলা : কোনো ব্যক্তি প্রাণনাশ ছাড়া অন্য কিছুর উপর নির্যাতন করা	৫৪১
 দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: রক্তমূল্য বা হত্যাকারীর উপর ধার্য ক্ষতিপূরণ -----	❖ ৫৪৬
প্রথম মাসআলা: তার পরিচয়	৫৪৬
দ্বিতীয় মাসআলা: দিয়াত শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল এবং হিকমাহ	৫৪৬
তৃতীয় মাসআলা: কাদের উপর দিয়াত ওয়াজিব এবং কে দায়ভার গ্রহণ করবে?	৫৪৭
চতুর্থ মাসআলা: দিয়াতের প্রকারভেদ ও পরিমাণ	৫৪৮
 তৃতীয় অনুচ্ছেদ: কুসামাহ -----	❖ ৫৫১
প্রথম মাসআলা: حملة এর পরিচয়, হৃকুম ও তা প্রণয়নের তাৎপর্য	৫৫১
দ্বিতীয় মাসআলা: কুসামার শর্তসমূহ	৫৫৩
তৃতীয় মাসআলা: কুসামার পদ্ধতি	৫৫৩

একাদশ অধ্যায় : দণ্ডবিধি

প্রথম অনুচ্ছেদ: শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তির পরিচয়, তা শরীয়ত সম্মত হওয়া এবং সাথে সাথে তার উপকারিতা বা তাংপর্য	◆ ৫৫৭
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: ব্যভিচারের শাস্তি	◆ ৫৬১
প্রথম মাসআলা: জিনা ব্যভিচারের পরিচয়, তার ছক্ষুম এবং তার ক্ষতিকারক দিকসমূহ	৫৬১
দ্বিতীয় মাসআলা : ব্যভিচারের নির্ধারিত শাস্তি	৫৬২
তৃতীয় মাসআলা: কীসের মাধ্যমে জিনা সাব্যস্ত হবে?	৫৬৬
তৃতীয় অনুচ্ছেদ: অপবাদের শাস্তি	◆ ৫৬৮
প্রথম মাসআলা: <i>القذف</i> শব্দের অর্থ এবং তার বিধান	৫৬৮
দ্বিতীয় মাসআলা: অপবাদ দেওয়ার শাস্তি এবং এর হিকমাহ	৫৬৯
তৃতীয় মাসআলা: অপবাদের শাস্তি আবশ্যিক হওয়ার জন্য শর্তসমূহ	৫৭০
চতুর্থ মাসআলা: অপবাদের নির্ধারিত শাস্তির জন্য কিছু শর্তসমূহ	৫৭২
চতুর্থ অনুচ্ছেদ: মদ্যপায়ির নির্ধারিত শাস্তি	◆ ৫৭৩
প্রথম মাসআলা: মদের পরিচয়, তার বিধান এবং তা হারাম হওয়ার হিকমাহ	৫৭৩
দ্বিতীয় মাসআলা: মদ পানকারীর জন্য নির্ধারিত শাস্তি, এর শর্তসমূহ এবং কোন বিষয়ের মাধ্যমে শাস্তি সাব্যস্ত হবে?	৫৭৫
তৃতীয় মাসআলা: সমসাময়িক ক্ষতিকারক দ্রব্য বা সিগারেট এবং তার দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য করার বিধান	৫৭৬
পঞ্চম অনুচ্ছেদ: চুরির নির্ধারিত শাস্তি	◆ ৫৭৮
প্রথম মাসআলা: চুরি করার পরিচয়, তার বিধান, শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি এবং তা কার্যকর করার পেছনে হিকমাহ বা উপকারিতা	৫৭৮
দ্বিতীয় মাসআলা: চুরির শাস্তি ওয়াজিব হওয়ার জন্য কিছু শর্ত	৫৮০
তৃতীয় মাসআলা: চুরির শাস্তির ক্ষেত্রে সুপারিশ এবং চোরকে চুরিকৃত সম্পদ দিয়ে দেওয়া	৫৮২
চতুর্থ মাসআলা: হাত কাটার পদ্ধতি এবং হাতের কোন স্থান কাটা হবে?	৫৮৩
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: শিক্ষামূলক শাস্তি (তাঁবীর)	◆ ৫৮৪
প্রথম মাসআলা: শিক্ষামূলক শাস্তির পরিচয়, তার বিধান এবং এর উপকারিতা	৫৮৪
দ্বিতীয় মাসআলা: ঐ সমস্ত অপরাধের প্রকারসমূহ যার ব্যাপারে শিক্ষামূলক শাস্তি দেওয়া আবশ্যিক হয়	৫৮৫
তৃতীয় মাসআলা : তা'ঁবীর বা শিক্ষামূলক শাস্তির পরিমাণ	৫৮৬

চতুর্থ মাসআলা : শিক্ষামূলক শান্তির প্রকারসমূহ	৫৮৬
সপ্তম অনুচ্ছেদ: লুটতরাজের নির্ধারিত শান্তি	◆ ৫৮৭
প্রথম মাসআলা: লুটতরাজের পরিচয় ও লুটপাটকারীদের শান্তি	৫৮৭
দ্বিতীয় মাসআলা: সন্তাসীদের উপর শান্তি ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্তসমূহ	৫৮৮
তৃতীয় মাসআলা: লুটকারীর উপর থেকে শান্তি বাতিল হওয়া	৫৮৯
অষ্টম অনুচ্ছেদ : মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী	◆ ৫৯০
প্রথম মাসআলা: হুর্রা এর পরিচয়, তার শর্তসমূহ এবং ধর্মত্যাগীর বিধান	৫৯০
দ্বিতীয় মাসআলা: ধর্মত্যাগ সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়সমূহ	৫৯২
তৃতীয় মাসআলা: ধর্মত্যাগী হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত বিধিবিধান	৫৯৩

দ্বাদশ অধ্যায় : শপথ ও মানত্ব

প্রথম অনুচ্ছেদ: শপথসমূহ	◆ ৫৯৭
প্রথম মাসআলা: میمانشা বা শপথ পরিচিতি প্রসঙ্গে	৫৯৭
দ্বিতীয় মাসআলা: শপথের প্রকারভেদ	৫৯৭
তৃতীয় মাসআলা: শপথের কাফ্ফারা এবং তা ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ	৫৯৯
চতুর্থ মাসআলা: কিছু বৈধ ও নিষিদ্ধ শপথের স্বরূপ	৬০৩
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: মানতসমূহ	◆ ৬০৫
প্রথম মাসআলা: التذر (মানত করা) এর সংজ্ঞা, তার বৈধতা ও হকুম	৬০৫
দ্বিতীয় মাসআলা: মানতের শর্তসমূহ ও তার শব্দাবলী	৬০৭
তৃতীয় মাসআলা: মানতের প্রকারভেদ	৬০৭
চতুর্থ মাসআলা: মানতের শ্রেণিভেদ ও তার হকুমসমূহ	৬০৮
পঞ্চম মাসআলা: যেসব মানত পূর্ণ করা বৈধ নয় তার স্বরূপ	৬১০

অয়োদশ অধ্যায় : পানাহার করা, পণ্ড যবেহ ও শিকার করা

প্রথম অনুচ্ছেদ: পানাহার করা	◆ ৬১৩
প্রথম মাসআলা: حملة-এর সংজ্ঞা এবং তার মূলনীতি	৬১৩
দ্বিতীয় মাসআলা: যে সমস্ত খাবারকে শরীয়ত প্রণেতা হালাল ও বৈধ হিসেবে উল্লেখ করেছেন	৬১৫
তৃতীয় মাসআলা: শরীয়ত প্রণেতা যেসব খাবার হারাম করেছেন	৬১৮

চতুর্থ মাসআলা: শরীয়ত প্রণেতা যা বর্ণনা করা থেকে বিরত থেকেছেন	৬২২
পঞ্চম মাসআলা: যে সকল খাবার খাওয়া মাকরহ	৬২২
ষষ্ঠ মাসআলা : খাওয়ার আদাব	৬২৩
• ষ্ঠিতীয় অনুচ্ছেদ: পশু যবেহ সংক্রান্ত বিধিবিধান	◆ ৬২৭
প্রথম মাসআলা: যবেহ-এর অর্থ, শ্রেণিভেদ ও এর বিধান	৬২৭
ষ্ঠিতীয় মাসআলা: যবেহ বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ	৬২৮
তৃতীয় মাসআলা: যবেহ-এর আদাব বা নিয়মসমূহ	৬৩১
চতুর্থ মাসআলা: যবেহ-এর মাকরহ বিষয়সমূহ	৬৩৩
পঞ্চম মাসআলা: আহলে কিতাবদের যবেহকৃত পশুর বিধান	৬৩৪
তৃতীয় অনুচ্ছেদ: শিকারের বিধিবিধান	◆ ৬৩৫
প্রথম মাসআলা: শিকারের পরিচয়, হকুম ও শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল	৬৩৫
ষ্ঠিতীয় মাসআলা: বৈধ ও অবৈধ শিকার	৬৩৬
তৃতীয় মাসআলা: শিকার বৈধ হওয়ার শর্তসমূহ	৬৩৭

চতুর্দশ অধ্যায় : বিচার-ফয়সালা ও সাক্ষ্য প্রদান

প্রথম অনুচ্ছেদ: বিচার-ফয়সালা	◆ ৬৪৩
প্রথম মাসআলা: বিচার-ফয়সালার পরিচয়, বিধান ও শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল	৬৪৩
ষ্ঠিতীয় মাসআলা: বিচারকের শর্ত	৬৪৫
তৃতীয় মাসআলা: বিচারকের শিষ্টাচার ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তারজন্য কী থাকা উচিত এবং কী উচিত নয়	৬৪৬
চতুর্থ মাসআলা: বিচার-ফয়সালার পদ্ধতি ও গুণাবলি	৬৪৮
ষ্ঠিতীয় অনুচ্ছেদ: সাক্ষ্য প্রদান	◆ ৬৫০
প্রথম মাসআলা: সাক্ষ্যের পরিচয়, হকুম ও তার দলীল	৬৫০
ষ্ঠিতীয় মাসআলা: যে সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে তার শর্ত	৬৫২
তৃতীয় মাসআলা: সাক্ষ্য সংক্রান্ত কিছু বিধান	৬৫৩

مقدمة ভূমিকা

الحمدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى أَلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ. أَمَا بَعْدُ:

যাবতীয় প্রশংসা ও গুণকীর্তন সুমহান বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য। দরুদ ও
সালাম বর্ধিত হোক তার প্রিয় বান্দা ও রাসূল, সর্বশেষ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর পরিবারবর্গ এবং
তাঁর সকল সাহাবায়ে কিরামের প্রতি। অতঃপর..

দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করা, শরীয়তের লকুম-আহকামের প্রমাণাদি জানা, সর্বোত্তম ও
সর্বোৎকৃষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্যগুলির অন্যতম। শরীয়তে এমন অনেক নাস তথা কুরআন হাদীসের
দলীল রয়েছে, যেগুলো পঠন ও গবেষণার মাধ্যমে শরীয়তের গভীর জ্ঞান অনুসন্ধান ও সে
ব্যাপারে দক্ষ হতে আস্থান করে। দ্বীন ইসলামে এটার গুরুত্ব রয়েছে, এটি তারই একটি উত্তম
দৃষ্টান্ত। এর মর্যাদা বুঝানোর জন্য এটা উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, মহান আল্লাহ যদি কোনো বান্দার
কল্যাণ চান তবে তাকে দ্বীনের পাণ্ডিত্য দান করেন।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন: **مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقِهُهُ فِي الدِّينِ**

“আল্লাহ যে ব্যক্তির কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।”^১

অতএব অজ্ঞতা যে ব্যক্তিকে অঙ্গ করে দিয়েছে, প্রবৃত্তি যাকে তার লক্ষ্যস্থলে পৌছা হতে পথচার
করে দেওয়ার ফলে সে তার পথে বিশৃঙ্খলভাবে এদিক সেদিক ঘুরে-ফিরে বেড়ায়, অথচ সে
সঠিক পথের সন্ধান পায় না, সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির মতো হতে পারে না, যে ব্যক্তি জ্ঞানের
আলোয় উদ্ভাসিত, ফলে সে হেদায়েত ও আলোর পথ থেকে তার প্রতিপালকের ইবাদত করে।
এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন:

^১ মুক্তাফাকুন আলাইত্তি; সহীহ বুখারী, হা. ৭১; সহীহ মুসলিম, হা. ২২৭৯, ফুআ. ১০৩৭।

﴿ قُلْ هُلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ ﴾

”বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি উভয়ে কখনো সমান হতে পারে?” [সূরা যুমার : ১]

বরকতময় এই দেশের (সৌদি আরবের) সরকার প্রশাসন হিদায়াত ও আলোর পথে থেকে মানুষদেরকে আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বহন করছে। এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। কেননা এটি হারামাইন শরীফাইনের দেশ; তারা তাদের সক্ষমতা ও সাধ্যানুযায়ী কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে মানুষদের থেকে অনেকাংশে অজ্ঞতা বিদূরীত হয়েছে এবং কুরআন ও সুন্নাহ যা থেকে মুক্ত সেগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে এ দেশের বাদশাহ (যিনি হারামাইন শরীফাইনের খাদেম) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিতে অনেক প্রচেষ্টা করেছেন। দুআ করি, আল্লাহ তাকে সমস্ত কল্যাণকর কাজগুলো করার তাওফীক দান করুন। তন্মধ্যে একটি অন্যতম বিরাট খেদমত হলো- দাওয়াহ, ইরশাদ, ওয়াকফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রকল্প, যার অধীনে বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মাজীদ মুদ্রণ কমপ্লেক্স পরিচালিত হয়। এখান থেকে শারঙ্গি জ্ঞানের সহজ সহজ গ্রন্থগুলো প্রচার প্রসার করা হয় এবং সকল মানুষদের মাঝে বিনামূল্য বিতরণ করা হয়। যাতে তারা খুব সহজ পদ্ধতিতে কুরআন ও সুন্নাহ এবং তা থেকে সালফে সালেহীন যা বুঝেছেন; তার আলোকে তাদের দ্বীন শিক্ষা করতে পারে। এ লক্ষ্যে বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স ধারাবাহিকভাবে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো প্রকাশ করেছে:

১. أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. (কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ঈমানের মূলনীতি);

২. الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة. (কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যিকর ও দুআ);

আর এখন নৃতন একটি কিতাব প্রকাশিত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি চলছে, সেটা হলো:

৩. الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. (কুরআন সুন্নাহর আলোকে সহজ পদ্ধতিতে দ্বীনের বিধানাবলি)।

এই গ্রন্থটি কিতাবুল কারীম তথা কুরআন ও সুন্নাতে নাববী তথা হাদীস থেকে সহীহ দলীলের আলোকে ইবাদত ও মু’আমালাত সংক্রান্ত ফিকহী লকুম আহকামকে সন্নিবেশিত করেছে। এগুলোকে খুব সহজভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যা জটিলতা ও দীর্ঘায়িত থেকে মুক্ত। যেসব বিষয়ে অনেক মুসলিমই সমাধান করা এবং তা থেকে উপকৃত হতে সক্ষম নয়। সেই সাথে এটাকে এমন সংক্ষেপ করা হয়েছে এবং এতে নির্বাচিত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ত্রুটিমুক্ত ও সুস্পষ্ট রাখার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে মানুষ খুব সহজেই দ্বীনের লকুম আহকামগুলো জানতে পারে।

অতঃপর বাদশা ফাহাদ কমপ্লেক্স এমন একদল যোগ্য ওস্তায়কে এই বইটি প্রস্তুত করার দায়িত্ব দিলেন, যারা ইসলামী শরীয়ত বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন পূর্বক ফিকহ সম্বন্ধে বিশেষ যোগ্যতা

রাখেন। (উল্লেখ্য যে, বাদশাহ ফাহাদ কমপ্লেক্স কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিটি বইয়ের ক্ষেত্রেই এমনটি করা হয়ে থাকে।) এরপর, পুনঃনিরীক্ষণের জন্য পাঞ্জুলিপিটি বিশেষ পরামর্শ কমিটির হাতে চলে যায়। তারা তখন ছুটে যাওয়া কিংবা দুর্বোধ্য অংশগুলো সংশোধন করে দেন...। আলহামদুলিল্লাহ! অবশেষে পাঞ্জুলিপিটি একটি সুন্দর বিষয়বস্তু সংবলিত বইয়ে রূপ নেয়। এখানে -

- প্রতিটি মাসআলায় উল্লিখিত ফিকহী বিধি-বিধানকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত হাদীস ও আসার এসেছে সেগুলোর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।
- একজন মুসলিমের জীবনে প্রয়োজনীয় যাবতীয় মাসআলা ও ফিকহ-বিষয়ক আলোচনা সন্নিবেশ করা হয়েছে।
- ছাত্র থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণের সুবিধার্থে সুস্পষ্ট ইবারত (বর্ণনাভঙ্গি) ও সহজ প্রকাশ ভঙ্গিমা ব্যবহার করা হয়েছে।
- বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও বিষয়বস্তু সহজে অনুধাবনযোগ্য করে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- অজ্ঞতাবশত কিংবা তাকলীদের বশবতী হয়ে অধিকাংশ মুসলিম যে সকল শরীয়ত-বিরোধী কাজে লিঙ্গ হয়, সেগুলো থেকে সতর্ক করা হয়েছে।

সর্বোপরি আল্লাহর কাছে এই ফরিয়াদ করছি, তিনি এই বইটিকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে একটি একনিষ্ঠ কর্ম হিসেবে কবুল করে নেন এবং এটি যেন মানুষের দ্বীন শিক্ষার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

পরিশেষে, সে সকল ওস্তায়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যারা এই বইটি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ শ্রম আজ্ঞাম দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাতের দিন তিনি যেন তাদেরকে এই শ্রমের বিনিময়ে অসামান্য উপহারে ভূষিত করেন, সেই দুআ করছি।

বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স এবং ইলমী খেদমতে নিয়োজিত ভাইদেরকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

শাইখ সালিহ বিন আব্দুল আয়ীফ বিন মুহাম্মাদ আলুশ শাইখ
মাননীয় মঞ্চী- সৌদি সরকারের দাওয়াহ, ইরশাদ, ওয়াকফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
এবং মাননীয় পরিচালক- বাদশাহ ফাহাদ মুদ্রণ কমপ্লেক্স

منہج العمل فی الكتاب বইটি সাজানোর পদ্ধতি

বইটি যেভাবে সাজানো হয়েছে সংক্ষেপে তার বর্ণনা:

প্রথম: বিষয়গুলোকে প্রধান প্রধান অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। আর প্রত্যেকটি অধ্যায়ে বেশকিছু অনুচ্ছেদ রয়েছে। আর প্রত্যেক অনুচ্ছেদে বেশকিছু মাসআলা রয়েছে। আর এটা করা হয়েছে অধ্যয়ণের সহজ ও সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে।

দ্বিতীয়: প্রত্যেক অনুচ্ছেদে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আসা হয়েছে। আর যেগুলোর প্রয়োজন কম সেগুলোর পরিচয় ও মাসআলা উল্লেখ করা হয়নি।

তৃতীয়: সাধ্যনুযায়ী বিষয়বস্তুকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে এবং সহজ-সাবলীল শব্দ ও বাক্য চয়ণ করা হয়েছে।

চতুর্থ: প্রত্যেক মাসআলায় নির্ভরযোগ্য দলীলগুলোর উপর সীমাবদ্ধ থাকা হয়েছে।

পঞ্চম: মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলায় শুধুমাত্র দলীল সমর্থিত নির্ভরযোগ্য মত উল্লেখ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মতামত ও মতানৈক্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়নি।

ষষ্ঠ: কুরআনুল কারীমের আয়াতগুলোর তথ্যসূত্র দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি আয়াতের পাশে সূরার নাম ও আয়াত নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে।

সপ্তম: হাদীসগুলো তাখরীজ করা হয়েছে। অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থের তথ্যসূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব হাদীসটি যদি আমরা সহীহাইন তথা বুখারী-মুসলিমে উভয়টিতে অথবা এ দুটির যে কোনো একটিতে পেয়ে যাই, তবে সেটাই আমরা যথেষ্ট মনে করেছি। আর যদি এ দুটি গ্রন্থে আমরা না পাই, তবে প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থগুলো থেকে হাদীস তাখরীজ করেছি। এ ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ চারটি হাদীস গ্রন্থ (যা সুনানে আরবাআ নামে প্রসিদ্ধ: তিরমিয়ী, আবু দাউদ, নাসাই, ইবনু

মাজাহ) অন্য হাদীস গ্রন্থগুলোর পূর্বে প্রাধান্য পেয়েছে। যে হাদীসগুলো সহীহল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীস নয়, সেগুলোর সাথে হাদীসের হকুম এবং তার স্তরও বর্ণনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ও বর্তমানের ঐ সকল আলেমদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা হাদীসের (হকুম দেওয়ার) ব্যাপারে অভিজ্ঞ।

অষ্টম: ঐ সমস্ত দুর্বোধ্য শব্দ ও পরিভাষার ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়েছে, যেগুলো স্পষ্ট করা ও বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন পড়েছে। এক্ষেত্রে যেগুলো বিস্তৃত ও ব্যাখ্যা সাপেক্ষ, সেগুলো এ গ্রন্থের টীকাতে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে যেগুলো মৌলিক গবেষণামূলক পরিভাষা সেগুলো মূল গ্রন্থের মূলপাঠে প্রত্যেক অনুচ্ছেদ ও মাসআলার শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে।

নবম: আধুনিক বেশকিছু ফিকহের গ্রন্থ হতে সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলো হলো :

আশ-শারহল মুমতি (الشرح الممتع) (লেখক: শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন (যাহু);
আল মুলাখাসুল ফিকহী (الملاخص الفقهي) (লেখক: শাইখ সালিহ আল ফাওয়ান (হাফি.)।

এক্ষেত্রে চার মাযহাব এবং অন্যান্য ফিকহের মৌলিক গ্রন্থগুলো থেকেও সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

দশম: বেশকিছু বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, যে সমস্ত বিষয়ে মানুষ বেশি জড়িয়ে পড়ে অথচ তা কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিপরীত এবং সেক্ষেত্রে সঠিক ও সত্যটা বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। এটা ঐ সমস্ত স্থানেই এমন করা হয়েছে, যে সকল স্থানে আমরা করার প্রয়োজন অনুভব করেছি।

একাদশ: গ্রন্থের শেষে অধ্যায় ও মাসআলাগুলোর বিস্তৃত সূচিপত্র আমরা প্রনয়ন করেছি, যাতে পাঠ ও আলোচনা খুঁজে পেতে সহজ হয়।

التمهيد
مুখবন্ধ

ନିମ୍ନ କିଛୁ ବିଷୟର ପ୍ରତି ଆଲୋକପାତ କରା ହଲୋ:

- ফিকহের আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয়;
 - ফিকহের উৎস; -ফিকহের আলোচ্য বিষয়;
 - ফিকহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য; -ফিকহের ফায়িলত।

ফিকহের শাব্দিক ও পারিভাষিক পরিচয় :

۴۷) شব্দটির অভিধানিক অর্থ **الفَهْم** বা বুঝা। এ অর্থেই আল-কুরআনে শু'আইব **فَهِبْ** এর জাতি সম্পর্কে একটি আয়াত উদ্ধৃত হয়েছে:

﴿... مَا نَفِقْهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ ...﴾

“ଆମରା ତୋମାର ଅଧିକାଂଶ କଥାଇ ବୁଝାତେ ପାରଛି ନା ।” [ସୁରା ହୃଦ: ୯୧]

এ ছাড়াও 'ফিকহ' শব্দটিকে একই অর্থে কুরআনের অন্যত্র ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقُهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾

“তোমরা তাদের তাসবীহ পাঠ বুঝতে সক্ষম নও।” [সূরা আলি ইমরান: 88]

﴿فَلَا﴾ শব্দের পারিভাষিক অর্থঃ শরীয়তের বিস্তারিত দলীলাদি থেকে প্রাপ্ত কর্মগত বিধিবিধান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করাকে ফিকহ বলা হয়। কখনো কখনো স্বয়ং আহকাম বা বিধানাবলির ক্ষেত্রে ﴿فَلَا﴾ শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

ফিকহের মৌলিক উৎস:

১. আল-কুরআন ২. সুন্নাহ ৩. ইজমা' ৪. কুয়াস

ফিকহের আলোচ্য বিষয়:

সামগ্রিকভাবে শরীয়তের বিধানের আওতাভুক্ত বান্দার যাবতীয় কাজকর্ম ফিকহের মূল আলোচ্য বিষয়। পাশাপাশি ব্যক্তির সাথে তার রবের সম্পর্ক থেকে শুরু করে তার নিজ সত্তা ও সমাজের সাথে সম্পর্কের বিষয়টিও ফিকহের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত।

এ ছাড়াও, বিভিন্ন কর্মগত বিধিবিধান, বান্দার কথা, কাজ, পারস্পরিক চুক্তি ও লেনদেন ফিকহের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এ সমস্ত বিধি-বিধান দুই প্রকার:

১. ইবাদত-সংক্রান্ত বিধিবিধান: যেমন- সলাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি।

২. মু'আমালাত-সংক্রান্ত বা লেনদেন বিধিবিধান: যেমন- চুক্তি, লেনদেন, শান্তি, অপরাধ, জিম্মাদারিসহ ইত্যাদি ঐসকল বিষয়াবলী, যেগুলোর মাধ্যমে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক রাখা হয়।

উপরিউক্ত বিধিবিধানকে সংক্ষেপে এভাবে বলা যেতে পারে-

১. একটি পরিবার গড়ে ওঠা থেকে শুরু করে শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিধান; তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: বিবাহ, তালাক, বংশ পরম্পরা, ভরণপোষণ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিধানাবলী।

২. অর্থনৈতিক লেনদেন (নাগরিক) সংক্রান্ত বিধিবিধান: এ ধরনের লেনদেনগুলো সাধারণত ব্যবসা, ভাড়া, শরীকানা ইত্যাদি পারস্পরিক বিনিময় সংক্রান্ত হয়ে থাকে।

৩. অপরাধ সংক্রান্ত বিধিবিধান: শরীয়তের বিধানের আওতাভুক্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে, তার উপর কী শান্তি প্রয়োগ করা হবে, সে সংক্রান্ত বিধানাবলী।

৪. বিচার-ফয়সালা সংক্রান্ত বিধিবিধান: এসমস্ত বিধান পারস্পরিক বিবাদ নিরসন, দাবি-দাওয়া, দোষ অথবা নির্দোষিতা প্রমাণিত হওয়ার পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট।

৫. আন্তরান্তীয় বিধি-বিধান: এই বিধানগুলো ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের শান্তি ও যুদ্ধ বিষয়ক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করতে কার্যকরী। পাশাপাশি এগুলো ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত অযুসলিমদের সাথে সম্পর্কের বিষয়েও নির্দেশনা প্রদান করে। জিহাদ ও সন্কিঞ্চুক্তি এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

ফিকহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

ফিকহ সম্পর্কে বৃৎপত্তি অর্জন করে তদনুযায়ী আমল করার ফলে বান্দার ইবাদতে শুধি আসে এবং তার চলার পথে স্থিতিশীলতা বিরাজ করে। একজন বান্দা যখন পরিষুচ্ছ হবে তখন পুরো

সমাজে শুন্ধি বিরাজ করবে। ফলস্বরূপ দুনিয়াতে সে সৌভাগ্য ও সচ্ছলতা লাভ করবে এবং আধিরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জালাত লাভে ধন্য হবে।

দ্বীন ইসলামে ফিকহের ফয়েলত এবং ফিকহ শিক্ষাগ্রহণ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান:

সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ ও সর্বোত্তম গুণ হলো দ্বীন সম্পর্কে বৃৎপত্তি অর্জন করা। সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা ফিকহের ফয়েলত ও তা অধ্যায়নের প্রতি উৎসাহের বিষয়টি প্রমাণিত। যেমন আল্লাহ বলেন:

فَوْمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرُّ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَالِبِيْهِ لِيَتَعَفَّفُوْا فِي الدِّيَنِ وَلَيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَخْذَرُونَ^٤

“আর সকল মুমিনের অভিযানে বের হওয়া সংত নয়। সুতরাং, তাদের প্রত্যেক বড়ো দল থেকে ছেটো দল কেন বের হলো না, যাতে দ্বীনের গভীর জ্ঞান লাভ করে এবং যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করে, স্বজাতিকে সংবাদ প্রদান করবে, যেন তারা সাবধান হতে পারে।” [সূরা তাওবাহ : ১২২]

নাবী ﷺ বলেন: আল্লাহ তা‘আলা যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের ফিকহ (বুবা) দান করেন।

দেখা যাচ্ছে যে, নাবী ﷺ যাবতীয় কল্যাণকে দ্বীনের ফিকহ অর্জনের মাঝেই নিবন্ধ করেছেন। এর মাধ্যমে বিষয়টির গুরুত্ব, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুভূত হচ্ছে। নাবী ﷺ বলেন:

النَّاسُ مَعَادُونَ، خَيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، إِذَا فَقُهُوا

“মানুষ খনির মতো; জাহেলী যুগের উক্তম ব্যক্তিগণ ইসলাম গ্রহণের পরও উক্তম; যদি তারা ফিকহ অর্জন করে।”^২

সুতরাং দ্বীন ইসলামে ফিকহের অবস্থান অনেক উঁচু এবং ফিকহ অর্জনের সওয়াব অভাবনীয়। কারণ একজন মুসলিম যখন তার দ্বীনের যাবতীয় বিষয়ের ফিকহ অর্জন করবে এবং তার জন্য কোনটি উপকারী আর কোনটি অপকারী তা জানবে, তখন সে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে আপন রবের ইবাদত করতে পারবে এবং তাকে দুনিয়া ও আধিরাতের যাবতীয় কল্যাণ ও সৌভাগ্য দান করা হবে।

^২ তাফাকুন আলাইহি: সহীল বুখারী, হা. ৩৩৮৩, সহীহ মুসলিম, হা. ৬৬০২, ফুআ. ২৬৩৮।



প্রথম অধ্যায়

পরিত্বতা

أولاً : كتاب الطهارة

————— ♫ এতে ১০টি অনুচ্ছেদ রয়েছে ♫ ———

প্রথম অনুচ্ছেদ : পরিত্বতা এবং পানির বিধান

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : তৈজসপাত্রের বিধান

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : প্রয়োজন পূরণ (মলমুত্ত ত্যাগ) ও তার শিষ্টাচার

চতৃর্থ অনুচ্ছেদ : মিসওয়াক, সৃষ্টিগত স্বভাবসমূহ

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : ওয়ু

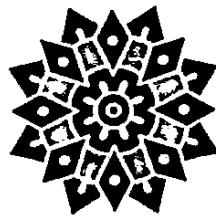
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : মোজা, পাগড়ি এবং ক্ষত স্থানের প্লাস্টারের উপর মাসাহ করা

সপ্তম অনুচ্ছেদ : গোসল

অষ্টম অনুচ্ছেদ : তায়াম্মুম

নবম অনুচ্ছেদ : অপরিত্বতা এবং তার থেকে পরিত্বতা অর্জনের পদ্ধতি

দশম অনুচ্ছেদ : হায়েয (খতুশ্রাব) এবং নিফাস (প্রসূতি অবস্থা)



الباب الأول : في أحكام الطهارة وأمياه প্রথম অনুচ্ছেদ : পবিত্রতা এবং পানির বিধান

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: فِي التَّعْرِيفِ بِالْطَّهَارَةِ، وَبِبَيَانِ أَهْمَيْتِهَا، وَأَفْسَامِهَا
প্রথম মাসআলা: পবিত্রতার পরিচয়, তার গুরুত্ব ও প্রকারসমূহ

১. পবিত্রতার পরিচয় ও তার প্রকারসমূহ:

পবিত্রতা সলাতের চাবি ও গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত। আর শর্ত সর্বদা মাশরুত (শর্তকৃত বিষয়) এর আগে আসে।

পবিত্রতা দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা। তা হলো শিরক, পাপাচার এবং যে সকল জিনিস অন্তরে মরিচা ধরায়, তা থেকে অন্তরকে পবিত্র করা। এটা শরীরের পবিত্রতার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শিরকের অপবিত্রতা শরীরে থাকা অবধি শারীরিক পবিত্রতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। যেমন- আল্লাহ ত'আলা বলেন: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ يَجْزَئُون﴾ “নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র।” [সূরা তাহাবাহ : ২৮]

দ্বিতীয় প্রকার: বাহ্যিক পবিত্রতা। শীত্বাই এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আসবে, ইনশা-আল্লাহ।

২. পবিত্রতার পরিচয়

পবিত্রতার শান্তিক অর্থ: অপরিচ্ছন্নতা, ময়লা থেকে পবিত্রতা অর্জন।

٣. الاصطلاح: رفع الحديث، وزوال الخبث

পারিভৱিক অর্থ: অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা এবং মহলা আবর্জনা দ্বাৰা কৰা।

الخليج: زوال الماء والغيار: شرقي، كابود وستان من حيث ناها في تهذيب الماء.

বাহ্যিক পরিবেশ দুই প্রকার: ১. নাপাকী থেকে পরিবেশ অর্জন; এটা শরীরের সাথে নির্দিষ্ট।
২. ময়লা-আবর্জনা থেকে পরিবেশ অর্জন; এটা শরীর, কাপড় এবং স্থানের সাথে নির্দিষ্ট।

ହୁଏ ବା ଅପବିତ୍ରତା/ନାପକି ଦୁଇ ପ୍ରକାର: ୧. ଛୋଟୋ ଅପବିତ୍ରତା, ଯାର ଜନ୍ୟ ଓୟୁ ଆବଶ୍ୟକ ।
୨. ବଡ଼ୋ ଅପବିତ୍ରତା, ଯାର ଜନ୍ୟ ଗୋସଲ ଆବଶ୍ୟକ ।

খুঁত ময়লা-আবর্জনা তিন প্রকার: ১. এমন আবর্জনা যার জন্য গোসল ওয়াজিব;
২. এমন আবর্জনা যার জন্য পানি ছিটানো আবশ্যিক;
৩. এমন আবর্জনা যার জন্য মাসাহ করা আবশ্যিক।

المسألة الثانية: الماء الذي تحصل به الطهارة
দ্বিতীয় মাশআলা: যেসকল পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন হয়

পবিত্রতা অর্জনের জন্য এমন জিনিস প্রয়োজন যার দ্বারা পবিত্রতা অর্জন, নাপাকি ও অপবিত্রতা অপসারণ করা সম্ভব। আর সেই জিনিস হলো পানি। যে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন হয় সেই

^{১০} : শরীরের সাথে লেগে থাকা কোনো জিনিস যা সলাত বা এই জাতীয় ইবাদত থেকে বাধা প্রদান করে আর এই জন্য পর্যবেক্ষণ অর্জন করা শর্ত করা হয়। বা অপবিত্রতা দুই প্রকারঃ চাঁচুর হৃদয়ে থাওয়া হলো অপবিত্রতা। আর সেটা হলো ওয়ুর অঙ্গ-প্রস্তুতির সাথে সম্পূর্ণ। যেমন- পায়খানা প্রস্তাবের রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু নির্গত হওয়া। এই প্রকার অপবিত্রতা ওয়ুর দ্বারা দূর হয়ে যে ক্রমে বাড়ো অপবিত্রতা: সেটা পুরো শরীরের সাথে সম্পূর্ণ। যেমন-শারীরিকি অপবিত্রতা, এই প্রকার অপবিত্রতা স্মেরণের দ্বারা দূর হয়। এর উপর ভিত্তি করে বলা যায় হৃদয়ে অপবিত্রতার প্রতিতা দুই প্রকারঃ বড়ো অপবিত্রতা; তাতে প্রেরণ করতে হবে। এবং ছেটো অপবিত্রতা; তাতে ওয়ু করতে হবে। আর ওয়ু গোসলে অপারগ ব্যক্তির জন্য সমাধান হলো তম বৃক্ষ-
(বেগুন পাতা পাতার পাতারি)। (১১) যেমন চিনিটা ইঁকালী যেমন পাতিলুক। (১২)।

১০৫॥ অর্থ নাথাক্তি: শীঘষ্ট তাৰ আলোচনা আসুৱে।

হলো, ماء الطهور । أماء الطهور । বা এমন পানি যা নিজে পবিত্র এবং অন্যকে পবিত্রকারী । সেই পানিতে তার সৃষ্টির মৌলিকত্ব অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ যে গুণাবলী দিয়ে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই গুণাবলী তার মাঝে বিদ্যমান থাকে । চাই সেটা আকাশ থেকে বর্ষিত পানি হোক; যেমন-বৃষ্টির পানি, বরফ গলা পানি, শিশিরের পানি । অথবা জমিনে প্রবাহিত পানি হোক; যেমন-নদীর পানি, ঝর্ণার পানি, পুরুরের পানি এবং সমুদ্রের পানি । মহামহিয়ান আল্লাহর বাণী:

﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا يُطَهِّرُ كُمْ بِهِ﴾

“তিনি তোমাদের উপর আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষন করেন তা দ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য ।”

[সূরা আনফাল : ১১]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً﴾

“আমি আকাশ হতে পবিত্র পানি বর্ষন করেছি ।” [সূরা ফুরক্কান : ৪৮]

আল্লাহর রসূল ﷺ এর বাণী :

اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايِ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ

“হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহগুলো পানি, বরফ এবং শিশির দ্বারা ধূয়ে দাও ।”^৪

অন্যত্র আল্লাহর রসূল ﷺ সমুদ্রের পানি সম্পর্কে বলেন: هُوَ الطَّهُورُ مَاءُ الْخَلُّ مَيْتَةٌ

“সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণী হালাল ।”^৫

উপরিউক্ত গুণসম্পন্ন পানি ছাড়া অন্য তরল পদার্থ দ্বারা পবিত্রতা অর্জন হবে না । যেমন-সিরকা, পেট্রোল, জুস, লেবু পানি এবং এগুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পানি । এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طِيبًا﴾

“যদি তোমরা পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াস্তুর করো ।” [সূরা মায়দাহ : ৬]

যদি প্রকৃত পানি ছাড়া অন্য কোনো তরল পদার্থ দ্বারা পবিত্রতা অর্জন হতো, তাহলে আয়াতটিতে সেটার প্রতি ইঙ্গিত করা হতো । (উপরিউক্ত আয়াতে) অন্য পানির দিকে ইঙ্গিত না করে মাটির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে ।

^৪ মুঢ়াফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৭৪৪; সহীহ মুসলিম, হা. ১২৪১, ফুআ. ৫৯৮ ।

^৫ সুনান আবু দাউদ, হা. ৮৩, তিরমিয়ী, হা. ৬৯, নাসাই, হা. ৫৯, ইবনু মাজাহ, হা. ৩২৪৬ । ইমাম তিরমিয়ী বলেন: হসান সহীহ । আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন: সহীহ সুনান নাসাই ৫৮ ।

الْمَسْأَلَةُ الْثَالِثَةُ: أَمَاءٌ إِذَا خَالَطَهُ نِجَاسَةٌ

চৃতীয় মাসআলা: পানির সাথে নাপাকি মিশ্রিত হওয়া

পানির সাথে যদি নাপাকি মিশ্রিত হয়ে তার তিনটি গুণের মে কোনো একটি (গন্ধ, স্বাদ এবং রং) পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে সে পানি সকলের ঐকমত্যে নাপাক, তা ব্যবহার করা বৈধ নয়। চাই সে পানি কম বা বেশি হোক। তা অপবিত্রতা দূরীভূত করতে পারবে না।

অপরদিকে যদি পানিতে নাপাকি মিশ্রিত হয় আর পানির তিনটি গুণের কোনো একটি পরিবর্তন না হয় (তাহলে দুই অবস্থা); যদি পানি বেশি হয় তাহলে তা অপবিত্র হবে না। সে পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা যাবে। আর যদি পানি কম হয় তাহলে তা অপবিত্র হয়ে যাবে, তার দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যাবে না। বেশি পানির পরিমাণ হলো দুই কুল্লাহ বা তার চেয়ে বেশি। আর কম এর পরিমাণ হলো দুই কুল্লাহ এর চেয়ে কম পানি।^৫

এর দলীল আবু সাঈদ খুদরী رض এর হাদীস। তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন:

إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنْجِسُ شَيْءً

“নিশ্চয়ই পানি পবিত্র। তাকে কোনো জিনিস অপবিত্র করতে পারে না।”^৬

ইবনু উমার رض এর হাদীস; নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন: **إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلْتَنِ لَمْ يُنْجِسْهُ شَيْءٌ**

“পানির পরিমাণ দুই মটকা হলে তাকে কোনো কিছুতে অপবিত্র করে না।”^৭

الْمَسْأَلَةُ الْرَابِعَةُ: أَمَاءٌ إِذَا خَالَطَهُ طَاهِرٌ

চতুর্থ মাসআলা: পানিতে যদি কোনো পবিত্র জিনিস মিশ্রিত হয়

পানিতে যদি কোনো পবিত্র জিনিস মিশ্রিত হয়, যেমন গাছের পাতা, সাবান, ক্ষার^৮, বরই পাতা; এছাড়া অন্য কোনো পবিত্র জিনিস, আর মিশ্রিত পবিত্র জিনিসটা যদি পানিতে প্রভাব বিস্তার না

^৫ ধ্যাঃ কুল্লাহ হলো- কলসী, মটকা। এর বহু বচন হলো قَال - عَلِيٌّ فِي دুই কুল্লাহ এর পরিমাণ প্রায় ৯৩.০৭৫ সা = ১৬০.৫ লিটার পানি। দুই কুল্লাহ প্রায় ৫ মশক পানি।

^৬ আহমাদ: ৩/১৫, সুনান আবু দাউদ, হা. ৬১, সুনান নাসাই, হা. ২৭৭, তিরমিয়ী, হা. ৬৬, ইমাম তিরমিয়ী হাদীসটিকে হসান বলেছেন। আলবানী ইরওয়াউল গালীলে সহীহ বলেছেন: ১/৪৫।

^৭ আহমাদ: ২/২৭, সুনান আবু দাউদ, হা. ৬৩, তিরমিয়ী, হা. ৬৭; সুনানুন নাসাই, হা. ৫২; ইবনু মাজাহ, হা. ৫১৭, ইবনু মাজাহর শব্দ: তেরাই আ। ইরওয়াউল গালীলে আলবানী এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন ১/৪৫।

କରେ ତାହଲେ ସଠିକ କଥା ହଲୋ ସେ ପାନି ପବିତ୍ର । ତାର ଦ୍ୱାରା ନାପାକି, ଅପବିତ୍ରତା, ଆବର୍ଜନା ଥେକେ ପବିତ୍ରତା ଅର୍ଜନ କରା ବୈଧ । ଆଜ୍ଞାହ ସୁବହନାହ୍ ଓୟା ତା'ଆଳା ବଲେନ :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَخْدُ مِنْكُمْ مِنَ الْغَابِطِ أَوْ لَا مَسْتِمُّ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجْدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَامْسَحُوا بِرُوجُورِهِمْ وَأَيْدِيهِمْ﴾

“ଯଦି ତୋମରା ଅସୁହ ହେଉ ଅଥବା ସଫରେ ଥାକେ ଅଥବା ତୋମାଦେର କେଉଁ ଶୌଚାଗାର ଥେକେ ଆସେ ଅଥବା ତୋମରା ନାରୀ ସଂଭୋଗ କରୋ ଏବଂ ପାନି ନା ପାଓ, ତାହଲେ ତୋମରା ପବିତ୍ର ମାଟି ଦ୍ୱାରା ତାଯାମ୍ବୁମ କରୋ । ସୁତରାଂ ତୋମରା ତୋମାଦେର ଚେହରା ଓ ହାତ ମାସାହ କରୋ ।” [ସ୍ରା ନିସା : ୪୩]

ଆଯାତଟିତେ ୧୯ ଶବ୍ଦଟି (ଅନିଦିଷ୍ଟ), ଫଳେ ସକଳ ପ୍ରକାର ପାନି ଏର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନି ଆର ମିଶ୍ରିତ ପାନିର ମାଝେ କୋନୋ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନେଇ । ଏର ପ୍ରମାଣ ହଲୋ, ଆଜ୍ଞାହର ରମ୍ଜଲ ତାର କନ୍ୟାକେ ଗୋସଲ ଦାନକାରିଣୀ ମହିଳାଦେରକେ ବଲେନ :

اَغْسِلْنَاهَا ثَلَاثَةً، اَوْ خَمْسَةً اَوْ كَثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُمْ بَيْءَاءً وَسِدْرً، وَاجْعَلُنَّ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا اَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ

“ତୋମରା ତାକେ ତିନବାର ବା ପାଁଚବାର ବା ପ୍ରୟୋଜନ ମନେ କରଲେ ତାର ଚେଯେ ଅଧିକବାର ବରଇ ପାତାସହ ପାନି ଦିଯେ ଗୋସଲ ଦାଓ । ଶେଷ ବାରେ କର୍ପୁର ବା (ତିନି ବଲେଛେ) କିଛୁ କର୍ପୁର ବ୍ୟବହାର କରୋ ।”¹⁰

المسألة الخامسة: حكم الماء المستعمل في الطهارة

ال第五 معاشرة: پବିତ୍ରତା ଅର୍ଜନେର କ୍ଷେତ୍ରେ ବ୍ୟବହତ ପାନିର ବିଧାନ

ଓୟ ଏବଂ ଗୋସଲେର ଅଙ୍ଗ-ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥେକେ ବାରେ ପଡ଼ା ପାନିକେ ବ୍ୟବହତ ପାନି ବଲା ହ୍ୟ । ସଠିକ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ପବିତ୍ରତା ଅର୍ଜନେର କ୍ଷେତ୍ରେ ବ୍ୟବହତ ପାନି ନିଜେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟକେ ପବିତ୍ରକାରୀ । ସେ ପାନି ଅପବିତ୍ରତାକେ ଅପସାରଣ କରେ ଏବଂ ନାପାକି ଦୂର କରେ ଯତକ୍ଷଣ ନା ତାର ତିନଟି ଗୁଣାବଲିର ଏକଟି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହ୍ୟ: ଗନ୍ଧ, ସ୍ଵାଦ, ରଙ୍ଗ । ବ୍ୟବହତ ପାନି ପବିତ୍ର ହେୟାର ଦଲିଲ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَلُونَ عَلَى وَصُورَهِ

“ନାରୀ ଯଥନ ଓୟ କରତେନ ତଥନ ତାର ବ୍ୟବହତ ପାନିର ଉପର ସାହାବୀଗଣ ଯେନ ହମଢି ଥେଯେ ପଡ଼ତେନ ।”¹¹

* ଏଟା ହଲୋ ଏକ ପ୍ରକାର ଏସିଦ, ଯାର ଦ୍ୱାରା ହାତ ଧୋଯା ହ୍ୟ, ଏଟା ଆରବୀତେ العرض ବଲା ହ୍ୟ । ଏଟା ଶବ୍ଦଟିତେ ଆଲିଫେର ନିଚେ ଯେବେ ଦିଯେବେ ପଡ଼ା ହ୍ୟ ।

¹⁰ ମୃଦ୍ଗାନ୍ମ ଆଜ୍ଞାଇଟି: ସହିତ୍ତ ବୁଖାରୀ, ହ. ୧୨୫୩, ୧୨୫୮, ୧୨୫୭; ସହିହ ମୁସଲିମ, ହ. ୨୦୫୭, ଫୁଆ. ୯୩୯ ।

¹¹ ସହିତ୍ତ ବୁଖାରୀ, ହ. ୧୮୯ ।

এ ছাড়াও জাবির **কে** যখন অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন তখন তিনি **কে** তাঁর ওয়ুর পানি তাঁর শরীরে ঢেলে দিয়েছিলেন।^{১২}

যদি ব্যবহৃত পানি নাপাক হতো তাহলে সাহাবীদের ওয়ুর পানি নিয়ে কাড়াকাড়ি করা, জাবির **কে** এর শরীরে ওয়ুর পানি ঢেলে দেওয়া বৈধ হতো না।

এছাড়াও নাবী **কে**; তাঁর সাহাবীগণ এবং তাঁর স্ত্রীগণ পেয়ালা ও পানি পান করার পাত্রে^{১৩} ঘৃত করতেন এবং গামলায়^{১৪} গোসল করতেন। যে পাত্রগুলোতে তারা ওয়ু গোসল করতেন সে পাত্রগুলো ব্যবহৃত পানির ছিটা-ফেটা পড়া থেকে মুক্ত নয়।

এ ছাড়া নাবী **কে** আবু হুরায়রা **কে** কে একদিন বলেছিলেন (আবু হুরায়রা **কে** তখন অপবিত্র ছিলেন):

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ

“মুমিন আপবিত্র হয় না।”^{১৫}

যেহেতু মুমিন নাপাকই হয় না, সেহেতু মানুষ শুধুমাত্র পানি স্পর্শ করার কারণেই পানি তাঁর পবিত্রতা হারাবে না।

المسألة السادسة: أنساراً لأدميين وهم ملائكة الأنعمان ষষ্ঠى ماساتيالا: مانعو এবং চতুর্পদ জন্মের উচ্ছিষ্ট

পানকারীর পান করার পর যা পাত্রে অবিশিষ্ট থাকে তাকে উচ্ছিষ্ট বলে। মানুষ পবিত্র, তাঁর উচ্ছিষ্টও পবিত্র চাই সে মুসলিম হোক বা কাফের হোক, অনুজ্ঞাপ সে অপবিত্র হোক বা হায়েয়া হোক। সহীহ সূত্রে একথা সাব্যস্ত হয়েছে যে, আল্লাহর রসূল **কে** বলেছেন:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ

“মুমিন অপবিত্র হয় না।”^{১৬}

আয়িশাহ **কে** থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হায়েয়া অবস্থায় তিনি পাত্র থেকে পান করতেন অতঃপর আল্লাহর রসূল **কে** পাত্রটি নিতেন এবং যে স্থানে আয়িশাহ **কে** মুখ রেখে পান করেছেন সেখানে মুখ রেখে তিনিও পান করতেন।^{১৭}

^{১২} মুণ্ডাফাকুন আলাইহি: সহীল বুখারী, হ্য. ৫৬৫১, সহীহ মুসলিম, হ্য. ৪০৩৭, ফুআ. ১৬১৬।

^{১৩} এটা **বুরু** এর বহু বচন, অর্থ: পানি পান করার পাত্র।

^{১৪} এর এক বচন হলো **গামলা**। অর্থ: গামলা।

^{১৫} সহীহ মুসলিম, হ্য. ৭১০, ফুআ. ৩৭১।

^{১৬} সহীহ মুসলিম, হ্য. ৭১০, ফুআ. ৩৭১।

^{১৭} সহীহ মুসলিম, হ্য. ৫৭৯, ফুআ. ৩০০।

ଚତୁର୍ବୀନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଦେର ମାଝେ ଯେଉଁଲୋର ଗୋଶତ ଖାଓୟା ହୟ, ତାଦେର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ପବିତ୍ର; ଏହି ବିଷଯେ ଆଲେମଗନ ଐକମତ୍ୟ ପୋଷଣ କରେଛେ । ଆର ଯାଦେର ଗୋଶତ ଖାଓୟା ହୟ ନା ଯେମନ-ହିଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ, ଗାଢା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ; ସେଉଁଲୋର ସ୍ଵପାରେ ସଠିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହଲୋ: ତାଦେର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟଓ ପବିତ୍ର । ତାଦେର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ପାନିତେ କୋନୋ ପ୍ରଭାବ ଫେଲେ ନା । ବିଶେଷ କରେ ଯଥନ ପାନି ବେଶ ଥାକେ । ତବେ ପାନି କମ ଥାକେ ଏବଂ ସେବ ପ୍ରାଣୀ ପାନ କରାର କାରଣେ ପାନିର ଗୁଣବଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତି ହୟେ ଯାଇ, ତାହଲେ ପାନି ଅପବିତ୍ର ।

ଏର ପ୍ରମାଣ ହଲୋ ପୂର୍ବେର ହାଦୀସ । ତାତେ ବଲା ହେଁଲେ: ନାବୀ ﴿କେ ଏ ପାନି ସମ୍ପର୍କେ ଜିଜ୍ଞେସ କରା ହେଁଲି, ଯେଥାନେ ପାନି ପାନ କରାର ଜନ୍ୟ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ହିଞ୍ଚ ଜନ୍ମ ଆସା ଯାଓୟା କରେ । ତିନି ଏର ଜବାବେ ବଲେଛିଲେନ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَنِ لَمْ يَجْعَلِ الْجَبَّ

“ପାନିର ପରିମାଣ ଦୁଇ ମଟକା ହଲେ ତା ଅପବିତ୍ରତା ବହନ କରେ ନା ।”

ଏହାଡାଓ ବିଡାଲ ସମ୍ପର୍କେ ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲ ﴿ଏର ବାଣୀ , ଯେ ବିଡାଲ ପାତ୍ର ଥେକେ ପାନ କରେ ଫେଲେ ।

إِنَّمَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَافَاتِ

“ବିଡାଲ ଅପବିତ୍ର ନନ୍ଦ । ଏଟା ତୋ ତୋମାଦେର ଆଶେପାଶେ ବିଚରଣକାରୀ ବା ବିଚରଣକାରିଣୀ ପ୍ରାଣୀ ।”¹⁸

ଏର କାରଣ ହଲୋ, ସାଧାରଣତ ବିଡାଲ ଥେକେ ସତର୍କ ଥାକା କଟ୍ଟକର । ଯଦି ଆମରା ବଲି ଯେ ବିଡାଲେର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଅପବିତ୍ର ତାହଲେ ପାତ୍ରଙ୍ଗଲୋ ଧୋୟା ଆବଶ୍ୟକ ହୟେ ଯାବେ । ଆର ଏଟା ଅବଶ୍ୟଇ କଟ୍ଟକର । ଆର ଏହି କଟ୍ଟକେ ଏହି ଉତ୍ସାତେର ଉପର ଥେକେ ତୁଲେ ନେଓୟା ହେଁଲେ ।

କୁକୁରେର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଅପବିତ୍ର । ଅନୁରପ ଶୁକୁରେର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟଓ ଅପବିତ୍ର । କୁକୁରେର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଅପବିତ୍ର ହେୟା ପ୍ରସ୍ତେ ଆବୁ ହରାୟରା ﴿ହେଲେନ୍ହି ହତେ ହାଦୀସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଁଲେ । ତିନି ବଲେନ, ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲ ﴿ବଲେଛେ:

طَهُورٌ إِنَّمَا أَحَدُكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَا هُنَّ بِالرَّابِ

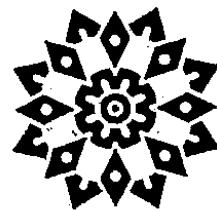
“ତୋମାଦେର କାରୋ ପାତ୍ରେ ଯଥନ କୁକୁର ମୁଖ ଲାଗିଯେ ପାନ କରବେ ତଥନ (ସେ ପାତ୍ର ପବିତ୍ର କରାର ପଦ୍ଧତି ହଲୋ) ସାତ ବାର ତା ଧୂମେ ଫେଲେ । ତବେ ପ୍ରଥମ ବାର ମାଟି ଦିଯେ ଘଷେ ପରିଷକାର କରତେ ହବେ ।”¹⁹

ଶୁକରେର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ: ଶୁକର ନାପାକ, ନୋଂରା ଓ ଅପରିଷକାର ହେୟାର କାରଣେ ତାର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଅପବିତ୍ର । ଆଲ୍ଲାହ ତା‘ଆଲା ବଲେନ: “ନିଶ୍ଚଯାଇ ତା ଅପବିତ୍ର ।” ସୂରା ଆନାମ : ୧୫

¹⁸ ଆହମାଦ: ୫/୨୯୬, ସୁନାନ ଆବୁ ଦ୍ୱାରା, ହ. ୭୫, ତିରମିଥୀ, ହ. ୯୨ ତିନି ବଲେନ: ହ୍ସା ସହିହ, ଇରଓଡାଉଲ ଗାଲିଲେ ଆଲବନ୍ଦି (ବର୍ଷ:) ଏଟା ସହିହ ବଲେଛେ: ୨୩ ।

¹⁹ ପାତ୍ର ଥେକେ ମୁଖ ଦିଯେ ପାନ କରା ।

²⁰ ମୁତ୍ତାଫାକୁନ ଆଲାଇହି: ସହିହଲ ବୁଖାରୀ, ହ. ୧୭୨, ସହିହ ମୁସଲିମ, ହ. ୫୩୫, ଫୁଆ. ୨୭୯, ଶବ୍ଦ ମୁସକିମ୍ବେର ।



الباب الثاني: في الأذنـية দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: তৈজসপাত্রের বিধান

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

মুঠো : যে সমস্ত পাত্রে পানি বা অন্য কিছু সংরক্ষন করা হয় তাকে মুঠো বলা হয়। হতে পারে পাত্রটি লোহার বা অন্য কিছুর। এ সকল পাত্র ব্যবহার করা মباح বা বৈধ। এই মর্মে আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা বলেন:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً

“তিনি (আল্লাহ) পৃথিবীর সকল কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।” [সূরা বাকুরাহ : ২৯]

المـسـأـلةـ الأولى: استـعـمالـ آـنـيـةـ الـذـهـبـ وـالـفـضـةـ وـغـيرـهـماـ فـيـ الطـهـارـةـ প্রথম মাসআলা: পরিভ্রান্ত অর্জনের ক্ষেত্রে স্বর্ণ-রৌপ্য এবং অন্যান্য জিনিস দ্বারা তৈরী পাত্রের ব্যবহার

খাবার পানাহার এবং অন্যান্য কাজে সকল প্রকার পাত্র ব্যবহার করা বৈধ, যদি সে পাত্র পবিত্র এবং অনুমোদিত হয়। যদি সেটা অনেক দামী হয় তাতেও কোনো সমস্যা নেই। তার মৌলিকত্ব অবশিষ্ট থাকার কারণে সেটা ব্যবহার করা বৈধ হবে; তবে স্বর্ণের এবং রৌপ্যের পাত্র ব্যতীত। বিশেষত স্বর্ণ এবং রৌপ্যের পাত্রে খাওয়া এবং পান করা হারাম তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহার করা বৈধ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

لَا تَشْرُبُوا فِي آنِيَةِ الْذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكِلُوا فِي صَحَافِهَا، فَإِنَّهَا كُنْمٌ فِي الدُّنْيَا وَلَكُنْمٌ فِي الْآخِرَةِ

“তোমরা স্বর্ণ এবং রৌপ্যের পাত্রে পান করো না এবং এগুলোর পাত্রে তোমরা আহার করো না। নিশ্চয়ই এগুলো পৃথিবীতে কাফেরদের জন্য আর পরকালে তোমাদের জন্য।”^{১১}

অপর হাদীসে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

الَّذِي يَشْرُبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجْزَى فِي بَطْنِهِ نَارَ حَمَّنَمَ

“যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে সে যেন তার পেটের মধ্যে জাহানামের আগুন প্রবেশ করায়।”^{১২}

এটি স্বর্ণ এবং রৌপ্যের পাত্রে খাওয়া, পান করা হারামের দলীল। তবে অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হারামের দলীল নয়। সুতরাং এটা প্রমাণিত হয় যে, পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার করা বৈধ।

হাদীসে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞাটি (تشربوا) ৪) সার্বজনীন। সেটা স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্র, স্বর্ণ-রৌপ্যের প্রলেপ দেওয়া পাত্র^{১৩} এবং যে পাত্রে সামান্য স্বর্ণ-রৌপ্য রয়েছে সে পাত্রকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

المَسَالَةُ الثَّانِيَةُ: حُكْمُ اسْتِعْمَالِ الْإِنَاءِ الْمُضَبَّبِ بِالْذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

দ্বিতীয় মাসআলা: স্বর্ণ-রৌপ্য দিয়ে জোড়া^{১৪} দেওয়া পাত্র ব্যবহারের বিধান

যদি স্বর্ণ দিয়ে কোনো ভাঙ্গা পাত্রকে জোড়া লাগানো হয় তাহলে (নিষেধাজ্ঞা সূচক দলীলের মধ্যে প্রবেশ করার কারণে) সে পাত্র ব্যবহার করা হারাম। তবে যদি কোনো পাত্রকে রৌপ্য দিয়ে জোড়া দেওয়া হয় আর রৌপ্যের পরিমাণ যদি সামান্য হয় তাহলে সে পাত্র ব্যবহার করা জায়েয়।

এই মর্মে আনাস رض হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন:

إِنْكَسَرَ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْجَدَ مَكَانَ الشَّغْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ

“নাবী رض এর পেয়ালা ভেঙ্গে গেল। অতঃপর তিনি ভাঙ্গা জায়গায় রূপার পাত দিয়ে জোড়া লাগিয়ে দিলেন।”^{১৫}

^{১১} মুস্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৫৪২৬, সহীহ মুসলিম, হা. ৫২৮৭, ফুআ. ২০৬৭।

^{১২} মুস্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৫৬০, সহীহ মুসলিম, হা. ৫২৭৯, ফুআ. ২০৬৫।

^{১৩} المسوأ: প্রলেপ যুক্ত পাত্র।

^{১৪} التضليل: ভাঙ্গা পাত্রকে লোহা বা অন্য কিছু দিয়ে জোড়া দেয়া।

^{১৫} সহীহল বুখারী, হা. ৩১০৯।

المسألة الثالثة: آنية الكفار চৃতীয় মাসআলা: কাফেরদের পাত্র

কাফেরদের পাত্রের ক্ষেত্রে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, তা হালাল যতক্ষণ না তার নাপাকী সম্পর্কে জানা যায়। যদি নাপাকি জানা যায় তাহলে খোয়া ছাড়া তাদের পাত্র ব্যবহার করা বৈধ নয়। এই প্রসঙ্গে আবু ছালাবা আল খুশানী ^{১৪} হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

فَلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَفَنَأْكُلُ فِي أَرْبَتِهِمْ؟ قَالَ: لَا تَأْكِلُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ تَجْدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا

“আমি বললাম, হে আল্লাহর নাবী! আমরা আহলে কিতাব অধ্যয়িত এলাকায় বসবাস করি। আমরা কি তাদের পাত্রে আহার করতে পারবো? তিনি বলেন: তোমরা সেগুলোতে খাবে না। তবে তোমরা যদি অন্য পাত্র না পাও তাহলে খেতে পারো, তা ধূয়ে নিয়ে খাবে।”^{২৬}

যদি তাদের পাত্রের নাপাকি সম্পর্কে জানা না যায়, অর্থাৎ তারা এমন শ্রেণির হয় যারা সরাসরি নাপাকির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার দিক থেকে প্রসিদ্ধ নয়, তাদের পাত্র ব্যবহার করা বৈধ। কারণ একথা প্রমাণিত যে, আল্লাহর রসূল ﷺ এবং তার সাহাবীগণ একজন মুশরিক মহিলার মশক থেকে ওয়ু করার জন্য পানি নিয়েছিলেন।^{২৭} এছাড়াও আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য আহলে কিতাবদের খাবার হালাল করে দিয়েছেন। কখনো কখনো তারা আমাদেরকে তাদের পাত্রে খাবার পরিবেশন করে। যেমন: একজন ইহুদি দাস আল্লাহর রসূল ﷺ কে যবের রুটি এবং গন্ধযুক্ত চর্বি খাবার খাওয়ার দাওয়াত দিলেন। অতঃপর আল্লাহর রসূল ﷺ তা খেলেন।^{২৮}

المسألة الرابعة: الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة চতুর্থ মাসআলা: মৃত প্রাণির চামড়া থেকে তৈরী পাত্রে পরিত্রতা অর্জন

মৃত প্রাণির চামড়া যখন পক্রিয়াজাত করা হয় তখন সেটা পরিত্র হয়ে যায় এবং তা ব্যবহার করা বৈধ। আল্লাহর রসূল ﷺ এর হাদীস: أَتَيْتَ إِهَابَ دُبِغَ فَقَذَ طَهْرٌ

^{২৬} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহ বুখারী, হ্য. ৫৪৭৮, সহীহ মুসলিম, হ্য. ৪৮৭৭, ফুআ. ১৯৩০।

^{২৭} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহ বুখারী, হ্য. ৩৪৪, সহীহ মুসলিম, হ্য. ১৪৪৯, ফুআ. ৬৮২। وَادْعُوا: বড়ো মশক।

^{২৮} আহমাদ ৩/২১০, ২১১, ইরওয়াউল গালীলে আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন: ১/৭১। وَاهْمَّا: চর্বি, তেল, وَخَلْصَّا: গন্ধ, বাসীগন্ধ।

“କାଁଚା ଚାମଡ଼ା”^{୨୯} ଯଥନ ଦାବାଗତ ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଜାତ କରା ହୁଏ ତଥନ ସେଟା ପବିତ୍ର ହେଁ ଯାଏ ।”^{୩୦}

ନାବୀ  ଏକଦିନ ଏକଟି ମୃତ ଛାଗଲେର ପାଶ ଦିଯେ ଅତିକ୍ରମ କରିଛିଲେନ । ଅତଃପର ବଲଲେନ:

هَلَا أَخْدُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ، فَانْتَفَعُوا بِهِ؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ: إِنَّمَا حَرُومَ أَكْلُهَا

“কেন তারা এর (ছাগলের) চামড়া খুলে নিয়ে প্রক্রিয়াজাত করে তা দ্বারা উপকার গ্রহণ করল না! তারা ~~অসম্ভব~~ বললেন, এটা তো মৃত ! তিনি ~~অসম্ভব~~ বললেন: মৃত জীব খাওয়া হারাম ।”^১

এই বিধান এই মৃত প্রাণির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেটা জবাই করা জায়েয়। আর যে প্রাণী জবাই করা জায়েয় না তার চামড়াও নাপাক।

মৃত প্রাণির চুল ও পশম পবিত্র অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় যে প্রাণির গোশত খাওয়া বৈধ মৃত অবস্থায় সেই প্রাণির চুল ও পশম পবিত্র। তবে জবাই ছাড়া মারা গেলে তার গোশত নাপাক, খাওয়া হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَثَمَ خِزْرِيرَ فَإِنَّهُ رَجْسٌ﴾

“ମୃତ ପ୍ରାଣୀ, ପ୍ରବାହିତ ରଙ୍ଗ ଓ ଶୁକରେର ଗୋଶତ ବ୍ୟାତୀତ । ନିଶ୍ଚଯାଇ ଏଗ୍ରଲୋ ଅପବିତ୍ର ।” [ସୁରା ଆନାମ : ୧୫]

পানির সাথে মিশ্রিত দ্রব্যের মাধ্যমে চামড়ায় থাকা ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কারের মাধ্যমে চামড়া শোধন করা হয়। যেমন- লবন এবং এ জাতীয় পদার্থ অথবা পরিচিত উভিদ। যেমন: বাবলা গাছ, জুনিপার গাছ এবং অন্যান্য গাছ। তবে যে প্রাণী জবাই করা বৈধ নয় সে প্রাণির চামড়াও পরিত্র নয়। এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, বিড়ালের চামড়া এবং এ জাতীয় পশুর চামড়া শোধন করলে পরিত্র হবে না। যদি সে প্রাণী জীবিত অবস্থায় পরিত্র ছিল। জীবিত অবস্থায় পরিত্র অর্থচ তার গোশত খাওয়া হয় না এমন প্রাণির চামড়া পাকা করণের দ্বারা পরিত্র হবে না।

সারকথা: গোশত খাওয়া হয় এমন প্রত্যেক মৃত প্রাণির চামড়া পাকা করণের দ্বারা চামড়া পবিত্র হবে আর গোশত খাওয়া হয় না এমন প্রত্যেক মৃত প্রাণির চামড়া পাকা করলেও পবিত্র হবে না।

۲۰ بھاگ: کُنچا ٹامڈا ।

۱۰۰ ادا دین الامات فقد طبری شد: آر. ۳۶۶، کوچا. ۶۹۸، ساریه مسولیم، هج. ۱۶۵۰، شیخیه.

^{১০} সংগীত মুসলিম, হা. ৬৯৩, ফুআ. ৩৬৩, ইবনু মাজাহ, হা. ৩৬১০।



الباب الثالث: في قضاء الحاجة وأدابها

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : প্রয়োজন পূরণ (মেলমুত্তি ত্যাগ) ও তার শিষ্টাচার

এ অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المسألة الأولى: الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر

প্রথম মাসআলা: পায়খানা প্রস্তাবের পর পানি ও চিলা কুলুখ ব্যবহার করা
এবং পানি ও চিলা-কুলুখ একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হওয়া

استنجاء: প্রস্তাব-পায়খানার পথ দিয়ে যা কিছু নির্গত হয় তাকে পানি দ্বারা দূর করাকে
বলা হয়।

استجمار: প্রস্তাব-পায়খানার পথ দিয়ে যা কিছু নির্গত হয় তাকে পরিষ্কারকারী
বস্তু দ্বারা পরিষ্কার করাকে বলা হয়। যেমন: পাথর বা এ জাতীয় জিনিস। ইত্তিনজা
এবং ইত্তিজমার একটিকে অপরটির জায়গায় ব্যবহার করা জায়েয়। এই প্রসঙ্গে রসূল ﷺ থেকে
হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আনাস رضي الله عنه বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَخْمُلُ أَنَا، وَغُلَامٌ تَخْرُوِي، إِذَا وَقَدْ مِنْ مَاءٍ، وَعَنْتَرَةً فَيَسْتَشِّجِي بِالْمَاءِ
“আল্লাহর রসূল ﷺ যখন শৌচাগারে যেতেন তখন আমি ও আমার মতো একটি ছেলে পানি এবং
বর্ণ নিয়ে যেতাম। অতঃপর তিনি পানি দিয়ে শৌচকার্য করতেন।”^{৩২}

^{৩২} সহীহ মুসলিম, খ. ৫০৮, ফুআ. ২৭১। রাবী চামড়ার ছেটো পাত্র।

আয়িশাহ رض হতে বর্ণিত। নাবী رض বলেছেন:

إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَ�يِطِ فَلْيَسْتَطِعْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فِي أَنْهَا تَجْزِي عَنْهُ

“যখন তোমাদের কেউ টয়লেটে যাবে সে যেন তিনটি পাথর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করে। সেটা তার জন্য যথেষ্ট হবে।”^{৩৩}

ইস্তিনজা এবং ইস্তিজমার দুটোর মাঝে সমন্বয় করা সর্বোত্তম।

পাথর বা তার স্থলাভিষিক্ত প্রত্যেক পবিত্র, পরিষ্কারকারী, বৈধ জিনিসের দ্বারা ইস্তিজমার সম্পূর্ণ হবে। যেমন- টিসু, কাঠ ইত্যাদি। নাবী رض পাথর দিয়ে ইস্তিনজা করতেন। সুতরাং পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে যে জিনিসটা ইস্তিজমারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে সেটাই ইস্তিজমারের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে ইস্তিজমারের ক্ষেত্রে অবশ্যই তিনবার করতে হবে। এই প্রসঙ্গে সালমান ফারসী رض হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন:

نهانا - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَسْتَشْجِي بِالْيَمِينِ، أَنْ يَسْتَشْجِي بِأَقْلَ منْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَانْسْتَشْجِي بِرَجِيعٍ أَوْ عَظِيمٍ

“নাবী رض আমাদেরকে ডান হাতে ইস্তিনজা করতে, তিন পাথরের কমে ইস্তিজমার করতে এবং গোবর বা হাড় দ্বারা ইস্তিজমার করতে নিষেধ করেছেন।”^{৩৪}

المَسَأَةُ الثَّانِيَةُ: اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

দ্বিতীয় মাসআলা: প্রয়োজন পূরণের সময় (প্রস্তাৱ পায়খানা কৱা অবস্থায়)

কিবলামুখী হওয়া এবং কিবলাকে পিছনে রাখা

জনমানবহীন স্থানে যেখানে কোনো বেড়া বা প্রতিবন্ধকতা নেই সেখানে প্রয়োজন পূরণ করার সময় কিবলামুখী হওয়া বা কিবলাকে পিছনে রাখা কোনোটাই জায়েয় নেই। আবু আইয়ুব আনসারী رض থেকে বর্ণিত। রসূল صلی اللہ علیہ و سلّم বলেছেন:

إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَ�يِطَ فَلَا تَسْتَقِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدِيرُوهَا بِيَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ، وَلَكِنْ شَرُّقُوا أَوْ عَرِبُوا، قَالَ أَبُو أَيْوبَ:

فَقَدِدْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاجِيَصَ قَدْ بَيَّنَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَتَتَحَرَّفُ عَنْهَا وَتَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

^{৩৩} আহমাদ: ৬/১০৮, দারাকুতনী: ১৪৪, ইমাম দারাকুতনী এর সনদকে সহীহ বলেছেন।

^{৩৪} বাহু মুসলিম, হা. ৪৯৪, ফুআ. ২৬২: মল, বিষ্টা, গোবর। الرجيع ।

“যখন তোমরা পায়খানা করতে যাও তখন তোমরা কিবলার দিকে মুখ করবে না এবং পিঠও দিবে না, বরং তোমরা পূর্ব দিকে বা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে। আবু আইয়ুব আনসারী ^{৩৫} বলেন, আমরা যখন সিরিয়ায় এলাম তখন পায়খানাগুলো কিবলামুখী করে বানানো পেলাম। ফলে আমরা কিছুটা ফিরে বসতাম এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতাম।”^{৩৫}

তবে শৌচালয় যদি বিল্ডিং-এর মাঝে হয় অথবা ব্যক্তি এবং কিবলার মাঝে কোনো বেড়া/প্রতিবন্ধক থাকে, তাহলে কিবলামুখী হওয়া বা পিছনে রাখা কোনোটাতেই সমস্যা নেই। আল্লাহ বিন উমার ^{৩৬} হতে বর্ণিত।

اَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْوَلُ فِي بَيْتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ، مُسْتَدِيرَ الْقِبْلَةِ

“তিনি আল্লাহর রসূল ^{৩৬} কে তার বাড়িতে সিরিয়া মুখী হয়ে এবং কাঁবার দিকে পিঠ করে বসে প্রস্তাব করতে দেখেছেন।”^{৩৬}

ছোটো মারওয়ান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَتَأْخَذُ إِنَّمَا عُمَرَ رَاجِلَةً مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ جَلَسَ يَبْوُلُ إِلَيْهَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَيْسَ قَدْ شُرِيَّ عَنْ هَذَا؟ قَالَ: بَلَى إِنَّمَا «شُرِيَّ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَشْرُكُ فَلَا يَأْسَ

“ইবনু উমার ^{৩৭} তার উটকে কিবলার দিকে বসালেন। অতঃপর ঐ উটের দিকে মুখ করে রসে প্রস্তাব করলেন। আমি বললাম: হে আবু আল্লুর রহমান! এ থেকে কি নিষেধ করা হয়নি? তিনি বললেন: হ্যাঁ, তবে এ নিষেধ উন্মুক্ত ময়দানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যদি তোমার এবং কিবলার মাঝে কোনো আড়াল থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নেই।”^{৩৭}

তিবে বিল্ডিং এর মাঝেও কিবলামুখী হওয়া, কিবলাকে পিছনে রাখা পরিত্যাগ করা উত্তম।

[আল্লাহ সর্বজ্ঞানী]

^{৩৫} মুওাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ১৪৪, সহীহ মুসলিম, হা. ৪৯৭, ফুআ. ২৬৪।

^{৩৬} মুওাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ১৪৮, সহীহ মুসলিম, হা. ৪৯৯, ফুআ. ২৬৬।

^{৩৭} সুনান আবু দাউদ, হা. ১১, দারাকুতনী: ১৫৮, হাকেম: ১/১৫৪, ইমাম দারাকুতনী ও হাকেম এটাকে সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী সহযোগ প্রকাশ করেছেন। ইবনু হাজার, হাজেমি এবং আলবানী এটাকে হাসান বলেছেন।

المَسْأَلَةُ التَّالِيَةُ: مَا يَسْنُ فَعْلَهُ لِدَخْلِ الْخَلَاءِ

তৃতীয় মাসআলা: টয়লেটে প্রবেশকারীর করণীয় সুন্নাতসমূহ

বস্তি হলো প্রবেশকারীর জন্য সুন্নাত হলো প্রবেশের সময় دُعْاً تَرَى دুআটি পাঠ করা এবং বের হওয়ার সময় غُفران! দুআটি পাঠ করা। এ ছাড়াও তার জন্য সুন্নাত হলো বাম পা আগে দিয়ে প্রবেশ করা, ডান পা আগে দিয়ে বের হওয়া এবং মাটির (মলমুক্ত ত্যাগের স্থান) কাছাকাছি না হওয়া পর্যন্ত লজ্জাস্থান উপোচিত না করা।

স্থানটা যদি উপুক্ত হয় তাহলে মুশাহাব হলো- দুরে যাওয়া এবং পর্দা করা যাতে দেখা না যায়। এগুলোর প্রমাণ হলো নিম্নরূপ:

১. জাবির ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِي النَّبَارَ حَتَّى يَتَغَيَّبَ فَلَا يُرَى

“আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ এর সাথে সফরে বের হলাম। আল্লাহর রসূল ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে এত দুরে যেতেন যে, তাকে দেখা যেত না।”^{৭৮}

২. আলীؑ হতে বর্ণিত। রসূল ﷺ বলেন:

سَرُّ مَا يَنْأِي أَعْيُنَ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلَاءَ، أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللَّهِ

“জিনের দৃষ্টি ও আদম সতানের লজ্জাস্থানের মাঝে পর্দা হলো যখন তাদের কেউ টয়লেটে প্রবেশ করে সে যেন বিসমিল্লাহ বলে।”^{৭৯}

৩. আনাসؓ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبُثِ وَالْجَبَاثِ

নাবীؓ যখন টয়লেটে প্রবেশ করতেন তখন এই দুআটি পাঠ করতেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبُثِ وَالْجَبَاثِ

“হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে নাপাক পুরুষ জীন এবং মহিলা জীন থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।”^{৮০}

^{৭৮} সুনান আবু দাউদ, খ. ২, ইবনু মাজাহ, খ. ৩৩৫, শব্দ ইবনু মাজাহ এর। দেখুন সহীহ ইবনু মাজাহ: ১/৬০।

^{৭৯} ইবনু মাজাহ: ২৯৭, তিরমিয়া, খ. ৬০৬, আলবানী (রহ.) এটা সচিক্ষণ গামু সহীহ বলেছেন: ৩৬১।

^{৮০} মুস্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, খ. ১৪২, সহীহ মুসলিম, খ. ৭১৭, ফুআ. ৩৭৫।

৪. আয়িশাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، قَالَ غُفْرَانِكَ

“নাবী যখন পায়খানা হতে বের হতেন তখন গুরুতর বলতেন।”^{৪১}

৫. ইবনু উমার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً لَا يَرْفَعُ ثُوبَهُ حَتَّى يَدْنُو مِنَ الْأَرْضِ

“নাবী যখন টয়লেটে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন মাটির (মলমূত্র ত্যাগের স্থান) নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত তিনি তার কাপড় ওঠাতেন না।”^{৪২}

المُسَأَّلَةُ الرَّابِعَةُ: مَا يَحْرُمُ فَعْلَهُ عَلَى مَنْ أَرَادَ قَضَاءَ الْحَاجَةِ

চতুর্থ মাসআলা: মলমূত্র ত্যাগকারীর জন্য যে কাজগুলো করা হারাম

আবদ্ধ পানিতে প্রস্তাব করা হারাম। জাবির হতে বর্ণিত। তিনি নাবী থেকে বর্ণনা করেছেন:

إِنَّهُ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

“নিশ্চয় নাবী আবদ্ধ পানিতে প্রস্তাব করতে নিষেধ করছেন।”^{৪৩}

প্রস্তাব/পায়খানা করা অবস্থায় কোনো ব্যক্তি তার লজ্জাস্থান ধরবে না এবং ডান হাতে ইস্তিনজাও করবে না। (কারণ এগুলো হারাম) আল্লাহর রসূল বলেন:

إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكْرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَشْجِي بِيَمِينِهِ

“যখন তোমাদের কেউ প্রস্তাব করে তখন সে যেন ডান হাতে লজ্জাস্থান না ধরে এবং ডান হাতে ইস্তিনজা না করে।”^{৪৪}

অনুরূপভাবে ছায়াতে, বাগানে, ফলদায়ক গাছের নীচে, পানির ঘাটে প্রস্তাব-পায়খানা করা হারাম। মুয়ায বিন জাবাল হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল বলেছেন:

^{৪১} সুনান আবু দাউদ, হা. ১৭, তিরমিয়ী, হা. ৭।

^{৪২} সুনান আবু দাউদ, হা. ১৪, তিরমিয়ী, হা. ১৪।

^{৪৩} সহীহ মুসলিম, হা. ৫৪২, ফুআ. ২৮১, সহীহল বুখারী, হা. ২৩৯, এরাজি: নিশ্চল, আবদ্ধ পানি।

^{৪৪} সুনান আলাইইহি: সহীহল বুখারী, হা. ১৫৬৪, সহীহ মুসলিম, হা. ৫০১, ফুআ. ২৬৭।

أَتَقُوا الْمَلَائِكَةَ: الْبَرَازِفِ الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظَّلَّ

“তোমরা তিনটি অভিশপ্ত কাজ থেকে বিরত থাক। সেগুলো হলো: মানুষের অবতরণ স্থলে, চলাফেরার পথে এবং ছায়া বিশিষ্ট স্থানে পায়খানা করা।”^{৪৫}

আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। নিচ্যই নাবী ﷺ বলেছেন:

أَتَقُوا اللَّعَانِيْنَ قَالُوا: وَمَا اللَّعَانِيْنَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْذِي يَسْخَلُ فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظُلْمِهِمْ

“তোমরা দুটি অভিশপ্ত কাজ থেকে বিরত থাকো। সাহাবিগণ বললেন: হে আল্লাহর রসূল! সে দুটি অভিশপ্ত কাজ কি? তিনি বললেন: মানুষের চলা-ফেরার রাস্তায় এবং তাদের ছায়ায় পায়খানা করা।”^{৪৬}

অনুরূপভাবে টয়লেটে কুরআন পাঠ করা এবং গোবর, হাড় ও সম্মানিত খাবারের দ্বারা ইত্তিজমার করাও হারাম। জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

هَنَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظَمٍ، أَوْ بِغَزِيرٍ

“নাবী ﷺ হাজ্জি এবং গোবর দ্বারা ইত্তিজমার করতে নিষেধ করেছেন।”^{৪৭}

মুসলিমদের কবরস্থানেও পায়খানা করা হারাম। নাবী ﷺ বলেছেন:

وَمَا أُبَلِّي أَوْ سُطَّ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي، أَوْ وَسَطَ السُّوقِ

“কবরস্থানে পায়খানা করা আর বাজারে পায়খানা করার মধ্যে আমি কোনো পার্থক্য দেখি না।”^{৪৮}

الْمَسَأَةُ الْخَامِسَةُ: مَا يَكْرِهُ فَعْلَهُ لِلْمُتَخَلِّي

পঞ্চম মাসআলা: প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণকরার জন্য অপচন্দনীয় কর্মসমূহ

কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই বাতাসের প্রবাহমুখী হয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করা (যাতে তার দিকে প্রশ্নাব ফিরে না আসে) মাকরাহ। এমনিভাবে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করা অবস্থায় কথা বলা মাকরাহ। নাবী ﷺ প্রশ্নাব করা অবস্থায় তার পাশ দিয়ে একজন লোক অতিক্রম করলেন এবং তাকে সালাম দিলেন। নাবী ﷺ তার সালামের জবাব দিলেন না।^{৪৯}

^{৪৫} সুনan আবু দাউদ, হ্য. ২৬, ইবনু মাজাহ, হ্য. ৩২৮, সনদ হাসান ইরওয়াউল গালীল: ১/১০০।

^{৪৬} সহীহ মুসলিম, হ্য. ৫০৬, ফুআ. ২৬৯।

^{৪৭} সহীহ মুসলিম, হ্য. ৪৯৬, ফুআ. ২৬৩।

^{৪৮} ইবনু মাজাহ, হ্য. ১৫৬৭, আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন। ইরওয়াউল গালীল: ১/১.২।

^{৪৯} সহীহ মুসলিম, হ্য. ৭০৯, ফুআ. ৩৭০।

গর্তে এবং এমন স্থানে প্রস্তাব করা হারাম। আবু কাতাদা সাল্লাল্লাহু আল্লাহু আবু কাতাদা বিন সারজিস সাল্লাল্লাহু আবু কাতাদা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন-

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ أَنْ يُبَالِ فِي الْجُنُحِ قَبْلِ لِقَاتَادَةَ: مَا بَالِ الْجُنُحِ؟ قَالَ: يُقَالُ إِنَّهُ مَسَاكِنُ الْجِنِّ
 “নাবী সাল্লাল্লাহু আবু কাতাদা গর্তে প্রস্তাব করতে নিষেধ করেছেন। আবু কাতাদাকে জিজ্ঞেস করা হলো, কি কারণে গর্তে প্রস্তাব করা নিষেধ? তিনি বললেন, বলা হয়, গর্তে জিনেরা বসবাস করে।”^{৫০}

কারণ গর্তে কোনো প্রাণী থাকতে পারে, ফলে সে প্রাণী কষ্ট পাবে, অথবা স্টো জিনদের বাসস্থান হতে পারে, ফলে তারা কষ্টের স্বীকার হবে।

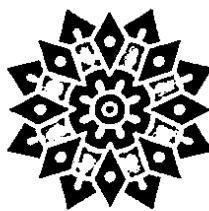
প্রয়োজন ছাড়া আল্লাহর নাম রয়েছে এমন কোনো জিনিস নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করা মাকরুহ। কারণ নাবী সাল্লাল্লাহু আবু কাতাদা যখন টয়লেটে প্রবেশ করতেন তখন তার আঁচ্ছি রেখে যেতেন।^{৫১}

যদি প্রয়োজন এবং জরুরি হয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই। যেমন: এমন টাকা নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করা, যাতে الله বাইরে রেখে যায় তাহলে চোরের লক্ষ্যবস্তু হয় অথবা ভুলে রেখে যাওয়ার স্বাভাবনা রয়েছে।

তবে মুসহাফ (কুরআন কপি) নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করা হারাম। চাই স্টো প্রকাশ্য হোক অথবা গোপন। কারণ মুসহাফ হলো আল্লাহর বাণী, সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী। মুসহাফ নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করা মুসহাফকে অপমানের নামান্তর বৈ অন্য কিছু নয়।

^{৫০} সুনান আবু দাউদ, খ. ২৯, সুনান নাসাই, খ. ৩৪।

^{৫১} সুনান আবু দাউদ, খ. ১৯, তিমিয়ী, খ. ১৭৪৬, সুনান নাসাই, খ. ৫২২৮, ইবনু মাজাহ, খ. ৩০৩।



الباب الرابع: في السواك وسنن الفطرة চতুর্থ অনুচ্ছেদ : মিসওয়াক, সৃষ্টিগত স্বভাবসমূহ

এ অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

মিসওয়াক: মুখে গন্ধ এবং উচ্চিষ্ট খাবার দূর করার জন্য দাঁতে এবং মাড়ীতে গাছের ডাল বা এ জাতীয় জিনিস ব্যবহার করাকে মিসওয়াক বলা হয়।

المسألة الأولى: حكمه প্রথম মাসআলা: তার বিধান

সর্বদা মিসওয়াক করা সুন্নত সম্মত। এমন কি রোজাদার যদি রোজাবস্থায় মিসওয়াক করে, তাতেও কোনো সমস্যা নেই। চাই সময়টা সকাল হোক বা বিকাল। কারণ নাবী ﷺ মিসওয়াক করার ব্যাপারে সাধারণভাবে উৎসাহিত করেছেন। তিনি কোনো সময়কে নির্ধারণ করেননি। এমনকি তিনি বলেছেন:

السَّوَاكُ مَطْهَرٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

“মিসওয়াক মুখের পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায়।”^{৫২}

তিনি অন্যত্র আরও বলেন:

لَوْلَا أَنْ أَشْقَى عَلَى أَمْتَيِ, لَأَمْزِحْمِ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

“আমার উদ্ধাতের উপর যদি কঠিন মনে না করতাম, তাহলে প্রত্যেক সলাতে তাদেরকে মিসওয়াক করার আদেশ করতাম।”^{৫৩}

^{৫২} সহীল বুখারী, ঘ. ২/৪০, আহমদ: ৬/৪৭, নাসাই, ঘ. ৫।

^{৫৩} মুতাফাকুন আলাইহি: সহীল বুখারী, ঘ. ৮৮৭, সহীহ মুসলিম, ঘ. ৪৭৭, ফুআ. ২৫২।

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: مَنْ يَتَأْكِدُ الثَّالِثَيْرَ مَسْأَلَةُ الْمَسْوَلَةِ: كَمْ خَلَقَ اللَّهُ

ওয়ুর সময়, ঘুম থেকে ওঠার সময়, মুখে দুর্গন্ধি তৈরি হলে, কুরআন তিলাওয়াতের সময়, সলাতের সময়, অনুরূপভাবে মাসজিদে এবং বাড়িতে প্রবেশের সময় মিসওয়াক করা প্রয়োজন। এই মর্মে মিকদাদ বিন শুরাই তার বাবা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

سَأَلَتْ عَائِشَةَ، قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسُّوَاقِ

“আমি আয়িশাহ رض কে জিজ্ঞেস করে বললাম, নাবী ص ঘরে প্রবেশ করে প্রথমে কী করতেন? তিনি ص বললেন, মিসওয়াক করতেন।”^{৫৪}

অনুরূপভাবে দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকার পরে এবং দাঁত বিবর্ণ হলেও মিসওয়াক করা প্রয়োজন।

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، يَسْوُصُ ۝ فَاهِ بِالسُّوَاقِ

“নাবী ص রাতে (তাহাঙ্গুদের জন্য) ওঠে মিসওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন।”^{৫৫}

মুসলিম এই বিষয়ে আদিষ্ট যে, ইবাদতের সময় এবং আল্লাহর নেকট্য অর্জনের সময় সে পবিত্রতা এবং পরিচ্ছন্নতার সবচেয়ে সুন্দর অবস্থা গ্রহণ করবে।

الْمَسْأَلَةُ التَّالِيَةُ: كَمْ يَكُونُ الثَّالِثَيْرَ مَسْأَلَةُ الْمَسْوَلَةِ: كَمْ

কাঁচা ডাল দিয়ে মিসওয়াক করা সুন্নাত, তবে সেটা যেন টুকরো টুকরো না হয় এবং যাতে মুখে আঘাত না লাগে। কেননা নাবী ص আরাক^{৫৬} গাছের ডাল দিয়ে মিসওয়াক করতেন। তিনি ডান এবং বাম হাত দিয়েও মিসওয়াক করতেন। এই বিষয়ে প্রশংস্ততা রয়েছে।

যদি কারো কাছে ওয়ু করার সময় মিসওয়াক না থাকে, তাহলে তার জন্য আঙুল দ্বারা মিসওয়াক করা যথেষ্ট হবে। এটা আলী رض আল্লাহর রসূল ص এর ওয়ুর পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে বর্ণনা করেছেন।^{৫৭}

^{৫৪} সহীহ মুসলিম, হ্য. ৪৭৮, ফুআ. ২৫৩।

^{৫৫} الشَّوْصُ : ঘৰা, মাজা।

^{৫৬} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হ্য. ২৪৫, সহীহ মুসলিম, হ্য. ৪৮৩, ফুআ. ২৫৫।

^{৫৭} رِزَاعَكَ: شجر من الحمض يستاك بقبيانه، واسمها الكفاث

^{৫৮} আহমাদ: ১/১৫৮, আত তালিখীসূল কাবীর: ১/৭০।

المسألة الرابعة: فوائد السواك

চতুর্থ মাসআলা: মিসওয়াকের উপকারিতা

পূর্বের হাদীসে মিসওয়াকের গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। তা হলো দুনিয়াতে মুখ পবিত্রকারী আর পরকালে রবের সন্তুষ্ট অর্জনকারী।

সুতরাং, মুসলিমদের জন্য উচিত এই সুন্নাতের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া এবং এর মাঝে ব্যাপক উপকার নিহিত থাকার কারণে পরিত্যাগ না করা। কিছু মুসলিম এমন আছেন যারা একমাস দুই মাস চলে যায় কিন্তু অলসতাবশত অথবা অজ্ঞতাবশত মিসওয়াক করেন না। এই সুন্নাত পরিত্যাগ করার কারণে এই লোকেরা বড়ো পুরুষের এবং অনেক কল্যাণ হারিয়ে ফেলেছে। যে সুন্নাত স্বয়ং আল্লাহর রসূল ﷺ সংরক্ষণ করতেন। যদি তিনি তার উম্মতের উপর এটা কঠিন মনে না করতেন, তাহলে এটাকে তার উম্মতের উপর ওয়াজিব করে দিতেন।

এ ছাড়াও ডাক্তারগণ মিসওয়াকের নানা উপকারের কথা আলোচনা করে থাকেন। যেমন- দাঁত শক্তিশালী করে, মাড়িকে শক্ত করে, আওয়াজকে পরিষ্কার করে, ব্যক্তিকে কর্মসূচি করে ইত্যাদি।

المسألة الخامسة: سنن الفطرة

পঞ্চম মাসআলা: সৃষ্টিগত স্বভাবসমূহ

এটাকে বৈশিষ্ট্যও বলা হয়। কারণ একজন ব্যক্তি সৃষ্টির ঐ সমস্ত গুণাবলিতে গুণাবলিতে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের জন্য ঐ গুণাবলিকে পছন্দ করেছেন। যাতে তারা সর্বোত্তম গঠন এবং পরিপূর্ণ আকৃতির অধিকারী হতে পারে। আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

خَمْسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ: الْإِسْتِخْدَادُ، وَالْجِنَانُ، وَقُصُّ الشَّارِبِ، وَنَفْعُ الْإِبْنِيَّ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ

“পাঁচটি বিষয় ফিতরতের অন্তর্ভুক্ত: ১. ক্ষুর ব্যবহার করা (নাভির নিম্নাংশে); ২. খাতনা করা; ৩. গোফ খাটো করা; ৪. বগলের পশম উপরে ফেলা; ও ৫. নখ কাটা।”^{৫৯}

^{৫৯} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৫৮৯, সহীহ মুসলিম, হা. ৪৮৫, ফুআ. ২৫৭।

১. دسته داد. বা নাভীর নিচের চুল মুগ্ন করা: এগুলো হলো লজ্জাস্থানের চারপাশে গজিয়ে ওঠা চুল। এটাকে দস্তে বলে নামকরণ করা হয়েছে। কারণ এই কাজে লোহা তথা ক্ষুর (রেড) ব্যবহার করা হয়। এই চুল দূর করার মাঝে রয়েছে সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা, মুগ্ন ছাড়াও এগুলো পরিষ্কার করা স্থিতি। যেমন: উৎপাদিত পরিষ্কার করার জিনিসপত্র (ক্রিম জাতীয় জিনিস)।

২. الختان. বা খতনা করা: পুরুষাঙ্গের মাথা^{৬০} ঢেকে রাখে এমন চামড়া কেটে ফেলা, যাতে পুরুষাঙ্গের মাথা উঞ্চোচিত হয়ে যায়। এই বিধান হলো পুরুষের ক্ষেত্রে। মহিলাদের ক্ষেত্রে বিধান হলো: মিলনস্থানের উপরের অতিরিক্ত গোশত কেটে ফেলা। একথা বলা হয় যে, এই জায়গাটা মোরগের ঝুটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে সঠিক কথা হলো: খতনা করা পুরুষদের জন্য ওয়াজিব আর মহিলদের জন্য সুন্নাত।

পুরুষদের খতনা করার তাৎপর্য হলো: লিঙ্গের অগ্রে^{৬১} তুকে জমে থাকা অপবিত্রতা থেকে লজ্জাস্থানকে পবিত্র করা। এ ছাড়াও খতনায় অনেক উপকার রয়েছে। তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে খতনা করাটা তাদের উত্তেজনাকে প্রশমিত করে দেয়। শিশু জন্ম লাভের সপ্তম দিনে খতনা করা মুস্তাহব। খতনা দ্রুত আরোগ্য নিয়ে আসে এবং ছোটো শিশু পরিপূর্ণ রূপে বেড়ে ওঠে।

৩. قص الشارب واحفائه. বা গোফ খাটো করা ও দাঢ়ি ছেড়ে দেওয়া। গোফ ছোটো করার ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ এতে রয়েছে সৌন্দর্য, পরিচ্ছন্নতা এবং কাফেরদের বৈপরিত্য।

গোফ খাটো করা, দাঢ়ি ছেড়ে দেওয়া, লম্বা করা এবং দাঢ়িকে সন্মান করার প্রসঙ্গে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। দাঢ়ি ছেড়ে দেওয়ার মাঝে রয়েছে সৌন্দর্য এবং পুরুষত্বের প্রতিচ্ছবি। অথচ অনেক মানুষ এই বিষয়ের বিপরীত করে। তারা গোফ রাখে আর দাঢ়ি মুগ্ন করে অথবা দাঢ়ি ছেটে ছোটো করে ফেলে।

এ সকল কাজ সুন্নাহর বিপরীত এবং এই প্রসঙ্গে বর্ণিত আদেশ দাঢ়ি ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব এর বিপরীত। তা হচ্ছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جُزُوا الشَّوَّارِبَ، وَأَرْخُوا اللَّحْيَ خَالِقُوا الْمُجُوسَ
“আবু হুরায়রা^{৬৩} হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল^{৬৪} বলেছেন: তোমরা মোচ কেটে ফেল এবং দাঢ়ি লম্বা করো। আর অগ্নিপূজকদের বিরুদ্ধাচরণ করো।”^{৬২}

^{৬০} الحشنة : পুরুষাঙ্গের মাথা।

^{৬১} যে চামড়া পুরুষাঙ্গের মাথা ঢেকে রাখে এবং যাকে খতনায় কেটে ফেলা হয়।

^{৬২} মুসলিম, ঘ. ৪৯১; (২৬০), الجزء، ১: ছেড়ে দেওয়া এবং হতকেপ না করা।

ইবনু উমার رض হতে বর্ণিত হাদীস।

عَنْ أَبْنِيْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَالِفُوْا الْمُشْرِكِينَ: وَقُرُوْا اللَّحْيَ، وَأَخْفُوا الشَّوَارِبَ.

“ইবনু উমার رض সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমরা মুশরিকদের বিপরীত করো; দাঢ়ি লঞ্চা রাখো, গোঁফ ছোটো করো।”^{৬৩}

সুতরাং মুসলিমের উপর আবশ্যক হলো, নাবী ﷺ এর দিকনির্দেশনা আকড়ে ধরা, শক্রদের বিপরীত করা এবং মহিলার সাদৃশ্য হওয়া থেকে বেঁচে থাকা।

৪. طاف ظافر বা নখ কাটা: এমনভাবে নখ কর্তন করা যাতে নখ লঞ্চা না হয়। নখ কর্তন করলে নখগুলো সুন্দর হয় এবং তাতে জমে থাকা ময়লাগুলো দূর হয়ে যায়। কিছু মুসলিম এই সৃষ্টিগত স্বভাবের বিপরীত করে। তারা তাদের নখগুলো লঞ্চা করছে এবং হাতের নির্দিষ্ট কোনো আঙুলের নখ তারা লঞ্চা করছে। এসকল কাজ হলো শয়তানের সৌন্দর্যমণ্ডিত করা এবং আল্লাহর শক্রদের অন্ধ অনুসরণ।

৫. طاف ظافر বা বগলের চুল উপরে ফেলা: অর্থাৎ বগলে গজানো চুল অপসারণ করা। উপড়ানো, মুগানো বা অন্য কোনো মাধ্যমে এই চুল বগল থেকে অপসারণ করা হলো সুন্নাত। এই কাজে রয়েছে পরিচ্ছন্নতা এবং অপচন্দনীয় গন্ধ হতে মুক্তি যা এই চুলগুলোর কারণে জমা হয়ে থাকে। এটাই হলো আমাদের একনিষ্ঠ ধর্ম। যে ধর্ম আমাদেরকে এই সকল কাজের প্রতি নির্দেশ দিয়েছে, কারণ তাতে সৌন্দর্য, পবিত্রতা এবং পরিচ্ছন্নতা রয়েছে। যাতে মুসলিম সর্বোত্তম অবস্থায় থাকে, কাফের, জাহেলদের অন্ধ অনুসরণ থেকে দুরে থাকে, তাদের ধর্ম নিয়ে গর্বিত থাকে, তার রবের আনুগত্যশীল থাকে এবং তার নাবী ﷺ এর সুন্নাতের অনুসারী হয়।

এই পাঁচটি স্বভাবের সাথে মিসওয়াক করা, নাকে পানি দেওয়া কুলি করা, আঙুলের গিটসমূহ ধোত করা, (আঙুলের গিটসমূহে ময়লা জমা হয়) এবং ইস্তিনজা করাকেও সম্পৃক্ত করা হয়। আর এটা বর্ণিত হয়েছে আয়িশাহ رض এর হাদীসে।

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قُصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسُّوَالُكُ، وَاسْتِئْشَافُ الْمَاءِ، وَقُصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَتَنْفُّ الإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَإِنْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الْإِسْتِنْجَاءَ.

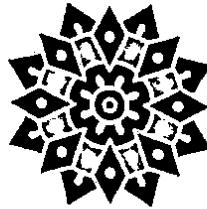
قَالَ مُضَعِّبٌ بْنُ شَيْبَةَ أَحَد رواة الحديث: وَسَيِّئُ الْعَاشرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ المُضَمَّضَةً.

^{৬৩} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৫৮৭২, সহীহ মুসলিম, হা. ৪৮৭, ফুআ. ২৫৮, শব্দ বুখারীর।

“আয়শাহ হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: দশটি কাজ ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত। গোফ খাটো করা, দাঢ়ি লম্বা করা, মিসওয়াক করা, নাকে পানি দিয়ে ঝাড়া, নখ কাটা এবং আঙুল গিরাসমূহ ধোয়া, বগলের পশম উপরে ফেলা, নাভীর নীচের পশম মুণ্ডন করা এবং পানি দ্বারা ইস্তিনজা করা।

‘ট্রিং অর্থাৎ ইস্তিনজা করা।

হাদীসের রাবী মুসআব বলেন, দশমটির কথা আমি ভুলে গেছি। সত্ত্বতঃ সেটি হবে কুলি করা।^{৬৪}



الباب الخامس : في الوضوء পঞ্চম অনুচ্ছেদ : ওয়

এ অনুচ্ছেদে কিছু মাসআলা রয়েছে-

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: تَعْرِيفُهُ، وَحِكْمَتُهُ প্রথম মাসআলা: ওয়ুর পরিচয় এবং হকুম

শব্দটি থেকে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ: সুন্দর, পরিচ্ছন্নতা।

شرعًا: استعمال الماء في الأعضاء الأربعـ وهي الوجه واليدان والرأس والرجلانـ على صفة مخصوصة في الشرع، على وجه التعبـد للـله تعالىـ.

পরিভাষায়: আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে শরীরতের নির্দিষ্ট পস্থায় চারটি অঙ্গে (মুখ, দুই হাত, মাথা এবং দুই পা) পানি ব্যবহার করাকে ওয়ু বলা হয়।

ওয়ুর হকুম: অপবিত্র ব্যক্তি যদি সলাত আদায় করতে চায় অথবা সলাতের হকুমের অন্তর্গত কোনো ইবাদত করতে চায় (যেমন তাওয়াফ করা, কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা) তাহলে তার উপর ওয়ু করা ওয়াজিব।

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: الدَّلِيلُ عَلَى وَجْوَبِهِ، وَعَلَى مَنْ يَجْبُ، وَمَنْ تَيْحَبُّ؟

দ্বিতীয় মাসআলা: ওয়াজিরের দলীল, কার উপর ওয়াজির? কখন ওয়াজির?

ওযু করা ওয়াজির এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّمَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُتِّلُوا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيهِكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطْهُرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَخْدُ مِنْكُمْ مِنَ الْغَابِطِ أَوْ لَامْسَתُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَبَيَّنُوا صَعِيدًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيهِكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُظْهِرَكُمْ وَلِيَسْتَعْمِلَنَّ عَلَيْكُمْ لَعْلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

“হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা সলাতের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করো; তোমাদের মাথা মাসাহ করো; পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত করো। আর যদি তোমরা অপবিত্র থাকো, তাহলে বিশেষভাবে (গোসল করে) পবিত্র হও। যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের কেউ প্রস্তাব-পায়খানা হতে আগমন করে, অথবা তোমরা স্ত্রী-সহবাস করো এবং পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াসুম করো; তা দিয়ে তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তহয় মাসাহ করো। আল্লাহ তোমাদেরকে কোনো প্রকার কষ্ট দিতে চান না বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।” [সুরা মায়িদাহ : ৬]

আল্লাহর রসূল ﷺ এর বাণী:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

“পবিত্রতা ব্যতীত সলাত কবুল হয় না। খিয়ানতের সম্পদ থেকে সাদকাও কবুল হয় না।”^{৬৫}

তিনি আরও বলেন: **لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَتَوَضَّأْ**

“যে ব্যক্তি অপবিত্র (মলমুক্ত বা এমন ছোটো কারণের অপবিত্রতা) হয় তার সলাত কবুল হবে না, যতক্ষণ না সে ওযু করে।”^{৬৬}

মুসলমানদের কেউ এর বিপরীত কোনো কিছু বর্ণনা করেননি। ফলে কুরআন-সুন্নাহ এবং ইজমার দ্বারা ওযু শরীয়ত সম্মত হওয়া প্রমাণিত হয়েছে।

* * سন্ধিহ মুসলিম, ঘ. ৪৬৫, ফুআ. ২২৪; : الغلول : গনিমত বা অন্য মাল থেকে ছুরি করা।

* * سন্ধিহ বুখারী, ঘ. ১৩৫। ‘নিঃশব্দে বা সশব্দে বায়ু বের হওয়াকে হাদাস বলে।’

ଯାର ଉପର ଓୟୁ କରା ଓୟାଜିବ: ପ୍ରାଣ୍ତବୟଙ୍କ ଜ୍ଞାନୀ, ମୁସଲିମ ଯଥନ ନାମଯେର ଇଚ୍ଛା କରବେ ଅଥବା ସଲାତେର ନାମାନ୍ତର କୋନୋ ଇବାଦତେ ଇଚ୍ଛା କରବେ ତଥନ ତାର ଉପର ଓୟୁ କରା ଓୟାଜିବ ହବେ ।

ଯଥନ ଓୟାଜିବ: ଯଥନ ସଲାତେର ସମୟ ହବେ ତଥନ ଓୟୁ କରା ଓୟାଜିବ: ଅଥବା ଯେ ସମ୍ମତ ଇବାଦତେର ଜନ୍ୟ ଓୟୁ କରା ଶର୍ତ୍ତ କରା ହେଁବେ ସେ କାଜଗୁଲୋ ଯଥନ ମାନୁଷ କରବେ (ଯଦିଓ ଏହି ଇବାଦତଗୁଲୋର ଜନ୍ୟ ସମୟ ନିର୍ଧାରିତ ନେଇ) ତଥନ ଓୟୁ କରା ଓୟାଜିବ ହବେ । ଯେମନ- ତାଓୟାଫ କରା, କୁରଆନ ମାଜୀଦ ଅର୍ପଣ କରା ।

مُسَأَلَةٌ فِي شَرْوَطِهِ ତୃତୀୟ ମାସଆଲା: ଓୟୁର ଶର୍ତସମୂହ

କ. ମୁସଲିମ, ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଭାଲୋ ମନ୍ଦେର ମାଝେ ପାର୍ଥକ୍ୟକାରୀ ହେଁଯା: ସୁତରାଂ କୋନୋ କାଫେରେର ଓୟୁ ସଠିକ ହବେ ନା । ଅନୁରୂପ ପାଗଲେର ଓୟୁଓ ସଠିକ ହବେ ନା । ଏମନିଭାବେ ଯେ ଛୋଟୋ ଶିଶୁ ଭାଲୋ-ମନ୍ଦେର ପାର୍ଥକ୍ୟ କରାର ବସେ ଉପନ୍ନିତ ହୟନି ତାର ଓୟୁଓ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ ।

ଖ. ନିୟତ କରା: ଆଲ୍‌ଲାହର ରସୂଲ ﷺ ବଲେହେନ: “ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଜ ନିୟତେର ଉପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ।”^{୬୭}

ନାବୀ ﷺ ହତେ ସାବ୍ୟନ୍ତ ନା ହେଁଯାର କାରଣେ ମୁଖେ ଓୟୁର ନିୟତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରା ଶରୀୟତ ସମ୍ମତ ନାହିଁ ।

ଘ. ପାନି ପବିତ୍ର ହେଁଯା: ଏର ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବେ ପାନିର ଅଧ୍ୟାୟେ ଆଲୋଚିତ ହେଁବେ । ଅପବିତ୍ର ପାନି ଦିଯେ ଓୟୁ ଶୁଦ୍ଧ ହବେ ନା ।

ଘ. ଯୋମ, ଆଟା ବା ଏ ଜାତୀୟ ଜିନିସ ଯା ଚାମଡ଼ାଯ ପାନି ପୌଛାତେ ବାଧା ପ୍ରଦାନ କରେ ତା ଦୂର କରା: ଯେମନ ନେଇଲ ପାଲିଶ, ଯା ବର୍ତମାନେ ମହିଳାଦେର ମାଝେ ବ୍ୟାପକ ଆକାରେ ଛଢିଯେ ପରେହେ ।

ଙ. ପୂର୍ବେ ଉପ୍ଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଲୋ ପାଓୟା ସାପେକ୍ଷେ ପାନି ଅଥବା ଟିଲା କୁଳୁଖ ବ୍ୟବହାର କରେ ପବିତ୍ରତା ହେଁଯା ।

ଚ. ଧାରାବାହିକତା ରକ୍ଷା କରା (ଏକ ଅଙ୍ଗ ଶୁକାନୋର ପୂର୍ବେଇ ଆରେକ ଅଙ୍ଗ ଧୌତ କରା) ।

ଛ. ପରମ୍ପରା କାଜଗୁଲୋ କରା । ଏହି ଦୁଇ ବିଷୟେ କିଛୁ ପରେଇ ଆଲୋଚନା ଆସବେ ।

ଜ. ସକଳ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଙ୍ଗ-ପ୍ରତଙ୍ଗଗୁଲୋ ଧୌତ କରା ।

^{୬୭} ମୁହାଫାକୁନ ଆଲ୍‌ହାଇହି: ସହିତ୍ତ ବୁଖାରୀ, ହା. ୧, ସହିତ୍ତ ମୁସଲିମ, ହା. ୪୮୨୧, ଫୁଆ. ୧୯୦୭ ।

المسألة الرابعة: فرضه أي أعضاؤه

চতুর্থ মাসআলা: ওয়ুর ফরযসমূহ (মোট ৬টি)

১. পরিপূর্ণভাবে চেহারা ধৌত করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾

“যখন তোমরা সলাতের জন্য প্রস্তুত হবে, তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত করো।” [সূরা মায়দাহ : ৬]
কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া, চেহারার অন্তর্ভুক্ত। মুখ এবং নাক চেহারার অন্তর্ভুক্ত।

২. কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধৌত করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَأَنِيدِيَّكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾

“কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করো।” [সূরা মায়দাহ : ৬]

৩. দুই কানসহ পুরো মাথা মাসাহ করা। আল্লাহ বলেন:

﴿وَامْسِحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾

“তোমাদের মাথা মাসাহ করো।” [সূরা মায়দাহ : ৬]

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন: «الْأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» “দুই কান মাথার অন্তর্ভুক্ত।”^{৬৮}

সুতরাং মাথার কিছু অংশ বাদ দিয়ে মাসাহ করলে ওয়ু হবে না।

৪. টাখনু পর্যন্ত দুই পা ধৌত করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَأَرْجِلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

“পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত করো।” [সূরা মায়দাহ : ৬]

৫. ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। কারণ আল্লাহ এগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন। রসূল ﷺ আল্লাহ তা'আলার বর্ণনা অনুপাতে ধারাবাহিকভাবে ওয়ু করেছেন। আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ ও অন্যান্যদের হাদীসে^{৬৯} রসূল ﷺ-এর ওয়ুর পদ্ধতি এমনভাবেই বর্ণিত হয়েছে।

৬. موالة : কোনো প্রকার বিলম্ব ছাড়াই একটি অঙ্গ ধোয়ার পরে আরেকটি অঙ্গ ধৌত করা। এভাবেই আল্লাহর রসূল ﷺ একের পর এক অঙ্গ ধৌত করে ওয়ু করতেন। খালিদ বিন মাদান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّ وَفِي ظَهِيرَةِ قَدَمِهِ لَعْنةً قَذَرُ الدَّرْزَهِمِ، لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»

^{৬৮} তিরমিয়ী, হা. ৩৭, ইবনু মাজাহ, হা. ৪৪৩।

^{৬৯} সহীহ মুসলিম, হা. ৪৪৩, ফুআ. ২৩৫।

“নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কিছু সাহাবী সুত্রে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন, এক ব্যক্তি সলাত আদায় করছে, অথচ তার পায়ের উপরিভাগে এক দিরহাম পরিমাণ স্থান শুকনো, (ওয়ুর সময়) তাতে পানি পৌঁছায়নি। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পুনরায় ওয় করে সলাত আদায়ের নির্দেশ দিলেন।”^{৭০}

যদি একের পর এক অঙ্গ বিলম্ব ছাড়াই ধোত করা শর্ত না হতো তাহলে তিনি তাকে ছুটে যাওয়া স্থানটুকু ধোয়ার নির্দেশ দিতেন। কিন্তু তিনি তাকে এমন নির্দেশ প্রদান করেননি বরং তাকে পুনরায় ওয়ু করার আদেশ দিয়েছেন।

লুম্বা: ওয়ু অথবা গোসলে ছুটে যাওয়া স্থান যেখানে পানি পৌছায়নি।

المُسَأَلَةُ الْخَامِسَةُ: سَنَنُه
পঞ্চম মাসঅলা : সুনাহসমূহ

এখানে এমন কিছু কাজ নিয়ে আলোচনা করা হবে যেগুলো ওয়ু করা মুশাহাব। যদি কোনো ব্যক্তি এই কাজগুলো করে, তাকে সওয়াব দেওয়া হবে। আর যদি কেউ ছেড়ে দেয়, তবে তার কোনো সমস্যা নেই। এই কাজগুলোকে *سن الوضوء* বা ওয়ুর সুন্নাত বলা হয়।

১. শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

«لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ»

“যে ব্যক্তি (ওয়তে) আল্লাহর নাম নেয় না, তার ওয় হয় না।”^১

২. মিসওয়াক করা। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

لَوْلَا أَنْ أَشْقَى عَلَى أُمَّتِي لَا مَرْجِعُهُمْ بِالسُّوَادِ إِنَّ كُلًّا وَضُوءٌ

“আমার উশ্বাতের উপর যদি কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে আমি প্রত্যেক ওয়ুতে তাদেরকে মিসওয়াক করার হৃকুম করতাম।”^{৭২}

৩. গুয়ুর শুরুতে তিনবার হাত ধোত করা। আল্লাহর রসূল ﷺ এমনটা করতেন। আল্লাহর রসূল ﷺ এর গুয়ুর বর্ণনায় বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, তিনি তার দুই হাত তিনবার ধোত করতেন।

^{५०} आहमाद ३/४२४, आबू दाउद, अ. १७५, इरण्डयाउल गलील: १/१२७।

^{২০} আহমদ: ১/৪১৮, সুনান আবু দাউদ, হ্য. ১০১, শকিম: ১/১৪৭, ইমাম আলবানী এটাকে হসান বলেছেন। ইরওয়াউল গালীল: ১/১২২

^{१३} इमाम बखरी याकुफ सिगाह दिम्ये तालिकाभावे तारु किताबे वर्णना कर्वत्तेन। फातहल बायीः ४/१५०।

৪. ভালোভাবে কুলি করা এবং নাকে পানি প্রবেশ করানো। তবে রোজাদার এক্ষেত্রে বিরত থাকবে।
রসূল ﷺ এর ওয়ুর বর্ণনায় এসেছে: “কুলি করতেন ও নাকে পানি দিতেন।”
অপর হাদীসে এসেছে-

وَبَالْغُ فِي الْإِنْتِئَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَابِعًا

“তুমি উভয়রূপে নাকে পানি দিয়ে তা পরিস্কার করো, যদি তুমি সওম পালনের অবস্থায় না থাকো।”^{৭৩}

৫. ওয়ুর অঙ্গগুলো ঘষাঘষি করা এবং ঘন দাঢ়ি পানি দিয়ে খিলাল করা যাতে ভিতরে পানি পৌছায়। রাসূল ﷺ এমনটি করতেন।

كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ يَدْلِكُ ذِرَاعَيْهِ

“তিনি ওয়ু করার সময় কনুই ঘষে ধৌত করতেন।”^{৭৪}

কান যেখানে জল পান করে থাকে ও মখল যেখানে পান করে থাকে

“পানি নিয়ে চোয়ালের নিম্নদেশে (থুতনির নীচে) প্রবেশ করাতেন ও দাঢ়ি খিলাল করতেন।”^{৭৫}

৬. হাত এবং পা ধৌত করার ক্ষেত্রে ডানকে অগ্রগামী করা। আল্লাহর রসূল ﷺ এমনটি করতেন। হাদীসে এসেছে: كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ، فِي تَنْعِلِهِ، وَتَرْجِلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ

“জুতা পরা, চুল আঁচড়ানো এবং পবিত্রতা অর্জন করা তথা প্রত্যেক কাজই ডান দিক হতে আরও করতে পছন্দ করতেন।”^{৭৬}

৭. চেহারা, দুই হাত ও দুই পা তিনবার করে ধৌত করা। ওয়াজিব হলো একবার ধৌত করা আর তিনবার ধৌত করা হলো মুশাহব। এই মর্মে আল্লাহর রসূল ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে:

أَنَّهُ تَوَضَّأَ مَرَةً مَرَةً، مَرَتَّيْنِ مَرَتَّيْنِ، وَنَلَّاتٍ نَلَّاتٍ

“নিশ্চয়ই তিনি একবার একবার, দুইবার দুইবার, তিনবার তিনবার ওয়ুর অঙ্গগুলো ধৌত করতেন।”^{৭৭}

^{৭৩} সুনান আবু দাউদ, হ্য. ২৩৬৬, সুনান নাসাই ১/৬৬, হাদীস নং: ৮৭।

^{৭৪} ইবনু মাজাহ, হ্য. ১০৮২; সুনানুল কুবরা: ১/১৭৬, মুসতাদরাক: ১/২৪৩।

^{৭৫} সুনান আবু দাউদ, হ্য. ১৪৫, ইরওয়াউল গালীল: ৯২।

^{৭৬} মুস্তাফাকুন আলাইহি: সহীল্ল বুখারী, হ্য. ১৬৮, সহীহ মুসলিম, হ্য. ৫০৪, ফুআ. ২৬৮।

^{৭৭} মুস্তাফাকুন আলাইহি: সহীল্ল বুখারী, হ্য. ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯; সহীহ মুসলিম, হ্য. ৪২৬, ফুআ. ২২৬।

৮. ওয়ুর পরে বর্ণিত দুআ পড়া। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

مَنْ يُنْكِنْهُ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُنْجِيُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فَتَحَّتَ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الْعَيْانَةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيْمَانَ شَاءَ

“তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি উভম ও পূর্ণরূপে ওয়ু করে এ দুআ পড়বে ‘আশহুদু অল্ল-ইলা-হ্য ইল্লাহু হ্য ওয়াহদাহ লা-শারীকা লাহ, ওয়া আল্লা মুহাম্মাদান ‘আবদুর পেরা রসূলুহ’ তারজন্য জানাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জানাতে প্রবেশ করতে পারবে।”^{৭৮}

المسألة السادسة: في نوافذه

ষষ্ঠى ماسআলা: ওয়ু ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

বা ভঙ্গকারী বলবে বুঝায় যে সমস্ত জিনিস ওয়ুকে বাতিল করে এবং তার নষ্ট করে এগুলো হলো মোট ছয়টি:

১. প্রস্তাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু নির্গত হওয়া। নির্গত হওয়া জিনিসটি হচ্ছে পারে প্রস্তাব অথবা পায়খানা অথবা বীর্য, অথবা মায়ি, অথবা ইস্তেহায়ার রক্ত অথবা বায়ু নির্গমন হওয়া, কম বা বেশি হোক। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَابِطِ

“অথবা তোমাদের কেউ প্রস্তাব-পায়খানা হতে আগমন করে।”^{৭৯} সূরা নিন: ৪৩

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন: لَا يَفْيِلُ اللَّهُ صَلَةً أَحَدٍ كُمْ إِذَا أَخْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأُ

“বায়ু বের হলে ওয়ু না করা পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদের কারো সলাত করুল করবেন না।”^{৮০}

অপর হাদীসে এসছে: وَلَكِنْ مِنْ غَابِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ

“এমনকি মলত্যাগ-প্রস্তাব ও ঘুম হতে ওঠার পর ওয়ু করার সময়ও (মোজা না খুলি)।”^{৮১}

^{৭৮} سہیہ مسلم، ہ. ۴۴۱، کুআ. ۲۳۴، ইমাম তিরমিয়ী، ہ. ۶۹۵۴।

^{৭৯} سہیہ বুখারী, ہ. ۶۹۵۴।

^{৮০} আহমদ ২/২৩৯, নামাই ১/৮৩, তিরমিয়ী, ہ. ১৬।

বায়ু নির্গত হয়েছে কিনা এ ব্যাপারে যে সন্দেহ করে, তার ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

فَلَا يَنْصِرُ فَحَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً، أَوْ يَجِدَ رِيحًا

“যতক্ষণ না শব্দ শোনে বা দুর্গন্ধ পায় সে যেন ফিরে না যায়।”^{৮১}

২. শরীরে অন্যান্য অঙ্গ থেকে অপবিত্র জিনিস বের হওয়া। যদি সেটা প্রস্তাব বা পায়খানা হয় তাহলে পূর্বের হাদীসের বক্তব্যের মধ্যে প্রবেশের কারণে সাধারণভাবে ওযু ভেঙে যাবে। যদি প্রস্তাব পায়খানা ব্যতীত অন্যকিছু হয়, যেমন: রক্ত, বমি আর যদি সেটা নোংরা এবং পরিমাণে বেশি হয় তাহলে ওযু করা উত্তম, সতর্কতামূলক। আর যদি পরিমাণে কম হয় তাহলে সকলের ঐকমত্যে ওযু করতে হবে না।

৩. অজ্ঞান হওয়া, অথবা ঘুম এবং তন্ত্রার কারণে সংজ্ঞাহীন হওয়া। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْرٍ

“এমনকি মলত্যাগ-প্রস্তাব ও ঘুম হতে ওঠার পর ওযু করার সময়ও (মোজা না খুলে)।”^{৮২}

তিনি অপর হাদীসে বলেন :

الْعَيْنُ وَكَاءُ السَّهِ^{৮৩}، فَمَنْ تَأْمَ، فَلَيَسْوَضْ

“চক্ষুদ্বয় হচ্ছে পশ্চাত্ত্বারের সংরক্ষণকারী। কাজেই যে ব্যক্তি (চোখ বন্ধ করে) ঘুমায়, সে যেন ওযু করে।”^{৮৪}

তবে পাগলামী, সংজ্ঞাহীনতা, নেশগ্রস্ততা এবং এ জাতীয় কাজের কারণে ওযু ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সকলে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ওযু ভঙ্গকারী নিদ্রা হলো: যে নিদ্রার কারণে ব্যক্তির অনুভূতি অবশিষ্ট থাকে না। সেটা যে প্রকারের নিদ্রাই হোক না কেন।

তবে যদি নিদ্রা কম হয় তাহলে তা ওযু ভঙ্গ করবে না। কেননা সাহাবীদেরকে সলাতের জন্য অপেক্ষায় রেখে তন্ত্রা পেয়ে বসতো। অতঃপর তারা দাড়াতেন, সলাত আদায় করতেন কিন্তু ওযু করতেন না।^{৮৫}

^{৮১} মুফ্ফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ১৩৭, সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ৩৬১।

^{৮২} তিরমিয়ী, হা. ৯৬।

^{৮৩} যে রশি দিয়ে ম্যাপ এবং মশক বাধা হয়।

^{৮৪} إل: الرَّبْرَبْ: তথা নিতহ এর অর্থ হলো জাত্রত অবস্থা, চোখদ্বয় হলো ঐ রশির মত যার আরা বাধা হয়। সুতরাং যখন অজ্ঞান হয়ে যায় তখন এই বঙ্গনও খুলে যায়।

^{৮৫} সুনান আবু দাউদ, হা. ২০৩, ইবনু মাজাহ, হা. ৪৭৭, ইরওয়াউল গালীল: ১/১৪৮।

^{৮৬} সহীহ মুসলিম, হা. ৭১৯, ফুআ. ৩৭৬।

৪. কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই লজ্জাভান স্পর্শ করা। এই মর্মে বুসরা বিনতে সাফওয়্যান বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন: “কেউ নিজ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে যেন ওয়ু করে।”^{৮৭}

অপর হাদীসে আবু আইয়ুব এবং উম্মু হাবীবা বলেন: রসূল ﷺ বলেছেন: مَنْ مَسَّ فَرْجُهُ فَلْيَتَوَضَّأْ: “যে ব্যক্তি তার লজ্জাস্থান প্রশ়ির্ষ করল সে যেন ওষু করে নেয়।”^{৮৮}

৫. উটের গোশত খাওয়া: এই প্রসঙ্গে জাবির বিন সামুরাঃ হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন:

أَتَوْضَأُ مِنْ حُجُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ، قَالَ أَتَوْضَأُ مِنْ حُجُومِ الْأَيْلِ؟ قَالَ: نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ حُجُومِ الْأَيْلِ.

“আমি কি বকরির গোশত খেয়ে ওয়ু করব? তিনি বললেন, তোমার ইচ্ছা ওয়ু করতে পারো আর নাও করতে পারো। সে বলল, আমি কি উটের গোশত খেয়ে ওয়ু করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, উটের গোশত খেয়ে তুমি ওয়ু করবে।”^{৮৯}

৬. মুরতাদ হওয়া বা ইসলাম পরিত্যাগ করা : আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿مَنْ يَكُفِرُ بِالْإِيمَانِ فَقُدْ حَبَطَ عَمَلُهُ﴾

“যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে কুফরী মিশ্রিত করবে তার ‘আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে।’” [সূরা মায়দাহ : ৫]

এ ছাড়াও যে সমস্ত কাজ গোসল ফরয করে সেগুলো ওয়েও ফরয করে তবে মৃত্যু ব্যতীত।

المُسَأَّلَةُ السَّابِعَةُ: مَا يُجِبُ لِهِ الْوَضُوءُ

সপ্তম মাসআলা: যে সকল কাজের জন্য ওয়ু করা ওয়াজির

নিম্নোক্ত কাজগুলোর জন্য শরয়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপরে ওয়ে করা ওয়াজিব:

১. সলাতের জন্য: এই প্রসঙ্গে ইবনু উমার খ্রিস্টান আনুভূতি হতে মারফু সুত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

^৪ সুনান আবু দাউদ, হা. ১৮১, নাসাই, হা. ১৬৩, তিরমিয়ী, হা. ৮২।

^{४८} उस्म शब्दीवार हदीस; इबनु माजाह, अ. ४८१।

^{१०} संस्कृत ग्रन्थालय, श. ६८८, फुआ. ३६०।

لَا يَقْبِلُ اللَّهُ صَلَةً بِغَيْرِ طَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

“পবিত্রতা ব্যতীত সলাত কবুল হয় না। খিয়ানতের সম্পদ থেকে সাদকা কবুল হয় না।”^{১০}

২. বায়তুল্লায় তাওয়াফ করার জন্য: চাই সেটা ফরয অথবা নফল হোক। আল্লাহর রসূল ﷺ তাওয়াফের সময় ওযু করতেন। হাদীসে এসেছে:

فَإِنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ

“তিনি ওযু করে তাওয়াফ সম্পন্ন করেন।”^{১১}

অপর হাদীসে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ

“বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা সলাতই। তবে পার্থক্য হচ্ছে এতে আল্লাহ কথা বলার বৈধতা দিয়েছেন।”^{১২}

এমনকি তিনি হয়ে যা মহিলাদেরকে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে নিষেধ করেছেন^{১৩}।

৩. কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়া কুরআন স্পর্শ করার জন্য। আল্লাহ তা'আলা এই মর্মে বলেন:

لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُظَهَّرُونَ ﴿

“যারা সম্পূর্ণ পবিত্র তারা ছাড়া অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না।”[সুরা ওয়াকিয়া : ৭৯]

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন: لَا يَمْسُسُ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

“পবিত্র ব্যক্তি ব্যতীত কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না।”^{১৪}

^{১০} সহীহ মুসলিম, হ্য. ৪২৩, ফুআ. ২২৪।

^{১১} মুগাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হ্য. ১৬১৪, সহীহ মুসলিম, হ্য. ১২৩৫।

^{১২} ইবনু হিজ্বান: ৩৮৩৬, হাকিম ১/৪৫৯ এবং তিনি সহীহ সানাদে; ইমাম যাহবী, বাযহাকী ৫/৮৭ এবং অন্যান্যরা ঐকমত্য পোষণ করেছেন; শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, ইরওয়া নং ১২১।

^{১৩} মুগাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হ্য. ৩০৫, সহীহ মুসলিম, হ্য. ১২১১।

^{১৪} মুয়াত্তা মালিক: ১/১৯৯, দারাকুতনী: ১/১২১।

المسألة الثامنة: ما يستحب له الوضوء

অষ্টম মাসআলা: যে সকল কাজের জন্য ওযু করা মুশাহাব

নিম্নোক্ত অবস্থাগুলোতে ওযু করা মুশাহাব:

১. আল্লাহর যিকৃ এবং কুরআন পাঠের সময়।

২. প্রত্যেক সলাতের সময়। আল্লাহর রসূল ﷺ নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রত্যেক সলাতের জন্য ওযু করতেন। যেমন আনাস رضي الله عنه হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ إِذَا كُلَّ صَلَاةً

“নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক সলাতের সময় ওযু করতেন।”^{৯৫}

৩. যে অপবিত্র ব্যক্তি পুনরায় সহবাস করতে চায় অথবা খেতে চায়, অথবা ঘুমাতে চায় অথবা পান করতে চায় তার জন্য ওযু করা মুশাহাব। আবু সাঈদ খুদরী হতে এই মর্মে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ

“রসূলমাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হবে তারপর আবার মিলিত হবার ইচ্ছা করবে সে যেন ওযু করে নেয়।”^{৯৬}

আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত।

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَمَّ، وَهُوَ جُنْبٌ، تَوَضَّأَ وَضْوَءَةً لِلصَّلَاةِ، قَبْلَ أَنْ يَنَمَّ

“রসূলমাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাপাকী অবস্থায় যখন ঘুমাতে ইচ্ছা করতেন তখন ঘুমানোর আগে সলাতের জন্য যেমন ওযু করতে হয় তেমন ওযু করতেন।”^{৯৭}

অণ্য বর্ণনায় এসেছে:

فَإِذَا دَرَأَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَمَ

“তখন কিছু খেতে অথবা ঘুমানোর ইচ্ছা করলে।”^{৯৮}

^{৯৫} সহীহ বুখারী, ঘ. ২১৪।

^{৯৬} সহীহ মুসলিম, ঘ. ৫৯৪, ফুআ. ৩০৮।

^{৯৭} সহীহ মুসলিম, ঘ. ৫৮৬, ফুআ. ৩০৫।

^{৯৮} সহীহ মুসলিম, ঘ. ৫৮৭, ফুআ. ৩০৫।

৪. গোসলের পূর্বে ওযু করা। আয়িশাহ আল-বিক্রম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَاحَيْةِ يَدْأُبُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ. ثُمَّ يَفْرُغُ يَمْينَهُ عَلَى شِمَائِلِهِ فَيَغْسِلُ قَرْجَهُ. ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءًا لِلصَّلَاةِ

“রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন অপবিত্রতা থেকে গোসল করতেন তখন প্রথমে দুই হাত ধূতেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি ঢেলে লজ্জাস্থান ধূতেন। তারপর সলাতের ওযুর মতো ওযু করতেন।”^{৯৯}

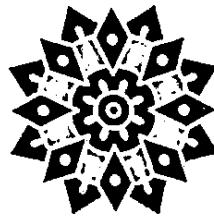
৫. ঘুমের সময়: বারা বিন আযিব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল আল-বিক্রম বলেছেন:

إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقْكَ الْأَيْمَنِ

“যখন তুমি বিছানায় যাবে সলাতের ওযুর মতো ওযু করে নিবে। তারপর ডান পাশে শয়ে পড়বে।”^{১০০}

^{৯৯} সহীহ মুসলিম, খ. ৬০৫, ফুআ. ৩১৬।

^{১০০} সহীহ বুখারী, খ. ২৪৭।



الباب السادس: في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : মোজা, পাগড়ি এবং ক্ষত স্থানের প্লাস্টারের উপর মাসাহ করা

এই অনুচ্ছেদে কিছু মাসআলা রয়েছে:

الخُفُّ: هو ما يلبس على الرِّيشِ من جلد ونحوه

الخُفُّ: চামড়া বা এ জাতীয় কোনো জিনিস পায়ে পরাকে খফ বলা হয়। এর বহুবচন হলো খিফাফ এই অর্থে পশম বা পশম জাতীয় কোনো জিনিস দুই পায়ে পরাকে খফিন বলা হয়।

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: حُكْمُ الْمَسْحِ عَلَى الْخَفَّيْنِ وَدَلِيلُهُ

প্রথম মাসআলা: মোজার উপর মাসাহ করার হ্রন্ম এবং দলীল

আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের ঐকমত্যে মোজার উপর মাসাহ করা বৈধ। এটা আল্লাহ ত'আলার পক্ষ থেকে বান্দাদের উপর এক বিশেষ ছাড়, জটিলতা নিরসন এবং উম্মতের ইজমা এর বৈধতার উপর প্রমাণ করে।

সুন্নাহ থেকে দলীল: মোজার উপর মাসাহ করা ব্যাপারে রসূল ﷺ এর কর্ম, আদেশ এবং ছাড় দেওয়া সংক্রান্ত অনেকগুলো হাদীস মুতাওয়াতিরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আহমাদ বিন হাফল رض বলেন, মোজার উপর মাসাহ করার ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে নাবী رض থেকে ৪০ টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদের কথা:

لَيْسَ فِي قُلُوبِنَا مِنَ الْمَسْحِ شَيْءٌ
এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: আমার অন্তরে মোজার উপর মাসাহ করা বৈধ
হওয়ার ব্যাপারে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই।

হাসান বাসরী (رضي الله عنه) বলেন, রসূল (ﷺ) এর সতরজন সাহাবী আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে,
রসূল (ﷺ) মোজার উপর মাসাহ করেছেন। এ হাদীসগুলোর একটি জাবির বিন আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه)
এর হাদীস। তিনি বলেন,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَّذِي تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفْيَةِ

“আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, তিনি প্রস্তাব করেছেন।
তারপর ওযু করেছেন এবং তার উভয় মোজার উপর মাসাহ করেছেন।”^{۱۰۱}

ইবରাহିମ খেকে আমাশ (رضي الله عنه) বর্ণনা করে বলেন, এই হাদীস মুহাদিসদের আশ্চর্য করতো। কারণ
জাবির (رضي الله عنه) ইসলাম গ্রহণ করেছেন সুরা মায়দাহ অর্থাৎ ওযুর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরে।

ইজমা: আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের সকল আলেম মুকীম এবং মুসাফির, প্রয়োজনে অথবা
অন্য কারণে মোজার উপর মাসাহ করা শরীয়ত সম্মত হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

অনুরূপভাবে সুতার মোজার উপরেও মাসাহ করা জায়েয়। আর সেটা (সুতার মোজা) চামড়ার
মোজা ছাড়া অন্য যে মোজা পায়ে পরা হয়, যেমন: কাপড়ের তেলা বা এ জাতীয় কিছু। বর্তমানে
ঢটাকে শ্রাব বলা হয়। এগুলো চামড়ার মোজার মতো মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।
আর উভয়ের মধ্যকার ୩/୪ বা মূল কারণও একই। বর্তমান চামড়ার মোজার চেয়ে সুতার মোজার
ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতোং সুতার মোজা যদি পা টেকে রাখতে সক্ষম হয় তাহলে তার
উপরেও মাসাহ করা বৈধ।

المسألة الثانية: شروط المسح على الخفين، وما يقوم مقامهما

দ্বিতীয় মাসআলা: মোজার উপর মাসাহ করার শর্তসমূহ এবং তার স্থলাভিষিক্ত
শর্তসমূহ:

১. পবିତ୍ରାବସ୍ଥାয় পରିଧାନ কରା: মୁଗୀରା ବିନ ଶୁ'ବା (رضي الله عنه) হতে বର্ণିତ। তিনি বলেন,

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزَعَ خُفْيَةِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَذْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتِينَ».
فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا

^{۱۰۱} সহীহ মুসলিম, হা. ৫১০, ফুআ. ২৭২, সহীহল বুখারী, হা. ২০০।

“আমি নাবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে কোনো এক সফরে ছিলাম। (ওয়ু করার সময়) আমি তাঁর মোজা দুটি খুলতে চাইলে তিনি বললেন: ‘ও দুটো থাক, আমি পবিত্র অবস্থায় পরেছিলাম। (এই বলে) তিনি তার উপর মাসাহ করলেন।”^{১০২}

২. আবশ্যকীয় স্থান টেকে রাখা: অর্থাৎ পায়ের যে অংশ ধোত করা আবশ্যক তা টেকে রাখা। যদি আবশ্যকীয় অংশের একটুও প্রকাশ পায় তাহলে মাসাহ করা শুধু হবে না।

৩. মোজা বৈধ হওয়া: সুতরাং ছিনতাই করা বা চুরি করা মোজার উপর মাসাহ করা বৈধ হবে না। অনুরূপভাবে পুরুষের জন্য রেশমের মোজার উপর মাসাহ করা বৈধ নয়। কেননা সেটা তার জন্য পরিধান করা পাপ। সুতরাং এর দ্বারা ছাড় গ্রহণ করা বৈধ নয়।

৪. মোজা পবিত্র হওয়া: সুতরাং অপবিত্র মোজার উপর মাসাহ করা বৈধ নয়। যেমন- গাধার চামড়া দিয়ে তৈরী করা মোজা।

৫. শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে মাসাহ করা: আর তা মুকিমের (স্থায়ী বাসিন্দাদের) জন্য একদিন এক রাত ও মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত।

মোজার উপর মাসাহ করা শুধুতার জন্য আলেমগণ এই পাঁচটি শর্ত নাবী ﷺ এর হাদীস এবং সাধারণ নীতিমালা হতে চয়ন করেছেন। সুতরাং মাসাহ করার সময় এগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যিক।

الْمَسَأَةُ الْثَالِثَةُ: كِيفِيَّةُ الْمَسْحِ وَصَفْتِهِ

তৃতীয় মাসআলা: মাসাহ করার পদ্ধতি এবং তার বর্ণনা

শরীয়ত সম্মত মাসাহ হলো- মোজার উপরিভাগ মাসাহ করা। এ ক্ষেত্রে আবশ্যিক হলো, মাসাহ এমনভাবে করতে হবে যাকে মাসাহ বলা হয়। মাসাহ করার পদ্ধতি: মোজার উপরি ভাগের বেশির ভাগে মাসাহ করা। মুগীরা বিন শু'বা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ওযুতে রসূল ﷺ এর মাসাহ করার পদ্ধতি হাদীসে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

رَأَيْتُ النَّبِيًّا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْحُقْبَنِ عَلَى ظَاهِرِهِ

“আমি নাবী ﷺ কে তার মোজা দুটির উপরিভাগ মাসাহ করতে দেখেছি।”^{১০৩}

পায়ের নিচে বা গোড়ালিতে মাসাহ করা যথেষ্ট হবে না। আর সুন্নাতও নয়। আলী رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন:

^{১০২} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ২০৬, সহীহ মুসলিম, হা. ৫১৪, ফুআ. ২৭৪।

^{১০৩} তিরমিয়ী, হা. ৯৮, সহীহ তিরমিয়ী, হা. ৮৫।

لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْحُجُّتْ أُولَئِي بِالْمُسْنِحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَسْحٍ عَلَى ظَاهِرٍ خُفْيَةٍ»

“দীনের মাপকাঠি যদি রায়ের (মানুষের মনগড়া অভিমত ও বিবেক-বিবেচনার) উপর নির্ভরশীল হতো, তাহলে মোজার উপরিভাগের চেয়ে নীচের (তলার) দিক মাসাহ করাই উত্তম হতো। অথচ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর (পায়ের) মোজাদ্বয়ের উপরিভাগ মাসাহ করতে দেখেছি।”^{১০৪}

যদি কেউ উপর এবং নিচ উভয়টায় মাসাহ করে তাহলে সেটা মাকরহ হবে।

المسألة الرابعة: مدته

চতুর্থ مাসআলা: মাসাহ করার সময়কাল

মুকিম (স্থায়ী বাসিন্দা) এবং যে মুসাফিরের জন্য সলাত কসর করা বৈধ নয়, তাদের মাসাহ করার সময়কাল হলো এক দিন এক রাত। আর যে মুসাফিরের জন্য সলাত কসর করা বৈধ, তার মাসাহ করার সময়কাল হলো তিন দিন তিন রাত। আলী رض হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلِيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَبِوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقْبِرِ

“রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরকারীর জন্য তিন দিন তিন রাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং বাড়িতে অবস্থানকারীদের জন্য এক দিন এক রাত।”^{১০৫}

المسألة الخامسة: مبطلاته

পঞ্চম مাসআলা: মাসাহ ভঙ্গকারী বিষয়াবলী

নিরোক্ত কারণে মাসাহ বাতিল হয়ে যাবে-

১. গোসল আবশ্যককারী কোনো কাজ সংগঠিত হলে মাসাহ বাতিল হয়ে যাবে। সফওয়ান বিন আসুসালের হাদীসে এসেছে। তিনি বলেন:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَلَا نَتْرُعْ بِخَفَافِنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلِيَالِيهِنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَاحِهِ

^{১০৪} সুনান আবু দাউদ, খ. ১৬২, বাইহাকী: ১/২৯২।

^{১০৫} সহীহ মুসলিম, খ. ৫২৬, ফুআ. ২৭৬/৮৫।

“রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিতেন, আমরা যেন নাপাকির গোসল ব্যতীত তিন দিন তিন রাত আমাদের মোজা না খুলি। এমনকি মলত্যাগ-প্রস্তাব ও ঘুম হতে ওঠার পর ওয়ু করার সময়ও (মোজা না খুলি)।^{১০৬}

২. চেকে রাখা আবশ্যিক এমন স্থান প্রকাশ পেলে অথবা পায়ের কিছু অংশ প্রকাশ পেলে মাসাহ বাতিল হয়ে যাবে।

৩. মোজাদ্বয় খুলে ফেললে মাসাহ বাতিল হয়ে যাবে। অধিকাংশ আলেমের মতে একটি মোজা খোলা দৃটি মোজা খোলার মতোই।

৪. মাসাহ এর সময় অতিক্রান্ত হলে মাসাহ বাতিল হয়ে যাবে। কারণ শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে মাসাহ এর সময় নির্ধারিত।

সুতরাং হাদীসের বুঝ অনুপাতে নির্ধারিত সময়ের উপরে অতিরিক্ত করা জায়ে হবে না।

المسألة السادسة: ابتداء مدة المسح

ষষ্ঠ মাসআলা: মাসাহ এর সময় শুরু হওয়া

অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হয়ে মোজা পরিধান করার পরে মাসাহ করার সময় শুরু হবে। যেমন: কেউ ফজরের নামাজের জন্য ওয়ু করে মোজা পরিধান করল। সূর্য উদিত হওয়ার পরে সে অপবিত্র হলো কিন্তু ওয়ু না করে একেবারে যোহরের সলাতের পূর্বে ওয়ু করল। সুতরাং তার মাসাহ করার সময় শুরু হবে সূর্য উদিত হওয়ার পরে অপবিত্র হওয়ার সময় থেকে। তবে কিছু কিছু আলেম বলেন: যোহরের সলাতের ওয়ু করার সময় তার মাসাহ করার সময় শুরু হবে।

المسألة السابعة: المسح على الجبيرة والعمامة وخرم النساء

সপ্তম মাসআলা: ভাঙ্গা হাড় যথাস্থানে বসানোর জন্য বেঁধে রাখা কাঠ, পাগড়ি এবং মহিলাদের ওড়নার উপর মাসাহ করা

الجبيرة : কাঠ বা এ জাতীয় জিনিস। যেমন- ভাঙ্গা হাড় যথাস্থানে বসানো এবং জোড়া লাগাতে কাঠ বা তার সমজাতীয় জিনিস দ্বারা ম্যবুত করে প্লাস্টার করা। এর উপর মাসাহ করা হয়। অনুরূপভাবে ব্যান্ডেজ এবং ক্ষত স্থানের উপর দেওয়া প্রতির উপরও মাসাহ করা হয়। এই সকল

কিছুর উপর মাসাহ করা শর্ত সাপেক্ষে জায়েয হবে। শর্ত হলো প্রয়োজন অনুপাতে হতে হবে। যদি প্রয়োজনের বেশি হয় তাহলে অতিরিক্ত অংশ খুলে ফেলতে হবে।

ছেটো অপবিত্রতা অথবা বড়ো অপবিত্রতা যাই হোক না কেন উভয় অবস্থাতেই এগুলোর উপর মাসাহ করা যাবে। এগুলোর উপর মাসাহ করার নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। বরং এগুলো না খোলা পর্যন্ত এবং সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত এগুলোর উপর মাসাহ করা যাবে। এর প্রমাণঃ جبیرة এর উপর মাসাহ করা একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। আর প্রয়োজন তার পরিমাণ নির্ধারণ করে। অতএব দুই অপবিত্রতার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। অনুরূপভাবে পাগড়ির উপর মাসাহ করা বৈধ। আর হলো: যার দ্বারা মাথায় পাগড়ি পরানো হয় এবং মাথায় কাপড় পেঁচানো হয়। এর প্রমাণ হলো মুগীরা বিন শু'বা এর বর্ণিত হাদীস।

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعَمَامَةِ وَعَلَى الْحَقْنَينِ .

“নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়ু করলেন। মাথার সম্মুখভাগ এবং পাগড়ি ও উভয় মোজার উপর মাসাহ করলেন।”^{১০৭}

অপর হাদীসে এসেছে:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْحَقْنَينِ وَالْخِمَارِ

“নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ ﷺ উভয় মোজা ও পাগড়ির উপর মাসাহ করেছেন।”^{১০৮}

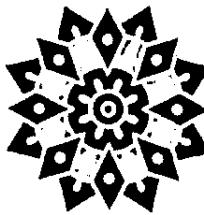
পাগড়ির উপর মাসাহ করার জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। যদি কেউ সতর্কতা অবলম্বন করে, তাহলে সে পাগড়ি পরিধান করার সময় মাসাহ করবে এবং মোজার উপর মাসাহ করার নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে পাগড়ির উপর মাসাহ করবে, সেটাই সুন্দর হবে।

মহিলাদের ওড়না যা দ্বারা মাথা ঢেকে রাখা হয়, উভম হলো তার উপর মাসাহ না করা, তবে যদি ওড়না খুলতে কষ্ট হয় অথবা মাথায় কোনো অসুখ থাকে তাহলে তার উপর মাসাহ করা যাবে।

কেউ মাথায় মেহেদি বা এ জাতীয় কিছু লাগায় তাহলে তার উপর মাসাহ করা জায়েয। মাথা পবিত্র করার ক্ষেত্রে আল্লাহর রসূল ﷺ এর কাজে ব্যাপকতা রয়েছে। আর এই ব্যাপকতায় এই উন্নতের জন্য সুবিধা এবং সহজতা রয়েছে।

^{১০৭} সহীহ মুসলিম, ঘ. ৫২৪; ফুআ. ২৭৪।

^{১০৮} সহীহ মুসলিম, ঘ. ৫২৫; ফুআ. ২৭৫/৮৪।



الباب السابع: في الغسل সপ্তম অনুচ্ছেদ: গোসল

এ অনুচ্ছেদে কিছু মাসআলা রয়েছে:

المسألة الأولى: معنى الغسل، وحكمه، ودليله
প্রথম মাসআলা: গোসলের অর্থ হৃকুম এবং দলীল

১. গোসলের অর্থ: شَبَّاتٌ مَّا سَدَّارٌ গুস্তি মাসদার। এর থেকে নির্গত হলো ফعل হলো: পুরো শরীর ধোত করা।

شرعًا: تعميم البدن بالماء. أو: استعمال ماء ظهور في جميع البدن، على صفة مخصوصة، على وجه التعبّد لله سبحانه.

পরিভাষায় অর্থ: পানি দ্বারা শরীরকে বেষ্টন করে নেওয়া। অথবা আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সারা শরীরে পবিত্র পানি ব্যবহার করা।

২. হৃকুম: ওয়াজিব হওয়ার কারণ পাওয়া গেলে গোসল করা ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطْهِرُوا﴾

“যদি তোমরা অপবিত্র থাকো, তাহলে (বিশেষভাবে গোসল করে) পবিত্র হও।” [সূরা মায়দাহ: ৬]

আল্লাহর রসূল ﷺ এর কিছু সাহারী থেকে গোসল সফলিত কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সে হাদীসগুলো গোসল ওয়াজিবের উপর প্রমাণ করে। (অচিরেই কিছু অংশ আলোচনায় আসবে ইনশা-আল্লাহ)

৩. ফরয গোসলের ক্ষেত্রসমূহ: নির্জান্ত কারণে গোসল ফরয হয়:

১. লজ্জাস্থান থেকে বীর্য নির্গত হওয়া: শর্ত হলো নারী অথবা পুরুষের লজ্জাস্থান থেকে কামভাবের সাথে বীর্যপাত হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنْبًا فَأَظْهِرُوا﴾

“যদি তোমরা অপবিত্র থাকো, তাহলে বিশেষভাবে (গোসল করে) পবিত্র হও।” [সূরা মাযিদাহ : ৬]

আল্লাহর রসূল ﷺ আলী ﷺ কে বলেন:

إِذَا فَضَّحَتِ الْمَاءُ ۖ فَاغْسِلْ

“বীর্য নির্গত হলে গোসল করবে।”^{১১০}

ঘুমন্ত ব্যক্তির জন্য কামভাব শর্ত নয়। কেননা ঘুমন্ত ব্যক্তি কখনো কখনো তা অনুভব করতে পারে না। এই প্রসঙ্গে আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল:

هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ عُنْسِلٍ إِذَا اخْتَلَمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ"

“মহিলাদের যখন স্বপ্নদোষ হয় তখন কি তার উপর গোসল করা জরুরি? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: হ্যাঁ, যখন সে বীর্য দেখবে।”^{১১১}

২. বিনা প্রতিবন্ধকতায় পুরুষের লজ্জাস্থানের অগ্রভাগ মহিলার লজ্জাস্থানে প্রবেশ করাঃ যদিও বীর্যপাত না হয়। এই প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِذَا جَلَسَ يَنْ شَعِيْهَا الْأَرْضَيْمَ وَمَسَ الْجِنْبَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسلُ

“যখন কোনো পুরুষ স্ত্রীর চার হাত-পায়ের মাঝখানে বসবে এবং একের লজ্জাস্থান অপরের লজ্জাস্থানকে স্পর্শ করবে তখন গোসল ফরয হবে।”^{১১২}

তবে ১০ বছরের কম বয়সী ছেলে এবং ৯ বছরের কম মেয়ের এই অবস্থায় গোসল ফরয হবে না।

৩. কাফের ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ, যদিও সে মুরতাদ হয়। নাবী ﷺ ক্রায়স বিন আসেমকে ইসলাম গ্রহণের সময় গোসল করার নির্দেশ দিয়ে ছিলেন।^{১১৩}

^{১০১} পানি সজোরে নির্গত হওয়া। উদ্দেশ্য হলো: বীর্যপাত।

^{১০২} সুনান আবু দাউদ, হ্য. ২০৬।

^{১০৩} সন্থীহ মুসলিম, হ্য. ৫৯৯, ফুআ. ৩১৩।

^{১০৪} সন্থীহ মুসলিম, হ্য. ৬৭২; ফুআ. ৩৪৯।

^{১০৫} সুনান আবু দাউদ, হ্য. ৩৫৫, নাসাই, হ্য. ১/১০৯, তিরমিয়ী, হ্য. ৬০৫।

৪. হায়ে এবং নিফাসের রক্ত বন্ধ হওয়া: আয়িশাহ হতে বর্ণিত, নাবী ফাতিমা বিনতে কুয়স কে বললেন:

إذا أقبلت الحية، فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتنم وصل

“হায়ে শুরু হলে সলাত ছেড়ে দেবে। আর হায়ে শেষ হলে গোসল করে সলাত আদায় কৰবে।”^{১১৪}

সকলের একমতে নিফাস, হায়য়ের মতো।

৫. মারা যাওয়া: আল্লাহর রসূল ﷺ এর মেয়ে যাইনাব মারা গেলে তাকে গোসল দেওয়ার হাদীসে বলেন: তাকে গোসল দাও।^{১৪} তিনি মুহরিমদের ব্যাপারে বলেন: اغسلوه بماءِ اغسلنها - তাঁকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল দাও।^{১৫} এই গোসল ছিল ইবাদত স্বরূপ (অপবিত্রতার জন্য নয়)।

এই গোসলটা যদি অপবিত্রতার কারণেই হতো, তাহলে গোসলের কারণ(মৃত্যু হওয়া) অবশিষ্ট থাকার পরেও অপবিত্রতার ছক্ষু ওঠে যেত না (বরং এই গোসলের ছক্ষু ইবাদাতের জন্য)।

المأساة الثانية: في صفة الغسل وكيفيته

জুনুবী অবস্থায় (অপবিত্র অবস্থা) গোসলের দুটি পদ্ধতি রয়েছে। ১. **কيفية استحباب** তথা
(মস্তাহাব পদ্ধতি) ২. **كيفية إحياء**^{১৭} তথা (যথেষ্ট পদ্ধতি)

کیفیۃ استحباب (مُسْتَحْبَاتُ وَمُنْهَبُاتُ): پ্রথমে دুই হাত এবং লজ্জাস্থানে থাকা ময়লা ধোত করা। অতঃপর সলাতের ওয়ুর মতো ওয়ু করা। এরপর হাতে পানি নিয়ে মাথার চুলের গোড়ায় খিলাল করা যাতে চুলের গোড়ায় পানি পৌছে যায়। অতঃপর তিন চুলু পানি মাথায় দিয়ে সারা শরীরে পানি প্রবাহিত করা। এটা বর্ণিত হয়েছে আয়িশাহ رض এর হাদীসে।

কীভাবে যথেষ্ট পদ্ধতি: মায়মনা প্রস্তর এর হাদিসানুপাতে প্রথমে নিয়তের সাথে সারা শরীরে পানি প্রবাহিত করা। তিনি (মায়মনা প্রস্তর) বলেন:

^{११४} भट्टाचार्य कल्प आलाइहि: सहीत्तल बथारी, श. ३२०, सहीह मसलिम, श. ३३३।

^{११२} मन्त्रालयकर्त्ता आलाइट्टि; सहीतुल बखारी, श. १२५३, सहीह मसलिम, श. १३९।

^{११६} युद्धाकान आलाइटि; सहीत्तल बधारी, हा. १२६६, सहीत मस्तिम, हा. ११०६।

^{۱۱۹} : যাত্র মধ্যে শুধ ওয়াজিব গোসল অন্তর্ভুক্ত থাকে।

যার মধ্যে ওয়াজির এবং মন্ত্রিবাব উভয় গোসল অন্তর্ভুক্ত থাকে।

«وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصُوَرًا لِجَنَابَةِ، فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى شَمَائِلِهِ مَرَتَّبَنِ أَوْ ثَلَاثَاتَنِ، ثُمَّ غَسَلَ قَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوِ الْحَائِطِ، مَرَتَّبَنِ أَوْ ثَلَاثَاتَنِ، ثُمَّ مَضَمَضَ وَاسْتَشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَسْحَى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ» قَالَتْ: «فَاتَّيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ بِنَفْصِ بِيَدِهِ»

“আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাবাতের গোসলের জন্য পানি রাখলেন। তারপর দুইবার বা তিনবার ডান হাত দিয়ে বাম হাতের উপর পানি ঢাললেন এবং তাঁর লজ্জাস্থান ধোত করলেন। তারপর তাঁর হাত মাটিতে বা দেওয়ালে দুইবার বা তিনবার ঘষলেন। পরে তিনি কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন এবং চেহারা ও দুই হাত ধোত করলেন। তারপর তাঁর মাথায় পানি ঢাললেন এবং তাঁর শরীর ধুলেন। অতঃপর একটু সরে গিয়ে তাঁর দুই পা ধোত করলেন। মাইমুনাহ رض বলেন: অতঃপর আমি একখণ্ড কাপড় দিলে তিনি তা নিলেন না, বরং নিজ হাতে পানি ঝেড়ে ফেলতে থাকলেন।”^{১১৮}

এমন বর্ণনা আয়িশাহ رض বর্ণিত হাদীসেও এসেছে। তিনি বলেন,

“ثُمَّ يَجْلِلُ شَعْرَهُ بِيَدِهِ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَزْوَى بَسْرَتَهُ، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ”
“অতঃপর তাঁর হাত দিয়ে চুল খিলাল করলেন। চামড়া ভিজেছে বলে যখন তিনি নিশ্চিত হতেন, তখন তাতে তিনবার পানি ঢালতেন। তারপর সমস্ত শরীর ধুয়ে ফেলতেন।”^{১১৯}

অপবিত্রতার গোসলে মহিলাদের চুলের ঝুটি খোলা ওয়াজিব নয় অনুরূপ ভাবে হায়েয়ের গোসলেরও তা খোলা ওয়াজিব নয়। উশু সালামা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজেস করলাম:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشْدُ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: لَا. إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَخْبِي عَلَى رَأْسِكِ
ثَلَاثَ حَيَّاتٍ ثُمَّ تُفِيظِينَ عَلَيْكَ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ

“হে আল্লাহর রসূল! আমি তো মাথায় চুলের বেনী গেঁথে থাকি। সুতরাং অপবিত্রতার গোসলের সময় কি আমি তা খুলব? তিনি বললেন: না। বরং তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তুমি মাথার ওপর তিন আজলা পানি ঢেলে দিবে। অতঃপর সারা শরীরে পানি ঢেলে দিয়ে পবিত্র হয়ে যাবে।”^{১২০}

^{১১৮} মুস্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ২৭৪, সহীহ মুসলিম, হা. ৩১৭।

^{১১৯} মুস্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ২৭২, সহীহ মুসলিম, হা. ৩১৬।

^{১২০} সহীহ মুসলিম, হা. ৬৩১, ফুআ. ৩৩০।

المَسْأَلَةُ التَّالِيَّةُ: الْأَغْسَالُ الْمُسْتَحْبَةُ

তৃতীয় মাসআলা: মুস্তাহাব গোসলসমূহ

ওয়াজিব গোসলের আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। এ পর্যায়ে সুন্নাত এবং মুস্তাহাব গোসলের আলোচনা করা হবে। সেগুলো হলো:

১. প্রত্যেক সহবাসের সময় গোসল করা। রাফি বিন খাদিজ থেকে বর্ণিত।

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ، يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ» ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَجْعَلُهُ عُسْلًا وَاجِدًا، قَالَ: «هَذَا أَرْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ»

“নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন তাঁর স্ত্রীদের নিকট গেলেন এবং প্রত্যেক স্ত্রীর নিকটই গোসল করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি সবশেষে একবার গোসল করলেই তো পারতেন? তিনি বললেন: এরূপ করাই অধিকতর পবিত্রতা, উৎকৃষ্টতা ও পরিচ্ছন্নতার পরিচায়ক।”^{১১১}

২. জুমআর দিনে গোসল করা। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ

“তোমাদের মধ্যে কেউ জুমআর সলাতে আসলে সে যেন গোসল করে।”^{১১২}

এটা মুস্তাহাব গোসলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

৩. দুই ঈদের সলাতের জন্য গোসল করা।

৪. হাজ্জ-উমরাহ ইহরামের সময় গোসল করা। আল্লাহর রসূল ﷺ এ সময়ে গোসল করতেন।

৫. মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিলে গোসল করা। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا، فَلْيَغْتَسِلْ

“যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল দিবে, সে যেন নিজে গোসল করে।”^{১১৩}

^{১১১} সুনান আবু দাউদ, হা. ২১৯, ইবনু মাজাহ, হা. ৫৯০।

^{১১২} সহীহল বুখারী, হা. ৮৭৭।

^{১১৩} ইবনু মাজাহ, হা. ১৪৬৩।

المسألة الرابعة: الأحكام المترتبة على من وجب عليه الفصل

চতুর্থ মাসআলা: গোসল ওয়াজির হওয়া ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য লক্ষণসমূহ
সুবিন্যস্ত আহকামের সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

১. মুসাফির না হলে তার জন্য মসজিদে অবস্থান করা জায়েয নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾

“গোসল জরুরি হলে তা সমাপ্ত না করে সলাতের জন্য দণ্ডায়মান হয়ো না। কিন্তু মুসাফির
অবস্থার কথা স্থতন্ত্র।”[সূরা নিসা : ৪৩]

মুসাফির যদি ওয়ু করে তাহলে তার জন্য মসজিদে অবস্থান করা জায়েয। এই বিষয়ে আল্লাহর
রসূল ﷺ এর যুগে কিছু সাহাবী হতে একথা প্রমাণিত হয়েছে। কারণ ওয়ু অপবিত্রতাকে
হালকা করে। আর ওয়ু হলো দুটি পবিত্রকারীর একটি।

২. তার জন্য মুসহাফ (কুরআন মাজীদ) স্পর্শ করা বৈধ নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُظَهَّرُونَ﴾

“যারা পৃত ও পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না।”[সূরা ওয়াকিয়াহ : ৭৯]

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন: لا يمسه المصحف إلا ظاهر

“পবিত্রতা ব্যতীত কেউ মুসহাফ (কুরআন) স্পর্শ করে না।”^{১২৪}

৩. তার জন্য কুরআন পাঠ করা বৈধ নয়। সুতরাং অপবিত্র ব্যক্তি গোসল না করা পর্যন্ত কুরআন
পাঠ করবে না। আলী رض হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا الْجَنَابَةُ

“নাবী ﷺ কে অপবিত্রতা ব্যতীত আর কিছুতেই কুরআন পড়তে নিষেধ করেননি।”^{১২৫}

কুরআন পাঠ নিষেধের কারণ হলো, দ্রুত গোসলের প্রতি উৎসাহিত করা এবং কুরআন পাঠের
প্রতিবন্ধকতাকে দূর করা। এ ছাড়াও তার উপর হারাম হলো:

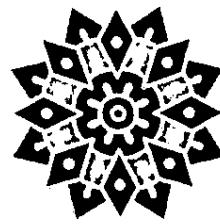
৪. সলাত আদায় করা।

৫. বায়তুল্লার তাওয়াফ করা।

যার আলোচনা ইতোমধ্যে ওয়ুর পঞ্চম অধ্যায়ে চলে গেছে।

^{১২৪} মুয়াজ্ঞা মালেক: ৪৬৮, মুসতাদুরাকে হাকিম: ৩/৪৮৫; আলবালী সহীহ বলেছেন, ইরওয়া ১২২। কুরআন শব্দ রয়েছে।

^{১২৫} আহমদ : ১০১৪, ইবনু মাজাহ, হ্য. ৫৯৪, তিরমিয়ী, হ্য. ১৪৬, ইমাম তিরমিয়ি হাসান সহীহ বলেছেন।



الباب الثامن: في التيميم অষ্টম অনুচ্ছেদ: তায়ামুম

এই অনুচ্ছেদে কিছু মাসআলা রয়েছে:

তায়ামুমের আভিধানিক অর্থ: ইচ্ছা করা।

شرعًا: هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب، على وجه مخصوص؛ تعبدًا لله تعالى.

পরিভাষায়: আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পবিত্র মাটি দ্বারা দুই হাত এবং চেহারা মাসাহ করাকে তায়ামুম বলা হয়।

المسألة الأولى: حكم التيمم ودليل مشروعيته

প্রথম মাসআলা: তায়ামুমের হুকুম এবং তা শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল

তায়ামুম শরীয়ত সম্মত। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের প্রতি এক বিশেষ ছাড়। এটা এই শরীয়তের একটি অন্যতম সৌন্দর্য এবং এই উন্নতের একটি বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُتِمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيهِكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَارْجِلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاقْطَهِرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَابِطِ أَوْ لَمْ مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيهِكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكُنْ يُرِيدُ لِيُظْهِرَكُمْ وَلَيُتَمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ﴾

“হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা সলাতের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধোত করো; তোমাদের মাথা মাসাহ করো; পা টাখনু পর্যন্ত ধোত করো। আর যদি তোমরা অপবিত্র থাকো, তাহলে বিশেষভাবে (গোসল করে) পবিত্র হও। যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের কেউ প্রস্ত্রাব-পায়খানা হতে আগমন করে, অথবা তোমরা স্তৰী-সহবাস করো এবং পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়ামুম করো;

তা দিয়ে তোমাদের মুখ্যমণ্ডল ও হন্তদ্বয় মাসাহ করো। আল্লাহ তোমাদেরকে কোনো প্রকার কষ্ট দিতে চান না বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।” [সূরা মায়িদাহ : ৬]

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ كَافِيكَ وَإِنْ لَمْ تَجِدْ الْمَاءَ عَشَرَ حَجَّاجَ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأْمِسْهُ بِشَرْتِكَ

“পবিত্র মাটিই যথেষ্ট, যদি দশ বছরেও পানি না পাওয়া যায়। অতঃপর যখন পানি পেয়ে যাবে তখন পানি ব্যবহার করবে।”^{১২৬}

অপর হাদীসে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

جُعِلْتُ لِي الْأَرْضُ مَسِيْدًا وَطَهُورًا

“সমস্ত জমিন আমার জন্য সলাত আদায়ের উপযোগী ও পবিত্র করা হয়েছে।”^{১২৭}

যখন তায়াম্মুম করার শর্তসমূহ পাওয়া যাবে তখন তায়াম্মুম করা শরীয়ত সম্মত এই প্রসঙ্গে আলেমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তায়াম্মুম পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের স্থলাভিষিক্ত হবে। ফলে তায়াম্মুমের দ্বারা ঐ সব কাজ করা বৈধ হবে যে সব কাজ ওয়ার দ্বারা করা হয়। যেমন: সলাত আদায়, তাওয়াফ করা, কুরআন পাঠ করা ইত্যাদি।

সুতরাং কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা দ্বারা তায়াম্মুম শরীয়ত সম্মত হওয়া সাব্যস্ত হলো।

الْمَسَأَةُ الثَّانِيَةُ: شُرُوطُ التَّيِّمِ، وَالْأَسْبَابُ الْمُبِيْحَةُ لَهُ

দ্বিতীয় মাসআলা : তায়াম্মুমের শর্তসমূহ এবং তার বৈধ কারণসমূহ

পানি ব্যবহারে অপারগতার সময় তায়াম্মুম করা বৈধ। এই অপারগতাটা হতে পারে পানি না থাকার কারণে অথবা শারীরিক অসুস্থতার দরুণ পানি ব্যবহার করলে ক্ষতি হতে পারে এই আশংকায় অথবা কঠিন ঠাণ্ডার কারণে। এই মর্মে ইমরান বিন হসাইন হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রসূল ﷺ বলেছেন: عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ، فَإِنَّهُ يُكْفِيكَ

“পবিত্র মাটি নাও (তায়াম্মুম করো), এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট।”^{১২৮}

^{১২৬} মুসনাদ আবু দাউদ, তুমালিসী ৩২৯, তিরমিয়ী, হা. ১২৪। (দ্বিতীয় শব্দে কোনো হাদীস ছাই পাওয়া যায়নি। অন্যান্য শব্দে বহু হাদীস গ্রহে রয়েছে। সুনান আবু দাউদ, হা. ৩৩২; সুনান নাসাই, হা. ৩২২; মুসনাদে আহমাদ, ১৮৮৮২-অনুবাদক)।

^{১২৭} সংহীল বুখারী, হা. ৩৩৫।

^{১২৮} মুগ্ধাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৩৪৪, সহীহ মুসলিম, হা. ৬৮২ (الطَّيِّب) শব্দটি সহীহল বুখারিতে নেই। সুনানুস সাগীর, বায়হাকী, হা. ২৪৬।

একটু পরে এর বিষ্ণারিত আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

নিম্নোক্ত শর্তের মাধ্যমে তায়াম্মুম সহীহ হবে:

১. ﴿نِيَّا﴾ নিয়ত করা) এটা হলো সলাতকে বৈধ করার নিয়ত। নিয়ত সকল ইবাদতের পূর্ব শর্ত।
আর তায়াম্মুম হলো একটি ইবাদত।

২. لَامٌ (মুসলিম হওয়া) কাফেরের তায়াম্মুম সহীহ হবে না। কেননা এটা একটি ইবাদত।

৩. العَقْل (জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া) সুতরাং কোনো জ্ঞানহীন ব্যক্তির তায়াম্মুম বৈধ হবে না। যেমন-
পাগল, অজ্ঞান ব্যক্তি।

৪. التَّمِيز (ভালো মন্দের পার্থক্যকারী): সুতরাং যে ভালো মন্দের পার্থক্য করতে সক্ষম নয়,
তার জন্য তায়াম্মুম করা সহীহ হবে না। আর এটা সাত বছরের কম বয়সের ক্ষেত্রে হয়।

৫. تَعْذِيرِ اسْتِعْمَالِ الْمَاء (পানি ব্যবহারে অপারগতা): এটা হতে পারে পানি না থাকার কারণে।
আল্লাহ তা'আলা এই মর্মে বলেন:

﴿فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَبَيَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا﴾

“অতঃপর যদি পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো।” [সূরা মায়দাহ : ৬]

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيْبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِينِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ قَلِيلًا سَبَرَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ.

“পবিত্র মাটি মুসলিমদের জন্য পবিত্রতাকারী, যদিও সে দশ বছর ধরে পানি না পায়। যখন সে
পানি পাবে নিজের শরীরে ঘেন পানি পৌছায় (গোসল করে)। এটাই উচ্চম।”^{১২৯}

অথবা পানি ব্যবহারে ক্ষতির ভয়ে। হয়তো পানি ব্যবহারের কারণে অসুস্থতা বৃদ্ধি পাবে অথবা সুস্থ হতে
বেশি সময় লাগবে। এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿وَإِنْ كُثُّمْ مَرْضِىٌ﴾ (যদি তোমরা পীড়িত হও)
আল্লাহর রসূল ﷺ মাথা ফাটা ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলেন:

﴿فَتُلْوُهُ فَتَلْهُمُ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فِيمَا شَفَأَهُ اللَّهُ بِالْسُّؤَالِ﴾

“এরা লোকটিকে হত্যা করেছে। আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন! না জানলে কেন জিজেস করল না?
নিশ্চয়ই অজ্ঞতার প্রতিষেধক হলো জিজেস করা।”^{১৩০}

অথবা খুব ঠাণ্ডার কারণে ক্ষতি হতে পারে। অথবা পানি ব্যবহারের কারণে মারা যেতে পারে
এই ভয়ে। আমর বিন আস খুলুম হতে বর্ণিত:

^{১২৯} তিরমিয়ী, হা. ১২৪।

^{১৩০} সুনান আবু দাউদ, হা. ৩৩৭, ইবনু মাজাহ, হা. ৫৭২।

أَنْهُ لَا بَعْثٌ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلَالِيْلِ قَالَ: أَخْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةَ بَارِدَةَ شَدِيدَةَ الْبَرْزِدِ، فَأَشَفَقْتُ إِنْ أَغْتَسَلُ أَنْ أَهْلَكَ فَتَيَّمْتُ وَصَلَّيْتُ بِأَضْحَائِي صَلَاةَ الصَّبَحِ...

“তিনি যাতুস-সালাসিল যুক্তে প্রেরিত হন। তিনি বলেন, এ সময় খুব শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়। আমার ভয় হলো, আমি যদি গোসল করি তাহলে ক্ষতিগ্রস্থ হবো। তাই আমি তায়ান্ত্র করে লোকদের সাথে সলাত আদায় করলাম।...”^{১৩১}

৬. পৰিত্র মাটি দিয়ে তায়ান্ত্ৰম কৱতে হবে। অপৰিত্র মাটি (যেমন- এমন মাটি যাতে প্ৰস্তাৱ লেগেছে আৱ সেটা পৰিত্র কৱা হয়নি।) এগুলো দিয়ে তায়ান্ত্ৰম সহীহ হবে না। যদি ধূলা যুক্ত মাটি পাওয়া যায় তাহলে তা নিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَتَيَمِّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَامسحُوا بِيُوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾

“তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াস্তুম করো; তা দিয়ে তোমাদের মুখমণ্ডল ও ইষ্টব্রহ্ম যাসাহ করো।”
[সর্বা মায়িদাহ : ৬]

ইবনু আববাস رض বলেন, الصعيد-الطيب-পবিত্র। যদি মাটি না পায় তাহলে বালু ঘন্ট পাথর দিয়ে তায়ান্ত্রম করা যাবে। আক্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا أَسْتَطَعْتُمْ﴾

“সাধ্যনয়ায়ী আলাহকে ভয় করো !” সুরা তাগাবন: ১৬।

আওয়ায়ী বলেন: من الصعب تثبيت الرمل، خلأه من الماء.

المسألة الثالثة: مبطلات التيمم

তৃতীয় মাসআলা: তায়াম্বুম ভঙ্গকারী বিষয়াদি

যে বিষয়গুলো তামান্ত্রিকভাবে করে সেগুলো তিনটি:

১. ওয়ু ভঙ্গকারী ছোটো অপবিত্রতা এবং গোসল আবশ্যককারী বড়ো অপবিত্রতা যেমন সহবাস, হয়ে, নিফাস দ্বারা তায়ান্ত্রম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি কেউ ছোটো অপবিত্রতা হতে তায়ান্ত্রম করে অতঃপর প্রশ্নাব করে অথবা পায়খানা করে তাহলে তার তায়ান্ত্রম বতিল হয়ে যাবে। কারণ

১০৩ আইনাদ: ৪/২০৩, সুনাম আবু দাউদ, শ. ৩৩৪।

তায়ান্ত্রম হলো ওয়ুর পরিবর্তে। আর পরিবর্তিত বিষয়ের বিধান যার সাথে পরিবর্তন করা হয়েছে তার মতেই। অনুরূপভাবে বড়ো অপবিত্রতার কারণেও তায়ান্ত্রম বতিল হয়ে যাবে।

২. পানি পাওয়া গেলে: যদি পানি না থাকার কারণে তায়াম্বুম করা হয় তাহলে পানি পাওয়ার
সাথে সাথে তায়াম্বুম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمْسِهُ بِشَرْتَكِ

“যখন সে পানি পাবে নিজের শরীরে যেন পানি পৌছায়।”

৩. যে অপারগতার কারণে তায়াস্মুম করা শরীয়ত সম্ভব হয়েছে, সে অপারগতা দূর হয়ে গেলে তায়াস্মুম ভেঙ্গে যাবে। যেমন- অসুস্থতা।

المسألة الرابعة: صفة التيمم

চতুর্থ মাসআলা: তায়াশ্বুমের পদ্ধতি

পদ্ধতি: প্রথমে নিয়ত করবে অতঃপর বিসমিল্লাহ বলে দুই হাত মাটিতে একবার মারবে। অতঃপর দুই হাতে ফুঁ-দিয়ে দুই হাত দ্বারা চেহারা এবং দুই হাতের কঙ্গি পর্ণন্ত মাসাহ করবে।

ଆମାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏର ହାଦୀସେ ଏସେହେଁ

الْتَّعْمُضَرْبَةُ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ

“তায়ান্ত্রমে মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের জন্য একবার (তায়ান্ত্রমের বস্ত্রের উপর হাত) মারতে হবে।”^{১৩২}

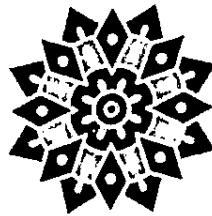
আম্বারের অপর হাদীসে এসেছে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيَكَ أَنْ تَضَعَ هَكُذا، فَضَرَبَ بِكَفِهِ ضَرِبَةً عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ تَفَضَّلَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهَرَ كَفِهِ بِشَكَالِهِ أَوْ ظَهَرَ شَكَالِهِ بِكَفِهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ.

“তোমার জন্য তো এটুকুই যথেষ্ট ছিল- এই বলে- তিনি দুই হাত মাটিতে মারলেন, তারপর তা ঘেড়ে নিলেন এবং তা দিয়ে তিনি বাম হাতে ডান হাতের পিঠ মাসাহ করলেন। (কিংবা রাবী বলেছেন) বাম হাতের পিঠ ডান হাতে মাসাহ করলেন। তারপর হাত দুটো দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল মাসাহ করলেন।”^{১৩৩}

১০২ আহমদ : ৪/২৬, সুনান আবু দাউদ, শ. ৩২৭।

¹⁰⁰ मुहाफ़ाकन आज्ञाइदि: सहील बचानी, श. ३४७, सहीह मुसलिम, श. ३६८।



الباب التاسع: في النجاسات وكيفية تطهيرها নবম অনুচ্ছেদ : অপবিত্রতা এবং তার থেকে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি

এই অনুচ্ছেদে কিছু মাসআলা রয়েছে:

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: تعریف النجاست، ونوعاها

প্রথম মাসআলা: অপবিত্রতার পরিচয় ও প্রকারভেদ

النجاست (অপবিত্রতা) : প্রত্যেক ময়লা জিনিস যা থেকে শরীয়ত প্রণেতা বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তাকে **نجاست** (অপবিত্রতা) বলা হয়।

জনস্তুতি প্রকার:

১. **প্রকৃত অপবিত্রতা:** যে জিনিসের মূল অপবিত্র হওয়ার কারণে কোনো অবস্থাতেই তা পবিত্র হয় না তাকে **نجاست حقيقة** বা প্রকৃত অপবিত্রতা বলা হয়। যেমন- গাধার গোবর, রক্ত, প্রস্তাব।

২. **বিধানগত অপবিত্রতা:** এটা বস্তু বিষয়ক অপবিত্রতা। যা শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট। এই অপবিত্রতা সলাত হতে বাধা প্রদান করে।

এই প্রকার অপবিত্রতা **(حدث أصفر)** (ছেটো অপবিত্রতা) কে অন্তর্ভুক্ত করে যা ওয়ুর মাধ্যমে দূর হয়ে যায়। যেমন পায়খান। এবং **-حدث أكابر** -কে ও অন্তর্ভুক্ত করে, যা গোসলের মাধ্যমে দূর হয়। যেমন-জানাবাতের অপবিত্রতা।

যে জিনিসের দ্বারা অপবিত্রতা দূরীভূত হয় তার মূল হলো পানি। এটাই হলো পবিত্রতা অর্জনের প্রধান মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَيُنَزَّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُظْهِرَ كُمْ بِهِ﴾

“আকাশ থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন যাতে এর মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করেন...।” [সূরা আনফাল: ১১]

نِجَاسَةٌ تِينَةٌ

نِجَاسَةٌ مَغْلَظَةٌ বা কঠিন অপবিত্রতা: সেটা হলো কুকুরের অপবিত্রতা। এবং তার থেকে সৃষ্টি অপবিত্রতা।

نِجَاسَةٌ مَخْفَفَةٌ বা হালকা অপবিত্রতা: খাবার থেতে শেখেনি এমন বাচ্চা ছেলের প্রশ্নাব।

نِجَاسَةٌ مَتْوَسِّطَةٌ বা মধ্যম অপবিত্রতা: উপরের দুটি ব্যতীত অন্যান্য অপবিত্রতা। যেমন প্রশ্নাব, পায়খানা, মৃত প্রাণী ইত্যাদি।

الْمَسَأَةُ الْثَانِيَةُ: أَشْيَاءُ الَّتِي قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى نِجَاسَتِهَا

দ্বিতীয় মাসতালা: যে জিনিসগুলো অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

১. মানুষের প্রশ্নাব, পায়খানা এবং বর্মি: তবে খাবার থেতে পারে না এমন ছেলে শিশুর প্রশ্নাব ব্যতীত। তার প্রশ্নাবের উপর পানির ছিটা দিলে তা পবিত্র হয়ে যাবে। এই প্রসঙ্গে উন্মু ক্লাইস বিনতে মেহসান থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন:

أَتَتْ يَابْنِ هَمَّا صَغِيرٍ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجْرِهِ، فَبَأَلَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَاهُ بَيْمَاءُ، فَضَصَحَّهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ

“তিনি তাঁর এমন একটি ছোটো ছেলেকে নিয়ে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর নিকট এলেন যে তখনো খাবার থেতে শেখেনি। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশুটিকে তাঁর কোলে বসালেন। তখন সে তাঁর কাপড়ে প্রশ্নাব করে দিল। তিনি পানি আনিয়ে এর উপর ছিটিয়ে দিলেন এবং তা ধোত করলেন না।”^{১৩৪}

তবে যে ছেলে শিশু খাবার খায় সে এবং মেয়ে শিশুর প্রশ্নাবের হ্রকুম হবে বড়ো মানুষের প্রশ্নাবের হ্রকুমের ন্যায়।

^{১৩৪} সঞ্চীত বুখারী, ঘ. ২২৩, نَصْجَعَ : পানির ছিটা দেওয়া, পানি ঢেলে দেওয়া।

২. গোশত খাওয়া হয় এমন প্রাণির প্রবাহিত রক্ত। তবে যে রক্ত গোশত এবং রগের মধ্যে অবশিষ্ট থাকে তা পবিত্র। আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ [সূরা আনআম: ১৪৫]।

৩. গোশত খাওয়া হয় না এমন প্রাণির গোবর এবং প্রস্ত্রাব। যেমন- বিড়াল, ইঁদুর।

৪. মৃত প্রাণী: এগুলো হলো: যে প্রাণীগুলো শরীরী পছায় জবাই করা ছাড়াই স্বাভাবিক ভাবে মারা গিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿لَا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ [সূরা আনআম: ১৪৫]

তবে এর থেকে মৃত মাছ, টিঙ্গি এবং যে প্রাণির দেহে রক্ত প্রবাহিত হয় না, তাকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। কারণ এগুলো পবিত্র।

৫. মায়ী (তরল শুক্রবস) নির্গত হওয়া। এটা হলো আঠালো পাতলা পানি যা খেলা-ধূলা বা সহবাসের চিন্তা-ভাবনার সময় নির্গত হয়। এটা উচ্চেজনা সহকারে এবং সজোরে নির্গত হয় না। এটা নির্গত হলে শরীরে শিথিলতা আসে না। কখনো কখনো এটা বের হওয়ার কথা অনুভব করাও যায় না। এটা নাপাক। আল্লাহর রসূল ﷺ আলীকে ঝুঁকিয়ে বলেন:

“তোমরা মায়ী হতে ওযু করো এবং পুরুষাঙ্গ ধৌত করো।”^{১৩৫}

এই ক্ষেত্রে হালকা করণ এবং কষ্ট লাঘবের জন্য গোসল করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। কেননা এটা এমন জিনিস যার থেকে সতর্ক থাকা কষ্টকর।

৬. ওয়াদই: এটা হলো- ঘন সাদা পানি, যা প্রস্তাবের পরে বের হয়। যে ব্যক্তির এটা নির্গত হবে, সে লজ্জাস্থান ধৌত করে ওযু করবে। গোসল করতে হবে না।

৭. হায়েয়ের রক্ত: আসমা বিনতে আবু বকরের হাদীসে এসেছে তিনি বলেন:

جاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنْدَانَا يُصِيبُ تُوبَهَا مِنْ دَمِ الْخِيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟
قَالَ: «تَحْتَهُ، ثُمَّ تَفْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْصَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ»

“তিনি বলেন, জনেকা মহিলা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট এসে বললেন: (হে আল্লাহর রসূল!) বলুন, আমাদের কারো কাপড়ে হায়েয়ের রক্ত লেগে গেলে সে কী করবে? তিনি বললেন: সে তা ঘষে ফেলবে, তারপর পানি দিয়ে রগড়াবে এবং কাপড়ে পানির ছিটা দিবে। অতঃপর সেই কাপড়ে সলাত আদায় করবে।”^{১৩৬}

^{১৩৫} সহীল বুখারী, হ. ২৬৯।

^{১৩৬} ﴿إِنَّمَا : পাথর অথবা পাঠ দিয়ে ঘষা দিবে।﴾ আঙ্গুল এবং নখ দিয়ে জোরে জোরে ঘর্বন করার এবং তার উপর পানি ঢালার যাতে ﴿جِلْسَةً﴾ এবং তার চিন্হ দূর হয়ে যায়।

^{১৩৭} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীল বুখারী, হ. ২২৭, সহীহ মুসলিম, হ. ২৯১।

المسألة الثالثة: كيفية تطهير النحاسة

তৃতীয় মাসআলা: কীভাবে অপবিত্রতাকে পরিচ করা হবে

১. অপবিত্রতা যদি মাটি অথবা কোনো জায়গায় হয়: তাহলে তাকে পবিত্র করতে একবার ঘোয়া যথেষ্ট হবে। একবার ধুলেই ﷺ বা অপবিত্রতা দূরীভূত হয়ে যাবে। সুতরাং তার উপর একবার পানি ঢেলে দিতে হবে। জনৈক বেদুঈন যখন মসজিদে প্রশ্নাব করে দিয়েছিল তখন আল্লাহর রসূল ﷺ তার ব্যাপারে এই নির্দেশ প্রদান করেছিলেন।^{১৩৮}

২. অপবিত্রতা মাটি ব্যতীত অন্যকিছুতে হলে: সেটা কাপড়ে হতে পারে অথবা জুতায় হতে পারে: যদি সেটা কুকুর কোনো পাত্রে মুখ দেওয়ার কারণে হয়, তাহলে আবশ্যিক হলো সেই পাত্র সাতবার ধোয়া। তার মধ্যে একবার মাটি ব্যবহার করা আবশ্যিক। এই মর্মে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدُكُمْ فَلَيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَا هُنَّ بِالثَّرَابِ

“তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর লেহন করলে তা সাতবার ধোও; এর একবার (প্রথমবার) মাটি দিয়ে।”^{১৩৯}

এই বিধান পাত্র এবং অন্যান্য সকল জিনিসের ক্ষেত্রে। যেমন- কাপড়, বিছানা ইত্যাদি।

শুকরের অপবিত্রতা: সঠিক কথা শুকরের অপবিত্রতা অন্যান্য অপবিত্রতার মতো একবার ধূলেই যথেষ্ট হবে। একবার ধোত করলেই নাপাকি দূর হয়ে যাবে। একে সাতবার ধোয়ার শর্ত করা হয়নি।

অপবিত্রতা যদি প্রস্তাব, পায়খানা বা রক্তের হয়: তাহলে তা পানি দিয়ে ধোত করতে হবে।
সাথে সাথে ঘষে পানি নিংড়াতে হবে, যাতে তা দূর হয়ে যায়, তার চিহ্নও না থাকে। এগুলো
একবার ধোয়াই যথেষ্ট হবে।

যে শিশু খাবার খেতে শিখেনি তার প্রস্তাব থেকে পরিত্রাতা অর্জনের জন্য পানি ছিটানোই যথিষ্ঠেষ্ট হবে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

يُغسلُ مِنْ بَوْلِ الْجَهَارِيَّةِ، وَيُسْتَضَعُ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ

“মেয়ে শিশুর প্রশ্নাব ধোত করো আর ছেলে শিশুর প্রশ্নাবে পানি ছিটিয়ে দাও ।”^{১৪০}

এই প্রসঙ্গে উন্মুক্তাইস বিনতে মিহসানের হাদীস পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

^{२८} मुद्राकाळ आलाइहि: सशीखल दुखारी, श. २२०, सशीह मुसलिम, श. २८४।

^{١٥٣} سہیہ مسلمیم، جا. ۵۳۵، فوآ. ۲۷۹، مسلمیمیر شد: اُلہمْ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ بِالْخَيْرِ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ بِالْكُبُرِ يَرَهُ

^{৫০} আবু দ্বা কাউদ: ৩৭৬, সুনান নাসাই, শ. ৩০৩, ইবনু মাজাহ, শ. ৫২৬।

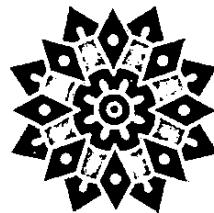
যে প্রাণির গোশত খাওয়া হয় তার চামড়া: এসব প্রাণির চামড়া দাবাগত বা প্রক্রিয়াজাত করলেই পবিত্র হয়ে যাবে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

طَهْرٌ فَقَدْ بُنِيَّ إِلَهًا

“প্রক্রিয়াজাতের পর যে-কোনো চামড়া পবিত্র হয়ে যায়।” ১৪১

হায়েয়ের রক্তকে মহিলা পানি দিয়ে ধোত করবে। অতঃপর তাতে পানির ছিটা দিয়ে সলাত আদায় করবে।

সুতরাং মুসলিমের জন্য আবশ্যিক হলো শরীর, স্থান, কাপড় যেগুলিতে সে সলাত আদায় করে, সেগুলিকে অপবিত্র থেকে পবিত্র করার ব্যাপারে গুরুত্বারূপ করা। কারণ পবিত্রতা সলাত সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত।



الباب العاشر: في الحيض والنفس দশম অনুচ্ছেদ : হায়েয (খুস্তাব) এবং নিফাস (প্রসূতি অবস্থা)

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে।

আভিধানিক অর্থ: -الحيض- প্রবাহ, নিঃসরণ।

شرعأ: دم طبيعية وَجِيلَة، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، حال صحة المرأة، من غير سبب ولادة.

পরিভাষায়: গর্ভজনিত কারণ ছাড়াই মহিলার সুস্থ অবস্থায় নির্ধারিত সময়ে জরায়ুর গন্ধর হতে যে স্বাভাবিক রক্ত প্রবাহিত হয়, তাকে হায়েয বলা হয়।

: النفاس : س্তন জন্মদানের সময় মহিলার যে রক্ত প্রবাহিত হয় তাকে নفاس বলা হয়।

المُسَأَّلَةُ الْأُولَى: بِدَايَةٍ وَقْتِ الْحِيْضِ وَنِهَايَتِهِ

প্রথম মাসআলা: হায়েয শুরু এবং শেষ হওয়ার সময়

নয় বছর বয়সের পূর্বে হায়েয শুরু হয় না। 'নয় বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কোনো মহিলার হায়েয হয়েছে' একথা প্রমাণিত নয়। এই মর্মে আয়িশাহ আয়িশাহ বলেন:

إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تُسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ.

"যখন কোনো বালিকার বয়স ৯ বছর হবে, সে মহিলা হয়ে যাবে।" ^{১৪২}

সঠিক তথ্যমতে অধিকাংশ মহিলাদের পঞ্চাশ বছরের পরে হায়েয হয় না। এই প্রসঙ্গে আয়িশাহ থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন:

إِذَا بَلَغْتِ الْمُرْأَةُ حَمْسِينَ سَنَةً خَرَجَتِ مِنْ حَدْدِ الْحِيْضِ

“কোনো মহিলার পঞ্চাশ বছর হয়ে গেলে, সে হায়েয হওয়া থেকে মুক্ত হয়ে যায়।”^{১৪৩}

المسألة الثانية: أقل مدة الحيض وأكثرها

দ্বিতীয় মাসআলা : হায়েযের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন সময়সীমা

সঠিত তথ্যমতে হায়েযের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন কোনো সময়সীমা নেই। এটা মহিলাদের শরীর এবং স্বভাবের উপর নির্ভর করে।

المسألة الثالثة: غالب الحيض

তৃতীয় মাসআলা: হায়েযের অধিকাংশ সময়সীমা

বেশির ভাগ মহিলাদের হায়েযের স্থায়ীত্বের সময়সীমা:

বেশির ভাগ মহিলাদের হায়েযের সময়সীমা ছয় বা সাত দিন। আল্লাহর রসূল ﷺ হামনা বিনতে জাহশকে বলেছিলেন:

تَحْبِيْضِي فِي عِلْمِ اللّٰهِ سِتَّةُ أَيَّامٍ، أَوْ سِبْعَةٌ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّيْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا، أَوْ ثَلَاثَةُ وَعِشْرِينَ يَوْمًا، كَمَا تَحْبِيْضِ النِّسَاءُ وَيَطْهُرُنَّ لِيَقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ

“তুমি ছয় অথবা সাতদিন ঝাতুমতী গণ্য করো, প্রকৃত বিষয় আল্লাহই ভালো জানেন। অতঃপর তুমি গোসল করো এবং সলাত পড়ো চৰিশ অথবা তেইশদিন। যেমনভাবে মহিলারা ঝাতুম্বাব ও পরিত্রাতা গণ্য করে থাকে।”^{১৪৪}

^{১৪৩} মুগন্নী: ১/৪০৬।

^{১৪৪} সুনান আবু দাউদ, খ. ২৮৭, তিরমিয়ী, খ. ১২৮, ইবনু মাজাহ, খ. ৬২৭ ইরওয়াউল গালীল ১৮৮।

المسألة الرابعة: ما يحرم بالحيض والنفاس চতুর্থ مাসআলা: হায়েয এবং নিফাসের কারণে যা হারাম

১. লজ্জাস্থানে যৌন সঙ্গম করাঃ এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَظْهُرَنَّ﴾

“অতএব ঝুতুকালে স্ত্রী-সহবাস হতে বিরত থাক এবং যে পর্যট পবিত্র না হয়, তোমরা তাদের নিকটবর্তী হয়ো না।” [সূরা বাকুরাহ : ২২]

উক্ত আয়াতটি যখন অবর্তীর্ণ হয় তখন আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছিলেন:

اصْنُعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النَّكَاحَ

“তোমরা (সে সময় তাদের সাথে) শুধু সহবাস ছাড়া অন্যান্য সব কাজ করো।”^{১৪৫}

২. তালাক দেওয়াঃ এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِيَعْتَهِنَ﴾

“তাদেরকে তালাক দিলে তাদের ইন্দ্রিয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দিও।” [সূরা তালাক: ১]

আব্দুল্লাহ বিন উমার رض যখন তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেন তখন আল্লাহর রসূল ﷺ উমার বিন খাতাবকে বলেছিলেন: “তাকে ফিরিয়ে আনার আদেশ দাও।”^{১৪৬}

৩. সলাত আদায় করাঃ আল্লাহর রসূল ﷺ ফাতিমা বিনতে হ্বাইশ رض কে এই প্রসঙ্গে বলেন:

إِذَا أَقْبَلَتِ الْجِنَسَةُ، فَنَذِعِ الصَّلَاةَ

“যখন হায়েয শুরু হবে, সলাত ছেড়ে দিবে।”^{১৪৭}

৪. রোজা রাখাঃ এই মর্মে আল্লাহর রসূল ﷺ মহিলাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন:

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟

“আর হায়েয অবস্থায় তারা কি সলাত ও সিয়াম হতে বিরত থাকে না?”^{১৪৮}

^{১৪৫} সহীহ মুসলিম, হা. ৫৮১, ফুআ. ৩০২।

^{১৪৬} মুজাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৫২৫১, সহীহ মুসলিম, হা. ১৪৭১।

^{১৪৭} মুজাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৩২০, সহীহ মুসলিম, হা. ৩৩৩।

^{১৪৮} সহীহল বুখারী, হা. ৩০৪।

৫. বাযতুল্লাহর তাওয়াফ করাঃ বিদায় হাজে আয়িশাহ أَيْشَه যখন হায়েয়া হয়ে যান তখন আল্লাহর রসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ তাকে বলেন:

اَفْعَلِ مَا يَفْعَلُ الْخَاجُ غَيْرَ أَنْ لَا تَطْوِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهِيرِي

“তুমি পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য হাজীদের মতো সকল কাজ করে যাও, কেবল কাঁবার তাওয়াফ করবে না।”^{১৪৯}

৬. কুরআন পাঠ করাঃ সাহাবী, তাবেঙ্গী, তবে তাবেঙ্গীদের অধিকাংশের মতে হায়েয় অবস্থায় কুরআন পাঠ করা হারাম। তবে যদি পাঠ করা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়; (যেমন- ভুলে যাওয়ার ভয়ে রিভাইজ করা, মহিলা মাদরাসায় পাঠ দান করা, মাদরাসায় পড়া বলে দেওয়া) তাহলে জায়েয়। যদি একান্ত প্রয়োজনীয় না হয়, তাহলে পড়া যাবে না। এই মতটি কোনো কোনো আলেম ব্যক্ত করেছেন।^{১৫০}

৭. কুরআন মাজীদ স্পর্শ করাঃ আল্লাহ তা'আলা এই প্রসঙ্গে বলেন:

لَا يَمْسِي إِلَّا الْمَظْهَرُونَ

“যারা পুতৎ পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না।” [সূরা ওয়াকিয়াহ : ৭৯]

৮. মসজিদে প্রবেশ এবং তাতে অবস্থান করাঃ নাবী صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ এই মর্মে বলেছেন:

لَا أَجِلُّ الْمَسْجِدَ لِيَأْتِيَنِي وَلَا جُنْبٌ

“ঝুতুমতী মহিলা ও নাপাক ব্যক্তির জন্য মসজিদে যাতায়াত আমি হালাল করি না।”^{১৫১}

এই কারণে নাবী صَلَّى اللّٰহُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ তার মাথা আয়িশাহ أَيْشَه এর দিকে বাঢ়িয়ে দিতেন। আর আয়িশাহ أَيْشَه তার কামরায় থেকে হায়েয়াবস্থায় আল্লাহর রসূল صَلَّى اللّٰহُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ এর মাথা চিরুনী করে দিতেন। এমতাবস্থায় নাবী صَلَّى اللّٰহُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ মসজিদের মধ্যে আয়িশাহ أَيْشَه এর কামরার নিকটবর্তী থাকতেন।^{১৫২} অনুরূপভাবে যদি মসজিদ দুষ্প্রিয় হওয়ার আশংকা করে, তবে হায়েয়া মহিলার জন্য মসজিদের মাঝ দিয়ে অতিক্রম করাও হারাম। যদি দুষ্প্রিয় হওয়া থেকে নিরাপদ হয়, তাহলে মসজিদের মাঝ দিয়ে অতিক্রম হারাম নয়।

^{১৪৯} মুস্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৩০৫, সহীহ মুসলিম, হা. ১১৯।

^{১৫০} اثْرَحَ الْمَعْنَى : ১/২৯১-২৯২।

^{১৫১} সুনান আবু দাউদ, হা. ২৩২, নায়লুল আওতার: ১/২৮৮।

^{১৫২} সহীহল বুখারী, হা. ২৯৬।

المسألة الخامسة: ما يوجبه الحيض

পঞ্চম মাসআলা : হায়েয়ের আবশ্যক বিষয়

১. গোসল ওয়াজিব: এই প্রসঙ্গে নাবী ﷺ বলেন:

دَعِيَ الصَّلَاةُ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتَ تَحْمِضُ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِ وَصُلِّيْ

“এরপ হওয়ার পূর্বে যতদিন হায়ে হতো সে কয়দিন সলাত অবশ্যই পরিত্যাগ করবে। তারপর গোসল করে সলাত আদায় করবে।”^{১৫৩}

২. বালেগা হওয়া: আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

لَا يَقْبِلُ اللَّهُ صَلَاةً حَائِضٍ إِلَّا بِخَمَارٍ

“কোনো প্রাণ্ডবয়স্কা মেয়ে ওড়না ছাড়া সলাত আদায় করলে আল্লাহ কবুল করেন না।”^{১৫৪}

সুতরাং হায়েয়ের কাণেই মহিলার উপর পর্দা আবশ্যক হয়। অতঃপর এই হায়েয প্রমাণ করে যে, শরীয়তের দায়িত্ব প্রাপ্ত্যা হায়েযের দ্বারাই অর্জিত হয়। আর হায়েয বালেগ হওয়ার কারণেই হয়।

৩. ইদত গণনা: যে তালাকপ্রাপ্তা মহিলার হায়ে হয় তার ইদতের সময়সীমা শেষ হবে হায়ে গণনার মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَالنُّظْلَاقُ يَتَرَبَّصُ بِأَنْفُسِهِنَّ تَلَاقَ قُرُونٌ

“তালাকপ্রাপ্তগণ তিন ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।” [সুরা বাক্সারাহ: ২২৮] অর্থাৎ তিন হায়ে গণনার মাধ্যমে।

৪. হায়েযের মাধ্যমে ইদত গণনার মাধ্যমে জরায়ু খালি হওয়ার ফয়সালা দেওয়া আবশ্যক করে।

সতর্কীকরণ: যদি হায়ে এবং নিফাসগ্রস্ত মহিলা সূর্য ডোবার পূর্বে পবিত্র হয়, তাহলে ঐ দিনের যোহর ও আসরের সলাত আদায় করা তারজন্য আবশ্যক। আর যদি ফজরের পূর্বে পবিত্র হয়, তাহলে ঐ রাতের মাগরিব এবং ইশার সলাত আদায় করা তার জন্য আবশ্যক। কারণ ওজরের সময় দ্বিতীয় সলাতের ওয়াক্তটা প্রথম সলাতের ওয়াক্ত হয়ে যায়। এই মত পোষণ করেছেন ইমাম মালেক, শাফেঈ, আহমাদসহ অধিকাংশ ওলামায়ে কিরাম।^{১৫৫}

^{১৫৩} সহীহ বুখারী, ঘ. ৩২৫, সহীহ মুসলিম, ঘ. ৩৩৪।

^{১৫৪} আরু দাউদ : ৬৪১, তিরমিয়ী, ঘ. ৩৭৭, ইবনু মাজাহ, ঘ. ৬৫৫।

^{১৫৫} : المختصر الفقهي ১-৫৯-৬০।

المسألة السادسة: أقل النفاس وأكثره

ষষ্ঠى مَسَأْلَةُ مَسَأْلَةِ نِفَافِهِ وَسَرْبِلِهِ

নিফাসের সর্বনিম্ন সময়ের কোনো সীমারেখা নেই। কেননা এই ব্যাপারে কোনো সীমারেখা বর্ণিত হয়নি। সুতরাং এটা নির্ভর করে রক্ত বিদ্যমান থাকার উপর। কারো রক্ত বেশি থাকে আবার কারো কম থাকে। তবে আধিকাংশেই রক্ত বিদ্যমান থাকে ৪০ দিন।

ইমাম তিরমিয়ী ৩৫৯ বলেন, নাবী ﷺ এর সাহাবীগণ এবং তাবেয়ীগণ এই বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, নিফাসগ্রস্ত মহিলা ৪০ দিন সলাত পরিত্যাগ করবে। তবে এর পূর্বে যদি সে পবিত্র হয়ে যায় তাহলে গোসল করে সলাত আদায় করবে। এই মর্মে উন্মু সালামা হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন:

كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجْلِسُ أَزْبَعِينَ يَوْمًا

“আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে নিফাসগ্রস্ত মহিলারা চল্লিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন।” ১৫৬

المسألة السابعة: في دم المستحاضنة

সপ্তম মাসআলা: ইন্তিহায়ার রক্ত

استحاضة ماء با ইন্তিহায়া: রক্তক্ষরণের রগ হতে অসময়ে রক্ত প্রবহিত হওয়াকে বলা স্থাপন হয়। এই রগটিকে عذل ও বলা হয়।

হ্কুম এবং শুণাবলির দিক বিচারে ইন্তিহায়ার রক্ত হায়েয়ের রক্তের বিপরীত। হায়েয়ের সময় বা অন্য সময় জরায়ুর ভিতরের একটি রগ ফেটে গেলে এই রক্ত বের হয়। যা সলাত, রোজা, এবং সহবাসে বাধা দেয় না। কেননা এই রক্ত পবিত্র। এর দলীল হলো ফাতিমা বিনতে আবী হ্বাইশ এর বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَمْرَأَةٌ أَسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ. أَفَأَدْعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: لَا. إِنَّمَا ذَلِكَ عِزْفٌ وَلَيْسَ بِالْخِيَضَةِ فَإِذَا أَفْبَلَتِ الْخِيَضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنِّكَ الدَّمَ وَصَلِّ.

“হে আল্লাহর রাসূল! আমি কখনও পবিত্র হই না। এমতাবস্থায় আমি কি সলাত ছেড়ে দেব? তিনি **ﷺ** বললেন: না, এ হলো এক ধরনের রগ থেকে নির্গত বিশেষ রক্ত, হায়েয়ের রক্ত নয়। তোমার হায়েয শুরু হলে সলাত ছেড়ে দাও। আর হায়েয শেষ হলে রক্ত ধুয়ে সলাত আদায় করো।”^{১৫৭}

সুতরাং হায়েয মহিলা তার নির্ধারিত দিন শেষে গোসল করবে আর মুস্তাহায়া মহিলা ইস্তেহায়ার শেষে লজ্জাস্থান ঘোত করবে এবং রক্ত বের হওয়ার স্থানে তুলা জাতীয় কিছু রাখবে যা রক্ত প্রবাহিত হওয়াকে বাধা প্রদান করবে। তুলা জাতীয় জিনিস শক্ত করে রাখবে, যাতে পড়ে না যায়। স্বাস্থ্য সুরক্ষার উপকরণ এই সময়ে যথেষ্ট হবে। অতঃপর সে প্রত্যেক সলাতের জন্য ওয়ু করবে।

মুস্তাহায়া মহিলার তিন অবস্থা:

প্রথম অবস্থা: অভ্যাসগতভাবে কোনো কোনো মহিলার ইস্তেহায়া হয়। আর সে তার ইস্তেহায়া হওয়ার পূর্বেকার হায়েযের নির্ধারিত সময় জানে। এই শ্রেণির মহিলা তার হায়েযের নির্ধারিত সময় নামায-রোজা থেকে বিরত থাকবে এবং এই রক্তকে হায়েযের রক্ত মনে করবে। যখন হায়েযের নির্ধারিত সময় শেষ হবে তখন সে গোসল করবে এবং সলাত আদায় করবে এবং তার পরে প্রবাহিত রক্তকে ইস্তিহায়ার রক্ত মনে করবে। এই মর্মে আল্লাহর রসূল **ﷺ** উশু হাবীবা **رض** কে বলেন:

امْكُنْيِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكَ حَيْضَتُكَ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّ

“তোমার হায়েয যে কয়দিন হয়, সে কয়দিন পরিমাণ তুমি অপেক্ষা করো। তারপর গোসল করো এবং সলাত আদায় করো।”^{১৫৮}

দ্বিতীয় অবস্থা: কোনো মহিলার অভ্যাসগত ভাবে ইস্তেহায়া হয় না। তবে তার প্রবাহিত রক্তের বৈশিষ্ট্য দেখে হায়েযের রক্ত পার্থক্য করা সত্ত্ব; কালো রং বিশিষ্ট অথবা ঘন হওয়া অথবা দুর্গন্ধযুক্ত হওয়া। আর ইস্তেহায়ার রক্তের বৈশিষ্ট্য দেখে চেনা যায়; লাল রং, দুর্গন্ধ না থাকা। এমতাবস্থায় ঐ মহিলা প্রবাহিত রক্তের পার্থক্য নিরূপণ করে হায়েয ও ইস্তিহায়া গণনা করবে। এই প্রসঙ্গে নাবী **رض** ফাতিমা বিনতে আবী হবাইশ **رض** কে বলেন:

إِذَا كَانَ دَمُ الْحِيْضَرِ فِيْهِ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأْمِسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَوَضَّئِي وَصَلِّ
فَإِنَّمَا هُوَ عِزْقٌ

^{১৫৭} সহীহ বুখারী, হ. ৩০৬, সহীহ মুসলিম, হ. ফুআ. ৩৩৪।

^{১৫৮} সহীহ মুসলিম, হ. ৬৪৬, ফুআ. ৩৩৪।

“হায়েয়ের রক্ত কালো হয়ে থাকে, তা চেনা যায়। যদি এ রক্ত বের হয় তাহলে সলাত থেকে বিরত থাকবে। আর যদি অন্য রকম হয় তাহলে ওযু করে সলাত আদায় করবে। কারণ তা রগ থেকে নির্গত রক্ত।”^{১৫৯}

তৃতীয় অবস্থা: যদি কোনো মহিলার অভ্যাসগত ভাবে ইস্তেহায়া না হয়, আর তার প্রবাহিত রক্তের মাঝে এমন কোনো গুণ না পাওয়া যায়, যার দ্বারা হায়েয় এবং ইস্তেহায়ার রক্তের মাঝে পার্থক্য করা যায়, তাহলে সে মহিলা অধিকাংশ মহিলার হায়েয়ের সময়সীমা ছয়দিন বা সাত দিন নামায-রোজা থেকে বিরত থাকবে। হয় বা সাত দিন পরে ঐ মহিলা গোসল করবে এবং সলাত-সওম আদায় করবে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহর রসূল ﷺ হামনা বিনতে জাহশ ﷺ কে বলেন:

«إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِّنْ رَّكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةً أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ... ، ثُمَّ اغْتَسِلِي ... فَإِذَا اسْتَقَأْتِ فَصَلِّي ... وَصُومِي، فَإِنَّ ذَلِكَ بُخْرِيَّكَ».

“এটা শয়তানের লাথি বা আঘাত। কাজেই তুমি নিজেকে হয় অথবা সাতদিন ঝতুমতী ধরে নেবে।... তারপর গোসল করবে।... যখন তুমি নিজেকে পাক-পবিত্র মনে করবে, তখন সলাত আদায় করবে... ও সিয়াম পালন করবে। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট।”^{১৬০}

রকضَة من الشَّيْطَان এর অর্থ: ধাক্কা দেওয়া, আঘাত করা। অর্থাৎ শয়তান এই রক্তকে ধাক্কা দেয়, আঘাত করে।

^{১৫৯} সুনান আবু দাউদ, বা. ২৮৬।

^{১৬০} সুনান আবু দাউদ, বা. ২৮৭, তিরমিয়ী, বা. ১২৮।



— ♡ এতে ০৩টি অনুচ্ছেদ রয়েছে ♡ —

প্রথম অনুচ্ছেদ : সলাতের পরিচয় ফযীলত এবং পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের আবশ্যিকতা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: আযান এবং ইকামত

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: সলাতের ওয়াক্তসমূহ

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : সলাতের শর্তসমূহ, ঝুকন্সমূহ, দলীলসমূহ এবং সলাত পরিত্যাগকারীর বিধান

পঞ্চম অনুচ্ছেদ: নফল সলাত

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: সাহ সাজদা, তিলাওয়াতের সাজদা এবং শুকরিয়ার সাজদা

সপ্তম অনুচ্ছেদ: জামাআতে সলাত আদায় করা

অষ্টম অনুচ্ছেদ: সলাতে ইমামতি করা

নবম অনুচ্ছেদ : অপারগ ব্যক্তিদের সলাত

দশম অনুচ্ছেদ: জুমুআর সলাত

একাদশ অনুচ্ছেদ : সলাতুল খওফ বা ভয়-ভীতির সলাত

বাদশ অনুচ্ছেদ: দুই ঈদের সলাত

ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ: সলাতুল ইস্তিস্কা বা বৃষ্টি প্রার্থনার সলাত

চতুর্দশ অনুচ্ছেদ: সলাতুল কুসূফ তথা চন্দ-সূর্য গ্রহণের সলাত

পঞ্চদশ অনুচ্ছেদ: জানায়ার সলাত ও মৃতব্যক্তির বিধিবিধান





الباب الأول : في تعريف الصلاة، وفضلها، ووجوب الصلوات الخمس প্রথম অনুচ্ছেদ : সলাতের পরিচয় ফয়েলত এবং পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের আবশ্যিকতা

١. سلأاتের پارিচয়: تعريف الصلاة

الصّلاة با سلأاتের آভিধনিক آর্থ: الدّعاء - دুআ করা।

شرعًا: عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم.

পরিভাষায়: সলাত হলো “নির্দিষ্ট কিছু কথা ও কাজ সঙ্গলিত একটি ইবাদত; যা তাকবীর দিয়ে শুরু আর সালাম দিয়ে শেষ করা হয়।” (এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।)

٢. سلأاتের فয়েলত: শাহাদাতাইন (দুই শাহাদাত) এর পরে ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রূক্ন হলো সলাত। এটা হলো ইসলামের দ্বিতীয় স্তুতি। মিরায়ের রাতে সপ্ত আকাশের উপর আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর সলাতকে ফরয করেছেন। এটাই হলো মুসলিম জীবনে সলাতের গুরুত্বের সবচেয়ে বড়ো দলীল। নাবী ﷺ যখন কোনো বিষয়ে দৃঢ়চিন্তায় পড়তেন^{১৬} তখন তিনি সলাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। সলাতের ফয়েলত এবং তার প্রতি উৎসাহমূলক অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

^{১৬}: جزء : پেঁয়ে বসা।

১. আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفراتٌ لِمَا اجتبيتُ الكبائر

“পাঁচ ওয়াক্ত সলাত, এক জুমুআহ থেকে আরেক জুমুআহ, এক রমায়ান থেকে আরেক রমায়ান এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের সব গুনাহের জন্য কাফফগারা হয়ে যায়। যদি সে কাবীরাহ গুনায় লিঙ্গ না হয়।”^{১৬২}

২. অপর হাদীসে বলেন:

أَرَيْتُمْ لَوْ أَنَّ هَذَا بَابٌ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَاتٍ، هُلْ يَقِنَّ مِنْ دَرْزِهِ شَيْءً؟ قَالُوا: لَا يَقِنَّ مِنْ دَرْزِهِ شَيْءً، قَالَ: فَذَلِكَ مَثُلُ الصَّلَواتِ الْخَمْسِ، يَمْحُوا اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا.

“তোমাদের কারো বাড়ির সামনে যদি একটি নদী থাকে, আর সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার দেহে কোনো ময়লা থাকবে? তারা ~~ক্ষেত্র~~ বললেন, না, তার দেহে কোনোরূপ ময়লা বাকি থাকবে না। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন:- পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের বিষয় এমন। এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন।”^{১৬৩} : الدرن : ময়লা।

৩. সলাতের আবশ্যকতা: সলাতের আবশ্যকতা কুরআন সুন্নাহ এবং ইজমার মাধ্যমে জানা যায়। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের অনেক আয়াতে আর্চে-**وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ**- তোমরা সলাত প্রতিষ্ঠিত করো [সূরা বাক্সারাহ: ৪৩]। এ ছাড়াও তিনি বলেছেন:

فَلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ

“আমার বাস্তাদের মধ্যে যারা মু’মিন তাদেরকে বলো সলাত কায়েম করতে।”[সূরা ইবরাহীম : ৩১]

সুন্নাহ থেকে দলীল: মিরায়ের হাদীসে এসেছে:

“এটি আদায় পাঁচ ওয়াক্ত আর সওয়াব ৫০ ওয়াক্ত।”^{১৬৪} এ ছাড়াও বুখারী মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে। আল্লাহর রসূল ﷺ ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারীদের বলেন:

خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. فَقَالَ: هُلْ عَلَيْهِ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا, إِلَّا أَنْ تَطُوعَ

“দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত। সে বলল, আমার উপর এছাড়া আরও সলাত আছে কি? তিনি ﷺ বললেন: না, তবে নফল আদায় করতে পারো।”^{১৬৫}

^{১৬২} সহীহ মুসলিম, হ্য. ৪৩৮, ফুআ. ২৩৩।

^{১৬৩} সহীহল বুখারী, হ্য. ৫২৮, সহীহ মুসলিম, হ্য. ১৪০৮, ফুআ. ৬৬৭।

^{১৬৪} সহীহল বুখারী, হ্য. ৩৪৯।

^{১৬৫} সহীহল বুখারী, হ্য. ৪৬, সহীহ মুসলিম, হ্য. ৮, ফুআ. ১১।

জ্ঞান সম্পন্ন, প্রাণবয়স্ক মুসলিমের উপর সলাত আবশ্যক। সুতরাং কাফের, ছোটো বাচ্চা এবং পাগলের উপর সলাত আবশ্যক নয়। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

رُفِعَ الْقَلْمُ عَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيقِظَ، وَعَنِ الْمُجْنُونِ حَتَّىٰ يَقِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَلْغُ.

“তিনি ধরনের লোকের উপর থেকে কলম ওঠিয়ে নেওয়া হয়েছে: ১. ঘুম্ন ব্যক্তি যতক্ষণ না জেগে ওঠে; ২. পাগল ব্যক্তি যতক্ষণ না ভালো হয়; ৩. নাবালেগ শিশু, যতক্ষণ না সাবালক হয়।”^{১৬৬}

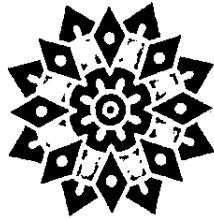
তবে বাচ্চাদের সাত বছর বয়সে সলাতের নির্দেশ দিতে হবে এবং দশ বছর বয়সে সলাত পরিত্যাগ করলে প্রহার করা হবে। যে ব্যক্তি সলাত অঙ্গীকার করবে অথবা ছেড়ে দিবে, সে কুফুরী করবে এবং ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। এই মর্মে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

“আমাদের ও তাদের মধ্যে অঙ্গীকারের বিষয় হলো সলাত। সুতরাং যে ব্যক্তি সলাত ত্যাগ করে, সে কাফের হয়ে যায়।”^{১৬৭}

^{১৬৬} বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনাকে এই শব্দে একত্রিত করা হয়েছে। সুনান আবু দাউদ, হা. ৪৩৯১; ৪৪০১; ৪৪০২।

^{১৬৭} সুনানুত তিরমিয়ী, হা. ২৬২১।



الباب الثاني : الأذان، والإقامة দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: আযান এবং ইকামত

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المسألة الأولى: تعريف الأذان والإقامة، وحكمهما

প্রথম মাসআলা: আযান ও ইকামতের পরিচয় ও হকুম

ক. আযান ও ইকামতের পরিচয়:

আযানের আভিধানিক অর্থ: ঘোষণা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَأَذَانٌ مِّنْ أَنَّهُ وَرَسُولُهُ﴾

“আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে।” [সূরা তাওবাহ : ৩]

অর্থাৎ ঘোষণা করা প্রচার করা।

شرع: الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص.

পরিভাষায়: নির্দিষ্ট যিকর বা শব্দাবলির মাধ্যমে সলাতের সময়ে প্রবেশের জন্য যে ঘোষণা দেওয়া হয় তাকেই আযান বলে।

ইকামতের আভিধানিক অর্থ: ﴿أَقَامَ﴾ ফেল বা ক্রিয়ার মাসদার। এর অর্থ উপবিষ্ট ব্যক্তিকে (সলাতের জন্য) দাঁড় করানো।

شرع: الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص ورد به الشارع.

পরিভাষায়: শরীয়ত প্রণেতা কর্তৃক বর্ণিত নির্দিষ্ট যিকরের বা শব্দাবলির দ্বারা সলাতে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেওয়াকে ইকামত বলা হয়।

খ. আয়ান ও ইকামতের শুরুম:

পুরুষদের ক্ষেত্রে আযান এবং ইকামত দেওয়া শরীয়ত সম্মত পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের জন্য আযান ও ইকামত দেওয়া ফরযে কেফায়া, যখন কেউ একজন তা আদায় করবে তখন অন্যদের থেকে এর দায়ভার চলে যাবে। কারণ এই দুটি হলো ইসলামের প্রকাশ্য নিদর্শন। সুতরাং এই দুটিকে বন্ধ করে দেওয়া বৈধ নয়।

المقالة الثانية: شروط صحتها

ଦ୍ଵିତୀୟ ମାସଅଳା: ଆୟାନ ଓ ଇକାମତ ସହୀହ ହେଉଥାର ଜନ୍ୟ ଶର୍ତ୍ତସମ୍ମହିତ

১. মুসলিম হওয়া: কোনো কাফেরের আযান ও ইকামত বৈধ নয়।
 ২. জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া: অন্যান্য ইবাদতের মতো কোনো পাগল, নেশাগ্রস্থ এবং ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারে না, এমন ছেলে শিশুর আযান ইকামত বৈধ নয়।
 ৩. পুরুষ হওয়া: কঠিনাত্মক কারণে মহিলাদের আযান ও ইকামত বৈধ নয়। অনুরূপ কোনো হিজড়ার আযান ইকামত বৈধ নয়, তার যৌনাঙ্গ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে।
 ৪. সলাতের ওয়াক্তে আযান হওয়া: সূতরাং সলাতের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়া সঠিক নয়। তবে ফজর এবং জুমুআর প্রথম আযান ব্যতীত। কারণ এ দুটি সময় হওয়ার পূর্বেই জায়েয়। আর ইকামত হবে সলাতের দাঁড়ানো মনস্থ করার সময়।
 ৫. আযানের বাক্যগুলো ধারাবাহিক এবং মধ্যবর্তী বিলম্ব ছাড়া একের পর এক হওয়া। যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে অনুরূপ ইকামতও (বর্ণনা অচিরেই সামনে আসবে)।
 ৬. আযান এবং ইকামত আরবী ভাষা এবং ঐ শব্দাবলি দ্বারা হওয়া যে শব্দে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

المسألة الثالثة: في الصفات المستحبة في المؤذن

তৃতীয় মাসআলা: মুয়াব্দিনের মুন্তাহাব গুণাবলী

১. ন্যায়পরায়ণ ও বিশুদ্ধ হওয়া: কারণ তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। যার দিকে সলাত এবং সিয়ামের বিষয়টা সোপার্দ করা হয়। সুতরাং তিনি যদি ন্যায়পরায়ণ বিশ্বস্ত না হন, তাহলে অসময়ে আধান দিয়ে মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে পারেন।

২. প্রাণ্তবয়স্ক, জ্ঞানবান হওয়া: ভালো মন্দের পার্থক্যকারী শিশুর আযান সঠিক বলে বিবেচিত।
৩. সময় সম্পর্কে জ্ঞানী হওয়া: যাতে তিনি সময় অনুসন্ধান করতে পারেন এবং প্রথম ওয়াক্তে আযান দিতে পারেন। যদি তিনি সময় সম্পর্কে অজ্ঞ হন তাহলে কখনো কখনো ভুল করতে পারেন।
৪. উচু^{৬৬} আওয়াজ বিশিষ্ট হওয়া, যাতে মানুষ তার আযান শুনতে পায়।
৫. ছোটো এবং বড়ো অপবিত্রতা হতে পবিত্র হওয়া।
৬. কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া।
৭. দুই কানে দুই আঙুল রাখা এবং চলার সময় ডান দিকে আর বলার সময় বাম দিকে চেহারা ঘোরানো।
৮. আযান ধীর গতিতে দেওয়া আর ইকামত দ্রুত গতিতে দেওয়া।

المسألة الرابعة: في صفة الأذان والإقامة চতুর্থ মাসআলা: আযান ও ইকামতের পদ্ধতি বর্ণনা

আযান ও ইকামতের পদ্ধতি: আযান এবং ইকামতের কয়েকটি পদ্ধতি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো: আবু মাহযুরাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ الْأَذَانَ بِنَفْسِهِ، فَقَالَ: تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، حَمِّيَ عَلَى الصَّلَاةِ، حَمِّيَ عَلَى الْفَلَاحِ، حَمِّيَ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: ثُمَّ اسْتَأْخِرُ عَنِّي غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ، قَالَ: وَتَقُولُ: إِذَا أَقْمَتَ الصَّلَاةَ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، حَمِّيَ عَلَى الصَّلَاةِ، حَمِّيَ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

“নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই তাকে আযান শিক্ষা দেন। তিনি বলেন: তুমি বলো,

الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَه إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَن مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَن مُحَمَّداً رَسُولَ اللهِ، حَيٌّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيٌّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَه إِلَّا اللهُ^{১৬৪}

কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলো। অতঃপর তিনি বলেন: তুমি সলাতের ইকামতে বলো,
الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَه إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَن مُحَمَّداً رَسُولَ اللهِ، حَيٌّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيٌّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَه إِلَّا اللهُ^{১৬৫}

এটা হলো বেলাল হতে বর্ণিত হাদীস অনুপাতে। সে হাদীসে বলা হয়েছে:

أَمْرٌ بِلَأْلَأْ أَن يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَأَنْ يُوْرِثَ الْإِقَامَةَ، إِلَّا إِلْقَامَةٍ

“বিলাল -কে আযানের বাক্য দুই বার করে ও ইকামতের বাক্য বেজোড় করে বলার নির্দেশ দেওয়া হয়।”^{১৭০}

সুতরাং আযানের শব্দগুলো দুবার দুবার আর একবার একবার করে।

এটা হলো আযান ইকামতের মুস্তাহাব বর্ণনা। বেলাল আল্লাহর রসূল এর মতুয় অবধি সফর এবং মুকীম উভয় অবস্থায় আযান দিতেন (আর এটা ছিল তার আযান এবং ইকামতের পদ্ধতি)।

যদি কোনো মুয়াজ্জিন শাহাদাতাইনকে^{১৭১} প্রথমে নিম্ন স্বরে অতঃপর উচ্চ স্বরে বলে অথবা ইকামতের শব্দগুলো দুবার করে বলে, তাতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা এগুলো বৈধ ইখতিলাফের অন্তর্ভুক্ত।

ফজরের আযানের শব্দগুলো দুই বার বলা মুস্তাহাব। এই মর্মে আবু মাহযুরাহ হতে হাদীস এসেছে।

إِنْ كَانَ أَذَانَ الصُّبْحِ قُلْتَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

“ফজরের আযানে বলবে: চলামান শব্দগুলো দুই বার বলা মুস্তাহাব।”^{১৭২}

^{১৬৪} সুনান আবু দাউদ, হা. ৫০৫, ইবনু মাজাহ, হা. ৭০৮।

^{১৬৫} সহীহল বুখারী, হা. ৬০৫, সহীহ মুসলিম, হা. ৭২৪, ফুআ. ৩৭৮।

^{১৭০} সহীহল বুখারী, হা. ৬০৫, সহীহ মুসলিম, হা. ফুয়াদ আব্দুল বাকী ৩৭৮।

^{১৭১} এটাকে বলা হয়। অর্থাৎ মুয়াজ্জিন যখন ফজরের আযান এই জুমলা বলে তখন সলাতে দ্রুত যাওয়ার উৎসাহ এর দিকে ফিরে যায়।

المسألة الخامسة: ما ي قوله سامع الأذان، وما يدعوه بعده

পঞ্চম মাসআলা: আযান শ্রবণকারী যা বলবে এবং

আযানের পরে যে দুআ করবে

আযান শ্রবণকারীর জন্য মুণ্ডাহাব হলো মুয়ায়ফিন যা বলে তাই বলা। এই প্রসঙ্গে আবু সাউদ খুদরী ^{رض} এর হাদীসে এসেছে, রসূল <ص> বলেছেন:

إِذَا سَمِعْتُمُ النَّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤْذِنُ

“যখন তোমরা আযান শুনতে পাও, তখন মুয়ায়ফিন যা বলে তোমরাও তাই বলো।”^{১৭৪}

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
তবে ব্যতীত। এই সময় মুয়াজিনের ফ্লাই হিঁচালে হিঁচালে বলার পর পর হাতে বর্ণিত হতে বর্ণিত হাদীস হতে প্রমাণিত।^{১৭৫}

মুয়াজিন যখন ফজরের আযানে চুক্তি করে তখন শ্রোবণকারীও তাই বলবে।
তবে এটা ইকামতে বলা সুন্নাত নয়।

অতঃপর নাবী <ص>-এর উপর দরুন পাঠ করে এই দুআ পড়বে:

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدُّعْوَةِ التَّائِمَةِ، وَالصَّلَاةِ الْفَা�ئِدَةِ أَتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةُ وَالْفَضِيلَةُ، وَانْثَنِي مَقَامًا مَخْمُودًا الْنَّبِيُّ وَعَذْنَةً

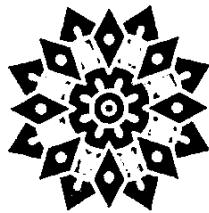
“যে ব্যক্তি আযান শুনে দুআ করে, ‘হে আল্লাহ-এ পরিপূর্ণ আহবান ও প্রতিষ্ঠিত সলাতের তুমিই মালিক। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অসীলা ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী করো এবং তাঁকে সে মাকামে মাহমুদে পৌঁছে দাও, যার অঙ্গীকার তুমি তাঁকে করেছো।”^{১৭৬}

^{১৭৪} সুনান নাসাই, হ্য. ৬৩৩; সুনান আবু দাউদ, হ্য. ৫০০।

^{১৭৫} সহীহ বুখারী, হ্য. ৬১১, সহীহ মুসলিম, হ্য. ১০৯৩।

^{১৭৬} সহীহ মুসলিম, হ্য. ফুআ. ৩৮৫।

^{১৭৭} সহীহ বুখারী, হ্য. ফুআ. ৬১৪।



الباب الثالث: في مواقيت الصلاة তৃতীয় অনুচ্ছেদ: সলাতের ওয়াক্তসময়

দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরয। প্রত্যেক সলাতের জন্য শরীয়ত সময় নির্দিষ্ট করেছে।
আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَائِنَةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَتَبْنَا مَوْقُوتًا﴾

“নিশ্চয়ই সলাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত।” [সূরা নিসা : ১০৩]

অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে সলাত আদায করা ফরয। সময়ের পূর্বে সলাত আদায করলে তা যথেষ্ট হবে না।
এই সময়গুলোর মূল দলীল: আব্দুল্লাহ বিন উমার رض হতে বর্ণিত হাদীস। নাবী ﷺ বলেছেন:
وَقَتُ الظَّهَرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ يَخْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقَتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَ
الشَّمْسُ، وَوَقَتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغْبِ الشَّفَقُ، وَوَقَتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ، وَوَقَتُ
صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ

“যোহরের সলাতের ওয়াক্ত শুরু হয যখন সূর্য (মাথার উপর থেকে পশ্চিম দিকে) হেলে পড়ে
এবং মানুষের ছায়া তার দৈর্ঘ্যের সমান হয়। আর আসরের সলাতের সময় না হওয়া পর্যন্ত তা
থাকে। আসরের সলাতের সময় থাকে সূর্য বিবর্ণ হয়ে সোনালী বা তাম্রবর্ণ ধারণ না করা পর্যন্ত।
মাগরিবের সলাতের সময় থাকে সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্তে উভাসিত লালিমা বিদূরিত না
হওয়া পর্যন্ত। ইশার সলাতের সময় অর্ধরাত অর্থাৎ- মধ্যরাত পর্যন্ত। আর ফজরের সলাতের
সময় শুরু হয ফজর বা উষার উদয় থেকে শুরু করে সূর্যোদয় পর্যন্ত।”^{۱۷۷}

^{۱۷۷} সহীহ মুসলিম, খ. ১২৭৫ ফুয়াদ আব্দুল বাকী। ৬১২।

সুতরাং যোহরের ওয়াক্ত শুরু হয় সূর্য ঢলার সময় অর্থাৎ সূর্য আকাশের মধ্যস্থল থেকে পশ্চিম দিকে হেলে যাওয়ার সময়। আর এর সময় দীর্ঘ হয় প্রতিটি জিনিসের ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়া পর্যন্ত। প্রথম গরম ব্যতীত সলাত প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা মুন্তাহাব। তবে প্রথম গরমের সময় সলাত পিছিয়ে ঠাণ্ডায় সলাত আদায় করা মুন্তাহাব।^{১৭৮} আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

إِذَا أَشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرُدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرُّ مِنْ فَيْحَةِ جَهَنَّمَ

“প্রচণ্ড গরম হলে (যুহরের) সলাত দেরি করে আদায় করো। গরমের তীব্রতা জাহানামের উভাপ ছড়িয়ে পড়া থেকেই হয়ে থাকে।”^{১৭৯}

যোহরে ওয়াক্ত শেষ হলে আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়। অর্থাৎ প্রতিটি জিনিসের ছায়া তার সমপরিমাণ হলে আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়। আর সূর্য ডোবার দ্বারা তা শেষ হয় অর্থাৎ হলুদ আভার শেষ সময়ে। আসরের সলাত প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা সুন্নাত। এটা হলো মধ্যবর্তী সলাত যার দলীল আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজিদে অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾

“তোমরা সলাতের প্রতি যত্নবান হও। বিশেষতঃ মধ্যবর্তী সলাতের এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দণ্ডয়মান হও।”[সূরা বাক্সারাহ: ২৩৮]

আল্লাহর রসূল ﷺ আসরের সলাতকে সংরক্ষণের নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন:

مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَانَتِمْ وُتْرَ أَهْلَهُ وَمَا لَهُ

“যে ব্যক্তির ‘আসরের সলাত ছুটে গেল, তার তার পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদ সব কিছুই ধ্রুংস হয়ে গেল।”^{১৮০}

তিনি ﷺ আরও বলেন: مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبَطَ عَمْلُهُ

“যে ব্যক্তি আসরের সলাত ছেড়ে দিলো তার ‘আমল বিনষ্ট হয়ে গেল।”^{১৮১}

সূর্য অন্ত যাওয়া থেকে নিয়ে আকাশের লাল আভা^{১৮২} থাকা অবধি মাগরিবের ওয়াক্ত। নাবী ﷺ বলেন:

وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغْبِ الشَّفَقُ

^{১৭৮} অর্থাৎ আসরের সলাতের নিকটবর্তী করা।

^{১৭৯} সংহিতল বুখারী, হা. ৫৩০-৫৩৪, সহীহ মুসলিম, হা. ৬১৫।

^{১৮০} সংহিতল বুখারী, হা. ৫৫২, সহীহ মুসলিম, হা. ২০১, ৬২৬।

^{১৮১} সংহিতল বুখারী, হা. ৫৫৩।

^{১৮২} সহীহ মুসলিম, হা. ১২৭২, ফুআ. ৬১২/১৭৩।

“মাগরিব সলাতের সময় সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্তে উভাসিত লালিমা বিদূরিত না হওয়া পর্যন্ত।”^{১৮৩}
মাগরিবের সলাত প্রথম ওয়াক্ত সলাত আদায় করা সুন্মাত। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

لَا تَزَالْ أَمْتَي عَلَى الْفِطْرَةِ، مَا لَمْ يُؤْخِرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشَبَّهَ النُّجُومُ

“ଆମାର ଉପ୍ରାତ ତତଦିନ କଲ୍ୟାଗେର ମଧ୍ୟ ଥାକବେ, ଯତଦିନ ତାରା ମାଗରିବେର ସଲାତ ଆଦାୟେ
ତାରକା ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ହୋଯା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲସି କରବେ ନା ।”¹⁸⁸

তবে হাজীদের জন্য মুয়দালিফার রাত ব্যতীত। মুয়দালিফায় রাতে মাগরিব পিছিয়ে ইশার সলাতের সাথে খুট করে পড়া সুন্নাত।

আকাশের লাল আভা ডুবে যাওয়া থেকে নিয়ে মধ্যরাত পর্যন্ত ইশার সলাতের ওয়াজ্জি। নাবী
বলেন:

وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ

“ইশার সলাতের সময় অর্ধরাত অর্থাৎ- মধ্যরাত পর্যন্ত।” ১৮৫

যদি কষ্ট না হয় তাহলে ইশার সলাতকে মধ্যরাত পর্যন্ত বিলম্বে আদায় করা মুস্তাহব। ইশার সলাতের পূর্বে ঘুমানো এবং পরে কথা বলা অপচন্দনীয়। আবু বারযা রাখ বলেন:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا

“ଆଲାହର ରୁସ୍ଲ ସାଲାଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ଇଶାର ପୂର୍ବେ ଘୁମାନୋ ଏବଂ ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତ ବଲା
ଅପଛନ୍ଦ କରିତେନ !” ୧୮୬

দ্বিতীয় ফজর উদিত হওয়া থেকে নিয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত ফজর সলাতের ওয়াক্ত। যদি ফজর উদিত হওয়া নিশ্চিত হয়ে যায়, তাহলে দ্রুত সলাত আদায় করা মুশ্ভাহাব।

এই সময়গুলোতে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা শরীয়ত সম্মত। সুতরাং মুসলিমদের উপর আবশ্যিক হলো, এই সময়গুলোকে সম্মান করা/ধরে রাখা, এই সময় গুলোতেই সলাত আদায় করা এবং শেষ ওয়াক্তকে পরিত্যাগ করা। কারণ যারা সময়মত সলাত আদায় না করে বিলম্ব করে আদায় করে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভীতি প্রদর্শন করেছেন। তিনি বলেন:

﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾

“সুতরাং পরিতাপ সেই সলাত আদায়করীদের জন্য, যারা তাদের সলাতে অমনোযোগী।”^{৮-৫} সুরা মাইন: ৪-৫

১৪০ বনান আব দাউদ, হ্য. ৪১৮, আহমদ : ৪/১৭৪।

১০৮ বনান আব দাউদ, হ্য. ৪১৮, আহমদ : ৪/১৭৮।

२०५ बड़ी ह मसलिया, डा. १३७३, फर्जा, ६११/१७३।

१४६ शतीच्छ वआवी आ ५६८ शतीच्छ मसलिम आ ६४७।

তিনি অপর এক আয়াতে বলেন:

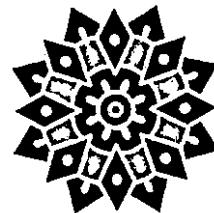
﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاغُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَيْنًا﴾

“তাদের পরে এলো অপদার্থ উভরসূরীরা; তারা সলাত নষ্ট করল ও মনোবাসনার অনুসারী হলো; সুতরাং তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।” [সূরা মারহিয়াম: ৫৯]

উ হলো: জাহানামের পরাজয়, অকল্যাণ এবং দ্বিগুণ কঠোর শাস্তি। (আমরা এর থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।)

সময়মত সলাত আদায় করা আল্লাহ তা‘আলার নিকটে সবচেয়ে প্রিয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। আল্লাহর রসূল ﷺ কে আল্লাহ তা‘আলার নিকট কোন আমল প্রিয়, এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: “সঠিক সময়ে সলাত আদায় করা।”^{১৮৭}

^{১৮৭} সহীহ বুখারী, খ. ৫২৭, সহীহ মুসলিম, খ. ১৩৯।



الباب الرابع: في شروط الصلاة، وأركانها، وأدلة ذلك، وحكم تاركها চতুর্থ অনুচ্ছেদ : সলাতের শর্তসমূহ, কর্কমসমূহ, দলীলসমূহ এবং সলাত পরিত্যককারীর বিধান

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: فِي عَدْدِ الصَّلَوَاتِ الْمُكْتَوِيَّةِ প্রথম মাসআলা: ফরয সলাতের সংখ্যা

ফরয সলাতের সংখ্যা হলো পাঁচ (অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত) সেগুলো হলো- ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব, এবং ইশা। এই প্রসঙ্গে সকলে ঐকমত্যে উপনীত। এর উপর প্রমাণ করে তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رض এর বর্ণিত হাদীস (তিনি বলেন):

أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: خَمْسٌ صَلَوَاتٍ فِي
الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ

“এক বেদুঈন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আমার উপর সলাত থেকে কী ফরয করেছেন? তিনি বললেন: দিনে ও রাতে ৫ ওয়াক্ত সলাত।”^{১৮৮}

জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তির ঘটনা সম্বলিত আনাস رض থেকে বর্ণিত হাদীসও এর উপর প্রমাণ করে। ঐ হাদীসে নাবী ﷺ কে গ্রাম্য ব্যক্তি কথা বলতে গিয়ে বলেন:

^{১৮৮} سন্ধিহস বুথারী, হা. ৬৯৫৬; সহীহ মুসলিম, হা. ১১।

وَرَأَمْ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمَنَا، وَلَيْلَتِنَا، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ

“আপনার দৃত বলেছে যে, আমাদের উপর আমাদের দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরয।
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সত্যই বলেছে।”^{১৮৯}

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: عَلَى مَنْ تَجْبُ؟

ঘূর্তীয় মাসআলা: কার উপর সলাত ফরয

হয়ে এবং নিফাসগ্রস্ত ব্যক্তিত বোধশক্তি সম্পন্ন, প্রাণবয়স্ক মুসলিম নর ও নারীর উপর সলাত ফরয। শিশুদেরকে সাত বছর বয়সে সলাতের নির্দেশ দেওয়া হবে এবং দশ বছর বয়সে সলাত পরিত্যাগ করলে প্রহার করা হবে। এই সম্পর্কে হাদীস:

رُفِعَ الْقَلْمَنْ عَنْ ثَلَاثَةِ: فَذَكَرَ مِنْهَا وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَجْتَلِمَ

“তিন ব্যক্তির উপর থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়। তাতে উল্লেখ রয়েছে, শিশু বালেগ না হওয়া পর্যন্ত।”^{১৯০}

অপর হাদীসে বলেছেন:

مُرُوا أَوْلَادُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشِيرٍ وَفَرَقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

“তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হলে তাদেরকে সলাতের জন্য নির্দেশ দাও এবং তাদের বয়স দশ বছর হলে (সলাত আদায না করলে) তাদেরকে মারবে এবং তাদের ঘুমের বিছানা আলাদা করে দিবে।”^{১৯১}

المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: فِي شُرُوطِهَا

ঢূর্তীয় মাসআলা: সলাতের শর্তসমূহ

সলাতের শর্ত নয়টি:

১. মুসলিম হওয়া: কোনো কাফেরের সলাত সহীহ হবে না। কেননা তার আমল বাতিল বলে গণ্য।
২. বোধশক্তি সম্পন্ন হওয়া: পাগলের সলাত সহীহ হবে না। কেননা সে শরীয়তের দ্বায়িত্ব প্রাপ্ত নয়।

^{১৯০} সহীহ মুসলিম, ঘ্য. ১২।

^{১৯১} সুনান আবু দাউদ, ঘ্য. ৪৪০১।

^{১৯২} সুনান আবু দাউদ, ঘ্য. ৪৯৫, তিরমিয়ী, ঘ্য. ৪০৭, আহমাদ: ৩/২০১।

^{১৯৩} যে সকল বিষয়ের উপর সলাতের শুক্তা নির্ভর করে।

৩. প্রাঞ্চবয়স্ক হওয়া। প্রাঞ্চবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত শিশুদের উপর সলাত ওয়াজিব নয়। তবে সাত বছরে তাদেরকে সলাতের আদেশ করা হবে এবং দশ বছর বয়সে প্রথার করা হবে।
রসূল ﷺ বলেন:

مُرُوا أَوْلَادُكُمْ بِالصَّلَاةِ

“তোমাদের সন্তানদেরকে সলাতের জন্য নির্দেশ দাও।”

৪. সাধ্যমত ছোটে^{১৩} এবং বড়ো নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জন করা: ইবনু উমার رض হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

لَا يَقْبِلُ اللَّهُ صَلَاةً يَعْتَزِرُ طَهُورٌ

“পবিত্রতা ব্যতীত সলাত কবুল হয় না।” ^{১৪}

৫. সলাতের ওয়াক্ত হওয়া: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا

“নিশ্চয়ই সলাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত।” [সূরা নিসা : ১০৩]

জিবরীল আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে আল্লাহর রসূল ﷺ এর পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের ইমামতি করলেন। অতঃপর বললেন:

مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتٌ

“এই দুই সময়ের মাঝেই সময়।” ^{১৫}

সুতরাং ওয়াক্ত ছাড়া ওয়াক্ত না হলে এবং সময় অতিক্রম হয়ে গেলে সলাত শুরু হবে না।

৬. সাধ্যমতো কোনো জিনিস দ্বারা সতর ঢেকে রাখা, যাতে চামড়া না দেখা যায়: আল্লাহ তা'আলা এই মর্মে বলেন:

﴿يَا بَنِي آدَمَ حُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾

“হে আদম! প্রত্যেক সলাতের সময় সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদ গ্রহণ করো।” [সূরা আরাফ : ৩১]

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন: لَا يَقْبِلُ اللَّهُ صَلَاةً حَائِضٍ إِلَّا بِخَارِ

“কোনো প্রাঞ্চবয়স্ক মহিলা ওড়না ছাড়া সলাত আদায় করলে আল্লাহ তার সলাত কবুল করবেন না।” ^{১৬}

^{১৩} ছোটে নাপাকি এবং বড়ো নাপাকি।

^{১৪} সহীহ মুসলিম, ঘ. ৪২৩, ফুআ. ২২৪।

^{১৫} তিরমিয়ী, ঘ. ১৫০, নাসাঈ: ১/৯১।

^{১৬} নুনান আবু দাউদ, ঘ. ৬৪১, তিরমিয়ী, ঘ. ৩৭৫, ইবনু মাজাহ, ঘ. ৬৫৫।

একজন প্রাণ্ডবয়স্ক পুরুষ মানুষের সতর হলো নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। আল্লাহর রসূল ﷺ এই প্রসঙ্গে জাবির খানকে বলেন:

إِذَا صَلَّيْتَ فِي نُوْبٍ وَاحِدٌ، فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَّحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيْقًا فَأَنْزِرْ بِهِ

“যখন এক কাপড়ে সলাত পড়বে তখন কাপড় যদি বড়ো হয়, তাহলে শরীরে জড়িয়ে পরবে। আর যদি ছোটো হয় তাহলে লুঙ্গি হিসেবে ব্যবহার করবে।” ১৯৭

তবে উভয় হলো কাঁধে কোনো কাপড় রাখা। কারণ যে কাপড়ের কিছু অংশ কাঁধে থাকে না, তা পরিধান করে সলাত আদায় করতে আল্লাহর রসূল ﷺ নিষেধ করেছেন। হাত এবং মুখ ছাড়া পুরো শরীর মহিলার জন্য সতর। তবে যদি সে কোনো অপরিচিত ব্যক্তি সামনে সলাত পড়ে, তাহলে পুরো শরীর (হাত এবং মুখসহ) ঢেকে রাখবে। রসূল ﷺ বলেছেন: مَرْأَةٌ عُورَةٌ مَحْلِلَةٌ أَوْ بَرْغَةٌ “মহিলারা আবরণীয় বস্ত্র।” ১৯৮

لَا يَقْبِلُ اللَّهُ صَلَاتَ حَائِضٍ إِلَّا بِخَارٍ

“মহান আল্লাহ প্রাণ্ডবয়স্কা নারীর সলাত ওড়না পরিধান ব্যক্তিত কবুল করেন না।” ১৯৯

৭. সাধ্যমত সলাতের স্থান, কাপড় এবং শরীর থেকে নাপাকি দূর করাঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَثِيَابَكَ فَطَهِنْ

“আর আপনার পরিচ্ছদ পরিত্র করুন।” [সূরা মুদ্দাস্সীর : ৪]

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

تَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَةً عَذَابُ الْقَنْزِ مِنْهُ

“প্রশ্নাবের ছিটা থেকে বেঁচে থাকো। কেনান অধিকাংশ কবরের আয়াব এ থেকেই হয়।” ২০০

অন্য হাদীসে আল্লাহর রসূল ﷺ আসমা খনকে কাপড়ে লেগে থাকা রক্ত ধোত করার পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

خُنْثُهُ، ثُمَّ تَفْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ

“তা ঘৰবে, তাৰপৰ পানি দিয়ে রগড়াবে এবং পানিৰ ছিটা দিকে। অতঃপৰ সেই কাপড়ে সলাত আদায় করবে।” ২০১

^{১৯৭} সন্ধীহস্ত বুখারী, ঘ. ৩৬১, সহীহ মুসলিম, ঘ. ৩০১০।

^{১৯৮} তিরমিয়ী, ঘ. ৩৯৭।

^{১৯৯} সুনান নাসাৰী, ঘ. ৬৪১।

^{২০০} দারাকুত্বী: ১/৯৭ (৪৫৩)।

অপর হাদীসে আল্লাহর রসূল ﷺ তার সাহাবীদেরকে মসজিদের প্রস্তাব করে দেওয়া আরব বেদস্টনের প্রস্তাবের নাপাকি দূর করার জন্য বলেন:

أَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ

“ওৱ প্রশ্নাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও।” ২০২

৮. সাধ্যমত কিবলামুখী হওয়া: এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَوَلِ وجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾

“অতএব আপনি মসজিদুল হারামের দিকে চেহারা ফিরিয়ে নিন।” [সুরা বাকুরাহ : ১৪৪]

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

إذا قمت إلى الصلاة فأشبع الوضوء، ثم استقبل القبلة

“যখন তুমি সলাতে দাঁড়ানোর ইচ্ছে করবে, তখন প্রথমে তুমি যথানিয়মে ওয়ে করবে। তারপর কিবলামুখী দাঁড়াবে।” ২০৩

৯. নিয়ত করা: কোনো অবস্থাতেই নিয়ত ছাড়া চলবে না। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন: **إِنَّمَا** **الْأَعْمَلُ بِالنَّيْتَ** “প্রত্যেক কাজ নিয়ত অনুযায়ী হয়ে থাকে।”^{২০৪} নিয়তের স্থান হলো অন্তর। আর এর মূল হলো কোনো জিনিসের উপর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া। মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা শরীয়ত সম্মত নয়। কেননা নাবী ﷺ মুখে নিয়ত উচ্চারণ করেননি এবং তার সাহাবীদের থেকে এমন কিছু বর্ণিত হয়নি।

المُسَأَّلَةُ الرَّابِعَةُ: فِي أَرْكَانِهَا

চতুর্থ মাসআলা: সলাতের কুকুনসমূহ

କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବା ରୂପନ୍ତମୁହଁ: ଯେ ସମସ୍ତ ଜିନିସର ସମସ୍ତୟେ ଇବାଦତ ଗଠିତ ହୁଯ ଏବଂ ଯେଉଁଲୋ ବ୍ୟତୀତ ଇବାଦାତ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୁଯ ନା, ସେଉଁଲୋର ସମଟିକେ ଆରକାନ ବଲା ହୁଯ ।

ଆରକାନ ଏବଂ ଶତେର ମାଝେ ପାର୍ଥକ୍ୟ: ଶତ ଇବାଦତେର ଆଗେ ଏସେ ଇବାଦତେର ସାଥେ ଚଲମାନ ଥାକେ ।
ଆର ଆରକାନ ଇବାଦତେର ଅନ୍ତର୍ଭକ୍ତ କଥା ଏବଂ କାଜଗୁଲୋକେ ବୁଝାଯ ।

^{२०३} सन्धीहस्त बुधारी, श. २२७, संस्थान मुसलिम, श. २९१।

२०१ नठीहुल बथारी, श. २२०।

^{২০৮} প্রদীপ্তি বুঢ়াবী, হা. ৬৩৫২, সঞ্চীহ মসলিম, হা. ৩৯৭।

^{২৪} মন্ত্রানালিকন আলাইটি: সঞ্চীত্ব বথারী, হা. ১; সঞ্চীত্ব মসলিম, হা. ১৯০৭।

সলাতের রুকন হলো মোট ১৪ টি। এই রুকনগুলো ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বা অজ্ঞতাবশত যদি কারো ছুটে যায় তাহলে সলাত বাতিল হয়ে যাবে।

১. কিয়াম করা (দাঁড়ানো): দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম এমন ব্যক্তির জন্য ফরয সলাতে দাঁড়িয়ে সলাত পড়া একটি রুকন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿وَقُومُوا لِلّهِ قَاتِيْن﴾ “আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও।” [সূরা বাকুরাহ : ২৩৮]

আল্লাহর রসূল ﷺ ইমরান বিন হুসাইন رضي الله عنه কে বলেন:

صَلُّ قَاضِيَا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ.

“দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করা। তা সক্ষম না হলে বসে; যদি তাতেও সক্ষম না হও, তাহলে শুয়ে।”^{২০৫}

যদি ওজরের কারণে কেউ ফরয সলাতে কিয়াম ছেড়ে দেয়, (যেমন অসুস্থতা বা এ জাতীয় কোনো সমস্যা) তাহলে তার ওজর গ্রহণযোগ্য হবে। এমতবস্থায় সে সাধ্যানুপাতে বসে অথবা শুয়ে সলাত আদায় করবে।

তবে নফল সলাতে কিয়াম করা সুন্নাত, রুকন নয়। বসে সলাত আদায়কারীর সলাতের চেয়ে দাঁড়িয়ে সলাত আদায়কারীর সলাত বেশি ফরালতপূর্ণ। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

صَلَاةُ الْفَاعِلِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ

“কেউ বসে সলাত আদায় করলে তা দাঁড়িয়ে সলাতের অর্ধেক সমান হয়।”^{২০৬}

২. সলাতের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমা দেওয়া: অর্থাৎ সলাতের প্রারম্ভে ‘আল্লাহ আকবার’ বলা। তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া সলাত হবে না। আল্লাহর রসূল ﷺ সলাত ভুলকারী ব্যক্তিকে বলেন:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكُبِرْ

“যখন তুমি সলাতে দাঁড়াবে, তখন তাকবীর বলো।”^{২০৭}

অপর হাদীসে তিনি বলেন:

وَخَرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَخَلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

“সলাত তাকবীর দিয়ে শুরু হয় আর সালাম ফিরানো দ্বারা শেষ হয়।”^{২০৮}

সুতরাং তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত সলাত হবে না।

^{২০৫} সহীহ বুখারী, হ্য. ১১১৭।

^{২০৬} সহীহ মুসলিম, হ্য. ১৬০০, ফুআ. ৭৩৫; সুনান নাসাই, হ্য. ১৬৫৯।

^{২০৭} সহীহ বুখারী, হ্য. ৭৯৩, সহীহ মুসলিম, হ্য. ফুআ. ৩৯৭।

^{২০৮} সুনান আবু দাউদ, হ্য. ৬১, ইবনু মাজাহ, হ্য. ২৭৫, তিরমিয়ী, হ্য. ৩।

৩. প্রত্যেক রাকআতে সুরা ফাতিহা পাঠ করাঃ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন: “لَا صَلَاةٌ لِّمَنْ يَقْرُأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ” যে যজ্ঞি সলাতে সুরা ফাতিহা পড়ল না তার সলাত হলো না।^{১০৯}

এই বিধান থেকে সলাতে মাসবুক ব্যক্তি (যার রাকআত ছুটে যায়) কে বাদ রাখা হয়েছে। যদি মাসবুক ব্যক্তি ইমামকে রুকু অবস্থায় অথবা কিয়ামের এমন অবস্থায় পায়, যখন তার জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করা সম্ভব নয়, তাহলে তাকে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে না।

অনুরূপভাবে জেহরী সলাতে (যে সলাতগুলোতে জোরে তিলাওয়াত করা হয়) মুক্তাদীকে সূরা ফাতিহা পাঠ করা হতে বাদ রাখা হয়েছে। তবে মুক্তাদী যদি ইমামের চুপ থাকার সময়টাতে সূরা ফাতিহা পড়ে ফেলতে পারে, তাহলে সেটা তার জন্য উত্তম। সতর্কতা গ্রহণ করে। [উপর্যুক্ত হাদীসের আলোকে প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহাহ পাঠ করা আবশ্যিক- এই মতের পক্ষেই আলেমদের একদল।-সম্পাদক]

৪. প্রত্যেক রাকআতে রুক্ত করাঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ازْكُرُوهُ وَاسْجُدُوا ه﴾

“হে ম'মিনগণ! তোমরা বুকু করো, সাজদাহ করো।” [সূরা হাজ়ি: ৭৭]

আল্লাহর রসূল ﷺ সলাতে ভুলকারীকে বলেন:

ثُمَّ ازْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ رَاكِعاً

“ତାରପର ତୁମି ଧୀରଞ୍ଜିରଭାବେ ଝୁକୁ କରବେ ।” ୨୧୦

৫-৬. রুক্মি থেকে ওঠা এবং সোজা হয়ে দাঁড়ানো: আল্লাহর রসূল ﷺ সলাতে ভুলকারীকে বলেন:

از کم حتی تطمئن را کن، نه از فم حتی تعطیل قاید.

“তারপর তুমি ধীরস্থিরভাবে বুকু করবে। এরপর মাথা তুলে ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়াবে।”^{১১}

৭. সাজদা করাঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন: “সাজদাহ করো !” [সূরা হাজ়ি : ৭]

আল্লাহর রসূল ﷺ সলাতে ভুলকারীকে বলেন:

ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِدًا

“ତାରପର ଧୀରଶ୍ଵିରଭାବେ ସାଜଦାହ କରବେ ।”^{୨୧୨}

^{२०३} ମହିଳା ସୁଖାରୀ, ପ୍ର. ୭୫୬, ମହିଳା ମୁସଲିମ, ପ୍ର. ଫୁଆ, ୩୯୮।

^{२०} सशीकल वृथानी, श. ६२५१, सशीक मुसलिम, श. फुआ. ३९७।

୧୩୧ ସହିତ୍ତ ବୁଝାନୀ, ପ୍ର. ୬୨୫୧।

প্রত্যেক রাকআতে সাতটি অঙ্গের উপরে দুটি করে সাজদা হবে। যেমনটি ইবনু আবাসের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

أَمْرُتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمِ عَلَى الْجِهَةِ، وَأَشَارَ يَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكَبَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ

“আমাকে সাত অঙ্গে সাজদাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কপাল- (এ বলে তিনি হাত দিয়ে নাকের দিকে ইশারা করলেন) দুই হাত; দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের প্রান্তদেশ (পায়ের আঙুলসমূহ)।”^{২১৩}

৮-৯. সাজদা থেকে ওঠা এবং দুই সাজদার মাঝে বসা: রসূল ﷺ সলাতে ভুলকারীকে বলেন:

نُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ جَالِسًا.

“অতঃপর মাথা তুলে ধীরস্থিরভাবে বসবে।”^{২১৪}

১০. সকল রুকন পালনের সময় ধীরস্থিরতা অবলম্বন করাঃ অর্থাৎ সলাতে স্থিরতা অবলম্বন করা। এর পরিমাণ হবে প্রত্যেকটা রুকনে যা আবশ্যিকীয় আছে তা বলার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সময়। কারণ আল্লাহর রসূল ﷺ সলাতে ভুলকারীকে সকল রুকনে স্থিরতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সলাতে স্থিরতা না থাকার কারণে পুনরায় সলাত পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

১১. শেষ তাশাহুদ: আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ আল্লাহ বলেন:

كَيْنَأَنْ تَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْهَا التَّسْهِيدُ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحْيَاتُ لِلَّهِ

“আমাদের উপর তাশাহুদ ফরয হওয়ার আগে আমরা বলতাম: স্লাম উল্লেখ করা করে না, আল্লাহর উপর তাঁর বান্দাদের পক্ষ থেকে সালাম বর্ষিত হোক। অতঃপর নাবী ﷺ বললেন: তোমরা বুঝ না, বরং বলো, তাঁর স্লাম উল্লেখ করো।”^{২১৫}

সুতরাং ইবনু মাসউদ আল্লাহ এর কথা ক্ষেত্রে (ফরয হওয়ার পূর্বে) প্রমাণ করে যে, তাশাহুদ ফরয।

^{২১৩} সহীল বুখারী, ঘ. ৬২৫১।

^{২১৪} সহীল বুখারী, ঘ. ৮০৯, সহীহ মুসলিম, ঘ. ফুআ. ৪৯০।

^{২১৫} সহীল বুখারী, ঘ. ৬২৫১।

^{২১৬} সুনান নাসাই ২/২৪০।

১২. শেষ তাশাহুদের জন্য বসা: রসূল ﷺ শেষ তাশাহুদে বসেছেন এবং তিনি এতে অবিচল ছিলেন। আর তিনি ﷺ বলেছেন: “তোমরা আমাকে যেভাবে সলাত আদায় করতে দেখেছ, সেভাবে সলাত আদায় করবে।”^{২১৬}

১৩. সালাম ফেরানো: আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন: “আর সালামের দ্বারা (পার্থিব সকল কাজ) হালাল হয়।”^{২১৭} এ ছাড়াও তিনি ﷺ ডান এবং বাম দিকে **السلام عليكم** وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَّهُ বলতেন।

১৪. আরকানগুলো ধারাবাহিকভাবে আদায় করা: কারণ নাবী ﷺ এগুলোকে ধারাবাহিকভাবে আদায় করতেন এবং তিনি বলেছেন: صَلُوْكًا رَأَيْتُمْنِي أَصْلِي

“তোমরা আমাকে যেভাবে সলাত আদায় করতে দেখেছো সেভাবে সলাত আদায় করবে।”
এ ছাড়াও তিনি  সলাতে ভুলকারীকে শিক্ষা দিতে গিয়ে মি^{শন} শব্দ বলেছেন, যে
ধাৰাবাচ্চিকতাৰ ব্যাপারে পৰ্যাণ কৰবে।

المُسَأَّلَةُ الْخَامِسَةُ: فِي وَاجِبَاتِهَا

পঞ্চম মাসআলা: সলাতের ওয়াজিবসমূহ

সলাতের মোট ওয়াজিব আটটি। ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ ওয়াজিব ছেড়ে দিলে তার সলাত বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি কেউ ভুলে যায় অথবা এই ব্যাপারে অজ্ঞ হয়, তাহলে তার সলাত অপরিপূর্ণ হবে। যদি সলাতে ভুলবশত কোনো ওয়াজিব ছুটে যায় তাহলে সাহু সাজদা দেওয়া আবশ্যিক।

ଓয়াজিব এবং আরকানের মাঝে পার্থক্য: যদি কেউ রুকন ভুলে যায়, তাহলে সে রুকন আদায় না করা পর্যন্ত তার সলাত হবে না। আর যদি কেউ ওয়াজিব ভুলে যায় তাহলে সাহ সাজদা দিলে তা আদায় হয়ে যাবে। সুতরাং তার আরকান ওয়াজিবের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে ওয়াজিবের আলোচনা প্রদত্ত হলো:

১. তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত সকল তাকবীর: এই তাকবীর গুলোকে তক্রির আন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই তাকবীর গুলোকে গুরুত্বপূর্ণ পৰ্যায়ে স্থানান্তরের তাকবীর বলা হয়। ইবনু মাসউদ আমেরিষ্ট বলেন:

୧୦୮ ମହିନେ ବ୍ୟାପାରୀ, ଶ୍ର. ୬୩୧ ।

^{१७} आव दाउदः ६१, तिरमियी, अ. ३, इबन मायाहः २५५।

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفِيعٍ وَخَفْضٍ، وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ.

“আমি (সলাতরত অবস্থায়) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রত্যেকবার ওঠা, নীচ হওয়া, দাঁড়ানো ও বসার সময় ‘আল্লাহ আকবার’ বলতে দেখেছি।”^{২১৮}

আল্লাহর রসূল ﷺ মৃত্য অবধি এই কাজে অবিচল ছিলেন। আর তিনি বলেছেন:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصْلِي.

“তোমরা আমাকে যেভাবে সলাত আদায় করতে দেখেছ সেভাবে সলাত আদায় করবে।”

২. ইমাম এবং একক ব্যক্তির জন্য سَمْعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ

حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ وَهُوَ قَائِمٌ رَبِّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

“আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সলাতে দাঁড়াতেন ‘আল্লাহ আকবার’ বলে সলাত শুরু করতেন। তিনি রুকু’তে যাওয়ার সময় তাকবীর বলে যেতেন। তিনি রুকু থেকে পিঠ সোজা করে দাঁড়ানোর সময় (যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করেন আল্লাহ তার কথা শুনেন) বলতেন। অতঃপর দাঁড়ানো অবস্থায় প্রশংসন (হে আল্লাহ! তোমার জন্য সকল প্রশংসন) বলতেন।”^{২১৯}

৩. মুক্তাদীর রিং বলা: সুন্নাত হলো ইমাম এবং একক ব্যক্তি কে একসাথে পড়বে। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে পূর্বের আবু হুরায়রা رض এর হাদীসে। আবু মুসা رض এর হাদীসে এসেছে,

وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ

“যখন অতঃপর সম্মত রিং বলতেন, যে হয়েছে পূর্বের আবু হুরায়রা رض এর হাদীসে।”^{২২০}

৪. প্রত্যেক রুকুতে একবার سُبْحَانَ رَبِّ الْعَظِيمِ বলা।

৫. সাজদায় একবার سُبْحَانَ رَبِّ الْأَعْلَى হ্যাইফা رض এর হাদীসে এসেছে:

^{২১৮} ডিইমিয়ী, পৃ. ২৫৩, সুনান নাসাই ২/২০৫।

^{২১৯} সহীহ মুসলিম, পৃ. ৭৫৪, ফুআ. ৩৯২।

^{২২০} সহীহ মুসলিম, পৃ. ৭৯০, ফুআ. ৪০৪, আহমাদ: ৪/৩৯৯।

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّ الْعَظِيمِ» وَفِي سُجُودِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّ الْأَعْلَى»
“নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রূক্তে এবং সাজদায় সুব্নাম রী অগ্রিম সুব্নাম রী এবং সাজদায় তিন বার পর্যন্ত তাসবীহ বৃক্ষি করা সুন্নাত ।”^{২২১}

৬. দুই সাজদার মাঝে রং অঁচি বলা । হ্যায়ফা ^{আলোচনা} এর হাদীসে এসেছে:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي

“নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই সাজদার মাঝে (প্রভু আমাকে ক্ষমা করুন ! প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন) বলতেন ।”^{২২২}

৭. প্রথম তাশাহুদ (তবে যে মুক্তাদীর ইমাম ভুলবশত তাশাহুদে না বসে দাঁড়িয়ে যায়, তার জন্য এটা ওয়াজিব নয় । কেননা এমতাবস্থায় তার উপর ইমামের অনুসরণ করা ওয়াজিব) । নাবী ^{আলোচনা} যখন প্রথম তাশাহুদ ভুলে যেতেন, তখন সেই তাশাহুদকে আর ফিরাতেন না বরং দুটি সাহ^{২২৩} সাজদা দিয়ে দিতেন । প্রথম তাশাহুদ হলো:

الْتَّحْيَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيَّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ
الصَّالِحِينَ أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

“যাবতীয় মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহরই জন্য । হে নাবী! আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত (বর্ষিত) হোক । সালাম আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর সৎ বান্দাদের প্রতি । আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যক্তিত অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই । আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল ।”

৮. প্রথম তাশাহুদের জন্য বসা: ইবনু মাসউদ ^{আলোচনা} হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত হাদীসে এসেছে:

إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَقُولُوا: التَّحْيَاتُ لِلَّهِ...

“প্রত্যেক দুই রাকআতে যখন বসবে, তোমরা বলবে, তোমরা বলবে ...”^{২২৪} التَّحْيَاتُ لِلَّهِ...

এ ছাড়াও রিফায়া বিন রাফেঙ্গ এর হাদীসে এসেছে:

فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ قَاطِمِينَ، وَافْتَرِشْ فَخِذْكَ الْيُسْرَى ثُمَّ تَشَهَّدْ

“তুমি সলাতের প্রথম বৈঠকে প্রশান্তির সাথে বসবে এবং এ সময় তোমার বাম পা বিছিয়ে দিবে, অতঃপর তাশাহুদ পড়বে ।”^{২২৫}

^{২২১} আবু দাউদ, হা. ৮৭৪, তিরমিয়ী, হা. ২৬২ ।

^{২২২} ইবনু মাজাহ: ৮৯৭ ।

^{২২৩} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ১২০২ ও সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ৫৭০ ।

^{২২৪} আহমাদ : ৪১৬০, সুনান নাসাই, হা. ১১৬৩ ।

المسألة السادسة: في سنها

ষষ্ঠى ماساتلأا : سُنَّاتِ سُنَّاهُ

সুন্নাহ দুই প্রকার: কর্মের সুন্নাহ ও বলার সুন্নাহ

কর্মের সুন্নাহ: তাকবীরে তাহরীমা, রুকুতে যাওয়া এবং রুকু থেকে ওঠার সময় দুই হাত উত্তোলন করা। কারণ মালেক বিন হয়াইরিস যখন সলাতের জন্য তাকবীর দিতেন তখন দুই হাত উত্তোলন করতেন। অনুরূপ রুকুতে যাওয়া এবং রুকু থেকে ওঠার সময়েও তিনি রফটেল ইয়াদাইন করতেন। এ ছাড়াও তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ﷺ এমনই করতেন।^{২২৬}

অনুরূপভাবে কিয়াম অবস্থায় ডান হাত বাম হাতের উপর দিয়ে বুকের উপর রাখা, সাজদার স্থানে দৃষ্টি দেওয়া, দুই পায়ের মাঝে ফাঁকা রাখা, রুকুতে দুই হাতের তালু দিয়ে হাটুকে আঁকড়ে ধরা, রুকুতে পিঠকে লম্বা করা এবং মাথা সম্মুখভাগে রাখাও সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত।

পড়ার সুন্নাহ: সলাত শুরুর দুআ বা সানা পড়া, বিসমিল্লাহ বলা, আউযুবিল্লাহ বলা, আমীন বলা, সূরা ফাতিহার পর অতিরিক্ত কিছু পড়া, রুকু এবং সাজদায় তাসবীর পরে অতিরিক্ত কিছু পড়া এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে তাশাহুদের পরে অন্যান্য দুআ পড়া সুন্নাত।

المسألة السابعة: مبطلاً لها

সপ্তম মাসতলأا : سلَّاتٍ (بَاتِلَ) بِنِسْتَكَارِيَّةِ بِشَرَّابِلِ

যে সমস্ত কারণে সলাত বিনষ্ট হয়ে যায় তার সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

১. যে জিনিস পবিত্রতাকে বাতিল করে, সে জিনিস সলাতকেও বাতিল করে। কারণ পবিত্রতা হলো সলাত সঠিক হওয়ার শর্ত। যখন পবিত্রতা বাতিল হয়ে যাবে তখন সলাতও বাতিল হয়ে যাবে।
২. শব্দ করে হাসা: অর্থাৎ অট্টহাসি হাসা। অট্টহাসি সলাত বাতিল করে দেয়, এই ব্যাপারে সকলেই একমত। কারণ এটা কথা বলা বা এর চাইতেও বেশি। এর কারণে সলাত গুরুত্বহীন এবং খেলতামাশার পাত্র হয়ে যায় সেটা সলাতের উদ্দেশ্যের প্রতিবন্ধক। তবে হাসিটা যদি মুচকি হাসি হয়, তাহলে সলাত বাতিল হবে না। এমনটি ইবনু মুনয়ির এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

^{২২৬} সুনান আবু দাউদ, ঘ. ৮৫৬।

^{২২৭} সহীহ মুসলিম, ঘ. ৭৫০, ফুআ. ৩৯১।

৩. সলাতের ভুল সংশোধন ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে সলাত বহির্ভূত কথা বলা: যায়েদ বিন আরকাম  বলেন:

كُنَّا نَكَلْمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنِيهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَّلَتْ {وَقُومُوا اللَّهُ قَاتِنَ} [البقرة: 238]

“আমরা সলাতের মধ্যে কথা বলতাম। আমাদের কেউ তার সঙ্গীর সাথে নিজ দরকারী বিষয়ে কথা বলত। অবশ্যে এ আয়াত নাযিল হলো ‘তোমরা (সলাতে) আল্লাহর উদ্দেশ্যে একাগ্রচিন্ত হও।’” [সুরা বাকুরাহ : ২৩৮]। অতঃপর আমরা সলাতে নীরব থাকতে আদেশপ্রাপ্ত হলাম।”^{২২৭} যদি কেউ অজ্ঞতাবশত অথবা ভুলে কথা বলে, তাহলে তার সলাত বাতিল হবে না।

৪. মুসল্লির সন্তুষ্টি দিয়ে সাবালিকা মেয়ে, গাধা এবং কালো কুকুর অতিক্রম করা: রসূল  বলেছেন:

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّجُلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّجُلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْجَمَارُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ.

“তোমাদের কেউ যখন সলাতে দাঁড়ায়, সে যেন হাওদার খুঁটির ন্যায় একটি কাঠি তার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। যদি সে তার সামনে হাওদার পিছনের খুঁটির ন্যায় একটি কাঠি দাঁড় না করায়, এমতাবস্থায় তার সামনে দিয়ে গাধা, মহিলা এবং কালো কুকুর চলাচল করলে তার সলাত নষ্ট হয়ে যাবে।”^{২২৮}

৫. ইচ্ছাকৃতভাবে সতর উম্মোচন করা।

৬. কিবলাকে পিছনে রেখে সলাত পড়া। কারণ কিবলামুখী হওয়া সলাত শুন্দ হওয়ার জন্য শর্ত।

৭. জেনে শুনে অপবিত্রতা নিয়ে সলাত আদায় করা এবং সলাতে অপবিত্রতার কথা স্মরণ হলে তা সে অবস্থায় দূর না করা।

৮. ওজর ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো রূক্ন অথবা শর্ত ছেড়ে দেওয়া।

৯. জরুরি প্রয়োজন ছাড়া সলাতের অন্তর্ভুক্ত নয়, এমন কোনো কাজ বেশি বেশি করা। যেমন- ইচ্ছাকৃত খাওয়া ও পান করা।

^{২২৭} সহীতল বুখারী, হ্য. ৪৫৩৪, সহীহ মুসলিম, হ্য. ১০৯০, ফুআ. ৫৩৯।

^{২২৮} সহীহ মুসলিম, হ্য. ১০২৪, ফুআ. ৫১০।

১০. বিনা ওজরে হেলান দেওয়া। কারণ কিয়াম হলো সলাত সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত স্বরূপ।

১১. কর্মগত কোনো রুক্ন ইচ্ছাকৃতভাবে বেশি করে করা। যেমন- রুকু সাজদা বেশি করে করা। কারণ অতিরিক্ত কাজ সলাতের সমস্যা করে। ফলে সকলের মতে সলাত বাতিল হয়ে যায়।

১২. স্বেচ্ছায় রুক্নগুলোকে উলোটপালোট করা। কারণ রুক্নগুলো ধারাবাহিকভাবে আদায় করাও একটি রুক্ন।

১৩. সলাত পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বে সালাম ফিরানো।

১৪. ইচ্ছাকৃতভাবে সূরা ফাতিহার অর্থকে পরিবর্তন করে পড়া। কারণ সূরা ফাতিহা পাঠ করাও একটা রুক্ন।

১৫. ইত্ততা করার মাধ্যমে নিয়ত ভঙ্গ করা এবং নিয়ত ভঙ্গের উপর দৃঢ় সংকল্প করা। কারণ নিয়তে অবিচল থাকা সলাতের একটি শর্ত।

المسألة الثامنة: ما يكره في الصلاة²²⁹

অষ্টম মাসআলা: সলাতে যে কাজগুলো করা মাকরহ

সলাতের মধ্যে নিম্নের কাজগুলো করা মাকরহ:

১. শুধুমাত্র প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা: এটা সলাতে নাবী ﷺ এর সুন্নাত ও দেখানো পথের বিপরীত।

২. সূরা ফাতিহা দুবার পাঠ করা: এটাও নাবী ﷺ এর সুন্নাতের বিপরীত। তবে কেউ যদি প্রয়োজনে পড়ে, তাহলে তা বৈধ আছে। যেমন কেউ সূরা পাঠ করার সময় অন্তরের উপস্থিতি এবং একগ্রাতা হারিয়ে ফেলল। ফলে সে তার অন্তরকে হায়ির করার জন্য সূরা ফাতিহা আবার পড়ল, এতে কোনো সমস্যা নেই। তবে শর্ত হলো দুই বার পাঠ করা যেন তাকে কুমন্তনার দিকে টেনে নিয়ে না যায়।

৩. বিনা প্রয়োজনে সলাতে সামান্য এদিক ওদিক তাকানো মাকরহ: আল্লাহর রসূল ﷺ কে সলাতে দৃষ্টিপাত করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন:

مُّؤْخِلَّاً مِنْ صَلَةِ الْعَبْدِ يَخْتِسِّهُ الشَّيْطَانُ

²²⁹ ফকীহদের পরিভাষায় মাকরহ হলো: যে কাজ করতে কঠোর ভাবে নিষেধ করা হয়নি। মাকরহ এর হকুম: পরিভ্যাগ বাধ্যকতা ছাড়া এই কাজ প্রয়োজনে করা জায়েয়।

“এটা এক ধরনের ছিনতাই। যার মাধ্যমে শয়তান বান্দার সলাত হতে অংশবিশেষ ছিনিয়ে নেয়।”^{২৩০}

খ্তাম : চুরি করা, ছিনতাই করা।

তবে দৃষ্টিপাত করা যদি প্রয়োজন হয় তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। যেমন নামাযে কারো কুমক্ষনা আসার কারণে বামদিকে তিনবার থুথু ফেলার প্রয়োজন হওয়া। এই দৃষ্টিপাত হলো প্রয়োজনের দৃষ্টিপাত। এর ব্যাপরে নাবী **ﷺ** এর নির্দেশ রয়েছে। অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি সলাত অবস্থায় তার সন্তানের ক্ষতির আশংকা করল, ফলে তার দৃষ্টিপাত হয়ে গেল, এতে তার কোনো সমস্যা নেই।

এগুলো হলো সামান্য দৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে, যদি কোনো ব্যক্তি পুরোপুরি দৃষ্টিপাত করে (এদিক ওদিক তাকায়) অথবা কিবলাকে পেছনে করে ফেলে তাহলে তার সলাত বাতিল হয়ে যাবে, যদি সে এটা প্রচণ্ড ভয় বা এ জাতীয় কোনো ওজরের কারণে না করে থাকে।

৪. সলাতে দুচোখ বন্ধ করে রাখা: কারণ এটা অগ্নিপূজকদের অগ্নি পূজা করার সময়ের সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ। এ কথাও বলা হয় যে, একাজ ইহুদিদের কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর আমাদেরকে কাফেরদের সাথে সাদৃশ্য রাখতে নিষেধ করা হয়েছে।

৫. সাজদায় দুই কনুই বিছিয়ে দেওয়া: আল্লাহর রসূল **ﷺ** বলেন:

اعْتَدُلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَنْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعِيهِ أَبْسَاطَ الْكَلْبِ

“সাজদায় সামঞ্জস্য রক্ষা করো এবং তোমাদের মধ্যে কেউ যেন দুই হাত বিছিয়ে না দেয়, যেমন কুকুর বিছিয়ে দেয়।”^{২৩১}

সুতরাং মুসলিম জন্য উচিত হচ্ছে, দুই হাতের মাঝে ফাঁকা রাখা, হাতব্যকে মাটি থেকে উপরে উঠিয়ে রাখা এবং প্রাণির সাথে সাদৃশ্য না রাখা।

৬. সলাতে বেশি বেশি অনর্থক কাজ করা: অনর্থক কাজে অতর ব্যন্ত থাকলে সলাতে উদ্বিষ্ট একান্ততা অর্জিত হয় না।

৭. কোমরে হাত রাখা: আবু হুরায়রা **رض** হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন:

هَىَ أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ مُخْتَصِراً

“কোমরে হাত রেখে সলাত আদায় করতে লোকেদের নিষেধ করা হয়েছে।”^{২৩২}

^{২৩০} সহীল বুখারী, ঘ. ৭৫১।

^{২৩১} সহীল বুখারী, ঘ. ৮২২।

^{২৩২} সহীল বুখারী, ঘ. ১২২০।

هُلُوْ مَاجَايْ هَاتِ رَأْخَا . اخْتَصَارَ بَأْ نَخْصَر
هُلُوْ نِيتَسْبِرِ الْعَاصِرَةِ عَلَى تَسْبِيرِ الْعَاصِرَةِ .
কোমর। আয়িশাহ প্রেরণ এর কারণ বলতে গিয়ে বলেন: ইন্দিরা এমনটি করে।^{২৩৩}

৮. সলাতে কাপড় ঝুলিয়ে পরা এবং মুখ চেকে রাখা: আবু হুরায়রা প্রেরণ বলেন:

هَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ وَأَنْ يُغَطِّي الرَّجُلُ فَاهَ

“আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সলাতের সময় কাপড় উপর থেকে নিচের দিকে
ঝুলিয়ে দিতে ও মুখ চেকে রাখতে নিষেধ করেছেন।”^{২৩৪}

৯. সদল হলো: কোনো মুসল্লি কর্তৃক একটি কাপড় তার দুই কাধের উপর ছড়িয়ে দেওয়া আর তার
দুই প্রান্তকে না গুটানো। অথবা জমিন পর্যন্ত চলে গেল, না গুটানোর কারণে। ফলে এটা
অস্বাভাবিক হয়ে যায়।

১০. ইমামের আগে সলাতের কার্যাবলী সম্পাদন করা: আল্লাহর রসূল প্রেরণ বলেন:

أَلَا يَخْشِي - أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْوَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حَمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةً حَمَارٍ .

“সাবধান! তোমাদের কেউ যখন ইমামের পূর্বে মাথা ওঠিয়ে ফেলে, তখন সে কি ভয় করে না
যে, আল্লাহ তা‘আলা তার মাথা গাধার মাথায় পরিণত করে দিবেন অথবা তার আকৃতিকে গাধার
আকৃতি করে দেবেন?”^{২৩৫}

১১. দুই হাতের আঙুলগুলোকে একটার ফাঁকে অপরটি তুকানো (আঙুল বিজড়িত করা): যে
ব্যক্তি ওয়ু করে সলাতের জন্য মসজিদে আসে, তাকে ক্ষিপ্ত করতে রসূল প্রেরণ
করেছেন।^{২৩৬} সুতরাং সলাতের মধ্যে একাজ হতে বিরত থাকা আর বেশি প্রয়োজন। ক্ষিপ্ত
হলো: হাতের আঙুলগুলোর এক আঙুলকে অপর আঙুলের মাঝে প্রবেশ করানো। তবে
সলাতের বাইরে ক্ষিপ্ত করা মাকরহ নয় যদিও তা মাসজিদে হয়। যেমনটি রসূল প্রেরণ যুলুল
ইয়াদাইন এর ঘটনায় করেছিলেন।

১২. চুল এবং কাপড় গুটানো: আবুল্লাহ ইবনু আব্বাস প্রেরণ বলেন:

أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمِ، وَيَكْفُفَ ثُوبَهُ وَلَا شَعْرَهُ

^{২৩৩} সহীল বুখারী, হা. ৩৪৫৮।

^{২৩৪} সুনান আবু দাউদ, হা. ৬৪৩, তিরমিয়ী, হা. ৩৭৯।

^{২৩৫} সহীল বুখারী, হা. ৬৯১, সহীল মুসলিম, হা. ফুআ. ৪২৭।

^{২৩৬} মুসলিম হাকিম: ১/২০৬।

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাত অঙ্গের সাহায্যে সাজদা করা এবং সলাতের মধ্যে চুল একত্র না করা এবং কাপড় না গুটাতে নির্দেশপ্রাণ হয়েছিলেন।”^{২৩৭}

এই শব্দটা কখনো জমা করা অর্থে ব্যবহার হয়। তখন এর অর্থ হবে কাপড় এবং চুল জমা করা বা মিলানো মাকরহ আবার কখনো নিষেধ হওয়া অর্থে ব্যবহার হয়। তখন এর অর্থ হবে সাজদাবস্থায় কাপড় ও চুল ঝুলে পড়াকে বাধা দেওয়া নিষেধ। এসকল কাজই হলো অনর্থক কাজ, যেগুলো সলাতের একাগ্রতাকে নষ্ট করে।

১২. খাবার উপস্থিত হওয়া অবস্থায় অথবা পায়খানা প্রস্তাবের বেগ চেপে সলাত আদায় করা। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

لَا صَلَاةٌ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَانِ

“খাবার হাজির হলে কোনো সলাত নেই এবং পায়খানা-প্রস্তাবের বেগ নিয়ে সলাত হবে না।”^{২৩৮}

খাবার উপস্থিত হলে সলাত মাকরহ হওয়ার কারণ হলো, খাবার সন্তুখে উপস্থিত হলে এবং তা গ্রহণের ক্ষমতা থাকলে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি তা কামনা করে, আশা করে। তবে মুসল্লি যদি রোজাদার হয় অথবা খাবার খেয়ে তৃপ্ত হয়ে থাকে অথবা খাবার খুব গরমের কারণে খেতে সক্ষম না হয়, তাহলে সেই অবস্থায় সলাত পড়া মাকরহ নয়।

খব্বান: প্রস্তাব-পায়খানা। পায়খানা-প্রস্তাবের বেগ নিয়ে সলাত পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এ অবস্থায় মুসল্লির অন্তর বেগ নিয়ে ব্যস্ত হতে পারে এবং মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, ফলে তা মাকরহ। কারণ পায়খানা-প্রস্তাবের বেগ সলাতের একাগ্রতাকে বাধাগ্রস্থ করে। আবার কখনো কখনো পায়খানা প্রস্তাব আটকে রাখলে মানুষ ক্ষতির সন্মুখীনও হয়।

১৩. আকাশের দিকে তাকানো। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

لَيَسْتَهِنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ

“লোকেদের উচিত তারা যেন সলাতের মধ্যে আকাশের দিকে দৃষ্টি নিষ্কেপ না করে। তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেওয়া হবে।”^{২৩৯}

^{২৩৭} সহীহ বুখারী, হ্য. ৮১৫, সহীহ মুসলিম, হ্য. ফুআ. ৪৯০।

^{২৩৮} সহীহ মুসলিম, হ্য. ১১৩৩, ফুআ. ৫৬০।

^{২৩৯} সহীহ মুসলিম, হ্য. ৮৫৩, ফুআ. ৪২৯।

المسألة التاسعة: حكم تارك الصلاة নবম মাসআলা: সলাত পরিত্যাগকারীর বিধান

যে ব্যক্তি সলাত ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করে, সে কাফের। কারণ সে আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রসূল ﷺ এবং মুসলিমদের ইজমাকে মিথ্যাপতিপন্নকারী।

যে ব্যক্তি অলসতা এবং অমনোযোগী হয়ে সলাত ছেড়ে দেয়, তার ব্যাপারে সঠিক মত হলো, যদি সে সর্বদাই অলসতা ও অমনোযোগী হয়ে সলাত ছেড়ে দেয়, তাহলে কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের সম্পর্কে বলেন:

فِإِنْ تَأْبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الرِّزْكَاهُ فَإِخْرَانُكُمْ فِي الدِّينِ

“অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে এবং সলাত আদায় করে ও যাকাত দেয়, তাহলে তারা তোমাদের দীনী ভাই।” সূরা তাওবাহ : ১১

এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, যদি তারা সলাত প্রতিষ্ঠার শর্তকে বাস্তবায়ন না করে, তাহলে তারা মুসলিম নয় এবং আমাদের দ্বিনি ভাইও নয়। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

“আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মধ্যে (মুক্তির) প্রতিশ্রুতি হলো সলাত। সুতরাং যে ব্যক্তি সলাত ছেড়ে দেয়, সে কুফুরী করে।”^{২৪০}

অপর হাদীসে বলেন:

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

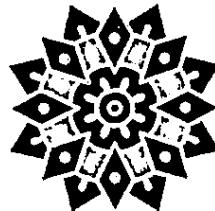
“বান্দা এবং শিরক-কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সলাত পরিত্যাগ করা।”^{২৪১}

তবে যে ব্যক্তি কখনো সলাত পড়ে আবার কখনো ছেড়ে দেয় অথবা এক দুই ওয়াক্ত ফরয সলাত পড়ে তার ব্যাপারে স্পষ্ট বিধান হলো, সে কাফের নয়। কেননা সে সলাতকে পরিপূর্ণ রূপে ছেড়ে দেয়নি। যেমনটি দলীলে এসেছে: تَرْكُ الصَّلَاةِ

সুতরাং ছুকুমটা হলো لَا تَرْكُ الصَّلَاةِ তথা দুইএক ওয়াক্ত সলাত ছাড়া ৪ তথা পুরোপুরি সলাত ছেড়ে দেওয়া নয়। এই ক্ষেত্রে সে মূলের উপর থাকবে তথা ইসলামের মধ্যে থাকবে। আমরা তাকে নিশ্চিত ইলম ব্যতীত ইসলাম থেকে বের করার ঘোষণা দিবো না। আর যেটা নিশ্চিত ইলম দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, সেটা নিশ্চিত ইলম ছাড়া বর্জিত হবে না।

^{২৪০} তিরমিয়ী, খ. ২৬২১।

^{২৪১} সহীহ মুসলিম, খ. ১৪৮, ফুআ. ৮২।



الباب الخامس: في صلاة التطوع পঞ্চম অনুচ্ছেদ: নফল সলাত

এই অধ্যায়ে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

التطوع দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওয়াজিব ব্যতীত সকল ইবাদত।

المسألة الأولى: فضلها، والحكمة من مشروعيتها

প্রথম মাসআলা: নফল সলাতের ফয়েলত এবং শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল

১. ফয়েলত: ইলম অর্জন ও আল্লাহর রাষ্ট্রে জিহাদের পরে আল্লাহর নৈকট্য লাভের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পথ হলো নফল সলাত আদায় করা। নাবী ﷺ আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে সর্বদা নফল সলাত আদায় করতেন। আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ أَذَّنَهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقْرَبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْيِّ مِمَّا فَتَرَضَتْ عَلَيْهِ، وَمَا يَرْأُلُ عَبْدِي يَتَغَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُجِّهَهُ...
“নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বলেন: যে ব্যক্তি আমার কোনো বন্ধুর সঙ্গে শক্ততা রাখবে, আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করব। আমি যা কিছু আমার বান্দার উপর ফরয করেছি শুধুমাত্র তা দ্বারাই আমার বেশি নৈকট্য লাভ করবে। তবে আমার বান্দা নফল ইবাদাত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে। এমন কি আমি তাকে আমার এমন প্রিয় পাত্র বানিয়ে নিই।”^{২৪২}

২. শরীয়তসম্মত হওয়ার হিকমাহ: আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা বান্দাদের প্রতি রহমত স্বরূপ নফল সলাতকে শরীয়ত সম্মত করেছেন। তাই তিনি প্রত্যেক ফরয সলাতের সময় নফল সলাতের ব্যবস্থা করেছেন যাতে বান্দা এই নফল সলাতগুলো আদায় করে সৌমান বৃক্ষি, মর্যাদা সমুন্নত, ফরয আমলগুলো পরিপূর্ণকরণ এবং কিয়ামতের দিন আমলের ঘাটতি পূরণ করতে

^{২৪২} সহীহল বুখারী, হ. ৬৫০২; সিলসিলাহ সহীহাহ: ১৬৪০।

পারে। কারণ ফরয আদায়ে কখনো কখনো কমতি হয়ে যায়। (এই কমতিটা আল্লাহ তা'আলা নফল দিয়ে পূর্ণ করে দিবেন।) যেমনটি আবু হুরায়রা رضي الله عنه এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسِبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الصَّلَاةُ فَإِنْ أَعْتَهَا، وَإِلَّا قِيلَ: انظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطْوِعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطْوِعٌ أَكْبِلَتِ الْفَرِيقَةُ مِنْ تَطْوِعِهِ، ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمُفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ.

“কিয়ামতের দিন মুসলিম বান্দার নিকট থেকে সর্বপ্রথম ফরয সলাতের হিসাব নেওয়া হবে। যদি সে তা পূর্ণরূপে আদায় করে থাকে (তবে ভালো), অন্যথায় বলা হবে, দেখো তার কোনো নফল সলাত আছে কি না? যদি তার নফল সলাত থেকে থাকে, তবে তা দিয়ে তার ফরয সলাত পূর্ণ করা হবে। অতঃপর অন্যান্য সকল ফরয আমলের ব্যাপারেও অনুরূপ ব্যবস্থা করা হবে।”^{১৪৩}

المسألة الثانية: في أقسامها

দ্বিতীয় মাসআলা: নফল সলাতের প্রকারভেদ

নফল সলাত দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট সলাত আদায় করা। এগুলোকে সুন্নাতে মুয়াকাদা বলা হয়। এগুলোর মধ্যে কিছু রয়েছে ফরয সলাতের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন সুন্নাতে রাওয়াতিব (দিনে রাতে ১২ রাকআত) আর কিছু রয়েছে, যেগুলো ফরয সলাতের সাথে সম্পৃক্ত নয়। যেমন-বিতর সলাত, চাশতের সলাত, সূর্য গ্রহণের সলাত।

দ্বিতীয় প্রকার: নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট নয় এমন সুন্নাত সলাত। এগুলোকে সুন্নাতে মুতলাক্তাহ বলা হয়।

প্রথম প্রকারের মধ্যে অনেক প্রকারভেদ রয়েছে। যার কতগুলো কতক্ষের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো সূর্য গ্রহণের সলাত; অতঃপর বিতর সলাত; অতঃপর বৃষ্টির সলাত; অতঃপর তারাবীহ এর সলাত।

দ্বিতীয় প্রকারের সলাতগুলো সারারাত আদায় করা শরীয়তসম্মত এবং দিনেও পড়া যায়। তবে নিষিদ্ধ সময়গুলো ব্যতীত। আর রাতের সলাত দিনের সলাতের চেয়ে বেশি ফর্যালতপূর্ণ।

^{১৪৩} সুনান আবু দাউদ, হ্য. ৬৮৪, সুনান নাসাই, হ্য. ৪৬৬, ৪৬৭; ইবনু মাজাহ: ১৪২৫; সানাদ সহীহ।

المسألة الثالثة: ما تُسْنِنُ لِهِ الْجَمَاعَةُ مِنْ صَلَاةِ التَّطْوِعِ

তৃতীয় মাসআলা: যে নকল সলাতগুলো জামাআতের সাথে আদায় করা সুন্নাত
তারাবীর সলাত, বৃষ্টি প্রার্থনার সলাত এবং সূর্য়ঘংঘের সলাত জামাআতে আদায় করা সুন্নাত।

المسألة الرابعة: في عدد الرواتب

চতুর্থ মাসআলা: সুন্নাতে রাওয়াতিব সলাতের সংখ্যা

শব্দটি শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হলো সর্বদা চলমান। এই সলাতগুলো ফরয সলাতের অনুগামী। এই সলাতগুলোর উপকারিতা হলো, ফরয সলাতের ঘটতি হলে এগুলোর দ্বারা সেই ঘটতি পূরণ করে দেওয়া হবে, যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

সলাতের সংখ্যা হলো মোট ১২ রাকআত। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে ইবনু উমার رض এর হাদীস। তিনি বলেন,

حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظَّهِيرَ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظَّهِيرَ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ،
وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاءِ كَانَتْ سَاعَةً لَا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا،
فَحَدَّثَنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَأَذْنَ الْمَؤْذِنِ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

“আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দশ রাকআত সলাত সংরক্ষণ করে রেখেছি। যুহরের পূর্বে দুই রাকআত; পরে দুই রাকআত; মাগরিবের পরে দুই রাকআত; ইশার পরে দুই রাকআত এবং দুই রাকআত সকালের (ফজরের) সলাতের পূর্বে। [ইবনু উমার رض বলেন] আর সময়টি ছিল এমন, যখন আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট প্রবেশ করিনি। উস্মান মু’মিনীন হাফসা رض আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, যখন ফজর উদিত হতো এবং মুআব্যিন আযান দিতেন তখন দুই রাকআত সলাত আদায় করতেন।”^{২৪৪}

বারো রাকআত সুন্নাত সলাত আদায়ের ব্যাপারে মুসলিমদের মনোযোগী হওয়া এবং গুরুত্বারোপ করা উচিত। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي اللَّهُ تَعَالَى فِي كُلِّ يَوْمٍ ثَنَتِي عَشْرَةَ رَكْعَةً إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ

^{২৪৪} মধ্যে বুখারী, হ. ১১৮০, ১১৮১, ১১৮২ সহীহ মুসলিম, হ. ৭২৯। বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনাকে একত্রিত করা হয়েছে।

“কোনো মুসলিম বান্দা যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে প্রতিদিন ফরয সলাত ব্যতীত ১২ রাকআত নফল সলাত আদায় করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জানাতে একটি ঘর তৈরি করেন অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) জানাতে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করা হয়।”^{২৪৫}

এগুলো হলো পূর্বে উল্লিখিত ১০ রাকআত আর যোহরের পূর্বে (দুই রাকআতের) স্থানে চার রাকআত। ইমাম তিরমিয়ী (যান্ম) উম্মু হাবীবাহ (যান্ম) এর বর্ণিত হাদীসে দুই রাকআত বৃদ্ধি করে বর্ণনা করেছেন। ঐ হাদীসে এসেছে:

أَرْبَعًا قَبْلَ الظَّهَرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

“যুহরের সলাতের পূর্বে চার রাকআত এবং পরে দুই রাকআত; মাগরিবের সলাতের পরে দুই রাকআত, ইশার সলাতের পরে দুই রাকআত এবং ফজরের সলাতের পূর্বে দুই রাকআত।”^{২৪৬}

এমনটি আয়িশাহ (যান্ম) এর হাদীসেও সাব্যস্ত হয়েছে। তিনি বলেন:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظَّهَرِ

“নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহরের পূর্বে চার রাকআত (সুন্নাত) ছাড়তেন না।”^{২৪৭}

এই সুন্নাত গুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ফজরের পূর্বের দুই রাকআত সুন্নাত। আল্লাহর রসূল (যান্ম) বলেছেন:

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

“ফজরের দুই রাকআত (সুন্নাত) দুনিয়া ও তার মাঝের সকল কিছুর চাইতে উত্তম।”^{২৪৮}

আয়িশাহ (যান্ম) এই রাকআত সম্পর্কে বলেন:

وَلَمْ يَكُنْ يَدْعُهُمَا أَبَدًا

“তিনি কখনোই তা (সুন্নাত) ছাড়তেন না।”^{২৪৯}

^{২৪৫} সহীহ মুসলিম, হা. ১৫৮১, ফুআ. ৭২৮।

^{২৪৬} তিরমিয়ী, হা. ৪১৫।

^{২৪৭} সহীহল বুখারী, হা. ১১৮২।

^{২৪৮} সহীহল বুখারী, হা. ৬৪১০, সহীহ মুসলিম, হা. ২৬৭৭।

^{২৪৯} সহীহল বুখারী, হা. ১১৫৯।

المسألة الخامسة: حكم الوتر وفضله ووقته পঞ্চম মাসআলা: বিতর সলাতের বিধান, ফর্মালত এবং সময়

হকুম: বিতর সলাত হলো সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। নাবী ﷺ এই সলাতের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন এবং উৎসাহ প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ وَتْرَ يُحِبُّ الْوَتْرَ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ বেজোড়, তিনি বেজোড় ভালোবাসেন।”^{২৫০}

অপর হাদীসে তিনি বলেন:

يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، أَوْتُرُوا، فَإِنَّ اللَّهَ وَتْرٌ، يُحِبُّ الْوَتْرَ

“হে কুরআনের অনুসারীরা! বিতর পড়ো। নিশ্চয়ই আল্লাহ বেজোড়, তিনি বেজোড় ভালোবাসেন।”^{২৫১}

বিতর সলাতের ওয়াক্ত/সময়: আলেমদের ঐকমত্যে ইশা এবং ফজরের মধ্যবর্তী সময়টা হলো বিতরের সময়। আল্লাহর রসূল ﷺ এই সময়ে বিতর পড়েছেন এবং পড়তে বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ، هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُرِّ النَّعْمٍ، صَلَاةُ الْوَتْرِ، مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ

“আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য লাল বর্ণের ঘোড়ার চাইতেও উভয় একটি সলাত নির্ধারিত করেছেন। সলাতুল বিতর। যা ইশার পরে ও সুবেহ সাদিকের পূর্বে মধ্যবর্তী সময়ে।”^{২৫২}

যখন ফজরের সময় হয়ে যাবে, তখন বিতরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাবে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَنْتَنِي، فَإِذَا حَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوَتِّرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

“রাতের সলাত দুই দুই (রাক‘আত) করে। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ফজর হওয়ার আশঙ্কা করে, সে যেন এক রাক‘আত সলাত আদায় করে নেয়। আর সে যে সলাত আদায় করল, তা তার জন্য বিতর হবে।”^{২৫৩}

এটা ফজরের সময় হলে বিতরের সময় শেষ হওয়ার দলীল। হাফেজ ইবনু হাজার আসফুলানী (رض) বলেন: উক্ত হাদীসটি থেকে ইমাম আবু দাউদ (رض) ও ইমাম নাসাই (رض) কর্তৃক বর্ণিত

^{২৫০} সহীহল বুখারী, হ্য. ৬৪১০, সহীহ মুসলিম, হ্য. ২৬৭৭।

^{২৫১} সুনান আবু দাউদ, হ্য. ১৪১৬।

^{২৫২} সুনান আবু দাউদ, হ্য. ১৪১৮, তিরমিয়ী, হ্য. ৪৫২।

^{২৫৩} সহীহল বুখারী, হ্য. ৯৯০।

হাদীস (যেটাকে আবু আওয়ানা এবং অন্যরা সহীহ বলেছেন) সেটাই স্পষ্ট হয়। আর সেই হাদীসটি হলো (আবু দাউদ ও নাসাইর) ইবনু উমার ^{رض} বলতেন:

مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ. فَإِذَا كَانَ الْفَجْرُ قَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالوَتْرِ.

“যে ব্যক্তি রাতে নফল সলাত আদায় করবে সে যেন বিতর সলাত সর্বশেষে আদায় করে। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবেই সলাত আদায় করতে আদেশ করতেন। অতঃপর যখন ফজর হয়ে যায়, তখন রাতের সকল সলাত ও বিতর সলাতের সময় শেষ হয়ে যায়।”^{২৫৪}

শেষ রাতে বিতর সলাত পড়া প্রথম রাতে পড়ার চেয়ে উত্তম। তবে যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, সে শেষ রাতে জগ্রহ হতে পারবে না তার জন্য প্রথম রাতে তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাব। আর যে ব্যক্তি শেষ রাতে জগ্রত হওয়ার ইচ্ছা করে তার জন্য শেষ রাতে পড়া মুস্তাহাব। জাবির ^{رض} হতে বর্ণিত। নাবী ^{رض} বলেছেন:

مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ أَوْلَاهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ

“যে ব্যক্তির আশঙ্কা হবে, শেষ রাতে জাগতে পারবে না, সে যেন রাতের প্রথমভাগেই (ইশার সলাতের পর) বিতর আদায় করে নেয়। আর কেউ যদি শেষ রাতে জাগতে আগ্রহী থাকে (অর্থাৎ শেষ রাতে জগতে পারবে বলে নিশ্চিত হতে পারে) তাহলে সে যেন শেষভাগে বিতর আদায় করে। কারণ শেষ রাতের সলাতে (ফেরেশতারা উপস্থিত) সাক্ষী থাকে। আর এটাই সর্বোত্তম।”^{২৫৫}

المسألة السادسة: صفة الوتر وعدد ركعاته

ষষ্ঠ মাসতালা: বিতর সলাতের পদ্ধতি এবং তার রাকআত সংখ্যা

বিতর সলাতের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো এক রাকআত। যেমনটি ইবনু আকবাস এবং ইবনু উমার ^{رض} এর হাদীসে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে : “الوَتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ” : “বিতর সলাত রাতের শেষাংশে এক রাকআত।”^{২৫৬}

^{২৫৪} ফাতহল বারী: ২/৫৫৭।

^{২৫৫} সহীহ মুসলিম, ঘ. ৭৫৫।

^{২৫৬} সহীহ মুসলিম, ঘ. ৭৫২, ৭৫৩।

এ ছাড়াও ইবনু উমার কর্তৃক বর্ণিত আরেক হাদীসে এসেছে:

صَلَّى رَبُّكَ عَلَيْهِ وَآتَهُ تُورَّةً لَمْ يَأْتِ مَقْدَصَ صَلَّى

“এক রাক’আত সলাত আদায় করে নেয়। আর তা পূর্বে পড়া সলাতকে তার জন্য বিতর করে দিবে।”

বিতর সলাত তিন রাকআত পড়াও জায়েয়। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে আয়শাহ ফালুক্স বর্তুক বর্ণিত হাদীসে। তিনি বলেন,

يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا،

“চার রাক’আত পড়তেন। এই চার রাক’আত আদায়ের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর আরও চার রাক’আত সলাত আদায় করতেন। এই চার রাক’আতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিন রাক’আত আদায় করতেন।”^{২৫৭}

এই তিন রাকআত সলাত দুই সালামে পড়াও জায়েয়। আব্দুল্লাহ বিন উমার ফালুক্স দুই সালামে তিন রাকআত সলাত আদায় করতেন। যেমন হাদীসে এসেছে:

كَانَ يُسَلِّمُ مِنْ رُكْعَيْنِ حَتَّىٰ يَأْمُرَ بِعَضِ حَاجَاتِهِ.

“দুই রাক’আতের মাঝে সালাম ফিরাতেন। অতঃপর কাউকে কোনো প্রয়োজনীয় কাজের নির্দেশ দিতেন।”^{২৫৮}

অনুরূপ এই তিন রাকআত সলাত ধারাবাহিক এক তাশাহুদ ও এক সালামে আদায় করাও জায়েয়। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে আয়শাহ ফালুক্স এর হাদীসে। তিনি বলেন:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَتِّرُ بَلَاثَ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ

“নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন রাকআত বিতর পড়তেন। শেষ রাকআত ব্যতীত বসতেন না।”^{২৫৯}

এই তিন রাকআত সলাত দুই তাশাহুদ ও এক সালামে আদায় করা যাবে না, যাতে মাগরিবের সলাতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হয়ে যায়। কেননা আল্লাহর রসূল ﷺ এর থেকে নিষেধ করেছেন।^{২৬০}

বিতর সলাত পাঁচ এবং সাত রাকআতও পড়া জায়েয়। এগুলোতেও শুধু শেষ রাকআতে বসতে হবে অর্থাৎ একটি মাত্র তাশাহুদ ও সালামে সলাত আদায় করতে হবে। আয়শাহ ফালুক্স বলেন,

^{২৫৭} সহীল বুখারী, হ্য. ৩৫৬৯।

^{২৫৮} সহীল বুখারী, হ্য. ১৯১।

^{২৫৯} সুনান নাসাই, হ্য. ১৬৯৮।

^{২৬০} দারাকুন্নম: ২/২৪-২৫, হাকেম: ১/৩০৪।

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً، يُوَتِّرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجِدُ لِسُونَهُ شَيْءًا إِلَّا فِي آخِرِهَا.

“আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের বেলা তেরো রাকআত সলাত আদায় করতেন। এর মধ্যে পাঁচ রাকআত বিতর করতেন এবং এতে একেবারে শেষে ছাড়া কোনো বৈঠক করতেন না।”^{২৬১}

এ ছাড়াও উম্মু সালামাহ  এর হাদীসে একই কথা বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَتِّرُ بِسَبْعَ أَوْ بِخَمْسٍ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَلَا كَلَامٍ.

“আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাত অথবা পাঁচ রাকআত বিতর পড়তেন। তাদের মাঝে সালাম অথবা কথা বলার মাধ্যমে পার্থক্য করতেন না।”^{২৬২}

المسألة السابعة: الأوقات المنهي عن النافلة فيها

সপ্তম মাসআলা: নফল সলাতের জন্য নিষিদ্ধ সময়সমূহ

যে সময়গুলোতে নফল সলাত আদায় করা নিষেধ সেগুলো মোট পাঁচটি:

প্রথম: ফজরের সলাত আদায় করার পর থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত। রসূল  বলেছেন:

لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

“ফজরের সলাতের পরে সূর্য ওঠা পর্যন্ত কোনো সলাত নেই।”^{২৬৩}

দ্বিতীয়: সূর্য উদিত হওয়ার পর থেকে চোখের দেখা বর্ষা পরিমাণ উঁচু না হওয়া পর্যন্ত। এক বর্ষার পরিমাণ প্রায় এক মিটার। সূর্য এক মিটার উচু হতে প্রায় ১৫ থেকে ২০ মিনিট সময় লাগে। সূর্য উদিত হওয়ার পর যখন এক বর্ষা পরিমাণ বা এক মিটার পরিমাণ উঁচু হবে তখন নিষিদ্ধ সময় শেষ হয়ে যাবে। রসূল  আমর বিন আরোসকে বলেন:

صَلَلْ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْبِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْقَعَ.

^{২৬১} সহীহ মুসলিম, ঘ. ৭৩৭।

^{২৬২} ইবনু মাজাহ, ঘ. ১১৯২।

^{২৬৩} সহীহ বুখারী, ঘ. ৫৮৬, সহীহ মুসলিম, ঘ. ৮২৭।

“তুমি ফজরের সলাত আদায় করো, অতঃপর সূর্য উদিত হয়ে উপরে না ওঠা পর্যন্ত সলাত থেকে বিরত থাকো।”^{২৬৪}

তৃতীয়: সূর্য মধ্যাকাশে^{২৬৫} উপস্থিত হওয়ার সময় থেকে পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ে যোহরের ওয়াক্ত না হওয়া পর্যন্ত। উকবা বিন আমের ~~আল-কুফ~~ বলেন:

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرْ فِيهِنَّ مَوْتَانًا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بِازِغَةً حَتَّى تَرْقَعَ، وَحِينَ يَقُولُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ، وَحِينَ تَتَضَيَّفُ لِلْغَرْوَبِ حَتَّى تَغْرِبُ.

“আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি সময়ে আমাদেরকে সলাত আদায় করতে এবং আমাদের মৃতদেরকে দাফন করতে নিষেধ করেছেন। ১. সূর্য যখন আলোকোভাসিত হয়ে উদয় হতে থাকে তখন থেকে তা পরিষ্কারভাবে উপরে ওঠা পর্যন্ত, ২. সূর্য ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় থেকে হেলে যাওয়া পর্যন্ত, ৩. সূর্য ক্ষীণ আলো হওয়ার পর থেকে তা সম্পূর্ণ অস্ত যাওয়া পর্যন্ত।”^{২৬৬}

এর অর্থ হলো সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়া।

চতুর্থ: আসরের সলাতের পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত।^{২৬৭} রসূল ﷺ বলেছেন:

لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرِبَ الشَّمْسُ.

“ফজরের পরে সূর্য ওঠা পর্যন্ত কোনো সলাত নেই এবং আসরের পরে সূর্য ডোবা পর্যন্ত কোনো সলাত নেই।”^{২৬৮}

পঞ্চম: সূর্য ডুবতে শুরুর পর থেকে সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত। যেমন পূর্বের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

এই পাঁচ নিষিদ্ধ সময় তিনটি সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেই তিনটি সময় হলো: ১. ফজরের সলাতের পর থেকে নিয়ে সূর্য এক বর্ষা বা এক মিটার উঁচু না হওয়া পর্যন্ত। ২. সূর্য মধ্যাকাশে হওয়ার পর থেকে নিয়ে পশ্চিম দিকে ঢলে না পড়া পর্যন্ত। ৩. আসরের সলাতের পর থেকে নিয়ে সূর্য ডোবা শেষ না হওয়া পর্যন্ত।

^{২৬৪} সহীহ মুসলিম, হা. ৮৩২।

^{২৬৫} সূর্য উচু হওয়ার শেষ স্থান। কেননা উচু হয় পূর্বাকাশে যখন পূর্বাকাশে উচু হওয়া শেষ হয় তখন পশ্চিমাকাশে ঢলে পরে।

^{২৬৬} সহীহ মুসলিম, হা. ৮৩১।

^{২৬৭} অর্থাৎ সূর্য ডুবতে শুরু করা পর্যন্ত।

^{২৬৮} ইবনু মাজাহ, হা. ১২৫০।

এই সময়গুলোতে সলাত নিষিদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য:

নাবী ﷺ বর্ণনা করেছেন যে, কাফেররা সূর্য উদিত হওয়া এবং ডোবার সময় পূজা করে। সুতরাং এ দুই সময়ে সলাত আদায় করাটা তাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়। আমর বিন আবাসা ﷺ এর হাদিসে এসেছে:

فَإِنَّهَا -أي الشمسم- تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَجِئْتَهُ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ،... فَإِنَّهَا تَغْرِبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَجِئْتَهُ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ.

“অতঃপর তা -সূর্য- উদিত হওয়ার সময় শয়তানের দুই শিং-এর মাঝখান দিয়ে উদিত হয় এবং তখন কাফেররা সূর্যকে সাজদা করে ...। কারণ তা -সূর্য- শয়তানের দুই শিং-এর মাঝখান দিয়ে অন্ত যায় এবং তখন কাফেররা সূর্যকে সাজদা করে।”^{২৬৯}

এটা হলো সূর্য উদিত হওয়া এবং সূর্য ডোবার সময় সলাত নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ।

সূর্য উদিত হওয়ার পর কিছু সময় এবং মধ্যকাশে থেকে পশ্চিমে ঢলে পড়ার আগ পর্যন্ত সলাত নিষিদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য: নাবী ﷺ এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

فَإِنَّ حِئَتَهُ يَسْجُدُ جَهَنَّمُ

“কারণ তখন জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হয়।”^{২৭০}

সুতরাং এই সময়গুলোতে নফল সলাত পড়া বৈধ নয়। তবে যদি কোনো সলাত পড়ার দলীল পাওয়া যায় তাহলে তা আদায় করা বৈধ। যেমন- তাওয়াফের দুই রাকআত সলাত।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى فِيهِ أَيْةً سَاعَةً شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ

“হে আবদে মানাফের বংশধর! তোমরা কাউকে রাত বা দিনের যে কোনো সময়ে এই ঘরের তাওয়াফ করতে ও সলাত আদায় করতে বাঁধা দিবে না।”^{২৭১}

অনুরূপভাবে ফজরের সুন্নাত ফজরের পরে আদায় করা, যোহরের সুন্নাতের কায়া আসরের পরে আদায় করা। বিশেষ করে যখন যোহরের সলাত আসরের সাথে জমা করে আদায় করা হবে তখন অনুরূপ কারণবশত যে সলাতগুলো পড়া হয় সেগুলোও আদায় করা বৈধ।

^{২৬৯} সহীহ মুসলিম, হ্য. ৮৩২।

^{২৭০} সহীহ মুসলিম, হ্য. ৮৩২।

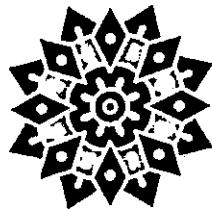
^{২৭১} সুনান আবু দাউদ, হ্য. ১৮৯৪, তিরমিয়ী, হ্য. ৮৬৮।

যেমন- জানায়ার সলাত, মসজিদে প্রবেশের সলাত, সূর্য গ্রহণের সলাত। অনুরূপভাবে এই সময় গুলোতে ছুটে যাওয়া ফরয সলাতের কাষা আদায় করাও জায়েয। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أُوْ نَسِيَّهَا فَلْيُصْلِلْهَا إِذَا ذُكِرَهَا.

“কোনো ব্যক্তি সলাত আদায় থেকে ঘুমিয়ে গেলে অথবা ভুলে গেলে, স্মরণ হওয়া মাত্রই যেন সে তা আদায় করে নেয়।”^{১১}

ফরয সলাত হলো ঝণের মতো, এটা আদায় করা ওয়াজিব। সুতরাং যখনই সলাতের কথা স্মরণ হবে, তখনই আদায় করে নিতে হবে।



الباب السادس : في سجود السهو والتلاوة والشكر ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: সাহ সাজদা, তিলাওয়াতের সাজদা এবং শুকরিয়ার সাজদা

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المسألة الأولى: في مشروعية سجود السهو وأسبابه

প্রথম মাসআলা: সাহ সাজদার শরীয়ত সম্মত হওয়া এবং তার কারণসমূহ
সাহ সাজদার দ্বারা উদ্দেশ্য:

সলাতে কম, বৃদ্ধি অথবা সন্দেহের সংশোধন স্বরূপ সলাতের শেষে যে সাজদা করা হয় তাকে
সাহ সাজদা বলে। সাহ সাজদা শরীয়ত সম্মত। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجِدْ سَجْدَتَيْنِ

“তোমাদের কারো ভুল হয়ে গেলে সে যেন দুটি সাজদা করে।” ২৭৩

আল্লাহর রসূল ﷺ সাহ সাজদা করেছেন। এর আলোচনা সামনে আসবে। সাহ সাজদা শরীয়ত
সম্মত হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

সহ সাজদার কারণ হলো মোট তিনটি:

১. সলাতে কোনো কাজ করা;
২. কম করা;
৩. সন্দেহ হওয়া।

^{২৭০} সঠীয় মুসলিম, ঘ. ১১৭০; ফুআ, ৫৭২।

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: مَتى يَجِبُ؟

দ্বিতীয় মাসআলা: কখন সাহু সাজদা ওয়াজির?

নিম্নোক্ত কারণে সাহু সাজদা ওয়াজির:

১. যদি সলাতের কোনো কাজ বেশি হয়ে যায়। যেমন- রুকু, সাজদা, কিয়াম, তাশাহহুদ।
আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رض বলেন:

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمْ، فَلَمَّا أَنْفَعَنَّ تَوْشِيْقَ الْقَوْمِ بَيْنَهُمْ، قَوْلَاهُ: مَا شَاءْنُكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ زِيدٌ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَا، قَالُوا: فَإِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَأَنْفَعْتَهُمْ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ. إِنَّمَا نَسِيْتُمْ مَا حَدُّكُمْ فَلَيْسَ بِمُجْدٍ لَكُمْ سَجْدَتَيْنِ)

“আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো এক সলাত আদায় করতে পাঁচ রাকআত আদায় করলেন। সলাত শেষে তিনি ঘুরলে লোকজন পরম্পর কানাঘুষা করতে থাকল। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে জিঞ্জেস করলেন: ব্যাপার কী? সবাই বলল, হে আল্লাহর রসূল! সলাতের রাকআত কি বৃদ্ধি করা হয়েছে? তিনি বললেন: না। তখন সবাই বলল, আপনি তো সলাত পাঁচ রাকআত আদায় করেছেন। অতঃপর তিনি (এ কথা শুনে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘুরলেন এবং দুটি সাজদা করে সালাম ফিরালেন। অতঃপর বললেন: আমি তোমাদের মতোই মানুষ। আমিও ভুল করি, যেমন তোমরা ভুল করো। তোমাদের কারো ভুল হয়ে গেলে সে যেন দুটি সাজদা করে।”^{২৭৪}

সলাত অবস্থায় যখন বেশি হওয়া সম্পর্কে জানা যাবে, তখন তার জন্য বসে যাওয়া আবশ্যিক, যদিও সে রুকু অবস্থায় থাকে। কারণ জানার পরেও যদি সে অতিরিক্তের উপর চলমান থাকে তাহলে সে জেনে শুনে বেশি সলাত পড়লো। আর এটা জায়েয নয়।

২. সলাত শেষ হওয়ার পূর্বে সালাম ফিরিয়ে দেওয়া। ইমরান বিন হুসাইন رض বলেন:

سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَتِ رَكَعَاتٍ، مِنَ الْعَصْرِ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ، فَقَامَ رَجُلٌ بِسِيطٍ الْبَيْدَنِ، قَوْلَاهُ: أَقْصَرَتِ الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ «فَخَرَجَ، فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي كَانَ تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَتِ السَّهْوِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

“রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আসরের সলাতে তিন রাকআত আদায় করার পর সালাম ফিরালেন। এরপর তিনি তার বাড়ির মধ্যে চলে গেলেন। তখন দীর্ঘ হাত

বিশিষ্ট ব্যক্তি তার কাছে গিয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল! সলাত কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে? এ কথা শুনে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বেরিয়ে আসলেন। অতঃপর যে রাকআত সলাত তিনি ছেড়েছিলেন, তা আদায় করে সালাম ফিরালেন। এরপর সাহর দুটি সাজদা করলেন এবং আবার সালাম ফিরালেন।”^{২৭৫}

৩. অশুন্দ কুরআন তিলাওয়াত করা যাতে অর্থ পরিবর্তন/ভুল হয়ে যায়। কারণ ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল পড়াটা সলাতকে বাতিল করে দেয়। সুতরাং অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল পড়লে সাহ সাজদা দেওয়া ওয়াজিব।

৪. সলাতের কোনো ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়া। ইবনু বুহাইনা رض বলেন:

صَلَّى اللَّهُ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعْتَنِي مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَامَ، فَلَمْ يَجِلِّسْ^{২৭৬}، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرَنَا تَسْلِيمَةً كَبَرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ سَلَّمَ.

“আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিয়ে দুই রাকআত সলাত আদায় করলেন। (দ্বিতীয় রাকআতে) তিনি না বসে উঠে দাঁড়ালে লোকজন সবাই তার সাথে সাথে উঠে দাঁড়াল। তিনি সলাত শেষ করলে অর্থাৎ সলাত প্রায় শেষ করলে আমরা তার সালাম ফিরানোর অপেক্ষায় ছিলাম। এ সময় তিনি তাকবীর বললেন এবং সালাম ফিরানোর পূর্বেই বসে দুটি সাজদা করলেন। এরপর তিনি সালাম ফিরালেন।”^{২৭৭}

এটা এমন হাদীসের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে যে হাদীসে মধ্যবর্তী তাশাহুদ ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং এর উপর সকল ওয়াজিবকে তুলনা করা হবে। যেমন- রুকু-সাজদার তাসবীহ, দুই সাজদার মাঝের দুআ, স্থানান্তরের তাকবীরসমূহ ছেড়ে দেওয়া।

৫. রাকআতের সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ হলে অর্থাৎ কত রাকআত পড়েছে মনে না থাকলে সাহ সাজদা দেওয়া ওয়াজিব। সলাতে সন্দেহ হলে মুসল্লী দ্বিধাপ্রস্তু হয়ে পড়ে যে, সলাত কম পড়েছে নাকি বেশি পড়েছে। ফলে তার নিয়ত দুর্বল হয়ে যায়। এমতাবস্থায় সাজদার মাধ্যমে ঘাটতি পূরণ করা প্রয়োজন। আবু হুরায়রা رض বলেন: রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

إِنَّ أَحَدَكُمْ، إِذَا قَامَ يُصْلِيْ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ، حَتَّىْ لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدَكُمْ، فَلَيْسَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

^{২৭৫} সহীহ মুসলিম, খা. ১১৮১; ফুআ. ৬৭৪।

^{২৭৬} অর্থাৎ প্রথম তাশাহুদ ছেড়ে দিলেন।

^{২৭৭} সহীহস বুখারী, খা. ১২৩০, সহীহ মুসলিম, খা. ১১৫৬; ফুআ. ৫৭০।

“তোমরা কেউ যখন সলাতে দাঁড়াও, তখন শয়তান তার কাছে এসে তাকে সন্দেহ ও দ্বিধা-
দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলে দেয়। এমনকি সে কয় রাকআত সলাত আদায় করল তাও স্মরণ করতে
পারে না। তোমাদের কেউ একুশ অবস্থা হতে দেখলে যেন বসে বসে দুটি (অতিরিক্ত) সাজদা
করে নেয়।”^{২৭৮}

এক্ষেত্রে মুসলিম নিম্নোক্ত দুটি অবস্থার যে-কোনো একটিতে থাকে। ১. সন্দেহটা এমন হয় যে, সে কম পড়েছে না বেশি পড়েছে কোনোটাকে প্রাধান্য দিতে পারে না। এমতাবস্থায় মুসলিম কমকে হিসাব করবে এবং সাহ সাজদা করবে। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرُحِ الشَّكَّ وَلْيَسْتَقِنَ عَلَى مَا اسْتَقِنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَلِمَ... .

“যখন সলাতের মধ্যে তোমাদের কারো এরূপ সন্দেহ হয় যে, সে তিন রাকআত আদায় করেছে না চার রাকআত? তাহলে সে সন্দেহ দূর করে (যে কয় রাকআত আদায় করেছে বলে নিশ্চিত হবে তার উপর) দৃঢ়চিত্ত হবে। এরপর সালাম ফেরানোর পূর্বে দুটি সাজদা করবে।”^{২৭৯}

তবে মুসল্লি যদি কোনোটার প্রবল ধারণা করে এবং একটি প্রাধান্য দিতে পারে, তাহলে সে সেটার উপর আমল করে সাহ সাজদা করবে। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
বলেছেন:

فليتحر الصواب، ثم ليتم عليه -أي على التحرى- ثم ليسّم، ثم ليسجد سجدين بعد أن يسلّم.

“চিন্তা-ভাবনার ভিত্তিতে যেটি সঠিক বলে মনে হবে সেটিই করবে এবং এর উপর ভিত্তি করে সলাত শেষ করবে। অতঃপর সালাম ফিরাবে। অতঃপর সালামের পরে দুটি সাজদা করবে।”^{১৮০}

المسألة الثالثة: متى يُسنّ؟

তৃতীয় মাসআলা: কখন সাহু সাজদা করা সন্মত?

যখন শরীয়ত সম্মত দুআ, ক্রিয়াআত অন্য স্থানে ভুলে পড়া হয়ে যায়, এই স্থানগুলোতে শরীয়ত সম্মত দুআ বা অন্য কিছু থাকা সত্ত্বেও তখন সাহ সাজদা করা সুন্নাত। যেমন- ঝুক সাজদা য

^{१९६} नवीन वर्खानी, श. १२३१, मुसिलम, ११५२; फूआ. ३८९।

ନାଥୀବ ପ୍ରସଲିମ, ପ୍ରା. ୫୭୧ ।

२६० सवीत यन्त्रिम, अ. ५७२।

কুরআন পাঠ করে ফেলা, কিয়ামে তাশাহুদ পড়ে ফেলা। অথচ রুকুতে পড়ার জন্য سبحان ربِّي العظيم নামে একটি আলাদা দুআ রয়েছে। এই মর্মে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

“তোমাদের কারো ভুল হয়ে গেলে সে যেন দুটি সাজদা করে।” ২৮১

المسألة الرابعة: موضعه وصفته

চতুর্থ মাসআলা: সাহু সাজদার স্থান এবং পদ্ধতি

১. সাহু সাজদার স্থান: এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সাহু সাজদার স্থান প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসগুলো দুই প্রকার:

এক প্রকার সালামের পূর্বের কথা প্রমাণ করে। আরেক প্রকার সালামের পরের কথা প্রমাণ করে। এ জন্য কিছু মুহাক্কিগণ বলেছেন: সাহু সাজদা সালামের আগে বা পরে করার ব্যাপারে মুসল্লি ইচ্ছাধীন। কারণ হাদীসগুলো দুটি বিষয়েই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং যদি কেউ সর্বদা সালামের আগে সাহু সাজদা অথবা সর্বদা সালামের পরে করে, কোনো সমস্যা নেই, তা বৈধ হবে। ইমাম যুহরী رضي الله عنه বলেছেন, সালামের পূর্বে সাহু সাজদা করা রসূল ﷺ এর শেষ জীবনের কাজ ছিল।

২. সাহু সাজদার পদ্ধতি: সলাতের সাজদার মতোই দুটি সাজদা। সাজদায় যাওয়া এবং সাজদা থেকে ওঠার জন্য তাকবীর দিতে হয়। অতঃপর সালাম ফিরাতে হয়। কোনো কোনো ফকির এর মতে, সালামের পরে সাহু সাজদা দিলে তাশাহুদ পড়তে হবে। এই প্রসঙ্গে নাবী ﷺ থেকে তিনটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যাদের সামষ্টিক মান হাসান পর্যায়ে। ইবনু হাজার আসকুলানী رضي الله عنه এমনটি বর্ণনা করেছেন।^{১৮১}

المسألة الخامسة: سجود التلاوة

পঞ্চম মাসআলা: তিলাওয়াতের সাজদা

১. শরীয়ত সম্মত হওয়া এবং তার হুকুম: সাজদার আয়াত পাঠ করলে এবং শ্রবণ করলে সাজদা করা শরীয়ত সম্মত। ইবনু উমার رضي الله عنه বলেন:

^{১৮১} সন্ধীহ মুসলিম, খ. ৫৭২।

^{১৮২} কাতুল বারী ৩/১১৯।

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا سَجَدَ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، حَتَّىٰ مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعًا جَبَّاهَهُ.

“নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট এমন সূরা পাঠ করতেন, যাতে সাজদার আয়াত আছে। অতঃপর তিনি সাজদা করতেন, আমরাও তার সাথে সাজদা করতাম। এমনকি আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তার কপাল স্থাপনের (সাজদা করার) জায়গাটুকু পর্যন্ত পেত না।”^{২৮৩}

সঠিক তথ্য মতে, তিলাওয়াতের সাজদা করা সুন্নাত, ওয়াজিব নয়। যায়েদ বিন সাবিত رض নাবী ص এর নিকট সূরা নাজম পাঠ করলেন অতঃপর তিনি সাজদা করলেন না।^{২৮৪} এই হাদীস প্রমাণ করে, এটা ওয়াজিব নয়। সলাত এবং সলাতের বাইরে কুরআন যখন সাজদার আয়াত পাঠ করবে তখন কুরআন এবং শ্রোতা উভয়ের জন্যই সাজদা করা শরীয়ত সম্মত। নাবী যখন পাঠ করেছেন তখন নিজে সাজদা করেছেন এবং তার সাহাবীরাও তার সাথে সাজদা করেছেন। যেমনটি পূর্বের হাদীসে এসেছে (فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ) সলাতেও সাজদা করা শরীয়ত সম্মত। এর দলীল হলো ইমাম বুখারী رض ও মুসলিমের رض আবু রাফেস رض থেকে বর্ণিত হাদীস। আবু রাফেস رض বলেন,

صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ، فَقَرَأَ: إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، فَسَجَدَ، قَوْلُتُ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: سَجَدَتْ بِهَا خَلْفَ أَبِي القَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَزُلُّ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّىٰ أَلْقَاهُ.

“আমি একবার আবু হুরায়রা رض-এর সাথে ইশার সলাত আদায় করেছিলাম। তিনি সলাতে ইড়া দিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কী? তিনি বললেন, এই সূরা তিলাওয়াতে আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে আমি সাজদা করেছিলাম। তাঁর সঙ্গে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত এভাবে আমি সাজদা করতে থাকব।”^{২৮৫}

যদি কুরআন সাজদা না করে তাহলে শ্রোতাও সাজদা করবে না। কেননা শ্রোতা কুরআন অনুগামী। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে যায়েদ বিন সাবিত رض এর হাদীসে। সূরা নাজম পড়ে যায়েদ সাজদা করেননি, তাই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাজদা করেননি।

২. ফর্যালত: আবু হুরায়রা رض হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল ص বলেছেন:

إِذَا قَرَأَ أَبْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، اغْتَرَلَ الشَّيْطَانُ بِكَيْ، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ أَبْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرَتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فِي النَّارِ.

^{২৮৩} সংহিত বুখারী, ঘ. ১০৭৬, সহীহ মুসলিম, ঘ. ৫৭৫।

^{২৮৪} সংহিত বুখারী, ঘ. ১০৭৩।

^{২৮৫} সংহিত বুখারী, ঘ. ১০৭৮, সহীহ মুসলিম, ঘ. ৫৭৮।

“মানুষ যখন সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সাজদায় যায়, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে দূরে সরে পড়ে এবং বলতে থাকে, হায়! আমার দুর্ভাগ্য! বনী আদম সাজদার জন্য আদিষ্ট হলো। তারপর সে সাজদা করল এবং এর বিনিময়ে তার জন্য জাহান নির্ধারিত হলো। আর আমাকে সাজদার জন্য আদেশ করা হলো, কিন্তু আমি তা অস্বীকার করলাম, ফলে আমার জন্য জাহানাম নির্ধারিত হলো।”^{২৮৬}

৩. সাজদার পদ্ধতি বর্ণনা: একটি সাজদা করতে হবে। সাজদায় যাওয়ার সময় তাকবীর দিতে হবে এবং সলাতের সাজদার মতোই سُبْحَانَ رَبِّيِ الْأَعْلَى বলতে হবে।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي.

“হে আমাদের রব আল্লাহ! আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং আপনার প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।” এই দুআও পড়া যেতে পারে। কেউ যদি এই দুআ পাঠ করে,

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَيَصْرَهُ بِخَوْلِهِ وَفَوْرِيهِ

“আমার চেহারা সেই মহান সত্ত্বার জন্য সাজদা করল যিনি নিজ শক্তি ও সামর্থ্য একে সৃষ্টি করেছেন এবং এতে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন।” তাতেও কোনো সমস্যা নেই।^{২৮৭}

৪. কুরআন মাজিদে তিলাওয়াতের সাজদার স্থানসমূহ:

কুরআন মাজিদে সাজদার স্থান মোট ১৫টি। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে তা উল্লেখ করা হলো:

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|---------------------|
| ১. সূরা আ'রাফ, আয়াত নং ২০৬; | ২. সূরা রাদ, আয়াত নং ১৫; | ৩. সূরা নাহল ৪৯-৫০; |
| ৪. সূরা ইসরা ১০৭-১০৯; | ৫. সূরা মারযাম ৫৮; | ৬. সূরা হাজ্জ ১৮; |
| ৭. সূরা হাজ্জ ৭৭; | ৮. সূরা ফুরক্বান ৭৩; | ৯. সূরা নামল ২৫-২৬; |
| ১০. সূরা সাজদাহ ১৫; | ১১. সূরা ফুসসিলাত ৩৭-৩৮; | ১২. সূরা নাজম ৬২; |
| ১৩. সূরা ইনশিক্কাক ২০-২১; | ১৪. সূরা আলাকু ১৯; | |

১৫তম সাজদা হলো সূরা (স) সদ-এর সাজদা। এটা শুকরিয়ার সাজদা। ইবনু আবাস رض বলেন:

لَيْسَتْ صِنْعَةً عَزَّاً إِنَّ السُّجُودَ، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا.

“সূরা স-দ এর সাজদা অত্যাবশ্যক সাজদাসমূহের মধ্যে গণ্য নয়। তবে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি তা তিলাওয়াতের পর সাজদা করতে দেখেছি।”^{২৮৮}

^{২৮৬} সহীহ মুসলিম, হ্য. ৮১।

^{২৮৭} সুনান আবু দাউদ, হ্য. ১৪১৪; জামে তিরমিয়ী, হ্য. ৫৮০।

^{২৮৮} সহীহ বুখারী, হ্য. ১০৬৯।

المسألة السادسة: سجود الشكر ষষ্ঠি মাসআলা: শুকরিয়ার সাজদা

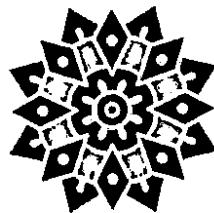
যে ব্যক্তি কোনো নিয়ামত লাভ করবে অথবা তার কোনো বিপদ দূরীভূত হবে অথবা কোনো সু-সংবাদ লাভ করবে, তার জন্য মুশাহাব হলো আল্লাহর রসূল ﷺ অনুসরণ করে আল্লাহর সাজদায় লুটিয়ে পড়া। এর জন্য কিবলামুখী হওয়া শর্ত নয়, তবে কিবলামুখী হওয়া উত্তম।

নাবী ﷺ শুকরিয়ার সাজদা করতেন। আবু বকর رض হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسِيرٌ أَوْ بُشِّرَ بِهِ، خَرَّ سَاجِدًا، شُكْرًا لِّلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

“নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট কোনো খুশির খবর আসলে তিনি মহামহিম আল্লাহর সমীপে কৃতজ্ঞতার সাজদায় লুটিয়ে পড়তেন।” ২৮৯

নাবী ﷺ এর সাহাবীগণও কৃতজ্ঞতার সাজদা করতেন। এই সাজদার বিধান তিলাওয়াতের সাজদার অনুরূপ এবং পদ্ধতিও একই।



الباب السابع: في صلاة الجماعة সপ্তম অনুচ্ছেদ: জামাআতে সলাত আদায় করা

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَحُكْمُهَا

প্রথম মাসআলা: জামাআতে সলাত আদায়ের মর্যাদা এবং তার বিধান

১. ফ্যালত: মসজিদের জামাআতের সাথে সলাত আদায় করা ইসলামের অন্যতম বড়ো একটি নির্দশন। মুসলমানরা এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছে যে, পাঁচ ওয়াক্ত সলাত মসজিদে আদায় করা বড়ো একটি ইবাদত। আল্লাহ তা'আলা এই উপরের জন্য নির্দিষ্ট কিছু সময়ে একত্রিত হওয়াকে শরীয়ত সম্মত করেছেন। যেমন- পাঁচ ওয়াক্ত সলাতে, জুম'আর সলাতে, ঈদের সলাতে, সূর্য গ্রহণের সলাতে। সবচেয়ে বড়ো এবং গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশ হলো আরাফার ময়দানে একত্রিত হওয়া। যেটা মুসলিম উপ্রাহর আকুণ্ডা, ইবাদত এবং তাদের ধর্মীয় নির্দশনাবলী ‘এক’ হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে। ইসলামে এই মহা সম্মেলনগুলিকে শরীয়ত সম্মত করা হয়েছে মুসলমানদের উপকারের জন্য। যেমন এই সম্মেলনগুলোতে তারা একে অপরের সাথে মিলিত হয়, একে অপরের খোঁজ খবর নিতে পারে ইত্যাদি। যেগুলো মুসলিম উপ্রাহর জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَابِيلَ لِتَعْعَارِفُوا إِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾
عِنْدَ اللَّهِ أَنَّقَاءُكُمْ

“হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই বেশি মর্যাদাবান যে তোমাদের মধ্যে বেশি তাকওয়াসম্পন্ন।” [সূরা হজরাত: ১৩]

ନାବୀ  ଜାମାଆତେ ସଲାତ ଆଦାୟେର ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରେଛେନ ଏବଂ ତାର ଫୟାଳତ ଓ ବିରାଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣନ ଦିଯେଛେନ । ତିନି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗେ ବଲେନ :

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدْرِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

“জামাআতের সাথে আদায় করা সলাত একাকী সলাতের চেয়ে সাতাশ গুণ উত্তম।”^{২৯০}

ତିନି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆରାମ୍ଭ ବଲେନ୍:

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاةِ فِي بَيْتِهِ، وَفِي سُوقِهِ، خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ: إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَخْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، لَا يُجْرِي جُهَّهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُطْ خَطْوَةً، إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحَتَّى
عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى، لَمْ تَرَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّ عَلَيْهِ، مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ... .

“কোনো ব্যক্তির জামাআতের সাথে সলাতের সওয়াব, তার নিজের ঘরে ও বাজারে আদায় করা
সলাতের সওয়াবের চেয়ে পঁচিশ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এর কারণ হলো, সে যখন উত্তমরূপে
ওযু করে অতঃপর একমাত্র সলাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে রওয়ানা করে, তখন তার প্রতি কদমের
বিনিময়ে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি গুনাহ ক্ষমা করা হয়। সলাত আদায়ের পর সে
যতক্ষণ নিজ সলাতের স্থানে থাকে, ফিরিশতাগণ তারজন্য দুআ করতে থাকেন। আর তোমাদের
কেউ যতক্ষণ সলাতের অপেক্ষায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সলাতে বলে গণ্য হয়।”^{২৯১}

২. বিধান: পাঁচ ওয়াক্ত সলাত জামাআতের সাথে আদায় করা ওয়াজিব। কুরআন এবং সুন্নাহ
এর আবশ্যিকতার উপর প্রমাণ করে।

কুরআনের দলীল-

﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقِمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقْرُبُوا إِلَيْهَا مِنْهُمْ مَعَكَ﴾

“যখন তুমি তাদের (সৈন্যদের) মধ্যে থাকো, অতঃপর সলাতে দভায়মান হও তখন যেন তাদের একদল তোমার সাথে দভায়মান হয়।” [সূরা নিসা : ১০২]

ভীতিকর অবস্থায় যখন আদেশ আবশ্যিকতার জন্য তাহলে নিরাপদ অবস্থায় সেটা আরও বেশি আবশ্যিকতার হকদার !

२० सदीह युवतिम्, श. ६५०।

୨୩ ମଧ୍ୟଭଲ ବୁଥାରୀ, ପ୍ର. ୬୪୭ ।

হাদীস থেকে দলীল: আবু হুরায়রা رض হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

أَنْقَلَ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةً الْعِشَاءِ، وَصَلَاةً الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَّوا. وَلَقَدْ هَمِمْتُ أَنْ أَمْرِ بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ، ثُمَّ أَمْرَ رَجُلًا فِي صَلَوةِ النَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلَقَ مَعِي بِرَجَالٍ مَعَهُمْ حُزْمٌ مِنْ خَطْبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأَخْرَقَ عَلَيْهِمْ بَيْوَاهٍ بِالنَّارِ.

“ইশা ও ফজরের সলাত মুনাফিকদের উপর সর্বাপেক্ষা কঠিন। তারা যদি জানত যে, এ দুটি সলাতের পুরস্কার বা সওয়াব কত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে বুক হেঁচড়ে হলেও তারা এ দুই ওয়াক্ত জামাআতে উপস্থিত হতো। আমি ইচ্ছা হয় যে, সলাতের আদেশ দেই, অতঃপর সলাতের ইকামত দেওয়া হোক। এরপর কাউকে লোকদের ইমামতি করতে বলি। আর আমি কিছু লোককে নিয়ে ঝালানী কাঠের বোঝাসহ যারা সলাতের জামাআতে আসে না, তাদের কাছে যাই এবং আগুন দিয়ে তাদের ঘর-বাড়ি ঝালিয়ে দেই।”^{১৯২}

উপরিউক্ত হাদীসটি জামাআতের সাথে সলাত আদায় করার আবশ্যিকতা প্রমাণ করে। এটা এজন্য যে, রসূল ﷺ প্রথমতঃ জামাআত থেকে পিছিয়ে থাকা ব্যক্তিদেরকে মুনাফিক বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর একথা সর্বজন বিদিত যে, সুন্নাতী বিষয়ে পিছনে থাকা ব্যক্তিদেরকে মুনাফিক হিসেবে গণ্য করা হয় না। সুতরাং একথা প্রমাণিত হয় যে, তারা ওয়াজিব থেকে বিরত থেকেছেন। দ্বিতীয়তঃ রসূল ﷺ তাদেরকে জামাআত থেকে বিরত থাকার জন্য শান্তি দিতে চেয়েছিলেন। আর শান্তি তো কেবল ওয়াজিব কাজের জন্যই হয়, সুন্নাত কাজের জন্য হয় না। তবে রসূল ﷺ কে আগুন দ্বারা শান্তি প্রদানে এটাই বাধা প্রদান করেছে যে, আগুন দ্বারা কেবল আল্লাহই শান্তি প্রদান করবেন। এ কথাও বলা হয়েছে যে, নারী এবং ছোটো শিশু, যাদের উপর জামাআত ফরয নয় তাদের বাড়িতে অবস্থান করাটাই আল্লাহর রসূল ﷺ কে শান্তি প্রদানে বাধা দিয়েছে।

সুন্নাত থেকে দলীল: একজন অঙ্ক লোক, যাকে নিয়ে মাসজিদে যাওয়ার-আসার কেউ ছিল না। সে রসূল ﷺ-এর নিকটে বাড়িতে সলাত পড়ার অনুমতি চাইল। অতঃপর রসূল ﷺ বললেন:

أَحِبْ لَا أَحِدُكَ رُخْصَةً

“তুমি মাসজিদে আসবে, তোমার জন্য কোনো অনুমতি নেই।”^{১৯৩}

অপর হাদীসে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

^{১৯২} সহীহ মুসলিম, হা. ১৩৬৮, ফুআ. ৬৫১; সহীহল বুখারী, হা. ৬৪৪।

^{১৯৩} সহীহ মুসলিম, হা. ১৩৭২, ফুআ. ৬৫৩; সুন্নাত আবু দাউদ, হা. ৫৫২।

مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ، إِلَّا مِنْ عُذْرٍ.

“যে ব্যক্তি আযান শুনতে পেল, অতঃপর জামাআতে উপস্থিত হলো না, তার সলাত নাই। তবে কোনো ওয়র থাকলে ভিন্ন বিষয়।” ২৯৪

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رض বলেন:

لَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا يَخْلُفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقُ مَغْلُومُ النَّفَاقِ

“আমরা নিজেদেরকে দেখেছি যে, সর্বজনবিদিত মুনাফিক ব্যতীত কেউ-ই জামাআতে সলাত পড়া ছেড়ে দিতো না।” ২৯৫

নারী এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু ব্যতীত শুধুমাত্র পুরুষদের উপর জামাআতে সলাত আদায় করা ওয়াজিব। আল্লাহর রসূল ﷺ মহিলাদের ক্ষেত্রে বলেন: “তাদের ঘরই তাদের জন্য উত্তম।” ২৯৬

মসজিদে সলাতের জামাআতে মহিলাদের শরীক হওয়াতে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। তবে শর্ত হলো, স্বামীর অনুমতি, ফির্না হতে মুক্ত থাকা এবং পর্দা থাকতে হবে। যে মহিলা মসজিদে থাকে তার জন্য জামাআতে সলাত পড়া ওয়াজিব, এটাই সঠিক মত।

যে ব্যক্তি বিনা ওজরে জামাআত ছেড়ে দিয়ে একাকি সলাত পড়ে তার সলাত হয়ে যাবে। তবে ওয়াজিব পরিত্যাগ করার জন্য সে পাপী হবে।

المسألة الثانية: إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى: هل يجب عليه أن يصلى مع الجماعة الصلاة التي قد صلاتها أولاً؟

দ্বিতীয় মাসআলা: কেগনো ব্যক্তি ফরয সলাত আদায়ের পর মসজিদে প্রবেশ করলে আদায়কৃত সলাত পুনরায় জামাআতের সাথে আদায় করা কি তার উপর আবশ্যক? না, আদায়কৃত সলাত পুনরায় জামাআতের সাথে আদায় করা তার জন্য ওয়াজিব নয়। এটা তার জন্য সুন্নাত। এমতাবস্থায় প্রথম সলাত ফরয আর দ্বিতীয়টি সুন্নাত হলে বিবেচিত হবে। আবু যাব رض এর হাদীসে এসেছে, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

^{২৯৪} সুনান আবু দাউদ, হা. ৫৫১, ইবনু মাজাহ, হা. ৭৯৩।

^{২৯৫} সংহীহ মুসলিম, হা. ৬৫৪।

^{২৯৬} সুনান আবু দাউদ, হা. ৫৬৭; আহমাদ ২/৬৭; হাকিম ১/২০৯ এবং ইয়াম হাকিম সংহীহ বলেছেন।

كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمْرَاءُ يُؤْخِرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ - أَوْ - يُبَيِّنُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ قَالَ: «صَلِّ
الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ، فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ».

“তুমি যদি এমন ইমামের অধীন হও, যে সলাতকে তার সময় থেকে দেরি করে অথবা সলাতকে তার নির্দিষ্ট সময় থেকে মেনে ফেলে, তাহলে কী করবে? তিনি ﷺ বললেন: তুমি সলাতকে তার নির্দিষ্ট সময়ে পড়ে নিবে। তারপরে যদি তাদের সাথে অর্থাৎ- ইমামের সাথে জামা’আতে সলাত পাও তাহলে তাদের সাথেও আদায় করবে। এটা তোমার জন্য নফল হিসেবে গণ্য হবে।”^{২৯৭}

অপর হাদীসে আল্লাহর রসূল ﷺ মসজিদে জামাআত থেকে পৃথক দুইজন লোককে বললেন:

إِذَا صَلَيْتُمْ فِي رَحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدًا جَمَاعَةً فَصَلِّا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ.

“তোমরা বাড়িতে সলাত পড়ার পর যদি মসজিদে এসে জামা’আত হতে দেখো, তাহলে তাদের সাথে আবার সলাত পড়। এটা তোমাদের উভয়ের জন্য নফল হবে।”^{২৯৮}

المسألة الثالثة: أقل ما تتعقد به الجماعة

তৃতীয় মাসআলা: জামাআতের জন্য সর্বনিম্ন সংখ্যা

জামাআতের জন্য সর্বনিম্ন হলো দুইজন হওয়া, এতে কোনো দ্বিমত নেই। আল্লাহর রসূল ﷺ মালেক বিন হুয়াইরিসকে বলেন:

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَأَذْنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، وَلَيُؤْمِنَكُمَا أَكْبَرُكُمْ.

“সলাতের সময় হলে তোমাদের দুইজনের একজন আযান দিবে এবং ইকামত বলবে। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে বড়ো সে ইমামতি করবে।”^{২৯৯}

المسألة الرابعة: بم تدرك الجماعة؟

চতুর্থ মাসআলা: কৌসের দ্বারা জামাআত পাওয়া যাবে؟

নাময়ের এক রাকআত পাওয়ার মাধ্যমে জামাআত পাওয়া গণ্য হবে। যে ব্যক্তি কোনো সন্দেহ ছাড়া ধীরস্থিতার সাথে রুকু পাবে, অতঃপর ইমামের অনুসরণ করবে, সে এক রাকআত পেয়ে যাবে। আবু হুরায়রা رضي الله عنه এর হাদীসে এসেছে, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

^{২৯৭} সঠীহ মুসলিম, ঘ. ৬৪৮।

^{২৯৮} সুনান আবু দাউদ, ঘ. ৫৭৫, ৫৭৬, তিরমিয়ী, ঘ. ২১৯।

^{২৯৯} সঠীহ বুখারী, ঘ. ৬৫৮, সঠীহ মুসলিম, ঘ. ৫৭৪।

إِذَا جِئْتُم إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَانسُجُودُوا، وَلَا تَعْدُوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَذْرَكَ الرُّكْعَةَ، فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ.

“যদি তোমরা আমাদের সাজদা অবস্থায় সলাতে আসো, তাহলে তোমরা সাজদা করো। আর এটাকে কিছুই মনে করবে না। যে ব্যক্তি বুকু পেল, সে সলাত পেয়ে গেল।”^{৩০০}

المسألة الخامسة: من يعذر بترك الجماعة

পঞ্চম মাসআলা: জামাআত ত্যাগের জন্য কার ওয়র ধর্তব্য হবে?

নিম্নোক্ত অবস্থাগুলো জামাআত পরিত্যাগের জন্য ওয়র হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে:

১. এমন অসুস্থ ব্যক্তি যে, যদি সে জামাআতে যায় তাহলে তার কষ্ট হবে। আল্লাহ তা'আলা কবলেন:

﴿لَنَسَ عَلَى الْأَغْنَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَغْرِي حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾

“অক্ষের কোনো দোষ নেই, খোঁড়ার কোনো দোষ নেই, রোগীর কোনো দোষ নেই।” (সূরা ফাতহ : ১৭)

আল্লাহর রসূল ﷺ যখন অসুস্থ হলেন তখন মসজিদে যাওয়া হতে বিরত থেকে বললেন:

مَرُوا أَبْأَابِنْ كِبْرٍ فَلَيُصَلِّ بِالنَّاسِ

“আবু বকরকে লোকদের ইমামতি করতে বলো।”^{৩০১}

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رض বলেন,

لَقَدْ رَأَيْتُمَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ بِنَفَاقِهِ، أَوْ مَرِيضٌ.

“আমরা নিজেদেরকে দেখেছি যে, সর্বজনবিদিত মুনাফিক এবং অসুস্থ ব্যক্তি ব্যতীত কেউই সলাতের জামাআত পরিত্যাগ করে না।”^{৩০২}

অনুরূপভাবে মসজিদে গেলে যার অসুস্থ হয়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে তার ওজরও গ্রহণযোগ্য হবে।

২. পায়খানা ও প্রশ্নাবের বেগ আসা অথবা ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাবার উপস্থিত হওয়া। আয়িশাহ رض মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন,

لَا صَلَاةٌ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَانَ.

“খাবার হজির হলে কোনো সলাত নেই। এবং পায়খানা-প্রশ্নাবের বেগ নিয়ে সলাত হবে না।”^{৩০৩}

^{৩০০} সুনান আবু দাউদ, ঘ. ৮৯৩।

^{৩০১} সংহৃদয় বুখারী, ঘ. ৭১৩, সংহৃদ মুসলিম, ঘ. ৪১৮।

^{৩০২} সংহৃদ মুসলিম, ঘ. ১৩৭৩, ফুআ. ৬৫৪।

^{৩০৩} সংহৃদ মুসলিম, ঘ. ১১৩৩, ফুআ. ৫৬০।

৩. যে নিখোঁজ হওয়ার আশংকা করে অথবা সম্পদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় করে অথবা ক্ষতির আশংকা করে। আবুল্লাহ ইবনে আবাস رض মারফু সুত্রে বর্ণনা করেছেন। রসূল ﷺ বলেছেন:

مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ، عُذْرٌ، قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: حَوْفٌ أَوْ مَرْضٌ، لَمْ تُفْبَلْ
مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى

“যে ব্যক্তি মুয়ায়িনের আযান শুনল এবং কোনো ওয়র তাকে সাড়া দিতে বাধা দিলো না- তারা বলল, হে আল্লাহর রসূল ওজর কী? তিনি ﷺ বললেন: ভয়-ভীতি অথবা অসুস্থতা।- তার অন্যত্র সলাত আল্লাহর কবুল করবেন না।”^{৩০৪}

অনুরূপ সকল প্রকার ভয় হোক সেটা নিজের উপর অথবা সম্পদের উপর অথবা পরিবারের উপর অথবা সন্তানের উপর। ভয়ের কারণে জামাআত ছেড়ে দেওয়ার ওজর গ্রহণ যোগ্য হবে। কারণ ভয়টাই ওজর।

৪. তুষার, বরফ, কাদা, বৃষ্টি অথবা অন্ধকার রাতে খুব ঠাণ্ডা বাতাসে জামাআতে যেতে কষ্ট হলে। ইবনু উমার رض বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ الْمُؤْذِنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةً بَارِدَةً ذَاتُ مَطَرٍ، يَقُولُ: لَا صَلُوْلَ فِي الرُّحَالِ

“আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শীত বা বর্ষণমুখর রাতে মুয়ায়িনকে নির্দেশ দিতেন, সে যেন বলে, শোন! তোমরা নিজ নিজ গৃহে সলাত আদায় করো।”^{৩০৫}

৫. ইমামের লঙ্ঘা ক্রিবারাতে কষ্ট হলে। এক ব্যক্তি মুয়াজ বিন জাবালের সাথে সলাত পড়তো। যখন মুয়াজ ক্রিবারাত লঙ্ঘা করল তখন সে জামাআত ছেড়ে দিয়ে একাকি সলাত পড়ে নিল। অতঃপর আল্লাহর রসূল ﷺ কে এই সংবাদ দেওয়া হলে তিনি তাকে তিরক্ষার করেননি।^{৩০৬}

৬. সফর সঙ্গে ছুটে যাওয়ার ভয়। এমতাবস্থায় কোনো ব্যক্তি সলাতের অপেক্ষা করার সময় তার মন সফর সঙ্গে ছুটে যাওয়ার ভয়ে ব্যস্ত থাকে।

৭. নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু নিকটবর্তী হলে। যেমন কারো নিকট আত্মীয় মৃত্যু সজ্জায় রয়েছে। আর সে ব্যক্তি মৃত্যু নিকটবর্তী ব্যক্তি নিকট থেকে তাকে শাহাদাতের তালকুনি দিতে চায়। এমন ওজর জামাআত পরিত্যাগের জন্য গ্রহণ যোগ্য হবে।

৮. ঝণগ্রস্ত ব্যক্তির পিছনে ঝণদাতা লেগে থাকে এবং ঝণ পরিশোধ করার কিছু না থাকে, ঝণদাতা তার পিছনে লেগে থাকার কারণে সে কষ্ট পায়, এমতাবস্থায় জামাআত পরিত্যাগ করতে পারে।

^{৩০৪} সুনান আবু দাউদ, হ্য. ৫৫১; অর্থগত বর্ণনা।

^{৩০৫} সহীহ বুখারী, হ্য. ৬৩২, সহীহ মুসলিম, হ্য. ৬৯৭।

^{৩০৬} সহীহ মুসলিম, হ্য. ১৪৮৬, ফুআ. ৬৯৭; সহীহ বুখারী, হ্য. ৬৩২।

المسألة السادسة: إعادة الجمعة في المسجد الواحد

ষষ্ঠى ماسআলা: একই মাসজিদে একাধিক জামাআত করা

যদি মাসজিদের নিয়মিত ইমামের জামাআতে উপস্থিত হতে বিলম্ব হওয়ার দরুণ কারো কারো সলাত ছুটে যায় তাহলে তারা ঐ মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত করে সলাত আদায় করবে। এটাই সঠিক মাসআলা। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَرْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَخَدْهُ

“নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির সাথে সলাত আদায় (জামাআতে) একাকী সলাত আদায়ের চেয়ে উত্তম।”^{৩০৭}

অপর হাদীসে এসেছে, এক ব্যক্তি জামাআত শেষ হওয়ার পর মাসজিদে আসলে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ؟ فَقَامَ أَحَدُ الْقَوْمِ، فَصَلَّى مَعَ الرَّجُلِ.

“তোমাদের মধ্যে কে এই ব্যক্তির সাথে সলাত আদায় করে সাদকা করতে চায়? এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল এবং তার সাথে সলাত আদায় করল।”^{৩০৮}

এমনিভাবে মসজিদ যদি রাস্তা অথবা বাজারের পাশে হয়, তাহলে সেখানে একাধিক জামাআত করাতে কোনো সমস্যা নেই। বিশেষ করে, যদি মসজিদের নিয়মিত ইমাম না থাকে আর বাজারের মানুষ ও পথচারীরা সেখান দিয়ে বারংবার যাতায়াত করে।

তবে যদি কোনো মসজিদে দু বা ততোধিক জামাআত নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় আর মানুষ এটাকে অভ্যাস হিসেবে গ্রহণ করে নেয়, তাহলে তা বৈধ নয়। কেননা নাবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদের আমলে এমন কিছু হয়েছে বলে জানা যায়নি।

নিয়মিত ইমামের সাথে জামাআতে উপস্থিত হওয়াতে অবহেলা এবং অলসতার কারণে মুসলিমদের কালিমা এবং দাওয়াতে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়। কখনো কখনো এটা প্রথম ওয়াক্ত থেকে সলাত বিলম্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

^{৩০৭} সুনan আবু দাউদ, ঘ. ৫৫৪।

^{৩০৮} তিরমিয়ী, ঘ. ২২০।

المسألة السابعة: حكم الصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة

সপ্তম মাসআলা: ফরয সলাতের ইকামত দেওয়া হলে অন্য সলাত আদায়ের বিধান
যদি মুয়াজ্জিন ফরয সলাতের ইকামত দেওয়া শুরু করে, তাহলে কারো জন্য নফল সলাত শুরু
করা বৈধ নয়। যদি সে এমতাবস্থায় নফল সলাত শুরু করে তাহলে সে ফরয ছেড়ে নফল নিয়ে
ব্যস্ত হয়ে পড়বে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

“সলাতের ইকামাত দেওয়া হলে ফরয সলাত ছাড়া অন্য কোনো সলাত নেই।”^{৩০৯}

মুঘাজ্জিন ইকামত দেওয়া অবস্থায় এক ব্যক্তিকে আল্লাহর রসূল ﷺ ফজরের সলাত পড়তে দেখলেন। অতঃপর বললেন: أَنْصِلِ الصُّبْحَ أَرْبَعًا

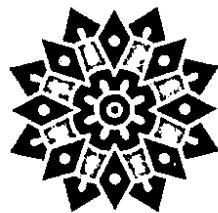
“তুমি কি ফজরের (ফরয) সলাত চার রাকআত পড়বে?” ৩১০

ତବେ ନଫଳ ସଲାତ ଶୁରୁ କରାର ପର ଯଦି ମୁୟାଜିନ ଇକାମତ ଦେଓଯା ଶୁରୁ କରେ ତାହଲେ ତାକବୀରେ ତାହରୀମାର ଫ୍ୟାଲିତ ଲାଭେର ଜନ୍ୟ ହାଲକାଭାବେ ସଲାତ ଶେଷ କରେ ଦିବେ । ଏହି ଦ୍ରୁତ ସଲାତ ପଡ଼ଟା ହବେ ଫୁରୁସ ସଲାତ ଧରାର ଜନ୍ୟ ।

କିଛୁ କିଛୁ ଆଲେମେର ମତେ, ଯଦି ପ୍ରଥମ ରାକାତାତେ ଥାକା ଅବସ୍ଥାୟ ଇକାମତ ଦେଇ ତାହଲେ ସଲାତ ଛେଡେ ଦିବେ । ଆର ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାକାତାତେ ଥାକେ, ତାହଲେ ସାଲାତ ହାଲକାଭାବେ ଶେଷ କରେ ଜାମାତାତେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ।

^{४०२} सहीह मसलिय, शा, १५२९, फुआ, ११०।

^{१०} संस्कृत मसलिम. वा. १५३५, फुजा. ७१।



الباب الثامن: في الإمامة في الصلاة অষ্টম অনুচ্ছেদ: সলাতে ইমামতি করা

এখানে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

إمامـة إـمـاـمـة دـارـة উ~দ~ে~শ~্য হলো: সলাতে ইমামের সাথে মুক্তাদির সম্পর্ক ইـمـاـمـة (ইমামাহ)।

المسألة الأولى: من أحق بالإمامـة؟ প্রথম মাসআলা: ইমামতির কে বেশি হকদার?

মানুষদের মধ্যে ইমামতির সবচেয়ে বেশি হকদার কে?- এর বর্ণনা আল্লাহর রসূল ﷺ দিয়ে গেছেন। এই মর্মে তিনি বলেছেন:

يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُفْرُوْهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءٌ، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنْنَةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنْنَةِ سَوَاءٌ، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءٌ، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا.

“লোকজনের ইমামতি করবে যে কুরআনের সর্বাপেক্ষা বেশি পাঠক। সবাই যদি কুরআনের জ্ঞানের সমান হয়, সেক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সুন্নাত সম্পর্কে অধিক পরিজ্ঞাত হবে সে-ই ইমামতি করবে। সুন্নাহর জ্ঞানেও সবাই সমান হলে হিজরতে যে অগ্রগামী সে ইমামতি করবে। হিজরতে সবাই সমান হলে, যে আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে, সে ইমামতি করবে।”^{৩১}

সুতরাং যারা ইমামতির সবচেয়ে বেশি হকদার হবেন তাদের আলোচনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. যিনি মানুষদের মাঝে সবচেয়ে সুন্দরভাবে কুরআন পাঠ করতে পারবেন এবং সলাতের বিষয়ে জ্ঞানী হবেন, তিনি হবেন ইমামতির হকদার। সুতরাং যখন একজন শ্রেষ্ঠ কুরী এবং

^{৩১} সহীহ মুসলিম, ঘ. ৬৭৩, [] অর্থ ইসলাম গ্রহণ করা।

আরেকজন তুলনামূলক কম পাঠ করতে পারেন তবে তিনি সলাতের বিষয়াদি এবং ছকুম আহকাম সম্পর্কে জ্ঞানী, তখন ফকীহ কুরী ব্যক্তি ইমামতির হকদার হবেন। কারণ সলাতে সুন্দর পাঠের চেয়ে সলাতের ছকুম আহকাম জানা বেশি প্রয়োজন।

২. কুরীর সাথে সাথে যিনি সুন্নাহ সম্পর্কে বেশি জ্ঞাত হবেন, তিনি হবেন ইমামতির হকদার। সুতরাং যখন কুরআন পাঠের দিক দিয়ে দুইজন ইমাম সমান হবেন, তবে উভয়ের একজন সুন্নাহ সম্পর্কে জ্ঞাত হবেন, তখন সুন্নাহ সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তি অগ্রাধিকার পাবেন। রসূল ﷺ বলেছেন:

فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءٌ، فَأَعْلَمُهُمُ بِالسُّنْنَةِ.

“সবাই যদি কুরআনের জ্ঞানে সমান হয়, সেক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সুন্নাত সম্পর্কে অধিক পরিজ্ঞাত হবে তিনিই ইমামতি করবেন।”

৩. যখন দুইজন ব্যক্তি কুরআত এবং সুন্নাহ সম্পর্কে জানার ব্যাপারে সমান হবেন তখন তদের হিজরতের প্রতি লক্ষ্য করতে হবে। যিনি আগে কুরুরের দেশ থেকে হিজরত করেছেন তিনি অগ্রাধিকার পাবেন।

৪. যখন দুইজন হিজরতের দিক দিয়ে সমান হবেন, তখন তাদের ইসলাম গ্রহণের দিকে লক্ষ্য করা হবে। যিনি আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তিনি অগ্রাধিকার পাবেন।

৫. যখন উপরের সবগুলো বিষয় সমান হবে তখন যিনি বয়সে বড়ো হবেন তিনি অগ্রাধিকার পাবেন। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءٌ، فَأَفْدَمُهُمْ سِلْمًا۔ وَفِي رَوَايَةِ سَنَّا

“হিজরতে সবাই সমান হলে, যে আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে, সে ইমামতি করবে।” অন্য বর্ণনায় বয়স রয়েছে।

অপর হাদীসে এসেছে: “وَلَيْؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ” তোমাদের মধ্যে যে বড়ো, সে ইমামতি করবে।”

উপরের সববিষয় সমান হলে লটারি করা হবে। যিনি লটারিতে জয়লাভ করবেন তিনিই ইমাম হবেন।

বাড়ির মানুষ মেহমানের চেয়ে ইমামতির বেশি হকদার। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

لَا يُؤْمِنُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ.

“কোনো ব্যক্তি যেন কারো বাড়িতে (বাড়ির কর্তাকে বাদ দিয়ে) কিংবা কারো ক্ষমতাসীন এলাকায় নিজে ইমামতি না করে।”^{৩১২}

^{৩১২} সহীহ মুসলিম, খ. ১৪২০, ফুআ. ৬৭৩।

অনুরূপভাবে দেশের বাদশাহ অন্যের চেয়ে ইমামতি করার বেশি হকদার। এমনিভাবে মসজিদের নিয়মিত ইমাম অন্যের চাইতে ইমামতির বেশি হকদার, যদিও অন্য ব্যক্তি তার চেয়ে ভালো কুরী হয় এবং বেশি জ্ঞানী হয়। তবে বাদশাহ ব্যতীত। কারণ হাদীসে এসেছে:

لَا يُؤْمِنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ.

“କୋଣୋ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେନ କାରୋ ବାଡ଼ିତେ (ବାଡ଼ିର କର୍ତ୍ତାକେ ବାଦ ଦିଯେ) କିଂବା କାରୋ ଶ୍ରମତାସୀନ ଏଲାକାୟ ନିଜେ ଇମାମତି ନା କରେ ।”

المُسَأَّلَةُ الثَّانِيَّةُ: مَنْ تَحْرِمُ إِمَامَتَهُ

ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସଭାଲା: ଯାର ଇମାଗତି କରା ହାରାମ

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଦେର ଇମାମତି କୁ଱ା ହାରାଯାଃ

১. মহিলা কর্তৃক পুরুষের ইমামতি করা। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةٌ

“সে জাতি সফল হবে না, স্বীলোক যাদের নেতা হয়।”^{৩১৩}

ମହିଳାଦେର ଶରୀଯତେର ବିଧାନ ହଲୋ, ତାରା ପର୍ଦାର ସାଥେ ସଲାତେର ପିଛନେର କାତାରେ ଦାଁଡାବେ । ସଦି ତାକେ ଇମାମ ବାନିଯେ ଦେଓଯା ହ୍ୟ, ତାହଲେ ଶରୀଯତେର ବିପରୀତ ହ୍ୟେ ଯାବେ ।

২. অপবিত্র ব্যক্তি (যার শরীরে নাপাকী) রয়েছে, আর সে তা জানে, ঐ ব্যক্তির ইমামতি করা হয়। যদি মুস্তাদী এই বিষয়টা না জেনে তার পিছনে সলাত পড়ে নেয় তাহলে তার সলাত হয়ে যাবে।

৩. মূর্খ ব্যক্তির ইমামতি করা হারাম। যে ব্যক্তি ভালোভাবে সূরা ফাতিহা পড়তে পারে না, যেখানে ইদগাম নেই সেখানে ইদগাম করে দেয়, কোনো অক্ষরকে অন্য অক্ষর দ্বারা পরিবর্তন করে দেয় অথবা এমন ভুল করে যার ফলে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। সলাতের ঝুকন পালন করতে না পারার কারণে তার ইমামতি বৈধ নয়। বরং হারাম।

৪. বিদআতী পাপীর ইমামতি করা হারাম। যখন তার পাপাচার প্রকাশ পেয়ে যাবে এবং বিদ্যাতের দিকে আহবান করাটাও প্রকাশিত হয়ে যাবে, তখন তার পিছনে সলাত পড়া বৈধ হবে না। তার ইমামতি করা হারাম। আল্লাহ তায়ারা বলেন:

७३८ नथिला बथारी, था. ४४२५।

﴿أَفَمِنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمْنَ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوْنَ﴾

“তাহলে কি যে ব্যক্তি মু’মিন হয়েছে সে পাপাচারীর মতো? তারা সমান নয়।” [সূরা সাজদাহ: ১৮]

৫. ঝুকু, সাজদা, কিয়াম, তাশাহুদ করতে অপারগ ব্যক্তির ইমামতি করা হারাম। সুতরাং যে ব্যক্তি এগুলো করতে সক্ষম, তারজন্য এমন ব্যক্তির পিছনে সলাত পড়া বৈধ নয়।

المسألة الثانية: من تكره إمامته

তৃতীয় মাসআলা: যার ইমামতি করা মাকরহ

প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির ইমামতি করা মাকরহ যে,

১. কুরআন পাঠে বেশি বেশি ভুল করে। তবে এটা সূরা ফাতিহা ব্যতীত। যদি সূরা ফাতিহাতে ভুল করে আর তার অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে তার সাথে সলাত হবে না। রসূল ﷺ বলেন: “يَوْمُ الْقِيَامَةِ إِذَا قُرِئَتِ الْقُرْآنُ فَلَا يَحِدُّهُ كُلُّ رَجُلٍ”

২. যে ইমামের ইমামতি লোকেরা অপছন্দ করে, অথবা অধিকাংশ লোক অপছন্দ করে, তার ইমামতি করা মাকরহ। নাবী ﷺ বলেন:

لَا تُرْفِعْ صَلَاتِهِمْ فَوْقَ رُؤُسِهِمْ شَبَرًا: رَجُلٌ أَمْ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.

“তিনি ব্যক্তির সলাত তাদের মাথার এক বিষত উপরেও ওঠে না। এমন ব্যক্তি যে জনগণের অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও তাদের ইমামতি করে।”^{৩১৪}

৩. যে ব্যক্তি কিছু অক্ষর গোপন করে পড়ে সেগুলোকে স্পষ্ট করে না, তার ইমামতি করা মাকরহ। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কোনো অক্ষরকে পুনরাবৃত্তি করে। এমনটি হলে অক্ষর বৃদ্ধি করা, যেমন **فَإِذَا قَدِمَ** কে পুনরাবৃত্তি করা হয়। এমনিভাবে **الْمُتَمَتَّمُ** শব্দে **كَمْ** কে পুনরাবৃত্তি করা হয়। এমন হলে অক্ষর বৃদ্ধি করার কারণে তার পিছনে সলাত পড়া মাকরহ।

المسألة الرابعة: موضع الإمام من المؤمنين

চতুর্থ মাসআলা: মুক্তাদী থেকে ইমামের অবস্থান

সুন্নাহ হলো ইমাম মুক্তাদীর সামনে থাকবে। আর মুক্তাদীরা দুই বা ততোধিক হবে তখন ইমামের পিছনে দাঁড়াবে। কারণ নাবী ﷺ যখন সলাতে দাঁড়াতেন তখন তিনি আগে দাঁড়াতেন আর মুক্তাদীরা পিছনে দাঁড়াতেন। সহীহ মুসলিম এবং আবু দাউদে এসেছে:

أن جابرًا و جبارًا و قفا، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فأخذ بآيديها حتى أقامهما خلفه.

“নিশ্চয়ই জাবির ও জাক্কার (সলাতের জন্য নাবী ﷺ এর সাথে) দাঁড়ালেন। একজন তাঁর ডান পাশে, অন্যজন তাঁর বাম পাশে। অতঃপর তিনি তাদের উভয়ের হাত ধরে পেছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন।”^{৩৫}

আনাস رض নাবী رض এর তাদের বাড়িতে সলাতের ঘটনায় বলেন:

لَمْ يَوْمٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَفْوُمُ خَلْفَهُ فَيَصْلِي بِنَا.

“আল্লাহর রসূল ﷺ ইমামতি করতেন আর আমরা তার পিছনে দাঁড়াতাম। অতঃপর তিনি আমাদের সলাত পড়াতেন।”^{৩৬}

মুক্তাদি একজন ব্যক্তি হলে ইমামের ডান পাশে দাঁড়াবে। হাদীসে এসেছে,

لَا نَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَارَ إِبْنَ صَخْرٍ وَجَابِرَأَلِيْ يَمِينَهُ لَا وَقْفًا عَنْ يَسَارِهِ.

“ইবনু সাখর ও জাবির رض যখন বাম পাশে দাঁড়ালেন, তিনি رض ডান পাশে নিয়ে আসলেন।”^{৩৭}

মুক্তাদি দুইজন হলে ইমাম তাদের মাঝে দাঁড়াবে। ইবনু মাসউদ رض একবার আলকামা এবং আসওয়াদের মাঝে দাঁড়িয়ে ইমামতি করলেন এবং বললেন:

هَكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ.

“এভাবেই আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে করতে দেখেছি।”^{৩৮}

তবে এটা জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উত্তম হলো- মুক্তাদি ইমামের পিছনে দাঁড়াবে। মহিলারা পুরুষদের পিছনের কাতারে দাড়াবে। আনাস رض বলেন,

وَصَفَقْتُ أَنَا وَالْيَتَمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُورُ مِنْ وَرَائِنَا.

“আমি ও ইয়াতীম বালক তাঁর পিছনে এবং আমাদের পিছনে বৃদ্ধা দাঁড়ালেন।”^{৩৯}

^{৩৫} সন্তীহ মুসলিম, ঘ্য. ৭৪০৬, ফুআ. ৩০১০; দীর্ঘ হাদীসকে সংক্ষিপ্ত করে অর্থগত বর্ণনা নিয়ে আসা হয়েছে।

^{৩৬} সন্তীহ মুসলিম, ঘ্য. ১৩৮৬, ফুআ. ৬৫৯।

^{৩৭} সন্তীহ মুসলিম, ঘ্য. ৭৪০৬, ফুআ. ৩০১০; মূল বইয়ে ইবনু আব্বাস রয়েছে, তবে হাদীসে ইবনু সাখর রয়েছে: অর্থগত বর্ণনা।

^{৩৮} সুনান আবু দাউদ, ঘ্য. ৬১৩।

^{৩৯} সন্তীহ মুসলিম, ঘ্য. ১৩৮৫, ফুআ. ৬৫৮।

المسألة الخامسة: ما يتحمله الإمام عن المأمور পঞ্চম মাসতালা: ইমাম মুক্তাদীর যে দায়িত্ব নিবে

জেহরী সলাতে (যে সলাতে কুরআত উচ্চ স্বরে পাঠ করা হয়) ইমাম মুক্তাদীর কুরআতের দায়িত্ব নিবে। আবু হুরায়রা رض এর হাদীসে এসেছে: **وَإِذَا قَرأَ فَأَنْصُتُوا**
“ইমাম যখন কুরআত পাঠ করবে, তখন তোমরা চুপ থাকবে।”^{৩২০}

অপর হাদীসে নাবী ﷺ বলেন: **مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَأَ عَلَيْهِ الْإِيمَامُ لَهُ قِرَاءَةُ الْإِيمَامِ** “যাদের ইমাম আছে ইমামের কুরআতই তার কুরআত।”^{৩২১}

সিররি সলাতে (যে সলাতে কুরআত নীরবে পড়া হয়) ইমাম মুক্তাদীর কুরআতের দায়িত্ব নিবে না। অর্থাৎ মুক্তাদীকে কুরআত পাঠ করতে হবে।

المسألة السادسة: مسابقة الإمام ষষ্ঠ মাসতালা: ইমামের আগে কোনো কাজ সম্পাদন করা

ইমামের আগে কোনো কাজ করা মুক্তাদীর জন্য বৈধ নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে তাকবীরে তাহরীমা দিবে তার সলাত নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ মুক্তাদীর জন্য শর্ত হলো, সে ইমামের পরে তাকবীর দিবে।

মুক্তাদীর জন্য সলাতের কাজগুলো ইমামের পরে সম্পাদন করা আবশ্যিক। নাবী ﷺ বলেন:
إِنَّمَا جُعِلَ الْإِيمَامُ لِيُؤْتَمْ بِهِ، فَإِذَا كَبَرُ فَكَبِرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَازْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ مِنْ حَمْدَهُ، فَقُولُوا: رَبِّكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا.

“ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁর অনুসরণের জন্য। তাই যখন তিনি তাকবীর বলেন, তখন তোমরাও তাকবীর বলবে। যখন তিনি বুকু করেন তখন তোমরাও বুকু করবে। যখন **سَمِعَ اللَّهُ مِنْ حَمْدَهُ** বলেন, তখন তোমরা **وَلَكَ الْحَمْدُ** বলবে। তিনি যখন সাজদা করেন তখন তোমরাও সাজদা করবে।”^{৩২২}

^{৩২০} সুনান আবু দাউদ, হা. ৬০৪; ইমাম আবু দাউদ رض বলেন, এই অংশটুকু সূরক্ষিত (মাহফুয়) নয়। এটা আবু খালিদের ধারণা মাত্র।

^{৩২১} ইবনু মাজাহ, হা. ৮৫০।

^{৩২২} সহীল্ল বুখারী, হা. ৩৮৯, সহীহ মুসলিম, হা. ৪১১।

মুক্তাদী যদি ইমামের সাথে সাথে কোনো কাজ করে ফেলে অথবা সালাম ফিরিয়ে ফেলে তাহলে তা সুন্নাতের বিপরীত হওয়ার কারণে মাকরাহ হবে। তবে সলাত বাতিল হবে না। কেননা সে ইমামের সাথে রূপকল একত্রিত করে ফেলেছে। যদি সে তার আগে করে ফেলে তাহলে তা হারাম হবে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন: **لَا تَسْتِقْوِي بِالرُّكُعِ وَلَا بِالسُّجُودِ، وَلَا بِالْقِيَامِ**: “তোমরা আমার আগে রূকু’, সাজদা কিংবা দাঁড়াবে না।”^{৩২৩}

হাদীসে বর্ণিত হচ্ছে টা হারামের চাহিদা রাখে। সুতরাং ইমামের পূর্বে কোনো কাজ সম্পাদন করা হারাম। আবু হুরায়রা رض হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِقَامَةِ، أَنْ يَحْوِلَ اللَّهُ رَأْسُهُ رَأْسَ حِمَارٍ؟

“সাবধান! তোমাদের কেউ যখন ইমামের পূর্বে মাথা উঠিয়ে ফেলে, তখন সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তা’আলা তার মাথা গাধার মাথায় পরিণত করে দিবেন?”^{৩২৪}

المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: أَحْكَامُ مُتَفَرِّقَةٍ فِي الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ

সপ্তম মাসতালা: ইমামতি ও জামাআত বিষয়ে বিভিন্ন বিধান

ইমামতি ও জামাআত সংশ্লিষ্ট পূর্বের আলোচনার ব্যতিক্রম করিপয় বিধিবিধানা:

১. জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্য ইমামের কাছাকাছি দাঁড়ানো মুস্তাহব। জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা ইমামের ঠিক পিছনে একদম কাছাকাছি দাঁড়াবে। নাবী ﷺ বলেছেন:

لَيْسَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَخْلَامِ وَالنَّهِيِّ ثُمَّ الَّذِينَ يَلْوَاهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلْوَاهُمْ

“তোমাদের মধ্য হতে যারা জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান তারা আমার পিছনে দাঁড়াবে। তারপর দাঁড়াবে তাদের নিকটবর্তী স্তরের লোক। তারপর দাঁড়াবে তাদের নিকটবর্তী স্তরের লোক।”^{৩২৫}

এর হিকমাহ হলো: ইমামের নিকট থেকে তার শিখবে, প্রয়োজন হলে কুরআনে ইমামকে সাহায্য করা (লোকমা দেওয়া) ও সলাতে কিছু হয়ে গেলে স্বেচ্ছায় তাদের মধ্য হতে একজন তার (ইমামের) প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে।

২. প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর প্রতি আগ্রহী হওয়া: প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর প্রতি আগ্রহী হওয়া ও সেই সাথে পিছনের কাতারে দাঁড়ানো থেকে বিরত থাকা মুক্তাদির জন্য মুস্তাহব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

^{৩২৩} সহীহ মুসলিম, ঘ. ৮৪৭, ফুআ. ৪২৬।

^{৩২৪} সহীহ বুখারী, ঘ. ৬১১, সহীহ মুসলিম, ঘ. ৪২৭।

^{৩২৫} সহীহ মুসলিম, ঘ. ৮৫৮, ফুআ. ৪৩২।

تَقَدَّمُوا فَأَمْتَوْا بِي، وَلِيَأْتِمَ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لَا يَرَأُلُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤْخَرُهُمُ اللَّهُ

“তোমরা সামনের কাতারে এসো এবং আমাকে অনুসরণ করো। তাহলে তোমাদের পরবর্তী লোকেরা তোমাদের অনুসরণ করবে। কোনো সম্প্রদায় প্রথম কাতার থেকে পিছনে সরে আসতে থাকলে অবশ্যে আল্লাহ তাদেরকে জাহানামে পশ্চাদ্বর্তী করে দেবেন।”^{৩২৬}

তিনি ﷺ আরও বলেছেন:

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفَّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَا سَتَّهُمُوا

“আয়ান দেওয়া এবং প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর মাঝে কি পরিমাণ নেকি আছে এটা যদি মানুষ জানতে পারতো, তাহলে তা অর্জনের জন্য লটারি করে হলেও তা করত।”^{৩২৭}

অপরদিকে মহিলারা সব সময় পিছনের কাতারে দাঁড়ানো মুস্তাহাব। এ প্রসঙ্গে নাবী ﷺ বলেছেন:

خَيْرٌ صُفُوفُ الرِّجَالِ أَوْهَا، وَشَرٌّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرٌ صُفُوفُ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرٌّهَا أَوْهَا.

“পুরুষদের সর্বোত্তম কাতার হলো প্রথম কাতার এবং নিকৃষ্ট কাতার হলো শেষ কাতার। আর মহিলাদের সর্বোত্তম কাতার হলো শেষ কাতার এবং নিকৃষ্ট কাতার হলো প্রথম কাতার।”^{৩২৮}

৩. পরস্পর মিলে কাতার সোজা করা, ফাঁক বন্ধ করা এবং ধারাবাহিকভাবে প্রথম কাতার থেকে পূর্ণ করা: সলাত শুরু করার আগে ফাঁক বন্ধ করা ও কাতার সোজা করার নির্দেশ দেওয়া ইমামের জন্য মুস্তাহাব। এটা নাবী ﷺ করেছেন। তিনি বলতেন:

سَوْرَا صُفُوفُكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفَّ، مِنْ مَقَامِ الصَّلَاةِ .

“তোমরা কাতার সোজা করো। নিশ্চয়ই কাতার সোজা করা সলাতের পরিপূর্ণতা।”^{৩২৯}

আনাস رض বলেন, সলাতের ইকামত দেওয়া হলে আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন:

أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، وَتَرَاصُوا، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهَرِي.

“তোমাদের কাতার সোজা করো এবং পরস্পর মিলে দাঁড়াও। কারণ আমি আমার পিছনে থেকে তোমাদের দেখতে পাই।”^{৩৩০}

^{৩২৬} সহীহ মুসলিম, হ্য. ৮৬৮, ফুআ. ৪৩৮।

^{৩২৭} সহীহ মুসলিম, হ্য. ৮৬৭, ফুআ. ৪৩৭।

^{৩২৮} সহীহ মুসলিম, হ্য. ৮৭১, ফুআ. ৪৪০।

^{৩২৯} সহীহ মুসলিম, হ্য. ৮৬১, ফুআ. ৪৩৩।

^{৩৩০} সহীহল বুখারী, হ্য. ৭১৯।

আনাস  আরও বলেন,

كَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِيْهُ بِمَنْكِيْ صَاحِبِهِ، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ.

“আমাদের প্রত্যেকেই পরম্পরে কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলিয়ে দাঁড়াতেন।”^{৩৩১}

প্রথম কাতার পূর্ণ করে তার পরের কাতারগুলো পূর্ণ করা মুস্তাহাব। যদি অপূর্ণ থাকে তাহলে যেন কাতারের শেষে থাকে। এ বিষয়ে নাবী  বলেছেন:

«أَلَا تَصُفُونَ كَمَا تَصُفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟» فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ تَصُفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: «يُمُونَ الصُّفُوفَ الْأُولَى وَيَرَاصُونَ فِي الصَّفَّ»

“তোমরা কি সেভাবেই কাতার বন্দি হবে না, যেভাবে ফিরিশতামগুলী তাদের রবের নিকট কাতার বন্দি হন? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! ফিরিশতারা কীভাবে তাঁদের রবের নিকট কাতার বন্দি হন? উত্তরে বললেন: তাঁরা প্রথম থেকে কাতার সোজা করেন এবং পরম্পরে মিলে মিলে দাঁড়ান।”^{৩৩২}

৪. কাতারের পিছনে নিঃসঙ্গ ব্যক্তির সলাত: কাতারের পিছনে কোনো ব্যক্তি নিঃসঙ্গ সলাত আদায় করলে তা বিশুদ্ধ হবে না। এ ব্যাপারে নাবী  বলেছেন:

لَا صَلَاةَ لِمَفْرَدٍ خَلْفَ الصَّفَّ

“পিছনের কাতারে নিঃসঙ্গ ব্যক্তির সলাত হয় না।”^{৩৩৩}

رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي وَخَدْهُ خَلْفَ الصَّفَّ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ.

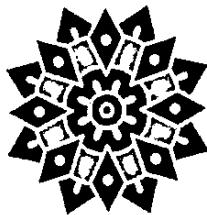
“আল্লাহর রসূল  এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে কাতারের পিছনে একাকী সলাত আদায় করছে। তখন তিনি তাকে পুনরায় সলাত আদায়ের নির্দেশ দিলেন।”^{৩৩৪}

^{৩৩১} সহীহ বুখারী, হ. ৭২৫।

^{৩৩২} সহীহ মুসলিম, হ. ৮৫৪, ফুআ. ৪৩০।

^{৩৩৩} আহমাদ ৪/২৩; ইবনু মাজাহ, হ. ১০০৩; ইমাম আহমাদ হাসান বলেছেন। ইমাম বুসীরী সহীহ বলেছেন যাওয়ায়েদ ইবনু মাজাহতে এবং ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহ ইবনু মাজাহ, হ. ৮২২।

^{৩৩৪} আহমাদ ৪/২২৮; সুনান আবু দাউদ, হ. ৬৮২; তিরমিয়ী, হ. ২৩০; ইবনু মাজাহ, হ. ১০০৪; ইমাম তিরমিয়ী হাসান বলেছেন। আহমাদ শাকের সহীহ বলেছেন, যাওয়াশিউত তিরমিয়ী ১/৪৪৮-৪৫০; ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহত তিরমিয়ী ১৯১।



الباب التاسع: في صلاة أهل الأذار মৌমান অনুচ্ছেদ : অপারগ ব্যক্তিদের সলাত

অপারগ ব্যক্তিরা হলো: অসুস্থ, মুসাফির ও ভীতসন্ত্ব ব্যক্তিবর্গ যারা সক্ষম ব্যক্তির ন্যায় সলাত আদায় করতে অক্ষম। শরীয়ত তাদের জন্য বিষয়টি শিথিল করে দিয়েছেন। তারা তাদের সাধ্যানুযায়ী সলাত আদায় করবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

“তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেন না।” [সূরা হাজ্জ : ৭৮]

তিনি আরও বলেছেন: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

“কোনো ব্যক্তিকেই আল্লাহ তা'আলা তার সাধ্যের বাইরে কোনো কিছু চাপিয়ে দেন না।”

[সূরা বাকুরাহ : ২৭৬]

অন্য আয়াতে তিনি বলেন: ﴿فَإِنَّقُوا اللَّهَ مَا مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

“তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় করো।” [সূরা তাগাবুন : ১৬]

ক. অসুস্থ ব্যক্তির সলাতের পদ্ধতি:

অসুস্থ ব্যক্তির পরিচয়: যার শরীরের সুস্থতা অসুস্থতায় পরিণত হয়। চাই তা পুরো শরীরেই হোক বা শরীরের কোনো অংশে হোক।

যে কোনো প্রকারেই অসুস্থ ব্যক্তি হোক না কেন তাকে দাঁড়িয়েই ফরয সলাতগুলো আদায় করতে হবে। তবে যদি কোনো ব্যক্তির পিঠ রোগাক্রান্ত হওয়ার দরুণ পিঠ সোজা করতে না পারে, অথবা দেয়াল, খুঁটি কিংবা লাঠির উপর ভর করেও যদি সলাত আদায় করতে না পারে তার ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন: «إِذَا أَمْرَتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأُنْهَا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»

“যখন আমি তোমাদের কোনো বিষয়ে নির্দেশ দেই তখন তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী সেটা করার চেষ্টা করো।”^{৩৩৫}

সুতরাং দাঁড়িয়ে না পারলে বসে সলাত আদায় করবে। তাতেও সক্ষম না হলে শুয়ে আদায় করবে। কারণ আল্লাহর রসূল ﷺ ইমরান বিন হুসাইন رضي الله عنه কে বলেছেন:

«صَلُّ فِي بَيْتٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ»

“দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করো। দাঁড়িয়ে না পারলে বসে আদায় করো। তাতেও সক্ষম না হলে শুয়ে সলাত আদায় করো।”^{৩৩৬}

এক্ষণে উল্লিখিত তিনি পদ্ধতির কোনো এক পদ্ধতিতেও সলাত আদায় করতে না পারলে তার অবস্থানুযায়ী সলাত আদায় করবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿فَأَنْقُوا إِلَهَ مَا أَسْتَطِعْمُ﴾

“তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় করো।” [সূরা তাগাবুন : ১৬]

যতক্ষণ পর্যন্ত অসুস্থ ব্যক্তির হাঁশ থাকবে ততক্ষণ তার সলাত মণ্ডকুফ হবে না। এক্ষেত্রে তার ইশারা করার সক্ষমতা থাকলে সে নিয়ত করে ইশারায় সলাত আদায় করবে।

অসুস্থ ব্যক্তি সলাত আদায়ের স্থানে বসে রুকু-সাজদায় মাথা নাড়িয়ে ইশারা করবে। সাজদায় রুকুর চেয়ে মাথাটা একটু নিচু করতে হবে। মাথা নাড়িয়ে ইশারা করতে অক্ষম হলে চোখ দিয়ে ইশারা করবে।

খ. মুসাফিরের সলাত এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়:

প্রথমত: চার রাকা‘আত বিশিষ্ট সলাত কসর করা; এর কতিপয় মাসআলা:

القصر في حكم أولي

প্রথম মাসআলা: কসরের হ্রাস

মুসাফিরের জন্য চার রাকা‘আত বিশিষ্ট সলাতে কসর করা শরীয়ত সম্মত। এ ব্যাপারে বিদ্঵ানদের মাঝে কোনো মতোবিরোধ নেই। কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা থেকে এর দলীল অমা�ণিত। কুরআনের বাণী:

^{৩৩৫} সহীল বুখারী, ঘ. ৭২৮৮; সহীহ মুসলিম, ঘ. ৩১৪৮, ফুআ. ১৩৩৭।

^{৩৩৬} সহীল বুখারী, ঘ. ১১১৭।

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَفْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خَفْتُمْ أَنْ يَفْتَحَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾
“যখন তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো তখন তোমরা সলাত কসর করলে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই: যদি তোমরা এ আশক্তা করো যে, কাফেররা তোমাদের ফেতনায় ফেলবে।” [সূরা নিসা : ১০১]

ভীতসন্ত্বস্ত অবস্থায় এবং অন্য কোনো কারণে সফরে সলাত কসর করা জায়েয়। মানুষ যখন নিরাপত্তা লাভ করল তখন রসূল ﷺ কে কসর সম্পর্কে জিজেস করা হলে তিনি বলেন:

«صَدَقَةٌ تَصَدِّقُ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبِلُوا صَدَقَةَكُمْ»

“এটা একটা সাদকা যা আল্লাহ তা’আলা তোমাদের দান করেছেন। সুতরাং তাঁর দেওয়া সাদাকা গ্রহণ করো।”^{৩৩৭}

নাবী ﷺ এবং খুলাফায়ে রাশেদা এর উপরেই বিদ্যমান ছিলেন। ইবনু উমার رض হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

...إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ، فَلَمْ يَرِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ قَبْصَةُ اللَّهِ، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرًا، فَلَمْ يَرِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ قَبْصَةُ اللَّهِ...

“আমি সফরে আল্লাহর রসূল ﷺ এর সাথে ছিলাম, তিনি মৃত্যু অবধি সফর অবস্থায় দুই রাকা‘আতের বেশি সলাত আদায় করেননি। আমি আবু বকর رض এর সাথেও থেকেছি, তিনিও মৃত্যু অবধি সফর অবস্থায় দুই রাকা‘আতের বেশি সলাত পড়েননি।”^{৩৩৮} অতঃপর উমার ও উসমান رض এর নাম উল্লেখ করলেন। আহমাদ ইবনু উমার رض থেকে মারফু’ সূত্রে বর্ণনা করেছেন,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَىٰ رُحْصَةٌ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَىٰ مَعْصِيَةٌ

“আল্লাহ তা’আলা তাঁর অবকাশ দেওয়া কাজগুলো কার্যকর হওয়া পছন্দ করেন। যেমন তিনি তাঁর অবাধ্যতাকে অপছন্দ করেন।”^{৩৩৯}

ইজমার দলীল: জরুরি প্রয়োজনে সলাত কসর করা এটা দ্বীনের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের অন্যতম। এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা রয়েছে। উপরন্তু, এই সুন্নাত পরিত্যাগ করার চেয়ে সংরক্ষণ করা ও এই ছাড়াটা গ্রহণ করাই শ্রেয় ও অতি উত্তম। অবশ্য কিছু বিদ্বান সফরে পূর্ণ সলাত পড়াকে অপছন্দ করেছেন। এটা এ কারণে যে, নাবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ এই সুন্নাতের উপর জোরালোভাবে অব্যাহত ছিলেন। আর এটা ছিল তাঁর নিয়মিত অভ্যাস ছিল।

^{৩৩৭} সহীহ মুসলিম, ঘ. ১৪৫৮, ফুআ. ৬৮৬।

^{৩৩৮} সহীহ মুসলিম, ঘ. ১৪৬৪, ফুআ. ৬৮৯।

^{৩৩৯} আহমাদ, ঘ. ৫৮৬৬; শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, ইরওয়া ৫৬৪।

المسألة الثانية: في تحديد الصلاة التي يجوز فيها القصر دِيْنِيَّ مَاسَّاَلَّا: يَسَرُّ سَلَاتِهِ كَسَرُّ جَاءَيْهِ

চার রাক'আত বিশিষ্ট সলাতেই কেবল কসর বৈধ। যেমন- ঘোহর, আসর ও ইশার সলাত। সকলের একমতে ফজর ও মাগরিবের সলাতে কসর করা যাবে না। নাবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণও তাই করেছেন। এ ব্যাপারে আব্দুল্লাহ বিন আব্দাস رضي الله عنه বলেন,

فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِنِ تَبَيَّنَ مَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخُوفِ رَكْعَةً
“আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের নাবী ﷺ এর উপর মুকীম অবস্থায় চার রাক'আত এবং সফর অবস্থায় দুই রাক'আত ফরয করেছেন। আর ভয়ের সময় এক রাক'আত ফরয করেছেন।”^{৩৪০}
সুতরাং এই হাদীস প্রমাণ করে যে, চার রাকআত বিশিষ্ট সলাতই উদ্দেশ্য।

المسألة الثالثة: في حد السفر الذي تقتصر فيه الصلاة ونوعه ثِلْيَّ مَاسَّاَلَّا: كَسَرُّ سَلَاتِهِ جَنَاحُ سَفَرِهِ دُرْجَتُ وَإِرَادَةِ

সলাত কসর করার জন্য সফরের দূরত্ব হলো প্রায় ষষ্ঠি মাইল। (এ হিসাব মতে) ৮০ কিলো মিটারের কাছাকাছি। এটা হলো, দুইজন দৃত একই সময়ে ভারী বোঝা নিয়ে পায়ে হেঁটে দুইদিন সফর করার দূরত্ব পরিমাণ।

নাবী ﷺ একদিন ও এক রাতের ভ্রমণকে সফর বলেছেন।^{৩৪১}

ইবনু আব্দাস ও ইবনু উমার رضي الله عنهما চার বুরদ পরিমাণ পথ সফর করলে সলাত কসর করতেন এবং সওম ভঙ্গ করতেন। চার বুরদ হলো প্রায় ষষ্ঠি মাইল ফারসাখ।

প্রকারভেদ: কয়েক প্রকারের সফর রয়েছে। ১. আস-সাফারুল মুবাহ বা বৈধ সফর: যেমন- বাণিজ্য ও আনন্দের উদ্দেশ্যে সফর; ২. আস-সাফারুল ওয়াজিব বা আবশ্যিকীয় সফর: যেমন- হাজ্জ ও জিহাদের উদ্দেশ্যে সফর; ৩. আস-সাফারুল মাসন্নুল মুসতাহাব বা অন্যান্য বৈধ সফর: যেমন- পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে সফর; ৪. দ্বিতীয়বার হাজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে সফর।
অধিকাংশ আলেমের মতে, হারাম সফরে কসর করা জায়েয হবে না।

^{৩৪০} সহীহ মুসলিম, হা. ১৪৬০, ফুআ. ৬৮৭

^{৩৪১} এটা তাঁর এই কথার ভিত্তিতে: لَا يَجِدُ لِأَزْرَأِهِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَّا يَخِيَ أَنْ تُسَافِرْ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةَ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ.

(যে মহিলা আল্লাহ এবং আখিয়াতের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে কোনো মাহারাম পুরুষকে সাথে না নিয়ে একদিন ও এক রাতের পথ সফর করা জায়িয নয়। সহীহ বুখারীর শব্দে, হা. ১০৮৮; সহীহ মুসলিম, হা. ৪২১/১৩৩১)

المسألة الرابعة: هل يقصر من نوع الإقامة؟

চতুর্থ মাসআলা: অবস্থান করার নিয়তে সফর করলে কি কসর করা যাবে?

যে ব্যক্তি অবস্থান করার নিয়তে সফর করবে তার বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কোনো ব্যক্তি যদি অনিদিষ্টভাবে অবস্থান করার নিয়তে সফর করে, তবে কসর করা যাবে না। কেননা এতে উপযুক্ত বৈধ কোনো কারণ নেই। অনুরূপভাবে যদি চার দিনের বেশি থাকার নিয়তে সফর করে বা কোনো প্রয়োজনে অবস্থান করে, আর এই ধারণা করে যে, চার দিনের মধ্যে তার কাজটি শেষ হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে (বলা যায়) যে, নাবী ﷺ মুকায় অবস্থান কালে একুশ ওয়াক্ত সলাত কসর করেছেন। কারণ তিনি চার তারিখ সকালে এসে ইয়াওমুত তারবিয়া (যুলহিজ্জা মাসের আট তারিখ) পর্যন্ত অবস্থান করেন। অতঃপর ফজর সলাত পড়ে বিদায় নেন। সুতরাং নাবী ﷺ -এর মতো যে ব্যক্তি চার দিন বা তার কম অবস্থান করবে, সে কসর করবে। এর বেশি থাকলে পূর্ণ সলাত পড়বে। ইমাম আহমাদ এটি উল্লেখ করেছেন।^{৩৪২}

আনাস رض বলেছেন, “আমরা মুকায় দশ দিন অবস্থানকালে দশ দিনই সলাত কসর করেছি।” এর অর্থ আমরা উল্লেখ করেছি। কারণ যদি কোনো প্রয়োজনে অবস্থান করে অথচ তার নিয়ত নেই যে, সে চার দিনের বেশি অবস্থান করবে। সে এটাও জানে না যে, তার কাজ কখন শেষ হবে? অথবা বৃষ্টি বর্ষণ বা যুলমের সম্মুখীন হয়ে আটকে গেলে সে কসর করবে যদিও কয়েক বছর অবস্থান করে। ইবনুল মুন্ফির বলেছেন, এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, মুসাফির ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত কসর করতে পারবে যতক্ষণ না সে মুকীম হয়ে অবস্থান করার নিয়ত করবে।

المسألة الخامسة: الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة

পঞ্চম মাসআলা: মুসাফির ব্যক্তির যেসব অবস্থায় সলাত পূর্ণ করা ওয়াজির সফর অবস্থায় সলাত কসর করার কয়েকটি অবস্থা রয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ:-

১. মুসাফির ব্যক্তি যখন মুকীম ইমামের পেছনে সলাত পড়বে: এ সময় সলাত পূর্ণ করা আবশ্যিক। নাবী ﷺ বলেছেন: *إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمْ بِهِ* “ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য।”^{৩৪৩}

^{৩৪২} দেবুন, আল-মুগানী ২/১৩৪-১৩৫; মাঝমুউল ফাতওয় ইবনু বায-ফাতওয়াস সলাহ ৪৫৮ পৃষ্ঠা।

^{৩৪৩} সহীল বৃথারী, ঘ. ৩৭৮।

ইবনু আবাস رض কে মুকীমের পিছনে সলাত পূর্ণ করা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, «تِلْكَ شَنَةٌ أُبِي الْفَاقِسِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

“এটা আবুল কাসেম رض এর সুন্নাত।”^{৩৪৪}

২. মুসাফির নাকি মুকীম; এরূপ সন্দেহপূর্ণ ব্যক্তির অনুসরণ করলে: কোনো ব্যক্তি যখন ইমামের পিছনে দাঁড়ায় অথচ সে জানেনা যে, ইমাম মুসাফির নাকি মুকীম, (যেমন বিমানবন্দর বা এরকম কোনো স্থানে) তখন এরূপ ব্যক্তি পূর্ণ সলাত আদায় করবে। কারণ কসরের জন্য দৃঢ় সংকল্প থাকতে হবে। নয়তো সন্দেহ থাকলে পূর্ণ সলাত আদায় করবে।

৩. যখন সফরে মুকীম অবস্থার সলাতের কথা স্মরণ হবে: যেমন একজন মুসাফির ব্যক্তি, সফরে থাকাবস্থায় তার স্মরণ হলো যে, নিজ এলাকায় থাকাকালিন বিনা ওযুতে ঘোহরের সলাত পড়েছে। অথবা মুকীম অবস্থায় কোনো সলাত ছুটে গেছে। এক্ষণে তাকে অবশ্যই পূর্ণ সলাত আদায় করতে হবে। এ ব্যাপারে নাবী رض এর ঘোষণা:

مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ تَسِيَّهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذُكِرَهَا

“যে ব্যক্তি সলাত না পড়ে ঘুমিয়ে যাবে অথবা ভুলে যাবে, সে যেন স্মরণ হওয়া মাত্রই সলাত পড়ে নেয়।”^{৩৪৫}

অর্থাৎ মুকীম অবস্থার মতো সলাত পড়তে হবে। কারণ যেহেতু কায়া সলাত পূর্ণ আদায় করা ওয়াজিব সেহেতু এই সলাতও পূর্ণ আদায় করতে হবে।

৪. মুসাফির ব্যক্তির যদি এমন কোনো সলাত নষ্ট হয়ে যায়, যা পূর্ণ আদায় করা উচিত ছিল, তা পুনরায় আদায় করার সময় পূর্ণ সলাত পড়তে হবে। যেমন মুকীমের পিছনে মুসাফির সলাত পড়লে পূর্ণ সলাত আদায় করা আবশ্যিক। এখন যদি তার এই সলাত নষ্ট হয়ে যায়, তবে তা পরিপূর্ণরূপে আদায় করবে। কারণ সলাতের পুনরাবৃত্তি ঘটলে পূর্ণ সলাত পড়া অত্যাবশ্যিক।

৫. মুসাফির ব্যক্তি যখন সাধারণ অবস্থান বা মুকীম হয়ে বসবাসের নিয়ত করবে: মুসাফির ব্যক্তি যখন নির্দিষ্ট সময় বা নির্দিষ্ট কোনো কাজের প্রতি মনস্থির না করে যে শহরে সফর করবে সে শহরেই সাধারণ অবস্থানের নিয়ত করবে, অনুরূপভাবে ঐ শহরকে নিজ শহর বানিয়ে নিবে তখন তার জন্য সলাত পূর্ণ করা আবশ্যিক। কারণ বাস্তবিকপক্ষে সে সফরের ছকুম-বহির্ভূত। বস্তুত, সফরটাকে যখন নির্দিষ্ট একটা সময় অথবা কোনো একটা কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে, এরূপ ক্ষেত্রে কেবল মুসাফির কসর পড়তে পারবে।

^{৩৪৪} আহমাদ ১/২১৬; ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন তার ইরওয়া গ্রন্থে ৫৮১।

^{৩৪৫} সহীহ বুখারী, হা. ৫৯৭; সহীহ মুসলিম, হা. ১৪৫৪, ফুআ. ৬৮৪; অর্থগত বর্ণনা।

দ্বিতীয়ত, দুই সলাত একত্র করে করা শরীয়ত সম্মত এবং তা বৈধ

المسألة الأولى: في مشروعية الجمع بين الصلاتين، ومن يباح له ذلك

الثانية: دعوى سلامة مأذونة جماعة كراها شرعيتها سمعت وفروعها

যে সফরে সলাত কসর করা যায় সে সফরে যোহর-আসর ও মাগরিব-ইশার মাঝে উভয়ের যে কোনো একটি সময়ে সলাত জমা করা বৈধ। মুয়ায খান্দান এর হাদিস-

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي عَزْوَةٍ تَبَوَّكَ، إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ رَفِيعِ الشَّمْسِ أَخْرَ الظَّهَرِ حَتَّى يَجْمِعَهَا إِلَى الْعَصْرِ يُصْلِيهَا جَمِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ رَفِيعِ الشَّمْسِ صَلَّى الظَّهَرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ، وَكَانَ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ»

“নাবী ﷺ তাবুকের যুক্তে সূর্য ঢলার পূর্বে সফর করার সময় যোহরের সলাতকে পিছিয়ে আসরের সঙ্গে মিলিয়ে যোহর-আসর এক সাথে আদায় করতেন। আবার সূর্য ঢলার পরে সফরে বের হলে যোহর-আসর এক সাথে আদায় করে তারপর সফরের উদ্দেশ্য বের হতেন। তিনি মাগরিব-ইশার সলাতও একত্র করতেন।”^{৩৪৬}

এক্ষেত্রে সফরকারী চলমান হোক কিংবা বিরতিতে থাকুক, একই বিধান। কারণ এটা সফরের একটা বিশেষ ছাড়। সুতরাং অন্যান্য ছাড়ের ন্যায় এখানে চলমান থাকা বা না থাকার বিষয়টি ধর্তব্য নয়। তবে সফর বিরতিতে থাকাকালীন জমা না করাই উত্তম। কারণ নাবী ﷺ বিরতিকালীন অবস্থায়ও মিনাতে গিয়ে জমা করেননি।

এমন অসুস্থ-মুকীম ব্যক্তির জন্য সলাত জমা করা বৈধ, যার জমা করলে কষ্ট লাঘব হয়। ইবনু আবুস খান্দান বলেন,

جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظَّهَرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطْرِ

“আল্লাহর রসূল ﷺ মদিনাতে বৃষ্টি ও ভয়ের কারণ ছাড়াই যোহর-আসর ও মাগরিব-ইশার সলাত জমা করেছেন।”^{৩৪৭}

অন্য বর্ণনায়: “না ভয়ের কারণে, না সফরের।”^{৩৪৮}

^{৩৪৬} সুনান আবু দাউদ, হা. ১২০৮; তিরমিয়ী, হা. ৫৫৩ এবং তিনি হাসান গরীব বলেছেন। আলবানী সহীহ বলেছেন, ইরওয়া ৫৭৮। অর্থগত বর্ণনা।

^{৩৪৭} সুনান আবু দাউদ, হা. ১২১১।

^{৩৪৮} সহীহ মুসলিম, হা. ১৫১৮, ফুআ. ৭০৫।

এখানে অসুস্থতার কারণটাই শুধু অবশিষ্ট থাকল। এ ব্যাপারে নাবী (সুন্নাহায়াহ ইস্তেহায়াগ্রস্থ) মহিলাকে দুই সলাতের মাঝে জমা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর ইস্তেহায়াহ এক প্রকার রোগ। পূর্বেন্নিখিত হাদীসে ইবনু আবাস (رضي الله عنه) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, তিনি এটা কেন করেছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, যাতে তিনি তাঁর উপ্পত্তকে কষ্টে না ফেলে দেন। মানুষ যখনই কোনো কষ্টে পতিত হবে আর সেই সময় জমা না করার দরুণ কষ্ট আরও বেড়ে যাওয়ার অশঙ্কা থাকলে, ঐ ব্যক্তির জন্য জমা করা জায়েয়। হোক সে অসুস্থ অথবা অসুস্থতাহীন মাঝুর (ওজরপ্রাপ্ত)। হোক সে মুকীম অথবা মুসাফির। তবে সফর ও অসুস্থতার কারণ ছাড়াও এমন কিছু ওয়র আছে যার জন্য সলাত জমা করা বৈধ আছে:

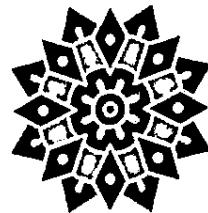
১. **প্রবল বৃষ্টি:** যার কারণে কাপড় ভিজে যায় এবং এর কারণে মুকাল্লাফ (দায়িত্বপ্রাপ্ত) ব্যক্তি কষ্টে পতিত হয়।
২. **কাঁদামাটি:** যার কারণে মানুষের চলাচল কষ্টকর হয়ে যায়।
৩. **প্রাকৃতিকভাবে প্রচল ঠাণ্ডা বাতাস:** এ ছাড়া আরও কিছু ওয়র রয়েছে, যার জন্য সলাত জমা না করলে মুকাল্লাফ ব্যক্তির কষ্ট হতে পারে।

المسألة الثانية: في حد الجمع المشروع

বিতীয় মাসআলা : শরীয়তসিদ্ধ জমাকৃত সলাতের পরিসীমা

যেসব সলাতে জমা করা শরীয়ত সম্মত; সেগুলো হলো, মুসাফির এবং যারা এর আওতাভুক্ত তাদের সকলেই যোহর-আসর ও মাগরিব-ইশা এই চার ওয়াকেই কেবল সলাত জমা করতে পারবে। অনুরূপভাবে বৃষ্টি এবং এ হকুমের অন্তর্ভুক্ত যা আছে সেগুলোর কারণেও মুকীম অবস্থায় যোহর-আসর একত্রে ও মাগরিব-ইশা একত্রে; এই চার ওয়াকে জমা করা যাবে।^{৩৪৯} একটু আগেই ইবনু আবাস (رضي الله عنه) এর হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে। আবু বকর, উমার ও উসমান (رضي الله عنه) এটা করতেন। কারণ কষ্ট হওয়ার কারণেই দুই ইশা ও দুই যোহরের মাঝে জমা যায়।

^{৩৪৯} দুই ইশা বলতে মাগরিব ও ইশা এবং দুই যুহর বলতে যুহর ও আসর। আধিক্যতার দিকে লক্ষ্য করে একে অপরের নামকরণ হয়েছে।



الباب العاشر: في صلاة الجمعة দশম অনুচ্ছেদ: জুমুআর সলাত

এতে কতিপয় মাসআলা রয়েছে:

المسألة الأولى: حكمها ودليل ذلك প্রথম মাসআলা: এর হুকুম ও দলীল

জুমুআহ পুরুষের উপর ফরযে আইন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَلَا سُبُّوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾

“হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদের জুমুআর দিনে সলাতের জন্য আহ্বান করা হবে তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করে দাও।” [সূরা জুমুআহ: ৯]

নাবী ﷺ বলেছেন: «رَأَخُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُتَّقِّلِمٍ»

“জুমুআর জন্য মধ্যাহ্নের পর যাত্রা করা প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তির উপর ওয়াজিব।”^{৩৫০}

নাবী ﷺ আরও বলেছেন:

«لَيَسْتَهِنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ»

“লোকেরা যেন অবশ্যই জুমুআর সলাত পরিত্যাগ করা থেকে বিরত থাকে; নতুবা অবশ্যই আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিবেন। অতঃপর তারা গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।”^{৩৫১}

ইমাম নাববী ﷺ বলেছেন, “এই হাদীসের আলোকে জুমুআহ ফরযে আইন।”^{৩৫২} একটু পরে যে হাদীস আসবে তাতে রয়েছে, জুমুআহ হলো যা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ওয়াজিব....।

^{৩৫০} সুনান নাসাই, হা. ১৩৭১; আলবালী সহীহ বলেছেন, সহীহল জামে' হা. ৩৫১।

^{৩৫১} সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ৮৬৫।

المسألة الثانية: على من تجب؟

ৰিতীয় মাসআলা: কাদের উপর ওয়াজিব؟

জুমুআহর সলাত প্রত্যেক মুসলিম, পুরুষ, স্বাধীন, প্রান্তবয়ক্ষ, বিবেকবান, জুমু'আয় আসতে সক্ষম ও মুকীম ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব। সুতরাং দাস, মহিলা, শিশু, পাগল, অসুস্থ অথবা মুসাফিরের জন্য ওয়াজিব নয়। নাবী ﷺ বলেছেন:

الجمعة حُقٌّ واجبٌ على كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةٌ: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأٌ، أَوْ صَبِّيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ.

“জামাআতের সাথে জুমুআহ আদায় করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ও ওয়াজিব। তবে চার শ্রেণির ব্যক্তি ছাড়া; দাস, মহিলা, শিশু ও অসুস্থ।”^{৩৫৩}

মুসাফিরের জন্যও জুমুআহ ওয়াজিব নয়। কেননা নাবী ﷺ সফরে জুমুআর সলাত পড়েননি। একবার হাজের সময় আরাফার দিন জুমুআর সাথে যিলে গেল। এরপরও তিনি যোহরে সলাত পড়ে এর সাথে আসরের সলাত জমা করেছিলেন। তবে যদি মুসাফির এমন এক শহরে এসে উপস্থিত হয় যেখানে জুমু'আহর সলাত হচ্ছে, তাহলে সেখানে মুসলিমদের সাথে জুমু'আহ পড়বে। আর দাস-দাসী, মহিলা, শিশু, অসুস্থ অথবা মুসাফির যদি জুমুআর সলাতে উপস্থিত হয়, তাহলে তা বিশুদ্ধ বলে গণ্য হবে এবং এ ক্ষেত্রে সে যোহরের সলাত পড়া থেকে বিরত থাকবে।

المسألة الثالثة: وقتها

তৃতীয় মাসআলা: জুমুআর সলাতের সময়

যোহরের সময়টাই মূলত জুমুআর সময়, যা সূর্য ঢলার পর থেকে শুরু করে কোনো বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়া পর্যন্ত থাকে। আনাস বিন মালেক رض এর হাদীস-

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمَلِّئُ الشَّمْسُ»

“নাবী ﷺ জুমুআর সলাত আদায় করতেন যখন সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ত।”^{৩৫৪}

এই হাদীসটা সেসব সাহাবী থেকে বর্ণিত যাদের নিয়ে তিনি তা করেছেন।^{৩৫৫} এরপরও যে ব্যক্তি জুমুআর সময় শেষ হওয়ার আগেই এক রাকআত পাবে, সে পূর্ণ জুমুআর সলাতই পেয়ে যাবে, অন্যথায় সে যোহরের সলাত পড়বে। নাবী ﷺ বলেছেন:

^{৩৫২} শাব্দিক নাবী ৬/১৫২।

^{৩৫৩} আবু দাউদ, ঘ. ১০৬৭; আলবানী সহীহ বলেছেন, ইরওয়া ৫৯২।

^{৩৫৪} সহীহল বুখারী, ঘ. ৯০৪।

^{৩৫৫} দেখুন, ফাতহল বারী ২/৪৫০।

مَنْ أَذْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ

“যে ব্যক্তি এক রাকআত সলাত পেল সে যেন পূর্ণ সলাতই পেল।”^{৩৫৬} এর আলোচনা গত হয়েছে।

المسألة الرابعة: الخطبة

চতুর্থ মাসআলা: খুতবা

খুতবা জুমুআর একটি রূকন। এটা ছাড়া জুমুআহ বিশুদ্ধ হবে না। কারণ নাবী ﷺ এর উপরই অব্যাহত ছিলেন, কখনোই পরিত্যাগ করেননি। জুমুআর খুতবা দুইটি। জুমুআর সলাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য এই দুইটি খুতবাই সলাতের আগে দেওয়া শর্ত।

المسألة الخامسة: في سن الخطبة

পঞ্চম মাসআলা: খুতবার সুন্নাতসমূহ

বীন ও দুনিয়ার কল্যাণে মুসলিমদের জন্য দুআ করা সুন্নাত। পাশাপাশি শাসকদের জন্য কল্যাণ ও তাওফীক কামনা করা। কারণ নাবী ﷺ জুমুআর দিনে যখন খুতবা দিতেন তখন দুআ করতেন, আঙুল দিয়ে ইশারা করতেন এবং মানুষেরা ‘আমীন’ বলত।

সলাতসহ উভয় খুতবা একজনে দেওয়াই সুন্নাত। খুতবায় সাধ্যানুযায়ী কষ্টস্বর উঁচু করা ও দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়া সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿وَتَرْكُوكَ قَائِمًا﴾

“তারা তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে সেদিকে হুটে চলে।” [সূরা জুমুআহ: ১১]

জাবির বিন সামুরাহ رض বলেন,

كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُولُ فِي خَطْبَ قَائِمًا، فَمَنْ بَرَأَ إِنَّمَا كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ

“নাবী ﷺ দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। অতঃপর বসে আবার দাঁড়াতেন এবং খুতবা দিতেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তোমাকে এ মর্মে সংবাদ দিবে যে, নাবী ﷺ বসে খুতবা দিতেন, তাহলে সে মিথ্যা বলবে।”^{৩৫৭}

খুতবাটা মিস্তার বা কোনো উঁচু স্থানে দেওয়া। কারণ নাবী ﷺ মিস্তারে খুতবা দিতেন। অর্থাৎ এটা একটা উঁচু জায়গা। কারণ উঁচু স্থান থেকে ঘোষণা বা বক্তব্য দেওয়া অধিক উপযোগী। দুই খুতবার মাঝে একটু বসা সুন্নাত। ইবনু উমার رض বলেন,

^{৩৫৬} সংহিতা বুখারী, ঘ. ৫৮০।

^{৩৫৭} সংহিতা মুসলিম, ঘ. ১৮৮১, ফুআ. ৮৬২।

(كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ)

“নাবী ﷺ দুইটি খুতবাই দাঁড়িয়ে দিতেন, মাঝে একটু বসে দুই খুতবাকে পৃথক করতেন।”^{৩৫৮}

খুতবা দুইটি সংক্ষেপ করা সুন্নাত। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় খুতবাটি প্রথমটির চেয়ে সংক্ষেপ করতে হবে। এ ব্যাপারে মারফু’ সূত্রে আল্লারের একটি হাদীস;

«إِنَّ طُولَ صَلَاتِ الرَّجُلِ، وَقَصْرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّهُ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطْلِبُوا الصَّلَاةَ، وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ»

“কোনো ব্যক্তির সালতের দীর্ঘতা এবং তার খুতবার সংক্ষিপ্ততাই তার পাঞ্জিত্যের নির্দশন। সুতরাং সলাত দীর্ঘ করো এবং খুতবা সংক্ষেপ করো।”^{৩৫৯} -নির্দশন।

খতীব সাহেব যখন মুক্তাদির সামনে আসবে তখনই সালাম দিবেন। জাবির رض বলেন,

(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ)

“আল্লাহর রসূল ﷺ যখন মিস্তারে উঠতেন তখন সালাম দিতেন।”^{৩৬০}

মুয়ায়িনের আযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত মিস্তারে বসে থাকা সুন্নাত। ইবনু উমার رض বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرَغَ الْمُؤْذِنُ ثُمَّ يَقُومُ، فَيَخْطُبُ

“নাবী ﷺ মিস্তারে উঠে বসে থাকতেন যতক্ষণ না মুয়ায়িনের আযান শেষ হতো। এরপর দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করতেন।”^{৩৬১} খতীব সাহেব লাঠি বা এ জাতীয় কিছুর উপর ভর করে খুতবা দিবেন। খতীবের জন্য মুসলিমদের সামনা সামনি হয়ে খুতবা দেওয়া সুন্নাহ, নাবী ﷺ এমনটিই করতেন।

المسألة السادسة: ما يحرم فعله في الجمعة ষষ্ঠى مآساتালا: جمع عذر الدندين نبيك كارثة بالله

ইমাম খুতবা দেওয়ার সময় পরম্পর কথা বলা নিষেধ। নাবী ﷺ বলেছেন:

مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَهُوَ كَالْحَمَارِ يَخْمُلُ أَسْفَارًا.

“জুমুআর দিন ইমাম খুতবা দেওয়ার সময় যে ব্যক্তি কথা বলবে সে বোৰা বহনকাৰী গাঢ়াৰ ন্যায়।”^{৩৬২}

^{৩৫৮} মুত্তাফাকুন বালাইহি: সহীহল বুখারী, ঘ. ৯২৮; সহীহ মুসলিম, ঘ. ১৮৮১, ফুআ. ৮৬১।

^{৩৫৯} সহীহ মুসলিম, ঘ. ফুআ, ৬৮৯।

^{৩৬০} সুনান কুবরা, ঘ. ৫৭৪১।

^{৩৬১} সুনান আবু দাউদ, ঘ. ১০৯২।

^{৩৬২} আহমদ ১/২৩০; ইবনু হাজার তার বুলুগুল মারামে বলেন: সানাদে সমস্যা নেই। সুবলুস সালামা ২/১০১-১০২, ঘ. ৪২১।

নাবী ﷺ আরও বলেন:

«إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصُتْ وَالِإِمَامُ يَنْخُطُ فَقَدْ لَغَوْتَ»

“ইমাম খুতবা দেওয়ার সময় তুমি যদি তোমার সাথীকে বল, ‘চুপ করো’ তাহলে তুমিও অনর্থক কাজ করলে।”^{৩৬৩}

অর্থাৎ অনর্থক কথা বললে। অনর্থক কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত কথাবার্তা। খুতবার সময় মানুষের ঘাড় টপকিয়ে সামনে যাওয়া নিষেধ। কারণ নাবী ﷺ এক ব্যক্তিকে মানুষের ঘাড় টপকিয়ে সামনে অগ্রসর হতে দেখে বললেন, “اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ بَسُونَ، তুমি লোকদের কষ্ট দিয়েছ।”^{৩৬৪} এর কারণে মুসলিমদের কষ্ট হয় আর তাদের মনোযোগে ব্যাধাত ঘটে। যদি কোনো উপায় না থাকে তবে ইমাম তার স্থানে পৌঁছতে মানুষের ঘাড় ডিঙিয়ে গেলে কোনো অসুবিধা নেই। আর দুজনের মাঝে ফাঁক করাও মাকরহ বা অপচলনীয়। নাবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ اغْسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ... ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفْرِقْ يَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ... غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

“যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করবে... অতঃপর দুজনের মাঝে ফাঁক না করে (মসজিদের দিকে) বের হবে, অতঃপর তার জন্য নির্ধারিত পরিমাণ সলাত আদায় করবে... তাহলে তার এবং পরবর্তী জুমুআর মাঝের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।”^{৩৬৫}

المسألة الثامنة: في نافلة الجمعة

সপ্তম মাসআলা: জুমুআর সলাতে কতটুকু পেলে জুমুআর পাওয়া যাবে?

ইমামের সাথে এক রাকআত পেলে পূর্ণ জুমুআই পাবে। আবু হুরায়রা رض থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে,

مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ

“যে ব্যক্তি জুমুআর এক রাকআত পেল, সে পুরো সলাতই পেয়ে গেল।”^{৩৬৬}

আর যদি এক রাকআতের কম পায় তাহলে যোহর আদায় করবে।

^{৩৬৩} মুত্তাফাকুন বালাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৩৯৪; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ৮৫১।

^{৩৬৪} সুনান আবু দাউদ, হা. ১১১৮; নাসাই ৩/১০৩ হাকিম ১/২৮৮ ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহ ইবনু মাজাহ, হা. ১১৬।

^{৩৬৫} সহীহল বুখারী, হা. ৯১০।

^{৩৬৬} ইবনু মাজাহ, হা. ১১২১; সুনান আবু দাউদ, হা. ১১২১।

المسألة الثامنة: في نافلة الجمعة

অষ্টম মাসআলা: জুমুআয় নফল সলাত

জুমুআর সলাতের পূর্বে কোনো সুন্নাত সলাত নেই। তবে সলাতের সময় হওয়ার আগে যদি কেউ সাধারণভাবে নফল সলাত পড়ে তাতে কোনো সমস্যা নেই। বন্তত, এ ব্যাপারে নাবী ﷺ আরও উৎসাহ দিয়েছেন। যেমনটি একটু আগে সালমান رضي الله عنه এর হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে,

«مَنْ أَغْسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ... ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفْرُغْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ»

“যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করবে..... অতঃপর (মসজিদের দিকে) বের হবে। আর দুইজনের মাঝে পৃথক করবে না। অতঃপর তার জন্য নির্ধারিত পরিমাণ সলাত আদায় করবে...।”^{৩৬৭}

সাহাবীগণ এটা করেছেন। আর নফল সলাতের বিশেষ ফয়লতও রয়েছে। এ ক্ষেত্রে কেউ যদি এই সলাত না পড়ে তবে তাকে দোষারোপ করা যাবে না। কেননা এই গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ রয়েছে জুমুআর সলাতের পরে, যা দুই রাকআত, চার রাকআত অথবা ছয় রাকআত পর্যন্ত আদায় করা যায়। নাবী ﷺ এটা করেছেন, সেই সাথে নির্দেশও দিয়েছেন।

“জুমুআর পরে তিনি দুই রাকআত সলাত পড়তেন।”^{৩৬৮} পাশাপাশি তিনি ﷺ বলেছেন:

«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ»

“যখন তোমাদের কেউ জুমুআর সলাত আদায় করবে সে যেন সলাতের পর চার রাকআত নফল আদায় করে।”^{৩৬৯}

অন্য বর্ণনায় রয়েছে: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»

“তোমাদের মধ্যে যে জুমুআর পরে সলাত আদায় করবে, সে যেন চার রাকআত আদায় করে।”^{৩৭০}

আর ছয় রাকআতের বিষয়ে ইবনু উমার رضي الله عنه হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। “নাবী ﷺ জুমুআর পরে ছয় রাকআত পড়তেন।”^{৩৭১} তাই ইবনু উমার رضي الله عنه ও এরূপ করতেন।^{৩৭২}

^{৩৬৭} مُعَاوِيَا بْنُ خَالِدٍ بْنِ الْمُؤْمِنِ بْنِ حَمْزَةَ الْمَخْرَقَيْلِيِّ: سَاهِيَّهُلْ بُوْخَارِيِّ, هـ. ১১০; سَاهِيَّهُلْ مُوسَلِّيِّ, هـ. ফুআ. ৮৫০।

^{৩৬৮} مُعَاوِيَا بْنُ خَالِدٍ بْنِ الْمُؤْمِنِ بْنِ حَمْزَةَ الْمَخْرَقَيْلِيِّ: سَاهِيَّهُلْ بُوْখَارِيِّ, هـ. ১৩৭; سَاهِيَّهُلْ مُوسَلِّيِّ, هـ. ফুআ. ৮৮২।

^{৩৬৯} سَاهِيَّهُلْ مُوسَلِّيِّ, هـ. ১৯২১, ফুআ. ৮৮১।

^{৩৭০} سَاهِيَّهُلْ مُوسَلِّيِّ, هـ. ১৯২৩, ফুআ. ৮৮১।

^{৩৭১} مُسাল্লাফ আবি শাইবাহ, হা. ৫৩৭২; শারহল মুমতি ৪/১০২।

^{৩৭২} سুন্নান আবু দাউদ, হা. ১১৩০।

সুতরাং এখান থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, জুমুআর পরে সর্বনিম্ন দুই রাকআত ও সর্বোচ্চ ছয় রাকআত পড়া যায়। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (সঞ্চালিত) মনে করেন যে, এই সুন্নাহ যদি মসজিদে আদায় করা হয় তাহলে চার রাকআত, আর বাড়িতে আদায় করলে দুই রাকআত।^{৩৭৩} তাই এই সলাতের বিভিন্ন অবস্থা হতে পারে।

المسألة التاسعة: كيفية صلاة الجمعة نinth مسأله: جumu'ah salat

জুমুআর সলাত দুই রাকআত এবং উভয় রাকআতে উচ্চেঃস্বরে ক্লিয়াআত হবে। কারণ নাবী ﷺ এমনটাই করতেন এবং এটি সুন্নাত। এ ব্যাপারে বিদ্বানগণ সকলেই একমত। প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা জুমুআহ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা মুনাফিকুন।^{৩৭৪} অথবা প্রথম রাকআতে সূরা আল্লা এবং দ্বিতীয় রাকআতে গশিয়াহ পাঠ করা সুন্নাত।^{৩৭৫} এটাই নাবী ﷺ করতেন।

المسألة العاشرة: في سن الجمعة tenth Masaal: Jumu'ah Salat

১. বড়ো প্রতিদিন হাসিলের জন্য সলাতে সকাল সকাল গমন করা সুন্নাত:

আবু হুরায়রা (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন,

«مَنْ أَغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُشْلًا جَنَابَةً، ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى، فَكَانَتْ قَرْبَ بَدْنَةٍ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَانَتْ قَرْبَ بَقَرَةٍ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْثَالِثَةِ، فَكَانَتْ قَرْبَ كَبْشًا أَفْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَانَتْ قَرْبَ دَجَاجَةٍ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَانَتْ قَرْبَ يَيْصَهَ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الدُّكْرَ»

“যে ব্যক্তি জুমুআর দিন জানাবাতের গোসলের মতো গোসল করে প্রথম পর্যায়ে মসজিদে আগমন করল সে যেন একটি উট কুরবানি করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে আগমন করল সে যেন একটি গরু কুরবানি করল, যে ব্যক্তি তৃতীয় পর্যায়ে আগমন করল সে যেন একটি শিং

^{৩৭৩} যাদুল মাযাদ ১/৮৮০।

^{৩৭৪} সঙ্গীহ মুসলিম, খ. ১৯১১, ফুআ. ৮৭৭।

^{৩৭৫} সঙ্গীহ মুসলিম, খ. ১৯১৩, ফুআ. ৮৭৮।

ওয়ালা দুষ্মা কুরবানি করল, যে ব্যক্তি চতুর্থ পর্যায়ে আগমন করল সে যেন একটি মুরগি কুরবানি করল এবং পঞ্চম পর্যায়ে যে ব্যক্তি আগমন করল সে যেন একটি ডিম কুরবানি করল। এরপর যখন ইমাম খুতবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয় তখন ফেরেশতারা যিকর (আলোচনা) শুনার জন্য উপস্থিত হয়।”^{৩৭৬}

তিনি আরও বলেন:

«مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَغْسَلَ، وَيَكْرَرُ وَابْتَكَرُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ حُطْوَرَةٍ يَخْطُوْهَا أَجْرٌ سَنَةٌ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا»

“যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করাল এবং করল, সকাল সকাল মসজিদে আসল, তার জন্য রয়েছে প্রত্যেক কদমের বিনিময়ে এক বছরের সিয়াম ও সলাতের নেকি।”^{৩৭৭}

২. জুমুআর দিনে গোসল করা সুন্নাত:

আবু হুরায়রা এর পূর্ববর্তী হাদিস: “مَنْ اغْسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُشْلَ الْجَنَابَةِ”^{৩৭৮} “যে ব্যক্তি জুমুআর দিন জানাবাতের গোসলের মতো গোসল করে...।”

গোসল পরিত্যাগ না করে বরং এর প্রতি আগ্রহী হওয়াই উচিত। বিশেষ করে যাদের শরীরে দুর্গন্ধ আছে। কিছু ওলামা এটাকে ওয়াজিব বলেছেন। মারফু‘ সূত্রে আবু সাঈদ খুদরী এর একটি বর্ণনাতে রয়েছে: **غُشْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ**

“প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির উপর জুমুআর দিন গোসল করা ওয়াজিব।”^{৩৭৯} সত্ত্বত ওয়াজিবের কথাটিই বেশি শক্তিশালী। তাই বিনা কারণে গোসল বাদ দেওয়া যাবে না।

৩. সুগন্ধি মাখা, পরিষ্কার-পরিষ্কার হওয়া ও শরীর থেকে যা দূর করার মতো তা দূর করা সুন্নাত: যেমন- নখ কাটা এবং অন্যান্য কিছু। এখানে পরিষ্কার-পরিষ্কার বলতে যা গোসলের অতিরিক্ত কাজকে বোঝানো হয়েছে, যাতে এটা দুর্গন্ধ ও এর উপকরণ দূর করতে সহায়তা করে। যেমন- এমন চুল যেগুলো শরীয়ত প্রণেতা দূর করার নির্দেশ দিয়েছেন, নখ, গুণ্ঠাঙ্গের লোম কেটে ফেলা, বগলের লোম উপড়ানো, নখ কাটা, গোঁফ ছোটো করা ও পাশাপাশি সুগন্ধি ব্যবহার করা। মারফু‘ সূত্রে সালমান এর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে,

لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَنْتَهِرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَكْرَرُ هُنُّ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمْسُ مِنْ طَيْبٍ بَيْتِهِ...

^{৩৭৬} মৃত্যুক্ষুল বালাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৮৮১; সহীহ মুসলিম, হা. ১৮৪৯, ফুআ. ৮৫০।

^{৩৭৭} তিগ্রিমিয়ী, হা. ৪৯৬ এবং তিনি হাসান বলেছেন। এ ছাড়াও মানবুরি হাসান বলেছেন, আত-তারগীব ওয়াত তারবীব ১/২৪৭।

^{৩৭৮} মৃত্যুক্ষুল বালাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৮৮১; সহীহ মুসলিম, হা. ১৮৪৯, ফুআ. ৮৫০।

^{৩৭৯} সঞ্চয়স বুখারী, হা. ৮৭৯; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ৮৪৬।

“কোনো ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করে সাধ্যানুযায়ী পবিত্রতা অর্জন করবে, তেল মাখবে অথবা স্বীয় ঘরের সুগন্ধি ব্যবহার করবে.....।”^{৩৮০}

ইবনু হাজার رض বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অধিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা..... এর দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো গোঁফ, নখ ও গুণ্ঠাঙ্গের লোম কাটা।^{৩৮১}

৪. সুন্দর সুন্দর কাপড় পরিধান করা সুন্নাত: ইবনু উমার رض এর হাদীসে বলা হয়েছে,
 أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى حُلْمَةً سِبْرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَشْتَرِتُ هَذِهِ، قَلِيسِنْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ
 وَلَلْوَفِيدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ،

“উমার বিন খাতাব رض মাসজিদে নাববীর দরজায় ডোরাকাটা রেশমের কাপড় দেখে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি যদি এটা ক্রয় করতেন এবং জুমুআর দিন ও আপনার কাছে যখন প্রতিনিধি দল আসে তখন পরিধান করতেন! তবে ভালো হতো।”^{৩৮২}

এই হাদীস থেকে ইমাম বুখারী رض জুমুআর দিন সুন্দর সুন্দর পোশাক পরিধান করার দলীল গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, বাব : يلس أحسن ما يجد,

হাফেজ ইবনু হাজার অসকুলানী رض বলেন, এর দ্বারা দলীল গ্রহণের দিকটা হলো এই যে, জুমুআর জন্য সৌন্দর্য অবলম্বনের মূল ভিত্তিকে নাবী رض স্বীকৃতি দিয়েছেন।^{৩৮৩} নাবী رض বলেছেন:

مَا عَلَىٰ أَحَدٍ كُمْ لَوْ أَشْتَرَى تَوْبَةً لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، سَوَىٰ ثُوبٍ مَهْبَثِهِ

“তোমাদের কেউ যদি জুমুআর দিনের সচরাচর পরিহিত পোশাক ব্যতীত দুইটি পোশাক ক্রয় করত।”^{৩৮৪} অর্থাৎ কাজের পোশাক।

৫. জুমুআর দিনে-রাতে নাবী رض এর উপর বেশি বেশি দরুদ পাঠ করা সুন্নাত: তিনি বলেছেন:

أَكْبِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَىٰ يَوْمِ الْجُمُعَةِ...

“জুমুআর দিন আমার উপর বেশি বেশি দরুদ পাঠ করো।”^{৩৮৫}

^{৩৮০} সহীহল বুখারী, হ্য. ৮৮৩।

^{৩৮১} সহীহল বুখারী, হ্য. ৮৮৩; দেখুন, ফাতহল বাবী ২/৪৩২।

^{৩৮২} সহীহল বুখারী, হ্য. ৮৮৬।

^{৩৮৩} ফাতহল বাবী ২/৪৩৪।

^{৩৮৪} সুনান আবু দাউদ, হ্য. ১০৭৮; ইবনু মাজাহ, হ্য. ১০৯৫; ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহ ইবনু মাজাহ, হ্য. ৮৯৮।

৬. ফজরের সলাতে যথাক্রমে সূরা সাজদাহ ও ইনসান (আদ-দাহর) পড়া সুন্নাত: এর উপরেই আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিয়মিত আমল ছিল।^{৩৮৬} আর দিনে সূরা কাহফ তিলাওয়াত করতেন। নাবী ﷺ বলেছেন:

«مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سطعَ لَهُ نورٌ مِّنْ تَحْتِ قَدْمِهِ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ يُضيِّعُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَغُفرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ»

“যে ব্যক্তি জুমুআর দিন সূরা কাহফ তিলাওয়াত করবে ঐ ব্যক্তির পায়ের নিচ থেকে উর্ধ্ব গগন পর্যন্ত আলোকিত হয়ে যাবে। কিয়ামতের দিন তাকে আলোকিত করবে এবং তার দুই জুমুআর মাঝের গুনাহ ক্ষমা করা হবে।”^{৩৮৭}

৭. যে ব্যক্তিই মসজিদে প্রবেশ করবে ঐ ব্যক্তির জন্য সুন্নাত হলো না বসে আগে দুই রাকআত সলাত আদায় করে নেওয়া: কারণ নাবী ﷺ এ ব্যাপারে আদেশ করেছেন।^{৩৮৮} তবে ইমাম যখন খুতবা দিতে থাকবে তখন সলাত সংক্ষেপ করে নিবে।

৮. বেশি বেশি দুআ করা ও দুআ করুলের সময় চাওয়া সুন্নাত: নাবী ﷺ বলেছেন:

إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ، قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ حَتَّىٰ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِنْتَهٰءًا

“নিশ্চয়ই জুমুআর দিনে এমন একটা সময় রয়েছে, এ সময় যে কোনো মুসলিম বান্দা সলাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর নিকট কিছু চাইলে তিনি তাকে অবশ্যই তা দিয়ে থাকেন।”^{৩৮৯}

^{৩৮৬} সুনান আবু দাউদ, হাক. ১০৪৭; নাসাই ৩/৯১; ইবনু মাজাহ, হা. ১০৮৫; হাকিম ১/২৭৮; ইমাম যাহুবী মাওকুফ সূত্রে সহীহ বলেছেন; ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহ ইবনু মাজাহ, হা. ৮৮৯।

^{৩৮৭} সহীহল বুখারী, হা. ৮৯১।

^{৩৮৮} হাকিম ২/৩৬৮ এবং তিনি সহীহ বলেছেন। ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, ইরওয়া ৩/৯৩৯।

^{৩৮৯} সহীহল বুখারী, হা. ৯৩০।

^{৩৯০} সহীহল বুখারী, হা. ৯৩৫; সহীহ মুসলিম, হা. ৮৫২, ফুআ. ১৮৫৪।



الباب الحادي عشر: في صلاة الخوف

একাদশ অনুচ্ছেদ : সলাতুল খওফ বা ভয়-ভীতির সলাত

এ সংক্রান্ত মাসআলাসমূহ:

এই সেই তৃতীয় ওয়র বা অপারগতা যার কারণে সলাতের অবস্থা ও এর সংখ্যা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। অসুস্থতা ও সফরের ওয়র সম্পর্কে আলোচনা পূর্বে চলে গেছে।

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: حُكْمُهَا، وَدَلِيلُ مَشْرُوعِيهَا، وَشُرُوطُهَا

প্রথম মাসআলা: ভীতির সলাতের বিধান, শরীয়ত সম্মত হওয়ার
দলীল ও এর শর্তসমূহ

এর হukum: ভীতির সলাত জায়েয প্রত্যেক বৈধ যুক্ত। যেমন কাফের, বিদ্রোহী ও ইসলাম বিরোধীদের সাথে যুদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنْ خَفْتُمْ أَنْ يَفْتَنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا... ﴿١﴾

“যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে কাফেররা তোমাদের ফেতনায ফেলবে।” [সূরা নিসা : ১০১]

যাদের সাথে যুদ্ধ করা বৈধ তাদেরকে এর উপরই বাকি কিয়াস করা হয়েছে। শক্তির আক্রমনের ভয় থাকলে অথবা পালানোর ভয় থাকলে যদি সেই পালানোটা বৈধ হয়, এবং শক্তি দলে কোনো শক্তি বা হিংস্র জন্তুকে যাওয়ায মানুষ নিজের উপর ভীতির আশঙ্কা করলে সেই সময় ভীতির সলাত আদায় করা জায়েয। যেমন এমন হিংস্র পশু যে তার পরিবার অথবা সম্পদ লুঠন করতে চায়, অত্যাচারী প্রতিপক্ষ ইত্যাদি।

শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল:

শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল হলো কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা:

কুরআনের দলীল: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقِمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقْمِنُ طَبِيقَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْنَاتِ طَبِيقَةً أُخْرَى لَمْ يُصْلِلُوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ...﴾

“যখন তুমি তাদের মধ্যে থাকবে তখন তাদের মধ্যে একটা দল যেন তোমার সাথে দাঁড়ায় এবং তারা যেন নিজেদের অন্তর্ভুক্ত ধারণ করে থাকে, যখন সাজদা করবে তখন তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান নেয়। এরপর অপর দল যারা সলাত পড়েনি তারা যেন এসে তোমার সাথে সলাত আদায় করে এবং তারা যেন কাফেরদের থেকে সতর্কতা অবলম্বন করে এবং অন্তর্ভুক্ত ধারণ করে থাকে।” [সূরা নিসা : ১০২]

আল্লাহর রসূল ﷺ এ সলাত আদায় করেছেন এবং সাহাবীরা ﷺ এর উপর একমত হয়েছেন।

এর শর্তসমূহ:

ভীতির সলাত দুটি শর্তে শরীয়তে অনুমোদিত।

প্রথম শর্ত: যাদের সাথে যুদ্ধের অনুমতি আছে শক্ত তাদের মধ্যকার হতে হবে। যেমন কাফের, বিদ্রোহী ও ইসলাম বিরোধীদের সাথে যুদ্ধ। এর আলোচনা পূর্বে চলে গেছে।

দ্বিতীয় শর্ত: সলাত পড়া অবস্থায় মুসলমানদের উপর আক্রমনের ভয় থাকলে।

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: كِيفِيَّةُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

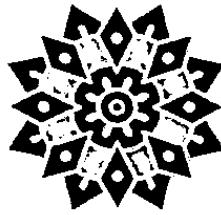
দ্বিতীয় মাসআলা: ভীতির সলাতের পদ্ধতি

ভীতির সলাত বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে নাবী ﷺ থেকে সাহল বিন আবি হাসমা আনসারী ﷺ এর সূত্রে একটা বিশেষ পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। আর এটাই কুরআনে বর্ণিত পদ্ধতির সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। এতে সলাতের সতর্কতা রয়েছে, রয়েছে যুদ্ধেরও সতর্কতা। পাশাপাশি এটা শক্তদের অন্তরজ্ঞালার কারণ। নাবী ﷺ এই বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন ‘যাতুর রিকু’ নামক যুদ্ধে। সাহল ﷺ যেভাবে এই পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন :

«أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَطَائِفَةً وَجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ تَبَّتْ قَائِمًا، وَأَتَمُوا لِأَنفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، وَصَفَّفُوا وَجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الْآخَرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي يَقِيْتُ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ تَبَّتْ جَالِسًا وَأَتَمُوا لِأَنفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمُوا»^{৩০}

একদল নাবী ﷺ এর সাথে কাতার সোজা করল, আরেকদল শক্র মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল। অতঃপর নাবী ﷺ তাঁর সাথে দাঁড়ানো লোকদের নিয়ে এক রাকআত সলাত আদায় করে দাঁড়িয়ে রইলেন, এরপর তারা নিজেদের সলাত পূর্ণ করে নিল। অতঃপর তারা গিয়ে শক্র মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো, এবার অপর দলটি এসে নাবী ﷺ এর বাকি এক রাকআতের সাথে আদায় করল। অতঃপর তিনি বসে রইলেন। পরে তারাও নিজেদের সলাত পূর্ণ করে নিল। এরপর নাবী ﷺ তাদের নিয়ে সালাম ফিরালেন।^{৩০}

^{৩০} সহীহ মুসলিম, হা. ৮৪১; সুনান আবু দাউদ, হা. ১২৩৮।



الباب الثاني عشر: في صلاة العيددين দ্বাদশ অনুচ্ছেদ: দুই ইদের সলাত

এ অধ্যায়ে কিছু মাসআলা রয়েছে:

দুটি ঈদ: ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর। এ দুটিরই শরয়ী উপলক্ষ্য রয়েছে। ঈদুল ফিতর মুসলিমদের রমায়ান মাসের সিয়াম শেষ উপলক্ষ্যে আসে। আর ঈদুল আযহা আসে যুল হিজাহের দশ তারিখ শেষ উপলক্ষ্যে। ঈদকে ঈদ বলার কারণ: এটি নির্ধারিত সময়ে বারবার ফিরে আসে।

المَسَأَلَةُ الْأُولَى: حِكْمَهَا، وَدَلِيلُ ذَلِكَ

প্রথম মাসআলা: ঈদের সলাতের হুকুম ও এর দলীল

ঈদের সলাত ফরযে কেফায়া। কিছু লোক তা আদায় করলে অবশিষ্টদের থেকে পাপের বোৰা নেমে যাবে। অপরদিকে সকলেই যদি তা বর্জন করে, তাহলে সকলেই পাপের ভাগিদার হবে। কারণ এটা ইসলামের বাহ্যিক নির্দেশনসমূহের অন্যতম। নাবী ﷺ এটা নিয়মিত আদায় করেছেন। অনুরূপভাবে তাঁর পরবর্তী সাহাবীগণও। এমনকি নাবী ﷺ মহিলাদেরও তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ঝুঁতুবর্মী মহিলাদেরকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে তারা মুসল্লা থেকে দুরে থাকবে। এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, এর গুরুত্ব ও ফয়লত কত বেশি! মহিলাদের নির্দেশ দিয়েছেন এজন্যই যে, তারা কোনো সভায় অংশ গ্রহণ করতে পারে না। এ দিক থেকে পুরুষেরা এক ধাপ এগিয়ে। আর বিদ্বানদের কেউ কেউ ফরযে আইন হওয়াকেই শক্তিশালী বলেছেন।

المَسَأَلَةُ الثَّانِيَةُ: شَرُوطُهَا দ্বিতীয় মাসআলা: শর্তসমূহ

গুরুত্বপূর্ণ শর্তসমূহ: ১. সময় হওয়া; ২. নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যক্তির উপস্থিতি; ৩. স্থায়ী বসবাস।

সময় হওয়ার আগে সলাত পড়া জায়েয় নেই। আবার তিনজন ব্যক্তির কমেও এই সলাত আদায় করা বৈধ নয়। আর স্থায়ী বাসিন্দা ব্যক্তিত কোনো মুসাফিরের উপর এ সলাত ওয়াজিব নয়।

المسألة الثالثة: المواقع التي تصلى فيها الثانية مسأله: سلاته آدابه وآدابه

দালানের বাইরে খোলা ময়দানে এ সলাত আদায় করা সুন্নাহ। আবু সাউদ رض এর হাদিস-

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلِّ ...

“নাবী ﷺ সৈদুল ফিতর ও সৈদুল আযহার সলাত আদায়ের জন্য বের হয়ে সৈদগাহে যেতেন।”^{৩৯১}
এখান থেকে উদ্দেশ্য হলো- আল্লাহই ভালে জানেন- এই নির্দশন প্রকাশ করা। তবে ওয়র
থাকলে জামে’ মসজিদে আদায় করা বৈধ। যেমন- বৃষ্টি, প্রচণ্ড বাতাস ইত্যাদি।

المسألة الرابعة: وقتها الرابعة مسأله: سmary

ঈদের সলাতের সময় চাশতের সলাতের মতো সূর্য বর্ণার সমপরিমাণ উদিত হওয়ার পর থেকে
পশ্চিম আকাশে ঢলার সময় পর্যন্ত। এ সলাত নাবী ﷺ ও তার খলীফাগণ সূর্য উদিত হওয়ার পর
আদায় করতেন। কারণ সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বের সময়টা নিষিদ্ধ সময়।^{৩৯২} সৈদুল আযহা প্রথম
ওয়াকে অন্তিবিলম্বে আদায় করা ও সৈদুল ফিতর একটু বিলম্বে আদায় করা সুন্নাত। কারণ
কুরবানি করার জন্য সৈদুল আযহার সলাত মানুষের অন্তিবিলম্বে আদায় করা দরকার। অন্যদিকে
যাকাতুল ফিতর আদায়ের জন্য সৈদুল ফিতরের সলাতের সময় একটু প্রশস্ত হওয়া প্রয়োজন।

المسألة الخامسة: صفتها وما يقرأ فيها

পঞ্চম মাসআলা: ঈদের সলাতের পদ্ধতি এবং সলাতে যা তিলাওয়াত করা হবে

পদ্ধতি: খুতবার পূর্বে দুই রাকআত সলাত। উমার رض বলেন,

صَلَاةُ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِنِيْكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ حَاجَ بَمِنْ أَفْرَى
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যবানীতে সফরের সলাত দুই রাকআত, জুমুআহর
সালাত দুই রাকআত এবং ঈদের সালাত দুই রাকআত। এগুলো পূর্ণ সালাত, কসর নয়। তাই
যে মিথ্যা বলবে, সে ব্যর্থ হবে।”^{৩৯৩}

^{৩৯১} মুক্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৯৫৬; সহীহ মুসলিম, হা. ১৯৩৮, ফুআ. ৮৮৯।

^{৩৯২} দেখুন, মুগানী ২/২৩২-২৩৩।

^{৩৯৩} আহমাদ ১/৩৭; নাসাই ১/২৩২; বায়হাকী ৩/২০০; সহীহ ইবনু খুবায়মাহ, হা. ১৫২৫; সহীহ; দেখুন, ইরওয়াউল গালীল ৩/১০৬।

ପ୍ରଥମ ରାକଆତେ ତାକବୀରେ ତାହରୀମା ଦିଯେ ସଲାତ ଶୁରୁ କରାର ପର 'ଆ'ୟୁ ବିଲ୍ଲାହ' ବଲାର ଆଗେଇ ଛୟ ତାକବୀର ଦିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାକଆତେ କେରାତେର ପୂର୍ବେ ପାଁଚ ତାକବୀର ଦିବେ କିଯାମେର ତାକବୀର ଛାଡ଼ା । ଆସିଶାହ ହେଲୁ ହତେ ମାରଫୁ' ସୂତ୍ରେ ଏକଟି ହାଦୀସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଯାଇଛି:

يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ سَوَى تَكْبِيرَتِ الرُّكُوعِ

"ଦ୍ୱିତୀୟ ରାକଆତେ ତାକବୀରେ ତାହରୀମାର ପର ସାତ ତାକବୀର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାକଆତେ ରୁକୁର ତାକବୀର ବ୍ୟତୀତ ପାଁଚ ତାକବୀର ।" ୩୯୪

ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାକବୀରେର ସାଥେ ହଞ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ୱୋଳନ କରତେ ହବେ ।

لَانَّ النَّبِيًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ

"ନାବି ତାକବୀରେର ସମୟ ତାର ହଞ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଓଠାତେନ ।" ୩୯୫ 'ଆ'ୟୁ ବିଲ୍ଲାହ' ବଲାର ପର ଉଚ୍ଚେଷ୍ଟରେ କ୍ରିରାଆତ ପାଠ କରତେ ହବେ, ଏତେ କୋନୋ ମତବିରୋଧ ନେଇ । ସୂରା ଫାତିହା ପାଠ କରବେ । ପ୍ରଥମ ରାକଆତେ ସୂରା 'ଆ'ଲା' ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାକଆତେ ସୂରା 'ଗଶିଯାହ' ପଡ଼ା ସୁନ୍ନାତ । ସାମୁରାହ ବଲେନ,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ: بِسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَهُنْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ،

"ନାବି ଦୁଇ ଈଦେ ସୂରା 'ଆ'ଲା' ଏବଂ ସୂରା 'ଗଶିଯାହ' ପଡ଼ାତେନ ।" ୩୯୬ ସହିହ ସୂତ୍ରେ ପ୍ରମାଣିତ ଆଛେ ଯେ, ତିନି ପ୍ରଥମ ରାକଆତେ ସୂରା 'କୁ-ଫ' ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାକଆତେ ସୂରା 'କୁମାର' ପଡ଼ାତେନ ।" ୩୯୭ ଏକ୍ଷେତ୍ରେ ଯିନି ଇମାମ ଥାକବେନ ତିନି ସୁନ୍ନାତ ପାଲନାର୍ଥେ କଥନୋ ଏଟା ବା କଥନୋ ଓଟା ପାଠ କରବେନ । ପାଶାପାଶି ମୁସଲିନ୍ଦେର ଅବସ୍ଥାଓ ବିବେଚନା କରବେନ ଏବଂ ତାଦେର ଜନ୍ୟ ଯେଟା ସହଜ ସେଟାଇ କରବେନ ।

المسألة السادسة: موضع الخطبة

ষଷ୍ଠ ମାସତାଲା: ଖୁତବାର ସ୍ଥାନ

ଈଦେର ସଲାତେ ଖୁତବା ହବେ ସଲାତେର ପର । କାରଣ ଇବନୁ ଉମାର ବଲେନ,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُوبَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

"ନାବି ଆବୁ ବକର ଓ ଉମାର ବଲେନ, ତାରା ସବାହି ଖୁତବାର ପୂର୍ବେ ଈଦେର ସଲାତ ଆଦ୍ୟ କରତେନ ।" ୩୯୮

^{୩୯୫} ମୁନାନ ଆବୁ ଦ୍ୱାରା, ପୃ. ୧୧୪୯; ସହିହ, ଦେଖନ, ଇରଓୟାଉଲ ଗାଲିଲ ୩/୨୮୬ ।

^{୩୯୬} ଆହମାଦ ୪/୩୧୬; ଇମାମ ଆଲବାନୀ ହାସାନ ବଲେହେନ, ଇରଓୟା ୬୪୧ ।

^{୩୯୭} ଆହମାଦ ୫/୭; ଇବନୁ ମାଜାହ, ପୃ. ୧୨୮୩; ଇମାମ ଆଲବାନୀ ସହିହ ବଲେହେନ, ଇରଓୟା ୬୪୪ ।

^{୩୯୮} ସହିହ ମୁସଲିମ, ପୃ. ୮୯୧ ।

^{୩୯୯} ସହିହ ବୁଖାରୀ, ପୃ. ୧୯୬୩; ସହିହ ମୁସଲିମ, ପୃ. ୧୯୩୭, ଫୁଆ. ୮୮୮ ।

المسألة السابعة: قضاء العيد

সপ্তম মাসআলা: ঈদের সলাত কায়া করার বিধান

কারো ঈদের সলাত ছুটে গেলে তার জন্য কায়া আদায় করা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। নাবী ﷺ থেকে দলীল বর্ণিত হয়নি। কেননা এটা নির্দিষ্ট জামাআতের সলাত। সুতরাং এটা জামাআত ছাড়া শরীয়ত অনুমোদিত নয়।

المسألة الثامنة: سنها

অষ্টম মাসআলা: এর সুন্নাহসমূহ

১. সুন্নাত হলো ঈদের সলাত জনপদের বাইরে এমন এক প্রশস্ত স্থানে আদায় করা যেখানে মুসলিমরা তাদের এই নির্দশন প্রকাশের জন্য জমায়েত হতে পারবে। আর যদি কোনো কারণবশত মসজিদে আদায় করতে হয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই।

২. সৈদুল আযহার সলাত অবিলম্বে আদায় করা এবং সৈদুল ফিতরের সলাত একটু দেরিতে আদায় করা সুন্নাত। এর বিবরণ সময়ের আলোচনায় অর্থাৎ চতুর্থ মাসআলায় উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. সৈদুল ফিতরের সলাতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বে কিছু খেজুর খেয়ে বের হওয়া ও কুরবানির দিন সলাত আদায় করে খাওয়া সুন্নাত। নাবী ﷺ সৈদুল ফিতরের দিন বেজোড় সংখ্যার কিছু খেজুর না খেয়ে বের হতেন না।^{৩৯৯} আর কুরবানির দিন সলাত আদায় না করা পর্যন্ত কিছু খেতেন না।^{৪০০}

৪. ফজরের সলাতের পর সকাল সকাল পায়ে হেঁটে ঈদের সলাতের উদ্দেশ্যে বের হওয়া, যাতে ইমামের নিকটবর্তী থাকতে পারে। পাশাপাশি সলাতের জন্য অপেক্ষায় থাকার ফয়েলত অর্জিত হয়।

৫. মুসলিম ব্যক্তি গোসল করে সুন্দর পোশাক পরিধান করে সুগন্ধি মেঝে সুন্দরভাবে সাজবে।

৬. ঈদের সলাতে এমন খুতবা দিতে হবে যাতে দ্বিনের সকল বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। মানুষদের যাকাতুল ফিতরের প্রতি উৎসাহ দিতে হবে, তারা কি বের করবে তা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে দিতে হবে, কুরবানি করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করতে হবে এবং এর ইকুম স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে দিতে হবে। বজ্রবে মহিলাদের জন্য একটা অংশ থাকবে। কারণ

^{৩৯৯} সহীহ বুখারী, ঘ. ৯৫৩।

^{৪০০} তিরমিয়ী, ঘ. ৫৪২; ইবনু মাজাহ, ঘ. ১৭৫৬; ইখাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহ ইবনু মাজাহ, ঘ. ১৪২২।

তাদেরও প্রয়োজন নাবী ﷺ কে অনুসরণ করা। তিনি ﷺ সলাত ও খুতবা শেষে মহিলাদের কাছে যেতেন এবং তাদেরকে উপদেশ দিতেন।^{৪০১} বর্ণনা অনুযায়ী এ কাজটি সলাতের পর হবে। ৭. বেশি বেশি ঈদের তাকবীর বলাও সুন্নাত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلِكُمْ كُلُّهُمْ مُّكْلِفٌ لِّمَا هُدَىٰ إِلَيْهِ وَلِكُلِّ أُنْثَىٰ مُّكْلِفٌ لِّمَا شَرَكَتْ﴾

“আর তোমরা যেন নির্ধারিত সংখ্যা পূরণ করতে পারো, তোমাদেরকে যে সুপথ দেখিয়েছেন তারজন্য তোমরা আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করো এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।” [সূরা বাকুরা : ১৮৫]

পুরুষেরা বাড়িতে, মাসজিদে ও হাটে-বাজারে উচ্চস্থরে তাকবীর পাঠ করবে এবং মহিলারা নিম্নস্থরে পাঠ করবে।

৮. রাস্তা পরিবর্তন করা। তিনি ﷺ এক রাস্তা দিয়ে ঈদগাহে যেতেন, অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসতেন। জাবির رض বলেন,

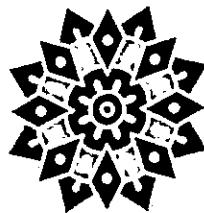
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِ حَالَفَ الطَّرِيقَ

“নাবী ﷺ ঈদের দিন রাস্তা পরিবর্তন করতেন।”^{৪০২}

এর হিকমাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, দুটো রাস্তাই যেন তাঁর জন্য সাক্ষ্য দেয়। আরও বলা হয়েছে, এতে ইসলামের নির্দশন প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া আরও কিছু তাৎপর্য রয়েছে। ঈদের দিন পরম্পরে একে অপরকে বলবে, صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এর অর্থ: আল্লাহ আমাদের এবং তোমার সৎ আমল কবুল করুন! বলে শুভেচ্ছ বিনিময় করাতে কোনো সমস্য নেই। সাহাবীগণ একে একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ হলে অতি আনন্দের সাথে এরূপ করতেন।

^{৪০১} সংহীতল বুখারী, ঘ. ৯৭৮।

^{৪০২} সংহীতল বুখারী, ঘ. ৯৮৬।



الباب الثالث عشر: في صلاة الاستسقاء অয়োদ্ধ অনুচ্ছেদ: সলাতুল ইস্তিসক্তা বা বৃষ্টি প্রার্থনার সলাত এতে কিছু মাসআলা রয়েছে:

المُسَأْلَةُ الْأُولَى: تعرِيفُهَا، وحُكْمُهَا ودَلِيلُ ذَلِك

প্রথম মাসআলা: ইস্তিসক্তার সংজ্ঞা, হুকুম ও দলীল

১. পরিচয়:

الاستسقاء هو طلب السقي من الله تعالى عند حاجة العباد إليه، على صفة مخصوصة؛ وذلك إذا أجدبت الأرض، وفحط المطر؛ لأنَّه لا يُسقى ولا ينزل الغيث إلا الله وحده.

“বান্দার প্রয়োজনে বিশেষ পদ্ধতিতে আল্লাহর কাছে পানি চাওয়া বা প্রার্থনা করা। আর এটা তখনই হয়ে থাকে যখন অনাবৃষ্টিতে জমি অনুর্বর হয়ে যায়। কারণ বৃষ্টি কেবল আল্লাহই দিতে পারেন, অন্য কেউ নয়।

২. হুকুম: سলাতুল ইস্তিসক্তা বা বৃষ্টির সলাত সুন্নাতে মুয়াকাদা। آبُدُ اللَّٰهِ بِنْ يَعْوَذُ بِلِلَّٰهِ^১ বলেন,
خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْفِي، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو وَحَوْلَ رِدَاءِهِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقَرَاءَةِ
“নাবী ﷺ আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতেন। অতঃপর কিবলামুখী হয়ে দুআ করতেন, নিজের চাদর পরিবর্তন করতেন এবং উচ্চেঁস্বরে কুরআতে দুই রাকআত সলাত আদায় করতেন।”^১

^১ সহীল বুখারী, খ. ১০২৪; সহীহ মুসলিম, খ. ১৯৫৬, ফুআ. ৮৯৪।

المسألة الثانية: سببها

الثانية ماسألاة : اই سلাতের কারণ

এই সলাতের কারণ হলো অনাবৃষ্টি অর্থাৎ বৃষ্টি না হওয়া। এই কারণেই নাবী ﷺ আদায় করতেন।

المسألة الثالثة: وقتها وكيفيتها

الثالثة ماسألاة : اই سلাতের সময় এবং পদ্ধতি

সলাতুল ইস্তিস্কুর সময় এবং পদ্ধতি ঈদের সলাতের মতোই। ইবনু আবুস অব্দুল্লাহ বলেন,

صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِدَّةِ

“নাবী ﷺ ঈদের সলাত যেভাবে আদায় করতেন সেভাবে এ সলাতও আদায় করতেন।”^{৪০৪}
 সলাতটি ঈদের সলাতের ন্যায় মুসল্লাতে (মাঠে) গিয়ে আদায় করা মুস্তাহব। ঈদের সলাতের মতো জেহরী কেরাতে দুই রাকআত সলাত আদায় করবে। খুতবার আগেই সলাত পড়তে হবে। অনুরূপভাবে তাকবীরের সংখ্যা এবং সলাতে পঠিতব্য কুরআতও একই। যে কোনো পদ্ধতিতেই ইস্তিস্কুর সলাত আদায় করা জায়েয। এ ক্ষেত্রে মানুষ দুআ করতে পারে এবং সাজদায় গেলে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে পারে। জুমুআর সলাতে ইমাম মিষ্বারে থাকাবস্থায় বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে পারে। যেমন নাবী ﷺ জুমুআর দিন মিষ্বারের উপর দাঁড়িয়ে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেছেন।^{৪০৫}

المسألة الرابعة: الخروج إلى

চতুর্থ ماسألاة: সলাতের উদ্দেশ্যে বের হওয়া

ইমাম যখন সলাতের উদ্দেশ্যে বের হবেন তখন মানুষদের উদ্দেশ্যে নসীহত করবেন। তাদেরকে তওবা করার নির্দেশ দিবেন। সেই সাথে অন্যায়-অত্যাচার এবং পরম্পরে হিংসা-বিদ্রোহ ও ঝগড়া-বিবাদ বর্জন করার নির্দেশ দিবেন। কারণ এ গুলোই আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণ নাফিল হওয়ার অন্তরায়। বস্তুত, পাপাচার অনাবৃষ্টির কারণ এবং তাকুওয়া হলো বরকতের কারণ।

^{৪০৪} নামান্দ, পৃ. ১৫২১; ডিরমিয়ী, পৃ. ৫৫৮, হাসান; দেখুন, ইরওয়াউল গলীল ৩/১৩৩।

^{৪০৫} সহীল মুখারী, পৃ. ৯৩৩; সহীহ মুসলিম, পৃ. ১৯৬৩, ফুআ, ৮৯৭।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَرَأُوا أَنَّ أَهْلَ الْقُرْبَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخْذَنَا هُنَّ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

“জনপদগুলোর লোকেরা যদি ঈমান আনত ও তাক্রুওয়া অবলম্বন করত, তাহলে আমরা তাদের জন্য আসমান এবং জমিনের কল্যাণ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা (সত্যকে) প্রত্যাখ্যান করল। কাজেই তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করলাম।” [সূরা আরাফ: ৯৬]

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে কিন্তু সুগন্ধি মাখা যাবে না, সুন্দর পোশাক পরিধান করবে না। কারণ এই দিনটি বিনয়-ন্ম হওয়ার দিন। তিনি অতি নম্র, ভদ্র ও বিনয়ী হয়ে বের হবেন। ইবনু আবাস رض বলেন,

খَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَا سَقَاءِ مَذَلَّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَحَشِّعًا، مُتَضَرِّعًا،

‘নাবী ﷺ বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য অতি নম্র-ভদ্র ও বিনয়ী হয়ে বের হতেন।’^{৪০৬}

المُسَأَّلَةُ الْخَامِسَةُ: الْخُطْبَةُ فِيهَا

পঞ্চম মাসআলা: ইস্তিস্কুর সলাতে খুতবা

ইস্তিস্কুর সলাতের পর ইমাম সাহেব একটা খুতবা দিবেন, যাতে সামগ্রিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে। সেখানে তিনি তাওবা করার নির্দেশ দিবেন। বেশি বেশি দান-সাদকা, আল্লাহর পথে প্রত্যাবর্তন ও যাবতীয় পাপ কাজ বর্জনের নির্দেশ দিবেন। সেই সাথে খুতবায় বেশি বেশি ইস্তিগফার করবেন, ক্ষমা প্রার্থনা করার আদেশ সুচক আয়াতসমূহ তিলাওয়াত ও বৃষ্টি চেয়ে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দুআ করা উচিত। যেমন তিনি বলেছেন, (اللَّهُمَّ أَغْنِنَا) অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দাও।^{৪০৭} তিনি আরও বলেন:

«اللَّهُمَّ اسْقِنَا عَيْنَيْنَا مُغَيْنِيَا، مَرِيْقَا مَرِيْعِيَا، عَاجِلًا عَيْزَرَ آجِيلِ، نَافِعًا عَيْزَرَ ضَارِ»

“হে আল্লাহ! আমাদেরকে মুশলিধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করো। যা হবে কল্যাণময় ও সজীবতা দানকারী; বিলম্বে নয় বরং তাড়াতাড়ি; উপকারী ও ক্ষতিকর নয়।”^{৪০৮}

^{৪০৬} তিরমিয়ী, হ্য. ৪৫৮; ইবনু মাজাহ, হ্য. ১২৬৬; হাসান; দেখুন, ইরওয়াউল গলীল ২/১৩৩।

^{৪০৭} সহীহল বুখারী, হ্য. ১০১৪; সহীহ মুসলিম, হ্য. ১৯৬৩, ফুআ. ৮৯৭: ইস্তিস্কুর দীর্ঘ হাদীস।

^{৪০৮} সুনান আবু দাউদ, হ্য. ১১৫৯; ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সানাদের তাখরীজ মিশকাত, হ্য. ১৫০৭।

—অত্যন্ত সুপেয়। **مَرِيْعَة**—উর্বর বা উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন। তিনি আরও বলেছেন,
 اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزَلْتَ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى جِنْ
 “হে আল্লাহ! আপনি আল্লাহ। আপনি ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই। আপনি অমুখাপেক্ষী, আমরা সবাই আপনার কাছে মুখাপেক্ষী। আপনি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন। আপনি আমাদের জন্য যা বর্ষণ করবেন, তা দ্বারা আমাদের জন্য প্রবল শক্তি ও কাঞ্চিত লক্ষ্যে পৌছার ব্যবস্থা করুন।”^{৪০৯}

অনুরূপভাবে তিনি দুর্হাত উত্তোলন করবেন। কারণ নাবী ﷺ একুপ করতেন। এমনকি তাঁর বগলের সুন্দর প্রকাশ পেত। লোকেরাও তাদের হাত উত্তোলন করবে। কারণ নাবী ﷺ যখন জুমুআর সলাতে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন তখন লোকেরাও (সাহাবীগণ) তাঁর সাথে হাত উত্তোলন করেছিল। পাশাপাশি নাবী ﷺ এর উপর বেশি বেশি দরদ পড়তে হবে। কারণ দুআ করুলের এটাও একটা মাধ্যম।

المسألة السادسة: السنن التي ينبغي فعلها فيها

ষষ্ঠى ماسأة: সলাতে যে সুন্নাতগুলো পালন করা উচিত

১. এ ব্যাপারে নাবী ﷺ থেকে প্রমাণিত দুআগুলো বেশি বেশি পড়তে হবে। দুআর শেষে কিবলামুখী হয়ে চাদর উল্টিয়ে নিবে। অর্থাৎ ডান পাশের অংশ বাম পাশে এবং বাম পাশের অংশ ডান পাশে নিতে হবে। এভাবে চাদরটা অনেকটাই আবায়ার মতো হবে। এ কথা প্রমাণিত যে, নাবী ﷺ মানুষের দিকে তাঁর পিঠ ফিরিয়েছেন। কিবলামুখী হয়ে দুআ করেছেন। অতঃপর তাঁর চাদর উল্টিয়ে দিয়েছেন।^{৪১০} চাদর উল্টানোর কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, চলমান অবস্থার পরিবর্তন আশা করা।

২. ইস্তিস্কুর সলাতের জন্য মহিলা-শিশুসহ সকল মুসলিমের বের হওয়াই সুন্নাহ।

৩. বিনয়-নন্দ ও নতজানু হয়ে বের হওয়া সুন্নাত। কারণ নাবী ﷺ বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য অতি নন্দ-স্তু ও বিনয়ী হয়ে বের হতেন।^{৪১১}

^{৪০৯} সুনান আবু দাউদ, ঘ. ১১৭৩; ইমাম আলবানী হাসান বলেছেন, সানাদের তাখরীজ মিশকাত, ঘ. ১৫০৮।

^{৪১০} সহীহ বুখারী, ঘ. ১০১১; সহীহ মুসলিম, ঘ. ফুআ. ৮৬৩।

^{৪১১} শিল্পীয় বর্ণনা করেছেন এবং তিনি হাসান সহীহ বলেছেন।

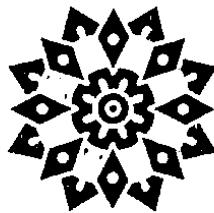
৪. বৃষ্টি বর্ষণের সময় সেখানেই অবস্থান করা সুন্নাহ, যাতে তার উপরে বৃষ্টি পড়ে। আর বলতে হবে “হে আল্লাহ মুশলিদারে এবং উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ করুন।” আরও বলতে হবে, “আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতে বৃষ্টি বর্ষণ হয়েছে।”

৫. বৃষ্টি বেশি হয়ে গেলে এবং ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে বলতে হবে.....

اللَّهُمَّ حَوِّلْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الظَّرَابِ وَالْأَكَامِ، وَبِطْوَنِ الْأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

“হে আল্লাহ আমাদের উপর নয় বরং আশেপাশে বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ! ছোটো ছোটো পাহাড়, স্তুপ, উপত্যকায় ও গাছের কাণ্ডের উপর বর্ষণ করুন।”^{৪১২}

৪১২-ছোটো ছোটো পাহাড়। কাঁ-স্তুপ, টিলা যা কোনো এক স্থানে অনেকগুলি পাথরের সমষ্টিকে বুঝায়।



الباب الرابع عشر: في صلاة الكسوف

চতুর্দশ অনুচ্ছেদ: সলাতুল কুসূফ তথা চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের সলাত

এতে কিছু মাসআলা রয়েছে:

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: تَعْرِيفُ الْكَسْوَفِ، وَالْحِكْمَةُ مِنْهُ

প্রথম মাসআলা: কুসূফের সংজ্ঞা ও এর তাৎপর্য

هو انحصار ضوء أحد الثنرين - الشمس والقمر- بسبب غير معتاد، والكسوف والخسوف بمعنى واحد.

কুসূফ: চন্দ্র-সূর্য এ দুটির কোনো একটির আলো অস্বাভাবিক উপায়ে ঢেকে যাওয়া। কুসূফ ও খুসূফ এ দুটির অর্থ একই। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে এটা ঘটিয়ে থাকেন, যাতে তারা তাঁর দিকে ফিরে আসে। যেমন নাবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ أَيَّتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَنْكِسِفَانِ لَيْوَتِ أَحَدٍ وَلَا لِجِيَّاتِهِ، وَإِنَّمَا يَجْوَفُ اللَّهَ بِهَا عِبَادُهُ

“নিশ্চয়ই চন্দ্র ও সূর্য এ দুটি আল্লাহর নির্দেশনের অন্যতম দুটি নির্দেশন। কারো মৃত্যু অথবা জন্মের কারণে গ্রহণ হয় ন। বরং আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা তাঁর বান্দাকে সতর্ক করে থাকেন।”^{৪১৩}

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: حِكْمَةُ صَلَاتِ الْكَسْوَفِ وَدَلِيلُهَا

দ্বিতীয় মাসআলা: সলাতুল কুসূফের হুকুম ও এর দলীল

আবু আওয়ানার সহীহ বর্ণনা উপর ভিত্তি করে বলা যায় সলাতুল কুসূফ ওয়াজিব।

আবু হানীফা থেকে ওয়াজিব হওয়ার মত বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মালেক এটিকে জুমুআর সাথে

^{৪১৩} মুত্তাফাকুন আলাইহি : সহীহুল বুখারী, হা. ১০৪৮; সহীহ মুসলিম, হা. ৯১১।

তুলনা করেছেন। ইবনুল কুয়িয়ম ওয়াজিব বলার কথাটিকে শক্তিশালী বলেছেন। আর শাইখ ইবনু উসাইমিন এ মতের স্বপক্ষে রয়েছেন। এটা এ কারণে যে, নাবী ﷺ এই সলাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি নিজেও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এই সলাত পড়তে যেতেন এবং এটাকে বান্দার জন্য সতর্কবার্তা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।^{৪১৪}

المسألة الثالثة: وقتها

ঢাক্কা মাসআলা: সলাতুল কুসূফের সময়

(সূর্য বা চন্দ্র) গ্রহণ শুরুর সময় থেকে শেষ পর্যন্ত। নাবী ﷺ বলেছেন:

إِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَفْصَلُوا حَتَّى يَنْجِلِي

“যখন তোমরা এর কিছু দেখতে পাবে তখন সলাতে দাঁড়িয়ে যাও যতক্ষণ না পরিষ্কার হয়।”^{৪১৫}

المسألة الرابعة: كيفيةها وما يقرأ فيها

চতুর্থ মাসআলা: পদ্ধতি এবং পঠিতব্য কৃত্তাআত

পদ্ধতি: এ সলাত দুই রাকআত। রাত হোক আর দিন হোক, প্রথম রাকআতে উচ্চেষ্ট্বের কৃত্তাআতে সূরা ফাতিহাসহ লম্বা একটি সূরা পাঠ করতে হবে। অতঃপর দীর্ঘ রুকু করতে হবে। তারপর ওঠে সামি আল্লাহু লিমান হামিদা বলতে হবে। এরপর সাজদা না করে বরং আবার সূরা ফাতিহা পড়ে লম্বা একটি সূরা পড়তে হবে, তবে প্রথম রাকআতের চেয়ে একটু কম। অতঃপর রুকু করে মাথা উঠিয়ে লম্বা দুটি সাজদা করতে হবে। দ্বিতীয় রাকআত প্রথম রাকআতের মতোই। কিন্তু প্রথমে যা করেছে তার চেয়ে একটু কম হবে। অতঃপর তাশাহদ পড়ে সালাম ফিরাবে। জাবির ﷺ বলেন,

كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ شَدِيدِ الْحَرَّ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَضْحَابِهِ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، حَتَّى جَعَلُوا يَخْرُونَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجَدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ تَحْوَى مِنْ ذَاكَ، فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ

^{৪১৪} মেখুন, ফাতহল বারী ২/৬১২, কিতাবুস সলাত- ইমাম ইবনুল কাইয়িম ১৫ পৃ.: আশ শারহল মুমতি' ৪/২৩৬-২৩৮।

^{৪১৫} সহীহ মুসলিম, হ্য. ৯১৫।

“আল্লাহর রসূল ﷺ এর যুগে প্রচণ্ড গরমের দিন সূর্য গ্রহণ শুরু হলো। তখন তিনি সাহাবীদের নিয়ে সলাত আদায় করার সময় দীর্ঘ কিয়াম করলেন। ফলে তারা লুটিয়ে পড়তে লাগলেন। অতঃপর দীর্ঘক্ষণ রুকু করলেন এবং অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর মাথা উঠিয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন। অতঃপর আবার দীর্ঘক্ষণ রুকু করে দুই সাজদাহ করলেন। অতঃপর দাঁড়ালেন এবং আবার এরূপ করলেন। ফলে চারটি রুকু এবং চারটি সাজদাহ হলো।”^{৪১৬}

সলাতুল কুসূফের পর ইমাম মানুষদেরকে উপদেশ দিবে, তাদেরকে সতর্ক করবে দুনিয়ার মোহ থেকে। তাদেরকে বেশি বেশি দুআ ও ইত্তিগফার পাঠ করার নির্দেশ দিবে। নাবী ﷺ মানুষদের উদ্দেশ্যে বজ্রব্য দেওয়ার সময় বলছেন,

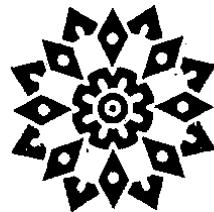
إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ أَيْتَانٍ مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَخْسِفَانِ بِرُوتَ أَحَدٍ وَلَا يُبَيِّنُونِ، إِنَّا رَأَيْنَاهُمْ ذَلِكَ، فَادْعُوا اللَّهَ، وَكَبِرُوا
وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا»

“নিশ্চয় চন্দ্র ও সূর্য এ দুটি আল্লাহর নিদর্শনের অন্যতম দুটি নিদর্শন। কারো মৃত্যু অথবা জন্মের কারণে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। সুতরাং তোমরা তা দেখলে আল্লাহর নিকট দুআ করবে, তাকবীর পাঠ করবে, সলাত আদায় করবে ও দান-সাদাক্তা করবে।”^{৪১৭}

পরিষ্কার হওয়ার আগে সলাত শেষ হলে পুনরায় পড়বে না বরং আল্লাহর যিকর করবে। বেশি বেশি দুআ করবে। নাবী ﷺ বলেছেন: তোমরা সলাত পড়বে এবং দুআ করবে যতক্ষণ না তা প্রকাশিত হয়। এ হাদীস প্রমাণ করে যে, পরিষ্কার হওয়ার আগে সলাত শেষ হয়ে গেলে দুআয় ব্যস্ত থাকবে। আর সলাত অবস্থায় পরিপূর্ণ পরিষ্কার হলে সলাত বিছ্ন না করে বরং হালকা করবে।

^{৪১৬} সহীহ মুসলিম, ঘ. ১০৪।

^{৪১৭} সহীহ বুখারী, ঘ. ১০৪৪।



الباب الخامس عشر: في صلاة الجنائز وأحكام الجنائز

পঞ্চদশ অনুচ্ছেদ: জানায়ার মলাত ও মৃতব্যক্তির বিধিবিধান

এতে কিছু মাসআলা রয়েছে:

জনাইয়ের বাবে জানায়ের পদ্ধতি: একবচনে **جناز** জানাযাহ। জীমে যবর ও যের দিয়ে পড়লে উভয়ের অর্থ একই হবে। আরও বলা হয়েছে, জীমে যাবর দিয়ে পড়লে তা দ্বারা মৃত ব্যক্তিটি উদ্দেশ্য। আর যের দিয়ে পড়লে খাটের নাম (অর্থাত কফিন)।

মানুষের উচিত এই দুনিয়ায় থাকাবস্থায় মরণের কথা স্মরণ করা। এর জন্য সৎ আমলের মাধ্যমে এবং আধিরাতের পাথের অর্জনের মাধ্যমে প্রস্তুতি গ্রহণ করা, পাপ কাজ থেকে তাওবা করা ও অন্যায়-অত্যাচার থেকে বের হয়ে আসার মাধ্যমে প্রস্তুতি নেওয়া।

অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া এবং তাকে তাওবা ও ওসিয়তের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া সুন্নাত। পাশাপাশি 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' এর তালকীন দেওয়া এবং তাকে কিবলামুখী করানো সুন্নাত। মৃত্যুবরণ করলে তার চোখ বন্ধ করে দেওয়া এবং প্রস্তুত করে দ্রুত দাফন করা সুন্নাহ।

المَسَأَةُ الْأُولَى: حِكْمَةُ غَسْلِ الْمَيْتِ وَكَيْفِيَّتُهُ

প্রথম মাসআলা: মৃতব্যক্তিকে গোসল করানোর হৰুম ও পদ্ধতি

১. **হৰুম:** মৃতব্যক্তিকে গোসল করানো ওয়াজিব। নাবী ﷺ এ ব্যাপারে আদেশ করেছেন। যেমন ইহরাম বাঁধা অবস্থায় এক ব্যক্তির ঘাড় মটকে যাওয়ায় সে মারা গেলে তিনি ﷺ বললেন:

أغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِنَرٍ

“তাকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল করাও।”^{৪১৮}

^{৪১৮} মুশাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, ঘ. ১২৬৫; সহীহ মুসলিম, ঘ. ১২০৬

তিনি তাঁর মেয়ে যায়নাব আমর্দা এর ব্যাপারে বলেছিলেন,

اغسلنها ثلاثة أو خمساً، أو سبعة

“ତାଙ୍କେ ତିନ ବାର, ପାଁଚ ବାର ଅଥବା ସାତ ବାର ଗୋସଲ କରାଓ ।”^{୪୧} ସକଳେ ଏକମତ ଯେ, ଗୋସଲ କରାନୋ ଫରୁଯେ କେଫାଯାହ ।

২. গোসলের পদ্ধতি: মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর জন্য একজন সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ ও গোসল করানোর হুকুম সম্পর্কে জানে এমন লোক নির্বাচন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে গোসল করানোর জন্য অসীয়ত কারী ব্যক্তি প্রাধান্য পাবে। এরপর ঘারা নিকটবর্তী তারা। যেমন বাবা, দাদা ও ছেলে, যদি গোসল করানোর হুকুম-আহকাম জানে। অন্যথায় যে এ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে সে প্রাধান্য পাবে। পুরুষ পুরুষকে গোসল করাবে। মহিলা করাবে মহিলাকে। স্বামী-স্ত্রী একজন আরেকজনকে গোসল করাতে পারবে। স্বামী তার স্ত্রীকে গোসল করাবে। অপরদিকে স্ত্রী তার স্বামীকে গোসল করাবে। স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকেই সাত বছরের নিচে তাদের কোনো সন্তান থাকলে তাকে গোসল করাতে পারবে।

କୋନୋ ମୁସଲିମ ପୁରୁଷ ବା ମହିଳାର ଜନ୍ୟ କୋନୋ କାଫେରକେ ଗୋସଲ କରାନୋ, ତାର ଲାଶ ବହନ କରା,
ତାକେ କାଫନ ଦେଓଯା ଏବଂ ତାର ଜାନାଧାର ସଲାତ ପଡ଼ା ଜାମ୍ଯେ ନୟ । ଯଦିଓ ସେ ତାର ନିକଟାତ୍ମୀୟ
ହୟ । ଯେମନ- ବାବା ମା । ମୃତବ୍ୟକ୍ତିକେ ଯେ ପାନି ଦିଯେ ଗୋସଲ କରାନୋ ହବେ ସେଟା ପବିତ୍ର ଓ ବୈଧ
ହତେ ହବେ । କୋନୋ ପର୍ଦ୍ଦାବୃତ ଥାନେ ଗୋସଲ କରାତେ ହବେ । ମୃତବ୍ୟକ୍ତିକେ ଗୋସଲ କରାନୋର ସାଥେ
ଯାର ସମ୍ପର୍କ ନେଇ, ସେଥାନେ ତାର ଉପସ୍ଥିତ ଥାକା ଉଚିତ ନୟ ।

গোসলের বর্ণনা: মৃতব্যক্তিকে গোসলের খাটের উপর রেখে তার সতর ঢেকে দিতে হবে। অতঃপর পরনের কাপড় খুলে পর্দাবৃত করতে হবে। এরপর সে তাকে মানুষের চোখের আড়ালে ভিন্ন কক্ষে অথবা অন্য কোথাও নিয়ে যাবে। এরপর যে মৃতব্যক্তিকে গোসল করাবে, সে তার মাথাটা উঁচু করে নিজের কাছাকাছি করে নিবে। অতঃপর তার হাত দিয়ে পেটের উপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চাপ দিকে। প্রশ্নাব-পায়খানার রাস্তা পরিষ্কার করে মৃতব্যক্তিকে মুক্ত করে নিবে। প্রশ্নাব-পায়খানার রাস্তায় যে নাপাকি থাকবে সেটা হাতে এক টুকরা কাপড় ভাঁজ করে নিয়ে ভালো করে ধোত করে নিবে। অতঃপর গোসল করানোর সময় বিসমিল্লাহ বলে সলাতের ন্যায় ওযু করাবে কুলি ও নাকে পানি দেওয়া ব্যতীত। মুখ এবং নাকের উপর মাসাহ করলেই যথেষ্ট হবে। অতঃপর বরই পাতা মিশ্রিত পানি, সাবান বা অন্য কিছু দিয়ে মাথা এবং দাঢ়ি ধোত করতে হবে। আগে ডান দিক ধুবে তারপর বাম দিক। এরপর অবশিষ্ট শরীর সম্পূর্ণ ধুবে। গোসল করানোর সময় হাতে এক টুকরা ত্যানা ভাঁজ করে নেওয়া মুস্তাহাব। একবার গোসল করানো

^{४२} गृहाधारकन आलाइदि: संशीलन वृथावी, श. १२५९; संशील मुसलिम, श. १०३।

ওয়াজিব, যদি একবার গোসল করালেই পরিষ্কার হয়ে যায়। আর তিন বার গোসল করানো মুস্তাহাব, যদিও পরিষ্কার হয়।

শেষ গোসলের সময় কর্পুর দেওয়া মুস্তাহাব। গোসল শেষে মুছে দিবে। নখ-চুল ইত্যাদি যেগুলো কাটা শরীয়ত সম্মত সেগুলো দূর করতে হবে। মেয়েদের চুল বেশী করে পিছন দিক থেকে ঝুলিয়ে দিতে হবে। পানি না পাওয়া গেলে বা শরীরের কোনো অংশ পুড়ার দরজন গোসল করানো স্তব না হলে মাটি দিয়ে তায়ামুম করাতে হবে। মৃতব্যক্তিকে গোসল দানকারী গোসল করানোর পর নিজেও গোসল করে নেওয়া মুস্তাহাব।

المسألة الثانية: من يتولى الغسل

দ্বিতীয় মাসআলা: কে গোসলের দায়িত্ব নিবে?

সবচেয়ে উত্তম হয় যদি মৃত্যুকে গোসল করানোর দায়িত্ব নির্ভরযোগ্য, আমানতদার ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের মধ্য থেকে যে গোসলের সুন্নাত সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত তিনি নেন। বিশেষ করে তার পরিবারের কেউ বা নিকটাত্তীয়দের মধ্যে কেউ। কারণ নাবী ﷺ-কে যাঁরা গোসল করানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তাঁরা তাঁর পরিবারভুক্ত ছিলেন। যেমন- আলী رضي الله عنه সহ অনেকেই।^{৪১০} তবে গোসল করানোর জন্য মানুষের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি হকদার তিনি হলেন, মৃত ব্যক্তি যাকে অসীয়ত করে যাবে। অতঃপর হকদার হবেন তার পিতা। তারপর তার দাদা। এরপর যারা তার আসাবা (যারা বংশের মধ্যে নিকবতী)। পরিশেষে তার আত্মীয়-স্বজন।

একজন পুরুষ অপর পুরুষকে এবং একজন মহিলা অপর মহিলাকে গোসল করানোর দায়িত্ব নেওয়া ওয়াজিব। তবে স্বামী-স্ত্রী এর ব্যতিক্রম; উভয়ের একজন অপরজনকে গোসল করাবে। আয়িশাহ رضي الله عنه এর হাদীস:

لَوْ كُنْتُ اسْتَفْبِلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا غَسَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرُ نِسَائِهِ

“যদি আমি গোসল করানোর বিষয়টি আগে জানতাম, যা আমি পরে জেনেছি তাহলে নাবী ﷺ-কে তাঁর সহধর্মীগণ ব্যতীত আর কেউ গোসল করাতেন না।”^{৪১১}

(لَوْ مِتْ قَبْلِ لَغْسَلْتِكِ، وَكَفْتَلِكِ)

^{৪১০} ইবনু মাজাহ, ঘ. ১৪৬৭। ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন। সহীহ ইবনু মাজাহ, ঘ. ১২০৭। আরও দেখুন- ইরওয়া ৬৯৯।

^{৪১১} দা, ঘ. ৩৬১৫; ইবনু মাজাহ, ঘ. ১৪৬৪। ইমাম আলবানী হাসান বলেছেন। দেখুন- ইরওয়া ৭০২।

“যদি তুমি আমার আগে মৃত্যুবরণ করো তবে আমিই তোমাকে গোসল করাবো এবং কাফন দিবো।”^{৪২২} আসমা বিনতে উমাইস, তিনি তাঁর স্বামী আবু বকর সিদ্দীক খানক কে গোসল করিয়েছেন।^{৪২৩}

যুদ্ধে শহীদ ব্যক্তিকে গোসল করানো যাবে না।

أَمْرٌ يُقْتَلُ أَحُدٌ أَنْ يَدْفَنَ فِي ثِيَابِهِ، وَلَمْ يُعَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ

‘নাবী ﷺ উল্লেখের শহীদদের তাদের পরিহিত কাপড়েই দাফন করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের গোসল করানো হয়নি। তাদের জানায়ার সলাতও পড়া হয়নি।’^{৪২৪}

অনুকূলপ্রভাবে তাদের কাফন দেননি। তাদের জানায়ার সলাত পড়েননি, বরং তাদের ঐ কাপড়েই দাফন করা হয়েছে। যেমনটি আমরা পূর্ববর্তী হাদীসে জেনেছি।

আস-সিকুতু (السِّكْطُ): এমন শিশু যে তার মাত্রগর্ভ থেকে শারীরিক পূর্ণ হওয়ার আগেই পড়ে যায়। সেক্ষেত্রে পুরুষ হোক বা নারী হোক, যদি চার মাস পর্যন্ত পোঁছে তবে গোসল করাবে, কাফন দিবে ও সলাতও পড়বে। কারণ চার মাস পরে সে পূর্ণ একটা মানুষে পরিণত হয়।

سَلَامًا اللَّهُ تَكْفِيهِ وَكَيْفِيَتِهِ حَكْمٌ

তৃতীয় মাসআলা: কাফন দেওয়ার হুকুম ও পদ্ধতি

মৃত ব্যক্তিকে কাফন দেওয়া ওয়াজিব। নাবী ﷺ ঐ মুহরিম ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন, যিনি সওয়ারী থেকে পড়ে যাওয়ার দরুন তার ঘাড় মটকে গিয়েছিল;

وَكَفْنُوهُ فِي تَوْبِينِ

“তাকে দুই কাপড়ে কাফন দাও।”^{৪২৫}

পুরো শরীর ঢেকে দেওয়া ওয়াজিব। যদি একটা ছেটো কাপড় ছাড়া আর কোনো কাপড় না পাওয়া যায় যা পুরো শরীর ঢাকার জন্য যথেষ্ট, তাহলে তার মাথাটা ঢেকে দিবে। আর পায়ের উপর কিছু ইয়থিরের ছাল বিছিয়ে দিবে। কারণ মুসআব ইবনু উমাইর খানক এর কাফন দেওয়ার ঘটনায় খুবাব খানক বলেছেন,

^{৪২২} ইবনু মাজাহ, হ্য. ১৪৬৫; শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, ইরওয়াউল গালীল ৩/১৬০।

^{৪২৩} ইমাম মালেক তার মুয়াত্তাতে বর্ণনা করেছেন, ১/২২৩।

^{৪২৪} সহীহ বুখারী, হ্য. ১৩৪৩।

^{৪২৫} মুতাফাকুন আলাইহি: সহীহ বুখারী, হ্য. ১২৬৬; সহীহ মুসলিম, হ্য. ১২০৬।

فَأَمْرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ، وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ

‘নাবী ﷺ আমাদেরকে তার মাথাটা ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার পায়ের উপর ইফখিরের ছাল বিছিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।’^{৪২৬}

পুরুষ মুহরীম ব্যক্তির মাথা ঢাকা যাবে না। নাবী ﷺ বলেছেন: “তোমরা তার মাথা ঢেকো না।”^{৪২৭} মৃত ব্যক্তিকে এমন কাপড় দ্বারা ঢেকে দিবে যাতে তার চামড়া দেখা না যায়। আর তাকে তার পরিহিত বস্ত্র দ্বারা ঢেকে দেওয়া ওয়াজিব; কারণ, মৃত ব্যক্তি এবং তার উত্তরাধিকারীদের উপর কোনো প্রকার অন্যায় আচরণ করা যাবে না। সুন্নাত হলো সুতার সাদা তিন লিফাফে (কাপড়ে) পুরুষকে কাফন দেওয়া। কাপড়টি বিছিয়ে তার উপর মৃতকে চিঁ করে শুইয়ে দিবে। অতঃপর বাম পাশের অংশ উপর দিয়ে ডান পাশে মুড়িয়ে দিবে। অতঃপর ডান পাশের অংশ বামে দিবে। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাপড় দিবে। অতঃপর মাথার কাছে অতিরিক্ত অংশ গিঁঠ দিবে। যদি অতিরিক্ত অংশ আরও বেশি থাকে তবে পায়ের কাছেও অনুরূপভাবে গিঁঠ দিবে। এটাই কাফন দেওয়ার সবচেয়ে সঠিক নিয়ম। আয়িশাহ رض বলেন,

فَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَلَّتَةٍ أَنْوَابٍ بِيَضِّ سُحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِنَاءٌ، أُدْرَجَ فِيهَا إِذْرَاجًا
রাসুল ﷺ কে কাফন দেওয়া হয়েছিল তিনটি সাদা সূতী ইয়মেনী কাপড়ে। এতে কোনো কুমীস বা পাগড়ি ছিল না। এতে তাঁকে প্রবেশ করানো হয়েছিল বা রাখা হয়েছিল।^{৪২৮}

এ ব্যাপারে নাবী ﷺ বলেছেন,

الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفُّوا فِيهَا مَوْتَائِكُمْ،

“তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করো এবং এটা দিয়ে তোমাদের মৃতদের কাফন দাও। কারণ এটাই তোমাদের সর্বোত্তম পোশাক।”^{৪২৯} নারীদের পাঁচটি সূতী কাপড়; ইয়ার, খিমার, কুমীস ও দুইটি লিফাফা। আর শিশুকে এক কাপড়ে। তিন কাপড়ে দেওয়া বৈধ। ছোটো মেয়ে হলে একটা কুমীস ও দুইটি লিফাফা।

^{৪২৬} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ১২৭৬; সহীহ মুসলিম, হা. ৯৪০।

^{৪২৭} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ১২৬৫; সহীহ মুসলিম, হা. ১২০৬-৯৩।

^{৪২৮} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ১২৬৪; সহীহ মুসলিম, হা. ৯৪১; শেষ শব্দ ইমাম আহমাদ (রাহিঃ) এর ৬/১১৮।

^{৪২৯} সুনান আবু দাউদ, হা. ৩৮৭৮; তিরমিয়ী, হা. ১০০৫; ইবনু মাজাহ, হা. ১৪৭২; শব্দ ইমাম তিরমিয়ীর। ইমাম তিরমিয়ী যাসান বলেছেন।

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيْتِ، حُكْمُهَا وَدَلِيلُ ذَلِكَ

চতুর্থ মাসআলা: মৃত ব্যক্তির জানায়ার সলাত

হকুম ও দলীল: মৃত ব্যক্তির জানায়ার সলাত ফরযে কেফায়া। কিছু লোক তা আদায় করলে অন্যান্যদের থেকে পাপের বোৰা নেমে যাবে। এর দলীল হলো: এক ব্যক্তি ঝণ রেখে মারা গেলে তার ব্যাপারে নাবী ﷺ এর বাণী: صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ

“তোমরা তোমাদের সাথীর জানায়ার সলাত আদায় করো।”^{৪৩০}

বাদশা নাজাশীর মৃত্যুর দিন নাবী ﷺ বললেন,

إِنَّ أَئَمَّا لَكُمْ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلُوا عَلَيْهِ

“নিচয় তোমাদের ভাই মারা গিয়েছে। সুতরাং তোমরা দাঁড়িয়ে জানায়ার সলাত পড়ো।”^{৪৩১}

المَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: شُرُوطُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيْتِ وَأَرْكَانُهَا وَسُنُنُهَا

পঞ্চম মাসআলা: জানায়ার সলাতের শর্ত, রুক্ন ও সুন্নাতসমূহ

১. শর্ত: শর্তসমূহ: নিয়ত করা, শরীয়তের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি (বিবেকসম্পন্ন প্রাণবয়স্ক ব্যক্তি) হওয়া, কিবলামুখী হওয়া, সতর ঢাকা ও অপবিত্রতা দূর করা। কারণ এটা সলাতেরই অন্তর্ভুক্ত। মৃতকে মুসল্লার সামনে উপস্থিত রাখা যদি (মৃত) নিজ অঙ্গলের হয়, মুসুল্লি এবং মৃত উভয়েই মুসলিম হওয়া ও পবিত্রতা অর্জন করা; যদিও ওয়রবশত মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতে হয়।

২. রুক্ন: রুক্নগুলো হলো: সক্ষম ব্যক্তির দাঁড়িয়ে সলাত পড়া ফরয। কারণ এটা এমন একটা সলাত যেখানে ফরয সলাতের ন্যায দাঁড়িয়ে আদায় করা আবশ্যিক। চার তাকবীর দেওয়া, (নাবী ﷺ বাদশা নাজাশীর জন্য চার তাকবীর দিয়েছেন), সুরা ফাতিহাহ পাঠ করা। আম হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, لَمْ يَفْرُأْ بَأْمَنِ الْقُرْآنِ “যে ব্যক্তি সলাতে সুরা ফাতিহা পড়ে না, তার সলাত হ্যন না।”^{৪৩২} নাবী ﷺ এর উপর দুরুদ পাঠ করা এবং মৃতব্যক্তির জন্য দুআ। নাবী ﷺ বলেছেন:

^{৪৩০} সহীহ মুসলিম, হ্য. ১৬১৯।

^{৪৩১} সহীহ মুসলিম, হ্য. ৯৫২-৬৪।

^{৪৩২} সহীহ মুসলিম, হ্য. ৩৯৪।

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمُيتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ
জন্য দুআ করবে।^{৪৩৩}

সালাম ফিরানে। আম হাদীস: “সালামের মাধ্যমেই সলাত শেষ হয়।” ও সবশেষে রুকুনগুলোর মাঝে- ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। এ ক্ষেত্রে একটা রুকন অন্যটির আগে আনা যাবে না।

৩. সুন্নাতসমূহ: প্রত্যেক তাকবীরের সাথে রফটল ইয়াদাট্ল করা, ক্রিরাআতের আগে ‘আউযুবিল্লাহ’ বলা, নিজের এবং মুসলমানদের জন্য দুআ করা এবং অনুচ্ছবে ক্রিরাআত পাঠ করা।

المسألة السادسة: وقت الصلاة على الميت وفضلهما وكيفيتها

ষষ্ঠى ماساتালা: জানায়ার সলাতের সময়, ফর্মিলত ও পদ্ধতি

১. সময়: যদি সে উপস্থিত থাকে তবে জানায়ার সলাতের সময় তাকে গোসল করানো, কাফল দেওয়া ও পূর্ণ প্রস্তুত করানোর পর থেকে শুরু হয়। আর অনুপস্থিত থাকলে মৃত্যুর সংবাদ পেঁচার পর।

২. ফর্মিলত: নাবী ﷺ বলেছেন:

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّىٰ يُصَلِّي عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّىٰ تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطًا، قِيلَ: وَمَا
الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ»

“যে ব্যক্তি জানায়ার সলাতে উপস্থিত হয়ে সলাত আদায় করে, তার জন্য এক কিরাত নেকি। আর যে ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে দাফন করানো পর্যন্ত থাকবে তার জন্য দুই কিরাত নেকি। বলা হলো, দুই কিরাত কতটুকু পরিমাণ? তিনি বললেন, বড়ো দুইটি পাহাড় সমপরিমাণ।”^{৪৩৪}

৩. পদ্ধতি: পুরুষ হলে ইমাম একাকী তার মাথার নিকটে দাঁড়াবে এবং মহিলা হলে মাঝ বরাবর দাঁড়াবে। এটা নাবী ﷺ এর ফিলী হাদীস থেকে প্রমাণিত, যা আনাস رض বর্ণনা করেছেন।^{৪৩৫} সলাতের জন্য তাকবীর দিবে। এরপর আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ বলে অনুচ্ছবে সুরা ফাতিহাহ পাঠ করবে, যদিও এটি রাতে হয়। অতঃপর তাকবীর দিয়ে তাশাহুদের দরুণ পাঠ করবে। তারপর তাকবীর দিয়ে মৃতব্যক্তির জন্য নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত দুআ করবে। তিনি বলেন,

^{৪৩৩} দা, হ্য. ৩১১৯। হাসান, দেখুন- ইরওয়াউল গালীল ৩/১৭৯।

^{৪৩৪} মুস্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হ্য. ১৩২৫; সহীহ মুসলিম, হ্য. ৯৪৫।

^{৪৩৫} আবু দাউদ, হ্য. ৩১৯৪, তিরমিয়ী, হ্য. ১০৪৫; ইবনু মাজাহ, হ্য. ১৪৯৪। ইমাম তিরমিয়ী বলেন, হাদীসটি হাসান। শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহত তিরমিয়ী ৮২৬।

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحِينَا وَمَيْتَنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأَثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَخْيَيْتَهُ مِنَ فَاحْمِيهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَ فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ.

“হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত-মৃত, উপস্থিত-অনুপস্থিত, ছেটো-বড়ো, নারী-পুরুষ সকলকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে আপনি যাকে জীবিত রাখবেন তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখেন এবং আমাদের মধ্যে যাকে মৃত্যু দিবেন তাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দিন।”^{৪৩৬}

اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لَهُ وَازْحَمْهُ وَاعْفُهُ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسْعَ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهُ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ التَّوْبَ الْأَبِيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارِهِ، وَأَهْلَهُ خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَذْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ - أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

“হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দাও ও তার প্রতি দয়া করো। তাকে নিরাপদে রাখো ও তার ক্রটি মার্জনা করো। তাকে মর্যাদা দান করো ও তার প্রবেশ পথকে প্রশস্ত করে দাও। তাকে পানি, বরফ ও বৃষ্টি দ্বারা ধূমে দাও এবং পাপ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করো যেমনভাবে সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার হয়। তার ঘরের বিনিময়ে উত্তম ঘর দান করো, তার পরিবার থেকে উত্তম পরিবার দান করো, তার স্ত্রীর তুলনায় উত্তম স্ত্রী দান করো। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং কবরের আয়াব থেকে বাঁচাও অথবা জাহানামের আগুন থেকে বাঁচাও।”^{৪৩৭}

মৃতব্যক্তি ছেটো হলে বলবে: **اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ سَلَفًا لِوَالْدَنِيَّةِ، وَفَرَطًا وَأَجْرًا:**

“হে আল্লাহ! তাকে তার পিতামাতার জন্য পূর্বসূরী, কিয়ামতের ময়দানে অগ্রপথিক ও সওয়াবের মাধ্যম করো।”^{৪৩৮}

অতঃপর আবার তাকবীর দিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে। তবে যে দুআ তার কাছে সহজ মনে হবে সেটা পড়তে পারলে ভালো। যেমন-

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتَنْنَا بَعْدَهُ

“হে আল্লাহ! এর সওয়াব থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না এবং এর পর আমাদেরকে ফিতনায় ফেলবেন না।”^{৪৩৯}

^{৪৩৬} সুনান আবু দাউদ, হ্য. ৩২০১; তিরমিয়ী, হ্য. ১০২৪; ইমাম হাকিম তা মুসতাদরাকে ১/৩৫৮ বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিয়ী বলেন, হ্যাসান সহীহ। ইমাম হাকিম বলেন, শাইখাইনের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

^{৪৩৭} সহীহ মুসলিম, হ্য. ফুআ. ১৬৩।

^{৪৩৮} মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হ্য. ৬৫৮।

সবশেষে ডান দিকে একবার সালাম ফিরাবে। তবে দুইটি সালাম ফিরালে তাতে কোনো সমস্যা নেই। কারো সলাতের কিছু অংশ ছুটে গেলে, সে সলাত শুরু করে ইমামের অনুসরণ করবে। এক্ষেত্রে ইমাম যখন সালাম ফিরাবে তখন তার যে অংশ ছুটে যাবে, তা আদায় করে নিবে। আর যদি দাফনের আগে সলাত শেষ হয়ে যায়, তবে তার জন্য করণীয় হলো কুবরের সামনে সলাত আদায় করা। নাবী ﷺ এরূপ করেছেন যা বর্ণিত হয়েছে ঐ মহিলার ঘটনায় যে মসজিদ বাড়ু দিত।^{৪৪০} মৃত্যুর সংবাদ জানলে-যদিও তা একমাস বা তার বেশি সময় হয়- গায়েবানা জানায় আদায় করবে। গর্ভচূত সন্তানের বয়স যদি চার মাস বা তার বেশি হয়, তাহলে তার জানায় আদায় করবে। আর যদি এর কম হয় তবে তার জানায় পড়া লাগবে না।

المسألة السابعة: حمل الجنازة والسير بها

সপ্তম মাসআলা: মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে চলা

মৃতদেহের পিছু পিছু কবরের দিকে গমন করা সুন্নাহ। নাবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ شَهِدَ جُنَاحَةً حَتَّىٰ يُصْلَى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّىٰ تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ»، قَيْلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ
قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ

“যে ব্যক্তি জানায়ার সলাতে উপস্থিত হয়ে সলাত আদায় করে, তার জন্য এক কিরাত নেকি। আর যে ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে দাফন করানো পর্যন্ত থাকবে তার জন্য দুই কিরাত নেকি। বলা হলো, দুই কিরাত কতটুকু পরিমাণ? তিনি বললেন, বড়ো দুইটি পাহাড় সমপরিমাণ।”^{৪৪১}

তাই কোনো মুসলিম যখন অপর মুসলিমের মৃত্যু সংবাদ শুনবে, তখন তার উচিত মৃতদেহ কাঁধে বহন করার উদ্দেশ্যে বের হওয়া এবং তার জানায় আদায় করে দাফন করা। নাবী ﷺ বলেছেন:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ كُلُّهُ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَاحِ... .

“একজন মুসলিম অপর মুসলিমের উপর পাঁচটি হক রয়েছে: সালাম দিলে তার উত্তর দেওয়া, অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া এবং জানায় আংশ গ্রহণ করা...।”^{৪৪২}

^{৪৪০} ইমাম মালিক তার মুহারায় ১/২২৮ বর্ণনা করেন, যা. ১৭; মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, যা. ৩/৪৮৮, যা. ৬৪২৫; ইবনু হিবান যেভাবে আল-ইহসান ৭/৩৪৭৬, যা. ৩০৭৩; এবং তার মুহারিক বলেন, ইমাম মুসলিমের শর্তে সহীহ।

^{৪৪১} মুক্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, যা. ৪৫৮; সহীহ মুসলিম, যা. ৯৫৬।

^{৪৪২} সহীহ মুসলিম ৯৪৫/৫২।

^{৪৪৩} সহীহল বুখারী, যা. ১২৪০।

এই বিষয়টি তখনই জোরদার হবে যখন তার জানায় কেউ উপস্থিত হবে না। আর মৃতদেহটা কোনো গাড়ি কিংবা কোনো বাহনে নিয়ে গেলে কোনো অসুবিধা নেই। বিশেষ করে যদি কবরস্থান দূরে হয়। লাশ অনুসরণকারীর জন্য উচিত তা বহন করার কাজে শরীক হওয়া।

মৃতব্যক্তিকে বিশেষ কোনো কবরস্থানে দাফন করা শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত। কারণ নাবী^{৪৪৩} মৃতব্যক্তিকে বাকী^{৪৪৪} নামক কবরস্থানে দাফন করতেন। এ ব্যাপারে হাদীসগুলো মুতাওয়াতির সূত্রে প্রমাণিত। কোনো একজন সাহাবী থেকেও এ মর্মে বর্ণিত হয়নি যে, তিনি কবরস্থান বৈ অন্য কোনো স্থানে দাফন করেছেন।

মৃতব্যক্তিকে দ্রুত গোসল করানো, কাফন দেওয়া, জানায়ার সলাত পড়া ও দাফন করা সুন্নাহ। নাবী^{৪৪৫} বলেছেন:

إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَمْحِسُوهُ، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ

“তোমাদের কেউ মৃত্যুবরণ করলে তাকে আটকে রেখো না, বরং তাকে দ্রুত করে পাঠাও।”^{৪৪৬}

কিছু লোক দেরিতে কাফন-দাফন করে এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায় অথবা সপ্তাহের কোনো একদিন নির্বাচন করে দাফন করা হয়। এসব সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ। অনুরূপ লাশ নিয়ে চলার সময় দ্রুত চলা সুন্নাত। নাবী^{৪৪৭} বলেছেন,

أَسْرِعُوا بِالْجَنَائزَةِ فَإِنَّكُمْ صَاحِحُهُ فَحَيْرٌ تَقْدُمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُنْ يَسِّرَى ذَلِكَ فَشُرُّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

“লাশ নিয়ে দ্রুত অগ্রসর হও। যদি সে সৎ হয়ে থাকে তাহলে ভালো। তোমরা তাকে সেদিকেই পাঠিয়ে দাও। আর যদি এর বিপরীত হয় তাহলে খারাপ; তোমরা তোমাদের ঘাড় থেকে তাকে দ্রুত নামিয়ে দিলে।”^{৪৪৮}

থুব বেশি তাড়াছড়া না করে বরং দ্রুততায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা কিছু আলেমের নিকট পছন্দনীয়। লাশ বহনকারীদের উচিত ধীরস্তিরভাবে গাত্রীর বজায় রেখে চলা। এ সময় উচ্চেঁশ্বরে আওয়াজ না করা। সেটা কুরআন তিলাওয়াত বা যে-কোনো বিষয়ই হোক। নাবী^{৪৪৯} থেকে এমন কোনো কিছুই প্রমাণিত নয়। যে এরপ করবে সে সুন্নাতের বিপরীত করল। মহিলাদের জন্য লাশের সাথে বের হওয়া জায়ে নয়। উম্মে আত্তিয়াহ^{৪৫০} এর হাদীস:

تُهْبِسَنَا عَنِ ابْتِاعِ الْجَنَائزِ

“লাশের অনুসরণ করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।”^{৪৫১}

^{৪৪৩} ফুরানী ১২/৩৪০, হা. ১৩৬১৩; ইবনে হাজার হাসান বলেছেন। ফাতহল বারী ৩/২১৯।

^{৪৪৪} মুওফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ১৩৫১; সহীহ মুসলিম, হা. ৯৪৪; শব্দ ইমাম বুখারী।

^{৪৪৫} মুওফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ১২৭৮; সহীহ মুসলিম, হা. ৯৩৮; শব্দ ইমাম মুসলিম।

লাশ বহন করা এবং সেটার অনুসরণ করা শুধু পুরুষদের জন্যই নির্দিষ্ট। অনুসরণকারী ব্যক্তির জন্য লাশ মাটিতে না রাখা পর্যন্ত বসা মাকরহ। কেননা নাবী ﷺ লাশ না রাখা পর্যন্ত বসতে নিষেধ করেছেন।^{৪৪৬}

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: دُفْنُ الْمَيْتِ وَصِفَةُ الْقَبْرِ وَمَا يَسْنُ فِيهِ

অষ্টম মাসআলা: মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা, কবরের বর্ণনা এবং এ সংক্রান্ত সুন্নাহ সমূহ

কবর গভীর করা, প্রশস্ত করা ও তাতে লাহদ করে দেওয়া সুন্নাহ। লাহদ হলো- কবরের নিচে পাশের দিকে কিবলামুখে একটি গর্ত খনন করা। যদি লাহদ করা অসম্ভাব হয়, তবে শাকু করাতে কোনো সমস্যা নেই। শাকু হলো- মৃতব্যক্তির জন্য কবরের মাঝে গর্ত খনন করা। তবে লাহদই উত্তম। নাবী ﷺ বলেছেন: *اللَّهُخُدُلَنَا وَالشَّقْلُغَيْرِنَا*

“লাহদ হলো আমাদের জন্য অর্থাৎ মুসলিমদের জন্য। আর শাকু হলো অন্যদের জন্য।”^{৪৪৭}

মৃতদেহ লাহদের মধ্যে কিবলামুখী করে ডান কাতে রাখবে। লাহদের খোলা অংশটা ইট এবং মাটি দিয়ে বন্ধ করে দিবে। অতঃপর তার উপর মাটির স্তপ করে দিবে। কবরকে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে এক বিঘত বা উটের কুঁজ পরিমাণ উচ্চ করতে হবে। এটা প্রমাণিত নাবী ﷺ এবং দুই সাহাবী *رض* এর কবরের বর্ণনায়।^{৪৪৮} এটা এ কারণে যে, যেন মনে হয় এটা একটা কবর। সুতরাং এর অবমাননা করা যাবে না। এর পরিচিতি বুঝার জন্য এর উপর পাথর বা অন্য কিছু স্থাপন করাতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে কবরের উপর ভবন নির্মাণ করা, প্লাস্টার করা ও এর উপর বসা হারাম। তেমনি এর উপর লেখালেখি করাও মাকরহ। তবে কবরকে চিহ্নিত করার জন্য প্রয়োজন অনুপাতে লেখা যাবে। জাবির *رض* বলেন,

نَحْنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْعَصَ "الْقَبْرُ، وَأَنْ يُفْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبَيَّنَ عَلَيْهِ

“আল্লাহর রসূল *ﷺ* কবর প্লাস্টার করতে, এর উপর বসতে ও এর উপর ভবন নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।”^{৪৪৯} তিরমিয়ী *رض* বৃক্ষ করেছেন, এর উপর লেখা যাবে না।

^{৪৪৬} মুগ্ধফাকুন আলাইহি: সহীহ বুখারী, হা. ১৩১০; সহীহ মুসলিম, হা. ৯৫৯।

^{৪৪৭} তিরমিয়ী, হা. ১০৫৬ এবং তিনি হাসান বলেছেন। ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহত তিরমিয়ী, হা. ৮৩৫।

^{৪৪৮} দেখুন, আশ-শারহল মুমতি ৪/৪৫৮।

^{৪৪৯} সিমেন্ট-বালু, সুড়কি দিয়ে বাড়ি নির্মানের মতো প্লাস্টার করা।

^{৪৫০} সহীহ মুসলিম ৯৭০/৯৪।

এটা শিরক ও কবরমুখী (কবরের প্রতি আকৃষ্ট) হওয়ার অন্যতম একটি মাধ্যম। এর মাধ্যমে অজ্ঞরা ঘোঁকায় পড়ে যাবে এবং শিরকে লিঙ্গ হবে। কবরে লাইটিং করাও হারাম। কারণ এতে কাফেরদের সাথে সাদৃশ্য হয় ও সম্পদ নষ্ট হয়। এর উপরে মসজিদ নির্মাণ করা, এর কাছে বা নিকটে সলাত আদায় করাও হারাম। এ ব্যাপারে নাবী ﷺ বলেছেন,

لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، إِنَّهُمْ قَبُورٌ أَنْسَائِهِمْ مَسَاجِدٌ

“আল্লাহহ তা'আলা ইহুদি-খ্রীস্টানদের প্রতি লানাত বর্ষণ করুন। কারণ তারা তাদের নাবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছিল।”^{৪৫১}

কবরের উপর হাঁটা, জুতা দিয়ে পদদলিত করা, কবরের উপর বসা বা কোনোভাবে কবরকে অবজ্ঞা করা হারাম। আবু হুরায়রা আল্লাহর আমন্ত্রিত উক্তি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

لَاَنْ يَجِلِّسَ اَحَدُكُمْ عَلَى جَمَرَةٍ فَتُخْرِقَ شَبَابُهُ، حَذِيرَةً لَهُ مِنْ اَنْ يَجِلِّسَ عَلَى قَبْرٍ

“কবরের উপর বসার চেয়ে তোমাদের কেউ জলন্ত অঙ্গারের উপর বসার দরুন তার কাপড় পুড়ে চামড়া পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, এটাই তার জন্য উত্তম।”^{৪৫২}

তিনি ﷺ কবরকে পদদলিত করতে নিষেধ করেছেন।^{৪৫৩}

দাফন শেষে মৃতব্যক্তির জন্য দুআ করা মুস্তাহাব। নাবী ﷺ এরপ করেছেন। মৃতব্যক্তির দাফন শেষ হলে তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে বলতেন,

اَسْتَغْفِرُو لِأَخْيَكُمْ، وَسَلُوا اللَّهَ بِالشَّيْءِ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

“তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা চাও। তার সুদৃঢ়তা কামনা করো। কারণ তাকে জিজ্ঞেস করা হবে।”^{৪৫৪}

তবে কবরের কাছে সূরা ফাতিহা বা কুরআনের কিছু অংশ তিলাওয়াত করা ঘৃণিত বিদআত। কারণ নাবী ﷺ এটা করেননি, সাহাবীরাও আল্লাহর আমন্ত্রিত উক্তি করেননি। নাবী ﷺ বলেছেন:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল যে ব্যাপারে আমাদের কোনো নির্দেশনা নেই তা অত্যাখ্যাত।”^{৪৫৫}

^{৪৫১} সংক্ষিপ্ত বুগাবী, ঘা. ৪৩৫।

^{৪৫২} সংক্ষিপ্ত মুসলিম ১৭১/১৬

^{৪৫৩} ডিসেম্বর, ঘা. ১৬৪ এবং তিনি হসান সহীহ বলেছেন।

^{৪৫৪} আবু দাউদ ৩২২।

^{৪৫৫} বুগাবী, মুসলিম ১৭১৮/১৮।

المسألة التاسعة: التعزية، حكمها، وكيفيتها

নবম মাসআলা: শোক প্রকাশ করার বিধান ও পদ্ধতি

تسلية المصاب وتقوته على تحمل مصيبة:

“বিপদে শোক প্রকাশ করা ও বিপদ সহ্য করে স্থির থাকা।”

বিপদে ধৈর্য ধারণ করে সওয়াবের আশা করার ফয়লত সংক্রান্ত বিভিন্ন দুয়া ও যিক্ৰ-আযকার বর্ণিত হয়েছে।

মৃতব্যক্তির পরিবারের শোক পালন করা শরীয়ত সন্তুষ্ট। এতে তাদের দুঃখ হালকা হয় এবং এটি তাদের সন্তুষ্টি ও ধৈর্যধারণে উদ্বৃদ্ধ করে। নাবী ﷺ থেকে যা প্রমাণিত সেটা যদি তার জানা থাকে, তাহলে এর মাধ্যমেও শোক প্রকাশ করা যেতে পারে। এছাড়া উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে এমন উত্তম বাক্যাবলির মধ্যে যা তার জন্য সহজ হয়, তা দিয়েও প্রকাশ করা যেতে পারে। তবে শরীয়তের পরিপন্থী হওয়া যাবে না। উসামা বিন যায়েদ رضي الله عنه বলেন, আমরা নাবী ﷺ এর নিকটে ছিলাম। তাঁর এক মেয়ে তাঁকে এ মর্মে ডেকে পাঠালেন যে, তার একটা শিশু বা ছেলে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তখন নাবী ﷺ বললেন:

أَرْجِعْ إِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا أَنَّ اللَّهَ مَا أَخْدَى وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجْلٍ مُسْمَى، فَمَرْءَاهَا فَلْتَصِرْ وَلْتَحْسِبْ

“তার কাছে ফিরে যাও। অতঃপর তাকে বলো আল্লাহ তাঁ'আলা যা নিয়েছেন সেটা তারই এবং যা দিয়েছেন সেটাও তার। সবকিছুই তার নিকটে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থাকে। সুতরাং তাকে নির্দেশ দাও, সে যেন ধৈর্যধারণ করে এবং নেকির আশা করে।”^{৪৫৬}

এটা এক ধরনের উত্তম বাক্য যা শোক প্রকাশের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। আর শোক প্রকাশের সময় মানুষের মাঝে প্রচলিত এমন কিছু বিষয় থেকে বিরত থাকা উচিত যার কোনো শারণ ভিত্তি নেই। তন্মধ্যে:

১. চেয়ার, লাইটিং ও হাফেজে কুরআন সন্তুষ্টি কোনো এক স্থানে শোক প্রকাশের জন্য একত্রিত হওয়া।

২. শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যে আগত লোকদের মেহমানদারি করার জন্য শোক প্রকাশের দিনগুলোতে মৃত ব্যক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে খাবারের ব্যবস্থা করা। জারীর আল বাজালী رضي الله عنه বলেন,

^{৪৫৬} সহীহুল বুখারী, ঘ. ৭৩৭৭, সহীহ মুসলিম ৯২৩/১১।

كُنَّا نَعْدُ الْجَمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيْتِ وَصَنْبِعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ

“মৃতব্যক্তির পরিবারের ঘরে একত্রিত হওয়া এবং দাফনের পর তাদের পক্ষ থেকে খাবারের ব্যবস্থা করাকে আমরা নিষিদ্ধ বিলাপ হিসেবে গণ্য করতাম।”^{৪৫৭}

৩. বারবার শোক প্রকাশ করা। কিন্তু মানুষ আছে যারা মৃতব্যক্তির পরিবারের নিকট গিয়ে একাধিকবার শোক প্রকাশ করে। মূলতঃ একবারই শোক পালন করতে হয়। কিন্তু যদি সদ্পদেশ দেওয়া, ধৈর্যধারণের আদেশ দেওয়া, আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার উপদেশ দেওয়ার জন্য বারবার শোক প্রকাশ করা হয়, তবে কোনো অসুবিধা নেই। পক্ষান্তরে যদি এই উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হয়, তাহলে তা পালান করা উচিত হবে না। কেননা এ ব্যাপারে নাবী ﷺ ও সাহাবায়ে ক্রিম থেকে কোনো প্রমাণ নেই।

সুন্নাত হচ্ছে মৃতব্যক্তির নিকটাতীয় ও প্রতিবেশিরা তার পরিবারের জন্য খাবার প্রস্তুত করবে। নাবী ﷺ বলেছেন:

اضْسِنُوا لِأَلِّ جَعْفَرَ طَعَاماً، فَقَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ أَوْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ

“তোমরা জাফরের পরিবারের জন্য খাবার প্রস্তুত করো। তাদের কাছে এমন বিষয় এসেছে যা তাদেরকে ব্যস্ত করে রাখছে। অথবা তাদের উপর যা আপত্তি হয়েছে তা তাদেরকে ব্যস্ত করে রাখবে।”^{৪৫৮}

মৃতব্যক্তির জন্য কাঁদা ও দুঃখ প্রকাশ করাতে কোনো সমস্যা নেই। বস্তুত, অধিকাংশ সময় এটাই হয়ে থাকে। প্রকৃতি এটার দিকে ঝুঁকে যায়, যা কোনোরূপ ভণিতা নয়। নাবী ﷺ তার ছেলে ইবরাহীমের মৃত্যুতে কেঁদে বলেছিলেন:

إِنَّ الْعَيْنَ تَذْمَعُ، وَالْقَلْبُ يَخْرُنُ، وَلَا تَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا

“অক্ষ প্রবাহিত হয়, অন্তর ব্যথিত হয়। তবে আমরা তাই বলি যা আমাদের রব পছন্দ করেন।”^{৪৫৯}

কিন্তু এটা অসন্তুষ্টি, ধৈর্যহারা ও অভিযোগের স্বরে হওয়া যাবে না। আর বিলাপ করা, চিংকার করা, গাল চাপড়ানো ও বুকের কাপড় ছেঁড়া হারাম। নাবী ﷺ বলেছেন:

لَيْسَ مِنَّا مِنْ لَطَمَ الْحَدُودَ، وَشَقَّ الْجِيُوبَ، وَدَعَابِدَ عَوَى الْجَاهِلِيَّةِ

^{৪৫৭} মুসলাদে আহমাদ।

^{৪৫৮} মুসলাদে আহমাদ ১৭৫১।

^{৪৫৯} সহীল বুখারী, হা. ১৩০৩।

“যে ব্যক্তি গাল চাপড়ায়, বুকের কাপড় ছিঁড়ে এবং জাহেলী যুগের ন্যায় অভিযোগ করে, ঐ ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।”^{৪৬০}

যেমন এরপ বলা: “হায়! ধৰ্স আমার জন্য” ইত্যাদি। নাবী ﷺ বলেছেন:

النَّاِحَةُ إِذَا لَمْ تُثْبِتْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ جَرَبٍ

“বিলাপকারী যদি মৃত্যুর আগে তাওবা না করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে আলকাতরার পায়জামা ও মরিচা ধরা বর্ম পরিয়ে ওঠানো হবে।”^{৪৬১}

^{৪৬০} সহীল বুখারী, হা. ১২৯৪।

^{৪৬১} সহীহ মুসলিম, ফুআ. ৯৩৪/২৯।

তৃতীয় অধ্যায় যাকাত

ثالثاً : كتاب الزكاة

————— ♫ এতে ০৬টি অনুচ্ছেদ রয়েছে ♫ ———

প্রথম অনুচ্ছেদ : যাকাতের প্রাথমিক আলোচনা

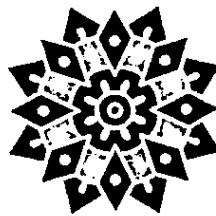
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : স্঵র্ণ ও রৌপ্যের যাকাত এ সংক্রান্ত কিছু মাসআলা

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ভূমি থেকে উৎপন্ন সম্পদের যাকাত

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : চতুর্ষিংশ জন্মের যাকাত

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : যাকাতুল ফিতর: যাকে বলা হয় সাদাকাতুল ফিতর

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : আহলুয় যাকাত বা যাকাত গ্রহীতা



الباب الأول: في مقدمات الزكاة

প্রথম অনুচ্ছেদ: যাকাতের প্রাথমিক আলোচনা

এ অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المَسَأَةُ الْأُولَىٰ: فِي تَعْرِيفِ الزَّكَاةِ প্রথম মাসআলা: যাকাতের পরিচয়

আভিধানিক অর্থ: বৃদ্ধি পাওয়া, বেড়ে যাওয়া। ফসল বাড়লে বলা হয়। زَكَا الزَّعِ |

وشرعًا: عبارة عن حق يجب في المال الذي بلغ نصاباً معيناً بشرط مخصوصة، لطائفة مخصوصة.

পরিভাষায়: যাকাত নির্দিষ্ট কিছু মানুষের এমন প্রাপ্য বা অধিকার যা সেই সম্পদে নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে শরীয়ত নির্ধারিত পরিমাণে আদায় করা ওয়াজিব।

এটা বান্দার পবিত্রতা এবং তার আত্মার পরিশুল্কতা স্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظَهِّرُهُمْ وَلَا تُرْكِيْهُمْ بِهَا﴾

“তাদের সম্পদ থেকে সাদকা নাও এবং তাদেরকে এর মাধ্যমে পবিত্র ও পরিশুল্ক করো।”

[সুরা তাওবাহ : ১০৩]

এটা পারস্পারিক ঘনিষ্ঠতা ও ভালোবাসা ছড়িয়ে দেওয়ার উপকরণ সমূহের মধ্যে একটি উপকরণ এবং মুসলিম সমাজের মাঝে পারস্পরিক দায়িত্ব গ্রহণ করার অন্তর্ভুক্ত।

المَسَأَةُ الثَّانِيَةُ: حُكْمُ الزَّكَاةِ وَدَلِيلُ ذَلِكَ দ্বিতীয় মাসআলা: যাকাতের হুকুম ও দলীল

আর যাকাত ইসলামের অন্যতম একটি ফরয ইবাদত। পাঁচটি রূকনের মধ্যে একটি রূকন। সলাতের পর এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রূকন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾

“তোমরা সলাত কার্যম করো এবং যাকাত প্রদান করো।” [সূরা বাকুরাহ: ৪৩]

তিনি আরও বলেন:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظْهِرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا﴾

“তাদের সম্পদ থেকে সাদকা নাও এবং তাদেরকে এর মাধ্যমে পবিত্র ও পরিষুচ্ছ করো।”

[সূরা তাওবা: ১০৩]

নাবী ﷺ বলেছেন:

”بُنَيَّ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ حَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحُجَّاجُ بِالْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ“

“ইসলাম পাঁচটি স্তুতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ১. এ মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল। ২. সলাত কার্যম করা। ৩. যাকাত প্রদান করা। ৪. সামর্থ্য থাকলে হাজুর পালন করা। ৫. রমায়ানের সিয়াম পালন করা।”^{৪৬২}

নাবী ﷺ মুয়ায বিন জাবাল ﷺ কে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় অসীয়ত করে বলেছেন:

”اذْعُهُمْ إِلَىٰ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلَمُنَّهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلَمُنَّهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ثُوَّخْدُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَمُرْدُ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ“

“তুমি তাদেরকে এ মর্মে সাক্ষ্য দেওয়ার প্রতি দাওয়াত দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল। যদি তারা এটা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানাবে যে, আল্লাহ তাঁআলা তাদের উপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরয করেছেন। যদি তারা এটাও মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানাবে যে, আল্লাহ তাদের উপর তাদের সম্পদে সাদকা (যাকাত) ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের থেকে উত্তোলন করে গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হবে।”^{৪৬৩}

সকল দেশের মুসলিমরা এ ব্যাপারে একমত যে, যাকাত ওয়াজিব। আর সাহাবীরাও এর বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে যুদ্ধ করতে একমত হয়েছিলেন। সুতরাং কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা এটা প্রমাণিত হলো যে, যাকাত ফরয।

^{৪৬২}মুত্তাফকুন বালাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৮; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৬ ইবনু উমার ﷺ এর হাদীস।

^{৪৬৩}মুত্তাফকুন বালাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ১৩৯৫; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৯ ইবনু আবাস ﷺ এর হাদীস।

الْمَسَأَةُ الْثَالِثَةُ: حُكْمُ مَنْ أَنْكَرَهَا

তৃতীয় মাসআলা: যাকাত অস্বীকারকারীর হুকুম

যে অজ্ঞতাবশত যাকাত ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করবে, তাহলে তাকে এর ওয়াজিবের বিষয়টি জানানো হবে। তার উপর কুফরের বিধান প্রযোজ্য হবে না; কারণ সে ওয়রগ্রেন্ট। তার অজ্ঞতার কারণ: হয়তো সে নৃতন ইসলামে প্রবেশ করেছে অথবা শহর থেকে দূরে কোনো মরুভূমিতে বেড়ে ওঠেছে। আর যদি যাকাত অস্বীকারকারী ইসলামী অঞ্চলে এবং আলেমদের মাঝে বেড়ে ওঠা মুসলিম হয়, তাহলে সে মুরতাদ হিসেবে গণ্য হবে। তার উপর রিদাতের হুকুম লাগানো হবে। তাকে তিন দিন সময় দেওয়া হবে তাওবা করার জন্য। যদি সে তাওবা না করে, তাকে হত্যা করা হবে। কারণ কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমায়ে উল্লিখিত যাকাত প্রদানের দলীল স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাই যার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে সে যদি তা দিতে অস্বীকার করে, তবে সেটা কুরআন-সুন্নাহকে মিথ্যারোপ করা এবং কুফরের নামান্তর।

الْمَسَأَةُ الرَّابِعَةُ: حُكْمُ مَنْ أَنْعَمْتَ بِخَلَائِلًا

চতুর্থ মাসআলা : কৃপণতাবশত যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি প্রদানকারীর হুকুম

যে ব্যক্তি কৃপণতাবশত যাকাত আদায়ে বিরত থাকবে অথচ তার বিশ্বাস আছে যে যাকাত ওয়াজিব, ঐ ব্যক্তি যাকাত আদায়ে বিরত থাকার কারণে পাপাচরী বলে গণ্য হবে। একারণে সে ইসলাম থেকে বের হবে না। কেননা যাকাত দ্বীনের একটি অন্যতম শাখা। সুতরাং শুধু যাকাত প্রদানে বিরত থাকার জন্য তাকে কাফের বলা যাবে না। নাবী ﷺ যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীর ব্যাপারে বলেন:

لَمْ يَرِي سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

“অতঃপর সে তার পথটাকে হয় জান্নাতে, না হয় জাহানামে দেখবে।”^{৪৬৪}

সে কাফের হলে তার জান্নাতের পথ থাকতো না। এজন্য তার থেকে জোরপূর্বক যাকাত আদায় করা হবে। যদি কেউ তা আদায় না করে লড়াই করে, তাহলে তার সাথে লড়াই করা হবে যতক্ষণ না সে আল্লাহর আদেশের কাছে মাথা নত করে এবং যাকাত প্রদান করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَإِنْ تَأْبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَوةَ فَخَلُوَا سَبِيلَهُمْ

“যদি তারা তাওবা করে, সলাত কার্যেম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।” [সূরা তাওবাহ : ৫]

নাবী ﷺ বলেছেন:

أَمْرَتُ أَنْ أَفَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهُدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَجِسَامُهُمْ عَلَى اللَّهِ

“আমি মানুষদের সাথে ততক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কেনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল, তারা সলাত কার্যেম করে এবং যাকাত প্রদান করে। যদি তারা তা করে, তবে তারা আমার থেকে তাদের জ্ঞান ও মাল নিরাপদ রাখল। তবে ইসলামের হক ব্যতীত। আর তাদের হিসাব আল্লাহর উপরই ন্যাত থাকবে।”^{৪৬৫}

আবু বকর সিদ্দীক ঝঁজুর বলেন:

لَوْ مَنْعُونِي عَنَّاقًا كَانُوا يُؤْدِيُونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلُوكُمْ عَلَى مَنْعِهَا

“যদি তারা একটি মেষ শাবক যাকাত দিতেও অস্বীকৃতি জানায়, যা তারা আল্লাহর রসূল ﷺ কে দিত, তাহলে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব।”^{৪৬৬}

আনাকুশ: ছাগলের মাদী বাচ্চা, যার এক বছর পূর্ণ হয়নি।

তাঁর সিদ্ধান্তে তিনি খলীফাসহ সকল সাহাবী একমত ছিলেন। সুতরাং তাদের থেকে ইজমা প্রমাণিত যে, যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে তাদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। কৃপণতাবশত যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে সেও এ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হবে।

المَسَالَةُ الْخَامِسَةُ: فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي تُجْبِي فِيهَا الزَّكَاةُ পঞ্চম মাসআলা: যেসব সম্পদে যাকাত ওয়াজিব

পাঁচ প্রকার সম্পদে যাকাত ওয়াজিব (ফরয়):

১. চতুর্থ জন্ম: আর তা হলো: উট, গরু ও ছাগল। নাবী ﷺ বলেছেন:

«مَا مِنْ صَاحِبٍ إِيلِي، وَلَا بَقِيرٌ، وَلَا غَنِمٌ لَا يُؤْدِي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمُ مَا كَانَتْ، وَأَنْسَمَهَا نَطَحَهُ بِقُرُونِهَا وَنَطَقَهُ بِأَظْلَافِهَا، كُلُّمَا تَفَدَّتْ أُخْرَاهَا، عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ»

“উট, গরু ও ছাগলের মালিকদের মধ্যে যে যাকাত আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির নিকট এই পশুগুলো আরও বড়ো ও মোটা তাজা হয়ে আসবে। তারপর তাকে শিং দিয়ে

^{৪৬৫} মুস্তাফাহুল বালাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ২৯৪৬; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ২১।

^{৪৬৬} সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ।

গুঁতা দিবে এবং পা দিয়ে পিষ্ট করবে। যখনই শেষ পশ্চিম চলে যাবে তখনই যথাক্রমে আবার প্রথমটাকে ফিরিয়ে আনা হবে। এভাবে মানুষের মাঝে ফয়সালা শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে।”^{৪৬৭}

২. দুই মুদ্রা: যথা সোনা এবং রূপা। এরপ বর্তমানে প্রচলিত কাগজের মুদ্রা এর স্থলাভিষিক্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَالَّذِينَ يَكْثِرُونَ الْدَّهْبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنِفِّقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُوهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

“যারা সুর্দ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।”[সূরা তাওবাহ : ৩৪]

নাবী ﷺ বলেছেন:

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤْدِي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفْحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأَخْرِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُنْكَوَى بِهَا جَنْبَهُ وَجَنْبَهُ وَظَهْرُهُ، كُلُّهَا بَرَدَتْ رُدَدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ.

“সোনা-রূপার মালিকদের মধ্যে যারা এর হক (যাকাত) আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন তার ঐ সোনা-রূপা দিয়ে তারজন্য আগুনের অনেক পাত (লোহার পাতের ন্যায়) তৈরি করা হবে। অতঃপর তা জাহানামের আগুনে গরম করা হবে। অতঃপর তা দিয়ে কপাল, পাৰ্শ্বদেশ ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। যখনই ঠাণ্ডা হয়ে আসবে পুনরায় তা উত্তপ্ত করা হবে। এরপ করা হবে এমন একদিন যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।”^{৪৬৮}

৩. ব্যাবসায়িক পণ্য: এটা হলো এমন সব পণ্য যা লাভের উদ্দেশ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন: **﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طِبِّاتِ مَا كَسْبَتُمْ﴾**

“হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তোমাদের অর্জিত পুরুষ জিনিস হতে ব্যয় করো।”[সূরা বাকুরাহ : ২৬৭]

সকল বিদ্঵ানই উল্লেখ করেছেন যে, এই আয়াতের উদ্দেশ্য হলো ব্যাবসায়িক পণ্যের যাকাত।

৪. শস্য ও ফল: শস্য: প্রত্যেক ঐ দানাদার খাদ্য যেগুলো গুদামজাত করে খাওয়া যায়। যেমন- গম, ঘৰ ইত্যাদি। ফল: খেজুর ও কিশমিশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾

“আমরা তোমাদের জন্য তুমি থেকে যা উৎপন্ন করেছি সেখান থেকে।”[সূরা বাকুরাহ : ২৬৭]

^{৪৬৭} সংগীহ মুসলিম, ঘ. ২১৯০, ফুআ, ৯৯০।

^{৪৬৮} সংগীহ মুসলিম, ঘ. ২১৮০, ফুআ, ৯৮৭।

অন্যত্র মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন:

﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾

“ফসল কর্তনের দিন তার হক বুরিয়ে দাও।” (সূরা আনআম: ১৪১)

নাবী ﷺ বলেছেন:

فِيهَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيَا الْعُشَرَ، وَفِيهَا سُقِيَ بِالنَّصْحِ نِصْفَ الْعُشَرِ،

‘বৃষ্টি, ঝর্ণা ও নালার পানিতে উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ বা দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। আর সেচের মাধ্যমে পানি দেওয়া হলে অর্ধ উশর বা কুড়ি ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে।’^{৪৬৯}

৫. খনিজ পদার্থ ও গুণ্ঠন: মায়াদিন (খনিজ পদার্থ): ভূ-গর্ভে সৃষ্টি প্রত্যেক ঐ মূল্যবান সম্পদ যা ভূমি থেকে বের হয়। এটা কোনো উত্তাবকের উত্তাবন নয়। যেমন- সোনা, রূপা, তামা ইত্যাদি।

রিকায (গুণ্ঠন) : জাহেলী যুগে মাটির নিচে লুকানো বা পোতা প্রাণ সম্পদ। খনিজ সম্পদ ও গুণ্ঠনের যাকাত ওয়াজিব হওয়ার আম দলীল:

﴿أَنْفَقُوا مِنْ طِبَابٍ مَا كَسْبُهُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾

“তোমরা তোমাদের অর্জিত পরিত্র জিনিস হতে ব্যয় করো এবং আমরা তোমাদের জন্য ভূমি থেকে যা উৎপন্ন করেছি সেখান থেকেও।” [সূরা বাক্সারাহ : ২৬৭]

ইমাম কুরতুবী তার তাফসীরে বলেছেন: এর তাফসীর হলো- উভিদ, খনিজ সম্পদ ও গুণ্ঠন।

নাবী ﷺ বলেছেন: “গুণ্ঠনে এক পঞ্চমাংশ যাকাত দিতে হবে।”^{৪৭০}

আর খনিজ পদার্থে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে উল্লেখের ইজমা রয়েছে।

^{৪৬৯} সহীল বুখারী, ঘ. ১৪৮৩ ইবনু উমার ﷺ এর হাদীস।

^{৪৭০} মুস্তাফাবুন আলাইহি: সহীল বুখারী, ঘ. ১৪৯৯; সহীল মুসলিম, ঘ. ফুআ. ১৭১০ আবু হুরায়রা ﷺ এর হাদীস।

**المسألة السادسة: في الحكمة من إيجاب الزكاة، وعلى من تجب (شروط وجوهاً)
ষষ্ঠى ماساتালا: ياكات وياجيর كرارا هيكما ه و يادير عپر وياجيর
(ياكات وياجيير شرسمعه)**

ক. الحكمة في إيجاب الزكاة বা **ياكات وياجيর كرارا تاৎپর্য:**

মহান লক্ষ্য ও মহৎ উদ্দেশ্যে যাকাত শরীয়ত সম্মত (ফরয) করা হয়েছে। তন্মধ্যে:

১. সম্পদ পবিত্র ও বৃদ্ধিকরণ, এতে বরকত হাসিল এবং যাবতীয় অঙ্গল ও সংকটাপূর্ণ অবস্থা দূরীকরণসহ বিভিন্ন বিপদাপদ ও ক্ষতি থেকে সম্পদকে রক্ষা করা।
২. যাকাত আদায়কারী ব্যক্তিকে যাবতীয় কৃপণতা ও পাপাচারের শাস্তি থেকে পবিত্রকরণের পাশাপাশি আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয়ে অভ্যন্ত করা।
৩. দরিদ্রদের সহযোগিতা করা এবং নিঃস্ব, অভাবগত ও বঞ্চিতদের প্রয়োজন মেটানো।
৪. সমাজের প্রত্যেকের মাঝে ভালোবাসা, পরম্পরে সহযোগিতা ও দায়িত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করা। অতঃপর ধনী ব্যক্তি যখন তার হতদরিদ্র ভাইকে নিজ সম্পদের যাকাত প্রদান করবে, তখন তার অন্তরে হিংসা-বিদ্রে ও ধনীদের সম্পদহ্রাস পাওয়ার কামনা-বাসনা ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাবে। এর মাধ্যমে হিংসা-বিদ্রে দূর হওয়ার পাশাপাশি নিরাপত্তাও প্রতিষ্ঠিত হবে।
৫. আল্লাহ তা'আলা যেসব মুসলিমকে প্রচুর ধনসম্পদ দান করেছেন, যাকাত আদায়ের মাধ্যমে তার কৃতজ্ঞতা আদায় করা হয়। সেই সাথে আল্লাহ তা'আলার আদেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পায়।
৬. যাকাত আদায়কারীর ঈমানের সত্যতা প্রমাণিত হয়। কারণ প্রিয় সম্পদ কেবল অধিক ভালোবাসার মানুষ বা অধিক প্রিয় কোনো বস্তুর উদ্দেশ্যেই ব্যয় করা হয়ে থাকে। এ কারণে এটাকে সাদাকাহও বলা হয়। কারণ এটা মূলত সাদাকাহ আদায়কারী ব্যক্তির আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও সন্তুষ্টিরই বহিপ্রকাশ।
৭. এটা রবকে সন্তুষ্ট করা, কল্যাণ নাফিল হওয়া ও পাপ ক্ষমা হওয়ার অন্যতম একটি উপায়।

খ. কাদের উপর ওয়াজিব (যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ):

১. মুসলিম হওয়া: কোনো কাফেরের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। কেননা যাকাত হলো আর্থিক ইবাদত। এর মাধ্যমে মুসলমান আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো কাফের ইসলাম গ্রহণ না করবে ততক্ষণ তার কোনো ইবাদত গৃহীত হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ﴾

“আর তাদের কাছ থেকে দান-খয়রাত কুবুল করা হয় না এজন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে।”[সুরা তাওবা: ৫৪]

সুতরাং যদি তাদের দান গৃহীত না-ই হয়, তাহলে এই কর্তব্য পালনে তাদের কোনো উপকার নেই। আবু বকর رض এর নিম্নের বক্তব্য থেকে বুঝা যাচ্ছে। তিনি বলেন,

هَذِهِ فِرِیضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

“এটাই সেই ফরয যাকাত যেটা আল্লাহর রসূল ﷺ মুসলিমদের উপর ফরয করেছেন।”^{৪৭১} কিন্তু তারপরও তার হিসাব হবে। কারণ বিশুদ্ধ মতে, সে শরীয়তের শাখাগত মাসআলায় সম্মোধিত।

২. স্বাধীন হওয়া: দাস-দাসীর উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। কেননা দাস কোনো কিছুর মালিক নয়। অন্যদিকে মুকাতাব দাসের মালিকানাও অত্যন্ত নগণ্য। আর দাসের অধীনে যা আছে তা সবই মূলত তার মনীবের। অর্থাৎ নিজের বলতে কিছুই নেই। এ কারণেই মূলত তার উপর যাকাত ওয়াজিব নয়।

৩. নিসাব পরিমাণ সম্পদের স্থির মালিক হওয়া: ^{৪৭২} এই নিসাব পরিমাণ সম্পদটি বিনা অভাবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ হিসাবে পূর্ণ মালিকানায় থাকতে হবে। যেমন খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাসস্থান সম্পত্তি প্রয়োজন। কারণ যাকাত ওয়াজিব হয়েছে মূলত দরিদ্রদের সহযোগিতা করার জন্য। তাই নিসাব হচ্ছে যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে ধনী হিসেবে বিবেচনা করা হয় সেই পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া। এটাই তার উপর ওয়াজিব। নাবী ﷺ বলেছেন:

لَيْسَ فِيهَا دُونَ حَسْنَةٍ أَوْ سُقْيٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ حَسْنٍ أَوْ أَقْصَى صَدَقَةٍ

“পাঁচ ওয়াসাকের কমে কোনো যাকাত নেই। পাঁচ উটের কমে কোনো যাকাত নেই এবং পাঁচ উকিয়ার কমে কোনো যাকাত নেই।”^{৪৭৩}

৪. সম্পদের উপর এক বছর অতিবাহিত হওয়া: নিসাব পরিমাণ সম্পদ ব্যক্তির মালিকানায় বারো চন্দ্র মাস অতিবাহিত হতে হবে। এ ব্যাপারে নাবী ﷺ বলেছেন:

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحُولُ

“কোনো সম্পদ এক বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তাতে কোনো যাকাত নেই।”^{৪৭৪}

^{৪৭১} সহীল বুখারী, হা. ১৪৫৪। আর এটা সেই কিতাবে ছির আনাস বিন মালিক رض কে বাহরাইনে প্রেরণ করার সময় আবু বকর رض যা লিখে দিয়েছিলেন।

^{৪৭২} যা হিবাতার উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মসের সমুদ্ধীয়ন না হওয়া। যদি ক্ষতির সমুদ্ধীয়ন হয়, তবে তাতে যাকাত নেই।

^{৪৭৩} মুস্তাফাকুন আলাইহি: সহীল বুখারী, হা. ১৪৪৭, সহীহ মুসলিম, হা. ৯৭৯।

এই শর্তটি চতুর্ষদ জন্ম, দুই মুদ্রা (সোনা ও রূপা) ও ব্যাবসায়িক পণ্যের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু শস্য, ফলমূল, মায়াদিন (খনিজ সম্পদ) ও রিকায়ের (গুণ্ঠন) ক্ষেত্রে এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ﴾^১

“তোমরা শস্য কাটার দিন শস্যের প্রাপ্ত্য আদায় করে দাও।” [সূরা আনআম: ১৪১]

মায়াদিন ও রিকায় এ দুটি ভূমি থেকে উৎপন্ন সম্পদ। সুতরাং এই সম্পদের যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য এক বছর অতিবাহিত হওয়া ধর্তব্য নয়। এগুলো শস্য ও ফলমূলের মতো।

المسألة السابعة: في أقسامها

সপ্তম মাসআলা : যাকাতের প্রকারভেদ

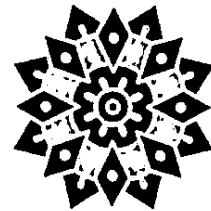
যাকাত দুই প্রকার:

১. সম্পদের যাকাত, যা সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত।
২. শরীরের যাকাত, শরীরের সাথে সম্পৃক্ত। এটাই যাকাতুল ফিতর।

المسألة الثامنة: زكاة الدّين

অষ্টম মাসআলা: ঝণের যাকাত

ঝণটা যদি নিঃস্ব ব্যক্তির উপর থাকে আর সে যদি এক বছরের জন্য ঝণ নিয়ে থাকে, তাহলে এই এক বছরই ঝণদাতা এর যাকাত আদায় করবে। পক্ষান্তরে সচ্ছল ব্যক্তির উপর ঝণ থাকলে, ঝণদাতা প্রতি বছরই এর যাকাত দিবে। কারণ সম্পদটি তার নিজের কাছে থাকার যে হুকুম এটাও সেই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।



الباب الثاني : في زكاة الذهب والفضة দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত

এ সংক্ষিপ্ত কিছু মাসআলা:

المُسَأْلَةُ الْأُولَى: حُكْمُ الزَّكَاةِ فِيهَا، وَأَدْلَةُ ذَلِكَ

প্রথম মাসআলা: স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাতের হুকুম ও এর দলীল

স্বর্ণ ও রূপার যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে আল্লাহর তা'আলা বলেন:

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُوهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

“যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শান্তির সুসংবাদ দাও।” [সূরা তাওবাহ : ৩৪]

যারা এই ওয়াজিব পরিত্যাগ করবে, তাদেরকে এই শান্তির ভয় দেখানো হয়েছে। নাবী ﷺ বলেছেন:

مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةً، لَا يُؤْدِي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفَّحَتْ لَهُ صَفَّائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُخْرِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُنْكَوِي إِلَيْهَا جَنْبَهُ وَجَنْبَهُ وَظَهُورُهُ، كُلُّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ كَمْبِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّىٰ يُقْضَى اللَّهُ بَيْنَ الْعِبَادِ.

“সোনা-রূপার মালিকদের মধ্যে যারা এর হক (যাকাত) আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন তার ঐ সোনা-রূপা দিয়ে তারজন্য আগনের অনেক পাত তৈরি করা হবে। অতঃপর তা জাহানামের আগনে গরম করা হবে। তারপর তা দিয়ে কপাল, পার্শ্বদেশ ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। যখনই



ঠঙ্গ হয়ে আসবে পুনরায় তা উত্তপ্ত করা হবে। এক্সপ করা হবে এমন একদিন যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।”^{৪৭৫}

বিদ্বানদের এ মর্মে ইজমা রয়েছে, দুইশত দিরহামে পাঁচ দিরহাম যাকাত দিতে হবে। আর স্বর্ণ যদি বিশ মিসকাল পরিমাণ হয় এবং তার মূল্য যদি দুইশত দিরহাম হয় তবে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে।

المسألة الثانية: مقدارها الثانية: مقدارها

স্বর্ণ ও রৌপ্যের ক্ষেত্রে যাকাতের পরিমাণ উপরের কুরু’ বা আড়াই শতাংশ ওয়াজিব। অর্থাৎ প্রত্যেক বিশ দিনার (স্বর্ণে) অর্ধ দিনার। এরপর যা বাঢ়বে, তাতে উল্লিখিত হিসাব অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে। কম হোক বা বেশি হোক। আর প্রত্যেক দুইশত দিরহামে (রৌপ্যে) পাঁচ দিরহাম। এর বেশি হলে, হিসাব অনুযায়ী আদায় করতে হবে। সদাকার অধ্যায়ে নাবী ﷺ এর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে:

وَفِي الرُّقَّةِ كُلُّ مَا تَبَقِّيَ دِرْهَمٌ رُّبْعُ الْعُشْرِ

“রূপার ক্ষেত্রে দুইশত দিরহামে এক দশমাংশ আদায় করতে হবে।”^{৪৭৬} আরেকটি হাদীস নিম্নরূপ:
 وَأَئِسَّ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي - فِي الدَّهْبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَخَالَ عَلَيْهَا الْحُولُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ

“আপনার উপর কিছুই নেই- অর্থাৎ স্বর্ণের ক্ষেত্রে বিশ দিনারের কম হলে কোনো যাকাত নেই। যদি আপনার নিকট বিশ দিনার থাকে এবং তা পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয় তাহলে অর্ধ রত্তি (দিনার) যাকাত দিতে হবে।”^{৪৭৭} নাবী ﷺ থেকে এক্সপ প্রমাণিত হয়েছে যে,

كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفَ دِينَارٍ

“তিনি প্রত্যেক বিশ রত্তিতে অর্ধ রত্তি যাকাত নিতেন।”^{৪৭৮}

^{৪৭৫} সহীহ মুসলিম, হ্য. ২১৮০, ফুআ. ১৮৭ আবু হুরায়রা ﷺ এর হাদীস।

^{৪৭৬} সহীহুল বুখারী, হ্য. ১৪৫৪ আনাস বিরিদি এর হাদীস।

^{৪৭৭} সুনান আবু দাউদ, হ্য. ১৫৭৩ এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন আলী বিরিদি থেকে হাসান অথবা সহীহ সানাদে; ইমাম নাবী এমনটিই বলেছেন। [বইতে ৪১৪৫ শব্দে রয়েছে; তবে হাদীসের বর্ণনায় ৪১৪৫ শব্দে রয়েছে।]

^{৪৭৮} ইবনু মাজাহ, হ্য. ১৭১১; দারাকুত্বনী, হ্য. ১৯৯ সহীহ। দেখুন, ইরওয়াউল গালীল ৩/২৮৯। [বইতে ৪১৪৫ শব্দে রয়েছে; তবে হাদীসের বর্ণনায় ৪১৪৫ শব্দে রয়েছে।]

المسألة الثالثة: شروطها তৃতীয় মাসআলা: যাকাতের শর্তাসমূহ

স্বর্ণ ও রৌপ্যে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য নিম্নের শর্তগুলো প্রযোজ্য:

১. নিসাব পরিমাণ হওয়া। অর্থাৎ স্বর্ণ হলে বিশ রত্তি পরিমাণ হতে হবে। আলী কান্দাহারি হাদীস এর দলীল। তিনি বলেন,

وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي - فِي الْذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْكَ الْخُولُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارًا

“আপনার উপর কিছুই নেই- অর্থাৎ স্বর্ণের ক্ষেত্রে বিশ দিনারের কম হলে কোনো যাকাত নেই। যদি আপনার নিকট বিশ দিনার থাকে এবং তা পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয় তাহলে অর্ধ রত্তি (দিনার) যাকাত দিতে হবে।”^{৪৭৯} এটা মোটামুটি ৮৫ গ্রামের সমান।

আর রৌপ্যের নিসাব হচ্ছে দুইশত দিরহাম সমপরিমাণ। নাবী কান্দাহারি বলেছেন:

لَيْسَ فِيهَا دُونَ حَمْسٍ أَوْ أَقِيرْ صَدَقَةً

“পাঁচ উকিয়ার কমে কোনো যাকাত নেই।”^{৪৮০} এক উকিয়া সমান চল্লিশ দিরহাম। তাহলে পাঁচ উকিয়া সমান দুইশত দিরহাম। নাবী কান্দাহারি বলেছেন:

وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمَائَةً، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَسْأَءَ رَبُّهَا

“রিক্ত বা রূপার ক্ষেত্রে দুইশত দিরহামে এক দশমাংশ আদায় করতে হবে। এক্ষণে যদি একশত নবাই দিরহামও হয়, তথাপি তাতেও কোনো যাকাত নেই। তবে মালিক যদি স্বেচ্ছায় কিছু দেয় (তাহলে তা নিতে পারো)।”^{৪৮১}

আলেমগণ সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, রৌপ্যের নিসাব হচ্ছে পাঁচ উকিয়ার সমপরিমাণ। আর স্বর্ণের নিসাব হচ্ছে বিশ রত্তি বা দিনার সমপরিমাণ।^{৪৮২}

২. বাকি সাধারণ শর্তাবলি পূর্বে উল্লিখিত ‘কাদের উপর যাকাত ওয়াজিব’ এর অধ্যায়ের মতোই। তা হলো: মুসলিম হওয়া, স্বাধীন হওয়া, পূর্ণ মালিক হওয়া ও এক বছর অতিবাহিত হওয়া। এর আলোচনা পূর্বে চলে গেছে।

^{৪৭৯} সুনান আবু দাউদ, হ্য. ১৫৭৩ এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন আলী কান্দাহারি থেকে হাসান অথবা সহীহ সানাদে; ইমাম নাববী এমনটিই বলেছেন। [বইতে ৫৪৪ শব্দে রয়েছে; তবে হাদীসের বর্ণনায় ৫৪৫ শব্দে রয়েছে।]

^{৪৮০} মুস্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হ্য. ১৪৪৭, সহীহ মুসলিম, হ্য. ৯৭৯।

^{৪৮১} সহীহল বুখারী, হ্য. ১৪৫৪।

^{৪৮২} শারহ সহীহ মুসলিম ৭/৪৮।

المسألة الرابعة: في ضم أحدهما -الذهب والفضة- إلى الآخر

চতুর্থ মাসআলা: স্বর্ণ-রৌপ্য একটি আরেকটির সাথে

মিলিয়ে যাকাত আদায় করা

বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, স্বর্ণ-রৌপ্য নিসাব পরিমাণ হলে একটা আরেকটার সাথে মিলিয়ে যাকাত আদায় করা যাবে না। কেননা দুইটা ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। তাই একপ ক্ষেত্রে একটা আরেকটার সাথে মিলিয়ে যাকাত আদায় করা যাবে না। যেমন উট-গরু এবং যব-গম। যদিও উভয়টিতে উদ্দেশ্য একই হয়; অর্থাৎ উট ও গরুতে সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া এবং যব ও গমে খাদ্যসামগ্রী হওয়া উদ্দেশ্য। নাবী ﷺ এর বাণী- “لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسٍ أَوْ أَقِصَّ صَدَقَةً”^{৪৮৩} পাঁচ উকিয়ার কমে কোনো যাকাত নেই।”^{৪৮৩} একটাকে আরেকটার সাথে মিলানোর কথা বললে, নিসাব পূর্ণ করতে গিয়ে পাঁচ উকিয়ার কম রোপ্যতে যাকাত দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে, যখন নিসাব পূর্ণ করার মতো স্বর্ণ থাকবে। আর হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, তার কাছে থাকা স্বর্ণের পরিমাণ পূর্ণ পাঁচ উকিয়া হয় কিনা। এর উপর ভিত্তি করে, যদি কারো কাছে দশ দিনার এবং একশত দিরহাম থাকে, তাহলে তার উপর কোনো যাকাত নেই। কেননা স্বর্ণ আলাদা যাকাত দিতে হবে এবং রৌপ্য আলাদা যাকাত দিতে হবে।

المسألة الخامسة: في زكاة الحُلُى

ପଞ୍ଚମ ମାସତ୍ତାଳା: ଗହନା ବା ଅଲକ୍ଷଣାରେର ଯାକାତ

বিদ্বানদের মাঝে এ ব্যাপারে কোনো ইখতিলাফ নেই যে, সংরক্ষণ এবং ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত গহনায় যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। হারামকৃত গহনার ক্ষেত্রে একই হ্রকুম। যেমন কোনো পুরুষ যদি স্বর্ণের আংটি বানায় কিংবা কোনো মহিলা যদি প্রাণির আকৃতিতে গহনা বানায় অথবা তাতে প্রাণির ছবি থাকে। বৈধ পত্রায় ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বা ধার দেওয়ার জন্য প্রস্তুতকৃত গহনার ক্ষেত্রে বিদ্বানদের বিশুদ্ধ মত হলো- এতে যাকাত দেওয়া ওয়াজিব। এর কারণ হলো:

১. স্বর্ণ-রোপ্য যাকাত ওয়াজিবের ক্ষেত্রে বর্ণিত হাদীসগুলো আম। আর এই আম হাদীসগুলো গহনাকেও অন্তর্ভুক্ত করে।
 ২. হাদীস বিশারদগণ আমর বিন শুয়াইব থেকে, তিনি তার পিতা, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন:

४८० मुख्याधिकार आलाइहि: सहीहल बुधारी, हा. १४४७, सहीह मुसलिम, हा. १७१।

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةً هَذَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسْكَنَاتٍ غَلِظَاتٍ مِّنْ ذَهَبٍ، قَالَ هَا: أَتَعْطِينَ زَكَةَ هَذَا؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: أَيْسُرُكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارِينِ مِنْ نَارٍ؟ قَالَ: فَخَلَعْتُهُمَا، فَأَلْقَتُهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

“একজন মহিলা আল্লাহর রসূল ﷺ এর কাছে আসল। সঙ্গে তার একটি মেয়ে। মেয়েটির হাতে পরিহিত স্বর্ণের দুইটি মোটা বালা। তখন তিনি ﷺ বললেন: তুমি কি এর যাকাত আদায় করো? সে বলল, না। তিনি বললেন: তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে যে, আল্লাহ তা'আলা এর বিনমিয়ে তোমাকে আগুনের বালা পরিয়ে দিবেন? সাথে সাথে মহিলাটি বালা দুটি খুলে নাবী ﷺ এর কাছে ফেলে দিল।”^{৪৮৪}

এই হাদীসটি এই বিষয়ের দলীল। এছাড়াও এর শাহেদ (সমর্থক হাদীস) সহীহ ও অন্যান্য হাদীস রয়েছে।

৩. এই মতটি অধিক নিরাপদ এবং দায়মুক্ত থাকার জন্য অধিক উপযোগী। নাবী ﷺ বলেছেন, “সন্দেহপূর্ণ বিষয় ছেড়ে সন্দেহমুক্ত বিষয়ের দিকে ধাবিত হও।”

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: فِي زَكَةِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ ষষ্ঠ মাসআলা: ব্যাবসায়িক পণ্যের যাকাত

العروض বা উরুয়: একবচনে উরুয় বা আরুয় বা আরায়। আরয হলো- মুসলিম ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত পণ্য। এটা যে-কোনো প্রকার পণ্য হতে পারে। এই নামকরণের কারণ হলো- এটি স্থির নয়; বরং আসে আবার চলে যায়। আর ব্যবসায়ী নির্দিষ্টভাবে পণ্যটাই চায় না বরং এর লভ্যাংশ হিসেবে টাকা চায়।

ব্যাবসায়িক পণ্যে যাকাত ওয়াজিব। কারণ কুরআনে আমভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে,

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّابِلِ وَالْمُتْرْوِمِ﴾

“তাদের সম্পদে অভাবী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।” [সূরা যারিয়াত: ১৯]

অন্যত্র বলা হয়েছে,

﴿كَمَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طِيبَاتِ مَا كَسَبُوا﴾

“হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তোমাদের অর্জিত পবিত্র সম্পদ থেকে ব্যয় করো।” [সূরা বাকুরাহ: ২৬৭]

^{৪৮৪} সুনান আবু দাউদ, হ্য. ১৫৬৩; নাসাই, হ্য. ২৪৭৯; বাযহাক ৪/১৪০; ইবনু কত্তান সহীহ সানাদে তার নাসবুর রায়াহ গ্রন্থে ২/৩৭০ বর্ণনা করেন; শাইখ আলবানী হাসান বলেছেন, সহীহত তিরমিয়ী ৫১৮।

নাবী ﷺ মুয়ায বিন জাবাল رض কে বলেছিলেন:

فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَرَصَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاهُمْ، وَتُرْدَدُ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ

“তাদেরকে জানাবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তাদের সম্পদে সাদকা ফরয করেছেন। যা ধনীদের থেকে উত্তোলন করে গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হবে।”^{৪৮৫}

নিঃসন্দেহে ব্যাবসায়িক পণ্য এক ধরনের সম্পদ।

ব্যাবসায়িক পণ্যে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ:

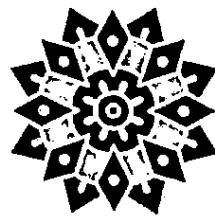
১. নিজ কর্মে ঐ সম্পদের মালিক হওয়া: যেমন- ক্রয়-বিক্রয়, হাদীয়া গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সূত্রের সম্পদ বা জোরপূর্বক গ্রহণকৃত কোনো সম্পদ এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

২. ব্যবসার নিয়তে ঐ সম্পদের মালিক হওয়া।

৩. মূল্য নিসাব পরিমাণ হওয়া। পূর্বেন্নিখিত পাঁচটি শর্তও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

অতঃপর এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেলে স্বর্ণ বা রৌপ্যের যে কোনো একটির মাধ্যমে এর মূল্য নির্ধারণ করার পর যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে তাতে আড়াই শতাংশ যাকাত ওয়াজিব হবে।

মূল্য নির্ধারণের সময় যা দিয়ে পণ্য ক্রয় করা হয়েছে, সেই মূল্য ধর্তব্য নয়। কেননা এর মূল্য উৎকৃষ্টগতি ও নিম্নগতি অনুসারে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। বরং বছর শেষের মূল্যটাই ধর্তব্য।



الباب الثالث: في زكاة الخارج من الأرض

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ভূমি থেকে উৎপন্ন সম্পদের যাকাত

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

الْمَسَأَلَةُ الْأُولَى: مَنْ تَجَبَ؟ وَدَلِيلُ ذَلِكَ

প্রথম মাসআলা: যাকাত কখন ওয়াজিব হবে? এবং তার দলীল

ভূমি থেকে উৎপন্ন সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার মৌলিক আয়ত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّمَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طِبَابٍ مَا كَسَبُوكُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾

“হে স্ট্রান্ডারগণ! তোমরা তোমাদের অর্জিত পবিত্র সম্পদ থেকে ব্যয় করো এবং ব্যয় করো তা থেকে যা আমরা তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি।” [সূরা বাকুরাহ : ২৬৭]

শস্যে যাকাত তখনই ওয়াজিব হবে যখন শস্যদানা শক্ত হয়ে উপরে আবরণ বা খোসা হবে। আর ফলমূলে যাকাত ওয়াজিব হয়, যখন ফল পরিপক্ষ হয়ে খাওয়ার উপক্রম হয়। এর জন্য এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾

“ফল কর্তনের দিন তোমরা তার হক বুঝিয়ে দাও।” [সূরা আনআম: ১৪১]

সুতরাং যে শস্য ও ফল মেঘে সংরক্ষণ করা হয়, তাতে যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। যেমন- গম, যব, সরিষা, ভুট্টা, ধান, খেজুর ও কিশমিশ। কিন্তু শুধু ফলমূল ও শাকসবজিতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। পাত্রের পরিমাপযোগ্য (ওজন করা যায় এমন) হতে হবে; কারণ নাবী ﷺ ওয়াসাক তথা পাত্রের মাপকে গণ্য করেছেন। আর মুদ্দাখার বা সংরক্ষণযোগ্য হওয়ার বিষয়টি যাকাত ওয়াজিব হওয়ার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তা সত্ত্বেও যদি শস্য এবং ফলমূলে মিকইয়াল বা পরিমাপযোগ্য ও মুদ্দাখার বা সংরক্ষণযোগ্য না পাওয়া যায়, তবে তাতে যাকাত নেই।

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: شَرْوَطُهَا التৃতীয় মাসআলা: যাকাতের শর্ত

শস্য ও ফলে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য দুটি শর্ত রয়েছে:

১. নিসাব পরিমাণ হতে হবে। অর্থাৎ পাঁচ ওয়াসাক। নাবী ~~ক্ষেত্র~~ বলেছেন,

لَيْسَ فِيهَا دُونَ حَمْسٍ أَوْ أَقِ صَدَقَةٌ

“পাঁচ ওয়াসাকের কমে কোনো যাকাত নেই।”^{৪৮৬} ওয়াসাক হলো উটের বহনযোগ্য শষ্যের পরিমাণ। এটা নাবী ~~ক্ষেত্র~~ এর সা‘ হিসেবে ষাট সা‘। তাহলে পাঁচ ওয়াসাক সমান তিনশ সা‘। আর নিসাবের পরিমাণ প্রায় ছয়শত বারো কেজি ভালো মানের গমের সমপরিমাণ। সা‘ এর ওজন অনুযায়ী দুইশ চলিশ কেজি।

২. এই নিসাব পরিমাণটা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সময় মালিকানায় থাকতে হবে।

المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: فِي مَقْدَارِ الْوَاجِبِ তৃতীয় মাসআলা: ওয়াজিবের পরিমাণ

শস্য ও ফলমূলে ওয়াজিবের পরিমাণ: বিনা খরচে সেচ দেওয়া হলে দশ ভাগের এক ভাগ। তা কোনো কিছু থেকে নির্গত পানি হোক বা ঝর্ণার পানি দিয়ে সেচ দেওয়া হোক। আর সেচের পানিতে খরচ হলে বিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে। চাই তা বালতি দিয়ে সেচ দেওয়া হোক বা উটের মাধ্যমে। এ ব্যাপারে নাবী ~~ক্ষেত্র~~ বলেছেন:

فِيهَا سَقَتِ السَّيْمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ بَعْدًا النَّسْرُ، وَفِيهَا سُقِيَ بِالسَّوَافِي، أَوِ النَّصْحَ نِصْفُ النُّشِيرِ

“যে ভূমি বৃষ্টি, নদ-নদী ও ঝর্ণার পানিতে সিঞ্চিত হয়, অথবা যে ভূমিতে তলদেশ থেকে আপনা আপনিই পানি সিঞ্চিত হয় তাতে উশর বা দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দেওয়া ওয়াজিব। আর যে ভূমি উট, বালতি বা সেচ যন্ত্র দিয়ে সেচ দেওয়া হয় তার যাকাত হলো উশরের অর্ধেক বা বিশ ভাগের এক ভাগ।”^{৪৮৭}

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: فِي زَكَةِ الْعَسْلِ চতুর্থ মাসআলা: মধুর যাকাত

ইবনু আব্দিল বার ~~ক্ষেত্র~~ অধিকাংশ আলেমদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এতে কোনো যাকাত নেই। আর এটাই বিশুদ্ধ। কারণ মধুর যাকাত ওয়াজিবের বিষয়ে কোনো স্পষ্ট সহীহ দলীল

^{৪৮৬} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ১৪৪৭, সহীহ মুসলিম, হা. ৯৭৯।

^{৪৮৭} সহীহল বুখারী, হা. ১৪৮৩ ইবনু উমার ~~ক্ষেত্র~~ এর হাদীস। সুনান আবু দাউদ, হা. ১৫৯৬।

কুরআনে কিংবা হাদীসে নেই। কোনো শারঈ বিষয়ের মূলনীতি হলো - ওয়াজিব সাব্যস্ত হওয়ার দলীল না পাওয়া পর্যন্ত বিষয়টি দায়মুক্ত বা স্থগিত থাকবে। ইমাম শাফেয়ী (যার বলেছেন, “মধুতে এক উশর যাকাত দিতে হবে।”)-হাদীসটি দুর্বল। এবং ৪১ মুখ্য যৌক্ত তা থেকে গ্রহণ করা হবে না) এই অংশটুকু যঙ্গফ। তবে উমার বিন আব্দুল আয়ীয় থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ৪
মন্তব্য যৌক্ত যা যঙ্গফ নয়। আমার মতে, মধুর যাকাত নেই। কেননা যাকাত আদায়ের খাত সম্পর্কে হাদীসের গ্রহসমূহ ও আসারগুলোতে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু তাতে মধুর যাকাত সম্পর্কে সুসাব্যস্ত কিছু আসেনি, সুতরাং এটাতে যেন ছাড় দেওয়া হয়েছে। ইবনু মুন্ফির (যার বলেন, মধুতে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোনো হাদীস প্রমাণিত নয়।

الْمَسَأَةُ الْخَامِسَةُ: فِي الرِّكَازِ পঞ্চম মাসআলা: রিকায় (গুপ্তধন)

রিকায়: রিকায় হলো ঐ সম্পদ যা জাহেলী যুগে মাটির নীচে পুঁতে রাখা হয়েছিল। এগুলো হলো স্বর্ণ, রৌপ্য কিংবা কুফরের আলামত সঁজলিত সম্পদ। এই সম্পদ অর্জনে কোনো অর্থ ব্যয় বা বড়ো কোনো কাজের মাধ্যমেও আসেনি। অপরদিকে যে সম্পদ অর্থ ব্যয় বা বড়ো কাজের মাধ্যমে অর্জিত হয় সেটা রিকায় নয়। রিকায় কম বা বেশি হোক, এক পঞ্চমাংশ যাকাত আদায় করতে হবে। এর উপর এক বছর অতিবাহিত হওয়া কিংবা নিসাব পরিমাণ পূর্ণ হওয়াও শর্ত না। একটি আম হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ﷺ বলেছেন: “রিকায়ে এক পঞ্চমাংশ যাকাত দিবে।”^{৪৮৮}

আর এটা ফায় হিসেবে সাধারণ মুসলিমদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। এক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট সম্পদ হওয়া শর্ত নয়। তা স্বর্ণ, রৌপ্য বা অন্য কিছু হতে পারে।

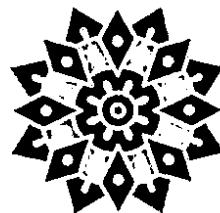
জাহেলী যুগের প্রোথিত সম্পদ চেনার মাধ্যম: এর উপর কুফরের আলামত পাওয়া যাবে। যেমন-তাদের নাম লেখা থাকবে। মৃত্তি খোদাই করা থাকবে। এ ছাড়াও অন্যান্য আলামত রয়েছে।

মার্দিন বা খনিজ সম্পদ: জমিন থেকে উৎপন্ন কিন্তু জমিনের জাতভুক্ত নয় এমন সম্পদ। এটি কোনো উভিদ নয়। সেটা প্রবাহমানও হতে পারে। যেমন- পেট্রোল ও আলকাতরা। অথবা কঠিন পদার্থও হতে পারে। যেমন- লোহা, তামা, সোনা, কুপা ও পারদ। সকলের একমতে এতে যাকাত ওয়াজিব। এর আলোচনা পূর্বে হয়েছে। ‘ভূমি থেকে উৎপন্ন সম্পদের যাকাত’ এই অধ্যায়ে এসংক্রান্ত একাধিক আম (ব্যাপক) দলীল উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿أَنْفِقُوا مِنْ طِبَابٍ مَا كَسْبُهُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের অর্জিত পুরিত্ব সম্পদ থেকে ব্যয় করো এবং ব্যয় করো তা থেকে যা আমরা তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি।” [সূরা বাকুরাহ : ২৬৭]

^{৪৮৮} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ১৪৯৯; সহীহ মুসলিম, হা. ফুজা. ১৭১০ আবু হুরায়রা ﷺ এর হাদীস।



الباب الرابع: في زكاة بهيمة الأنعام

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

চতুষ্পদ জন্ম: উট, গরু ও ছাগল। মহিষও গরুর অন্তর্ভুক্ত। মূলত এটা গরুরই একটা প্রকার। মেষ ও ডেড়া ছাগলের অন্তর্ভুক্ত। এদেরকে চতুষ্পদ জন্ম হিসেবে নামকরণ করার কারণ হলো, এরা মনের ভাব মুখে প্রকাশ করতে পারে না।

المقالة الأولى: شروط وجوبها

প্রথম মাসআলা: চতুর্থ জন্মতে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ

চতুর্পদ জন্মের যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য নিম্ন বর্ণিত কিছু শর্ত রয়েছে:

১. চতুর্পদ জন্তু শারঙ্গ দৃষ্টিকোণ থেকে নিসাব পরিমাণ হতে হবে। উট পাঁচটি, গরু ত্রিশটি, ছাগল চল্লিশটি হলে যাকাত আদায় করতে হবে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

لَيْسَ فِيهَا دُونَ حَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

“পাঁচ উটের কম সংখ্যায় যাকাত নেই।” ৪৮৯

ମୁଖ୍ୟାୟ ଏର ହାଦୀସ:

بَعْثَتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمْرَنِي أَنْ أَخْذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثَةِ تَسِيعًا وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعَنَ مُسْتَهَدِي

^{४८} युद्धाकानु आलाइटि: सहीहल बुधारी, हा. १४४७; सहीह मूसलिम, हा. २१५३, फ्रां. ९७९। आर उट्टेर दुःख बला हय तिन थेके दश पर्यंत नद्याके। एटि द्वी बाचक, एर कोनो एक बचन नेहि। येमन बला हय: आर उ बला हय, खम्स नुद:। खम्स अग्र, खम्स जगल, खम्स लूफ़।

“আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে ইয়েমেনে সাদকা (যাকাত) উত্তোলনের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে প্রতি ত্রিশটি গুরুতে একটি তাবি‘ এবং প্রতি চল্লিশটিতে একটি মুসিল্লাহ আদায়ের নির্দেশ দিলেন।”^{৪১০}

নাবী ﷺ বলেছেন:

إِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاهَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ

“চরে বেড়োনো ছাগল চল্লিশের কম হলে তাতে কোনো যাকাত নেই।”^{৪১১}

২. চতুর্ষদ জন্ত নিসাব পরিমাণ হওয়ার পর মালিকের নিকট এক বছর অতিবাহিত হওয়া। এ ব্যাপারে হাদীস-
لَا زَكَاةً فِي مَالٍ حَتَّى يَحْوَلَ عَلَيْهِ الْحُولُ

“কোনো সম্পদ এক বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তাতে কোনো যাকাত নেই।”^{৪১২}

৩. আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলার নির্দেশে কারো চাষাবাদ ছাড়াই ঘাস উৎপন্ন হয়- এমন মাঠে বিচরণশীল পশু হতে হবে; এক বছর হোক বা তার বেশি। নাবী ﷺ বলেছেন:

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمَا تَرْبَى، شَاهَةً

“মাঠে বিচরণশীল ছাগল যদি ৪০ থেকে ১২০ পর্যন্ত পৌঁছে তবে তাতে একটি ছাগল যাকাত দিতে হবে।”^{৪১৩} নাবী ﷺ আরও বলেছেন:

فِي كُلِّ سَائِمَةٍ إِلَيْلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ

“মাঠে বিচরণশীল উট প্রতি চল্লিশটিতে একটি বিনতে লাবুন যাকাত দিতে হবে।”^{৪১৪}

তবে যদি এক বছরের কম মাঠে বিচরণ করে আর একে বছরের অধিকাংশ সময় খাদ্য খাওয়াতে হয়, তাহলে সেটা মাঠে বিচরণশীল পশু বলে গণ্য হবে না। আর এতে যাকাতও দিতে হবে না।

৪. আমিল না হওয়া অর্থাৎ যে পশু জমি চাষাবাদ, দ্রব্য সামগ্রী স্থানান্তর অথবা বোঝা বহন করে। কেননা এধরনের পশু বন্দের ন্যায় মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। তবে যদি পশুটা ভাড়া দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়, তাহলে ভাড়ায় প্রাপ্ত অর্থ থেকে যাকাত দিতে হবে, যদি তা এক বছর অতিবাহিত হয়।

^{৪১০} হাদীসটি সহীহ। ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন ৫/২৪০; সুনান আবু দাউদ, হা. ১৫৭৬; তিরমিয়ী, হা. ৬২৩ এবং অন্যান্যরা। ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন। ইরওয়া নং ৭৯৫।

^{৪১১} সহীহস বুখারী, হা. ১৪৫৪।

^{৪১২} তিরমিয়ী, হা. ৬০১; ইবনু মাজাহ, হা. ১৭৯২; ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন। ইরওয়া নং ৭৮৭।

^{৪১৩} সহীহস বুখারী, হা. ১৪৫৪।

^{৪১৪} সুনান আবু দাউদ, হা. ১৫৭৫।

المسألة الثانية: في قدر الواجب الثانية ماسةً على المأمور

১. উটে ওয়াজিবের পরিমাণ:

আবশ্যক যাকাতের পরিমাণ: পাঁচটি উটে একটি জায়আ^{৪৯৫} মেষ, অথবা সানিয়্যাহ^{৪৯৬} ছাগল। আর দশটি উটে দুইটি ছাগল। পনেরোটি উটে তিনটি ছাগল। বিশটিতে চারটি ছাগল। পাঁচটি থেকে পয়ত্রিশ পর্যন্ত একটি বিনতে মাখায। বিনতে মাখায হলো- এক বছর পূর্ণ করে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে এমন মেয়ে উট। এটাকে এই নামে নামকরণ করার কারণ হলো, অধিকাংশ সময় এর মা গর্ভবতী হয়। এখানে মাখায অর্থ: হামেল বা গর্ভবতী। তবে এটা না পেলে একটা ইবনু লাবুন বা দুই বছরের পুরুষ উট যথেষ্ট হবে। ইবনু লাবুন হলো-যা দুই বছর পূর্ণ হয়ে তিন বছরে পদার্পণ করেছে। এটাকে নামকরণ করার কারণ হলো, অধিকাংশ সময় তার মা দ্বিতীয়বার গর্ভ ধারণ করে থাকে।

৩৬ থেকে ৪৫ পর্যন্ত একটি দুই বছরের বিনতে লাবুন।

৪৬ থেকে ৬০ পর্যন্ত একটি হিকাহ। হিকাহ হলো তিন বছর পূর্ণ হয়ে চার বছরে পদার্পণ করেছে এমন উদ্ধৃতি। এর নামকরণ করা হয়েছে এ জন্য যে, এটি নর উট দ্বারা মিলিত হওয়ার উপযুক্ত হয়েছে। এছাড়াও বলা হয় যে, এর উপর সওয়ার হওয়া এবং বোঝা বহন করার উপযুক্ত হওয়ার কারণে এমন নাম রাখা হয়েছে।

৬১ থেকে ৭৫ পর্যন্ত একটি জায়আ। উটের জায়আ বলা হয় যেটা চার বছর পূর্ণ হয়ে পাঁচ বছরে পদার্পণ করেছে। এটা নামকরণের কারণ, এ সময় এর সামনের দাঁতগুলো পড়ে যায়।

৭৬ থেকে ৯০ পর্যন্ত দুইটি বিনতে লাবুন।

৯১ থেকে ১২০ পর্যন্ত দুইটি হিকাহ।

১২০ টার বেশি হয়ে গেলে প্রতি ৪০ টাতে একটি বিনতে লাবুন। প্রতি ৫০ টাতে একটি হিকাহ। কিতাবুস সদাকৃতে এ ব্যাপারে আনাস^{৪৯৭} থেকে একটি হাদীস রয়েছে।

فِي أَرْبَعِ وَعَشْرِينَ مِنَ الْإِبْلِ، فَمَا دُوَّهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاءَ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعَشْرِينَ إِلَى خَمْسِ وَتَلَاثَيْنَ،
فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أَنْثَى،

“২৪ বা তার চেয়ে কম সংখ্যক উটের যাকাত ছাগল দিয়ে আদায় করতে হবে; প্রতি পাঁচটিতে একটি ছাগল। আর ২৫ থেকে ৩৫ পর্যন্ত হলে একটি মাদী বিনতে মাখায.....।”^{৪৯৮}

^{৪৯৫} ছোটো বাচ্চা। ছাগলের বাচ্চা এক বছর পূর্ণ করে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে বা দ্বিতীয় বছরে পা দিয়েছে।

^{৪৯৬} দুই বছর পূর্ণ করে তিন বছরে পদার্পণ করেছে বা তিন বছরে পা দিয়েছে।

^{৪৯৭} সহীফুল বুখারী, খ. ১৪৫৪।

উটের যাকাতের ছক:

ওয়াজিবের পরিমাণ	সংখ্যা	
	হতে	পর্যন্ত
১টি ছাগল	৫	৯
২টি ছাগল	১০	১৪
৩টি ছাগল	১৫	১৯
৪টি ছাগল	২০	২৪
১টি বিনতে মাখায	২৫	৩৫
১টি বিনতে লাবুন	৩৬	৪৫
১টি হিকাহ	৪৬	৬০
১টি জায়আ	৬১	৭৫
২টি বিনতে লাবুন	৭৬	৯০
২টি হিকাহ	৯১	১২০

১২০ এর বেশি হলে প্রতি চল্লিশটি উটে একটি বিনতে লাবুন এবং প্রতি পঞ্চাশটি উটে একটি হিকাহ দেওয়া ওয়াজিব।

২. গরুতে ওয়াজিবের পরিমাণ:

গরু ৩০ থেকে ৩৯ পর্যন্ত পৌছলে একটি তাবী‘ দিতে হবে। তাবী‘ বলা হয় যে গরুর বাচ্চার এক বছর পূর্ণ হয়েছে। এই নামকরণের কারণ হলো, এ বয়সের বাচ্চুর তার মায়ের অনুসরণ করে। ৪০ থেকে ৫৯ পর্যন্ত হলে একটি মুসিন্নাহ দিতে হবে। মুসিন্নাহ হলো যে গরুর বাচ্চার দুই বছর পূর্ণ হয়েছে। এটা নামকরণের কারণ হলো এ সময়ে দাঁত গজায়।

৬০ থেকে ৬৯ পর্যন্ত দুইটি তাবী‘ দিতে হবে। অতঃপর প্রতি ৩০ টাতে একটি তাবী‘ এবং প্রতি ৪০ টাতে একটি মুসিন্নাহ দিতে হবে। এভাবেই চলতে থাকবে। মুয়ায খালিল এর হাদীস:

أَمْرَنِي أَنْ أُخْدِي مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثَيْنَ تَبِعًا وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعَيْنَ مُسْتَنِدًا

“আমাকে প্রতি ত্রিশটি গরুতে একটা তাবী‘ এবং প্রতি চল্লিশটি গরুতে একটা মুসিন্নাহ আদায়ের নির্দেশ দিলেন।”^{৪৯৮}

^{৪৯৮} হাদীসটি সহীহ। ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন ৫/২৪০; সুনান আবু দাউদ, হা. ১৫৭৬; তিরমিয়ী, হা. ৬২৩ এবং অন্যান্যরা। ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন। ইরওয়া নং ৭৯৫।

গরুর যাকাতের ছক:

ওয়াজিবের পরিমাণ	সংখ্যা	
	হতে	পর্যন্ত
১টি তাবী	৩০	৩৯
১টি মুসিন্নাহ	৪০	৫৯
২টি তাবী	৬০	৬৯
২টি মুসিন্নাহ	৭০	৭৯

এর বেশি হলে প্রতি ৩০ টাতে একটি তাবী‘ এবং প্রতি ৪০ টাতে একটি মুসিন্নাহ দিতে হবে।

৩. ছাগলের ওয়াজিবের পরিমাণ:

ছাগল ৪০ থেকে ১২০ পর্যন্ত হলে একটি ছাগল যাকাত দিতে হবে। ১২১ থেকে ২০০ পর্যন্ত হলে দুইটি ছাগল দিতে হবে। ২০১ থেকে ৩০০ পর্যন্ত তিনটি ছাগল দিতে হবে। এই পরিমণের পর এভাবেই চলমান থাকবে প্রতি ১০০ টাতে একটি ছাগল দিতে হবে। এটা আনাস ~~প্রেরণ~~ এর হাদিসে এসেছে:

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةً شَاءَ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةً إِلَى مِائَتَيْنِ شَاءَنَّ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثَتِ مِائَةٍ، فَفِيهَا ثَلَاثَةُ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثَتِ مِائَةٍ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاءَ “বিচরণশীল ছাগল ৪০ থেকে ১২০ পর্যন্ত হলে একটি ছাগল যাকাত দিতে হবে। এর বেশি ১২১ থেকে ২০০ পর্যন্ত হলে দুইটি ছাগল দিতে হবে। এর বেশি ২০১ থেকে ৩০০ পর্যন্ত তিনটি ছাগল দিতে হবে। ৩০০ এর বেশি হলে প্রতি ১০০ তে একটি ছাগল।”^{৪৯৯}

ওয়াজিবের পরিমাণ	সংখ্যা	
	হতে	পর্যন্ত
১টি ছাগল	৪০	১২০
২টি ছাগল	১২১	২০০
৩টি ছাগল	২০১	৩০০

এর বেশি হলে প্রতি ১০০ তে একটি ছাগল।

^{৪৯৯} সহীহস বুখারী, ঘা. ১৪৫৪।

المسألة الثالثة: في صفة الواجب তৃতীয় মাসআলা: ওয়াজিবের বর্ণনা

ইসলাম তার শারঙ্গ মূলনীতি অনুযায়ী ধনী-দরিদ্রের কল্যাণের মাঝে সমতা বিধান করেছে। দরিদ্রকে সম্পূর্ণরূপে তার হক গ্রহণে উদ্বৃদ্ধ করেছে। একটুও কম করেনি। সেই সাথে ধনীদের সম্পদ সংরক্ষণের প্রতিও উদ্বৃদ্ধ করেছে। একারণে ব্যক্তির মধ্যম মানের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণের বিধান করা হয়েছে, উৎকৃষ্টতম না আবার নিকৃষ্টতমও হবে না। তবে পশুর বয়সের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ এর চেয়ে কমে যথেষ্ট হবে না। কারণ এতে দরিদ্রদের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। এর চেয়ে বেশি বয়সেরও গ্রহণ করা যাবে না। কারণ এতে ধনীদের প্রতি অন্যায় করা হয়।

অসুস্থ-ক্রটিসম্পন্ন ও বয়োঃবৃদ্ধ গ্রহণ করা যাবে না। কারণ এটা দরিদ্রদের কোনো উপকারে আসে না। আর এর বিপরীতে পেটুক অর্থাৎ মোটা ও অতিভোজী গ্রহণ করা যাবে না। যে পশু বাচ্চা লালন পালন করে, সেটাও নেওয়া যাবে না। গর্ভবতী নেওয়া যাবে না। প্রজননে ব্যবহৃত পশু নেওয়া যাবে না। দৃষ্টিনন্দন উৎকৃষ্ট পশুও নেওয়া যাবে না। কারণ সেটা সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ। আর এগুলো নিলে ধনীদের ক্ষতি হয়ে যাবে। নাবী ﷺ বলেছেন: ... وَكَرِيمٌ أَمْوَاهُمْ ...

“তোমরা তাদের ভালো ভালো সম্পদ নেওয়া থেকে বিরত থাকো।”^{৫০০}

উমার رض থেকে বর্ণিত। তিনি তার যাকাত আদায়ের আমিলকে (অফিসার) সুফইয়ানকে বলেছিলেন, তোমার সম্পদায়কে বলো, আমরা তোমাদের বাচ্চা লালন পালনকারী পশু, গর্ভবতী, অতিভোজী ও পাঠা ছাগল নিবো না। আমরা বরং নিবো জায়আ' ও সানী। এটা আমাদের ও তোমাদের মাঝে মধ্যম মানের সম্পদ।

জ্যায়আ' ও সানিয়া গবাদি পশুর বয়স বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে উট, গরু ও ছাগলের বয়সে পার্থক্য রয়েছে।

المسألة الرابعة: في الخلطة في هبمة الأنعم চতুর্থ মাসআলা: চতুর্পদ জন্মতে অংশীদার

এটা দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: ব্যক্তির অংশীদার। অর্থাৎ সম্পদে দুইজনের যৌথ মালিকানায় হয়। একজনের অংশ আরেকজন থেকে আলাদা করা যাবে না। এই ধরনের অংশীদার উত্তরাধিকার সূত্রে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

^{৫০০} মুসাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হ. ১৩৯৫; সহীহ মুসলিম, হ. ২৯, ফুআ. ১৯-(৩) ইবনু আবাস رض এর হাদীস।

বিতীয় প্রকার: বৈশিষ্ট্যগত অংশীদার। এই সম্পদে প্রত্যেকের অংশ আলাদাভাবে পার্থক্য করা যায় এবং এর মাঝে শুধু প্রতিবেশিরাই যুক্ত থাকে।

এই দুই প্রকার অংশীদারের সম্পদ এক সম্পদে পরিণত হবে যখন-

- দুই সম্পদের সমষ্টি একত্রে নিসাব পরিমাণ হবে।
- উভয় অংশীদার যাকাত আদায়ের যোগ্য হবে। এক্ষেত্রে যদি দুইজনের একজন কাফের হয় তবে একত্র করা শুন্দি হবে না এবং কোনো প্রভাবও ফেলবে না।
- দুইজনের পশ্চ একই গোয়ালঘরে থাকবে। একই চারণভূমিতে একত্রে থাকবে; একসাথে ফিরে আসবে। এমনকি দুধ, ঘাস ও প্রজননের ক্ষেত্রেও একত্রে থাকবে।

এই শর্তগুলো পাওয়া গেলে দুই সম্পদই এক সম্পদে পরিণত হবে। নাবী ﷺ বলেছেন:

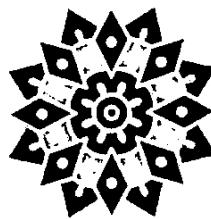
لَا يُجْمِعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشِيَّةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيلَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَيَّةِ
“যাকাতের ভয়ে বিচ্ছিন্নগুলোকে একত্রিত করা এবং একগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। দুই শরীকের পশ্চ একত্রে থাকলে প্রত্যেকেই নিজ অংশের হিসাব করে সঠিকভাবে যাকাত আদায় করবে।”^{৫১}

এই শরীকানা যাকাত ওয়াজিব হওয়া বা না হওয়াকে প্রভাবিত করবে। এটা শুধুমাত্র চতুর্পদ জন্মতেই হয়ে থাকে।

বিচ্ছিন্ন পশ্চগুলোর মাঝে একত্রকরণের দৃষ্টান্ত : তিন ব্যক্তি প্রক্র্যেকেই ৪০ টি করে ছাগলের মালিক। এখন মোট ছাগল ১২০টি। এ ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকেরটা আলাদা করলে তাদের উপর তিনটি ছাগল যাকাত দেওয়া ওয়াজিব হবে। কিন্তু আমরা যদি সব ছাগল একত্রিত করি, তবে তাতে মাত্র একটি ছাগল যাকাত দিতে হবে। এখানে তারা বিচ্ছিন্নগুলোর মাঝে একত্রিত করল, যাতে তাদের উপর তিনটি ছাগল ওয়াজিব না হয়ে বরং একটি ছাগল ওয়াজিব হয়।

একত্রকরণের মাঝে বিচ্ছিন্নকরণের দৃষ্টান্ত: এক ব্যক্তির ৪০ টি ছাগল আছে। যাকাত উত্তোলনকারীর আসার খবর শুনে সেগুলো পৃথক করে, এক স্থানে রাখল ২০টি, আরেক স্থানে রাখল ২০টি। এভাবে আলাদা থাকার দরুন নিসাব পরিমাণ না হওয়ায় তার কাছ থেকে যাকাত উত্তোলন করা হলো না।

^{৫১} সুনান আবু দাউদ ১৫৬৭। এটা নাবী ﷺ এর যাকাতের দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ। ইয়াম আলবানী সহীহ বলেছেন, ইরওয়া নং ৭৯২। [সহীহল বুখারী, খা. ১৪৫০-১৪৫১ দুই হাদীসের অংশ থেকেও প্রমাণিত।-সম্পাদক]



الباب الخامس: في زكاة الفطر، ويقال لها: صدقة الفطر

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : যাকাতুল ফিতর: যাকে বলা হয় সাদাকাতুল ফিতর

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

এ নামে নামকরণ করা হয়েছে এজন্য যে, রমাযান মাস শেষ হলে এটা ওয়াজিব হয়। এটা সম্পদের সাথে সম্পৃক্ষ নয় বরং দায়িত্বের সাথে সম্পৃক্ষ। এটা আত্মা ও শরীরের যাকাত।

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: فِي حَكْمِهَا وَدَلِيلِ ذَلِكَ

প্রথম মাসআলা : সাদাকাতুল ফিতরের বিধান ও প্রমাণ

প্রত্যেক মুসলিমের উপর যাকাতুল ফিতর ওয়াজিব। ইবনু উমার رض হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِدْقَةً الْفِطْرِ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ
وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ،

“প্রত্যেক গোলাম, স্বাধীন, পুরুষ, নারী, ছেটো, বড়ো সকল মুসলিমের উপর আল্লাহর রসূল
ﷺ রমাযানের শেষে সাদাকাতুল ফিতর হিসেবে এক সা’ পরিমাণ খেজুর অথবা এক সা’
পরিমাণ যব, আদায় করা ফরয করেছেন।”^{৫১}

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: شُرُوطُهَا وَعَلَى مَنْ تُجْبَ

দ্বিতীয় মাসআলা: শর্তসমূহ এবং যাদের উপর ওয়াজিব

বড়ো-ছেটো প্রত্যেক মুসলিম নারী, পুরুষ, স্বাধীন ও দাসের উপর সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব।
পূর্বে বর্ণিত ইবনু উমারের হাদীস।

^{৫১} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীল বুখারী, হা. ১৫০৩; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ৯৮৪।

গর্ভস্থ সন্তানের যখন রুহ ফুকে দেওয়া হয় তখনও তার পক্ষ থেকে আদায় করা মুণ্ডাহাব। অর্থাৎ এ সময় তার চার মাস হয়ে যায়। সালাফগণ গর্ভস্থ সন্তানের পক্ষ থেকে সদাকাতুল ফিতর আদায় করতেন। যেমনটি উসমান ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যক্তি নিজে এবং স্ত্রী কিংবা নিকটাত্তীয়দের মধ্য থেকে যাদের ভরণপোষণ দেয়, তাদের পক্ষ থেকে তার উপর এটি আদায় করা ওয়াজিব। অনুরূপভাবে দাসের পক্ষ থেকেও আদায় করতে হবে। কারণ এটা তারে মনিবের উপর ওয়াজিব। নাবী বলেছেন:

نَسِّـ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ

“সদাকাতুল ফিতর ছাড়া দাসের উপর আর কোনো যাকাত নেই।”^{৪০৩}

এটা তার উপরই ওয়াজিব হবে, যার নিকট তার এবং তার পরিবারের সৈদের দিন-রাতের জন্য যথেষ্ট খাবার এবং মৌলিক চাহিদা মেটানোর মতো সামর্থ্য থাকার পরও অতিরিক্ত কিছু থাকবে।

ফিতরা দুইটি শর্ত সাপেক্ষে ওয়াজিব:

১. ইসলাম: মুসলিম হওয়া। কোনো কাফেরের উপর তা ওয়াজিব নয়।
২. তার এবং তার পরিবারের সৈদের দিন ও রাতের জন্য যথেষ্ট খাবার এবং মৌলিক চাহিদা মেটানোর মতো সামর্থ্য থাকার পরও অতিরিক্ত কিছু থাকা।

الْمَسَأَةُ التَّالِيَةُ فِي حِكْمَةِ وِجْهِهَا

তৃতীয় মাসআলা: ওয়াজিব করণের তাৎপর্য

যাকাতুল ফিতর ওয়াজিব করণের বেশ কিছু হিকমাহ রয়েছে:

১. অশ্বাল কথাবার্তা এবং বেহদা কাজে লিপ্ত হওয়ার দরুন রোজাদার ব্যক্তির যে ভুল-ক্রটি হয়েছে, তা থেকে তাকে পবিত্রকরণ।
২. সৈদের দিন ফকির ও মিসকিনদেরকে কারো কাছে হাত পাতা থেকে বিরত রাখা এবং তাদের জন্য আনন্দ-উৎসুকের ব্যবস্থা করা; যাতে এই দিনটি সকল শ্রেণির মানুষের জন্য আনন্দের কারণ হতে পারে। ইবনু আবাস এর হাদিস-

قَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ الْلَّغْوِ وَالرَّفْثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

‘আল্লাহর রসূল ﷺ যাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন অশ্বীল কথাবার্তা এবং বেহুদা কথা থেকে রোজাদারের পবিত্রতা এবং মিসকিনদের খাবার স্বরূপ।’^{৫০৪}

৩. এতে পূর্ণ রমায়ান মাসের সিয়াম পালন, তারাবীহ ও এই বরকতময় মাসে সাধ্যানুযায়ী সৎ আমল করার মাধ্যমে বান্দার উপর আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়।

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: مَقْدَارُ الْوَاجِبِ، وَمِمَّ يَخْرُجُ؟

চতুর্থ মাসআলা: ওয়াজিবের পরিমাণ ও কী দিয়ে আদায় করতে হবে?

যাকাতুল ফিতর প্রত্যেক দেশের প্রধান খাদ্যব্যের এক সা' দিয়ে আদায় করা ওয়াজিব। সেটা গম, ঘব, খেজুর, কিশমিশ, পনীর, চাল ও ভুট্টা ইত্যাদি দিয়ে হতে পারে। এটি নাবী ﷺ থেকে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন পূর্বে বর্ণিত ইবনু উমার رض এর হাদীস।

একটি সমাজ তাদের সম্পূর্ণ ফিতরা একজন ব্যক্তিকে প্রদান করতে পারবে। অনুরূপ একজন লোক তার ফিতরা কোনো একটি সমাজকে বা গোষ্ঠিকে প্রদান করতে পারবে। এটা বৈধ।

খাদ্যের মূল্য দিয়ে ফিতরা আদায় করলে তা যথেষ্ট হবে না। কেননা এটি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নির্দেশ এবং তাঁর সাহাবীদের আমলের পরিপন্থী। তাঁরা এক সা' খাদ্যব্য দিয়েই ফিতরা আদায় করতেন। কারণ যাকাতুল ফিতর এমন একটি ইবাদত যা একটি নির্দিষ্ট বস্তু দ্বারা আদায় করা ফরয; আর তা হচ্ছে খাদ্যব্য। সুতরাং এটা ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে আদায় করলে তা যথেষ্ট হবে না।

المَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: فِي وَقْتٍ وَجْهَهَا وَإِخْرَاجِهَا

পঞ্চম মাসআলা: ওয়াজিব এবং আদায় করার সময়

ঈদের রাতে সূর্য অন্ত যাওয়ার মধ্য দিয়ে যাকাতুল ফিতর আদায় করার ওয়াজিবের হকুম শুরু হয়। কারণ তখন রমাযানের পরিসমাপ্তি ঘটে। ফিতরা আদায় করার দুটি সময় রয়েছে। একটি ফয়লতপূর্ণ সময়, আরেকটি বৈধ সময়।

ফয়লতপূর্ণ সময়: ঈদের দিন ফজর উদিত হওয়ার পর থেকে ঈদের সলাত আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত। ইবনু উমার رض এর হাদীস-

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ بِرَكَاتِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

“নাবী ﷺ ঈদের সলাতে বের হওয়ার আগেই যাকাতুল ফিতর আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।”^{৫০৫}

বৈধ সময়: এই সময়টি ঈদের একদিন বা দুইদিন আগে। ইবনু উমার رض এবং অন্যান্যরা এরূপ করতেন। ঈদের সলাতের পর ফিতরা আদায় করা জায়ে হবে না। যদি কেউ তা করে তাহলে সেটা সাধারণ সাদকা হিসেবে গণ্য হবে এবং পরে আদায় করার ফলে তাকে গুনাহগার হতে হবে। নাবী ﷺ বলেছেন:

مَنْ أَذَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَذَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

“সলাতের আগে আদায় করলে তা যাকাতুল ফিতর হিসেবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি সলাতের পরে আদায় করবে তারটা সাধারণ সাদকা হিসেবে গণ্য হবে।”^{৫০৬}

^{৫০৫} সহীফ্স বুখারী, খ. ১৫০৯

^{৫০৬} আবু দাউদ ১৬০৯।



الباب السادس : في أهل الزكاة ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : যাকাত গ্রহীতা

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: مَنْ هُمْ أَهْلُ الزَّكَاةِ؟ وَدَلِيلُ ذَلِكِ প্রথম মাসআলা: যাকাত গ্রহীতা কারা? এর দলীল

যারা যাকাতের হকদার তারা আহলুয় যাকাত। তারা আট শ্রেণির লোক। নিম্নোক্ত আয়তে আল্লাহ তা'আলা তাদের বিষয়টি নিয়ে এসেছেন। তিনি বলেছেন,

فَإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِبِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“এই সাদাকাণ্ডলো তো ফকীর মিস্কিনদের জন্য, এতে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করার অভিপ্রায় হয় তাদের জন্য, দাস-দাসীর জন্য, খণ্ডস্তদের জন্য, যারা আল্লাহর রাখ্যায় আছে তাদের জন্য ও মুসাফিরদের জন্য। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। আর আল্লাহ মহাঙ্গানী ও প্রজ্ঞাময়।” [সূরা তাওবাহ : ৬০]

এই শ্রেণিগুলোকে নিম্নে আরও স্পষ্ট করা হয়েছে:-

১. এটি **الفقير** শব্দের বহুবচন। অর্থাৎ যার নিজের এবং পরিবারের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের চাহিদা মেটানোর সামর্থ্য নেই। তার হয়তো কিছুই নেই অথবা চাহিদার অর্ধেকের চেয়েও কম আছে। এ ধরনের লোকদেরকে তত্ত্বকু যাকাত দেওয়া হবে যাতে তাদের এক বছর চলে যায়।

২. **مساكين**। এক বচনে। অর্থাৎ যার কাছে প্রয়োজনের অর্ধেক বা তার বেশি থাকবে। যেমন কারো নিকট একশত টাকা আছে কিন্তু তার প্রয়োজন দুইশত টাকা। এক্ষেত্রে এক বছর পূরণ করতে যত্তুকু লাগবে তাকে তত্ত্বকু যাকাত প্রদান করা হবে।

৩. **العاملون**। অর্থাৎ ইমাম যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্যে যাকে প্রেরণ করবে। ইমাম তাকে আসা-যাওয়ার খরচ প্রদান করবে, যদিও সে ধনী হয়। কারণ এই কর্ম এই কাজের জন্য নিজেকে সব কাজ থেকে বিরত রেখেছে। আর যারা তা আদায় করে, লেখালেখি করে, পাহারা দেয় এবং গ্রহীতাদেরকে বন্টন করার কাজে নিয়োজিত থাকে, তাদেরকেও আমিল বলা হয়।

৮. المُؤْلِفُ فَلُوْهْ: ঐসমস্ত লোক যাদেরকে যাকাত দেওয়া হবে:

- ইসলামের প্রতি ভালোবাসা রয়েছে, যদিও তারা কাফের হয়।
- অথবা ইমানকে মজবুত করার জন্য, যদি তারা দুর্বল ইমানের অধিকারী হয় এবং ইবাদতে উদাসীন হয়।
- অথবা আতীয়-স্বজনদের ইসলামের প্রতি উদ্বৃক্ষ করার জন্য।
- অথবা তাদের সহায়তা লাভ কিংবা অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার জন্য।

৫. الرِّقَابُ এক বচনে হবে,। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিম দাস-দাসী, যাকে যাকাতের অর্থ থেকে ক্রয় করে আজাদ করা হবে। অথবা চুক্তিকৃত (অর্থের) দাস, যাকে যাকাত দিয়ে তার চুক্তির অংশ প্ররূপ করা হবে যাতে সে স্বাধীন ও স্বনির্ভর হয়ে সমাজের একটি উপকারী অংশ হতে পারে এবং পূর্ণাঙ্গরূপে আল্লাহর ইবাদতে মনোনিবেশ করতে পারে। অনুরূপভাবে মুসলিম বন্দীকেও যাকাতের অর্থ দিয়ে শক্তির হাত থেকে মুক্ত করতে হবে।

৬. الغَارِمُ এক বচনে যে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্য না হয়ে ঋণ গ্রহণ করেছে। চাই তা নিজের জন্য বৈধ কোনো কাজে হোক বা অন্যের জন্য হোক। যেমন নিকটাতীয়দের মাঝে মীমাংসা করতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হওয়া। এক্ষত্রে তাকে সেই পরিমাণ সম্পদ যাকাত দেওয়া যাবে যা দ্বারা সে তার ঋণ পরিশোধ করতে পারে। আর কেউ যদি মানুষের মাঝে মীমাংসা করার জন্য ঋণ গ্রহণ করে, তবে সে স্বচ্ছল হলেও তাকে যাকাত দেওয়া হবে।

৭. سَبِيلُ اللَّهِ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বেচ্ছাসেবক হয়ে যুক্ত করেন এবং বাইতুল মাল থেকে তাদের জন্য কোনো বেতনের ব্যবস্থা থাকে না। তারা ধনী হোক কিংবা গরীব, তাদেরকে যাকাত দেওয়া হবে।

৮. مُسَافِرُ بْنُ السَّبِيلِ। যে নিজ শহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং তার শহরে পৌঁছাতে কিছু সম্পদের প্রয়োজন, যদি সে কারো থেকে ঋণ না পায়।

المَسَأَةُ الثَّانِيَةُ: فِي حَدِ الظِّينِ لَا تُدْفَعُ لِهِمُ الزَّكَاةُ

দ্বিতীয় মাসআলা: যাদেরকে যাকাত দেওয়া হবে না

যে শ্রেণির ব্যক্তিদেরকে যাকাত দেওয়া বৈধ নয়:

১. ধনী, বিস্তশালী ও উপার্জনে সক্ষম ব্যক্তি: নাবী ﷺ বলেছেন:

لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِفَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ

“যাকাতে ধনীদের কোনো অংশ নাই, বিস্তুরণ ও উপর্জনকারীর জন্যও নেই।”^{৫০৭} কিন্তু যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারীকে এবং ঝণগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রদান করা যাবে, যদিও তারা ধনী হয়। উপর্জন করতে সক্ষম ব্যক্তি যদি শারঙ্গ জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে বের হয় আর তার নিকট কোনো সম্পদ না থাকে, তখন তাকে যাকাত দেওয়া যাবে। কারণ জ্ঞান অঙ্গের কারী আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে থাকে। অন্যদিকে উপর্জন করতে সক্ষম ব্যক্তি যদি নফল ইবাদতের উদ্দেশ্যে সব কাজ পরিত্যাগ করে তবে তাকে যাকাত দেওয়া যাবে না। কেননা নফল ইবাদতের উপকার শুধুমাত্র বান্দার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু ইলমের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন।

২. পূর্বপুরুষ, উত্তরপুরুষ এবং স্ত্রী; অর্থাৎ যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব যাকাতদাতার উপর থাকে, তাদেরকে যাকাতের মাল প্রদান করা যাবে না। সুতরাং কোনো মুসলিম ব্যক্তির উপর যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব রয়েছে, তাদের যাকাতের মাল প্রদান করা যাবে না। যেমন- বাবা-মা, দাদা-দাদি, সন্তানগণ ও সন্তানের সন্তানগণ। কেননা এ শ্রেণির লোকদেরকে যাকাত দেওয়ার ফলে তাদের আর ওয়াজিব ভরণ-পোষণের দরকার হয় না, ব্যক্তির উপরও সেই দায়িত্বটা আর থাকে না। ঘুরেফিরে ব্যক্তি নিজেই এর ফল ভোগ করে। যেন সে নিজেই নিজেকে যাকাত দিলো।

৩. অতরে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা নেই এমন কাফেরদেকে যাকাতের মাল প্রদান করা যাবে না। নাবী ﷺ বলেছেন:

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرْدَ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

“যাকাত তাদের ধনীদের থেকে উত্তোলন করে গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হবে।”^{৫০৮} অর্থাৎ মুসলিমদের মধ্য হতে যারা ধনী এবং দরিদ্র, অন্য কেউ নয়। কেননা যাকাতের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো মুসলিমদের মাঝে যারা দরিদ্র তাদের অভাবমুক্ত করা এবং মুসলিম সমাজে প্রত্যেকের মাঝে আত্মত্ব ও ভালোবাসার বন্ধন অটুট রাখা। এটা কাফেরদের সাথে জায়েয নেই।

৪. নাবী ﷺ এর পরিবার: নাবী ﷺ এর পরিবারের মর্যাদা ও সম্মানার্থে যাকাতের মাল তাদের জন্য বৈধ নয়। এ কারণে নাবী ﷺ বলেছেন:

لَا تَحْلِ لِلْمُحَمَّدِ، إِنَّمَا هِيَ أُوسَاطُ النَّاسِ

“মুহাম্মদ ﷺ এর পরিবারের জন্য যাকাত নেওয়া বৈধ নয়। কারণ এতো মানুষের ময়লা।”^{৫০৯} নাবী ﷺ এর পরিবার বলতে বানু হাশেম, বানু মুত্তালিব। বলা হয়ে থাকে, শুধু বানু হাশেম। আর এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত। তাই বানু মুত্তালিব গোত্রে যাকাত প্রদান করা বৈধ। কারণ তারা মুহাম্মদ ﷺ এর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়। আম আয়াতের ভিত্তিতে: إِنَّ الْمَرْقَبَةَ لِلْفَقَرَاءِ^{৫১০}

^{৫০৭} আহমাদ ৫/৩৬২; সুনান আবু দাউদ, হা. ১৬৩৩। ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহন নাসাই, হা. ২৪৩৫।

^{৫০৮} মুস্তাফাকুন আলাইহি: সহীছল বুখারী, হা. ১৩৯৫ ও সহীহ মুসলিম, হা. ১৯-(৩১)।

^{৫০৯} মুসলিম, হা. ফুআ. ১০৭২।

“নিশ্চয়ই সদাকা হচ্ছে ফকীরদের জন্য...।” [সুরা তাওবা : ৬০] এর মধ্যে বানু মুত্তালিবও রয়েছে।

৫. অনুরূপ নাবী  এর পরিবারের মুজদাস-দাসীদেরকেও যাকাতের মাল প্রদান করা যাবে না। একটি হাদীস রয়েছে:

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَمْحُلُ لَنَا، وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنفُسِهِمْ

“নিচয় সাদকা আমাদের জন্য হালাল নয়। আর কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত দাস-দাসী তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।”^{১১০}

মুক্ত দাস-দাসী।-তাদের যে হ্রস্ব, দাসীদেরও সেই হ্রস্ব। সুতরাং বানু হাশেম পরিবারের দাস-দাসীদের উপর যাকাত হারাম।

৬. দাস: দাসকে যাকাত দেওয়া যাবে না। কেননা দাসের সম্পদ মূলত মনিবের মালিকানাধীন। সুতরাং যদি দাসকে দেওয়া হয় তাহলে স্টো তার মনিবের অধীনে চলে যাবে। কারণ তার যাবতীয় ভরণ-পোষণের দায়িত্ব মনিবের। তবে মুকাতাব দাসের বিষয়টি ভিন্ন। তাকে ততটুকু পরিমাণ যাকাতের অর্থ দেওয়া হবে যা দিয়ে তার চুক্তিকৃত অর্থ পরিশোধ করতে পারবে। দাস যদি যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারী হয় তাহলে তা থেকে তাকে প্রদান করা যাবে। কারণ সে শ্রমিকের ন্যায়। আর দাস তার মনিবের অনুমতিতে পারিশ্রমিক নিতে পারবে।

সুতরাং যে ব্যক্তি জানবে যে, এই শ্রেণির ব্যক্তিদের যাকাত প্রদান করা জায়েয় নেই, কিন্তু তারপরও দিবে, সে গুনাহগার হবে।

المسألة الثالثة: هل يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة؟

**তৃতীয় মাসআলা: যাকাত বণ্টন করার সময় উল্লিখিত আট শ্রেণিকেই
একত্র করা কি শর্ত?**

বিশুদ্ধ মতে, যাকাত বণ্টন করার সময় উল্লিখিত আট শ্রেণিকে একত্রে অন্তর্ভুক্ত করা কি শর্ত নয়।
বরং আট শ্রেণির যে-কোনো একটিকে প্রদান করা যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿إِن تُبَدِّلُوا الصَّدَقَاتِ فَيُنِعِمُّا هُنَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾

“তোমরা যদি দান প্রকাশে করো, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি তা গোপনে করো এবং ফকীরকে দাও, তাহলে তাও তোমাদের জন্য উত্তম।” [সূরা বাকুরাহ : ২৭১]

^{१०} नवीद मुसलिम, श. २२९४, फुआ. १०४४।

নাবী ﷺ বলেছেন:

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرْدَ عَلَى فَقَرَائِبِهِمْ

“ধনীদের থেকে গ্রহণ করে গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হবে।”^{১১}

নাবী ﷺ কুবাইসাকে বলেছিলেন: **أَقْمِ عِنْدَنَا حَتَّىٰ تَأْتِيَ الصَّدَقَةُ، فَنَأْمِ لَكَ دِرْ**

“আমাদের নিকট সাদকার মাল উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের নিকটেই থাকো। অতঃপর আমরা তোমাকে তা নিতে বলব।”^{১২}

এই দলীল প্রমাণ করে যে, উল্লিখিত আয়াতের উদ্দেশ্য হলো যাকাতের হকদারদের বর্ণনা দেওয়া। সকল হকদারের মাঝে একইসাথে বন্টন করা উদ্দেশ্য নয়।

المسألة الرابعة: في نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر

চতুর্থ মাসআলা: যাকাত এক শহর থেকে আরেক শহরে স্থানান্তর করা

প্রয়োজনে যাকাত এক শহর থেকে আরেক শহরে স্থানান্তর করা জায়েয়। শহরটি নিকটে হোক বা দূরে। যেমন কোনো দূরবর্তী শহরে যদি অভাব-অন্টন দেখা দেয় অথবা সেখানে যদি যাকাত দাতার নিজ শহরের দরিদ্রদের মতো দূরবর্তী শহরে তার কোনো দরিদ্র নিকটাত্তীয় থাকে, তাহলে সে কল্যাণের উদ্দেশ্যে তার নিকটাত্তীয়দের প্রদান করতে পারবে। এতে সাদকাও প্রদান করা হবে, পাশাপাশি অতীয়তার সম্পর্কও বজায় থাকবে। যাকাত স্থানান্তর জায়েয় হওয়ার ব্যাপারে এই বজ্রব্যটিই অধিক বিশুদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা আমভাবেই বলেছেন:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ

“নিশ্চয়ই যাকাত ফকির ও মিসকিনদের জন্য।” [সূরা তাওবাহ : ৬০]

অর্থাৎ যে-কোনো স্থানের ফকির ও মিসকিনদের জন্য।

^{১১} মুস্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ১৩৯৫ ও সহীহ মুসলিম, হা. ১৯-(৩১)

^{১২} সহীহ মুসলিম, হা. ১০৪৪।



————— ♫ এতে ০৫টি অনুচ্ছেদ রয়েছে ♫ ———

প্রথম অনুচ্ছেদ : সিয়ামের প্রাথমিক আলোচনা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : যে সকল কারণে রোজা ভঙ্গ করা বৈধ ও
রোজাদারের রোজা ভঙ্গকারী বিষয়

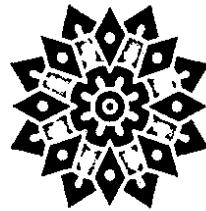
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : সিয়ামের মুস্তাহব (সুন্নাহ) ও মাকরহ বিষয়সমূহ

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : সিয়ামের কায়া, নফল

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : ইতিকাফ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft





الباب الأول: في مقدمات الصيام

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المسألة الأولى: تعريف الصيام، وبيان أركانه

প্রথম মাসআলা: সিয়ামের পরিচয় ও তার কর্কুনসমূহের বর্ণনা

১. সিয়ামের পরিচয়:

الصيام في اللغة: الامساكُ عن الشيء

শান্তিক অর্থ: কোনো কিছু থেকে বিরত থাকা।

وفي الشرع: الإمساك عن الأكل، والشرب، وسائر المفطرات، مع النية، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس.

পরিভাষায়: সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া এবং রোজাভঙ্গকারী সমস্ত বিষয় থেকে নিয়ন্ত্রের সাথে বিরুত থাকাকে সিয়াম বলে।

২. সিয়ামের কুকন: পারিভাষিক অর্থ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সিয়ামের দুটি মূল কুকন রয়েছে।

ପ୍ରଥମ: ସବହେ ସାଦେକ ଥେକେ ସର୍ବାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜା ଭଙ୍ଗକାରୀ ଜିନିସମହ ଥେକେ ବିରୁତ ଥାକା ।

এ কুকনের দলীলঃ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿فَالآنِ يَا شِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلْكُوْنُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾

“অতএব তোমরা (রমাযানের রাতেও) তাদের সাথে মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা অনুসন্ধান করো এবং প্রত্যুষে কালো সুতা হতে সাদা সুতা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা আহার ও পান করো।” [সূরা বাকুরাহ: ১৮৭]

আর নিয়তের দলীল: **بِيَاضِ النَّهَارِ وَبِغُصْنِ اللَّيْلِ** (বাল চিকিৎসা আলো)

আর নিয়তের দলীল: **سَوَادِ اللَّيْلِ وَبِضَاءِ النَّهَارِ** (রাতের অন্ধকার)

د্বিতীয়: নিয়ত করা: রোজাদার রোজা ভঙ্গকারী বিষয় থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদতের নিয়ত করবে। ইবাদতের নিয়তের মাধ্যমে উদ্দিষ্ট আমল অন্যান্য আমলসমূহ থেকে পৃথক হয়ে যাবে। আর নিয়তের মাধ্যমেই একটি ইবাদত অন্য ইবাদত থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। তাই রোজাদার এ নিয়তের দ্বারা রোজা রাখার ইচ্ছা পোষণ করবে। চাই তা রমাযানের হোক বা অন্য রোজা। এই রুকনের দলীল: আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

إِنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَاتِ، قَاتِلًا لِكُلِّ أُمْرٍ مَا نَوَى

“প্রত্যেক কাজ নিয়ত অনুযায়ী। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে।”^{৫১৩}

المَسَالَةُ الثَّانِيَةُ: حُكْمُ صِيَامِ رَمَضَانَ وَدَلِيلُ ذَلِكَ

দ্বিতীয় মাসআলা: রমাযানের সিয়ামের ভুক্তি ও তার দলীল

আল্লাহ আয়া ওয়া জাল্লা রমাযান মাসের সিয়াম ফরয করেছেন এবং তা ইসলামের পঞ্চ-স্তোত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ﴾

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো।” [সূরা বাকুরাহ: ১৮৩]

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهَدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلِيَصُمِّمْ﴾

“রমাযান মাস, যে মাসে বিশ্বমানবের জন্য পথ প্রদর্শন এবং সু-পথের উজ্জ্বল নির্দর্শন এবং হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসে (নিজ আবাসে) উপস্থিত থাকে সে যেন সিয়াম পালন করে।” [সূরা বাকুরাহ: ১৮৫]

* মুসলিম আলাইহি: সঠীছল বুখারী, ঘ. ১; সহীহ মুসলিম, ঘ. ১৯০৭

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার رض হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

بُنِيَّ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ تَحْمِسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

“ইসলাম পাঁচটি স্তোত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। ১. এ মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত সত্য কোনো ইলাহ নেই, এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রসূল। ২. সলাত কায়েম করা। ৩. যাকাত দেওয়া। ৪. রমায়ানের সিয়াম পালন করা। ৫. স্তোত্র হলে হাজ্জ পালন করা।”^{৫১৪}

أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ثَائِرُ الرَّأْسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخِيرِنِي مَاذَا قَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ الْخَمْسُ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا» فَقَالَ: أَخِيرِنِي مَاذَا قَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ؟ قَالَ: «صِيَامُ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا»

“তালহা ইবনে ওবাইদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন। এলোমেলো চুল বিশিষ্ট বেদুইন একজন ব্যক্তি নাবী ﷺ এর কাছে আসল। অতঃপর বলল: হে আল্লাহর রসূল! আমাকে সংবাদ দিন যে, কোন সিয়াম আল্লাহ আমার উপর ফরয করেছেন? তিনি ﷺ বললেন: রমায়ান মাসের সিয়াম। সে বলল: আমার উপরে অন্য কোনো সিয়াম কি ফরয করা হয়েছে? তিনি ﷺ বললেন: না, তুমি নফল হিসেবে অন্যান্য রোজা রাখতে পারো।”^{৫১৫}

এ ব্যাপারে ইজমাও সাব্যস্ত হয়েছে যে, রমায়ানের সিয়াম ফরয। এটি ইসলামের আবশ্যিকীয় জ্ঞাতব্য কুকনসমূহের মধ্যকার একটি। আর এর অস্বীকারকারী কাফের ও মুরতাদ।

সুতরাং রমায়ানের সিয়াম ফরয কুরআন, হাদীস ও ইজমার মাধ্যমে সাব্যস্ত হলো। আর যে ব্যক্তি তা অস্বীকারকার করবে, সে মুসলমানদের ঐকমত্যে কাফের।

المَسَأَةُ الثَّالِثَةُ: أَقْسَامُ الصِّيَامِ তৃতীয় মাসআলা: সিয়ামের প্রকারভেদ

সিয়াম প্রথমত দুই প্রকার: ওয়াজিব ও নফল।

ওয়াজিব সিয়াম তিন প্রকার:

১. রমায়ানের সিয়াম;
২. কাফ্ফারার সিয়াম;
৩. নযর বা মানতের সিয়াম।

^{৫১৪} মুস্তাফাকুন বালাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৮; সহীহ মুসলিম, হা. ফুজা. ১৬ ইবনু উমার رض এর হাদীস।

^{৫১৫} মুস্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৪৬; সহীহ মুসলিম, হা. ১১; অর্থগত বর্ণনা।

এখানে রমাযানের সিয়াম ও নফল সিয়াম সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। আর অন্যান্য সিয়ামের আলোচনা যথাস্থানে আসবে, ইনশা-আল্লাহ।

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: فَضْلُ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَالْحِكْمَةُ مِنْ مُشْرُوعِيَّةِ صِوْمَه

চতুর্থ মাসআলা: রমাযান মাসের সিয়ামের ফযীলত এবং শরীয়ত সম্বত হওয়ার তাৎপর্য

১. রমাযান মাসের সিয়ামের ফযীলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفْرَانَهُ مَا تَقدَّمَ مِنْ ذَنْبٍ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفْرَانَهُ مَا تَقدَّمَ مِنْ ذَنْبٍ»

“আবু হুরায়রা رضي الله عنه নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি رضي الله عنه বলেন: যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় লাইলাতুল কুদরে রাত জেগে ইবাদত করবে, তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করা হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমাযানের সিয়াম পালন করবে, তারও অতীতের সকল গুনাহ ক্ষমা করা হবে।”^{১১৬}

وعنه رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: الصَّلَواتُ لِلْخَمْسِ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفَّرَاتٌ مَا بَيْتَهُنَّ إِذَا اجْتَبَبُ الْكَبَائِرَ.

“আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকেই বর্ণিত। নিশ্চয়ই নাবী رضي الله عنه বলেন: পাঁচ ওয়াক্ত সলাত, এক জুমুআহ থেকে অন্য জুমুআহ, এক রমাযান থেকে আরেক রমাযান এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের সকল গুনাহের জন্য কাফফারা স্বরূপ, যদি সে কাবীরাহ গুনাহ থেকে বিরত থাকে।”^{১১৭}

রমাযান মাসে সিয়ামের ফযীলত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তার কিছু এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও রমাযানে সিয়ামের অনেক ফযীলত রয়েছে।

২. রমাযান মাসের সিয়াম শরীয়ত সম্বত হওয়ার হিকমাহ: আল্লাহ রমাযানের সিয়ামকে বহু হিকমাহ ও উপকারের কারণে শরীয়ত সম্বত করেছেন। তন্মধ্যে:

ক. নফসকে পবিত্র ও পরিশুद্ধ করা এবং তাকে খারাপ চরিত্র থেকে মুক্ত করা। সওম মানুষের শরীরের মধ্যকার শয়তানের চলার পথকে সংকীর্ণ করে দেয়।

^{১১৬} মুস্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, ঘ. ১৯০১; সহীহ মুসলিম, ঘ. ৭৬০।

^{১১৭} সহীহ মুসলিম, ঘ. ২৩৩।

খ. সওম দুনিয়া এবং তার লোভ-লালসা থেকে বিরত রাখে এবং পরকাল ও তার নেয়ামতের প্রতি আগ্রহী করে তোলে।

গ. সওম মিসকিনদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে শেখায় এবং তাদের কষ্ট অনুভব করতে শেখায়। কারণ রোজাদার ক্ষুধা ও পিপাসার স্বাদ আস্বাদন করে থাকে।

এছাড়া আরও অনেক তাৎপর্য ও উপকারিতা রয়েছে।

المسألة الخامسة: شروط وجوب صيام رمضان

পঞ্চম মাসআলা: রমাযানের সিয়াম ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ

নিম্নের শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকলে রমাযানের সিয়াম রাখা আবশ্যিক:

১. ইসলাম গ্রহণ করা: সুতরাং কাফেরের উপর সিয়াম আবশ্যিক নয় এবং তার পক্ষ থেকে সিয়াম বিশুद্ধও হবে না। কেননা সিয়াম একটি ইবাদত। আর কোনো ইবাদত কাফেরের পক্ষ হতে বিশুদ্ধ হয় না। সুতরাং ঐ কাফের ইসলাম গ্রহণ করলে তার ছুটে যাওয়া রোজাগুলো তার উপর কায় করা আবশ্যিক নয়।

২. বালেগ হওয়া: সুতরাং যে দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার সীমানায় পৌছেনি তার উপর সিয়াম আবশ্যিক নয়। নাবী ﷺ বলেন: رُفِعَ الْقَلْمَنْ عَنْ

“তিন শ্রেণির ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।”^{৫১৮}

তাদের মধ্যে হতে এক শ্রেণি হচ্ছে বালক, যতক্ষণ না সে যুবক হয়। কিন্তু যদি কোনো বালক বালেগ হওয়ার পূর্বে রোজা রাখে তাহলে তার রোজাও বিশুদ্ধ হবে, যদি সে ভালো-মন্দের মাঝে পার্থক্য করতে পারে। আর তার অভিভাবকের উপর তাকে রোজা রাখার নির্দেশ দেওয়া আবশ্যিক, যাতে সে এর প্রতি অভ্যন্ত হয়।

৩. জ্ঞানবান হওয়া: তাই পাগল ও নির্বাধের উপর রোজা আবশ্যিক নয়। যেমন নাবী ﷺ বলেছেন: رُفِعَ الْقَلْمَنْ عَنْ “তিন শ্রেণির ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।”^{৫১৯} তাদের মধ্যে পাগলও রয়েছে, যতক্ষণ না তার জ্ঞান ফিরে পায়।

৪. সুস্থতা: সুতরাং যে ব্যক্তি এতটা অসুস্থ যে তার রোজা রাখার সক্ষমতা নেই, তার উপর রোজা আবশ্যিক নয়। তবে যদি সে রোজা রাখে তাহলে তার রোজা বিশুদ্ধ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

^{৫১৮} আহমাদ ৬/১০০; সুনান আবু দাউদ ৪/৫৫৮; ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, ইরওয়া হা. ২৯৭।

^{৫১৯} আহমাদ ৬/১০০; সুনান আবু দাউদ ৪/৫৫৮; ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, ইরওয়া হা. ২৯৭।

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّهُ مِنْ أَيَّامِ أُخْرٍ﴾

“যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা মুসাফির, সে অপর কোনো দিন হতে গণনা করবে।” [সূরা বাক্সারাহ: ১৮৫]

যদি তার অসুস্থতা দূর হয়ে যায় তাহলে যে সিয়ামগুলো ছুটেছে সেগুলো কায়া করা আবশ্যিক।

৫. মুকীম হওয়া: সুতরাং মুসাফিরের উপর সিয়াম আবশ্যিক নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّهُ مِنْ أَيَّامِ أُخْرٍ﴾

“যে অসুস্থ অথবা মুসাফির, তার জন্য অন্য কোনো দিন হতে গণনা করবে।” [সূরা বাক্সারাহ: ১৮৫]

যদি মুসাফির রোজা রাখে, তাহলে তার সিয়াম বিশুद্ধ হবে। আর যে রোজাগুলো ছুটে যাবে, সেগুলো কায়া করা আবশ্যিক।

৬. হায়েয (ঝর্তুন্নাব) ও নেফাস থেকে মুক্ত হওয়া: তাই যে হায়েয ও নেফাস অবস্থায় আছে এমন স্থিলোকের উপর সিয়াম আবশ্যিক নয়। বরং তাদের উপরে রোজা রাখা হারাম। নাবী ﷺ বলেছেন:

(أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصْلِّ وَلَمْ تَصُمْ، فَذَلِكَ نَقْصَانٌ بِنِيهَا.)

“আর হায়েয অবস্থায় তারা কি সলাত ও সিয়াম হতে বিরত থাকে না? এটাই হচ্ছে তাদের দ্বিনের কমতি।”^{৫১০}

কিন্তু তাদের উপরে ছুটে যাওয়া রোজাগুলো কায়া করা আবশ্যিক। যেমন আয়িশাহ رض বলেন,
كَانَ يُصْبِيْنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمِرُ بِقَضَاء الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمِرُ بِقَضَاء الصَّلَاةِ

“আমাদের এক্সেপ্ট হতো। তখন আমাদেরকে শুধু সওম কায়া করার নির্দেশ দেওয়া হতো, সলাত কায়া করার নির্দেশ দেওয়া হতো না।”^{৫১১}

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: ثَبُوتُ دُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَانْقِضَائِهِ

ষষ্ঠ মাসআল্লাঃ: রমায়ান মাসের শুরু ও শেষ যেভাবে সাব্যস্ত হবে

রমায়ান মাসের সূচনা সাব্যস্ত হবে নিজে বা অন্যের মাধ্যমে কিংবা কোনো সংবাদের মাধ্যমে নৃতন চাঁদ দেখার দ্বারা। যদি একজন ন্যায়পরায়ণ মুসলিম নৃতন চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তার এই সাক্ষ্যের মাধ্যমে রমায়ান মাসের সূচনা সাব্যস্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَقَمْ شَهَدَ مِنْكُمُ الشَّهَرَ فَلِيَصُنْهُ﴾

^{৫১০} সহীল বুখারী, ঘ. ৩০৪।

^{৫১১} সহীহ মুসলিম, ঘ. ৬৫০, ফুআ. ২৩৫।

“অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসে (নিজ আবাসে) উপস্থিত থাকে সে যেন সিয়াম পালন করে।” [সুরা বাকুরাহ: ১৮৫]

নাবী ﷺ বলেছেন: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوهُ।

“যখন তোমরা চাঁদ দেখবে, তখন সিয়াম রাখবে।”^{৫২২}

ইবনু উমার رض এর বর্ণিত হাদীস:

أَخْبَرَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَقْبَةِ رَمَضَانَ فَصَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ

“আমি নাবী ﷺ কে রমায়ারেন চাঁদ দেখার সংবাদ দিলাম। অতঃপর তিনি নিজে সওম রাখলেন এবং মানুষদের সওম রাখার নির্দেশ দিলেন।”^{৫২৩}

যদি নৃতন চাঁদ দেখা না যায় বা কোনো ন্যায়পরায়ণ মুসলিম চাঁদ দেখার সাক্ষ্য না দেয়, তাহলে শাবান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করা আবশ্যিক। এ দুটি বিষয় ছাড়া মাসের মধ্যে প্রবেশ সাব্যস্ত হবে না। ১. নৃতন চাঁদ দেখা বা ২. শাবান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করা। নাবী ﷺ বলেছেন:

صُومُوا لِرُؤْتِيهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْتِيهِ، فَإِنْ غَبَّيْ "عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثَةَ

“তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম শুরু করবে এবং চাঁদ দেখে সিয়াম ভাঙবে। আকাশ যদি মেঘে ঢাকা থাকে তাহলে শাবানের গণনা ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।”^{৫২৫}

শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা গেলে রমায়ান মাসের সমাপ্তি সাব্যস্ত হবে। যদি দুইজন ন্যায়পরায়ণ মুসলিম নৃতন চাঁদ না দেখার সাক্ষ্য দেয়, তাহলে রমায়ান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করা আবশ্যিক।

المسألة السابعة: وقت النية في الصوم وحكمها

সপ্তম মাসআলা: সওমের নিয়তের সময় এবং নিয়তের হ্রকুম

রোজাদারের উপর সিয়ামের নিয়ত করা আবশ্যিক। এটি তার অন্যতম একটি হ্রকুন। নাবী ﷺ বলেছেন: إِنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرٍ مَا تَوَرَّى:

“প্রত্যেক কাজ (প্রাপ্য হবে) নিয়ত অনুযায়ী। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে।”^{৫২৬}

^{৫২২} মুফাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ১৯০০; সহীহ মুসলিম, হা. ১০৮০।

^{৫২৩} সুনান আবু দাউদ, হা. ২৩৪২; হাকিম তার মুসতাদরাকে সহীহ বলেছেন, ১/৪২৩।

^{৫২৪} কিছু বর্ণনায় ত্রুটি আর কিছু বর্ণনায় ত্রুটি রয়েছে। অর্থ গোপন হয়ে যাওয়, প্রকাশিত না হওয়া।

^{৫২৫} মুফাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ১৯০৯; সহীহ মুসলিম, হা. ১০৮১।

^{৫২৬} মুফাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ১; সহীহ মুসলিম, হা. ১৯০৭।

ওয়াজিব (ফরয) সিয়ামের ক্ষেত্রে সে রাতেই নিয়ত করবে, যদিও ফজরের এক মিনিট পূর্বে হয়। যেমন: রমাযানের সিয়াম, কাফফারার রোজা, মানতের রোজা ইত্যাদি। নাবী ﷺ বলেছেন:

مَنْ لَمْ يُبَيِّنِ الصَّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صَيَامَ لَهُ

“যে ব্যক্তি রাত থাকতে ফরয সিয়ামের নিয়ত করল না, তার সিয়াম হবে না।”^{৫২৭}

যে ব্যক্তি দিনের বেলায় রোজার নিয়ত করবে এবং যদি সে রাত্রে কোনো কিছু না খায়, তাহলে নফল রোজা ব্যতীত ফরয রোজা তার পক্ষ হতে যথেষ্ট হবে না। আর দিনের বেলায় নফল রোজার নিয়ত করলে রোজাটি বৈধ হবে, যদিও সে রাত্রে কোনো কিছু না খায় বা পান না করে। আয়িশাহ رض থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَأْتَ يَوْمَ فَقَالَ: مَنْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقُلْنَاهُ: لَا, قَالَ: «فَإِنِّي إِذْنَ صَادِمٍ»

“নাবী ﷺ একদিন ঘরে আসলেন। অতঃপর তিনি ﷺ বললেন: তোমাদের কাছে কি খাওয়ার মতো কিছু আছে? আমরা বললাম, না। তিনি ﷺ বললেন: তাহলে আমি সওম রাখলাম।”^{৫২৮} আর ফরয রোজার বেলায় দিনে নিয়ত করলে তা ধর্তব্য হবে না, বরং রাতেই নিয়ত করা আবশ্যিক। রমাযান মাসের শুরুতে পুরো মাসের জন্য একবার নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে। তবে প্রত্যেক দিন নিয়ত করা মুশাহাব।

^{৫২৭}তরিয়ী, হা. ৭৩০; নাসাই ২৩৩১; ইবনু মাজাহ, হা. ১৭০০; নাসাইর শব্দে। ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, তিরামিয়ী, হা. ৫৮৩।

^{৫২৮}সহীহ মুসলিম, হা. ১১৫৪।



الباب الثاني : في الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات الصائم দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: যে সকল কারণে রোজা ভঙ্গ বৈধ ও রোজাদারের রোজা ভঙ্গকারী বিষয়

এতে দুটি মাসআলা রয়েছে:

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: الأعذار المبيحة للفطر في رمضان

প্রথম মাসআলা: রমায়ানের সিয়াম ভঙ্গ করার বৈধ ওয়রসমূহ

নিম্নের ওয়রসমূহের কোনো একটি পাওয়া গেলে রমায়ানের সিয়াম না রাখা বৈধ:

প্রথম: অসুস্থতা ও বার্ধক্য: এমন অসুস্থ ব্যক্তি যে রোজা না রাখলে সুস্থ হওয়ার স্থাবনা আছে, তার জন্য রমায়ানে রোজা না রাখা বৈধ। যখন সে সুস্থ হয়ে যাবে, তখন তার উপর ছুটে যাওয়া রোজাগুলো কায়া করা আবশ্যিক হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَدَهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَ...﴾

“নির্দিষ্ট কয়েক দিন। যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা মুসাফির, তার জন্য অপর কোনো দিন হতে গণনা করবে।” [সূরা বাকুরাহ: ১৮৪]

তিনি আরও বলেন:

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ قَلِيلًا نَهْرَفْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَدَهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَ...﴾

“অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসে (নিজ আবাসে) উপস্থিত থাকে সে যেন সিয়াম পালন করে। যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা মুসাফির, তার জন্য অপর কোনো দিন হতে গণনা করবে।”

[সূরা বাকুরাহ: ১৮৫]

ঐ অসুস্থতার ক্ষেত্রে রোজা ভঙ্গ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যে অসুস্থতার কারণে অসুস্থ ব্যক্তির উপর রোজা রাখা কঠিন হয়। আর যে অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থ হওয়ার সভাবনা নেই বা যে ব্যক্তি ভবিষ্যতে রোজা রাখতে অক্ষম, যেমন- বয়ক্ষ ব্যক্তি; সে রোজা রাখবে না এবং তার উপর কায়া করাও আবশ্যিক নয়। বরং তার উপর ফিদইয়া আবশ্যিক। সে প্রত্যেক দিন একজন মিসকিনকে খাওয়াবে। কারণ মহামহিয়ান আল্লাহ খাদ্য খাওয়ানোকে সিয়ামের সমান করেছেন। যেহেতু সিয়াম ফরযের প্রাথমিক অবস্থায় সিয়াম রাখা, না হলে খাদ্য খাওয়ানো-এর মধ্যে স্বাধীনতা ছিল, তাই ওফরের সময় একে সমমান বা পরিবর্তিত হিসেবে করা হয়েছে।

ইমাম বুখারী رض বলেন, যে বয়ক্ষ ব্যক্তি রোজা রাখতে সক্ষম নয়, সে প্রত্যেক দিন একজন মিসকিনকে খাওয়াবে। আনাস رض যখন বৃক্ষ হয়ে গিয়েছিলেন, তখন তিনি এক বছর বা দুই বছর প্রত্যেক দিন একজন মিসকিনকে খাওয়াতেন। ইবনু আবুস হুসেন رض বলেন, যে সকল বয়ক্ষ পুরুষ বা মহিলা রোজা রাখতে সক্ষম নয়, তারা প্রত্যেক দিন একজন মিসকিনকে খাওয়াবে।^{১১}

অসুস্থতার কারণে কিংবা বয়ক্ষ হওয়ার কারণে যার অক্ষমতা দূর হওয়া স্তরে নয়, এমন ব্যক্তি প্রত্যেক দিন একজন মিসকিন ব্যক্তিকে আধা 'সা' গম অথবা খেজুর অথবা চাল বা ইত্যাদি যে-কোনো দেশীয় খাবার খেতে দিবে। এক 'সা'= ২.২৫ কেজি। তাই প্রত্যেক দিন ১.১২৫ কেজি পরিমাণ খাবার খেতে দিবে। আর কোনো অসুস্থ ব্যক্তি যদি রোজা রাখে, তার সিয়াম বিশুद্ধ হবে এবং তা তার জন্য যথেষ্ট হবে।

দ্বিতীয়: সফর: মুসাফির ব্যক্তির জন্য রমায়ানের সিয়াম ভঙ্গ করা বৈধ এবং পরবর্তীতে কায়া করা আবশ্যিক। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّهُ مِنْ أَيَّامِ أُخْرَ...﴾

“যে অসুস্থ অথবা মুসাফির, তার জন্য অপর কোনো দিন হতে গণনা করবে।” [সূরা বাকুরাহ: ১৮৪] তিনি বলেন:

﴿فَمَنْ شَهَدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ قَلِيلًا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّهُ مِنْ أَيَّامِ أُخْرَ...﴾

“অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসে (নিজ আবাসে) উপস্থিত থাকে সে যেন সিয়াম পালন করে। যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা মুসাফির, তার জন্য অপর কোনো দিন হতে গণনা করবে।” [সূরা বাকুরাহ: ১৮৫]

নাবী ﷺ কে সফরে সিয়াম রাখার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন:

إِنْ شِئْتَ فَصُنْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ.

“যদি তুমি চাও, তাহলে রোজা রাখো। আর চাইলে ছাড়তেও পারো।” [সহীল বুখারী, হা. ১৯৪৩]

^{১১} সহীল বুখারী, হা. ৪৫০৫।

তিনি **ﷺ** মক্কার পথে রমাযানের সিয়াম অবস্থায় যাত্রা করলেন। ‘কুদাইদ’ নামক স্থানে পৌছে তিনি রোজা ছেড়ে দিলেন। অতঃপর মানুষেরাও রোজা ছেড়ে দিল।^{৫০০}

যে পরিমাণ সফরে সলাত কসর করা বৈধ, সে পরিমাণ সফরে রোজা ভঙ্গ করাও বৈধ।^{৫০১} আর তা হচ্ছে প্রায় ৪৮ মাইল অর্থাৎ প্রায় ৮০ কিলোমিটার। বৈধ সফরের কারণে রমাযানের সিয়াম ভঙ্গ যাবে। আর সফরটি নাফরমানির সফর হয় কিংবা ‘রোজা পালন করবে না’ এজন্য হয়, তাহলে এই সফরে রোজা ভঙ্গ করা বৈধ নয়। যদি কোনো মুসাফির রোজা রাখে, তাহলে তার রোজা বিশুद্ধ বলে গণ্য হবে এবং তা তার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে। আনাস **رض** থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন:

(كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطَرِ، وَلَا الْمُفْطَرُ عَلَى الصَّائِمِ)

‘আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সফরে যেতাম। রোজাদার ব্যক্তি বেরোজাদারকে (যে সওম পালন করছে না) এবং বেরোজাদার ব্যক্তি রোজাদারকে দোষারোপ করত না।’^{৫০২}

তবে শর্ত হলো, সওমটা সফরে তার উপরে যেন কঠিন হয়ে না পড়ে। যদি তার উপরে কঠিন হয় কিংবা সে যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে রোজা ভঙ্গ করাই উত্তম। সে তখন ছাড়টাকে গ্রহণ করবে। কারণ নাবী **ﷺ** সফরে এক রোজাদার ব্যক্তিকে দেখলেন, যাকে কঠিন তাপের কারণে ছায়া প্রদান করা হচ্ছে। আর মানুষেরা তার পাশে ভিড় জমাচ্ছে। অতঃপর তিনি **ﷺ** বলেন:

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ .

“সফরে সওম পালন কোনো কল্যাণকর বিষয় নয়।”^{৫০৩}

তৃতীয়: ঝুতুশ্বাব ও নেফাস: যে মহিলার রমাযানে ঝুতুশ্বাব বা নেফাস আসবে, সে অবশ্যই রোজা ভঙ্গ করবে। এ অবস্থায় তার জন্য রোজা রাখা হারাম। যদি সে রোজা রাখে, তবুও বিশুদ্ধ হবে না। যেমন আবু সাইদ খুদরী **رض** থেকে বর্ণিত। নিশ্চয়ই নাবী **ﷺ** বলেছেন:

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تَصْلُّ وَلَمْ تَصْمِ؟ فَذَلِكَ مِنْ نُفْصَانِ دِينِهَا .

“আর হ্যায়ে অবস্থায় তারা কি সলাত ও সিয়াম হতে বিরত থাকে না? এটাই হচ্ছে তাদের দ্বীনের ক্রম।”^{৫০৪} আর তাদের উপরে রোজাগুলো কায়া করা আবশ্যিক। যেমন আয়িশাহ **رض** বলেছেন,

^{৫০০} সহীল বুখারী, ঘ. ৪৪৯১।

^{৫০১} দেবুন, মুগন্নী: ৩/৪৩।

^{৫০২} সহীল বুখারী, ঘ. ১৯৪৭।

^{৫০৩} সহীল বুখারী, ঘ. ১৯৪৬।

^{৫০৪} সহীল বুখারী, ঘ. ৩০৪।

كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

“আমাদের একুপ হতো। তখন আমাদেরকে শুধু সওম কায়া করার নির্দেশ দেওয়া হতো, সলাত কায়া করার নির্দেশ দেওয়া হতো না।”^{৫৩৫}

চতুর্থ: গর্ভধারণ ও দুঃখপান: যদি কোনো মহিলা গর্ভবতী কিংবা স্নন্যদানকারিণী হয় এবং সে নিজের বা তার সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা করে, তাহলে তার জন্য রোজা ভঙ্গ করা বৈধ। আনাস ~~কুরআন~~ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ~~কুরআন~~ বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ، وَسَطَرَ الصَّلَاةَ، وَعَنِ الْحَائِلِ أَوِ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصَّيَامَ.

“আল্লাহ তা'আলা মুসাফির লোকের সিয়াম ও সলাত অর্ধেক কমিয়ে দিয়েছেন। আর গর্ভবতী ও দুঃখদানকারিণী মহিলাদের সওম অথবা সিয়াম মাফ করে দিয়েছেন।”^{৫৩৬}

আর গর্ভবতী ও দুঃখদানকারিণী মহিলা ভাঙ্গা রোজার কায়া আদায় করবে, যদি তারা নিজেদের জীবনের উপর (ক্ষতির) ভয় করে। আর যদি গর্ভবতী মহিলা তার ভুগ্য বা গর্ভের শিশুর (ক্ষতির) প্রতি অথবা দুঃখদানকারিণী মহিলা তার শিশুর (ক্ষতির) প্রতি আশংকা করে, তাহলে প্রতিদিনের কায়া করার সাথে সাথে একজন মিসকিনকে খাদ্য খাওয়াবে। ইবনু আব্বাস ~~কুরআন~~ এর হাদীস।

(وَالْخَبْلَ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا)

“গর্ভবতী এবং দুঃখদানকারিণী সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা করলে তাদের জন্যও সওম ভঙ্গের অনুমতি আছে।”^{৫৩৭}

তাই বলা চলে রমাযানের সিয়াম ভঙ্গের কারণ চারটি: ১. সফর, ২. অসুস্থতা, ৩. হায়ে ও নিফাস এবং ৪. ক্ষতির আশঙ্কা। যেমন- গর্ভবতী, দুঃখদানকারি।

المَسَالَةُ الثَّانِيَةُ: مَفَطَرَاتُ الصَّائِمِ

দ্বিতীয় মাসআলা: রোজাদারের রোজা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

সেগুলো ঐ সকল বিষয় যেগুলো রোজাদারের রোজাকে নষ্ট ও ভঙ্গ করে দেয়। নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর কোনো একটির কারণে রোজাদারের রোজা ভঙ্গে যাবে।

প্রথম: ইচ্ছাকৃত খাওয়া অথবা পান করা: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

^{৫৩৫} সহীহ মুসলিম, হা. ৬৫০, ফুআ. ২৩৫।

^{৫৩৬} তিরমিয়ী, হা. ৭১৫ এবং তিনি হাসান বলেছেন; নাসাই ২/১০৩; ইবনু মাজাহ, হা. ১৬৬৭; ইমাম আলবানী হাসান বলেছেন, সহীহ নুনানুন নাসাই, হা. ২১৪৫।

^{৫৩৭} আবু দাউদ, হা. ২৩১৮, ২৩১৭; ইমাম আলবানী হাসান বলেছেন, ইরওয়া ৪/১৮, ২৫ এভাবে ইবনু উমার ~~কুরআন~~ থেকেও বর্ণনা রয়েছে।

﴿وَكُلُوا وَاشْرِبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَثِيلُ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيلِ...﴾
“প্রত্যুষে কালো সুতা হতে সাদা সুতা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা খাবার খাও ও পান করো। তারপর রাতের আগমন পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ করো।” [সূরা বাকুরাহ: ১৮৭]

আয়াতটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে, রোজাদারের জন্য সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খানা-পিনা বৈধ নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি ভুলে পানাহার করবে তার সিয়াম বিশুদ্ধ হবে। যখনই তার স্মরণে আসবে অথবা তাকে মনে করিয়ে দেওয়া হবে, সে পানাহার বর্জন করবে। নাবী ﷺ বলেন:

(مَنْ تَسْبِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ)

“সওম পালনকারী ভুলক্রমে যদি খাবার খায় বা পান করে ফেলে, তাহলে সে যেন তার সওম পুরা করে নেয়। কারণ আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।”^{৫৩৮}

আর নাকের ড্রপের মাধ্যমে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে। আর যে জিনিসগুলো খাওয়া ও পান করার পরিপূরক; যেমন স্যালাইন, তা পেট পর্যন্ত পৌছালেই রোজা ভঙ্গ হবে, যদিও তা মুখ দিয়ে না পৌছে অর্থাৎ খাওয়া না হয়।

দ্বিতীয়: সহবাস: সহবাসের মাধ্যমে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই কোনো রোজাদার সঙ্গম করলেই রোজা ভঙ্গে যাবে। তার উপর আবশ্যক তাওবা ও ইস্তিগফার করা এবং সহবাস করা রোজার দিনটির কায়া আদায় করা। আর সে এই কায়া আদায় করবে কাফফারার মাধ্যমে। সে একটি গোলাম আজাদ করবে। আর সক্ষম না হলে ধারাবাহিকভাবে দুই মাস রোজা রাখবে। আর সে এতেও সক্ষম না হলে ৬০ জন মিসকিনকে খাবার দিবে। আবু হুরায়রা رض এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

بَيْنَمَا تَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ كُنْتُ. قَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: وَقَعَتْ عَلَى امْرَأَيِّ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَحْجُدُ رَبَّهُ تُعْتَقُهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: هَلْ تَسْتَطِعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ، قَالَ: لَا، فَقَالَ: فَهَلْ تَحْجُدُ إِطْعَامَ سَتِينَ مِسْكِينًا. قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَمَا تَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرْقٍ فِيهَا نَمْ - وَالْعَرْقُ الْمَكْتُلُ - قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: خُذْهَا، فَتَصَدَّقُ بِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرِ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَأَبْيَهَا - يُرِيدُ الْحَرَثَيْنِ - أَهْلُ بَيْتِ أَفْقَرٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِيِّ، فَضَحِّكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ بَدَأَتْ أَيْبَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَطْعَمْهُ أَهْلَكَ.

^{৫৩৮} মুস্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ১৯৩৩; সহীহ মুসলিম, হা. ফুয়াদ আব্দুল বাকী ১১৫৫।

“আমোৱা আল্লাহৰ রসূল ﷺ-এৰ নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহৰ রসূল! আমি ধৰ্ম হয়ে গেছি। আল্লাহৰ রসূল ﷺ বললেন: তোমাৰ কী হয়েছে? সে বলল, আমি রোজা অবস্থায় আমাৰ স্তৰীৰ সাথে মিলিত হয়েছি। আল্লাহৰ রসূল ﷺ বললেন: কোনো ক্রীতদাস তুমি মুক্ত কৰতে পাৰবে কি? সে বলল, না। তিনি বললেন: তুমি কি একাধাৰে দুইমাস সওম পালন কৰতে পাৰবে? সে বলল, না। এৰপৰ তিনি বললেন: ষাটজন মিসকিন খাওয়াতে পাৰবে কি? সে বলল, না। রাবী বলেন, তখন নাবী ﷺ থেমে গোলেন, আমোৱা ও এই অবস্থায় ছিলাম। এ সময় নাবী ﷺ-এৰ কাছে এক ‘আৱাক পেশ কৰা হলো যাতে খেজুৰ ছিল। ‘আৱাক হলো ঝুড়ি। নাবী ﷺ বললেন: প্ৰশ্নকাৰী কোথায়? সে বলল, আমি। তিনি ﷺ বললেন: এগুলো নিয়ে সাদকা কৰে দাও। তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহৰ রসূল! আমাৰ চাইতেও বেশি অভাৱগ্রহণকে সাদকা কৰব? আল্লাহৰ শপথ, মদীনাৰ উভয় প্রান্তেৰ মধ্যে আমাৰ পৰিবাৱেৰ চেয়ে অভাৱগ্রহণ কেউ নেই। আল্লাহৰ রসূল ﷺ হেসে ওঠলেন এবং তাঁৰ দাঁত (আনইয়াব) দেখা গেল। অতঃপৰ তিনি ﷺ বললেন: এগুলো তোমাৰ পৰিবাৱকে খাওয়াও।”^{৫৩৯}

সহবাসেৰ আওতাভুক্ত বিষয়: ইচ্ছাকৃত মনী বেৱে কৰলে, সেটাও সহবাস এৱ আওতাভুক্ত হবে। যদি কোনো রোজাদার চুষ্ণন, স্পৰ্শকৰণ কিংবা হস্তমৈথুন বা অন্য কোনো উপায়ে বীৰ্যপাত কৰে, তাহলে তাৰ রোজা নষ্ট হয়ে যাবে। কাৱণ এগুলো কাম উভেজনাৰ সাথে কৰা হয়ে থাকে, যা রোজা ভেঙ্গে দেয়। তাৰ উপৰ কাফফাৱা ছাড়াই কায়া কৰা আবশ্যিক। কাৱণ কাফফাৱা শুধুমাত্ৰ সহবাসেৰ সাথেই আবশ্যিক এবং এব্যাপারে নিৰ্দিষ্ট দলীল রয়েছে।

কিন্তু যদি কোনো ঘুমন্ত ব্যক্তিৰ স্বপ্নদোষ হয় বা অসুস্থতাৰ কাৱণে কামভাৱ ছাড়াই বীৰ্যপাত হয়, তাহলে সিয়াম বতিল হবে না। কেননা এ ব্যাপারে বান্দাৱ কোনো স্বাধীনতা নেই।

তৃতীয়: ইচ্ছাকৃত বমি কৰা: ইচ্ছাকৃত পেটে চাপ প্ৰয়োগ কৰে মুখ দিয়ে খাদ্য ও পানীয় বেৱে কৰা। কিন্তু এমনিতেই যদি বমি হয় তাহলে তাৰ রোজার মধ্যে কোনো প্ৰভাৱ পড়বে না। কেননা নাবী ﷺ বলেছেন: *مَنْ ذَرَ عَهْدَ الْقَيْمِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلِيَقْضِي*

“যার (অনিচ্ছাকৃত) বমি হয়, তাকে কায়া কৰতে হবে না। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বমি কৰে, তাকে কায়া কৰতে হবে।”^{৫৪০}

চতুর্থ: শিঙা লাগানো: শিৱাৱ রক্ত ছাড়া চৰ্মেৰ রক্ত রেব কৰা। তাই রোজাদার শিঙা লাগালে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে। নাবী ﷺ বলেছেন: (أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَخْجُومُ)

“হিজামাকাৰী এবং যাকে হিজামা কৱানো হয়েছে, তাদেৱ উভয়েৰ সওম ভঙ্গ হয়েছে।”^{৫৪১}

^{৫৩৯} মুতাফাকুন আলাইহি: সহীল বুখারী, হা. ১৯৩৬; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১১১।

^{৫৪০} সুনান আবু দাউদ, হা. ২৩৭০; তিরমিয়ী, হা. ৭২০; ইবনু মাজাহ, হা. ১৬৭৬।

তেমনিভাবে যে শিঙা লাগায় তার রোজাও নষ্ট হয়ে যাবে। তবে যদি পৃথক যন্ত্রের সাহায্যে শিঙা লাগায় এবং তাতে রক্ত চোষার কোনো স্ফীতিনা না থাকে, তাহলে রোজা ভঙ্গ হবে না। আল্লাহ তা'আলাই সর্বজ্ঞ।

হিজামার আওতাভুক্ত বিষয়: যদি শিরা কেটে বা সুস্থতার জন্য যে-কোনো মাধ্যমে রক্ত বের করা হয়, তাহলে তাও হিজামার অন্তর্ভুক্ত হবে।

কিন্তু যদি যখন বা কামড়ের কারণে কিংবা নাক দিয়ে রক্ত বের হয় তাহলে তা হিজামার আওতাভুক্ত হবে না।

পঞ্চম: হায়েয ও নেফাসের রক্ত বের হওয়া; যখনই কোনো মহিলা হায়েয বা নেফাসের রক্ত দেখবে, সে রোজা ভঙ্গে ফেলবে এবং তার উপর কাঘা করা আবশ্যিক। নাবী ﷺ মহিলাদের ক্ষেত্রে বলেছেন: (أَيْنَسِ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصْلِّ وَلَمْ تَصْمِ)

“আর হায়েয অবস্থায় তারা কি সলাত ও সিয়াম হতে বিরত থাকে না? ”^{৫৪২}

ষষ্ঠ : রোজা ভঙ্গ করার নিয়ত করা: যে ইফতার করার সময়ের পূর্বেই রোজা ছেড়ে দেওয়ার নিয়ত করবে তার রোজা নষ্ট হয়ে যাবে, যদিও সে খাবার না খায়। কেননা নিয়ত রোজার দুই রুকনের অন্যতম একটি রুকন। সুতরাং, রোজা ছেড়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কেউ ইচ্ছাকৃত নিয়ত ভঙ্গ করলে তার রোজা ভঙ্গে যাবে।

সপ্তম: ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করা: কারণ তা ইবাদতের জন্য অসঙ্গতিপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ أَلِمْ أَشْرَكْتَ لِيَخْبَطَنَ عَمَلُكَ ... ﴾

“যদি তুমি (আল্লাহর) অংশীদার স্থির করো, তাহলে তোমার কর্ম অবশ্যই নিষ্ফল হয়ে যাবে।”

[সূরা যুমার: ৬৫]

^{৫৪২} সুনান আবু দাউদ, হ্য. ২৩৬৭; ইবনু মাজাহ, হ্য. ১৯৮৩।

^{৫৪৩} সহিহ বুখারী, হ্য. ৩০৪।



الباب الثالث: مستحبات الصيام ومكروهاته তৃতীয় অনুচ্ছেদ : সিয়ামের মুস্তাহব (সুন্নাহ) ও মাকরহ বিষয়সমূহ

এতে দুটি মাসআলা রয়েছে:

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: مَسْتَحْبَاتُ الصِّيَامِ প্রথম মাসআলা: রোজার মুস্তাহব বিষয়সমূহ

রোজাদারের জন্য নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখা মুস্তাহব:

১. সাহরী খাওয়া: নাবী ﷺ বলেছেন: (تَسْحَرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً)

“তোমরা সাহরী খাও, সাহরীতে বরকত রয়েছে।”^{৫৪৩}

খাবার কম হোক বা বেশি হোক উভয়ের মাধ্যমেই সাহরী খাওয়া সাব্যস্ত হয়। যদিও এক ঢোক পানি হয়। আর সাহরী খাওয়ার সময় মধ্যরাত্রি থেকে নিয়ে সুবহে সাদিক এর পূর্ব পর্যন্ত।

২. সাহারী দেরিতে খাওয়া: যায়েদ ইবনে সাবিত رض থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

(تَسْحَرَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ فُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ). قُلْتُ: كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا يَنْهَا؟ قَالَ: حَمْسِينَ أَيْمَانَ

“আমরা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সাহারী খেয়ে সলাতে দাঁড়ালাম। (রাবী আনাস رض বলেন) আমি (যায়েদ ইবনু সাবিত رض কে) জিজ্ঞেস করলাম, সাহারী ও আযানের মধ্যে কত সময়ের ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, পঞ্চাশ আয়াত পড়ার মতো সময়।”^{৫৪৪}

^{৫৪৩} মুস্তাফাকুন আলাইহি: সহীলুল বুখারী, হা. ১৯২৩; সহীল মুসলিম, হা. ২৪৩৯, ফুআ. ১০৯৫।

^{৫৪৪} মুস্তাফাকুন আলাইহি: সহীলুল বুখারী, হা. ৫৭৫; সহীল মুসলিম, হা. ২৪৪২, ফুআ. ১০৯৭।

৩. দ্রুত ইফতার করা: সূর্যাস্ত নিশ্চিত হলে রোজাদারের জন্য দ্রুত ইফতার করা মুস্তাহাব। সাহল ইবনু সার্দ থেকে বর্ণিত, নিচয় নাবী ﷺ বলেছেন: (لَا يَرِأُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا لِفِطْرٍ) “মানুষ যতদিন দ্রুত ইফতার করবে, ততদিন তারা কল্যাণের উপর থাকবে।”^{৪৫}

৪. পাকা খেজুরের মাধ্যমে ইফতার করা: যদি তা না পায় তাহলে শুকনো খেজুরের দ্বারা ইফতার করবে আর তা বেজোর হওয়া ভালো। যদি সেটাও না পায় তবে পানি দিয়ে ইফতার করবে। আনাস رض থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطْبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصْلِيَ، فَإِنْ مَمْتَكِنْ رُطْبَاتٍ، فَعَلَى تَمَازِتٍ، فَإِنْ لَمْ تَمْكِنْ حَسَّوَاتٍ مِنْ مَاءٍ)

“আল্লাহর রসূল ﷺ (মাগরিবের) সলাতের পূর্বে কয়েকটি পাকা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। পাকা খেজুর না পেলে শুকনো খেজুর দিয়ে, তাও না পেলে পানি দিয়ে ইফতার করতেন।”^{৪৬}

যদি সে ইফতার করার মতো কোনো কিছুই না পায় তাহলে অন্তরে ইফতারের নিয়ত করবে এবং এটাই তার জন্য যথেষ্ট হবে।

৫. ইফতারের সময় ও রোজা অবস্থায় দুআ করা: নাবী ﷺ বলেছেন:

(ثَلَاثَةٌ لَا تُرِدُّ دُعَوَّتُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطَرَ، وَالإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالْمَظْلُومُ)

“তিনি ধরনের লোকের দুআ কখনও ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। ১. রোজাদার যতক্ষণ ইফতার না করে; ২. সুবিচারক শাসক; ৩. ময়লুম।”^{৪৭}

৬. বেশি বেশি সাদকা, কুরআন তিলাওয়াত করা, রোজাদারদের খাওয়ানো এবং অন্যান্য ভালো ভালো আমল করা: ইবনু আক্বাস رض থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ النَّاسِ بِالْحَسْنَى، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِزِيرِيلُ، وَكَانَ جِزِيرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فِي دَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَرِسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَلْقَاهُ جِزِيرِيلُ أَجْوَدُ بِالْحَسْنَى مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ)

^{৪৫} মুস্তাফাকুন আলাইহি: সহীহ বুখারী, হা. ১৯৫৭; সহীহ মুসলিম, হা. ২৪৪৪, ফুআ. ১০৯৮।

^{৪৬} সুনান আবু দাউদ, হা. ২৩৫৬, তিরমিয়ী, হা. ৬৯৬ এবং তিনি হাসান বলেছেন; ইয়াম বাগবী তার শারহস সুন্নাহতে হাসান বলেছেন, শারহস সুন্নাহ ৬/২৬৬; আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহত তিরমিয়ী, হা. ৫৬০; আরনাউত শারহস সুন্নাহর তালীকে এক শক্তিশালী সানাদ বলেছেন।

^{৪৭} তিরমিয়ী, হা. ৩৫৯৮ এবং তিনি হাসান বলেছেন; বায়হাকী ৩/৩৪৫; এবং অন্যান্যরা আনাস رض থেকে মারফু সূত্রে: “তিনি ব্যক্তির দুআ ফিরিয়ে দেয়া হয় না। ১. পিতামাতার দুআ; ২. রোজাদারের দুআ; ৩. মুসাফিরের দুআ।” সুনানুল কুবরা, বায়হাকী, হা. ৬৩৯২। আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহাহ ১৭৯৭।

“আল্লাহর রসূল ﷺ মানুষের মাঝে দানশীলতায় সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী ছিলেন। তবে রমায়ান মাসে তিনি অধিক দানশীল হতেন যখন জিবরীল ﷺ তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন। আর জিবরীল ﷺ রমায়ানের প্রতি রাতে তার সাথে দেখা করতেন। তারা পরম্পর পরম্পরকে কুরআন শুনতেন। যখন জিবরীল ﷺ তার সাথে সাক্ষাত করতেন তখন তিনি বাতাসের চাইতেও বেশি দানশীল হতেন।”^{৫৪৮}

৭. রাতের সলাতে সচেষ্ট হওয়া: বিশেষ করে রমায়ানের শেষ দশকে। আয়িশাহ رض থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

(كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ شَدَّ مِنْزَرَهُ، وَأَخْبَأَ لِيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ)

“নাবী ﷺ রমায়ানের শেষ দশকে তাঁর লুঙ্গি কষে নিতেন (বেশি বেশি ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন) এবং রাত জেগে থাকতেন ও পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন।”^{৫৪৯}

নাবী ﷺ বলেছেন: (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنِبِهِ)

“যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমায়ানের রাত্রি জাগরণ করবে, তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।”^{৫৫০}

৮. উমরাহ করা: নাবী ﷺ বলেছেন: (عُمَرَةٌ فِي رَمَضَانَ، تَغْدِيلٌ حَجَّةٌ)

“রমায়ান মাসের উমরাহ হাজের সমপরিমাণ সওয়াব।”^{৫৫১}

৯. কেউ গালি দিলে বলা ‘আমি রোজাদার’: নাবী ﷺ বলেছেন:

وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدُكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَضْبَخْ، فَإِنْ سَأَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ

“তোমাদের কেউ যেন সওম পালনের দিন অশীলতায় লিঙ্গ না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, আমি একজন রোজাদার।”^{৫৫২}

^{৫৪৮} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৬; সহীহ মুসলিম, হা. ৫৯০৩, ফুআ. ২৩০৮।

^{৫৪৯} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ২০২৪; সহীহ মুসলিম, হা. ২৬৭৫, ফুআ. ১১৭৩।

^{৫৫০} সহীহ মুসলিম, হা. ২৬৭৫, ফুআ. ৭৫৯।

^{৫৫১} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ১৭৮৬; সহীহ মুসলিম, হা. ২৯২৮, ফুআ. ১২৫৬।

^{৫৫২} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ১৯০৪; সহীহ মুসলিম, হা. ২৫৯৩, ফুআ. ১১৫১; বুখারির শব্দে।

المسألة الثانية: مكرهات الصيام

দ্বিতীয় মাসআলা: রোজার জন্য মাকরহ (অপছন্দনীয়) কাজসমূহ

রোজাদারের জন্য কিছু অপছন্দনীয় বিষয় রয়েছে, যেগুলো রোজাকে অট্টিযুক্ত করে এবং তার সওয়াব কমিয়ে দেয়। সেগুলো হলো-

১. কুলি করা ও নাকের মধ্যে পানি নেওয়ার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করা: কারণ এর ফলে পানি পেটে চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। নাবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন:

وَيَا لِغْ في الإِسْتِشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

“রোজা পালনকারী না হলে নাকের গভীরে পানি পৌছাও।”^{৫৫৩}

২. যৌন উত্তেজনার সাথে চুম্বন করা: যে ব্যক্তি নিজের উপরে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না। তাই রোজাদারের জন্য স্ত্রী বা দাসীকে চুম্ব দেওয়া মাকরহ। কেননা তা যৌন উত্তেজনার দিকে ঠেলে দেয়। যার কারণে বীর্যপাত হয় কিংবা সহবাসে লিঙ্গ হয়ে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদি সে রোজা নষ্ট করা থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তাহলে কোনো সমস্যা নেই। আয়িশাহ رض আল্লাহর রসূল ﷺ এর ক্ষেত্রে বলেছেন: (وَكَانَ أَمْلَكُمْ لَعْزٍ بِهِ)

“তিনি তার প্রয়োজন পূর্ণ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রক ছিলেন।”^{৫৫৪}

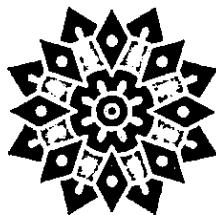
তেমনভাবে রোজাদার যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী সকল বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে। যেমন স্ত্রী বা দাসীর দিকে বেশি বেশি তাকানো কিংবা তাদের সাথে সহবাসের চিন্তা করা। কারণ এগুলোর কারণে বীর্যপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বা তাদের সাথে সহবাসে লিঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৩. কফ গিলে ফেলা: কারণ এটা পেটে পৌছে যায় এবং এর দ্বারা শক্তি অর্জিত হয়। তাছাড়া কফ গিলে ফেলা এক প্রকার নোংরামি ও ক্ষতিকর কাজ।

৪. প্রয়োজন ছাড়াই কোনো খাবারের স্বাদ নেওয়া: যদি খাবারের স্বাদ দেখার প্রয়োজন মনে করে, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। যেমন কোনো রাঁধনী লবন দেখল। তবে এক্ষেত্রে তা গলায় যাতে না পৌছে, সে ব্যাপারে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে।

^{৫৫৩} তিরিয়ী, হ. ৭৮৮ এবং তিনি সহীহ বলেছেন; নাসাই ১/৬৬; জা, হা. ৪০৭; আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহন নাসাই, হা. ৮৫।

^{৫৫৪} মুতাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ১৯২৭; সহীহ মুসলিম, হা. ২৯২৮, ফুআ. ১১০৬।



الباب الرابع: في القضاء، والصيام المستحب، وما يكره ويحرم من الصيام চতুর্থ অনুচ্ছেদ : সিয়ামের কায়া, নফল সিয়াম, হারাম ও মাকরুহ সিয়াম

এই পরিচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المُسَأَّلَةُ الْأُولَى: قضاء الصيام প্রথম মাসআলা: সিয়ামের কায়া

কোনো মুসলিম যদি ওয়র ছাড়াই রমাযানের কোনো রোজা ছেড়ে দেয়, তাহলে তার উপরে আবশ্যিক আল্লাহর নিকটে তাওবা-ইসতিগফার করা। কারণ এটা মহা অপরাধ ও বড়োপাপ। তাওবা ও ইসতিগফারের সাথে সাথে রমাযানের যে কয়টি রোজা ছেড়েছে তা পূর্ণ করা আবশ্যিক। আলেমদের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তাৎক্ষণিক কায়া পূর্ণ করা আবশ্যিক। কেননা রোজা ছাড়ার কোনো অনুমতি তাকে দেওয়া হয়নি। তাকে তো সেটা রমাযান মাসেই আদায় করতে হতো।

আর যদি বৈধ কোনো ওয়রের কারণে রোজা ছেড়ে দেয়। যেমন হায়েয, নেফাস, অসুস্থতা, সফর ইত্যাদি কারণে, তাহলে তার উপর কায়া করা আবশ্যিক। তবে তা তাৎক্ষণিক নয়। বরং তার জন্য আরেক রমাযান আসা পর্যন্ত অবকাশ রয়েছে। তবে মুন্তাহাব হলো তাৎক্ষণিক কায়া আদায় করা। কারণ তাতে দ্রুত দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আর কোনো ব্যক্তি অসুস্থতা বা অনুরূপ কারণে যদি অন্য রমাযান মাস আসার আগে রোজা না রাখতে পারে তাহলে তার এ চলতে থাকা ওয়রের কারণে দ্বিতীয় রমাযানের পরেও সে কায়া করতে পারে।

কিন্তু কোনো ওয়র ছাড়াই যদি দ্বিতীয় রমাযান পর্যন্ত বিলম্ব করে, তাহলে কায়া পালন করার পাশাপাশি প্রত্যেক দিন একজন মিসকিনকে খাবার দিবে। আর কায়া আদায়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা শর্ত নয়। ধারাবাহিক বা পৃথক উভয়ভাবেই বিশুদ্ধ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَدَهُ مِنْ أَيَّامِ أُخَرٍ﴾

“অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ অথবা মুসাফির হবে, সে অপর কোনো দিন হতে গণনা করবে।” [সূরা বাক্সারাহ: ১৮৪]

আর এই দিনগুলোর ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা শর্ত নয়। যদি শর্ত হতো, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বর্ণনা করে দিতেন।

المسألة الثانية: الصيام المستحب

দ্বিতীয় মাসআলা: মুষ্টাহাব (সুন্নাত) সিয়াম

আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের প্রতি দয়া ও হিকমতের মধ্য হতে অন্যতম হলো, তিনি তাদের জন্য এমন কিছু নফল ইবাদত নির্ধারণ করেছেন, যা ফরয ইবাদতসমূহের সাদৃশ্য। আর এর কারণে আমলকারীদের সওয়াব ও প্রতিদান বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এবং ফরয ইবাদতে ঝটি বা কমতি হলে তা পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। ইতৎপূর্বেই আলোচনা চলে গেছে যে, ফরয ইবাদতসমূহকে নফল ইবাদতের মাধ্যমে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ করা হবে। যে দিনগুলোতে রোজা পালন করা মুষ্টাহাব তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১. শাওয়াল মাসের ছয়টি রোজা: আবু আইয়ুব আল আনসারী رض থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سَيِّئَةً مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.

“রমায়ান মাসের সিয়াম পালন করে পরে শাওয়াল মাসে ছয় দিন সিয়াম পালন করা সারা বছর সওম পালন করার মতো”^{৩৩}

২. হাজ্জ পালনকারী ব্যতীত অন্যদের আরাফার দিবসে রোজা পালন: আবু কাতদা رض থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন:

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَخْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةُ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةُ الَّتِي بَعْدَهُ.

^{৩৩} সহীহ মুসলিম, হা. ২৬৪৮, ফুআ. ১১৬৪।

“আরাফাহ দিবসের সওম সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, তাতে পূর্ববর্তী বছর ও পরবর্তী বছরের গুনাহের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে।”^{৫৫৬}

হাজ পালনকারী ব্যক্তি আরাফার রোজা রাখবে না। কেননা নাবী ﷺ ওই দিনে রোজা রাখেননি, মানুষেরা তাকে দেখেছেন। হাজ পালনকারী ইবাদত ও দুआর জন্য সেই দিন শক্তিশালী থাকবে।

৩. আগুরার দিনের রোজা: নাবী ﷺ কে আগুরার দিনের রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: **أَخْتَسِبْ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةُ الَّتِي قَبْلَهُ**

“আগুরার সওম সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, তাতে পূর্ববর্তী এক বছরের গুনাহসমূহের কাফফারা হয়ে যাবে।”^{৫৫৭}

তার সাথে আগের কিংবা পরের একদিন রোজা রাখা সুন্নাহ। নাবী ﷺ বলেছেন:

لَئِنْ بَقِيَتْ إِلَى قَابِلٍ لَاَصُومَنَّ النَّاسَ

“আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি তবে মুহররমের নবম তারিখেও সিয়াম পালন করব।”^{৫৫৮}

নাবী ﷺ বলেছেন: **صُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ، خَالِفُوا الْيَهُودَ**

“তোমরা আগের কিংবা পরের একদিন তার সাথে রোজা রাখো, ইহুদিদের বিপরীত করো।”^{৫৫৯}

৪. প্রত্যেক সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখা: আয়িশাহ رض থেকে বর্ণিত।

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الْإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ

“নাবী ﷺ সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখতেন।”^{৫৬০}

নাবী ﷺ বলেছেন: **فَأَجِبْ أَنْ يُعَرَّضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ**

“প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার (আল্লাহ তা'আলার নিকট) আমলসমূহ উপস্থাপন করা হয়। সুতরাং আমি ভালোবাসি যে, আমার আমলসমূহ রোজা অবস্থায় উপস্থাপন করা হোক।”^{৫৬১}

^{৫৫৬} সহীহ মুসলিম, হা. ২৬৩৬, ফুআ. ১১৬২।

^{৫৫৭} সহীহ মুসলিম, হা. ২৬৩৬, ফুআ. ১১৬২।

^{৫৫৮} সহীহ মুসলিম, হা. ২৫৫৭, ফুআ. ১১৩৪।

^{৫৫৯} আহমাদ ১/২৪১; ইবনু বুবায়মাহ, হা. ২০৯৫; এর সানাদে দুর্বলতা রয়েছে। কিন্তু ইবনু আব্বাস رض থেকে মাওকুফ সূত্রে সহীহ।

^{৫৬০} আহমাদ ৫/২০১; তিরমিয়ী, হা. ৭৪৫ এবং ইয়াম তিরমিয়ী বলেন, হাসান সহীহ; আলবানী সহীহ বলেছেন, তালীক ইবনু বুবায়মাহ, হা. ২১১৬।

^{৫৬১} তিরমিয়ী, হা. ৭৪৭; নাসাই ১/৩২২; সুনান আবু দাউদ, হা. ২৪৩৬; ইয়াম তিরমিয়ী হাসান বলেছেন। আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহত তিরমিয়ী, হা. ৫৯৬।

৫. প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোজা রাখা: নাবী ﷺ আবুল্লাহ ইবনে আমর আলহাম্বুরি কে বলেছেন:
 وَصُمِّ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْتَانٍ، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدُّفْرِ

“তুমি মাসে তিন দিন করে সওম পালন করো। কারণ নেক কাজের পূরক্ষার তার দশগুণ; এভাবেই সারা বছরের সওম পালন হয়ে যাবে।”^{৫৬২}

আবু হুরায়রা আলহাম্বুরি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন,

(أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةِ صِيَامٍ تَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكِعَتِي الصُّحَى، وَأَنْ أُوْتَرْ قَبْلَ أَنْ تَأْتِي
 “আমার বন্ধু আলহাম্বুরি আমাকে তিনটি অসীয়ত করেছেন: প্রতি মাসে তিন দিন করে সওম পালন করা এবং দুই রাকআত সলাতুয়-যুহা এবং ঘুমানোর পূর্বে বিতর সলাত আদায় করা।”^{৫৬৩}

মুন্তাহব হলো প্রত্যেক মাসের আইয়্যামুল বিয়ে রোজা রাখা। প্রত্যেক চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখকে আইয়্যামুল বীয় বলা হয়। আবু যার আলহাম্বুরি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল আলহাম্বুরি বলেছেন:

(مَنْ كَانَ مِنْكُمْ صَائِمًا مِنَ الشَّهْرِ، فَلْيَصُمِّ الثَّلَاثَ الْبِيَضَ)

“তোমাদের মধ্যে যে প্রতি মাসে সিয়াম রাখতে চায়, সে যেন বীয়ের তিনদিন সিয়াম রাখে।”^{৫৬৪}

৬. একদিন রোজা রাখা এবং একদিন না রাখা: নাবী আলহাম্বুরি বলেছেন:

(أَفْضَلُ الصِّيَامِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا)

“সর্বোত্তম সিয়াম হচ্ছে দাউদ আলহাম্বুরি এর সিয়াম। তিনি একদিন সিয়াম রাখতেন এবং একদিন ছেড়ে দিতেন।”^{৫৬৫} আর এটা নফল সিয়ামের মধ্যে সর্বোত্তম।

৭. আল্লাহর মাস মুহাররম মাসে রোজা রাখা: আবু হুরায়রা আলহাম্বুরি হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল আলহাম্বুরি বলেছেন:

(أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ)

“রমাযানের সিয়ামের পর সর্বোত্তম সওম হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহাররমের সওম এবং ফরয সলাতের পর সর্বোত্তম সলাত হচ্ছে রাতের সলাত (তাহাজ্জুদ)।”^{৫৬৬}

^{৫৬২} সহীহ বুখারী, হা. ১৯৭৬।

^{৫৬৩} সহীহ বুখারী, হা. ১৯৮১।

^{৫৬৪} আহমাদ ৫/১৫২; নাসাই ৪/২২২; ইয়াম আহমাদের শব্দে। আলবানী হাসান বলেছেন, সহীহ সুনানুন নাসাই, হা. ২২৭৭-২২৮১।

^{৫৬৫} সহীহ বুখারী, হা. ১৯৭৬।

^{৫৬৬} সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১১৬৩।

৮. যিলহাজ মাসের নয় দিন রোজা রাখা: যিলহাজ মাসের প্রথম দিনে শুরু করবে এবং নবম দিনে শেষ করবে। আর তা হচ্ছে আরাফার দিন। কারণ এ দিনগুলোর মর্যাদা সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নাবী ﷺ বলেছেন:

مَا مِنْ أَيَّامُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْعَشْرِ

“প্রথম দশ দিনের (যিলহাজ মাসের) আমলের চেয়ে অন্য দিনের কোনো আমলই উত্তম নয়।”^{৫৬৭}
আর সিয়াম অবশ্যই আমলে সালেহের অন্তর্ভুক্ত।

المسألة الثالثة: ما يكره ويحرم من الصيام

তৃতীয় মাসআলা: যে রোজা রাখা হারাম এবং যে রোজা রাখা মাকরাহ

১. শুধু রজব মাসে রোজা রাখা মাকরাহ: জাহেলী যুগে তা করা হতো। তারা মাসটিকে অনেক সন্মন করতো। যদি অন্যান্য মাসের সাথে মিলিয়ে রোজা রাখা হয়, তাহলে মাকরাহ নয়। কেননা তখন এ মাসের সাথেই নির্দিষ্ট হবে না। আহমাদ ইবনু খারশা ইবনে আল-হার বলেন: আমি উমার ইবনুল খান্তাব رض কে রজব মাসে রোজা পালনকারীদেরকে প্রহার করতে দেখেছি, যতক্ষণ না তারা তাদের হাত খাবারে রাখতো। আর উমার رض বলতেন:

كُلُوا، فِإِنَّمَا هُوَ شَهْرٌ كَانَتْ تَعْظِيمَهُ الْجَاهِلِيَّةُ

“তোমরা রজব মাসে দিনের বেলা খাও। কারণ এ মাসটিকে জাহেলী যুগের মানুষ সম্মান করত।”^{৫৬৮}

২. শুধুমাত্র জুমুআর দিনে রোজা রাখা মাকরাহ: নাবী ﷺ বলেছেন:

(لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ)

“তোমরা শুধু জুমুআর দিন কেউ সওম পালন করবে না। তবে যদি কেউ জুমুআর দিনের আগে বা পরে একদিন পালন করে তাহলে সে জুমুআর দিন সওম পালন করতে পারে।”^{৫৬৯}

যদি অন্য দিনের সাথে শুক্রবার রোজা রাখে, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। যেমন পূর্বোক্ত হাদীসে এসেছে।

^{৫৬৭} সহীহল বুখারী, হা. ৯৬৯।

^{৫৬৮} ইন্ডিয়াউল গালীল ৪/১১৩।

^{৫৬৯} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ১৯৮৫; সহীহ মুসলিম, হা. ২৫৭৩, ফুআ. ১১৪৪।

፩. શુદ્ધમાત્ર શનિવારે દિન રોજા રાખા માકરહઃ નાબી ﴿ વલેછેન:

لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ

“તોમાદેર ઉપર ફરય કરા સત્તમ બ્યતીત તોમરા શુદ્ધ શનિવારે સત્તમ રેખો ના ।”^{૫૭૦}

ઉદ્દેશ્ય હલો: એકક કરા નિષેધ એવં શુદ્ધ એ દિનટિટે રોજાર જન્ય નિર્દિષ્ટ કરે નેઓયા નિષેધ । કિન્તુ અન્ય દિને સાથે મિલિયે રોજા રાખા હલે, કોનો સમસ્યા નેહિ । કેનના નાબી ﴿ ઉપ્પુલ મુ'મિનીન જુવ્વાઇરિયા ﴿ કે વલેછેન: યથન તિનિ ﴿ તાર નિકટે કોનો એક જુમુઆર દિને પ્રવેશ કરેછેલેન એમતાબસ્થાય જુવ્વાઇરિયા ﴿ રોજાદાર છિલેન: આંસું તુમિ કિ ગતકાલ રોજા રેખેછેલે? તિનિ બલલેન: ના । તિનિ ﴿ બલલેન: હા । તિનિ ﴿ તાકે બલલેન: તાહલે તુમિ રોજા છેડે દાઓ ।^{૫૭૧} નાબી ﴿ એ કથા હાં ત્રયિદિન અનુભૂતિ પ્રમાણ કરે યે, અન્ય દિને સાથે શનિવારકે મિલાલે રોજા રાખા જાયેય । ઇમામ તિરમિયી ﴿ નિષિદ્ધેર હાદીસ તાખરીજેર પર બલેન: “હાદીસે કારાહિયયાતેર (અપછન્દનીયતા) દ્વારા ઉદ્દેશ્ય હલો: એકજન બ્યક્તિ યેન શનિવારકે રોજાર સાથે નિર્દિષ્ટ ના કરે; કેનના ઇસ્લામ શનિવારકે સંસ્કાર કરે ।”

૪. ઇયાଓમુશ શાક તથા સન્દેહેર દિને રોજા રાખા હારામ: તા હલો, શાબાન માસેર ત્રિશત્મ દિન । સેદિન આકાશ મેઘાચ્છન્ન થાકાર કારગે નૂતન ચાંદ દેખા યાય ના । આર યદી આકાશ મેઘમુક્ત હય, તાહલે સે દિનટી ઇયાଓમુશ શાક હિસેબે ગળ્ય હબે ના । સન્દેહેર દિને રોજા રાખા હારામેર દલીલ: આસ્વાર જીન્હે બલેન: મَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ^{૫૭૨} “યે બ્યક્તિ સન્દેહેર દિને સત્તમ રાખ્યાં, સે અબશ્યાં આબુલ કાસેમ ﴿ એ અવાધ્ય હલો ।”^{૫૭૩}

નાબી સાલ્લાલ્હ આલાઇહિ ઓયા સાલ્લામ બલેન:

لَا يَتَقدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٌ أَوْ يَوْمَينِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ

“તોમરા કેઉ રમાયાનેર એકદિન વા દુઇ દિન આગે સત્તમ શુરુ કરબે ના । તબે કેઉ યદી એ સમય સિયામ પાલને અભ્યંત થાકે તાહલે સે યેન સેદિન સત્તમ પાલન કરે ।”^{૫૭૪}

^{૫૭૦} સુનાન આબુ દાઉદ, હા. ૨૪૨૧; તિરમિયી, હા. ૭૪૪; ઇબ્નુ માજાહ, હા. ૧૭૨૬; હાકિમ ૧/૪૩૫; ઇમામ તિરમિયી હાસાન વલેછેન એવં ઇમામ હાકિમ ઇમામ બુખારીની શર્તે સહીહ વલેછેન । ઇમામ યાહાવી માଓકુફ વલેછેન; આલવાની સહીહ વલેછેન, સહીહત તિરમિયી, હા. ૫૯૪

^{૫૭૧} સહીહુલ બુખારી, હા. ૧૯૮૬ ।

^{૫૭૨} ઇમામ બુખારી તાર સહીહાતે તાલીક કરેછેન, ફાતહુલ વારી ૪/૧૪૩;...ઇમામ તિરમિયી, હા. ૬૮૯ એવં અન્યાન્યરા બર્ણના કરેછેન એવં તિનિ હાદીસટી હાસાન સહીહ વલેછેન । ઇમામ આલવાની સહીહ વલેછેન, સહીહત તિરમિયી, હા. ૫૫૩ ।

^{૫૭૩} સહીહુલ બુખારી, હા. ૧૯૧૪ ।

এর অর্থ হলো: সাবধানতার জন্য কেউ যেন রমাযানের একদিন আগে রোজা না রাখে। কেননা রোজা নৃতন চাঁদ দেখার সাথে সম্মত। তাই এ কৃত্রিমতার কোনো প্রয়োজন নেই। আর যে ব্যক্তি আগে থেকেই রোজা রাখে, তার জন্য কোনো সমস্যা নেই। কেননা সে ব্যক্তি রমাযানের উদ্দেশ্যে উক্ত রোজা রাখছে না। তেমনিভাবে কায়া ও মানতের রোজাও ওয়াজিব হওয়ার কারণে রাখা যাবে।

৫. দুই ঈদের দিন রোজা রাখা হারাম: আবু সাউদ খুদরী رض থেকে বর্ণিত:

بَهِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ.

“নাবী ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন এবং কুরবানীর ঈদের দিন সওম পালন করতে নিষেধ করেছেন।”^{৫৭৪}

উমার ইবনুল খাতাব رض থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

(هَذَا يَوْمًا نَهِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِكُمْ مِنْ يَوْمِ فِطْرٍ كُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْيَوْمُ الْآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ تُسْكِنُكُمْ)

“আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুই দিনে সওম পালন করতে নিষেধ করেছেন। ঈদুল ফিতরের দিন যে দিন তোমরা তোমাদের সওম ছেড়ে দাও। আরেক দিন, যেদিন তোমরা তোমাদের কুরবানীর গোশত খাও।”^{৫৭৫}

৬. আইয়ামুত তাশরীক (যিলহাজ্জ মাসের ১১, ১২, ১৩ তারিখ) রোজা রাখা মাকরুহ: নাবী ﷺ বলেছেন:

أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“এই দিনগুলো খাওয়া-দাওয়া করার এবং আল্লাহকে স্মরণ করার দিন।”^{৫৭৬}

নাবী ﷺ বলেন:

(يَوْمُ عَرْفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلُ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ)

“আমাদের মুসলিম জনগণের ঈদের দিন হচ্ছে আরাফার দিন, কুরবানীর দিন ও তাশরীকের দিন। এ দিনগুলো হচ্ছে খাওয়া-দাওয়া করার দিন।”^{৫৭৭}

^{৫৭৪} সহীল বুখারী, হা. ১৯৯১।

^{৫৭৫} সহীল বুখারী, হা. ১৯৯০।

^{৫৭৬} সহীহ মুসলিম, হা. ২৫৬৭, ২৫৬৮, ফুআ. ১১৪১।

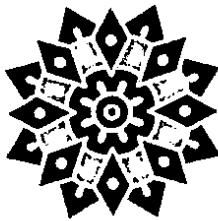
^{৫৭৭} তিরমিয়ী, হা. ৭৭৩; এবং তিনি হাসান বলেছেন; ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহত তিরমিয়ী, হা. ৬২০।

তবে তামাঙ্গু ও কিরান হাজ পালনকারীদের জন্য এ দিনগুলোতে রোজা রাখার ক্ষেত্রে ছাড় প্রদান করা হয়েছে। তারা যদি হাদী না পায়। আয়িশাহ ও ইবনু উমার সান্তান, বলেন:

(لَمْ يُرَخْصِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصْمِنَ، إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَذِيَّ)

“যার নিকট কুরবানীর পশ্চ নেই তিনি ব্যতীত অন্য কারও জন্য আইয়্যামে তাশরীকে সওম পালন করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।”^{৫৭৮}

ମୁଦ୍ରଣ ବୁଧାନ୍ତି, ଶ. ୧୯୯୭, ୧୯୯୮ ।



الباب الخامس: في الاعتكاف পঞ্চম অনুচ্ছেদ : ই‘তিকাফ

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: تَعْرِيفُ الْاعْتَكَافِ وَحُكْمُهِ

প্রথম মাসআলা: ই‘তিকাফের পরিচয় ও তার হুকুম

১. ই‘তিকাফের পরিচয়:

শাব্দিক অর্থ: لزوم الشيء، وحبس النفس عليه.

“কোনো জিনিসে লেগে থাকা, নাফসকে কোনো জিনিসের উপরে আটকে রাখা।”

পরিভাষায়: لزوم المسلم المميز مسجداً لطاعة الله عز وجل.

“ভালো-মন্দ পার্থক্যকারী মুসলিমের আল্লাহর আনুগত্যের জন্য মসজিদে অবস্থান করাকে ই‘তিকাফ বলা হয়।”

২. হুকুম: ই‘তিকাফ সুন্নাত এবং তার মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য অর্জন করা যায়।
আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿إِنْ ظَهِرَ أَبْيَقِي لِلظَّاهِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكْجِ السُّجُودِ﴾

“তোমরা আমার ঘরকে তওয়াফকারী, ই‘তিকাফকারী ও রুকু-সাজ্দাকারীদের জন্য পবিত্র রাখবে।”[সূরা বাক্সারাহ : ১২৫]

এই আয়াতটি ই‘তিকাফ শরীয়ত সম্মত হওয়ার ব্যাপারে দলীল। এমনকি তা পূর্ববর্তী উন্নতের উপরও শরীয়ত সম্মত ছিল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

“তোমরা মসজিদে ই‘তিকাফ করার সময় (স্ত্রীদের সাথে) মিলিত হবে না।”[সূরা বাক্সারাহ : ১৮৭]

আয়িশাহ رض থেকে বর্ণিত ।

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّىٰ تَوْفَاهُ اللَّهُ

“নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমৃত্যু রমাযানের শেষ দশকে ই‘তিকাফ করতেন।”^{৫৭৯}

সকল আলেম এটা শরীয়ত সম্মত হওয়ার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন এবং তা সুন্নাত। এটা কোনো ব্যক্তির উপর আবশ্যিক নয়। তাবে যদি সে নিজের উপরে আবশ্যিক করে নেয়, তাহলে ভিন্ন কথা। যেমন- কেউ ই‘তিকাফ করার মানত করল।

সুতরাং ই‘তিকাফ সুন্নাত ও শরীয়ত সম্মত; যা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো।

الْمَسَالَةُ الثَّانِيَةُ: شُرُوطُ الْعَتَقَافِ

দ্বিতীয় মাসআলা: ই‘তিকাফের শর্তসমূহ

ই‘তিকাফ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তার জন্য কতগুলো শর্ত রয়েছে। যেগুলো ছাড়া তা বিশুद্ধ বলে সাব্যস্ত হবে না। সেগুলো হলো-

১. ই‘তিকাফকারীকে মুসলিম, ভালো-মন্দ পার্থক্যকারী ও বোধশক্তি সমপূর্ণ হতে হবে: কাফের, পাগল এবং ভালো-মন্দ পার্থক্য করতে পারে না এমন বালকের ই‘তিকাফ বিশুদ্ধ বলে গণ্য হবে না। বালেগ হওয়া বা পুরুষ হওয়া ই‘তিকাফের জন্য শর্ত নয়। সুতরাং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি, যদি ভালো-মন্দ পার্থক্যকারীর করতে পারে, তবে ই‘তিকাফ বিশুদ্ধ বলে গণ্য হবে। অনুরূপ মেয়েদের ক্ষেত্রেও।

২. ই‘তিকাফের নিয়ত করা: নাবী رض বলেছেন: (إِنَّ الْأَعْمَالَ بِالْبَيْنَاتِ)

“প্রত্যেক কাজ (এর প্রাপ্তি হবে) নিয়ত অনুযায়ী।”^{৫৮০}

ই‘তিকাফকারী আল্লাহর ইবাদত ও নৈকট্য লাভের আশায় একান্তে অবস্থানের নিয়ত করবে।

৩. মাসজিদের মধ্যে ই‘তিকাফ হতে হবে: আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ “তোমরা মসজিদে ই‘তিকাফ করো।”[সূরা বাক্সারাহ: ১৮৭]

তাছাড়া আল্লাহর রসূল ﷺ মসজিদের মধ্যেই ই‘তিকাফ করেছেন। তিনি মসজিদ ছাড়া অন্যথায় ই‘তিকাফ করেছেন এমন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

^{৫৭৯} মুত্তাফকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হ্য. ২০২০; সহীহ মুসলিম, হ্য. ২৬৭২, ফুআ. ১১৭২।

^{৫৮০} মুত্তাফকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হ্য. ১; সহীহ মুসলিম, হ্য. ৪৮২১, ফুআ. ১৯০৭।

৪. ই'তিকাফের মসজিদটি এমন হতে হবে যেখানে জামাআতের সাথে সলাত চালু রয়েছে: এর কারণ হলো, ই'তিকাফের সময়েও ফরয সলাত রয়েছে এবং ই'তিকাফকারীর জন্য জামাআত আবশ্যিক। আর যে মসজিদে জামাআতের সাথে সলাত আদায় করা হয় না, সে মসজিদে ই'তিকাফ করা হলে জামাআতকে বর্জন করা হবে, অথচ সেটা তার উপর ওয়াজিব। কিংবা ই'তিকাফকারীকে বারবার বের হতে হবে, যা ই'তিকাফের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। আর মহিলাদের যে-কোনো মসজিদে ই'তিকাফ বিশুদ্ধ বলে গণ্য হবে। চাই তা জুমুআর মসজিদ হোক বা না হোক। এটা তখনই কার্যকর হবে যখন ফেতনার আশঙ্কা থাকবে না। ফেতনার আশঙ্কা থাকলে নিষিদ্ধ। তবে উভয় হলো মসজিদটি জুমুআর মসজিদ হওয়া। কিন্তু তা ই'তিকাফের জন্য শর্ত নয়।

৫. বড়ো অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়া: অপবিত্র শরীরবিশিষ্ট, ঝাতুবতী নারী বা নিফাস অবস্থায় আছে এমন স্ত্রীলোকের ই'তিকাফ বিশুদ্ধ হবে না। কারণ মসজিদে তাদের অবস্থান করা জায়েয় নেই।

রোজা ই'তিকাফের জন্য শর্ত নয়। ইবনু উমার رض থেকে বর্ণিত, উমার رض বলেছেন: আল্লাহর রসূল! আমি জাহেলী যুগে মসজিদুল হারামে একরাত্রি ই'তিকাফ করার মানত করেছিলাম। অতঃপর আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন: (أَوْفِ بِنَدِرِكِ) “তুমি তোমার মানত পূর্ণ করো।”^{৫৮}

যদি ই'তিকাফে রোজা শর্ত হতো, তাহলে রাতে ই'তিকাফ বিশুদ্ধ হতো না। কেননা রাতে কোনো রোজা নেই। যেহেতু উভয়টি পৃথক পৃথক ইবাদত। তাই একটির জন্য আরেকটি শর্ত নয়।

المسألة الثالثة: زمان الاعتكاف ومستحباته وما يباح للمعتكف

তৃতীয় মাসআলা: ই'তিকাফের সময়, তার মুস্তাহাব ও

ই'তিকাফকারীর জন্য যা বৈধ

১. ই'তিকাফের সময়: ই'তিকাফের রুক্ন হচ্ছে মসজিদে নির্দিষ্ট সময় অবস্থান করা। মসজিদে অবস্থান না করলে ই'তিকাফ সংঘটিত হবে না। বিদ্বানগণের নিকটে ই'তিকাফের সর্বনিম্ন পরিমাণ সময়ের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী ইতকাফের সর্বনিম্ন কোনো সময় নেই। তাই একটা সময়ে ই'তিকাফ করলেই বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হবে, যদিও সময়টা স্বল্প পরিমাণ হয়। তবে উভয় হলো ই'তিকাফ যেন একদিন বা এক রাতের কম পরিমাণ না হয়। কেননা নাবী ﷺ এবং কোনো সাহাবী থেকেই এর কম সময় পরিমাণের ব্যাপারে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না।

আয়িশাহ رض এর হাদীসের ভিত্তিতে ই'তিকাফের সর্বোত্তম সময় রমায়ানের শেষ দশক।

^{৫৮} মুস্তাফাকুন আলাইহি: সহীলুল বুখারী, হা. ২০৩২; সহীহ মুসলিম, হা. ৪৮২১, ফুআ. ১৬৫৬

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমৃত্যু রমাযানের শেষ দশকে ই‘তিকাফ করতেন।”^{৫৮২}

সুতরাং যে ব্যক্তি অন্য সময়ে ই‘তিকাফ করবে, তা বৈধ হবে। তবে সর্বোত্তম এর বিপরীত হবে। যে ব্যক্তি রমাযানের শেষ দশকে ই‘তিকাফ করতে চায়, সে যে মসজিদে ই‘তিকাফ করার নিয়ত করেছে, সেই সমজিদে যেন একুশতম দিনে ফজরের সলাত আদায় করে। অতঃপর ই‘তিকাফে প্রবেশ করবে। আর ই‘তিকাফ শেষ করবে রমাযানের শেষ দিনে সূর্যাস্ত যাওয়ার পর।

২. ই‘তিকাফের মুস্তাহাব: ই‘তিকাফ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। যেখানে বান্দা তার সৃষ্টিকর্তার সাথে একান্তে মিলিত হয়ে অন্যান্য সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে।

সুতরাং ই‘তিকাফকারীর জন্য সুন্নত হলো, সে ইবাদতের জন্য পূর্ণ মনোযোগী হবে, বেশি বেশি সলাত, যিকর, দুআ, কুরআন তিলাওয়াত, তাওবা ইসতিগফার ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য অন্যান্য ভালো কাজগুলো করতে থাকবে।

৩. ই‘তিকাফকারীর জন্য যা বৈধ: যে কাজের জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া ছাড়া উপায় নেই, সে কাজগুলোর জন্য তার মসজিদ থেকে বের হওয়া বৈধ। যেমন: তার খানা-পিনা উপস্থিত করার কেউ না থাকলে খাওয়া ও পান করার জন্য বের হওয়া, মল-মৃত্র ত্যাগ করার জন্য বের হওয়া, অযু করার জন্য বের হওয়া এবং শারীরিক অপবিত্রতার গোসল করার জন্য বের হওয়া।

তার জন্য মানুষের সাথে কোনো উপকারী কথা বলা বা মানুষদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করা বৈধ। কিন্তু যে আলোচনায় কোনো উপকার নেই কিংবা কোনো প্রয়োজন নেই, তা অবশ্যই ই‘তিকাফের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। এছাড়াও পরিবারের কোনো সদস্য এবং আত্মীয় স্বজনের সাথে সাক্ষাত করা বৈধ এবং তাদের সাথে অল্প কিছুক্ষণ কথা বলা বৈধ এবং তাদেরকে বিদায় অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বের হওয়াও বৈধ। সাফিয়া ~~রামানুজ~~ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَرْوَهُ لَيْلًا، فَحَدَّثَنِي تُمْ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبِي

“আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ই‘তিকাফে ছিলেন। আমি রাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসলাম এবং কিছু কথা বললাম। অতঃপর আমি ফিরে আসার জন্য দাঁড়ালে তিনিও (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- আমাকে পৌছে দেওয়ার জন্য আমার সাথে দাঁড়ালেন।”^{৫৮৩}

আর হাদীসে বর্ণিত ~~প্রতিলিপি~~ শব্দের অর্থ: যাতে তিনি আমাকে বাড়িতে পৌছিয়ে দেন।

ই‘তিকাফকারী মসজিদের পরিকার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে মসজিদেই খাওয়া-দাওয়া করবে এবং ঘুমাবে।

^{৫৮২} মুঠাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ২০২০; সহীহ মুসলিম, হা. ২৬৭২, ফূআ. ১১৭২

^{৫৮৩} মুঠাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৩২৮১; সহীহ মুসলিম, হা. ২৬৭২, ফূআ. ২১৭৫

المسألة الرابعة: مبطلات الاعتكاف

চতুর্থ মাসআলা: ই‘তিকাফ বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ

১. কোনো প্রয়োজন ছাড়াই ইচ্ছাকৃত মসজিদ থেকে বের হওয়া, যদিও অন্ন সময়ের জন্য হয়। আয়িশাহ (رضي الله عنه) এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

(وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا بِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا)

“তিনি ই‘তিকাফে থাকা অবস্থায় (প্রাকৃতিক) প্রয়োজন ব্যতীত ঘরে প্রবেশ করতেন না।”^{৪৮৪}

কেননা বের হওয়ার মাধ্যমে মসজিদে অবস্থান করার উদ্দেশ্যটা হারিয়ে যায়। অথচ মসজিদে অবস্থান করাটা ই‘তিকাফের রূপ।

২. সহবাস করা; যদিও তা রাতে হয় বা মসজিদের বাইরেও হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(فَوَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْثُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ)

“তোমরা মাসজিদে ই‘তিকাফ করার সময় (ক্রীদের সাথে) মিলিত হবে না।”[সূরা বাকারাহ: ১৮৭]

সহবাস ছাড়াই যৌন উভেজনার সাথে তার বীর্য নির্গত হলেও এ হৃকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন-হস্তমেথুন করা, যৌনিপথ ব্যতীত ভিন্ন রাস্তায় সহবাস করা।

৩. জ্ঞান হারিয়ে যাওয়া; পাগলামি ও মাদকাসত্ত্বের মাধ্যমে ই‘তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা পাগল ও নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি ইবাদতের যোগ্য নয়।

৪. হায়েয ও নেফাস: কেননা ঝুতুবতী ও নিফাস অবস্থায় আছে এমন স্তুলোক মসজিদে অবস্থান করতে পারবে না।

৫. ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করা: কারণ এটা ইবাদতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(لَيْلَةُ أَشْرَكَتْ لَيْلَةً حَبَطَنَ عَمَلُكَ)

“তুমি আল্লাহর শরীক হ্রিয়ে করো, অবশ্যই তোমার কাজ নিখ্ল হবে।”[সূরা যুমার: ৬৫]



পঞ্চম অধ্যায় হাজ্জ

خامساً : كتاب الحج

————— ♫ এতে ০৭টি অনুচ্ছেদ রয়েছে ♫ ———

প্রথম অনুচ্ছেদ : হাজ্জের প্রাথমিক আলোচনা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: হাজ্জের রুক্ন ও ওয়াজিবসমূহ

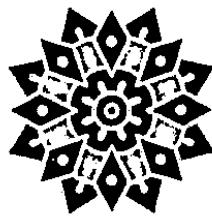
তৃতীয় অনুচ্ছেদ: বিধিনিষেধ, ফিদয়া ও হাদীর পশু

চতুর্থ অনুচ্ছেদ: হাজ্জ ও উমরার বিবরণ

পঞ্চম অনুচ্ছেদ: মদীনার যে সমস্ত স্থানে যিয়ারত করা সুন্নাত

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : কুরবানি

সপ্তম অনুচ্ছেদ : আকীকা



الباب الأول : في مقدمات الحج প্রথম অনুচ্ছেদ : হাজ্জের প্রাথমিক আলোচনা

এই অনুচ্ছেদে কিছু মাসআলা রয়েছে:

المَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: فِي تَعْرِيفِ الْحَجَّ প্রথম মাসআলা: হাজ্জের পরিচয়

الْحَجُّ বা হাজ্জের শাব্দিক অর্থ: (القصد) ইচ্ছা করা।

পরিভাষায়:

التعبد لله بأداء المنسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص، على ما جاء في سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

“নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে, আল্লাহর রসূল ﷺ এর পদ্ধতি মোতাবেক বেশ কিছু ইবাদতের পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে, আল্লাহর ইবাদত করাকে হাজ্জ বলে।”

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: حِكْمَةُ الْحَجَّ وَفَضْلُه দ্বিতীয় মাসআলা: হাজ্জের হৃকুম ও ফর্যালত

১. হাজ্জের হৃকুম: হাজ্জ ইসলামের অন্যতম একটি রূক্ন এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয বিধান। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَيَلِوَ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي عَنِ الْعَالَمِينَ.﴾

“যে সব মানুষ সফর করার আর্থিক সামর্থ্য রাখে তাদের উপর আবশ্যিক আল্লাহর উদ্দেশ্যে এই গ্রহের হাজ্জ করা এবং যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসী হতে অমুখাপেক্ষী।” [সূরা আলি ইমরান : ৯৭]

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন: ﴿وَأَتَئُونَا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾

“আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হাজ্জ ও ‘উমরাহকে পূর্ণ করো।” [সূরা বাক্সারাহ : ১৯৬]

ইবনু উমার ৩৫৫ এর হাদীসে মারফ শুত্রে বর্ণিত হয়েছে:

بُنِيَّ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْيَمِينِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

“ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। ১. এ মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ৩৫৫ আল্লাহর রসূল। ২. সলাত কায়েম করা। ৩. যাকাত দেওয়া। ৪. রমায়ানের সিয়াম পালন করা। ৫. স্তব হলে কাঁবা ঘরের হাজ্জ পালন করা।”^{৫৪৫}

এ হাদীসের মধ্যে হাজ্জের কথাও বর্ণিত হয়েছে।

সকল আলেম ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, হাজ্জ পালনে সক্ষম ব্যক্তির জন্য জীবনে একবার হাজ্জ পালন করা ওয়াজিব।

২. হাজ্জের ফযীলত: হাজ্জের ফযীলত প্রসঙ্গে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরায়রা ৩৫৫ থেকে মারফু শুত্রে বর্ণিত হয়েছে। নাবী ৩৫৫ বলেন:

الْعُمَرَةُ إِلَى الْعُمُرَةِ كَفَارَةٌ لَا يَنْهَا، وَالْحَجُّ الْمُبُرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا بِالْجُنَاحِ

“এক উমরাহ পরবর্তী উমরাহ পর্যন্ত মধ্যখানের গুনাহসমূহের কাফফারা স্বরূপ। আর আল্লাহর নিকট গৃহীত হাজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়।”^{৫৪৬} নাবী ৩৫৫ বলেছেন:

مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفَعْ، وَلَمْ يَفْسُدْ، رَجَعَ كَيْوَمْ وَلَدَنَهُ أَمْمَهُ

“যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হাজ্জ করল এবং অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ হতে বিরত থাকল, সে ঐ দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসবে যেদিন তাকে তার মা জন্ম দিয়েছিল।”^{৫৪৭} হাজ্জের ফযীলত সম্পর্কে এরূপ আরও অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

الْمَسَالَةُ التَّالِثَةُ: هَلْ يَجْبُ الْحِجَّ في الْعُمَرِ أَكْثَرُ مِنْ مَرَّةٍ؟

তৃতীয় মাসআলা: জীবনে কি একবারের বেশি হাজ্জ করা ওয়াজিব?

জীবনে একবার হাজ্জ পালন করা ওয়াজিব। এর বেশি হলে, তা নফল হিসেবে গণ্য হবে। আবু হুরায়রা ৩৫৫ বর্ণিত। আল্লাহর রসূল ৩৫৫ বলেছেন:

(أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحِجَّ، فَحُجُّوا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوْ رَجَبْتَ، وَلَا اسْتَطَعْتُمْ)

^{৫৪৫} মুস্তাফাকুন বালাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৮; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৬ ইবনু উমার ৩৫৫ এর হাদীস।

^{৫৪৬} সহীহ মুসলিম, হা., ফুআ. ১৩৪৯।

^{৫৪৭} মুস্তাফাকুন বালাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ১৫২০; সহীহ মুসলিম, হা. ৩১৮৩, ফুআ. ১৩৫০।

“হে লোকসকল! তোমাদের উপর হাজ্জ ফরয করা হয়েছে। অতএব তোমরা হাজ্জ করো। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! তা কি প্রতি বছর? এরপর তিনি ﷺ বললেন: আমি হাঁ বললে, তা ওয়াজিব হয়ে যেত (প্রতি বছরের জন্য)। অর্থে তোমরা তা পালন করতে সক্ষম হতে না।”^{৫৮}

আর নাবী ﷺ হিজরতের পরে মাত্র একবার হাজ্জ করেছিলেন। আলেমগণের ঐকমত্যে হাজ্জ পালনে সক্ষম ব্যক্তির উপরে জীবনে একবার হাজ্জ করা ওয়াজিব।

সুতরাং শর্ত পূরণ হলে তা দ্রুত পালন করা আবশ্যিক। এমতাবস্থায় কোনো ওয়াজিব ছাড়াই দেরি করলে সে গুনাহগার হবে। নাবী ﷺ বলেছেন:

تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجَّ فَإِنْ أَحَدُكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَغْرِضُ لَهُ

“তোমার দ্রুত হাজ্জ করো। কেননা তোমাদের কেউ জানে না, তার সামনে কী ঘটবে।”^{৫৯}

বিভিন্ন বর্ণনায় মারফু ও মাওকুফ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যার একটি আরেকটিকে শক্তিশালী করে:

مِنْ اسْتِطَاعَ الْحَجَّ فَلِمْ يَحْجُّ، فَلِمْ يَمْلِمْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا، وَإِنْ شَاءَ نَصَارَائِيًّا

“যে ব্যক্তি হাজ্জ পালনে সক্ষমতা সত্ত্বেও হাজ্জ করল না, সে যেন ইহুদি বা খৃস্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করল।”^{৬০}

المسألة الرابعة: شروط الحج চতুর্থ معاشرة: হাজ্জের শর্তসমূহ

হাজ্জ ওয়াজিব হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্তারোপ করা হয়েছে:

১. ইসলাম: কাফের ব্যক্তির উপর হাজ্জ ফরয নয় এবং তার পক্ষ থেকে হাজ্জ বিশুদ্ধও হবে না। কেননা ইসলাম ইবাদত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত।

২. জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া: পাগল ব্যক্তির উপর হাজ্জ ফরয নয় এবং পাগল ব্যক্তির পক্ষ থেকে হাজ্জ বিশুদ্ধ হবে না। কেননা শরীয়তের হৃকুম পালনের জন্য জ্ঞানবান হওয়া শর্ত। আর পাগল ব্যক্তি শরীয়তের হৃকুম পালনের যোগ্য নয় এবং তার থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তার জ্ঞান ফিরে আসে।

যেমন আলী রضي اللہ عنہ এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নিচের আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

رُفِعَ الْقَلْمَنْ عَنْ ثَلَاثَةِ، عَنِ النَّالِمِ حَتَّىٰ يَسْتَقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَلْغُ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يُفِيقَ

^{৫৮} সহীহ মুসলিম, হা., ফুআ. ১৩৩।

^{৫৯} আহমাদ ১/৩১৪; ইমাহব, ইরওয়া, হা. ৯৯০।

^{৬০} দেখুন, নাইপুর আওতার ৪/৩৩।

“ତିନ୍ ପ୍ରକାର ଲୋକେର ଉପର ଥିକେ କଳମ ତୁଲେ ରାଖା ହେଁବେ । ୧. ନିର୍ଦ୍ଦିତ ସ୍ୱଭାବ, ସତକଣ ନା ଜାଗରିତ ହୟ; ୨. ନାବାଲେଗ ଶିଶୁ, ସତକଣ ନା ପ୍ରାଣ୍ତବୟକ୍ତ ହୟ; ୩. ନିର୍ବୋଧ ପାଗଳ, ସତକଣ ନା ସୃଷ୍ଟ ହୟ ।”^{୫୧}

৩. বালেগ হওয়া: শিশুর উপরে হাজ্জ ফরয নয়। কেননা সে শরীরত পালনের যোগ্য নয় এবং বালেগ হওয়া পর্যন্ত তার থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। যেমন পূর্বের হাদীসে বলা হয়েছে, ... “তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।” বিস্তু সে যদি হাজ্জ করে, তাহলে তার হাজ্জ সহীহ বলে গণ্য হবে। তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক নিয়ত করবে, যদি সে ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে না পারে। তার এ হাজ্জ ফরয হাজ্জ হিসেবে যথেষ্ট হবে না। এতে বিদ্বানগণের নিকট কোনো দ্বিমত নেই।

ইবনু আবুস ইবনু থেকে বর্ণিত। “নিশ্চয় এক মহিলা তার ছেটো শিশুকে উপরে ওঠিয়ে বলল: হে আল্লাহর রসূল! এর জন্য কি হাজ্জ রয়েছে? তিনি ﷺ বললেন: (نَعَمْ، وَلِكَ أَجْرٌ) “হ্যাঁ এবং তোমার জন্য সওয়াব রয়েছে।”^{৫১২}

ନାବି ଶ୍ରୀ ଆରାଦ ବଲେନ:

«أَيُّهَا صَبِّيْ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ أُخْرَى، وَأَيُّهَا عَبْدٌ حَجَّ ثُمَّ عَيْنَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ أُخْرَى»

“କୋନୋ ଶିଶୁ ହାଜି କରଲ ଅତଃପର ବାଲେଗ ହଲୋ । ତାହଲେ ତାର ଜନ୍ୟ ଆରେକବାର ହାଜି କରା ଆବଶ୍ୟକ । କୋନୋ ଦାସ ହାଜି କରଲ ଅତଃପର ଦାସତ୍ତ ଥେକେ ମୁକ୍ତ ହଲୋ । ତାହଲେ ତାର ଜନ୍ୟ ଆରେକବାର ହାଜି କରା ଆବଶ୍ୟକ ।”^{୧୯୩}

৪. স্বাধীন হজয়া: কোনো দাসের উপর হাজ ফরয নয়। কেননা সে গোলাম, যে কোনো কিছুর মালিক নয়। কিন্তু যদি সে তার মানিবের অনুমতি সাপেক্ষে হাজ করে, তাহলে তার হাজ বিশুদ্ধ হবে। বিদ্বানগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, কোনো দাস যদি দাসত্বের অবস্থায় হাজ করে অতঃপর যদি সে দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়, তাহলে তার সামর্থ থাকলে তার উপর ইসলামের হাজ করা আবশ্যিক। দাসত্বের অবস্থায় সে যে হাজ করেছে সেটা তার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে না।

وَأَيْمَانًا عَبْدُ حَجَّ ثُمَّ عَيْقَنَ فَعَلَيْهِ حِجَّةٌ أُخْرَى

“কোনো দাস হাজ্জ করল অতঃপর দাসত্ব থেকে মুক্ত হলো। তাহলে তার জন্য আরেকবার হাজ্জ করা আবশ্যিক।”^{৫৪}

৫. সক্ষম হওয়া: আল্লাহ তা'আলা বলেন

﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّةُ الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا...﴾

^{२३} सुनान आबू दाउद, शा. ४४०१; ईबनू माजाह, शा. २०८१।

১২২ নবীন মসলিম, দা. ৩১৪৪, ফুআ, ১৩৩৬।

^{২০} মসন্দাদশ শাফের্স, হা. ৭৪৩; বায়বাকী ৫/১৭৯; ইয়াম আলবানী সহীহ বলেছেন, ইরাওয়া, ৯৮৬।

^{২৪} মসনদেশ শাফের্স, পা. ৭৪৩; বায়বাকী ৫/১৭৯: ইয়াম আলবানী সহীহ বলেছেন, ইরওয়া, ১৮৬।

“যেসব মানুষ সফর করার আর্থিক সামর্থ্য রাখে তাদের উপর আবশ্যক আলাহর উদ্দেশ্যে এই গৃহের হাজ্জ করা।” [সূরা আলি ইমরান : ৯৭]

যে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী নয়, যেমন কারো নিকটে এমন পরিমাণ পাখেয় নেই যেটা তার হাজ্জ করতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে এবং তার পরিবারের জন্যও যথেষ্ট হবে (তার হাজ্জে থাকা অবস্থায়) অথবা সে যদি মকায় যাওয়ার জন্য কোনো বাহন না পায় বা যে শারীরিক দিক থেকে সক্ষম নয়, যেমন সে ব্যক্তি অতিবৃদ্ধ অথবা অসুস্থ, যে বাহনে আরোহন করতে সক্ষম নয় এবং সফরের কষ্ট বহন করতে সক্ষম নয় বা তার জন্য যদি হাজ্জ করতে যাওয়ার রাস্তা নিরাপদ না হয়, যেমন পথে যদি ছিনতাইকারী থাকে বা কোনো মহামারি থাকে, যে কারণে সে নিজের জান ও মালের উপর আশঙ্কা করে। তাই এ ধরনের ব্যক্তিদের উপরে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত হাজ্জ ফরয নয়। আল্লাহ বলেন: ﴿يُكَلِّفُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا وُسْعَهَا لَا يَكُونُ لِإِنْسَانٍ إِلَّا مَا أُمِرَّ بِهِ﴾

“কোনো ব্যক্তির উপর আল্লাহ তার সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ চাপান না।” [সূরা বাক্সারাহ : ২৮৬]

সাধ্যমত সক্ষমতার কথাই আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন। আর মহিলাদের ক্ষেত্রে সক্ষমতা হলো মাহরাম বিদ্যমান থাকা যিনি তার সফরসঙ্গী হবেন। কারণ মাহরাম ছাড়া তার জন্য হাজ্জ কিংবা যে-কোনো সফর বৈধ নয়। নাবী ﷺ বলেছেন:

لَا يَكُلُّ لِإِنْسَانٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ ابْنَهَا،
أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ أَخْوَهَا، أَوْ ذُو حَرْمَمٍ مِنْهَا

“যে মহিলা আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে তার জন্য বৈধ নয় যে, তিনিদিন বা তার অতিরিক্ত সময়ের পথ সফর করবে তার পিতা অথবা তার ছেলে অথবা তার স্বামী অথবা তার ভাই অথবা তার অপর কোনো মাহরাম আতীয়কে সঙ্গী করা ব্যতীত।”^{৫৫}

নাবী ﷺ এক ব্যক্তিকে বলেছিলেন:

قَالَ: إِنَّ امْرَأَيْ خَرَجَتْ حَاجَةً، وَإِنِّي أَكْتَبْتُ فِي غَزَوةَ وَكَذَا، قَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَهَا.

“এক ব্যক্তি বলল, আমার স্ত্রী হাজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে এবং আমাকে অমুক সৈন্য বাহিনীতে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তিনি ﷺ বললেন: তুমি যাও এবং তার সাথে হাজ্জ করো।”^{৫৬}

যদি কোনো মহিলা মাহরাম ছাড়াই হাজ্জ করে তাহলে তার হাজ্জ বিশুद্ধ হবে। কিন্তু সে মাহরাম ছাড়া হাজ্জ করার কারণে পাপী হবে।

^{৫৫} সহীহ মুসলিম, হা. ৩১৬১, ফুআ. ১৩৪০।

^{৫৬} মুজাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ১৮৬২; সহীহ মুসলিম, হা. ৩১৬৩, ফুআ. ১৩৪১।

المسألة الخامسة: حكم العمرة وأدلة ذلك

পঞ্চম মাসআলা: উমরার লকুম ও তার দলীল

সক্ষম ব্যক্তির উপর জীবনে একবার উমরা করা ওয়াজিব। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ لِلّهِ﴾

“আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হাজ্জ ও ‘উমরাহকে পূর্ণ করো।” [সূরা বাকুরাহ : ১৯৬]

নাবী ﷺ আয়িশাহ رض কে বলেছিলেন যখন সে জানতে চাইল: মহিলাদের উপরে কি জিহাদ ফরয? আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন: **نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ، لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجَّ وَالْعُمْرَةُ**

“হ্যা। তাদের উপর জিহাদ ফরয। তবে তাতে কোনো যুদ্ধ নেই। আর সে জিহাদ হচ্ছে হাজ্জ ও উমরা করা।”^{৫৭}

আবু রায়ীন যখন জানতে চাইল যে তার পিতা হাজ্জ, উমরা ও বাহনে আরোহণ করতে সক্ষম নয় তখন তিনি বলেছিলেন: **حُجَّ، عَنْ أَبِيكَ، وَاعْتَمِزْ**

“তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হাজ্জ ও উমরা পালন করো।”^{৫৮}

উমরার রূবন্ধ তিনটি: ১. ইহরাম বাঁধা, ২. তাওয়াফ করা ও ৩. সাঁজ করা।

المسألة السادسة: موافقة الحج والعمرة

ষষ্ঠ মাসআলা: হাজ্জ ও উমরার মীকাত

মীকাতের আবিধানিক অর্থ: **الحد** বা সীমানা বা সীমা।

পরিভাষায়: “ইবাদতের স্থান বা সময়কে মীকাত বলা হয়।”

মীকাত দুই প্রকার: ১.সময় ২. স্থানগত।

হাজ্জ ও উমরার সময়ের মীকাত:

উমরা: বছরের যে কোনো সময়ে উমরা আদায় করা বৈধ।

^{৫৭} আহমাদ ৬/১৬৫; ইবনু মাজাহ, হা. ২৯০১।

^{৫৮} সুনান আবু দাউদ, হা. ১৮১০; নাসাই ৫/১১১; ইবনু মাজাহ, হা. ২৯০৪, ২৯০৫; আহমাদ ১/২৪৪; ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহ নাসাই, হা. ২৪৭৩।

হাজের জন্য মাস নির্ধারিত। হাজের কোনো আমলই এ মাসগুলো ছাড়া অন্য মাসে বৈধ হবে না। **আল্লাহ তা'আলা বলেন:** ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٌ﴾

“হাজ হয় কয়েকটি নিদিষ্ট মাসে।” [সূরা বাকুরাহ : ১৯৬]

সে মাসগুলো হলো শাওয়াল, যুল কু'দাহ ও যুল হিজাহ।

হাজ ও উমরার স্থানগত মীকাত: হাজ ও উমরা পালনকারীর জন্য ইহরাম ছাড়া এ সীমানাগুলো অতিক্রম করা বৈধ নয়। নাবী ﷺ সেগুলো ইবনু আবাস ﷺ এর হাদীসে বর্ণনা করেছেন।

وقَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحَلِيقَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُنُفَةِ، وَلِأَهْلِ تَجْدِيدِ قَرْنَيْنِ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَلَمَ، هُنَّ هُنَّ، وَلَمْنَ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ

“আল্লাহর রসূল ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য যুল হলায়ফাহ; সিরিয়ার অধিবাসীদের জন্য জুহফা; নাজদবাসীদের জন্য কারনুল মানায়িল; ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলামকে মীকাত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এগুলো ঐসব এলাকার লোকদের মীকাত এবং এর বাইরের যে সব লোক হাজ ও উমরার উদ্দেশ্যে ঐসব এলাকা হয়ে আসবে, তাদের মীকাত। আর যেসব লোক উন্নিখিত মীকাতসমূহের অভ্যন্তরে বসবাস করে, তারা স্থান থেকে ইহরাম বাঁধবে, এভাবে যারা আরও ভিতরে, তারা সে স্থান হতে। এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকে।”^{৫৯৯}

যে ব্যক্তি এ মীকাতগুলো ইহরাম ছাড়াই অতিক্রম করবে, তার উপরে উজ্জ স্থানে ফিরে আসা আবশ্যিক, যদি তার ফিরে আসা সম্ভব হয়। আর ফিরে আসা সম্ভব না হলে তার উপরে ফিদয়া আবশ্যিক। আর ফিদয়া হচ্ছে একটি ছাগল, যা সে মক্কায় যবেহ করবে এবং হারামের মিসকিনদের মাঝে বণ্টন করে দিবে।

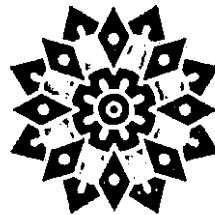
আর যারা মীকাতগুলোর বাইরের অধিবাসী হবে (অর্থাৎ মীকাতের স্থানগুলোর ভেতরের), তারা নিজেদের স্থান থেকেই ইহরাম বাঁধবে। পূর্বের হাদীসে যেমন বলা হয়েছে।

وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ

“আর যেসব লোক উন্নিখিত মীকাতসমূহের অভ্যন্তরে বসবাস করে, তারা স্থান থেকে ইহরাম বাঁধবে।”^{৬০০}

^{৫৯৯} মুঢ়াফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ১৫২৪; সহীহ মুসলিম, হা. ২৬৯৩, ফুআ. ১১৮১; অন্য বর্ণনায় রয়েছে: ইরাকবাসীর মীকাত যাতৃ ইরাক।

^{৬০০} মুঢ়াফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ১৫২৪; সহীহ মুসলিম, হা. ২৬৯৩, ফুআ. ১১৮১।



الباب الثاني: في أركان الحج وواجباته

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: হাজের রূক্মণ ও ওয়াজিবসমূহ

এই অনুচ্ছেদে দুটি মাসআলা রয়েছে।

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: فِي أَرْكَانِ الْحَجَّ

প্রথম মাসআলা: হাজের রূক্মণসমূহ

হাজে রূক্মণ চারটি। সেগুলো হলো:

১. ইহরাম বাঁধা: তা হচ্ছে হাজের নিয়ত ও ইচ্ছা পোষণ করা; কারণ হাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। সকল আলেমের ঐকমত্যে এটি নিয়ত ছাড়া বিশুद্ধ হবে না। যেমন নাবী ﷺ বলেছেন: “إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْبَيْتَ” “প্রত্যেক কাজ নিয়ত অনুযায়ী হয়ে থাকে।”^{৬০১}

নিয়তের স্থান হলো অন্তর। কিন্তু হাজের নিয়ত মুখে উচ্চারণ করাই উত্তম। কারণ এটি নাবী ﷺ থেকে প্রমাণিত।

২. আরাফায় অবস্থান করা: সমস্ত আলেমের ইজমা অনুপাতে এটিও রূক্মণ নাবী ﷺ বলেন: (الْحَجُّ عَرْفَةُ) “আরাফাই(আরাফার মাঠে অবস্থান করা) হাজে।”^{৬০২}

আর অবস্থান করার সময় হলো: আরাফার দিন (তারিখে) সূর্যাস্তের পর থেকে কুরবানির দিনের সূর্যদয় পর্যন্ত।

৩. তাওয়াকে যিয়ারাহ: তাকে তাওয়াকে ইফায়াও বলে। কারণ তা আরাফায় গমনের পরে হয়ে থাকে। এটিকে (তাওয়াফুল ফারয) বলা হয়। ইজমার ভিত্তিতে এটিও রূক্মণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿لَيَقْصُرُوا تَفْثِئُهُمْ وَلَيُوْفُوا نُذُورَهُمْ وَلَيَطْوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾

“অতঃপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাদের মানত পূর্ণ করে, সম্মানিত গ্রহের তাওয়াফ করে।” [সূরা হাজে : ২৯]

^{৬০১} مُؤْتَدِّل আলাইছি: সহীল বুখারী, হা. ১; সহীহ মুসলিম, হা. ১৯০৭

^{৬০২} تিরিমিয়া, হা. ৮৮৯; সুনান আবু দাউদ, হা. ১৯৪৯; নাসাঈ ৫/২৫৬; মুসতাদরাকে হাকিম ২/২৭৮; ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, নহীন নাসাঈ, হা. ২৮২২

৪. সাফা ও মারওয়ার সাঁজি করাঃ এটি হাজ্জের রুকন। আয়িশাহ رض থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

مَا أَنْتَ اللَّهُ حَجَّ اُمْرِي، وَلَا عُمْرَتُهُ لَمْ يَطْفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

“যে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঁজি করে না, আল্লাহ তার হাজ্জ ও উমরাহ পূর্ণ করবেন না।”^{৬০৩}

নাবী ﷺ বলেন: اسْعَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ

“তোমরা সাঁজি করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপরে সাঁজিকে ফরয করে দিয়েছেন।”^{৬০৪}

এই রুকনগুলো ছাড়া হাজ্জ সম্পন্ন হবে না। যে ব্যক্তি এই রুকনগুলোর কোনো একটি ছেড়ে দিবে, তার হাজ্জ পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ না সে ছেড়ে দেওয়া রুকন আদায় করবে।

المسألة الثانية: واجبات الحج الثانية: হাজ্জের ওয়াজিবসমূহ

১. শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত স্থান থেকে ইহরাম বাঁধা।

২. যে ব্যক্তি দিনের বেলায় আরাফায় আসবে তাঁর জন্য সুর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা; কারণ নাবী ﷺ সুর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করেছেন। যার আলোচনা হজ্জের বিবরণে আসবে এবং তিনি ﷺ বলেছেন:

“তোমরা আমার থেকে হাজ্জের নিয়মকানুন শিখে নাও।”

৩. কুরবানির রাতে মুয়দালিফায় অবস্থান করলে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত মুয়দালিফায় অবস্থান করা; কারণ নাবী ﷺ এ কাজটিও করেছেন।

৪. আইয়্যামুত তাশরীক (أيام التشرق) এর রাতগুলোতে মিনায় অবস্থান করা।

৫. ধারাবাহিকভাবে জামরায় পাথর নিক্ষেপ করা।

৬. মাথা কামানো অথবা চুল ছেটো করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَحَلِّقِينَ رُءُوسَهُمْ وَمُقْصِرِينَ﴾

“মাথা ন্যাড়া করা অবস্থায় ও চুল কেটে।” [সুরা ফাতহ : ২৭]

তা ছাড়া নাবী ﷺ একাজটি করেছেন এবং করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

৭. হায়েয ও নেফাসগ্রন্থ মহিলারা ছাড়া অন্যান্যদের জন্য বিদায় তাওয়াফ করা। ইবনু আব্বাস رض থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

^{৬০৩} সহীহ মুসলিম, ঘ., ফুআ, ১২৭৭।

^{৬০৪} আহমাদ ৬/৪২১, ইবনু খুবায়মাহ, ঘ. ২৭৬৩; বায়হাবী ৫/৯৮; ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, তালীক সহীহ ইবনু খুবায়মাহ ৪/২৩২

أَمْرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْيَتِيمِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّقَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ

“লোকদের আদেশ দেওয়া হয় যে, তাদের শেষ কাজ যেন হয় বাইতুল্লাহর তাওয়াফ। তবে এ হ্রাস ঝুঁতুমতি মহিলাদের জন্য শিথিল করা হয়েছে।”^{৬০৫}

এই ওয়াজিবগুলোর মধ্য হতে কোনো একটি ওয়াজিব যদি কেউ ইচ্ছাকৃত বা ভুলবশত বর্জন করে, তাহলে সে দম দিবে। তাহলে তার হাজ্জ বিশুद্ধ হয়ে যাবে। ইবনু আব্বাস رض থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “নসি মন নসকে শিনা^أ ও তরকে ফলিগ দম।”^{৬০৬}

“ভুলবশত কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে হাজ্জের পালনীয় যে-কোনো বিষয়গুলোর মধ্য হতে কোনো একটি ছুটে গেলে, সে যেন দম দেয়।”^{৬০৭}

উল্লিখিত আমলগুলো ব্যতীত অন্যান্যগুলো সুন্নাত হিসেবে গণ্য হবে। নিম্নে হাজ্জের গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতগুলো উল্লেখ করা হলো-

১. ইহরামের জন্য গোসল করা এবং সুগন্ধি লাগানো ও দুটি সাদা কাপড় পরিধান করা।
২. নক, নাভির লোম, বগলের লোম কেটে ফেলা, গৌঁফ খাটো করা এবং এছাড়া আরও যা কিছু কাটা দরকার তা কেটে ফেলা।
৩. হাজ্জ ইফরাদ ও ফ্রিরান পালনকারীর জন্য তাওয়াফে কুদুম করা।
৪. তাওয়াফে কুদুমে প্রথম তিনবার রমল করা।
৫. তাওয়াফে কুদুমে ইযতিবা করা; ইযতিবা হলো- চাদরের মাঝের অংশ ডান কাঁধের নিচে এবং তার দুই প্রান্ত বাম কাঁধের উপরে রাখা।
৬. আরাফার রাতে মিনায় অবস্থান করা।
৭. জামরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত ইহরামের সময় তালবিয়া পাঠ করা।
৮. মুয়দালিফায় মাগরিব ও ইশার মাঝে জমা-তাকুদীম করা।
৯. সত্ত্ব হলে ফজর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত মুয়দালিফায় মাশয়ারে হারামের নিকটে অবস্থান করা। সেটা না পারলে মুয়দালিফার সবটুকুই অবস্থান করার।

^{৬০৫} মুওফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ১৭৫৫; সহীহ মুসলিম, হা. ১৩২৮।

^{৬০৬} দারাকুঢ়নী ২/১৯১, হা. ২৫১২; বায়হাকী ৫/১৫২ এবং অন্যান্যরা। এটা ইবনু আব্বাস رض থেকে প্রমাণিত। যেমন বলেছে ইবনু আব্দুল বার তার ইস্তিয়কার গ্রন্থে ১২/১৮৪; এবং আলবানী তার ইরওয়া গ্রন্থে ৪/২৯৯।



الباب الثالث : في المحظورات والفدية والهدى তৃতীয় অনুচ্ছেদ: বিধিনিষেধ, ফিদয়া ও হাদীর পশ্চ

এই অনুচ্ছেদে কিছু মাসআলা রয়েছে:

المسألة الأولى: في محظورات الإحرام প্রথম মাসআলা: ইহরামের বিধিনিষেধ

শরীয়ত কর্তৃক মুহরিম ব্যক্তির জন্য করা নিষেধ কর্মসমূহ নয়টি:

১. সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা: যেমন পায়জামা, পোশাক ও অন্যান্য কাপড় যেগুলো শরীরে পৃথক পৃথকভাবে থাকে। তবে কেউ যদি লুঙ্গি না পায় তাহলে তার জন্য পায়জামা পরিধান করা বৈধ। এ নিষিদ্ধ কাজটি পুরুষদের জন্য। আর মহিলারা যে-কোনো কাপড় পরিধান করতে পারে। তবে নেকাব ও মোজা পরিধান করতে পারবে না। আলোচনা সামনে আসছে।
২. শরীর কিংবা কাপড়ে সুগন্ধি ব্যবহার করা : অনুরূপভাবে সুগন্ধির শ্বাগ নেওয়াও নিষেধ। তবে যে সমস্ত উত্তিদের সুগন্ধ নেই সেগুলোর শ্বাগ নেওয়া বৈধ। আর যেগুলোর সুগন্ধ নেই সেগুলো দ্বারা চোখে সুরমাও লাগাতে পারবে।
৩. পশম বা নখ কাটা: চাই সে পুরুষ কিংবা মহিলা হোক। তার জন্য হালকাভাবে মাথা ধৌত করা বৈধ রয়েছে। আর যদি তার কোনো নখ ভেঙ্গে যায়, তাহলে তা নিক্ষেপ করাও বৈধ রয়েছে।
৪. পুরুষের এমন কাপড় দ্বারা মাথা ঢাকা যেটা মাথার সাথে লেগে থাকে: তবে তার জন্য কোনো তাবু বা গাছের মাধ্যমে ছায়া নেওয়া বৈধ রয়েছে। মুহরিম ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনে ছাতা দ্বারা ছায়া নেওয়া বৈধ রয়েছে। আর মহিলাদের জন্য নেকাব কিংবা বোরকা দ্বারা মুখমণ্ডল ঢাকা নিষেধ। কোনো গাইরে মাহরাম ব্যক্তি থাকলে উড়ন্ত দ্বারা মুখমণ্ডল ঢাকা আবশ্যিক। মহিলাদের জন্য মোজা পরিধান করা নিষেধ। তাছাড়া অন্য যে-কোনো কাপড় পরিধান করতে ইচ্ছা করলে পরতে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি অজ্ঞতা কিংবা ভুলবশত সুগন্ধি লাগাবে বা মাথা ঢাকবে কিংবা সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করবে, তার কোনো পাপ হবে না। কেননা নাবী ﷺ বলেছেন:

عَفِي لِمَنْ تَبَطَّأَ، وَالنُّسْيَانُ، وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِ.

“আমার উক্ষত থেকে ভুলবশত কোনো কাজ করলে বা ভুলে গেলে কিংবা কোনো অপচন্দনীয় কাজের প্রতি তাকে বাধ্য করা হলে তার থেকে এগুলো ক্ষমা করা হয়েছে।”^{৬০৭}

তবে যখনই কোনো অজ্ঞ ব্যক্তি জানতে পারবে বা কোনো ভুলকারী ব্যক্তির স্মরণ হবে কিংবা বাধ্যকরণ দূর হবে, তখনই এই নিষিদ্ধ কাজ থেকে তার ফিরে আসা আবশ্যিক।

৫. নিজে বিবাহ করা কিংবা অন্যকে বিবাহ পড়ানো।

৬. মৌনিপথে সহবাস করা: প্রথম হালালের পূর্বে এমন কাজ হলে তা হাজ্জ বিনষ্টকারী হয়ে যাবে। যদিও তা আরাফার ময়দানে উপস্থিতির পরে হয়।

৭. লজ্জাস্থান ছাড়াই স্ত্রীর সংস্পর্শে যাওয়া: তবে এটা হাজ্জকে নষ্ট করবে না। তেমনিভাবে তাকে চুমু দেওয়া, স্পর্শ করা বা তার দিকে কামভাব নিয়ে তাকানো হাজ্জকে নষ্ট করবে না।

৮. স্থলচর প্রাণী হত্যা কিংবা শিকার করা: তবে তার জন্য সে সমস্ত দুরাচারী প্রাণীগুলো হত্যা করা বৈধ, যেগুলো নাবী ~~কর্তৃ~~ হালাল কিংবা হারামে, মুহরিম কিংবা গাইরে মুহরিম উভয়ের জন্যই হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সেগুলো হলো- কাক, ইঁদুর, বিছু, চিল, সাংপ এবং কামড়াতে অভ্যন্ত এমন কুকুর। তার জন্য স্থলের কোনো শিকারে সাহায্য করাও বৈধ নয়। চাই তা ইশারা কিংবা যে-কোনোভাবে হোক না কেন। আর বিশেষভাবে তাকে উদ্দেশ্য করে কোনো কিছু শিকার করলে সেটাও তার জন্য খাওয়া বৈধ নয়।

৯. মুহরিম কিংবা অন্য ব্যক্তির জন্য হারামের কোনো গাছ বা উভিদ কাটাও বৈধ নয়, তবে গাছের কারণে সমস্যা হলে ভিন্ন কথা: তবে রাস্তায় চলার পথে কষ্টদায়ক উভিত কেটে ফেলা বৈধ। তবে সমস্ত আলেমের ঐকমত্যে হারামের গাছসমূহ থেকে ইয়খির এবং মানুষ যা কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন করে, সেগুলোকে আলাদা করা হয়েছে।

فِدْيَةُ الْمَحْظُوراتِ

দ্বিতীয় মাসআলা: নিষিদ্ধ কাজসমূহের ফিদয়া বা জরিমানা

চুল মুগুন, নক কাটা, সেলাই করা কাপড় পরিধান করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, মাথা ঢাকা, স্ত্রীর দিকে দৃষ্টি দেওয়ার কারণে বীর্য বের হওয়া এবং বীর্য বের হওয়া ছাড়াই স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করা: এসব কাজের জন্য তিনি প্রকারের মধ্য হতে যে-কোনো এক ধরনের ফিদয়া প্রদান করতে হবে:

১. তিনদিন রোজা রাখতে হবে।
২. অথবা ছয়জন মিসকিনকে খাওয়াতে হবে।

^{৬০৭} সুনান ইবনে মাজাহ, ঘ. ২০৪৫; শান্তিক পার্থক্য রয়েছে।

৩. অথবা একটি ছাগল যবেহ করতে হবে। নাবী ক'ব বিন উজরাকে বলেছিলেন, যখন তাকে তার মাথার উকুন কষ্ট দিচ্ছিল:

الْخَلِقَ رَأْسَكَ، وَصُمِّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِنْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوْ اشْتَكِ بِشَاءَ

“মাথা মুণ্ডন করে ফেল। তুমি তিনদিন সওম পালন করো অথবা ছয়জন মিসকিনকে খাওয়াও অথবা একটি ছাগল কুরবানি করো।”^{৬০৮}

অন্যান্য কাজগুলোকে এগুলোর উপরেই অনুমান করে নিতে হবে। কারণ এগুলো ইহরামে
হারাম। কিন্তু এগুলো হাজকে নষ্ট করবে না।

আর কেউ কোনো প্রাণী শিকার করলে তাকে যে-কোনো তিনটি কাজ করতে হবে; হয়তো সে শিকারকৃত প্রাণির ন্যায় অনুরূপ কিছু যবেহ করবে, নয়তো যবেহকৃত প্রাণির মূল্য নির্ণয় করে সেটা দিয়ে এমন খাদ্য ত্রয় করবে যেটা ফিতরা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে; সেখান থেকে প্রতিটি মিসকিনকে এক মুদ গম বা অন্যান্য খাদ্য যেমন খেজুর, যব ইত্যাদি থেকে অর্ধ সা করে দিবে, নয়তো প্রতিদিন মিসকিনকে খাওয়ানোর পরিবর্তে রোজা রাখবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَنْ قُتِلَ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ مِثْلُ مَا قُتِلَ مِنَ النَّعْمَ يَخْتَمُ بِهِ ذَوَا عَذَلٍ مِّنْكُمْ هُدْيَا بَالِغُ الْكُفْبَةِ أَوْ كَفَارَةً طَعَامٌ مَسَاكِينٌ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا﴾

“আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক শিকার হত্যা করবে, তার উপর তখন বিনিময় ওয়াজিব হবে, যা (মূল্যের দিক দিয়ে) সেই জানোয়ারের সমতুল্য হয়, যাকে সে হত্যা করেছে। যার (আনুমানিক মূল্যের) মীমাংসা তোমাদের মধ্য হতে দুইজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি করে দিবে। সেই বিনিময় গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু হাদী স্বরূপ কাঁবা ঘরে পৌঁছে দিবে, অথবা তার কাফ়ফারা হলো মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করবে, অথবা এর সমপরিমাণ সিয়াম পালন করবে।” [সুরা মায়দাহ : ৯৫]

প্রথম হালালের পূর্বেই হাজে কেউ সহবাস করলে, স্ত্রীর সংস্পর্শে আসার কারণে বীর্য বের হলে বা হস্তমেথুন করলে বা স্ত্রীকে চুমু দিলে বা তাকে কামনার সাথে স্পর্শ করলে বা বারবার তাকালে, হাজে নষ্ট হয়ে যায়। যদিও ভুলবশত বা না জেনে কিংবা বল প্রয়োগের কারণে এগুলোতে লিঙ্গ হয়। তার জন্য একটি পশু কুরবানি করা আবশ্যিক এবং পুনরায় হাজে করা এবং তাওবা করা আবশ্যিক। আর প্রথম হালালের পরে হলে হাজে নষ্ট হবে না। তবে তার জন্য একটি বকরি কুরবানি করা আবশ্যিক। বিবাহ সম্পাদন করার বিষয়টিতে তার উপরে ফিদয়া আবশ্যিক নয়। শুধুমাত্র আকুন্দটা ফাসেদ বলে গণ্য হবে।

ଆର ହାରାମେ କୋନୋ ଗାଛ କିଂବା ଉତ୍ତିଦ କେଟେ ଫେଲା, ସେଗଲେ ମାନୁଷ ଉତ୍ସାଦନ କରେନି; ଛୋଟେ ଗାହେର କ୍ଷେତ୍ରେ ଛାଗଲ ଏବଂ ବଡ଼ୋର କ୍ଷେତ୍ରେ ଗରୁ ଜରିମାଳା ଦିତେ ହବେ । ଘାସ ଓ ପାତାର କ୍ଷେତ୍ରେ ତାର ସମ୍ପର୍କିଯାଣ ମୂଲ୍ୟ ଫିଦ୍ୟା ଦିତେ ହବେ । କାରଣ ଏଗଲୋର ମୂଲ୍ୟ ରଯେଛେ ।

^{৩৪} মুসাকান আলাইহি: সবীতল বুখারী, হা. ১৮১৫; সবীহ মুসলিম, হা. ১২০১।

যে ইচ্ছাকৃত এই কাজগুলো করবে তার ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য। কিন্তু যে না জেনে বা ভুলবশত কাটবে, তার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই।

المسألة الثالثة: في الهدى وأحكامه তৃতীয় মাসআলা : হাদী ও তার বিধান

হাদীস:

ما يهدى إلى البيت الحرام من بعثة الأنعام -الابل والبقر والغنم- تقرباً إلى الله تعالى.

“আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ হারামে যেই চতুর্থপদ জন্ত (উট, গরু ও ছাগল) পাঠানো হয় তাকে হাদী বলা হয়।”

হাদীর প্রকারসমূহ:

১. হাজ্জে তামাতু এবং কুরবানের হাদী: যে মসজিদে হারামে উপস্থিত হবে না, তার জন্য এটা আবশ্যিক। আর এটি কুরবানির জন্য, ক্ষতিপূরণের জন্য নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَمَنْ تَمَّعَ بِالْعُمَرَةِ إِلَى الْحِجَّةِ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدْيِ﴾

“যে ব্যক্তি তামাতু (হাজ্জে তামাতু) করে উমরাহ ও হাজ্জ একত্র করার মাধ্যমে তাহলে যা সহজ প্রাপ্য তা-এই কুরবানি করবে।” [সূরা বাক্সারাহ : ১৯৬]

যদি তার নিকট হাদী বা হাদীর ক্রয়ের মতো অর্থ না থাকে, তবে হাজ্জের সময়ই তিনদিন রোজা রাখবে। আর এই দিনগুলোতেও তার জন্য রোজা রাখা বৈধ এবং হাজ্জ থেকে ফিরে এসে সাতটি রোজা রাখবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قِصَّيْمٌ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحِجَّةِ وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾

“কিন্তু যদি কেউ তা (পশু) না পায়, তবে তাকে হাজ্জের সময় তিন দিন এবং (ঘরে) ফিরে আসার পর সাত দিন সিয়াম পালন করতে হবে।” [সূরা বাক্সারাহ : ১৯৬]

আর হাজ্জ পালনকারীর জন্য হাজ্জে তামাতু ও কুরবানির পশুর গোশত খাওয়াও মুন্তাহ্য। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُغَرَّبَ﴾

“তা থেকে খাও এবং ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে ও যান্ধাকারী অভাবগ্রস্তকে খাওয়াও।” [সূরা হাজ্জ : ৩৬]

২. ক্ষতিপূরণের জন্য হাদী: তা হলো কোনো ওয়াজিব বর্জন করার কারণে বা ইহরামের নিষিদ্ধ কাজসমূহে লিপ্ত হওয়ার কারণে কিংবা কোনোভাবে বাধাগ্রস্থ হলে যে ওয়াজিব ফিদয়া দেওয়া হয়। আল্লাহর তা'আলা বলেন:

﴿فَإِنْ أَخْصِرْتُمْ فَمَا أَسْتَيْسِرَ مِنَ الْهَذِي﴾

“কিন্তু যদি তোমরা বাধাগ্রস্থ হও, তবে যা স্তুত কুরবানী দিবে।” [সূরা বাক্সারাহ : ১৯৬]

ইবনু আবাস رض বলেন: من نسي من نسكه شيئاً أو تركه، فليرق دماً

“কোনো ব্যক্তি হাজের কোনো পালনীয় বিষয় ভুলে গেলে বা ছেড়ে দিলে, সে যেন একটি পশু যবেহ করে।”^{৬০৯} এ ধরনের পশুর গোশত খাওয়া বৈধ নয়। বরং তা হারামের দরিদ্রদের মাঝে সাদকা করে দিতে হবে।

৩. মুস্তাহব হাদী: এটি প্রত্যেক হাজ পালনকারী ও প্রত্যেক উমরা পালনকারীর জন্য মুস্তাহব। কারণ এটি নাবী ﷺ করেছেন। নাবী ﷺ বিদায় হাজে একশটি উট কুরবানি করেছিলেন।

এ ধরনের হাদী থেকে খাওয়াও মুস্তাহব। কারণ নাবী ﷺ প্রত্যেক উটের কিছু গোশতের টুকরা নিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, অতঃপর তা রান্না করা হয়েছিল এবং নাবী ﷺ তা খেয়েছিলেন ও তার বোল পান করেছিলেন।^{৬১০} البَضْعَةُ গোশতের টুকরা।

মুহরিম ব্যক্তি ছাড়া অন্যান্যদের জন্য মকায় হাদী পাঠানো বৈধ রয়েছে। যাতে তা যবেহ করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে। মুহরিম ব্যক্তিদের জন্য যা হারাম তা অন্যদের জন্য হারাম নয়।

৪. মানত করার হাদী: তা হলো হাজ পালনকারী বাযতুল্লাহর নিকটে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য যে মানত করে, তার জন্য এ নয়র পূর্ণ করা আবশ্যিক। আল্লাহর তা'আলা বলেন:

﴿ثُمَّ لَيَقْضُوا تَقْنَمُهُمْ وَلَيُوْفُوا نُدُورَهُمْ﴾

“অতঃপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাদের মানত পূর্ণ করে।” [সূরা হাজ : ২৯]

এ হাদী থেকে তার জন্য খাওয়া বৈধ নয়।

হাদী যবেহ করার সময়: হাজে তামাত্তু ও ক্রিবানের হাদী যবেহ করার সময়, কুরবানির দিন ঈদের সলাতের পর থেকে আয়ামুত তাশরীকের শেষ দিন পর্যন্ত। আর ক্ষতি পূরণের যবেহ যখন ইচ্ছা করতে পারে। তেমনিভাবে ওয়াজিব বর্জনের যবেহ যখন ইচ্ছা করতে পারে।

আর কোনো কারণে হাজে বাধাগ্রান্ত হলে, একটি বকরী বা উটের এক সপ্তমাংশ কিংবা গরুর এক সপ্তমাংশ কুরবানি করবে। আল্লাহর তা'আলা বলেন:

^{৬০৯} বায়বালী ৫/১৫২।

^{৬১০} সহীহ মুসলিম, দ্বা. ফুজা. ১২১৮।

﴿فَإِنْ أَخْصِرُوكُمْ فَمَا أَسْتَيْسِرَ مِنَ الْهَدِي﴾

“কিন্তু যদি তোমরা বাধ্যতামূলক হও, তবে যা সত্ত্ব কুরবানী দিবে /”[সূরা বাকুরাহ : ১৯৬]

জবাই করার স্থান: তামাত্তু ও ফ্রিনের হাদী জবাই করার ক্ষেত্রে সুন্নাত হলো: সেগুলো মিনায় যবেহ করা। তবে যদি সে হারামের যে-কোনো স্থানে যবেহ করে তাও তার জন্য বৈধ রয়েছে।

তেমনিভাবে কোনো ওয়াজিব বর্জনের ফিদয়া বা নিষিদ্ধকাজসমূহের লিঙ্গ হওয়ার জন্য যে ফিদয়া প্রদান করা হয়, সেগুলোও শুধুমাত্র হারামেই যবেহ করতে হবে। তবে হাজ্জে বাঁধাপ্রাপ্ত হলে যে স্থানে বাঁধাপ্রাপ্ত হবে সেই স্থানেই যবেহ করবে। আর রোজা যে-কোনো স্থানেই রাখা বৈধ।

তবে মুস্তাহবা হলে হাজ্জ পালন অবস্থায় তিনটি রোজা রাখবে এবং ফিরে এসে সাতটি রোজা রাখবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَّتَعْ بِالْعُمُرَةِ إِلَى الْحِجَّةِ فَمَا أَسْتَيْسِرَ مِنَ الْهَدِيِّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِصِيَامًا ثَلَاثَةً أَيَّامًا فِي الْحِجَّةِ
وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً﴾

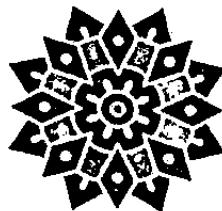
“যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন যে ব্যক্তি তামাত্তু (হাজ্জে তামাত্তু) করে উমরাহ ও হাজ্জ একত্র মাধ্যমে, তাহলে যা সহজ প্রাপ্য তা’ই কুরবানি করবে। কিন্তু যদি কেউ তা (পশু) না পায়, তবে তাকে হাজ্জের সময় তিন দিন এবং (ঘরে) ফিরে আসার পর সাত দিন সিয়াম পালন করতে হবে। এভাবেই দশদিন পূর্ণ করবে।”[সূরা বাকুরাহ : ১৯৬]

মুস্তাহব হলো হাজ্জ পালনকারী নিজেই জবাই করবে। অন্য কেউ যবেহ করলে কোনো সমস্যা নেই। জবাইর সময় হ্যাঁ লাহুম হ্যাঁ মন্তক ওলক। بسم الله، اللهم هذا منك ولك। এ দুআ বলা মুস্তাহব।

হাদীর শর্তসমূহ:

কুরবানির শর্তগুলোই হাদীর শর্ত হিসেবে প্রযাজ্য হবে:

১. হাদীর পশুটি চতুর্পদ প্রাণী হওয়া আবশ্যিক। (অর্থাৎ উট, গরু বা ছাগল হওয়া আবশ্যিক)।
২. সেটিকে দোষ-ক্রিটি থেকে মুক্ত হতে হবে। যেমন: অসুস্থতা, দৃষ্টিহীনতা, লেংড়া এবং দুর্বলতা থেকে মুক্ত হবে হবে।
৩. সেটির শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত বয়স পরিপূর্ণ হতে হবে। যেমন উটের বয়স পাঁচ বছর হতে হবে, গরুর বয়স দুই বছর হতে হবে এবং ছাগলের বয়স এক বছর হতে হবে ও ভেড়ার বয়স ছয় মাস হতে হবে।



الباب الرابع: في صفة الحج والعمرة চতুর্থ অনুচ্ছেদ: হাজ্জ ও উমরার বিবরণ

বিদ্঵ানগণের নিকটে হাজ্জের বিবরণের ব্যাপারে জাবির ^{রহি} এর প্রসিদ্ধ হাদীসটি দলীল হিসেবে পরিগণিত।^{৬১}

আমরা নাবী ^ص থেকে প্রমাণিত সহীহ বর্ণনাগুলো পর্যবেক্ষণ করেছি। অতঃপর আমাদের নিকট সে বর্ণনাগুলো থেকে একটি সারমর্ম তৈরি হয়েছে। যা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

যখন হজ্জ পালনে ইচ্ছা পোষণকারী মীকাতে পৌছাবে তখন তার জন্য গোসল করা মুন্তাহাব এবং যেসমস্ত পশম কেটে ফেলা বা উপড়ে ফেলা দরকার, সেগুলো কেটে ফেলবে এবং উপড়ে ফেলবে। যেমন- বগলের পশম, নাভির নিচের পশম, গৌফ। তার নখ কেটে নিবে। পুরুষ লোকেরা সেলাই করা কাপড় থেকে মুক্ত হবে, হাজ্জের পালনীয় কাজসমূহে প্রবেশের পূর্বেই শরীরে সুগন্ধি লাগাবে এবং পুরুষেরা দুটি সাদা পরিচ্ছন্ন ইয়ার বা লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করবে। আর মহিলারা ঘে-কোনো কাপড় পরিধান করে ইহরাম বাঁধবে। পুরুষেরা তাদের দুই কাঁধ চাদর ধারা ঢাকবে এবং যে কাজের তারা ইচ্ছা করেছে, তা আরও করবে। অর্থাৎ হাজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধবে। উন্নত হলো তার এ ইহরামটা যাতে বাহনের উপরে হয়। আর কোনো মুহরিম জীবনের ভয় করলে, যেমন- অসুস্থতা, ছিনতাই ইত্যাদি সে বলবে: أَنْ مَحِلٌّ حَيْثُ حَبَشَتِي

“তুমি যেখানে আমাকে আটকিয়ে দিবে, সেখানে আমি ইহরাম খুলব।”^{৬২}

^{৬১} সহীহ মুসলিম, ঘ. ২৮৩৩-২৮৩৬, ২৮৪০, ফুআ. ১২১৬, ১২১৮।

^{৬২} সহীহ মুসলিম, ঘ. ২৭৯৩, ফুআ. ১২০৭।

ইহরাম বাঁধার সময় তার জন্য কিবলামুখী হওয়া মুস্তাহাব এবং বলবে:

اللَّهُمَّ هَذِهِ حِجَّةٌ لِرِيَاءِ فِيهَا وَلَا سَمْعَةٌ

“হে আল্লাহ! এই আমার হাজ্জে কোনো মানুষকে দেখানো কিংবা শুনানোর নিয়ত নেই।”^{৬১৩}
এ শব্দগুলোর মাধ্যমে তালবিয়া শুরু করবে:

لَبِيكَ اللَّهُمَّ لَبِيكَ، لَبِيكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبِيكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ.

“হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপস্থিত হয়েছি, তোমার নিকট উপস্থিত হয়েছি, তোমার নিকট উপস্থিত আছি। তোমার কোনো অংশীদার নেই, আমি তোমার সমীপে উপস্থিত হয়েছি। যাবতীয় প্রশংসা ও নিয়মত তোমারই এবং সমগ্র রাজত্ব তোমারই। তোমার কোনো অংশীদার নেই।”^{৬১৪}

সাহাবীগণ “لَبِيكَ ذِي الْعَدْوَانِ لَبِيكَ” এ শব্দগুলো বৃক্ষি করতেন। তালবিয়া পাঠ করার সময় আওয়াজ উচু করা সুন্নাত। যখন সে মকায় পৌছাবে তার জন্য গোসল করা মুস্তাহাব। অতঃপর কোনো পুরুষ ব্যক্তি তাওয়াফ করলে ইজতিবা’ করবে। ইজতিবা বলা হয়: “তার ডান কাঁধকে খোলা রাখবে এবং বাম কাঁধকে চাদরের দুই মাথা দিয়ে ঢেকে রাখবে।” অবশ্যই তাওয়াফের সময় তাকে অজু অবস্থায় থাকতে হবে। তার জন্য হাজরে আসওয়াদকে ইসতিলাম বা স্পর্শ করা ও চুমু দেওয়া মুস্তাহাব। চুমু দেওয়া স্তব না হলে হাত দ্বারা স্পর্শ করে তার হাতকে চুমু দিবে। এটাও স্তব না হলে হাজরে আসওয়াদের দিকে হাত দ্বারা ইশারা করবে। তবে এ অবস্থায় হাতে চুমু দিবে না। এই কাজ প্রত্যেক তাওয়াফের প্রতিবারই করবে এবং প্রত্যেকবার তাকবীর দিয়ে শুরু করবে। بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ বলে তাওয়াফ শুরু করা, এটাই উচ্চম। যখন রুকনে ইয়ামানির নিকটে আসবে, তাকে স্পর্শ করবে, তবে চুমু দিবে না। ইসতিলাম বা স্পর্শ করা স্তব না হলে, তার দিকে ইশারা করবে না এবং তাকবীরও দিবে না। দুই রুকন- রুকনে ইয়ামানী এবং হাজরে আসওয়াদ- এর মাঝে বলবে:

رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً فَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

এছাড়া তাওয়াফের বাকি অংশে যা ইচ্ছা দুআ করবে। তাওয়াফের প্রথম তিনবারে রমাল করা মুস্তাহাব (ছেটো ছেটো পদক্ষেপে দৌড়িয়ে চলাকে রমাল বলা হয়)। আর বাকি চারবারে স্বাভাবিকভাবে হাঁটবে। সাতবার পূরণ হলে কাঁধ চাদর দ্বারা ঢাকবে। অতঃপর মাকামে ইবরাহীমে যাবে এবং পড়বে: ﴿وَرَأَيْدُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصْلِّ﴾

^{৬১৩} হুবলু মাজাহ, পা. ২৮৯০।

^{৬১৪} সহীল বুখারী, পা. ১৫৪৯, ৫৯১৫; সহীহ মুসলিম, পা. ফুআ. ১১৮৪।

“মাকামে ইবরাহীমকে সলাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করো [সূরা বাকুরাহ : ১২৫]।” মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকআত সলাত পড়বে। প্রথম রাকআতে সূরা কাফিফুন পাঠ করবে এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পাঠ করবে। যদি সে ভিড়ের কারণে মাকামের পিছনে সলাত পড়তে সক্ষম না হয়, তাহলে মসজিদের যে কোনো স্থানে সলাত পড়ে নিবে। এ হলো তাওয়াফের বিবরণ। এটি হাজে ইফরাদ ও হাজে কুরান পালনকারীর তাওয়াফে কুনুম এবং হাজে তামাতু পালনকারীদের উমরার তাওয়াফ। অতঃপর সুন্নাহ হলো যে, যমযমের পানি পান করবে এবং তা মাথায় ঢালবে। অতঃপর হাজের আসওয়াদের নিকটে ফিরে আসবে এবং স্তব হলে ইসতিলাম বা স্পর্শ করবে। অতঃপর সাফা পর্বতের দিকে বের হবে এবং আল্লাহ তাঁরার এ বাণী পাঠ করবে:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِ اللَّهِ

“নিশ্চয়ই ‘সাফা’ এবং ‘মারওয়া’ আল্লাহর নির্দশনসমূহের অন্যতম।” [সূরা বাকুরাহ : ১৫৮] অতঃপর সাফা পর্বতে আরোহণ করে বাযতুল্লাহকে দেখবে এবং কিবলামুঠী হয়ে হাত উত্তোলন করে বলবে:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، وَلَا جَنَاحَ لِلْأَحْرَابِ وَحْدَهُ.

“আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মার্বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তাঁর জন্য রাজত্ব এবং তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর শক্তিমান। আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই; তিনি এক। তিনি নিজের প্রতিক্রিতি পূর্ণ করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং সকল দলকে একাই পরাজিত করেছেন।”

এ দুআ তিনবার পাঠ করবে এবং সাফা পর্বতে দীর্ঘক্ষণ দুআ করবে। অতঃপর হেটে মারওয়া পর্বতে যাবে এবং দুটি নীল রঙের বাতির মাঝে দ্রুত সাঙ্গ করবে। এ কাজটি পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মহিলাদের ক্ষেত্রে নয়। অতঃপর হেটে মারওয়া পর্বতে আরোহণ করবে। মারওয়া পর্বতে তাই করবে, সাফা পর্বতে যা করেছিল। এ হলো একবার। অতঃপর মারওয়া থেকে সাফা পর্বতে যাবে, সেটি হবে আরেকবার। এভাবে সে সাতবার সাঙ্গ করবে। এই সাঙ্গ হাজে ইফরাদ ও হাজে কুরান পালনকারীর জন্য। এ কাজের পর তারা হালাল হবে না। বরং তারা ইহরাম অবস্থায় থাকবে। আর এটি হাজে তামাতু পালনকারীর উমরার সাঙ্গ হবে।

মাথায় চুল তাকুসীর করে (ছেটো করে) হাজে তামাতু পালনকারী উমরাহ করে হালাল হয়ে যাবে এবং সাধারণ পোষাক পরিধান করে নিবে। যখন ইয়াওমুত তারবিয়া আসবে (তা হলো যিলহাজ্জ মাসের অষ্টম তারিখ) তখন হাজে তামাতু পালনকারী তার থেকে হাজের ইহরাম বাঁধবে। আর মক্কার অধিবাসীগণ মক্কা থেকেই ইহরাম বাঁধবে। তার জন্য মীকাতের নিকটে গোসল, সুগন্ধি লাগানো এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া মুস্তাহাব।

সকল হাজী তালবিয়া পাঠ করতে করতে মিনায় যাবে এবং মিনায় যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা এবং ফজরের সলাত পড়বে। চার রাকআত বিশিষ্ট সলাতগুলোকে জমা করা ছাড়াই কসর করবে। অতঃপর নয় তারিখের সকালে আরাফায় যাবে। সন্ধিব হলে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলা পর্যন্ত মাসজিদে নামিরায় অবস্থান করবে। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে গেলে ইমাম বা নায়েবে ইমাম সংক্ষিপ্ত খুতবা দিবেন। অতঃপর যোহরের সময় জমা ও কসর করে যোহর ও আসরের সলাত পড়বে। অতঃপর আরাফায় প্রবেশ করবে।

হাজে পালনকারীর উপর আবশ্যক হলো, সে আরাফায় প্রবেশ করেছে কিনা তা নিশ্চিত হবে এবং কিবলামুখী হয়ে দুই হাত উত্তোলন করে দুআ করবে ও তালবিয়া পাঠ করবে। আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং এই মহান দিনে আল্লাহর নিকটে বেশি বেশি দুআ ও ধিকর করবে। আর এই দিনে এ দুআটি বলা সবচেয়ে উত্তম:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، هُوَ أَكْبَرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“এক আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো ইলাহ নেই; সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই, সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য, তিনি সব কিছুর উপরই ক্ষমতাবান।”

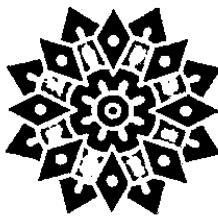
এই দিনে সে রোজাবিহীন অবস্থায় থাকবে। কারণ (হাজের) ইবাদত করার জন্য এটাই তার জন্য শক্তিশালী হিসেবে পরিগণিত। সে সূর্য অন্ত যাওয়া পর্যন্ত বিনয়ী হয়ে সেখানেই অবস্থান করবে। সূর্য অন্তমিত হলে সে ধীরস্থিরভাবে আরাফা থেকে তালবিয়া পড়তে পড়তে মুযদালিফায় যাবে। অতঃপর সেখানে মাগরিব ও ইশার সলাত জমা করে পড়বে এবং ইশার সলাত কসর করে পড়বে। দুর্বলদের জন্য রাতেই মুযদালিফা থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আর শক্তিশালীগণ রাতে সেখানে অবস্থান করবে এবং সেখানে ফজরের সলাত পড়বে। অতঃপর কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর প্রশংসা, তাকবীর বা ঝুর্তা ঝু এবং ঝাঁ ঝুঁ ঝু বলবে। এভাবে সে সকাল হওয়া পর্যন্ত করতে থাকবে।

অতঃপর মুযদালিফা হতে সূর্য ওঠার পূর্বেই বের হবে। ধীরস্থিরভাবে তালবিয়া পড়তে থাকবে। রাস্তা থেকে সাতটি কঙ্কর নিবে। অতঃপর যখন সে জামরায়ে আকুবায় আসবে, তাতে সাতটি পাথরই নিক্ষেপ করবে। প্রত্যেকটি পাথর নিক্ষেপের সময় ঝুর্তা ঝু বলবে। কিন্তু তালবিয়া পাঠ করবে না। অতঃপর হাদী (কুরবানির পক্ষ) যবেহ করবে। তাঁর জন্য তার গোশত খাওয়া মুস্তাহাব। অতঃপর মাথা মুওন করবে। এরপর তাওয়াফে ইফায়া করবে। আর সে ব্যক্তি হাজে তামাত্তু পালনকারী হলে এতে হাজের সাঙ্গ করবে। অথবা হাজে ইফরাদ বা কুরান পালনকারী হলে তাওয়াফে কুদুমে সাঙ্গ না করলে এ তাওয়াফে সাঙ্গ করবে।

পাথর নিক্ষেপ, যবেহ করা এবং হালকু বা তাকুসির এ কাজগুলোর মাঝে তারতীব বজায় রাখা সুন্নাহ। যদি একটিকে আরেকটির আগে সম্পাদন করে, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। যদি এ

তিনটি কাজের মধ্য হতে দুটি সম্পাদন করে - (অর্থাৎ জামরায়ে আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ এবং হলঙ্ক বা তাকসির করে এবং সাইসহ তাওয়াফ করে, যদি সাই থাকে)- তাহলে তার জন্য প্রথম হালাল সম্পাদিত হবে। এ অবস্থায় তার জন্য ইহরাম অবস্থার সবকিছুই হালাল হয়ে যাবে স্তৰী ব্যতীত। যদি তিনটিই সম্পাদন করে, তাহলে তার জন্য সবকিছুই হালাল হয়ে যাবে। এমনকি স্তৰীও তার জন্য হালাল হয়ে যাবে।

সে একাদশ ও দ্বাদশ রাত্রিতে আবশ্যিকভাবে মিনায় রাত্রিযাপন করবে। এগারো তারিখে তিনটি জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করবে। ছোটো জামরা দিয়ে শুরু করবে। অতঃপর মধ্যমটিতে। তারপর বড়োটিতে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। তেমনিভাবে বারো তারিখ দিনেও কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। কঙ্কর নিক্ষেপের সময় সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলা থেকে নিয়ে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত। যখন জামরায়ে সুগরায় বা ছোটো জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবে, তখন তার জন্য ডানে অল্প অগ্রসর হওয়া সুন্নাহ এবং কিবলামুখী হয়ে হাত উত্তোলন করে দুআ করবে। যখন সে জামরায়ে উসতায় বা মধ্যম জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবে, তখন তার জন্য সামনে অগ্রসর হওয়া সুন্নাহ। বাম দিকটাকে গ্রহণ করে কিবলামুখী হবে। দীর্ঘক্ষণ হাত উত্তোলন করে দুআ করতে থাকবে এবং জামরায়ে আকাবা বা বড়ো জামরার পরে দাঁড়াবে না। যদি সে তাড়াহড়া করতে চায়, তাহলে বারো তারিখে সূর্য অন্ত যাওয়ার পূর্বেই তার জন্য মিনা থেকে বের হওয়া আবশ্যিক। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে মিনায় তার উপরে সূর্য ডুবে, তাহলে তার উপরে তেরো তারিখ মিনায় রাত্রিযাপন করা আবশ্যিক। অতঃপর যখন সে মকা থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করবে, তার উপরে তাওয়াফুল ওয়াদা বা বিদায়ী তাওয়াফ করা আবশ্যিক। রায়তুল্লাহ হতে তার সর্বশেষ সময়টা তাওয়াফের মাধ্যমেই কাটাবে। তবে এ তাওয়াফ হায়ের ও নেফাস ওয়ালা মহিলাদের জন্য নেই।



الباب الخامس: في الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة পঞ্চম অনুচ্ছেদ: মদীনার যে সমস্ত স্থানে যিয়ারত করা সুন্নাত

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المسألة الأولى: زيارة مسجد النبي ﷺ প্রথম মাসআলা: নাবী ﷺ এর মসজিদ যিয়ারত

যে কোনো সময়ে নাবী ﷺ এর কবর যিয়ারত করা সুন্নাত। চাই তা হাজের পূর্বে কিংবা পরে হোক। এর জন্য নির্ধারিত কোনো সময় নেই। আর এটি হাজের অন্তর্ভুক্ত নয়; শর্তও না, ওয়াজিবও না। কিন্তু যে হাজ করতে যাবে তার জন্য হাজ আদায়ের পূর্বে কিংবা পরে নাবী ﷺ এর মসজিদ যিয়ারত করা উচিত। বিশেষ করে যার জন্য পুনরায় সফর করা কঠিন। যদি হাজ পালনকারীগণ মসজিদে নববী গমন করে এবং তাতে সলাত পড়ে তাহলে অনেক সওয়াবের অধিকারী হবে এবং দৃটি ভালো কাজের মাঝে সমন্বয়কারী হবে; ১. ফরয হাজ পালনকারী, ২.সলাতের জন্য মসজিদে নববী যিয়ারতকারী। তবে জেনে রাখা উচিত এই যিয়ারত কিন্তু হাজকে পরিপূর্ণকারী নয় এবং এটি হাজের অন্তর্ভুক্তও নয়। হাজ এই যিয়ারত ছাড়াই পরিপূর্ণ। এর মাঝে ও হাজের মাঝে কোনো সম্পর্ক নেই।

নাবী ﷺ এর মসজিদের জন্য যিয়ারত করা এবং তাতে সলাত পড়ার জন্য যিয়ারত করার ব্যাপারে অনেক দলীল রয়েছে। তন্মধ্যে-

১. নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

لَا تُشَدُّ الرِّحَائُلُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدٍ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

“তিনটি মসজিদ ব্যতীত সফর করা যাবে না (উটের পিছে হাওদা আঁটা যাবে না): মাসজিদুল হরাম, মাসজিদুর রসূল ﷺ ও মাসজিদুল আকসা।”^{৬১৫}

^{৬১৫} মুফাকাতুল আলাইহি: সহীহল বুখারী, ঘ. ১১৮৯; সহীহ মুসলিম, ঘ. ৩২৭৫, ফুআ. ১৩৯৭ আবু সাঈদ খুদরী ﷺ এর হাদীস।

٢. ተኒ ዝርዝር ዘመኑን የፌሃሱ ማዕከያ :

“আমার এ মাসজিদে (মসজিদে নববীতে) সলাত মাসজিদুল হরাম ব্যতীত অন্য যে-কোনো মসজিদে এক হাজার সলাতের চেয়েও উভয়।”^{৬১৬}

এ হাদীসগুলোই নাবী ﷺ এর মসজিদে সলাতের জন্য যিয়ারত করা শরীয়ত সম্মত হওয়ার উপরে প্রমাণ করে। কারণ যিয়ারতের অনেক ফয়লত রয়েছে। এই তিনি মসজিদ ব্যতীত অন্য যে-কোনো মসজিদে ইবাদতের উদ্দেশ্য যিয়ারত করা হারামের উপরও প্রমাণ করে। তাই এই তিনি মসজিদ ব্যতীত যে কোনো স্থানে যিয়ারত করা শরীয়ত সম্মত নয়। যেহেতু অনেকগুলো আম দলীল বর্ণিত হয়েছে, সুতরাং পুরুষ-মহিলা উভয়েই মসজিদে নাববীতে সলাত আদায় করবে।

যিয়ারতের পদ্ধতি: মুসাফির যখন মসজিদে নববীতে পৌছবে, তার জন্য মসজিদে প্রবেশের সময় ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা মুস্তাহাব। সে প্রবেশের সময় এ দুআটি পাঠ করবে:

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

আর মসজিদে নববীর জন্য নির্ধারিত কোনো যিকর বা দুআ নেই। অতঃপর মসজিদের যে-কোনো স্থানে দুই রাকআত সলাত পড়বে। তবে যদি রওয়ায় পড়ে, তাহলে এটাই সবচেয়ে উভয়। নাবী ﷺ বলেন: (مَا بَيْنَ بَيْتَيِ وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ)

“আমার ঘর ও আমার মিস্তারের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান।”^{৬১৭}

যে ব্যক্তি মসজিদে নববী যিয়ারত করবে, তার সেই মসজিদে পাঁচ ওয়াজ্জ সলাত পড়া উচিত। সে রওয়াতে বেশি বেশি যিকর, দুআ ও নফল সলাত আদায় করবে। কারণ এতে অনেক সওয়াব রয়েছে। ফরয সলাতেও সে সামনের দিকে থাকার চেষ্টা করবে। কারণ সামনের কাতারগুলো রওয়ার নিকটবর্তী।

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: زِيَارَةُ قَبْرِهِ

দ্বিতীয় মাসআলা: নাবী ﷺ এর কবর যিয়ারত

যখন কোনো মুসলিম মসজিদে নাববী যিয়ারত করবে, তার জন্য নাবী ﷺ এর কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব এবং আবু বকর ও উমার খন্দক এর কবরও যিয়ারত করা মুস্তাহাব। কারণ তা মসজিদে নাববী যিয়ারত করার অনুগামী। কিন্তু এটি আসল উদ্দেশ্য নয়। এটাই হচ্ছে শরীয়ত

^{৬১৬} মুফাক্তুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ১১৯০; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৩৯৪।

^{৬১৭} মুফাক্তুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ১১৯৬; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৩৯১।

সন্তুত যিয়ারত। তবে শুধুমাত্র কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা শরীয়ত সন্তুত নয়। এ ছাড়াও অন্য কোনো নাবী, সৎ লোকের কবর যিয়ারত করা এবং পৃথিবীর যে কোনো স্থানে সফর করা (এ তিনটি মাসজিদ ব্যতীত: মাসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী এবং মসজিদে আকসা) হারাম, এ ব্যাপারে ইজমা হয়েছে। যে একাজটি করবে, সে তার নিয়তের কারণে অবশ্যই গুনাহগার হবে। তার উদ্দেশ্যের কারণে পাপী হবে এবং হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে তার বিরোধিতাকারী হবে; কারণ হাদীসের বক্তব্য থেকে শুধুমাত্র এই তিনটি মসজিদ যিয়ারত করার বিষয়টি বোঝা যায়।

যিয়ারতের পদ্ধতি: যিয়ারতকারী নাবী ﷺ এর কবরের সামনে আদবের সাথে ও নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর সে নাবী ﷺ এর উপর এ বলে সালাম পাঠ করবে:

السلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

নাবী ﷺ বলেছেন: **مَا مِنْ أَحَدٍ يُسْلِمُ عَلَيَّ إِلَّا زَدَ اللَّهُ عَلَيَّ رُوْحِي حَتَّىٰ أَرْدَدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ**:

“কেউ আমাকে সালাম দিলে আল্লাহ আমার ‘রহ’ ফিরিয়ে দিবেন এবং আমি তার সালামের জবাব দিব।”^{৬১৮}

যিয়ারতকারী যদি বলে:

السلامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَةَ اللَّهِ مِنْ خَلْقِهِ، أَشْهَدُ أَنِّي قَدْ بَلَغْتَ الرِّسَالَةَ، وَأَدِيتَ الْأَمَانَةَ، وَنَصَحَّتَ الْأُمَّةَ، وَجَاهَتِ فِي اللَّهِ حَقَّ جَهَادِهِ، اللَّهُمَّ آتِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضْيَلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مُخْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، اللَّهُمَّ اجْزُهُ عَنِّي أَمْتَهُ خَيْرَ الْجَزَاءِ.

“হে আল্লাহর সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি রিসালাতের দায়িত্ব পৌছে দিয়েছেন, আমানত পূর্ণ করেছেন, উম্মাহকে নসীহাহ করেছেন, আল্লাহর রাস্তায় সঠিকভাবে জিহাদ করেছেন। হে আল্লাহ! আপনি তাকে ওয়াসীলাহ ও মর্যাদা দান করুন, শেষ বিচারের দিন প্রশংসিত স্থান দান করুন, যার প্রতিশুভি আপনি তাকে দিয়েছেন। হে আল্লাহ, আপনি তাকে তার উম্মতের পক্ষ থেকে সর্বেক্ষিত প্রতিদান দিন।”
তাহলে কোনো সমস্যা নেই।

অতঃপর সে আবু বকর ও উমর رض এর উপর সালাম পেশ করবে, তাদের জন্য দুআ করবে এবং রহমতের দুআ করবে। ইবনু উমার رض থেকে আসার বর্ণিত হয়েছে, যখন তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ এবং তার দুই সাহাবীর উপর সালাম পেশ করতেন, তখন তিনি এর বেশি পড়তেন না:

السلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا تَعْمَلِهِ

^{৬১৮} সুনান আবু দাউদ, ঘ. ২০৪১; আহমদ ২/৫২৭ আবু স্বায়ত্ব رض এর হাদীস; ইমাম আলবানী হসান বলেছেন, সঙ্গীত তারগীব, ঘ. ১৬৬৬।

অতঃপর তিনি ফিরে চলে আসতেন।

যিয়ারতকারী বা অন্যান্যদের উপর পাথর স্পর্শ করা, চুম্বন করা, তাওয়াফ করা, দুআ করার সময় তাকে সামনে রাখা বা কোনো প্রয়োজনে আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট চাওয়া বা কোনো বিপদ থেকে মুক্তি চাওয়া কিংবা অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য শিফা কামনা করা হারাম। কেননা এসব কিছু আল্লাহর জন্য; আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট আবেদন করা যাবে না। নাবী ﷺ এর কবর এবং নাবীর দুই সাহাবীর কবর যিয়ারত করা ওয়াজিব নয় এবং হাজের কোনো শর্তও নয়, যেমন কিছু সাধারণ অঙ্গ মানুষেরা ধারণা করে থাকে। বরং তা মুন্তাহাব। তার মাঝে ও হাজের মাঝে কোনো সম্পর্ক নেই।

নাবী ﷺ এর কবর যিয়ারতের ব্যাপারে যে সমস্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল ﷺ এর কবর যিয়ারত হাজের অন্তর্ভুক্ত, সেগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। সেগুলো যষ্টফ কিংবা মাওয়ু। যেমন
من حج و لم يزرنى فقد جفاني

“যে হাজ করল অথচ আমার কবর যিয়ারত করল না, সে আমার সাথে কঠোরতা করল।”

আরেকটি হাদীস:

“যে আমার কবর যিয়ারত করল, তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যায়।”

এ ছাড়া এ সম্পর্কে যতগুলো হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর একটিও নাবী ﷺ থেকে সাব্যস্ত নয়। বরং অনেক বিদ্বান সেগুলোকে বানোয়াট এবং মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

الْمَسْأَلَةُ الْيَالِيَّةُ: مَا كَنَّا نَخْرِي إِلَيْهِ زِيَارَتَهَا فِي الْمَدِينَةِ النَّبِيَّةِ

তৃতীয় মাসআলা: মাদীনার আরও যে সমস্ত জায়গায় যিয়ারত করা সুন্নাত

মদীনা যিয়ারতকারীর জন্য সে পুরুষ কিংবা মহিলা হোক, মাসজিদে কুবার দিকে অযু করে বের হওয়া এবং তাতে সলাত পড়া মুন্তাহাব। কারণ নাবী ﷺ মসজিদে কুবায় আরোহিত অবস্থায় ও হেঁটে যেতেন এবং দুই রাকআত সলাত পড়েছেন।^{৬১৯}

নাবী ﷺ বলেছেন: (مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدًا قِبَاءً، فَصَلَّى فِيهِ صَلَّةً، كَانَ لَهُ كَوْنَجِرْ عُمْرَةً)

“যে ব্যক্তি তার ঘরে পরিত্র হলো, অতঃপর মসজিদে কুবায় গমন করল এবং তাতে সলাত পড়ল, তার জন্য উমরার সমপরিমাণ সওয়াব নির্ধারিত হয়ে গেল।”^{৬২০}

^{৬১৯} সহীহ বুখারী, হা. ১১৯৪; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৩৯৯।

^{৬২০} আহমাদ ৩/৪৮৭; ইবনু মাজাহ, হা. ১৪১২; নাসাই ২/৩৭; ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহত তারগীব, হা. ১১৮১।

শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য 'বাকী কবরস্থান' এবং উহুদ যুদ্ধের শহীদগণের কবর যিয়ারত সুন্নাহ। যেমন হাময়া ও অন্যান্যদের কবর যিয়ারত করা, তাদের প্রতি সালাম পাঠ করা এবং তাদের জন্য দুআ করা সুন্নাহ। কারণ নাবী তাদের কবর যিয়ারত করেছেন এবং তাদের জন্য দুআ করেছেন। নাবী বলেছেন: (وروا القبور فإنها تذكر الموت)

তোমরা কবর যিয়ারত করো। কারণ তা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।”^{৬২১}

নাবী তার সাহাবীদেরকে শিখিয়ে দিতেন, যে তারা যখন কবর যিয়ারত করবে, তারা যেন বলে:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّ شَاءَ اللَّهُ لَأَحْقُرُوهُنَّ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَهُ وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

“হে কবরবাসী বিশ্বাসী মুসলিমগণ! তোমাদের প্রতি সালাম। আল্লাহ চাইলে আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব। আমি আমাদের ও তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট নিরাপত্তার আবেদন জানাচ্ছি।”^{৬২২} মদীনার এই স্থানগুলো যিয়ারত করা সুন্নাত।

এ ছাড়া অন্যান্য স্থান, যেগুলোর ব্যাপারে সাধারণ লোকেরা ধারণা করে থাকে যে সেগুলো যিয়ারত কর শরীয়ত সম্মত; যেমন- মাবরাকুন নাকাহ; মাসজিদে জুমুআ, বিরুল খাতাম, বিরে উসমান, মাসজিদুস সাবআ এবং মাসজিদুল কিবলাতাইন, এগুলোর ব্যাপারে কোনো দলীল নেই। নাবী থেকে এমনকিছু সাব্যস্ত নেই যে তিনি এ স্থানগুলো যিয়ারত করেছেন কিংবা যিয়ারতের নির্দেশ দিয়েছেন। কোনো সালাফে সালেহ থেকেও বর্ণিত নেই যে, তিনি এগুলো যিয়ারত করেছেন। মদীনার মাসজিদুন নাবী ও মসজিদে কুবা ব্যতীত অন্য কোনো মাসজিদের বিশেষ মর্যাদা নেই। নাবী বলেছেন:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌ

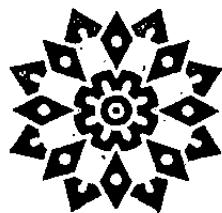
“যে ব্যক্তি আমাদের দ্বারা এমন বিষয় উভাবন করে যা তাতে নেই, তা পরিত্যাজ্য।”^{৬২৩}

সুতরাং, প্রত্যেক মুসলিমের উচিত, যখন মদীনা যিয়ারত করবে সে শরীয়ত সম্মত স্থানগুলো যিয়ারত করবে এবং যে স্থানগুলো যিয়ারত করা শরীয়ত সম্মত নয়, সেগুলো পরিহার করবে।

^{৬২১} সংক্ষিপ্ত মুন্সিম, পৃ. ২১৪৯, ফুআ. ৯৭৬।

^{৬২২} সংক্ষিপ্ত মুন্সিম, পৃ. ২১৪৭, ফুআ. ৯৭৫।

^{৬২৩} সংক্ষিপ্ত মুন্সিম, পৃ. ৪৩৮৪, ফুআ. ১৭১৮।



الباب السادس : في الأضحية ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : কুরবানি

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: فِي تَعْرِيفِ الْأَضْحِيَّةِ وَحُكْمِهَا وَأَدْلَةُ مَشْرُوعِيهَا وَشَرْوَطُهَا

প্রথম মাসআলা: কুরবানির পরিচয়, বিধান, শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল ও শর্ত

১. ذبح الأضحية وقت الصبح: এর আভিধানিক অর্থ: “পূর্বাহ্নের প্রথম প্রহরে কুরবানির পশু যবেহ করা।”

পারিভাষিক অর্থ:

ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو الماعز تقرباً إلى الله تعالى يوم العيد.

“ঈদের দিনে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্য উট, গরু, ছাগল কিংবা ভেড়া যবেহ করাকে কুরবানি বলা হয়।”

২. কুরবানির হকুম এবং তা শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল: কুরবানি করা সুন্নাতে মুয়াকাদা।
আল্লাহ বলেন: “অতঃপর সলাত পড়ো এবং কুরবানি করো।” [সূরা কাওসার : ২]
আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত।

أَنَّ النَّبِيًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَفْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاقِ جِهِمَّةٍ

“নাবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুটি সাদা-কালো রং এর শিং ওয়ালা ভেড়া নিজ হাতে কুরবানি করেছেন। তিনি ভেড়া দুটির পার্শ্বে তাঁর পা রেখে ‘বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবার’ বলে যবেহ করেছেন।”^{৬২৪}

৩. কুরবানি শরীয়তসম্মত হওয়ার শর্তসমূহ: নিম্নের শর্তগুলো যার মধ্যে পাওয়া যাবে তার জন্য কুরবানি করা সুন্নাত:

- মুসলিম হওয়া: অমুসলিম শরীয়তে যবেহ করার আদেশপ্রাপ্ত নয়।
- বালেগ ও জ্ঞানবান হওয়া: যে বালেগ ও জ্ঞান সম্পন্ন হবে না সে কুরবানির দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে না।
- সক্ষম হওয়া: সক্ষমতা নিশ্চিত হবে যদি সে ঈদের দিন ও আয়ামুত তাশরীকের দিনগুলোতে নিজের ও পরিবারের খরচ চালিয়ে তার নিকটে অতিরিক্ত পাথের থাকে।

المسألة الثانية: ما تجوز الأضحية به

দ্বিতীয় মাসআলা: যে সমস্ত চতুর্পদ জন্মের মাধ্যমে কুরবানি করা বৈধ

কুরবানি বৈধ হবে তিন প্রাণির জিনিসের মাধ্যমে:

১. উট, ২. গরু, ৩. ছাগল এবং তারই অন্তর্ভুক্ত হবে ভেড়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾

“আমি প্রত্যেক সম্মুদায়ের জন্য কুরবানির নিয়ম করে দিয়েছি, যাতে আমি তাদেরকে রিয়কুস্তুরপ যে সব চতুর্পদ জন্ম দিয়েছি, সেগুলির উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে।” [সূরা হাজ: ৩৪]

কুরবানির ক্ষেত্রে পক্ষ এ তিন শ্রেণির বাইরে যাবে না। কেননা নাবী ﷺ বা তার কোনো সাহাবী থেকে এ তিন শ্রেণি ব্যতীত অন্য কোনো শ্রেণি বর্ণিত হয়নি। কুরবানির ক্ষেত্রে একটি ছাগল একজনের পক্ষ থেকে এবং তার পরিবারের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে। আবু আইয়ুব আনসারী رض থেকে বর্ণিত:

كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعَمُونَ

“নাবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে কোনো ব্যক্তি নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ থেকে একটি বকরী কুরবানি করত। তা থেকে তারা খেত এবং অন্যদের খাওয়াত।”^{৬২৫}

^{৬২৪} মুতাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৫৫৬৫; সহীহ মুসলিম, হা. ৪৯৮১, ফুআ. ১৯৬৬।

^{৬২৫} ইবনু মাজাহ, হা. ৩১৪৭; ইমাম তিরমিয়ী সহীহ বলেছেন, হা. ১৫০৫; ইমাসব, সহীহ ইবনে মাজাহ, হা. ২৫৬৩।

एकटि उट वा एकटि गरु द्वारा सातजनेर कुरबानि देओया बैध रयेछे। येमन जाबिर ፫३७ थेके वर्णित। तिनि बलेन,

نَحْرَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْخَدْيِيَّةِ الْبَدَنَّةِ عَنْ سَبْعَةِ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةِ

“आमरा हुदाइबियार बहर आल्लाहर रसूल साल्लाल्लाहु आलाइहि ओया साल्लाम एर साथे प्रति सातजनेर पक्ष थेके एकटि उट एवं प्रति सातजनेर पक्ष थेके एकटि गरु कुरबानि करेछि।”^{६२६}

الْمَسْأَلَةُ التَّالِثَةُ: الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْأَصْحَاحِيَّةِ तृतीय मासआला: कुरबानिर पक्ष फ्रेट्रे शर्तसमूह

१. बयसः:

क. उटः एर जन्य शर्त- पाँच बहर पूर्ण होया।

ख. गरुः एर जन्य शर्त- दुइ बहर पूर्ण होया।

ग. छागलः एर जन्य शर्त- एक बहर पूर्ण होया।

जाबिर ፫३८ थेके वर्णित। निश्चय आल्लाहर रसूल ፫३९ बलेहेनः

لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِينَةً، إِلَّا أَنْ يَغْسِرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الصَّانِ

“तोमरा मुसिन्नाह छाडा कुरबानि करबे ना। तबे एटा तोमादेर जन्य कष्टकर मने हले, तोमरा जायाआ मेष-शाबक कुरबानी करते पारो।”^{६२७}

उटेर मध्यकार मुसिन्नाह (مسنة) बला हय, यार बयस पाँच बहर परिपूर्ण हयेछे। गरुर मध्यकार मुसिन्नाह बला हय, यार बयस दुइ बहर परिपूर्ण हय हयेछे। छागलेर मध्यकार मुसिन्नाह बला हय, यार बयस एक बहर परिपूर्ण हयेछे। मुसिन्नाहके छुनिय्याहउ (عنده) बला हय।

घ. भेडः ए क्षेत्रे जाया’ (الجَنْدُع) शर्त। जायाआ हलो यार एक बहर परिपूर्ण हयेछे। केउ केउ बलेनः यार बयस छय मास परिपूर्ण हयेछे। उक्क्वा इबनु आमेर ፫३१ थेके वर्णित, तिनि बलेन, आमि बललाम, हे आल्लाहर रसूल! (إِنَّمَا يُحِلُّ لِلَّهِ عِلْمُ الْأَجْنَادِ)

“आमार निकट जाया’ रयेछे। तिनि ፫३१ बललेनः तुमि ता जबाइ करो।”^{६२८}

^{६२६} सहीह मुसलिम, हा. ३०७६, फुआ. १३१८।

^{६२७} सहीह मुसलिम, हा. ४९७६, फुआ. १९६३।

^{६२८} मुत्ताफ़ाद्दुन आलाइहि: सहीहल बुद्धारी, हा. ५५५७; सहीह मुसलिम, हा. ४९८१, फुआ. १९६५।

উকুবা ইবনু আমের থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে:

صَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَذَعٍ مِنَ الصَّابَانِ

“আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ এর সাথে ভেড়ার জায়া’ কুরবানি করেছি।”^{৬২৯}

২. সুস্থ হওয়া: উট, গরু ও ছাগলের ক্ষেত্রে শর্ত হলো, এগুলোকে এমন দোষক্রটি থেকে মুক্ত থাকতে হবে যে দোষক্রটি গোশতে ভ্রটি সৃষ্টি করে। দুর্বল শীর্ণকায়, খোঁড়া, কানা এবং অসুস্থ প্রাণির মাধ্যমে কুরবানি যথেষ্ট হবে না।

বারা ইংল্যন আয়েব থেকে বির্ণত । তিনি নাবী থেকে বর্ণনা করেন:

أَزِيغْ لَا تُخْبِرُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ، الْبَيْنُ عَوْرُهَا، وَالْمُرِيْضَةُ، الْبَيْنُ مَرْضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيْنُ عَرْجُهَا،
وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي

“চার ধরনের প্রাণী কুরবানি করা বৈধ নয়। ১. অঙ্গ পশু; যার অঙ্গস্তু সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত, ২. কৃগ্র পশু; যার রোগ দৃশ্যমান, ৩. খোঁড়া জন্তু; যার খোঁড়ামী স্পষ্টভাবে প্রকাশিত, এবং ৪. স্কীণকায়, পশু যার হাড়ের মজ্জা পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে।”^{৬৩০}

العِجَافُ بِلَا حَيْثُ: دُورْلَ شীর্ণকায় চতুষ্পদ জন্তু।

যেটি স্বচ্ছ নয় এবং শীর্ণতার কারণে মাংস নেই। এ চারটি গুটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলোকে, যেগুলো এ চারটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন **বেলু** অর্থাৎ যার সামনের সারিই দাঁত নেই।

অর্থাৎ যেগুলোর কান বা শিঙের বেশির ভাগ নেই অথবা এজাতীয় আরও এমন দোষ-ক্রটি।

المسألة الرابعة: وقت ذبح الأضحية

চতুর্থ মাসআলা: কুরবানির পশু জবাই করার সময়

যে ব্যক্তি ঈদের সলাত পড়বে তার জন্য ঈদের সলাতের পর থেকে কুরবানির পশু জবাই করার ওয়াক্ত শুরু। আর যে ব্যক্তি সলাত পড়বে না, সে কুরবানির দিন সূর্যদয়ের পর থেকে নিয়ে দুই রাকআত ও দুই খুতবার সম্পরিমাণ সময় পরে জবাই করবে। বারা ইবনে আযিব رض থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

مَنْ صَلَّى صَلَاتَتِنَا، وَنَسَكَ نُسْكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَلَيُعَذَّ مَكَانِهِ أُخْرَى

^{४२} नामांकि ७/२१९; इमार आलवानी सहीह वलेछेन, सहीहन नामांकि, हा. ४०८०।

^{१००} बुद्धांशु मालिक पृष्ठा २४८; आहमाद ४/२८९; तिरमियी, हा. १४९७ एवं तिनि हासान सहीह वलेहेन। सूनान आबू दाउद, हा. २८०२; नासाई ७/२४४; इब्नु याजाह, हा. ३१४४; इमाय आलबानी सहीह वलेहेन, सहीहन नासाई, हा. ४०७३।

“যে আমাদের মতো সলাত আদায় করল এবং আমাদের মতো কুরবানি করল, সে কুরবানীর রীতিনীতি যথাযথ পালন করল। আর যে ব্যক্তি সলাতের পূর্বে কুরবানি করল, সে যেন পুনরায় তার স্থানে আরেকটি কুরবানি করে।”^{৬৩১}

ଆର କୁରବାନିର ସମୟ ଚଲମାନ ଥାକବେ ଆୟ୍ୟମୁତ ତାଶରୀକେର ଶେଷ ଦିନେର ସୂର୍ୟାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଯୁବାଯେର ଇବ୍ନ ମୁତ୍ତିଯିମ ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହାଦୀସ । ତିନି ନାବି  ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେନ ।

كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ

“ଆଯ୍ୟମତ ତାଶରୀକେର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନଇ ଜବାଇ କରାର ଦିନ ।” ୬୩୨

উন্নত হলো ঈদের সলাতের পরেই যবেহ করা। বারা ইবনে আযেব رض থেকে বর্ণিত।
নিচ্যই নাবী رض বলেছেন:

(أَوْلَ مَا تَبَدَّىٰ يِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّى، ثُمَّ تَرْجِعُ، فَتَشْخَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُتَّنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ لَخْمٌ قَدْمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّشْلِكِ فِي شَفِيعٍ)

“আজকের দিনে আমাদের প্রথম কাজ সলাত আদায় করা। অতঃপর ফিরে এসে কুরবানী করা। যে ব্যক্তি একুশ করবে সে আমাদের সুন্নাত পালন করল। যে ব্যক্তি সলাতের পূর্বেই যবেহ করবে, তা শুধু গোশ্তই হবে, যা সে পরিবারের জন্য পেশ করেছে। কুরবানি সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।”^{৬৩৩}

المسألة الخامسة: ما يصنع بالأضحية، وما يلزم المضحى إذا دخلت العشر

পঞ্চম মাসত্ত্বালা: কুরবানির পশুর গোশত কি করবে এবং কুরবানি
দানকারীর যিলহাজ্জ মাসের দশদিন কি কি করা আবশ্যিক

১. কুরবানির পশুর গোশত কী করবে:

কুরবানিকারীর জন্য সুন্নত হলো, সে কুরবানির পশুর গোশত খাবে এবং নিকটাত্মীয়, প্রতিবেশী এবং বন্ধুদের হাদীয়া প্রদান করবে ও ফকীরদের সাদকা করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾

“অতঃপর তোমরা তা থেকে খাও এবং দুষ্ট-দরিদ্রকে খাওয়াও।” [সূরা হাজ্জ : ২৮]

^{१०३} बुद्धाकून आलाइहि: सहीहुल बुधारी, हा. ९५५, ५५६२; सहीह मूसिम, हा., फुआ. १९६१।

^{४२} आद्यमाद ४/८२; वाय्यहार्णी १९/२९५; इबन हित्तान, हा. १००८; दाराकुर्खनी ४/२८४।

^{१०} शुक्राकृति आलाईहि; सदीश्वर वृथार्गी, हा. १६८; सदीह शुसलिम, हा. ४९६३, फुआ. १९६१ अर्थगत वर्णन।

তার জন্য মুস্তাহব হলো তাকে তিনভাগে ভাগ করা: একভাগ তার পরিবারের জন্য, আরেকভাগ দরিদ্র প্রতিবেশীদের জন্য, আরেক ভাগ হাদীয়া দেওয়ার জন্য। ইবনু আব্বাস কুরবানির পশ্চর বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেন:

وَيَطْعِمُ أَهْلَ بَيْتِهِ الْثَّلَاثَ، وَيَطْعِمُ فَقَرَاءَ جِبْرِانَهُ الْثَّلَاثَ، وَيَنْصَدِّقُ عَلَى السُّؤَالِ بِالْثَّلَاثِ

“সে পরিবারকে এক তৃতীয়াংশ খাওয়াবে, প্রতিবেশীকে আরেক তৃতীয়াংশ খাওয়াবে এবং আরেক তৃতীয়াংশ দরিদ্রদেরকে সাদকা করে দিবে।”^{৬৩৪}

তিনিদিনের পরেও কুরবানির গোশত জমা করে রাখা বৈধ রয়েছে। বারিরা ﷺ থেকে বর্ণিত।
 نِسْتَكْمُ عَنِ الدِّخَالِ لِحُومِ الْأَصَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَأْ لَكُمْ
 (بَهِتْكُمْ عَنِ الدِّخَالِ لِحُومِ الْأَصَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَأْ لَكُمْ)

“আমি তোমাদের তিনিদিনের বেশি কুরবানির গোশত খেতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা নিজেদের প্রয়োজন অনুপাতে জমা করে রাখতে পারো।”^{৬৩৫}

২. যিলহাজ্জ মাসের দশদিন কুরবানির ইচ্ছা পোষণকারীর জন্য যা আবশ্যিক:

যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশদিন কুরবানির ইচ্ছাপোষণকারীর জন্য চুল-নখ কাটা হারাম, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কুরবানি করে। উম্মে সালামা ﷺ মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন:

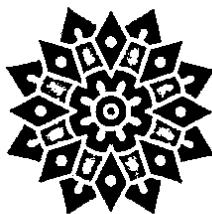
إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ وَعِنْدَهُ أُضْرِحَيْهِ يُرِيدُ أَنْ يُضْحِيَ، فَلَا يَأْخُذَنَ شَعْرًا، وَلَا يَقْلِمَنَ ظُفْرًا. وَفِي رِوَايَةِ - فَلَا يَمْسِيَ
 مِنْ شَعْرِهِ وَبَسِرِهِ شَيْئًا.

“যখন (যিলহাজ্জ মাসের) প্রথম দশদিন উপস্থিত হয় আর কারো নিকট কুরবানীর পশ্চ থাকে, যা সে কুরবানি করার নিয়ত রাখে, তবে সে যেন তার চুল ও নখ না কাটে।” অন্য বর্ণনায়: “সে যেন তার চুল ও নখের কিছুই স্পর্শ না করে (কর্তন না করে)।”^{৬৩৬}

^{৬৩৪} মুগন্নী ৮/৬৩২

^{৬৩৫} সহীহ মুসলিম, ঘ. ৫০০৮, ফুজা. ১৯৭৭

^{৬৩৬} সহীহ মুসলিম, ঘ. ৫০১২, ফুজা. ১৯৭৭ (৩৯-৪০)



الباب السابع: في العقيقة সপ্তম অনুচ্ছেদ : আকীকা

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المسألة الأولى: تعريف العقيقة وحكمها ووقتها

প্রথম মাসআলা: আকীকার পরিচয়, বিধান ও সময়

১. আকীকা (العقيدة) এর পরিচয়:

এর শাব্দিক অর্থ: **العقيدة** শব্দটি শব্দ থেকে নির্গত। অর্থ: কর্তন করা। এটি মূলত শিশুর জন্মের সময়ের মাথার চুলের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে থাকে।

পরিভাষায়: ما يذبح للمولود يوم سابعه عند حلق شعره.

“নবজাতক শিশুর চুল কাটার সময় সপ্তম দিনে তার জন্য পশু যবেহ করাকে আকীকা বলা হয়।”

এটি পিতার উপরে শিশুর হক।

২. (আকীকা) এর লকুম: আকীকা সুন্নাতে মুয়াকাদা। সালমান ইবনে আমের আয ঘবয়ী
^{৬৩} থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন:

مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمْبِطُوا عَنْهُ الْأَذْيَ

“প্রতিটি সন্তানের সাথে আকীকা রয়েছে। সুতরাং তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত করো এবং
তার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করো।”^{৬৩}

সামুরা থেকে বর্ণিত। নিশ্চয়ই নাবী বলেছেন:

(كُلْ غَلَامٍ رَّهِينَةً بِعَقِيقَتِهِ تُذَبِّحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُخْلَقُ رَأْسُهُ)

“প্রতিটি শিশু আকীকায় দায়বন্ধ থাকে। তার পক্ষ থেকে সপ্তম দিনে যবেহ করো, তার মাথা মুগ্ন করো।”^{৬৩৮}

আল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় নাবী বলেছেন:

(مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسِكَ عَنْهُ فَلَيُنْسِكْ)

“যার কোনো স্তান জন্মগ্রহণ করে, অতঃপর সে তার পক্ষ থেকে যবেহ করতে পছন্দ করে, তাহলে সে যেন আকীকা করে।”^{৬৩৯}

অর্থ: যদিগুলি অর্থাৎ, যবেহ করা।

৩. আকীকার সময়: নবজাতক শিশু মায়ের পেট থেকে পূর্ণাঙ্গভাবে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে নিয়ে বালেগ হওয়া পর্যন্ত আকীকা করার বৈধ সময়। তবে জন্মের সপ্তম দিনে আকীকা দেওয়া সুন্নাত। সামুরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল বলেছেন:

«الْغَلَامُ مُرْتَهِنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذَبِّحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُخْلَقُ رَأْسُهُ»

“প্রতিটি শিশু আকীকায় বন্ধক থাকে। তার পক্ষ থেকে সপ্তম দিনে যবেহ করো, তার মাথা মুগ্ন করো।”^{৬৪০}

المَسَأَةُ الثَّانِيَةُ: مَقْدَارٌ مَا يَذْبَحُ فِي الْعَقِيقَةِ

দ্বিতীয় মাসআলা: আকীকায় যা যবেহ করা হবে তার পরিমাণ

ছেলে নবজাতকের পক্ষ থেকে দুটি ছাগল এবং মেয়ে নবজাতকের পক্ষ হতে একটি ছাগল যবেহ করা সুন্নাত। উপ্রে কারায আল কুবিয়াহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: (عَنِ الْغَلَامِ شَاتَانِ مُكَافِتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاءَ)

“ছেলের জন্য একই ধরনের দুটি এবং কন্যার জন্য একটি ছাগল।”^{৬৪১}

^{৬৩৮} আহমাদ ৫/৭,৮,১২; সুনান আবু দাউদ, হা. ২৮৩৭; তিরমিয়ী, হা. ১৫২২; নাসাই ৭/১৬৬; ইমাম হাকিম সহীহ বলেছেন। ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহন নাসাই, হা. ৩৯৩৬।

^{৬৩৯} সুনান আবু দাউদ, হা. ২৮৪২; নাসাই ৭/১৬২; আহমাদ ২/১৮২; ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহন নাসাই, হা. ৩৯২৮।

^{৬৪০} আহমাদ ৫/৭,৮,১২; সুনান আবু দাউদ, হা. ২৮৩৭; তিরমিয়ী, হা. ১৫২২; নাসাই ৭/১৬৬; ইমাম হাকিম সহীহ বলেছেন। ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহন নাসাই, হা. ৩৯৩৬।

^{৬৪১} আহমাদ ৬/৩৮১; সুনান আবু দাউদ, হা. ২৮৩৪; নাসাই ৭/১৬৫; ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহন নাসাই, হা. ৩৯৩১।

الْمَسْأَلَةُ التَّالِثَةُ: تَسْمِيَةُ الْمَوْلُودِ، وَحَلْقُ رَأْسِهِ، وَتَحْنِيكُهُ، وَالْأَذْانُ فِي أَذْنِهِ
**তৃতীয় মাসআলা: নবজাতক শিশুর নামকরণ, মাথা মুগ্নন, তাহনীক করণ
এবং কানে আবান দেওয়া**

১. নবজাতক শিশুর নামকরণ: জন্মের সপ্তম দিনে শিশুর নাম রাখা সুন্নাত। সামুরা ^ع থেকে বর্ণিত। নিচয়ই নাবী ^ص বলেছেন: **كُلُّ عَلَامٍ رَّاهِينَهُ بِعَقِيقَتِهِ تُدْبِغُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُخْلَقُ** (কুলুম রহিনে বিউচিকটি তুদ্বেগ উন্তে যোম সাবিউ ও যখলক)

“প্রতিটি শিশু আকীকায় দায়বদ্ধ থাকে। তার পক্ষ থেকে সপ্তম দিনে জবাই করো, তার মাথা মুগ্নন করো।”^{৬৪২}

শিশুর জন্য ভালো নাম চয়ন করা সুন্নাত। নাবী ^ص খারাপ নাম পরিবর্তন করে ভালো নাম রেখেছেন এবং তিনি রাখতে বলেছেন।^{৬৪৩} আর সবচেয়ে উত্তম নাম হলো আবদুল্লাহ ও আব্দুর রহমান। ইবনু উমার ^{رض} থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ^ص বলেছেন:

إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَاءِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ

“নিচয়ই মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম আবদুল্লাহ ও আব্দুর রহমান।”^{৬৪৪}

২. নবজাতক চুল মুগ্নন করা: আকীকা জবাই করার পরে তার চুল মুগ্নন করা সুন্নাত। চাই সে পুরুষ কিংবা মহিলা হোক এবং তার চুলের সমপরিমাণ রূপা সাদকা করবে। আলী ^ع থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

(عَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ بْشَاءَ، وَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ، اخْلِقِي رَأْسَهُ، وَتَصَدِّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فَفَصَّةً)
 “রসূলুল্লাহ ^ص একটি ছাগল দ্বারা হাসানের আকীকা করেছেন। তিনি বলেছেন: হে ফাতিমা! তার মাথা নেড়া করে দাও এবং তার চুলের ওজনের অনুরূপ রূপা দান করো।”^{৬৪৫}

৩. নবজাতক শিশুকে তাহনীক করানো: তাকে খেজুর দ্বারা তাহনীক করা সুন্নাত। চাই সে পুরুষ বা মহিলা হোক।

^{৬৪২} আহমদ ৫/৭, ৮, ১২; সুনান আবু দাউদ, হা. ২৮৩৭; তিরমিয়ী, হা. ১৫২২; নাসাই ৭/১৬৬; ইয়াম হাকিম সহীহ বলেছেন। ইয়াম আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহন নাসাই, হা. ৩৯৩৬।

^{৬৪৩} দেবুন, ফাতহল বারী ১০/৫৭৭।

^{৬৪৪} সহীহ মুসলিম, হা., ফুআ. ১৯৬১।

^{৬৪৫} আহমদ ৬/৩৯০, ৩৯২; মুয়াত্তা মালিক পৃষ্ঠা ২৫৯; তিরমিয়ী, হা. ১৫১৯; হাকিম ৪/২৩৭; বাযহাকী ৯/৩০৪; ইয়াম আলবানী হাসান প্রস্তুত, সহীহত তিরমিয়ী, হা. ১২২৬।

খেজুর চিবিয়ে নবজাতকের মুখে দেওয়া, যাতে তার কিছু পেটে যায়। আবু মুসা رض থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

(وَلَدٌ لِيْ غَلَامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَخَنَّكَهُ بِتَمَرٍ)

“আমার একটি ছেলে সন্তান হলো, আমি তাকে নিয়ে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে উপস্থিত হলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহীম। অতঃপর একটি খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দিলেন।”^{৬৪৬}

আয়িশাহ رض থেকে বর্ণিত: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتِي بِالصَّبِيَّانِ وَيَحْنَكُهُمْ)

“আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে (নবজাতক) সন্তানদের নিয়ে আসা হতো। খেজুর চিবিয়ে তাদের মুখে দিতেন।”^{৬৪৭}

৪. নবজাতক শিশুর কানে আযান দেওয়া: নবজাতকের জন্মের পরে তার কানে আযান দেওয়া সুন্নাত। বলা হয়: তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত দিতে হবে। আবু রাফে رض থেকে বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে।

(رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْنَنَ فِي أَذْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَّةِ)

“ফাতিমা رض-হাসান ইবনু আলী رض-কে প্রসব করলে আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাসানের কানে সলাতের আযানের মতোই আযান দিতে দেখেছি।”^{৬৪৮}

^{৬৪৬} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৫৪৬৭; সহীহ মুসলিম, হা. ৫৫০৮, ফুআ. ২১৪৫।

^{৬৪৭} সহীহ মুসলিম, হা. ৫৫১২, ফুআ. ২১৪৭।

^{৬৪৮} তিরমিয়ী, হা. ১৫১৪ এবং তিনি হাসান সহীহ বলেছেন; শাইখ আলবানী হাসান বলেছেন, সহীহত তিরমিয়ী, হা. ১২২৪।



ষষ্ঠ অধ্যায়
জিহাদ

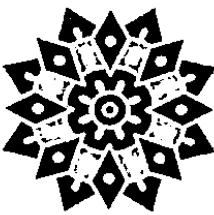
سادساً : كِتَابُ الْجَهَاد

————— ♡ এতে ০৩টি অনুচ্ছেদ রয়েছে ♡ ———

প্রথম অনুচ্ছেদ : জিহাদের পরিচয়, ফয়েলত, হকুম, শর্ত এবং কে কে জিহাদ করা থেকে বিয়োগ হবে

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : বন্দী এবং গণীমত

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : যুদ্ধ বিরতি, জিম্মা এবং নিরাপত্তা



الباب الأول : تعريف الجهاد وفضله وحكمه وشروطه ومسقطاته প্রথম অনুচ্ছেদ : জিহাদের পরিচয়, ফযীলত, হকুম, শর্ত এবং কে কে জিহাদ করা থেকে বিয়োগ হবে

এ অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المسألة الأولى: تعريفه، وفضله، والحكمة منه، وحكمه، ومتي يتبعين؟

প্রথম মাসআলা: জিহাদের সংজ্ঞা, ফযীলত, তাৎপর্য, বিধান এবং কখন
সেটি নির্দিষ্ট (ফরযে আইন) হবে؟

ক. জিহাদের (الجهاد) পরিচয়:

অভিধানিক অর্থ: “بذل الجهود والطاقة والواسع.”

পারিভাবিক অর্থ:

بذل الجهد والواسع في قتال الأعداء من الكفار ومدافعتهم.

“কাফের শক্তদের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে এবং তাদের প্রতিহত করার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা ও শক্তি ব্যয় করাকে জিহাদ বলা হয়।”

খ. জিহাদের ফযীলত ও তাৎপর্য: জিহাদ হলো ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া। যেমনটি নাবী ﷺ নামকরণ করেছেন।^{৬৪৯} কারণ এর মাধ্যমে ইসলাম উঁচু ও সমুদ্রত হয়। যারা আল্লাহর রাস্তায় মাল ও জ্ঞান দিয়ে জিহাদ করেন আল্লাহ তা'আলা তাদের ফযীলত বর্ণনা করেছেন এবং তাদেরকে জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন। একটু পরই সুরা নিসার আয়াত উল্লেখ করা হচ্ছে। এ ঘাড়াও জিহাদ ও মুজাহিদদের ফযীলত সম্পর্কে অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে।

^{৬৪৯} তিগ্রিয়ী, ঘ্য. ২৬১৬ এবং তিনি হাসান সহীহ বলেছেন। আহমাদ ৫/২৩১; ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহ সুনানুত তিগ্রিয়ী, ঘ্য. ২১১০; এটা লঙ্ঘ হাদীসের অংশ।

জিহাদ শরীয়ত সম্মত হওয়ার তাৎপর্য: আল্লাহ তা'আলা মহৎ কিছু উদ্দেশ্যে জিহাদকে শরীয়ত সম্মত করেছেন। তন্মধ্যে:

১. আল্লাহ তা'আলা জিহাদকে শরীয়ত সম্মত করেছেন, যাতে তিনি মানুষকে মুর্তি ও তাগুতের ইবাদত থেকে মুক্ত করতে পারেন এবং এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে তাদেরকে নিয়ে যেতে পারেন, যার কোনো শরীক নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَقَاتُلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾

“তোমরা সদা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।” [সূরা আনফাল : ৩৯]

২. তিনি জিহাদকে শরীয়তসম্মত করেছেন, যাতে তিনি যুলুমকে দূর করতে পারেন এবং মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أُذْنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلْمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

“তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো, যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ তাদের প্রতি যুলুম করা হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম।” [সূরা হাজ্জ : ৩৯]

৩. তিনি জিহাদকে শরীয়ত সম্মত করেছেন কাফেরদেরকে অপদন্ত করার জন্য, তাদের নাককে ধূলায় ধূসরিত করার জন্য এবং তাদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيهِمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَسِّفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ﴾

“তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো। আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন এবং তাদেরকে লালিত করবেন। আর তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করবেন এবং মুমিনের অতরসমূহকে প্রশান্ত ও ঠাণ্ডা করবেন।” [সূরা তাওবা : ১৪]

গ. জিহাদের হৃকুম এবং তার দলীল:

খাস বা বিশেষ অর্থে জিহাদ ফরযে কেফায়া। কেউ জিহাদ করলে অন্যদের আর পাপ হবে না। তাদের ক্ষেত্রে জিহাদ তখন সুন্নাহ হিসেবে পরিগণিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ
فَضَلَّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسْنَىٰ وَفَضَلَّ اللَّهُ
الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

“বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা কোনো অক্ষমতা ব্যতীতই গৃহে বসে থাকে, আর যারা নিজ ধন ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তারা সমান নয়। যারা জান-মাল দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ

তাদেরকে গৃহে অবস্থানকারীদের উপর উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন; আল্লাহ সকলের জন্যই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মুজাহিদদেরকে বসে-থাকা লোকদের তুলনায় আল্লাহ মহাপুরুষের দিয়ে মর্যাদা দান করেছেন।” [সূরা নিসা : ৯৫]

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, জিহাদ ফরযে কেফায়া; ফরযে আইন নয়। কেননা যারা জিহাদ করে এবং যারা কোনো ওজর ছাড়াই জিহাদ করে না, আল্লাহ তাদের মাঝে তুলনা করেছেন। আল্লাহ প্রত্যেকেই কল্যানের ওয়াদা দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে জান্নাত। যদি ফরযে আইন হতো তাহলে যারা জিহাদ করে না, তারা অবশ্যই শাস্তির হকদার হতো এবং তারা কোনো প্রতিশ্রুতি পেত না। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَابِقُهُ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

“আর মুমিনদের জন্য এটা সমীচীন নয় যে, সকলের একত্রে অভিযানে বের হবে। সুতরাং তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা ধীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারে।” [সূরা নিসা : ১২৬]

এ আয়াতে শর্তবৃক্ষ করা হয়েছে মুসলিমরা তখনই শক্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যখন তাদের শক্তি ও সামর্থ্য হবে। যদি তাদের শক্তি ও সামর্থ্য না থাকে তাহলে অন্যান্য ওয়াজিবের মতোই তা বাহিত হয়ে যাবে। সে অবস্থায় শক্রদের সাথে যুদ্ধ করলে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া হবে।

ঘ. জিহাদ কখন ফরযে আইন হবে?

নিম্নের অবস্থাগুলোর যে কোনো একটি পাওয়া গেলে জিহাদ ফরযে আইন হবে:

প্রথম অবস্থা: যখন শক্ররা মুসলিমর দেশে আক্রমণ করবে, তাদের উপর চেপে বসবে কিংবা তাদের দেশকে অবরোধ করবে, তখন তাদের ক্ষতি ঠেকানোর জন্য সকল মুসলিমের উপরে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অবস্থা: যুদ্ধের সময় দুই বাহিনী পরস্পর মুখোমুখি হলে জিহাদ ফরযে আইন এবং যুদ্ধে উপস্থিত মুসলিমদের উপর ময়দান থেকে পলায়ন করা হারাম হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّمَا أَئِبَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا رَحْقًا قَلَّ تُؤْهِمُهُمْ أَلْدَبَارٌ

“হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন কাফের বাহিনীর সমুখীন হবে তখন তাদের মুকাবিলা করা হতে কখনোই প্রস্তুত প্রদর্শন করবে না।।” [সূরা আনফাল : ৩৯]

নাবী ﷺ যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করাকে ধ্বংসাত্মক জিনিসসমূহের মধ্যে গণনা করেছেন।^{৬০}

^{৬০} মুকাবকুন আলাইহি: সহীহস বুখারী, হা. ২৭৬৬; সহীহ মুসলিম, হা. ফুজা. ১৪৫।

তবে নিষিদ্ধ পলায়ন থেকে দুটি অবস্থাকে পৃথক করা হয়েছে। প্রথমত: যদি কৌশলগত দিক পরিবর্তন করার জন্য পলায়ন করে, অর্থাৎ সে পলায়ন করে আরও বেশি শক্তি নিয়ে আসবে। দ্বিতীয়ত: শক্তি অর্জন ও সাহায্য লাভের জন্য মুসলিমদের কোনো দলের আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য।

তৃতীয় অবস্থা: ইমাম যাদেরকে জিহাদে বের হতে বলবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

هُنَّا أَئِيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَّا قَلْمَنْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِيْسِتُمْ بِالْحَيَاةِ
الَّدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ . إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْنَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“হে মুমিনগণ! তোমাদের কি হলো যে, যখন তোমাদেরকে বলা হয়, আল্লাহর পথে বের হও, তখন তোমরা আরও জোরে মাটিতে লেগে থাকো। তাহলে কি তোমরা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনের উপর পরিতৃষ্ণ হয়ে গেলে? বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাসিতা আধিরাতের তুলনায় কিছুই নয়, অতি সামান্য। যদি তোমরা (যুদ্ধাভিযানে) বের না হও, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতিকে স্থলাভিষিক্ত করবেন। আর তোমরা আল্লাহর (দ্বীনের) কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।” (সূরা তাউবা : ৩৮-৩৯)

নাবী ﷺ বলেন: (وَإِذَا اسْتَنْفِرْتُمْ، فَانْفِرُوا)

“যখন তোমাদেরকে জিহাদের জন্য ডাকা হবে, সাড়া দিবে।”^{৬৫১}

চতুর্থ অবস্থা: কখনো নিজের প্রয়োজনে তার উপর জিহাদ করা ফরযে আইন।

الْمَسَأَةُ الثَّانِيَةُ: شُرُوطُ الْجِهَادِ

দ্বিতীয় মাসআলা: জিহাদের শর্তসমূহ

জিহাদ ফরয হওয়ার জন্য সাতটি শর্তারোপ করা হয়েছে। সেগুলো হলো: ১. মুসলিম হওয়া ২. বালেগ হওয়া ৩. জ্ঞানবান হওয়া ৪. পুরুষ হওয়া ৫. স্বাধীন হওয়া ৬. শারীরিক ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা থাকা ও ৭. অসুস্থতা ও অসুবিধা থেকে মুক্ত থাকা।

সুতরাং কোনো কাফেরের উপর জিহাদ আবশ্যিক নয়। কেননা তা একপ্রকার ইবাদত। আর ইবাদত কাফেরের উপর আবশ্যিক নয়। সে ইবাদত করলে বিশুद্ধও হবে না। কেননা তার মধ্যে ইখলাস, আমানত ও আনুগত্য নেই। তাই তার জন্য মুসলিম সৈন্যবাহিনীর সাথে জিহাদে বের হওয়ার অনুমতি নেই। কেননা নাবী ﷺ বদর যুদ্ধে এক মুশরিককে বলেছিলেন:

^{৬৫১} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ১৮৩৪; সহীহ মুসলিম, হা. ৩১৯৩, ফুআ. ১৩৫৩।

(تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِنَ بِمُشْرِكٍ)

“তুমি কি আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান রাখো? সে বলল, না। তিনি  বললেন: তাহলে তুমি ফিরে যাও, আমি কোনো মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করব না।”^{৬৫২}

ଅନୁରୂପ ଅପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟକ୍ତ ବାଲକେର ଉପର ଜିହାଦ ଆବଶ୍ୟକ ନୟ । କେନନା ସେ ଦାୟିତ୍ୱପ୍ରାପ୍ତ ନୟ । ଇବନୁ
ଉମାର ଖ ଏର ହାଦୀସ:

أنه عَرَضَ نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحدٍ وَهُوَ أَبْنُ أَرْبَعَ عَشَرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزِّهُ فِي الْمَاقَاتِلَةِ

“তিনি নিজেকে উহুদের যুদ্ধের জন্য আল্লাহর রসল ﷺ এর নিকটে উপস্থাটপন করলেন। তখন তার বয়স ১৪ বছর। তাকে যুদ্ধের অনুমতি দেননি।”^{৬৫৩}

পাগলের উপরে জিহাদ আবশ্যক নয়। কেননা তার থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং সে দ্বায়িত্বান্ত নয়। দাসের উপরে জিহাদ ফরয নয়, কেননা সে তার মনিবের মালিকনাভুক্ত। যহিলাদের উপরও জিহাদ ফরয নয়। আয়িশাহ আবস্তু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال: **جَهَادٌ، لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحُجَّةُ وَالْعُمَرَةُ**

“হে আল্লাহর রসূল! মহিলাদের উপরও জিহাদ আছে? তিনি বললেন: হ্যা, তবে সে জিহাদে লড়াই নেই। তা হচ্ছে হাজ় ও উমরাহ।”^{৬৫৪}

نَرِيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ الْعَمَلِ، أَفْلَأُ نُجَاهِدُ؟ قَالَ: لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجَّ مَبْرُورٌ

“আমরা দেখছি জিহাদ হচ্ছে সর্বোত্তম আমল। আমরা কী জিহাদ করব না? তিনি  বললেন: সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে কবুল হাজ়ি।”^{৬৫৫}

জিহাদে অক্ষম ব্যক্তি তাকেই বলা হয় যে ব্যক্তি দুর্বলতা কিংবা বয়স্ক হওয়ার কারণে অন্ত বহন করতে সক্ষম নয়, তার উপর জিহাদ আবশ্যিক নয়। তেমনিভাবে এমন দরিদ্র ব্যক্তির উপরও জিহাদ ফরয নয় যে তার পরিবারের খরচ ও জিহাদের পথের খরচ বহন করতে সক্ষম না। আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجْدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ﴾

“ଆର ଖରୁଚ କରାର ମତୋ କୋଣୋ ସମ୍ବଲ ଯାଦେର ନେହି ତାଦେର କୋଣୋ ପାପ ନେହି ।” [ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିବା : ୧]

তেমনিভাবে যার কোনো অসুস্থতা, ক্ষতি কিংবা এ ধরনের কোনো ওয়ার রয়েছে, তার উপরও জিহাদ ফরয নয়। কেননা অপারগতা ওয়াজিব দূর করে দেয়। আল্লাহ বলেন:

^{४२} नवीन मुसलिम, शा. ४५९४, फुआ. १८१७।

^{৬৫} মুজাফারকন আলাইহি: সংগ্রহ বুখারী, হা. ২৬৬৪; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৬৮৬।

^{१४} दैवन माज्जाह. डा. ३९०२; शास्त्रात्मकी ४/३५० इमाम आलबानी सहीह बलेहेन, ईरउया नं २१८५।

୨୯ ଶରୀରକୁ ବାହୀ ଆ ୩୭୯୪ ।

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَغْرِيَقِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمُرِبِّضِ حَرْجٌ﴾

“অঙ্কের উপর কোনো দোষ নেই, খোঁড়ার উপর কোনো দোষ নেই, অসুস্থির উপর কোনো দোষ নেই।” [সূরা ফাতহ : ১৭]

আল্লাহ আরও বলেন:

﴿لَيْسَ عَلَى الْضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمُرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرْجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

“দুর্বল লোকদের উপর কোনো পাপ নেই এবং অসুস্থির ব্যক্তির উপর। আর খরচ করার মতো কোনো সম্ভল যাদের নেই তাদেরও কোনো পাপ নেই। যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি নিষ্ঠা রাখে।” [সূরা তাওবা : ৯১]

المسألة الثالثة: مسقطات الجهاد

তৃতীয় মাসআলা: যাদের উপর জিহাদ ফরজ নয়

কিছু ওয়রের কারণে জিহাদ রহিত হয়ে যাবে; সেটি ফরযে আইন কিংবা ফরযে কেফায়া হোক।
সেগুলো হলো:

১-২. পাগল ও শিশু: আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةِ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يُفْقِيَ، وَعَنِ النَّاَئِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِطَ، وَعَنِ الصَّبِّيِّ حَتَّىٰ يَعْلَمُ.

“তিনি শ্রেণির থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। ১. পাগল; যতক্ষণ না সুস্থ হয়, ২. ঘুমতি ব্যক্তি যতক্ষণ না জাগ্রত হয়, ৩. শিশু যতক্ষণ না প্রাপ্তবয়স্ক হয়।”^{৬৫৬}

৩. মহিলা: কোনো মহিলার উপর জিহাদ ওয়াজিব নয়। পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

৪. দাস: আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

(لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرًا، وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْحُجَّ وَبِرُّ أُمِّي، لَا خَيْثُ أَنْ أُمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ).

“সৎ ক্রীতদাসের সওয়াব হবে দ্বিগুণ। যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, আল্লাহর পথে জিহাদ, হাজ্জ এবং আমার মায়ের সেবার মতো উভয় কাজ যদি না থাকত, তাহলে ক্রীতদাসরূপে মৃত্যুবরণ করাই আমি পছন্দ করতাম।”^{৬৫৭}

^{৬৫৬} সুনান আবু দাউদ, খ. ৪৪০১; নাসাই' ৬/১৫৬; ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, ইরওয়া ২৯৭।

^{৬৫৭} সহীহল বুখারী, খ. ২৫৪৮; তার কথা (وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِهِ) সঠিক হচ্ছে এটা আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে মুদ্রাজ।

৫ ও ৬. শারিরিক দুর্বলতা, অর্থনৈতিক অক্ষমতা, অসুস্থতা কিংবা শরীরের কোনো অঙ্গ ঠিক না থাকা। যেমন- অঙ্গ হওয়া, নেঁড়া হওয়া ইত্যাদি। এর আলোচনা গত হয়েছে।

৭. নফল বা ঐচ্ছিক জিহাদের ক্ষেত্রে পিতা-মাতা কিংবা দুইজনের একজনের অনুমতি না পাওয়া। ইবনু উমার رض থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

(جَاءَ رَجُلٌ إِلَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَشْتَأْذَنُهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: أَحَبُّ إِلَيْهِ الدِّرَأَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدُ)

“এক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইল। তখন তিনি رض বললেন: তোমার পিতামাতা জীবিত আছেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। নাবী رض বললেন: তাহলে তাঁদের খেদমতে নিয়োজিত থাকো।”^{৬৫৮}

পিতা-মাতার খেদমত করা ফরযে আইন। আর এই অবস্থায় জিহাদ ফরযে কেফায়া। সুতরাং, ফরযে আইনকেই অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। তবে যখন জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাবে তখন তারা বাঁধা প্রদান করতে পারবে না এবং তাদের অনুমতিও লাগবে না।

৮. যার কাছে ঝণ পরিশোধ করার মতো অর্থ নেই এবং ঝণদাতার অনুমতিও নেই; যদি নফল জিহাদ হয়। নাবী رض বলেন:

الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفَّرُ كُلُّ شَيْءٍ، إِلَّا الدِّينُ

“আল্লাহর পথে জিহাদ ঝণ ব্যতীত সকল বিষয়কে ক্ষমা করে দেয়।”^{৬৫৯}

৯. এ আলেম যিনি ব্যতীত সে এলাকায় অন্য কোনো আলেম নেই; কেননা যদি সে নিহত হয় তাহলে অবশ্যই মানুষেরা তার প্রয়োজন অনুভব করবে। কারণ তার স্থলাভিষিঞ্জ কেউ হতে পারবে না। তাঁর চাইতে জ্ঞানী কাউকে না পাওয়া গেলে, মুসলিমদের প্রয়োজনের স্বার্থে তার থেকে জিহাদ রাহিত হয়ে যাবে।

^{৬৫৮} مুওাফাকুন আলাইহি: সদীহল বুখারী, হা. ৩০০৪; সদীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ২৫৪৯।

^{৬৫৯} সদীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৮৮৬ আন্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস এর হাদীস।

الباب الثاني : في الأسرى والغنائم দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : বন্দী এবং গণীমত

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: حُكْمُ أَسْرِيِ الْكُفَّارِ প্রথম মাসআলা: কাফের বন্দীদের হকুম

অধিকাংশ বিদ্বানদের মতে (এটাই বিশুদ্ধ মত) পুরুষ কাফের বন্দীদের বিষয়টি ইমামের হাতে থাকবে। সুতরাং, দ্বীন ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য করে তাদেরকে যেকোনো একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে; হত্যা অথবা দাসত্ব অথবা বিনিময়হীন অনুগ্রহ অথবা ফিদয়া (সম্পদ, উপকার অথবা মুসলিম বন্দী আজাদ করে দেওয়া)। নারী ও শিশু বন্দী হলেই দাস হিসেবে গণ্য হবে এবং গণীমতের মালের সাথে তারা যুক্ত হবে। ইমামের কাছে তাদের কোনো করায়ত থাকবে না। তাদেরকে হত্যা করা নিষেধ; এব্যাপারে রসূল ﷺ থেকে নিষেধজ্ঞ এসেছে। (কাফের পুরুষ বন্দীদের) হত্যা করার দলীল: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُّوكُمْ﴾

“মুশরিকদেরকে যেখানে পাও হত্যা করো।” [সূরা তাওবা : ৫]

﴿مَا كَانَ إِيمَانُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُشْخَنَ فِي الْأَرْضِ﴾

“কোনো নাবীর জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, দেশে (আল্লাহর দুশমনদেরকে) পুরোমাত্রায় পরাভূত না করা পর্যন্ত তার (হাতে) যুদ্ধ-বন্দী থাকবে।” [সূরা আনফাল : ৬৭]

আল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়া তা'আলা বলেছেন, যে বদরের মুশরিকদেরকে বন্দী ও মুক্তিপণ দেওয়ার চাইতে হত্যা করাই উত্তম ছিল। আনাস ইবনু মালেক رض থেকে বর্ণিত।

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَخَلَ عَامَ الْفَتحِ، وَعَلَىٰ رَأْسِهِ الْغَفْرَ، فَلَمَّا تَرَعَّهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُّتَعَلِّقٍ بِأَسْنَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ

“মকা বিজয়ের বছর আল্লাহর রসূল ﷺ লোহ শিরস্ত্রাণ পরা অবস্থায় (মকা) প্রবেশ করেছিলেন। অতঃপর তিনি ﷺ যখন শিরস্ত্রাণটি মাথা হতে খুললেন, এক ব্যক্তি এসে তাঁকে বলল, ইবনু খাতাল কাঁবার গিলাফ ধরে আছে। অতঃপর তিনি বললেন: তাকে তোমরা হত্যা করো।”^{৬৬০}

নাবী ﷺ বনু কুরাইয়ার পুরুষ বন্দীদের হত্যা করেছিলেন।

^{৬৬০} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীছুল বুখারী, হা. ১৮৪৬; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৩৫৭।

দাস বানানোর দলীল: আবু সাঈদ আল খুদরী رضي الله عنه বনু কুরাইয়ার ঘটনা বর্ণনা করেছেন:

لَمَّا نَزَّلَ عَلَىٰ حُكْمٍ سَعِدَ بْنُ مُعَاذٍ رضي الله عنه، فَحُكِمَ أَنْ تَقْتَلَ الْمَقَاتِلَةَ، وَتُسَبِّيَ الذَّرِيَّةَ

“যখন বনী কুরাইয়ায় সাদ ইবনু মুয়ায় رضي الله عنه-এর ফয়সালা মোতাবেক দূর্গ থেকে বেরিয়ে আসে। অতঃপর তিনি ফয়সালা দেন তাদের মধ্য হতে যারা যুদ্ধ করতে পারে, তাদেরকে হত্যা করা হবে এবং নারী ও শিশুদের বন্দী করা হবে।”^{৬৬১}

অনুগ্রহ করা এবং মুক্তিপণ নেওয়ার দলীল: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَصَرِّبُ الرِّقَابَ حَتَّىٰ إِذَا أَخْتَشِيْهُمْ فَشُدُّوا الْوَقَائِ فَإِنَّمَا مَنْ بَعْدُ رِعَايَةً حَتَّىٰ تَضَعَ الْخُرُبُ أَوْ زَارَهَا...

“অতএব যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে করো তখন তাদের গর্দানে আঘাত করো। পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরামর্শ করবে তখন তাদেরকে কবে বাঁধবে; অতঃপর হয় অনুকস্পা, না হয় মুক্তিপণ।”[সূরা মুহাম্মাদ : ৪]

ইমামের উচিত এগুলোর মধ্যে মুসলিমদের জন্য যেটি সবচেয়ে কল্যাণকর সেটি করা। কারণ ইমাম অন্যদের জন্য কাজ করেন। সুতরাং তার সিদ্ধান্ত এমন হওয়া উচিত যেন মুসলমানদের কল্যাণে আসে।

المسألة الثانية: تقسيم الغنيمة بين الغانمين দ্বিতীয় মাসআলা : গনীমতের মাল বণ্টন

الغَنِيمَةُ (গনীতম): যুদ্ধের মাধ্যমে কাফেরের যে সমস্ত মাল গ্রহণ করা হয় সেগুলোকে গনীমত বলা হয়। এ যুদ্ধে আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করা উদ্দেশ্য থাকে।

الغَنِيمَةُ কে **نَفَال** (আল-আনফাল) ও বলা হয়। আর **نَفَال** শব্দটি এর বহুবচন (অর্থ: অতিরিক্ত)। কারণ তা মুসলিমদের মালের অতিরিক্তাংশ।

গনীতম শরীয়ত সম্মত হওয়ার মূল দলীল: আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

فَكُلُوا مِمَّا عَنِيتُمْ حَلَالًا طَيْبًا وَأَئْتُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

“সুতরাং যুদ্ধে তোমরা যা কিছু গনীমত লাভ করেছ তা হালাল ও পবিত্ররূপে ভোগ করো, আর আল্লাহকে ভয় করো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।” [সূরা আনফাল : ৬৯]

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর্যুক্ত জন্য গনীমতের মাল হালাল করেছেন, যা পূর্ববর্তী উপর্যুক্ত জন্য হালাল ছিল না। নাবী ﷺ বলেন: **وَأَجِلَّتِيْ لِيْ الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تُحَلِّ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ**

^{৬৬১} সহীহ বুখারী, হা. ৩০৪৩।

“আমার জন্য গনীমত হালাল করা হয়েছে। আমার পূর্বে কারো জন্য হালাল ছিল না।”^{৬৬২}
আর গনীমতের অঙ্গৰুক্ত: সম্পদ, বন্দী এবং জমিন। অর আলেমদের মতে গনীমতকে পাঁচভাগে
বিভক্ত করা হবে:

প্রথম ভাগ: ইমামের ভাগ; যা এক পঞ্চমাংশ। তা ইমাম বা নায়েবে ইমাম বের করবে। আর এই
পঞ্চমাংশকে ভাগ করা হবে ঐ পদ্ধতিতে যে পদ্ধতি আল্লাহ কুরআনে বর্ণনা করেছেন:

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَيْرُهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خَمْسَةٌ وَالرَّسُولُ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ﴾

“আর তোমরা জেনে রেখো যে, যুক্তে তোমরা যা কিছু গনীমতের মাল লাভ করেছ, ওর এক
পঞ্চমাংশ আল্লাহ, তাঁর রাসূল, (রাসূলের) নিকটাতীয়, ইয়াতীম, মিসকিন এবং মুসাফিরের
জন্য।” [সূরা আনফাল : ৪১]

এ পঞ্চমাংশকে পাঁচভাগে ভাগ করা হবে।

১. আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য: এ অংশটি ফায় হিসেবে থাকবে। যা বায়তুল মালের
আওতাভুক্ত হবে এবং মুসলিমদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। নাবী ﷺ বলেছেন:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَالِي مَعِي أَفَاءَ اللَّهُ إِلَّا الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ

“ যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ। এই ‘ফাই’-এ আমার কোনো অংশ নেই, শুধুমাত্র এক-
পঞ্চমাংশ ছাড়া। আবার তাও তোমাদের কল্যাণের জন্যই ব্যয় করা হবে।”^{৬৬৩}

নাবী ﷺ এ অংশটিকে সকল মুসলিমের জন্যই করেছেন।

২. নিকটাতীয়: তারা হচ্ছে আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকটাতীয়; বনু হাশেম এবং বনু মুত্তালিব।
এ পঞ্চমাংশ থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী তাদেরকে দেওয়া যাবে।

৩. ইয়াতীম: বালেগ হওয়ার পূর্বেই যার পিতা মারা যায়, তাকে ইয়াতীম বলা হয়। চাই সে
পুরুষ হোক বা মহিলা, ধনী কিংবা দরিদ্র; এ সংজ্ঞার মধ্যে পড়লে ইয়াতীম হিসেবে গণ্য হবে।

৪. মিসকিন: ফকির শ্রেণীর লোকেরাও তাদের শ্রেণিভুক্ত হবে।

৫. মুসাফির: অর্থাৎ যার পাথেয় শেষ হয়ে গেছে। তাকে সেই পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে,
যার মাধ্যমে সে তার উদ্দেশ্য পর্যন্ত যেতে পারবে।

আর বাকি চার অংশ অর্থাৎ, পাঁচ ভাগের চারভাগ, যারা যুক্তে উপস্থিত হবে তাদের জন্য। তবে
তাদের পুরুষ, বালেগ, স্বাধীন ও জ্ঞানী হতে হবে; যারা যুক্তের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। চাই
তারা যুক্তে সরাসরি অংশগ্রহণ করুক বা না করুক, তারা শক্তিশালি হোক কিংবা দুর্বল হোক।
যেমন উমার খন্দক বলেন: **الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَرِدَ الْوَقْعَةُ**

^{৬৬২} সহীহ মুসলিম, বা. ফুআ. ৫২১।

^{৬৬৩} সুন্নাহ আবু দাউদ, বা. ২৬৯৪; নামাজ ৪১৩৮, দীর্ঘ হাদীস, অর্থগত বর্ণনা। ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, ইরওয়াউল গালীল ১২৪০

“গনীমত তাদের জন্য যারা যুক্তে অংশগ্রহণ করেছেন।”^{৬৬৪}

বন্টন করার পদ্ধতি: পদাতিক সৈনিককে এক অংশ প্রদান করা হবে এবং অশ্বারোহী সৈন্যকে তিনটি অংশ প্রদান করতে হবে; এক অংশ তার নিজের জন্য এবং দুটি অংশ তার ঘোড়ার জন্য। যেমন ইবনু উমার ^স এর বর্ণিত হাদিস:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ فِي النَّفْلِ، لِلنَّفَرِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا

নিশ্চয়ই আল্লাহর আল্লাহর রসূল ^স গনীমত বন্টন করেছেন। ঘোড় সাওয়ারকে দুই অংশ এবং পদাতিককে জন্য এক অংশ।”^{৬৬৫}

নাবী ^স খয়বার যুক্তে একাপ করেছেন: جعل للراجل سهماً واحداً، وللفارس ثلاثة أسماع

“পদাতিক সৈনিককে এক অংশ প্রদান করা হবে এবং অশ্বারোহী সৈন্যকে তিনটি অংশ প্রদান করা হবে।”^{৬৬৬} এর কারণ হলো, অশ্বারোহীর সম্পদের প্রয়োজনীয়তা এবং তার দ্বারা অর্জিত উপকারের পরিমাণ পদাতিকের চেয়ে বেশি।

আর কোনো মহিলা, দাস কিংবা শিশু যুক্তে উপস্থিত হলে তাদের জন্য কোনো নির্ধারিত অংশ নেই। বিশুদ্ধ মতানুসারে তাদেরকে সামান্য কিছু দেওয়া যেতে পারে। যেমন ইবনু আবাস ^স এক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে বলেন:

إِنَّكَ كَبَّتَنِي عَنِ الْمُرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَخْصُّنِي الْمُغْنَمُ، مَلِّيْقَسْمُ كَمَا شَئْتُ إِنَّهُ لَيْسَ كَمَا شَئْتُ إِلَّا أَنْ يُخْذَلَي.

“তুমি আমাকে লিখেছে এ প্রশ্ন করে যে, যারা জিহাদে যোগ দিয়েছে এমন নারী এবং গোলামকে কি গনীমাতের কিছু দেওয়া হবে? তাদের (নির্ধারিত) কিছুই দেওয়া হবে না। তবে সবার কাছ থেকে কিছু কিছু নিয়ে (বখশিশরূপে) দেওয়া হবে।”^{৬৬৭}

وَفِي لَفْظٍ: (وَمَا الْمَلُوكُ فَكَانُوا يُحِذِّي)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে: “গোলামকে গনীমত থেকে কিছু দেওয়া হতো।”^{৬৬৮}

গনীমতে মাল যদি জমি হয়, তাহলে ইমাম যোদ্ধাদের মাঝে তা বন্টনের স্বাধীনতা রাখে কিংবা মুসলিমদের কল্যানার্থে তা ওয়াকফ করাও স্বাধীনতা রাখে। আর এ জমি যার হাতে থাকবে, তার নিকট থেকে ভূমিকর নেওয়া হবে। চাই সে মুসলিম কিংবা কোনো অমুসলিম যিশি হোক। এ ভূমিকর প্রত্যেক বছরই তার নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে। ইমামের একাপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণের কল্যাণের দিকটাই ধর্তব্য হবে।

^{৬৬৪} ইমাম বায়হাকী সহীহ সানাদে কিতাবুল জিহাদের বাবুল গনীমাতে বর্ণনা করেছেন ৯/৫০; মুসারাফ আন্দুর রাজ্ঞাক ৫/৩০২।

^{৬৬৫} মুস্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হ্য. ৪২২৮; সহীহ মুসলিম, হ্য. ৪৪৭৮ ফুআ. ১৭৬২।

^{৬৬৬} সহীহল বুখারী, হ্য. ২৮৭৩।

^{৬৬৭} সহীহ মুসলিম, হ্য. ৪৫৮০, ফুআ. ১৮১২।

^{৬৬৮} মুন্স আবু দাউদ, হ্য. ২৭২৭।

المسألة الثالثة: مصرف الفيء তৃতীয় মাসআলা: ফায়-এর সম্পদ ব্যয়ের খাত

الفيء বা ফায়: যা যুদ্ধ ছাড়াই আহলুল হারবদের থেকে ন্যায়সঙ্গতভাবে পাওয়া যায়। যেমন কাফেররা মুসলিমদের আগমনের কথা শুনে ধন-সম্পদ রেখে পলায়ন করল।

ব্যয়ের খাত: ইমাম তার ইচ্ছানুযায়ী তা মুসলিমদের কল্যাণার্থে ব্যয় করবেন। যেমন কাজী, মুয়ায়িফন, ইমাম, ফকীহ ও শিক্ষকদের বেতন সেখান থেকেই প্রদান করতে পারবেন। এ ছাড়া মুসলিমদের অন্যান্য কল্যাণে ব্যয় করতে পারবেন। ইবনু উমার رض থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ إِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ، وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً، وَكَانَ يُنْفَقُ عَلَى أَهْلِهِ تَفَقَّهَ سَتَّةٍ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا يَقِيَ فِي الْكُرَاعِ وَالسَّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

“বানী নায়ির গোত্রের সম্পদ এমন সম্পদ যা আল্লাহ তা'আলা আল্লাহর রসূল ﷺ কে বিনাযুক্তে প্রদান করেন। সেখানে মুসলিমরা ঘোড়া এবং উট হাঁকিয়ে যুদ্ধ করেন। এ সম্পদ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সুতরাং তিনি তা থেকে নিজ পরিবারের এক বছরের ভরণ-পোষণে খরচ করলেন এবং অবশিষ্ট সম্পদ আল্লাহর পথে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য ঘোড়া ও অস্ত্র ক্রয় খাতে রেখে দিলেন।”^{৬৬৯}

এ জন্য আল্লাহ তা'আলা ফাইয়ের মাল ব্যয়ের বর্ণনায় প্রত্যেক শ্রেণির মুসলিমদের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِنِبْيِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
أَلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْ نَحْنُ

“যে ধন-সম্পদ আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে নিয়ে তাঁর রসূলকে দিয়েছেন তা আল্লাহর জন্য; তাঁর রসূলের জন্য; আর রসূলের আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকিন ও পথিকদের জন্য। যাতে তা তোমাদের মধ্যকার সম্পদশোলীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।” [সূরা হাশর : ৭]

ইমাম অনির্ধারিত পরিমাণ মাল নিয়ে তার ইজতিহাদ অনুযায়ী নিকটাতীয়দেরকে প্রদান করবেন। আর বাকি মাল মুসলিমদের কল্যাণার্থে খরচ করবেন।

^{৬৬৯} মুওফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ২৯০৪; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৭৫৭



الباب الثالث : في الهدنة والذمة والأمان

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المسألة الأولى: عقد الهدنة مع الكفار

প্রথম মাসআলা: কাফেরদের সাথে যুক্তবিরতির চুক্তি

১. هدنه এর পরিচয়: هدنه এর আভিধানিক অর্থ: السكون বা শিরতা, নীরবতা।

ଶାରୀସେ ସଂଖ୍ୟା:

عقد الإمام أو نائبه لأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة وإن طالت،

“প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারিত সময় পর্যন্ত যুদ্ধ বিরতির উপরে আহলুল হারবের তথা যুদ্ধের প্রতিপক্ষের সাথে ইমাম কিংবা প্রতিনিধির চুক্তি করাকে ঘৃণা বলা হয়।”

একে معاہدة وموادعہ، مہادنے বলা হয়।

২. **ঝংড় শরীয়ত সম্মত হওয়ার কারণ এবং তার দলীল:** প্রয়োজনে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যুক্ত বিরতির জন্য কাফেরদের সাথে মুসলিম নেতার যুক্তবিরতির চুক্তি করা বৈধ রয়েছে, যখন সে চুক্তিটি মুসলিমদের কল্যাণর্থে হবে। যেমন: মুসলিমদের দুর্বলতার কারণে বা তাদের প্রস্তুতি না থাকার কারণে কিংবা অন্য কোনো কল্যাণার্থে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلشَّرِ فَاجْنِحْ لَهُمْ﴾

“যদি তারা (কাফেরেরা) সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তাহলে তুমিও সন্ধি করতে আগ্রহী হও, ”

[সূরা আনফাল : ৬১]

আল্লাহর রসূল ﷺ ইদায়বিয়ার সন্ধিতে কাফেরদের সাথে দশ বছর যুদ্ধবিরতির চুক্তি করেছিলেন এবং মদীনায় ইহুদিদের সাথে সন্ধি করেছিলেন।

৩. হৃদয় (যুদ্ধবিরতি) এর আবশ্যকতা:

ইমাম কিংবা প্রতিনিধি যুদ্ধবিরতির চুক্তি করলে তা আবশ্যক হয়ে যায়। সেটি অমান্য করা কিংবা বাতিল করা বৈধ নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা (আহলুল হারব) সেটাকে অবিচল রাখবে, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না এবং বিশ্বাসঘাতকতার আশংকাও থাকবে না, ততক্ষণ তা অঙ্গুল রাখা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَمَا أَسْتَقْعَدْمُوا لَكُمْ فَآسْتَقْيِمُوا لَهُمْ...﴾

“তারা তোমাদের সঙ্গে চুক্তি ঠিক রাখলে, তোমরাও তাদের সাথে চুক্তিতে দৃঢ় থাক।”

[সূরা তাওবা : ৭]

আল্লাহ আরও বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ...﴾

“হে মু’মিনগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো।” [সূরা মায়দাহ : ১]

যদি তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে: যুদ্ধের মাধ্যমে, আমাদের বিরুদ্ধে শক্তদের সহযোগিতা করে, কোনো মুসলিমকে হত্যা করা কিংবা কোনো মুসলিমের মাল ছিনিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে যদি তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তাহলে আমাদের এবং তাদের মধ্যকার যুদ্ধবিরতির চুক্তি ভেঙ্গে যাবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করাও বৈধ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَظَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَنَةَ الْكُفَّارِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ.﴾

“তারা যদি চুক্তি করার পর তাদের শপথ ভঙ্গ করে আর তোমাদের দীনের বিরুদ্ধে কটুক্তি করে, তাহলে কাফেরদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করো, (এই অবস্থায়) তাদের শপথ রইল না, হয়তো তারা বিরত থাকবে।” [সূরা তাওবা : ১২]

যদি কোনো আলামতের মাধ্যমে তাদের পক্ষ থেকে অঙ্গীকার ভঙ্গের আশঙ্কা থাকে, তাহলে তাদের সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা বৈধ হবে। তখন অঙ্গীকার টিকিয়ে রাখ আবশ্যিক নয়। আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَا تَحْافَنَّ مِنْ قُوَّمٍ خَيَانَةً فَأَنْبَذَ اللَّهُمَّ عَلَى سَوَادِ...﴾

“(হে নাবী!) তুমি যদি কোনো সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ভঙ্গের আশংকা করো তাহলে তোমার চুক্তিকেও প্রকাশ্যভাবে তাদের সামনে চুক্তি ভঙ্গের খবর দিয়ে দাও।” (সূরা আনফাল : ৫৮)

অর্থাৎ, তাদের সাথে চুক্তিভঙ্গের কথা তুমি তাদেরকে জানিয়ে দাও, যাতে চুক্তিভঙ্গের বিষয়টি সমগর্কে উভয় পক্ষ সমানভাবে অবগত হতে পারে। তাদেরকে চুক্তিভঙ্গের বিষয়টি জানানোর পূর্বে যুদ্ধ করা জায়ে নয়।

المَسَأَةُ السَّابِقَةُ: عَقْدُ الْذَّمَةِ، وَدُفْعُ الْجِزِيَّةِ:

দ্বিতীয় মাসআলা: জিন্নার চুক্তি এবং জিয়িয়া প্রদান

১. ডম এর পরিচয়:

ডম এর আবিধানিক অর্থ: **العَهْد** তথা অঙ্গীকার করা। তা হচ্ছে নিরাপত্তা এবং জামানত।

ডম এর পারিভাষিক অর্থ:

হো إقرار بعض الكفار على كفرهم، بشرط بدل الجزية، والتزام أحكام الله التي حكمت بها الشريعة الإسلامية عليهم.

“ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান মানার শর্তে এবং জিয়িয়া প্রদানে শর্তে কিছু কাফেরের কুফরির উপরে অনুমোদন প্রদান করাকে জিন্না বলা হয়।”

২. জিন্নার বৈধতা: জিন্নার চুক্তি শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল:

﴿قَاتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحِرِّمُونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَنِّي
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزِيَّةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾

“যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না এবং কিয়ামাত দিনের প্রতিও না, আর ঐ বস্তুগুলিকে হারাম মনে করে না যেগুলিকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল হারাম বলেছেন, আর সত্য ধর্ম (অর্থাৎ ইসলাম) গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো যে পর্যন্ত না তারা বশ্যতা স্থীকার করে প্রজাকাপে স্বেচ্ছায় কর দেয়।” (সূরা তাওবা : ২৯)

বুরাইদা رض থেকে বর্ণিত। নাবী ص বলেছেন:

لَمْ أَذْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكُمْ، فَاقْبِلُ مِنْهُمْ، وَكُفُّ عَنْهُمْ... فَإِنْ هُنْ أَبْوَا فَسَلِّهُمُ الْجِزِيَّةَ.

“প্রথমে তাদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দিবে। যদি তারা তোমার এ আহবানে সাড়া দেয়, তবে তুমি তাদের পক্ষ থেকে তা মেনে নিবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে সরে দাঁড়াবে।..... আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তবে তাদের কাছে কর প্রদানের দাবী জানাবে।”^{৬৭০}

৩. জিয়িয়া কার নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে?

বালেগ, স্বাধীন, ধনী এবং আদায় করতে সক্ষম পুরুষদের থেকে জিয়িয়া গ্রহণ করা হবে। কোনো দাস থেকে তা নেওয়া হবে না; কেননা সে কোনো কিছুর মালিক নয়, সে ফকীরের স্তরে। আর মহিলা, শিশু এবং পাগলদের থেকেও নেওয়া হবে না; কেননা তারা যোদ্ধা নয়। যারা দীর্ঘস্থায়ী রোগী এবং অতিবৃদ্ধ তাদের থেকে জিয়িয়া গ্রহণ করা হবে না; কেননা তাদের রক্ত প্রবাহিত করা নিষিদ্ধ। সুতরাং, তারা নারীদের সাদৃশ্য রাখে।

৪. জিম্মা চুক্তির কারণে যা আবশ্যিক হয়: কাফেরদের সাথে করা এই চুক্তির ফলে তাদেরকে হত্যা করা হারাম। তাদের মাল রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, তাদের সম্মান রক্ষা করতে হবে, তাদের স্বাধীনতা হেফাজত করতে হবে, তাদেরকে কষ্ট দেওয়া যাবে না এবং তাদের সাথে কেউ অপরাধ করলে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। নাবী ﷺ বলেছেন:

إِنَّمَا أَعْلَمُ بِعِدْوَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ فَادْعُوهُمْ إِلَى ثَلَاثَتِ خِصَالٍ -أَوْ خَلَالٍ- فَإِنْتُمْ مَا أَجَابُوكُمْ فَاقْبِلُوهُمْ وَكُفُّ عَنْهُمْ...

“যখন তুমি মুশরিক শক্তির সম্মুখীন হবে, তখন তাকে তিনটি বিষয় বা আচরণের প্রতি আহ্বান জানাবে। তারা এগুলোর মধ্য থেকে যেটিই গ্রহণ করে, তুমি তাদের পক্ষ থেকে তা মেনে নিবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়াবে।”^{৬৭১}

الْمَسْأَلَةُ التَّالِثَةُ: عَقْدُ الْأَمَانِ

তৃতীয় মাসআলা: (মালা) নিরাপত্তার চুক্তি

১. মালা এর পরিচয়:

আভিধানিক অর্থ: তথা-নিরাপত্তা (الخوف ভয়) এর বিপরীত।

^{৬৭০} সহীহ মুসলিম, হা. ৪৪১৪ ফুআ. ১৭৩১।

^{৬৭১} সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৭৩১।

পারিভাষিক অর্থ: هو عبارة عن تأمين الكافر على ماله ودمه مدة محدودة.

“নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাফেরদের জান ও মালের নিরাপত্তা দেওয়াকে আমা বলা হয়।”

২. শরীয়ত সম্মত হওয়ার কারণ এবং দলীল:

আমা শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

إِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأْجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أُبْلِغْهُ مَأْمَنَةً.

“মুশরিকদের মধ্য হতে যদি কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাহলে তুমি তাকে আশ্রয় দান করো। যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়; অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও।” [সূরা তাওবাহ : ৬]

৩. নিরাপত্তা কার পক্ষ থেকে বিশুদ্ধ হবে এবং তার জন্য কি কি শর্ত করা হয়েছে:

প্রত্যেক মুসলিমের পক্ষ থেকেই নিরাপত্তার চুক্তি করা বিশুদ্ধ হবে। তবে শর্ত হলো: ১. তাকে জ্ঞানবান বালেগ হতে হবে; সুতরাং, কোনো পাগল এবং শিশুর পক্ষ হতে বিশুদ্ধ হবে না। ২. স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী হতে হবে: সুতরাং, বাধ্য করা হয়েছে এমন ব্যক্তি, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি এবং অজ্ঞান ব্যক্তির নিরাপত্তা প্রদান বিশুদ্ধ হবে না। ৩. মহিলার নিরাপত্তা বিশুদ্ধ হবে। নাবী ﷺ বলেছেন:

قَدْ أَجَرْنَا مِنْ أَجْرِ رَبِّ يَাْمَ هَانِيٍّ

“হে উম্মু হানী! তুমি যাকে নিরাপত্তা দান করেছ আমরাও তাকে নিরাপত্তা দান করেছি।”^{৬৭২}

দাসের নিরাপত্তা প্রদানও বিশুদ্ধ হবে। নাবী ﷺ বলেছেন:

ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى إِلَيْهَا أَذْنَاهُمْ

“নিরাপত্তা দানের ক্ষেত্রে সর্বস্তরের মুসলিমগণ একইভাবে দায়িত্বশীল। তাদের নিম্নস্তরের প্রদত্ত নিরাপত্তাও কার্যকরী।”^{৬৭৩}

ইমামের পক্ষ হতে সকল মুশরিকের জন্য যে নিরাপত্তা দেওয়া হয়, সেটা সার্বজনীন নিরাপত্তা হবে। আর কোনো সাধারণ মুসলিম নিরাপত্তা দিলে তার একজন শক্র জন্যই নির্দিষ্ট হবে। মুসলিমদের নেতা সুরক্ষা প্রদান করলে, সেটি সাধারণ সুরক্ষা হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ তার রাষ্ট্র সকলের। তার অনুমোদন ব্যতীত অন্য কেউ এরূপ করতে পারে না।

যে শব্দগুলো নিরাপত্তার উপর প্রমাণ করে সেগুলোর দ্বারা নিরাপত্তা সাব্যস্ত হবে।

^{৬৭২} মুকাফাতুল আপাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৩৫৭; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ৩৩৬।

^{৬৭৩} মুকাফাতুল আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৩১৭২; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৩৭০।

যেমন: أَنْتَ آمِنٌ - تُوْمِي أَشْكَانْ مُعْكَرٌ !

আজৰক - আমি তোমাকে আশ্রয় দিলাম।

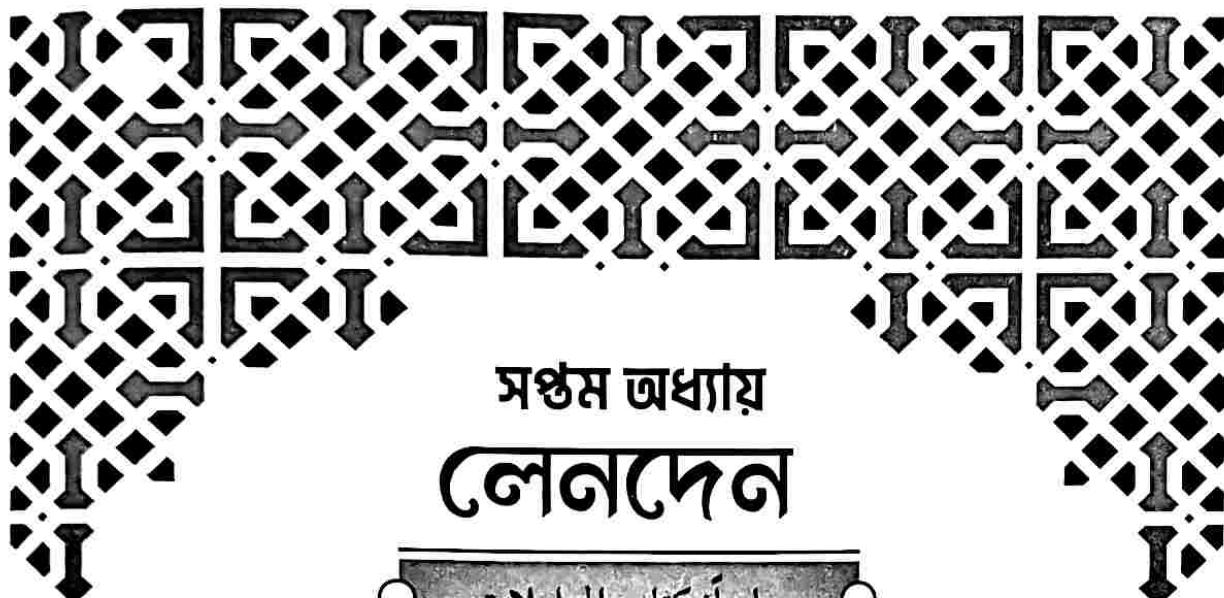
بَأْسٌ عَلَيْكَ - তোমার কোনো সমস্যা নেই। অথবা এমন কোনো ইঙ্গিতের মাধ্যমে।

الْمَسْتَأْمِنُ (নিরাপত্তা প্রার্থী) : যে ব্যক্তি আল্লাহর কালাম শোনার জন্য এবং ইসলামী শরীয়ত জানার জন্য নিরাপত্তা চায়, পূর্বের আয়াতের কারণে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া আবশ্যিক। অতঃপর সে তার সুরক্ষায় ফিরে আসবে।

৪. মানী বা নিরাপত্তার হুকুম এবং তার কারণে যা আবশ্যিক হয়:

মানী এর অঙ্গীকার পূর্ণ করা আবশ্যিক। তাই কোনো নিরাপত্তা চাওয়া ব্যক্তিকে হত্যা করা, বন্দী কিংবা দাসে পরিণত করা হারাম। তেমনিভাবে নিরাপত্তা চুক্তির সকল বিষয় কার্যকর করতে হবে।

যদি শক্রদের মন্দ এবং বিশ্঵াসঘাতকতার আশঙ্কা থাকে, তাহলে তাদের সাথে নিরাপত্তা চুক্তি ভঙ্গ করা বৈধ রয়েছে।



সপ্তম অধ্যায়

লেজদেন

سابعاً: كتاب المعاملات

————— ♫ এতে ২৩টি অনুচ্ছেদ রয়েছে ♫ ———

প্রথম অনুচ্ছেদ: ক্রয়-বিক্রয়

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : সুদ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ঋণ

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : বন্ধক রাখা

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : বাইয়ে সালাম

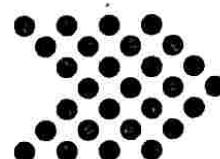
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : হাওয়ালা

সপ্তম অনুচ্ছেদ : প্রতিনিধি নিযুক্ত করা

অষ্টম অনুচ্ছেদ : জিম্মাদারী এবং দায়িত্ব

নবম অনুচ্ছেদ : নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা

দশম অনুচ্ছেদ : অংশীদারিত্ব



-
- একাদশ অনুচ্ছেদ : ভাড়া দেওয়া
 - দ্বাদশ অনুচ্ছেদ : বরগাচাষ ও ফসলের বরগাচাষ
 - ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ : শুফ‘আহ ও প্রতিবেশী
 - চতুর্দশ অনুচ্ছেদ : আমানত রাখা এবং তা নষ্ট করা
 - পঞ্চদশ অনুচ্ছেদ : জোরপূর্বক কিছু নেওয়া
 - ষোড়শ অনুচ্ছেদ : সংস্থি
 - সপ্তদশ অনুচ্ছেদ : প্রতিযোগিতা
 - অষ্টাদশ অনুচ্ছেদ : ধার নেওয়া
 - উনিবিংশ অনুচ্ছেদ : অনাবাদি জমি আবাদি করা
 - বিংশ অনুচ্ছেদ : মজুরী, পারিশ্রমিক
 - একবিংশ অনুচ্ছেদ : কুড়িয়ে পাওয়া বস্ত্র ও শিশু
 - দ্বিবিংশ অনুচ্ছেদ : ওয়াকফ
 - ত্রয়োবিংশ অনুচ্ছেদ : হিবা ও দান



الباب الأول : في البيوع প্রথম অনুচ্ছেদ: ক্রয়-বিক্রয়

এ অনুচ্ছেদে কিছু মাসআলা রয়েছে:

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: تَعْرِيفُ الْبَيْعِ وَحِكْمَتِهِ প্রথম মাসআলা: ক্রয়-বিক্রয়ের পরিচয় ও তার হকুম

ক. পরিচয়: আভিধানিক অর্থে ক্রয়-বিক্রয়: “أخذ شيءٍ وإعطاء شيءٍ” কিছু দিয়ে কিছু নেওয়া।
পরিভাষিক অর্থে: নগদ অথবা বাকিতে কোনো অর্থ-সম্পদ কিংবা বৈধ উপকার নেওয়ার বিনিময়ে শায়ীভাবে সম্পদের লেনদেন করা। তবে অবশ্যই এটি কোনো ধরনের ঝণ কিংবা সুদ হবে না।

খ. ক্রয়-বিক্রয়ের হকুম:

ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ। মহান আলাহ বলেন:

﴿وَأَخْلَقَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا﴾

“আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।” [সুরা বাক্সারাহ : ২৭৫]

ইবনু উমার رض বর্ণনা করেন। নাবী ﷺ বলেন:

إِذَا تَبَاعَ الرَّجُلُانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخَيْرِ مَا لَمْ يَفْرَقْ، وَكَانَا جَمِيعًا

“যখন দুই ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় করে, তখন তাদের উভয়ে যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন না হবে অথবা একে অপরকে ইখতিয়ার প্রদান না করবে, ততক্ষণ তাদের উভয়ের ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করা বা না করার স্বাধীনতা থাকবে।”^{৬৭৪}

আর সকল মুসলমানও ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা বা ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

^{৬৭৪} মুতাফাকুন আলাইহি: সহীহ বুখারী, হা. ২১১২; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৫৩১।

মানুষের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এর প্রয়োজন রয়েছে। কারণ অন্যের নিকটে থাকা জিনিস মানুষের প্রয়োজন হয়, তাই এর সাথে কল্যাণ জড়িত রয়েছে। কারণ ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত বৈধ পদ্ধায় কোনো বস্তু অন্যের কাছে পৌছার কোনো উপায় নেই। সমস্যা দূর করে উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করার জন্যই ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ ও শরীয়ত সম্মত করা হয়েছে।

المُسَأَّلَةُ الثَّانِيَّةُ: أُرْكَانُ الْبَيعِ

দ্বিতীয় মাসআলা: ক্রয়-বিক্রয়ের কুকুন

କ୍ରୟ-ବିକ୍ରିଯେର ତିନଟି ରୂପନ ରସ୍ୟାରେ । ସେଣ୍ଠଲୋ ହଲୋ-

১. চুক্তিকারী; ২. চুক্তিকৃত বস্তু; ৩. চুক্তি করার শব্দ।

এখনে চুক্তিকারী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ক্রেতা এবং বিক্রেতা। আর চুক্তিকৃত বস্তু দ্বারা উদ্দেশ্য বিক্রিত পণ্য; চুক্তি করার শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য ইজাব ও করুল তথা বিক্রিকারীর পক্ষ থেকে বলা যে, আমি বিক্রি করলাম আর ক্রেতার পক্ষ থেকে বলা যে, আমি তা ক্রয় করলাম।

এটি হলো কথা বলার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে ক্রয়-বিক্রয় করা।

এ ছাড়া কথা না বলে শুধু কর্মের মাধ্যমেও ক্রয়-বিক্রয় হয় আদান-প্রদানের মাধ্যমে। যেমন- ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে কোনো পণ্য নিয়ে কোনো কথা না বলে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করে দিলো।

المسألة الثالثة: الإشهاد على البيع

তৃতীয় মাসআলা: ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা

କ୍ରୟ-ବିକ୍ରିଯେର କ୍ଷେତ୍ରେ ସାକ୍ଷୀ ରାଖା ମୁଣ୍ଡାହାବ, ଓସାଜିବ ନୟ । ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଆଲା ବଲେନ:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَأَيْعَثُمْ ﴿١٣﴾

“তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ে সাফল্য রাখো।” [সূরা বাকুরাহ : ২৮২]

মহান আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষ্যর বিষয়ে মানুষদেরকে উৎসাহিত করতে এখানে সাক্ষী রাখার আদেশ করেছেন। আদেশ করা হলেও তা ওয়াজিব নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَغْصًا فَلْيُوَدِّ الَّذِي أَوْتُمْ أَمَانَةً﴾

“তোমাদের কেউ যদি একে অপরকে নিরাপদ মনে করে তাহলে সে তার কাছে রাখা আমান্ত
অন্যকে দিতে পারে।” [সুরা বাকুরাহ : ২৮৩]

এর দ্বারা প্রমাণ করে, এই আদেশ নিরাপদ ও কল্যাণকর দিকনির্দেশনার জন্য।

ଉମାରାହ ବିନ ଖୁବାଇମା ଥେକେ ହାଦୀସ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତାର ଚାଚା ହାଦୀସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେଛେ- ଯିନି ନାବି ସାଲାଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ-ଏର ସାହାବୀ ।

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابٍ، وَاسْتَبَعَهُ لِيُقْبِضَ ثَمَنَ فَرَسِهِ، فَأَسْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِ، وَطَفَقَ الرَّجَالُ يَتَعَرَّضُونَ لِلْأَعْرَابِ، فَيَسُوْمُونَهُ بِالْفَرَسِ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَهُ...^{୬୫}

“ନାବି ସାଲାଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ଏକ ବେଦୁସେନ ହତେ ଏକଟି ଘୋଡ଼ା କ୍ରଯ କରଲେନ । ତାରପର ବେଦୁସେନ ଘୋଡ଼ାର ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରହଣେ ଜନ୍ୟ ତାର ପିଛନେ ଚଲଲ । ନାବି ସାଲାଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ଦ୍ରୁତ ଚଲଛିଲେନ ଆର ସେ ଧୀରେ । ଏ ସମୟ ଲୋକଜନ ତାର ସାମନେ ପଡ଼ିଲେ ତାରା ଘୋଡ଼ାର ଦରଦାମ କରତେ ଲାଗଲ । ତାରା ଜାନତ ନା ଯେ, ନାବି ସାଲାଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଲାମ ତା କ୍ରଯ କରେଛେ । ତାହିଁ ତାରା ତାର ଶ୍ରିରୀକୃତ ମୂଲ୍ୟର ଉପର ଆରା ମୂଲ୍ୟ ବାଢ଼ିଯେ ବଲତେ ଲାଗଲ ।...”^{୬୫}

ହାଦୀସେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶଦେର ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ହଲୋ, ତାରା ତାର ଥେକେ ତା କ୍ରଯ କରତେ ଚାଇଲ ।

ଉଜ୍ଜ ହାଦୀସ ଥେକେ କହେକଟି ବିଷୟ ବୁଝା ଯାଇ । ସେଙ୍ଗଲୋ ହଲୋ-

କ. ନାବି ଏକ ଗ୍ରାମ୍ ଲୋକେର କାଛ ଥେକେ ଘୋଡ଼ାଟି କିନେଛିଲେନ । କିନ୍ତୁ ତାଦେର ମାବେ କୋନୋ ସାକ୍ଷୀ ଛିଲ ନା । ସୁତରାଂ କ୍ରଯ-ବିକ୍ରଯେର କ୍ଷେତ୍ରେ ଯଦି ସାକ୍ଷୀ ରାଖା ଓୟାଜିବ ହତୋ ତାହଲେ ତିନି ସାକ୍ଷୀ ନା ରେଖେ ତା କ୍ରଯ କରତେନ ନା ।

ଖ. ନାବି ଏକ ଯୁଗେ ସାହାବୀରାଓ ବାଜାରେ କ୍ରଯ-ବିକ୍ରଯ କରତେନ ତବେ ଏଠା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୟନି ଯେ, ତିନି ସାହାବୀଦେରକେ କ୍ରଯ-ବିକ୍ରଯେର କ୍ଷେତ୍ରେ ସାକ୍ଷୀ ରାଖିତେ ଆଦେଶ କରେଛେ କିଂବା ତିନି ନିଜେ ତା କରେଛେ ।

ଗ. ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନେ ମାନୁଷେର ଅନେକ କିଛୁଇ କ୍ରଯ କରତେ ହୟ । ସବ ଧରନେର କ୍ରଯ-ବିକ୍ରଯେର କ୍ଷେତ୍ରେଇ ଯଦି ସାକ୍ଷୀ ରାଖା ଓୟାଜିବ ହତୋ, ତାହଲେ ତା ମାନୁଷଦେର ଜନ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୟେ ଯେତ ।

ଘ. ଯଦି ବଡ଼ୋ କୋନୋ ବସ୍ତ୍ର କ୍ରଯ-ବିକ୍ରଯ କରା ହୟ ଏବଂ ତାର କୋନୋ ମୂଲ୍ୟ ବାକି ଥାକେ, ତାହଲେ ଅବଶ୍ୟଇ ତା ଲିଖେ ରାଖା ଓ ସାକ୍ଷୀ ରାଖା ଉଚିତ । ଯେନ କୋନୋ ଧରନେର ସମସ୍ୟା ହଲେ ଐ ଲେଖା ଓ ସାକ୍ଷୀର ଦିକେ ଫିରେ ଯାଓୟା ଯାଇ ।

المسألة الرابعة: الخيار في البيع ଚତୁର୍ଥ ମାସତାଳା: କ୍ରଯ-ବିକ୍ରଯେ ଇଚ୍ଛାଧିକାର

ଖାର ବା ଖିଯାର: କ୍ରେତା-ବିକ୍ରେତା ପ୍ରତ୍ୟେବେର ଜନ୍ୟ କ୍ରଯ-ବିକ୍ରଯେର ଚୁକ୍ତି ଠିକ ରାଖା ଅଥବା ବାତିଲ କରାର ଅଧିକାର ଥାକା ।

^{୬୫} ଆହମାଦ ୫/୨୧୫; ସୁନାନ ଆବୁ ଦ୍ଵାତର, ହା. ୩୬୦୭; ନାସାଈ, ହା. ୪୬୪୭; ଇମାମ ଆଲବାନୀ ସହିହ ବଲେହେନ, ସହିହ ନାସାଈ, ହା. ୪୩୩୨ ।

যদিও ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল বিষয় হলো, যখন বেচা-কেনার রুক্ন ও শর্তসমূহ পূর্ণ হয়ে যাবে এবং ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হবে তখন তা থেকে ফিরে আসার কারো অধিকার থাকবে না। কিন্তু ইসলাম ধর্ম হলো, সহজতা ও সহমর্মিতার ধর্ম। সুতরাং, প্রতিটি ব্যক্তির কল্যাণ ও অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখেছে। এজন্যই কোনো মুসলিম যখন কোনো কারণে কিছু কিনবে বা বিক্রি করবে, তারপর সে আবার ক্রয়-বিক্রয় থেকে ফিরে আসতে ইচ্ছা করবে, ইসলামী শরীয়ত তার জন্য এই ইচ্ছাধিকারের বৈধতা দিয়েছে যেন সে তার বিষয়ে চিন্তা করতে পারে এবং নিজের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখতে পারে। সুতরাং সে চিন্তা-ভাবনা করে দেখতে পারবে যে, সে তার ক্রয়-বিক্রয় ঠিক রাখবে না বাতিল করবে।

খবার বা ইচ্ছাধিকারের প্রকারভেদ:

খবার বা ইচ্ছাধিকারের বিভিন্ন প্রকার আছে। সেগুলোর মধ্য হতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. **خبار المجلس** তথা বৈঠকের ইচ্ছাধিকার। মজলিস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যেখানে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। সুতরাং যতক্ষণ ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ে মজলিসে থাকবে ততক্ষণ ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার অধিকার থাকবে। যখন ক্রেতা এবং বিক্রেতার কেউ মজলিস ত্যাগ করবে তখন এই খবার বা স্বাধীনতা বাতিল হয়ে যাবে। ইবনু উমার ^{رض} বলেন, নাবী ﷺ বলেন:

البَيْعَانُ بِالْخَيْرِ مَا لَمْ يَنْتَفِعْ قَاتِلُهُ

“ক্রেতা-বিক্রেতা পৃথক না হলে উভয়েরই (ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার) অধিকার থাকবে।”^{৬৭৬}

২. **الشرط** তথা শর্তসাপেক্ষে ইচ্ছাধিকার। আর তা হলো ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে কিংবা তাদের একজন ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি ঠিক রাখা বা না রাখার ব্যাপারে নির্ধারিত কিছু সময়ের শর্ত করা। তারপর যদি এই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি বাতিল না করে তাহলে চুক্তি সংঘটিত হয়ে যাবে। পরে তা বাতিল করার ইচ্ছাধিকার থাকবে না।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো ব্যক্তি কারো থেকে গাঢ়ি ক্রয়ের সময় বিক্রেতাকে বলল, আমার জন্য পূর্ণ এক মাসের ইচ্ছাধিকার থাকবে। এই সময়ের মধ্যে আমি ক্রয়ের চুক্তি ঠিক রাখতে পারি আবার বাতিলও করতে পারে। কিন্তু ক্রেতা যদি নির্দিষ্ট এক মাসের মধ্যে সেই চুক্তি বাতিল না করে, তাহলে উল্লিখিত সময় শেষ হলেই চুক্তি পরিপূর্ণভাবে সংঘটিত হয়ে যাবে। তারপর আর চুক্তি বাতিল করার কোনো অধিকার থাকবে না।

৩. **الكت** তথা ক্রতি থাকার কারণে ইচ্ছাধিকার। এই ইচ্ছাধিকারটা থাকবে শুধু ক্রেতার জন্য। ক্রেতা যদি তার বন্ধু ক্রয়ের পর এমন কোনো ক্রতি সম্পর্কে অবগত হয়, যেই বিষয়ে

^{৬৭৬} সুআফানুল আসাইতি: সহীল বুখারী, ঘ. ২১১০; সহীহ মুসলিম, ঘ. ফুআ. ১৫৩২।

বিক্রেতা তাকে পূর্বে জানায়নি অথবা বিক্রেতা নিজেও সেই ক্রটি সম্পর্কে জানত না, আর ক্রটি যদি পণ্যের মূল্য কমিয়ে দেয়, তাহলে এই অধিকার থাকবে। তবে ক্রটিকে ক্রটি হিসাবে সাব্যস্ত করার জন্য অবশ্যই গ্রহণযোগ্য অভিজ্ঞদের মতামত নিতে হবে। তারা যদি ক্রটিকে ক্রটি বলে বিবেচনা করে তাহলেই তা ক্রটি বলে গণ্য হবে। অন্যথায় ক্রটি হিসেবে গণ্য হবে না।

8. তথা কোনো বিষয় গোপন করা। আর তা হলো, ক্রয়-বিক্রয়ের সময় বিক্রেতা
ক্রেতার কাছে এমন কিছু গোপন করা যার কারণে পণ্যের মূল্য বেড়ে যায়। এটি অবশ্যই
হারাম। নাবী ﷺ বলেন: مَنْ غَسْنَا فَلْيُسْمِنْ مِنْ

“যে ব্যক্তি ধোকা দেয় সে আমাদের দলভুক্ত না।”^{৬৭৭}

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো ব্যক্তির কাছে একটি গাড়ি আছে। আর সেই গাড়িটিতে অনেক ত্রুটি রয়েছে। কিন্তু বিক্রেতা গাড়ির উপর সুন্দর রং দিয়ে ক্রেতার সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করল যেন তা একটি ত্রুটিমুক্ত গাড়ি। ক্রেতা সেটি কিনে নিলো। এই অবস্থায় ক্রেতা পণ্য ফেরত দিয়ে তার মূল্য ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার রাখবে।

المقالة الخامسة: شروط البيع

পঞ্চম মাসআলা:- ক্রয়-বিক্রয়ের শর্তসমূহ

ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। নীচে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

প্রথম: ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে সম্পূর্ণ থাকা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْتَنَّكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾

“ହେ ମୁଖିନଗଗ୍। ତୋମରା ଅନ୍ୟାଯଭାବେ ପରମ୍ପରେର ଧନ-ସମ୍ପଦ ଗ୍ରାସ କରୋ ନା; କେବଳ ପରମ୍ପରା
ସମ୍ପତ୍ତିକ୍ରମେ ସେ ବ୍ୟବସା କରୋ ତା ବୈଧ ।”[ସୂରା ନିୟା : ୨୯]

ଆବୁ ସାଙ୍ଗେ ଖୁଦରୀ ହେଲାଏ ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ନାବୀ ବଲେନ୍:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“କ୍ରୟ-ବିକ୍ରୟ ସମ୍ପଦର ମାଧ୍ୟମେଇ କେବଳ ହୁୟେ ଥାକେ ।” ୬୭୮

ମୁତ୍ତରାଂ ଅନ୍ୟାଯଭାବେ ଯଦି କାଉକେ କ୍ରୟ-ବିକ୍ରୟେର ଜନ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରା ହୟ ତାହଲେ କ୍ରୟ-ବିକ୍ରୟ ସଠିକ ହବେ ନା । କିନ୍ତୁ ଯଦି ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତଭାବେ କାଉକେ ବାଧ୍ୟ କରା ହୟ ତାହଲେ ସଠିକ ହବେ । ଯେମନ ବିଚାରକ କୋନୋ ସାଙ୍କ୍ଷିକୀ ଝାଗ ପରିଶୋଧ କରାର ଜନ୍ୟ ତାର ଜିନିସ ବିକ୍ରି କରିବେ ବାଧ୍ୟ କରିଲ ।

६११ नवीन युस्तिय, दा, फुजा. १०१।

⁴⁴ ଇବୁ ମାଜାହ: ୨୧୮୫, ଇବୁ ହିକ୍ମାନ: ୧୧/୩୪୦, ବାଇହାକୀ: ୬/୧୭, ଇରାଗ୍ରାମ ଗାଲିଲ: ୫/୧୨୦।

দ্বিতীয়: চুক্তিকারীকে লেনদেনের যোগ্য হওয়া। যেমন প্রাপ্তবয়ক, সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন, স্বাধীন ও সচেতন হওয়া।

তৃতীয়: বিক্রিত পণ্যের মালিক হওয়া অথবা মালিকের স্থলাভিষিঞ্চ হওয়া, যেমন অসীয়তকৃত ব্যক্তি হওয়া কিংবা অভিভাবক হওয়া অথবা কেয়ারটেকার হওয়া। সুতরাং কোনো ব্যক্তির এমন কিছু বিক্রি করা ঠিক হবে না যার সে মালিক নয়। যেমন- হাকীম ইবনে হিযাম আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, **لَّا تَبْنِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ**

“তোমার কাছে যা নেই তা তুমি বিক্রি করো না।”^{৬৭৯}

চতুর্থ: বিক্রিত পণ্যের মাধ্যমে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া উপকার নেওয়াটা বৈধ হওয়া। যেমন খাদ্য পানীয়, পোশাক, বাহন স্থাবর সম্পত্তি ইত্যাদি। সুতরাং এমন কিছু বিক্রি করা সঠিক হবে না যা দ্বারা উপকার নেওয়া হারাম। যেমন- মদ, শুকর, মৃত জানোয়ার, অনর্থক খেলা-ধূলার উপকরণ, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি।

জাবির ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন: **إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ بَيْعَ الْخُمُرِ وَالْأَلْبَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ**

“নিশ্চয়ই আল্লাহ মদ, মৃত জানোয়ার, শুকর এবং মূর্তি বিক্রি করাকে হারাম করেছেন।”^{৬৮০}

ইবনু আবুস আলাহ^{رض} হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেন:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَمَ عَلَى قَوْمٍ كُلَّ شَيْءٍ حَرَمَ ثَمَنَهُ

“আল্লাহ মানুষদের জন্য যে জিনিস খাওয়া হারাম করেছেন তার মূল্যও হারাম করেছেন।”^{৬৮১}

কুকুর বিক্রি করা বৈধ নয়। আবু মাসউদ ^{رض} এর হাদীসে রয়েছে,

بَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَمْنِ الْكَبْيِ

“আল্লাহর রসূল ﷺ কুকুরের মূল্য গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করেছেন।”^{৬৮২}

পঞ্চম: চুক্তিকৃত বস্তুটি অর্পণ যোগ্য হওয়া। কেননা যে জিনিস অর্পণ করা যায় না, তা না থাকার মতোই। সুতরাং তা ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ হবে না। কারণ এটি হবে ধোকা যুক্ত ক্রয়-বিক্রয়। কেননা এই ধরনের অবস্থায় ক্রেতা কখনো কখনো মূল্য পরিশোধ করে থাকে কিন্তু ক্রয়কৃত বস্তু হতে পায় না। যেমন কেউ পানিতে মাছ রেখেই বিক্রি করল। অথবা খেজুরের ভিতর থাকা অবস্থায় বিচি, শুণ্যে থাকা অবস্থায় পাথি, ওলানে থাকা অবস্থায় দুধ, গর্ভে থাকা অবস্থায় গর্ভস্থ পশু এবং পলাতক পশু বিক্রি করা বৈধ নয়। কেননা আবু হুরায়রা ^{رض} হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

^{৬৭৯} আহমাদ ৩/৪০২, সুনান আবু দাউদ, হা. ৩৫০৩, সুনান নাসাই ৭/২৭৯, তিরমিজী, হা. ১২৩২, ইবনু মাজাহ: ২১৮৭, ইরওয়াউল গাদীল: ৫/১৩২।

^{৬৮০} সহীহ বুখারী, হা. ২২৩৬, সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৫৮১

^{৬৮১} আহমাদ: ১/২৪৭, সুনান আবু দাউদ, হা. ৩৪৮৮।

^{৬৮২} সহীহ বুখারী, হা. ২২৩৭; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৫৬৭।

نَّبِيٌّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرِيرِ

“আল্লাহর রসূল ﷺ ধোকাযুক্ত ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন।”^{৬৮৩}

ষষ্ঠি: চুক্তিকৃত বস্তু সম্পর্কে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জানা থাকতে হবে। হয়তো চুক্তি করার সময় তা দেখার মাধ্যমে কিংবা এমন গুণাগুণ জানার মাধ্যমে যা দ্বারা অন্য কোনো জিনিস থেকে তা আলাদা করা যায়। কেননা চুক্তিকৃত বস্তু সম্পর্কে না জেনে ক্রয়-বিক্রয় করাটা এক ধরনের ধোকা। যা থেকে ইসলামী শরীয়তে নিষেধ করা হয়েছে।

সুতরাং চুক্তির মজলিসে নেই এমন কোনো জিনিস না দেখে বা সেই জিনিস সম্পর্কে না জেনে, ক্রয়-বিক্রয়টা ক্রেতার জন্য সঠিক হবে না।

সপ্তম: বিক্রিত পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হতে হবে এবং তা ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জানা থাকতে হবে।

المسألة السادسة: البيوع المنهي عنها

ষষ্ঠি ماسআলা: নিষিদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়সমূহ

আল্লাহ তাআলা কয়েক ধরনের ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন। যেমন: কেউ ক্রয়-বিক্রয় করতে গিয়ে তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে ক্ষতি করল। উদাহরণ স্বরূপ- ক্রয়-বিক্রয় করার কারণে ফরয ইবাদাত করা থেকে বিরত থাকলো। অথবা ক্রয়-বিক্রয় করতে গিয়ে অন্যের ক্ষতি করে ফেলল। এগলো হলো নিষিদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়। ধারাবাহিকভাবে নিম্নে তুলে ধরা হলো-

১. জুমু'আর দিন দ্বিতীয় আযানের পর ক্রয়-বিক্রয় করা

সুতরাং যে ব্যক্তির উপর জুমু'আর সলাত ফরয হয়েছে তার জন্য সঠিক হবে না (একটি মত অনুযায়ী দ্বিতীয়) আযানের পর ক্রয়-বিক্রয় করা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿إِنَّمَا أَيْمَانَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَاسِعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ...﴾

“হে মু’মিনগণ! জুমু'আর দিন যখন সলাতের জন্য আহবান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ করো।” [সূরা জুমু'আর : ৯]

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। মহান আল্লাহ এই সময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা থেকে নিষেধ করেছেন। আর নিষেধ করার পর সেই কাজ করা কোনোভাবেই সঠিক হবে না, বরং তা হারাম হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

২. এমন ব্যক্তির কাছে কোনো জিনিস বিক্রি করা যদ্বারা সে আল্লাহর অবাধ্যতামূলক কাজে সাহায্য নিবে অথবা যা সে হারাম কাজে ব্যবহার করবে। অতএব, এমন ব্যক্তির কাছে জুস বিক্রি করা যাবে না যে তা দ্বারা মদ বানাবে। আরও এমন ব্যক্তির কাছে পাত্র বিক্রি করা যাবে না যা দ্বারা সে মদ পান করবে। অনুরূপভাবে মুসলমানদের মাঝে ফিতনার সময়ে কোনো অস্ত্র বিক্রি করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

“সৎকাজ ও তাক্রুওয়ার ব্যাপারে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করো, পাপ ও সীমালজ্বনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না।”[সূরা মাইদাহ : ২]

৩. মুসলিম ভাইয়ের বিক্রয়ের উপর বিক্রি করার প্রস্তাব দেওয়া।

যেমন কোনো বিক্রেতার কাছে কেউ দশ টাকা দিয়ে কোনো পণ্য কিনতে আসলো। এবুজনের মাঝে কথাবার্তা শেষ না হতেই আরেক বিক্রেতা উক্ত ক্রেতাকে বলল, আমি আপনার কাছে আরও সন্তায় বিক্রি করব। অথবা সে বলল, এই দামেই আমি এর থেকে আরও ভালো জিনিস দিবো। এভাবে ক্রয়-বিক্রয় করা নিষেধ। কেননা ইবনু উমার رض এর হাদীসে রয়েছে। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন: (وَلَا يَبْغِي بَغْصَكُمْ عَلَى بَيْعِ بَغْضِي)

“কোনো ব্যক্তি বিক্রির অবস্থায় যেন অন্য কেউ বিক্রি করার প্রস্তাব না দেয়।”^{৬৪}

৪. এক ব্যক্তির ক্রয়ের উপর আরেক ব্যক্তির ক্রয় করা।

যেমন কোনো ব্যক্তি কারো কাছে কিছু বিক্রি করার জন্য কথা বলতে শুরু করল আর অপর এক ব্যক্তি বিক্রেতাকে বলল, আপনি বিক্রি করা বাতিল করুন। আমি আপনার কাছ থেকে তা আরও বেশি মূল্যে ক্রয় করব অথচ ইতঃপূর্বেই পূর্বের দুই ব্যক্তির মাঝে ক্রয়-বিক্রয় নিয়ে কথা-বার্তা চূড়ান্ত হয়েছিল। এই অবস্থায় দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে তা বিক্রি করা হারাম। যা পূর্বের হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয়।

৫. বাকি ও নগদের সংমিশ্রণে ক্রয়-বিক্রয় করা।

যেমন একজন ব্যক্তি (বিক্রেতা) আরেক ব্যক্তির (ক্রেতা) কাছে কোনো পণ্য নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত অর্থে বিক্রি করল। অতঃপর তখনই আবার বিক্রেতা (২য় ক্রেতা), ক্রেতার কাছ থেকে কম মূল্যে উক্ত পণ্যটি ক্রয় করে নেয়। মেয়াদ শেষে (১ম ক্রেতা) ক্রেতা প্রথম মূল্য পরিশোধ করল। যেমন একটি জমি ৫০,০০০ টাকার বিনিময়ে (১ম ক্রেতা) ক্রয় করল, যার মূল্য সে এক বছর পর পরিশোধ করবে। অতঃপর বিক্রেতা (সেই সময়ই) নগদ ৪০,০০০ টাকায় জমিটি (১ম

^{৬৪} মুতাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ২১৬৫; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৪১২।

ক্রেতার থেকে) ক্রয় করে নিলো। তাহলে বছর শেষে তার (১ম ক্রেতার) ৫০,০০০ টাকা পাওনা পরিশোধ করতে হবে।

এই ক্রয়-বিক্রয়কে **عِينَ** বা সৈনা নামকরণ করা হয়: কারণ ক্রেতা পণ্যের স্থানে **عِينَ** তথা নগদ অর্থ গ্রহণ করেছে।

তাই এটি হলো এক প্রকার সুদ, এজন্য এই পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করা নিষেধ করা হয়েছে। কেননা ইবনু উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

إِذَا تَبَأْغَتُمُ بِالْعِيَّةِ، وَأَخْذَتُمُ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَتَرْكَتُمُ الْجِهَادَ، سَلْطَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ذُلْلًا لَا يَرْفَعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ...

“যখন তোমরা সৈনা পদ্ধতিতে ব্যবসা করবে, গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা ও অপমান চাপিয়ে দিবেন। তোমরা তোমাদের দ্বিনে ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি মুক্তি দিবেন না।”^{৬৪৫}

৬. হস্তগত করার পূর্বেই কোনো পন্য বিক্রি করা। যেমন কোনো ব্যক্তি কারো কাছ থেকে পণ্য কিনলো। অতঃপর তা নিজের হস্তগত করা ও গুদামজাত করার আগেই অন্যের কাছে বিক্রি করে দিলো। আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبْغِعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

“নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, খাদ্য ক্রয় করে নিজের অধিকারে না এনে কেউ যেন তা বিক্রি না করে।”^{৬৪৬}

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَىءَ أَنْ تُبَاعَ السَّلْعُ حَيْثُ تُبَاعُ، حَتَّى يَحْوِرَهَا التُّجَارُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

“যাযিদ ইবনু সাবিত رضي الله عنه হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল ﷺ ব্যবসায়ীদেরকে পণ্ডুব্য ক্রয়ের পর নিজের জায়গায় স্থানান্তরিত করার আগে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।”^{৬৪৭}

অতএব, কোনো ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়, কোনো কিছু ক্রয় করার পর তা পূর্ণ হস্তগত করার পূর্বেই বিক্রি করা।

^{৬৪৫} আহমাদ ২/২৮; সুনান আবু দাউদ, হা. ৩৪৬২; ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সিলসিলাতুস সহীহাহ, হা. ১১।

^{৬৪৬} মুজাফাকুন আলাইহি: সহীলুল বুখারী, হা. ২১৩৬; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৫২৫।

^{৬৪৭} সুনান আবু দাউদ, হা. ৩৪৯৯।

৭. ফল পরিপক্ষ হওয়ার আগেই বিক্রি করা। ফল পরিপক্ষ হওয়ার পূর্বে তা বিক্রি করা জায়েয নয়। কারণ তাতে ফল নষ্ট হয়ে যাওয়ার কিংবা তাতে ক্রটি যুক্ত হওয়ার আশংকা থাকে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الْمُئْمَنَةَ، فَبِمَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَا لَأُخْرِيهِ؟
“আনাস ইবনে মালিক رض হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল ص বলেছেন: যদি আল্লাহ ফল ধরা বন্ধ করে দেন, তবে তোমরা কীসের বদলে তার ভাইয়ের মাল (ফলের মূল্য) নিবে?”^{৬৮৮}

عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَهْبِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ بَيْعِ الشَّمَارِ حَتَّى يَنْدُوَ صَلَادُهَا،
تَهْبِي الْبَاعِيْعَ وَالْمُبَتَاعَ

“আবদুল্লাহ ইবনু উমার رض হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফল পরিপক্ষ হওয়ার আগে তা বিক্রি করতে ক্রেতা ও বিক্রেতাকে নিষেধ করেছেন।”^{৬৮৯}

আর ফল পরিপক্ষ হওয়াটা বিভিন্নভাবে বুঝা যায়। যেমন: খেজুর লাল অথবা হলুদ হওয়ার মাধ্যমে, আঙুর কালো হয়ে তার মাঝে মিষ্টতা আসার মাধ্যমে, বিভিন্ন দানাদার শস্য শুকনো হওয়া ও শক্ত হওয়ার মাধ্যমে। এভাবেই অন্যান্য ফল-ফলাদির ব্যাপারে বোঝতে হবে।

৮. দালালী করা: তা হলো বিক্রির জন্য প্রস্তাবিত পণ্যের মূল্য কোনো ব্যক্তির বৃদ্ধি করে বলা। কিন্তু আসলে সেই পণ্যটি কেনার তার ইচ্ছা নেই। বরং তার ইচ্ছা হলো এর মাধ্যমে অন্য কাউকে ধোকায় ফেলা এবং সেই পণ্যটি কেনার প্রতি তাকে আগ্রহী করা ও পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করা। হাদীসে এ জাতীয় কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

عَنْ أَبْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَهْبِي عَنِ النَّجْشِ»

“ইবনু উমার رض হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দালালী (এক ক্রেতার উপর দিয়ে অন্য ক্রেতার দর কষাকষি) করতে নিষেধ করেছেন।”^{৬৯০}

المَسَالَةُ السَّابِعَةُ: قَالَةٌ فِي الْبَيعِ

সপ্তম মাসআলা: ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি বাতিল করা

গুরুত্বপূর্ণ বলা হয়: ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিক্রমে তা বাতিল করে দেওয়া। এটা হতে পারে ক্রেতা-বিক্রেতার কোনো একজনের কোনো অসুবিধার

^{৬৮৮} মুসাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ২১৯৮; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৫৫৫।

^{৬৮৯} মুসাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ২১৯৪; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৫৩৪।

^{৬৯০} মুসাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৬৯৬৩; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৫১৬।

কারণে। অথবা চুক্তি করার পর ক্রেতারা বুঝতে পারল যে, এখন তার সেই পণ্যটির প্রয়োজন নেই। কিংবা সে পণ্যটির মূল্য পরিশোধ করতে সক্ষম নয়। তারপর কোনো ধরনের সমস্যা না করে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে কমবেশি না করে সেই চুক্তি থেকে ফিরে আসল। এটি একটি শরীয়ত সম্মত কাজ এবং এই বিষয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ উৎসাহিত করেছেন। তিনি ﷺ বলেন:

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا، أَقَالَهُ اللَّهُ عَزَّزَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

“যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের (অনুরোধে তার) সাথে সম্পাদিত ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি বাতিল করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।”^{৬৯১}

[بِعْثَرْ- বিক্রিত বা ক্রীত বস্তু প্রত্যাপণ করার সিদ্ধান্ত বা ইচ্ছা গ্রহণ করা-অনুবাদক]

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: إِلْقَالَةُ فِي الْبَيعِ

অষ্টম মাসআলা: লাভ করার চুক্তি সাপেক্ষে ক্রয়-বিক্রয় করা

লাভ করার চুক্তি সাপেক্ষে ক্রয়-বিক্রয় করাকে আরবিতে بَيْعٌ مُرْبَعٌ বলে। এটি হলো ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের মাঝে চুক্তি সাপেক্ষে নির্ধারিত পরিমাণ লাভ করার মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ করে পণ্য বিক্রি করা।

যেমন পণ্যের মালিক ক্রেতাকে বলল, আমার পণ্যের মূল দাম হলো একশত টাকা। তোমার কাছে তা বিক্রি করব একশত দশ টাকায়। এখানে দশ টাকা থাকবে আমার লাভ।

এই পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করাটা সঠিক। যেহেতু ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ে মূল্যের পরিমাণ এবং লাভের পরিমাণ জানতে পারে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾

“আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন।” [সূরা বাকুরা : ২৭৫]

﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْعَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْ كِلَيْنِ﴾

“তোমাদের পরস্পর সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করো তা বৈধ।” [সূরা নিসা : ২৯]

بَيْعٌ مُرْبَعٌ ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিক্রমে সংঘটিত হয়ে থাকে। আর এই পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রয়োজনও রয়েছে। কেননা অনেক মানুষই প্রথম প্রথম ভালোভাবে জিনিস

^{৬৯১)} আহমাদ ২/২২৫; সুনান আবু দাউদ, হা. ৩৪৬০; ইবনু মাজাহ, হা. ২১৯৯; ইবনু হি�রান ১১/৪০৫ ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সুনান ইবনে মাজাহ, হা. ১৮০০।

কিনতে পারে না। আর সেই সুযোগে অনেক বিক্রেতাই নির্দিষ্ট পরিমাণে বেশি লাভ করে থাকে। এতে ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং যখন মূল মূল্য ও লাভ স্পষ্ট করে বিক্রি করবে তখন আর এই অতিরিক্ত বেশি নেওয়ার সুযোগ থাকবে না।

المسألة التاسعة: البيع بالتقسيط

নবম মাসআলা: কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করা

এটি হলো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাকিতে পণ্য বিক্রি করা। আর সেই পণ্যের মূল্য নির্দিষ্ট পরিমাণ কিস্তির মাধ্যমে কয়েক কিস্তিতে পরিশোধ করা। এক্ষেত্রে প্রতিটি কিস্তি পরিশোধ করার জন্য নির্দিষ্ট সময় থাকবে।

উদাহরণ: বিক্রেতার কাছে একটি গাড়ি আছে। যার নগদ মূল্য চল্লিশ হাজার টাকা। কিন্তু কেউ বাকিতে নিতে চাইলে তাকে দিতে হবে ষাট হাজার টাকা। তারপর বিক্রেতা ক্রেতার সাথে এই চুক্তিতে উপনীত হলো যে, মোট বারো কিস্তিতে সে ষাট হাজার টাকা পরিশোধ করবে। প্রতি মাসের শেষে সে পাঁচ হাজার করে টাকা দিবে।

হুকুম: এই ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করাটা বৈধ। আয়িশাহ গুরুত্বপূর্ণ হতে বর্ণিত।

اَشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيَّةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَالَهُ مِنْ حَدِيدٍ.

“আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনেক ইহুদির নিকট হতে নির্দিষ্ট মেয়াদে মূল্য পরিশোধের শর্তে খাদ্য ক্রয় করেন এবং তার নিকট নিজের লোহার বর্ম বন্ধক রাখেন।”^{৬১২}

তা ছাড়াও এই পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করার মাঝে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই লাভ রয়েছে। কারণ বাকি দেওয়ার সুবাদে বিক্রেতা বেশি লাভ নিতে পারছে। তার পণ্য বাজারজাত করার পথ বাঢ়ছে। ফলে সে নগদ ও কিস্তি উভয় পদ্ধতিতে বিক্রি করতে পারছে। আর কিস্তিতে সময় বাঢ়িয়ে বেশি লাভ করতে পারছে। অপরদিকে ক্রেতার কাছে নগদ টাকা না থাকা সত্ত্বেও সে পণ্য ক্রয় করতে পারছে। যার মূল্য সে পরে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিয়ে কয়েক কিস্তিতে পরিশোধ করবে।

কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয় সঠিক হওয়ার জন্য শর্তসমূহ:

ক্রয়-বিক্রয় সঠিক হওয়ার জন্য পূর্বে উল্লিখিত শর্তের সাথে কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয় সঠিক হওয়ার জন্য আরও কিছু শর্ত রয়েছে। নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

^{৬১২} মুস্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ২০৬৮; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৬০৩।

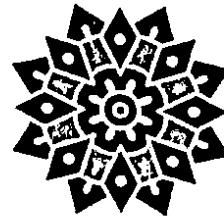
১. চুক্তির সময় পণ্যটা অবশ্যই বিক্রেতার হস্তগত ও নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে। এমন হতে পারবে না যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে কোনো জিনিস কিনার জন্য মূল্য নির্ধারণ করল এবং কত কিম্বিতে তা পরিশোধ করবে ও প্রতি কিম্বিতে কত টাকা দিবে তাও নির্ধারণ করল। তারপর বিক্রেতা উক্ত জিনিসটি কিনে এনে তা ক্রেতাকে দিবে। এমনটি হতে পারবে না। কেননা তা একটি হারাম কাজ। যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন: **لَا تَبْغُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ**

“তমি এমন জিনিস বিক্রি করো না, যা তোমার কাছে নেই।”^{৬৯৩}

২. চুক্তি করার সময় যে মূল্য নির্ধারণ করা হবে, কোনো কারণ বসত কিন্তি পরিশোধে বিলম্ব করা হলেও তার থেকে বেশি মূল্য পরিশোধ করতে ক্ষেত্রাকে বাধ্য করতে পারবে না। কেননা তখন অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ করাটা হবে সুদ।

৩. নির্ধারিত কিসি পরিশোধ করার ক্ষেত্রে ধনি ক্রেতার গড়িমসি (আজ দিচ্ছি, কাল দিচ্ছি বলে সময় ক্ষেপণ) করা হারাম।

৪. বিক্রি করার পর বিক্রেতার কোনো অধিকার নেই যে, সে বিক্রিত পণ্যের মালিকানা ধরে রাখবে। কিন্তু বাকি কিন্তি পরিশোধ করার জন্য জামানাত হিসাবে বিক্রেতা নিজের কাছে কোনো বস্তু বন্ধক রেখে রেখে দেওয়ার শর্ত করতে পারবে।



الباب الثاني : في الربا দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : সুদ

এই অনুচ্ছেদে কিছু মাসআলা রয়েছে:

المَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: تَعْرِيفُ الرِّبَا وَحُكْمُهُ প্রথম মাসআলা: সুদের পরিচয় ও তার হকুম

ক. সুদের আরবি শব্দ হলো رِبَّا । যার আভিধানিক অর্থ, বৃদ্ধি করা বা বৃদ্ধি হওয়া ।

شرعًا: زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض.

পরিভাষায় সুদ বলা হয়, একই জাতীয় দুটি জিনিস বিনিময় করার সময় একটির তুলনায় আরেকটি বেশি নেওয়া, যার বিপরীতে কোনো ধরনের বিনিময় নেই ।

খ. সুদের হকুম:

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে সুদকে হারাম করেছেন । যেমন: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَّا﴾

“আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন ।” [সূরা বাকুরা : ২৭৫]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَّا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

“হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং যদি তোমরা মু’মিন হও তাহলে সুদের মধ্যে যা অবশিষ্ট রয়েছে তা ছেড়ে দাও ।” [সূরা বাকুরা : ২৭৮]

সুদের কারবারীর বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা কঠোর হশিয়ারী প্রদান করেছেন । তিনি বলেন:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَّا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمُسِينِ﴾

“যারা সুদ খায়, তারা শয়তানের স্পর্শে মোহাভিভূত লোকের মতো দাঁড়াবে।” [সূরা বাকুরাহ : ২৭৫]

অর্থাৎ পুনরুখানের সময় তারা কবর থেকে কুস্তিতে পরাজিত ধরাশয়ী ব্যক্তির ন্যায় ওঠবে। আর এটা হবে দুনিয়াতে সুদ খাওয়ার কারণে তাদের পেট অস্বাভাবিক মোটা হওয়ায়।

এ ছাড়াও সুদ খাওয়াকে আল্লাহর রসূল ﷺ কবিরাহ গুনাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর যারাই যে কোনো অবস্থায় সুদি কারবারের সাথে জড়িত হবে আল্লাহর রসূল ﷺ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। যেমন জাবির খান হতে বর্ণিত:

لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرِّبَا، وَمُوْكَلٌ، وَشَاهِدٌ، وَقَالَ: هُنْ سَوَاءٌ.

“আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদখোর, সুদদাতা, এর লেখকের ও তার সাক্ষী দুইজনের উপর লানত করেছেন এবং বলেছেন: এরা সবাই সমান।”^{৬১৪}

সুদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে উল্লেখের ইজমাও রয়েছে।

المسألة الثانية: الحكمة في تحريمها দ্বিতীয় মাসআলা: সুদ হারাম করার রহস্য

সুদী কারবার মানুষদেরকে স্বার্থপরতা এবং অবৈধ পছায় কুকুরের আচরণের ন্যায় শুধু সম্পদ জমা করার প্রতি প্রবলভাবে লালায়িত করে তোলে। সুতরাং সুদ হারাম করা হয়েছে বান্দার জন্য রহমত স্বরূপ। এ ছাড়াও সুদের কারণে মানুষ কোনো বিনিময় ছাড়াই অন্যের সম্পদ দখল করে থাকে। সুদের মাধ্যমে মানুষের সম্পদ নিয়ে থাকে অথচ এর বিনিময়ে লোকেরা কোনো উপকারই পায় না। এভাবেই তারা গরিবদের সম্পদ আতঙ্গাত করার মাধ্যমে নিজেদের মাল বাঢ়াতে থাকে।

আর এদিকে সুদক্ষুর ব্যক্তি অলস ও অকর্ম ব্যক্তিতে পরিণত হয় এবং বৈধ ও উপকারী পছায় উপার্জন করা থেকে দূরে সরে পড়ে।

পাশাপাশি এই সুদ মানুষের মাঝের ভালো সম্পর্কগুলো নষ্ট করে দেয় আর বিশেষভাবে করজে হসানার দরজা একেবারে বন্ধ করে দেয়। এর মাধ্যমে বিশেষ এক শ্রেণির সুদক্ষুর লোক পুরো জাতির সম্পদ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো এটি মহান আল্লাহর কাছে বিরাট নাফরমানী কাজ। যদিও বাহ্যিকভাবে দেখা যায় যে, সুদের

মাধ্যমে সুদখোরের সম্পদ বৃক্ষি পায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তার বরকত নষ্ট করে দেন। কখনোই তার সম্পদে বরকত দান করেন না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

يَمْحُقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِيبُ الصَّدَقَاتِ ﴿١﴾

“আল্লাহ সুদকে বিলুপ্ত করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন।” [সূরা বাক্সারা : ২৭৬]

الْمَسَأَلَةُ التَّالِثَةُ: أَنواعُ الرِّبَا তৃতীয় মাসআলা: সুদের প্রকার

সুদ দুই প্রকার

১. رِبَاً الْفَضْلِ তথা বেশি করার সুদ।
২. رِبَاً النِّسْيَنَةِ তথা বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় করার সুদ।

প্রথম প্রকার: رِبَاً الْفَضْلِ হলো-সুদ হয় এমন একই জাতীয় দুটি জিনিসকে বিনিময় করার সময় কম-বেশি করা। যেমন- এক ব্যক্তি এক হাজার ‘ছা’ গম বিক্রি করল এক হাজার দুইশত ‘ছা’ গমের বিনিময়ে। উভয়ে এই গম গ্রহণ করল চুক্তি করার মজলিসেই। এখানে বিনিময় ছাড়াই অতিরিক্ত যে দুইশত ‘ছা’ গম গ্রহণ করল, সেটি হলো সুদ।

রِبَاً الْفَضْلِ এর হুকুম:

ইসলামী শরীয়ত হয় প্রকার জিনিসের মাঝে রِبَاً الْفَضْلِ বা অতিরিক্ত গ্রহণ করাকে হারাম হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। সে ছয়টি জিনিস হলো: স্বর্ণ, রূপা, গম, ঘব, খেজুর ও লবন। এই ছয়টি জিনিসের কোনো একটি যদি বিক্রয় করার সময় কম-বেশি করা হয়, তাহলেই তা সুদ হিসাবে গণ্য হবে। আবু সাঈদ খুদরী رض থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرْزِ بِالْبُرْزِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالثَّمْرُ بِالثَّمْرِ، وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلِ
يَدَا يَدِيهِ، فَمَنْ زَادَ، أَوْ اسْتَرَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، الْأَخْدُ وَالْمَغْطِي فِيهِ سَوَاءٌ

“স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, ঘবের বিনিময়ে ঘব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর ও লবনের বিনিময়ে লবন সমান সমান ও নগদ নগদ হতে হবে। এরপর কেউ যদি বাড়তি কিছু প্রদান করে বা অতিরিক্ত গ্রহণ করে, তবে তা সুদ হবে। গ্রহণকারী ও প্রদানকারী এতে একই রুক্ম হবে।”^{৬৯৫}

^{৬৯৫} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীলুল বুখারী, হা. ২১৭৫, ২১৭৬; সহীহ মুসলিম, হা. ৩৯৫৬, ফুআ. ১৫৮৪।

এই ছয় প্রকার জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করার ক্ষেত্রে যেসব কারণে সুদ হয়ে থাকে, সেসব কারণ যদি অন্য জিনিসের মধ্যেও পাওয়া যায়, তাহলে তাও সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এই ছয় প্রকার জিনিসের মাঝে সুদ হওয়ার কারণ হলো, পরিমাপ করা ও ওজন করা যায় এমন জিনিস লেনদেন করার সময় কম-বেশি করা হারাম। যদি তা একই জাতীয় জিনিস হয়।

ত্বিতীয় প্রকার: ~~بِنِيمَة~~ ۲، হলো- একই জাতীয় দুটি জিনিস বিনিময় করার সময় বিলম্বে মূল্য পরিশোধ করার কারণে একটি জিনিস কিছু বেশি নেওয়া। অথবা একই জাতীয় দুটি জিনিস বিনিময় করার সময় উভয়টিই বাকি রাখা।

উদাহরণ: ক. এক ব্যক্তি এক হাজার 'সা' গম বিক্রি করল এক হাজার দুই শত 'সা' গমের বিনিময়ে। ক্রেতাকে এক বছর সময় রাড়িয়ে দেওয়ার কারণে এখানে বিক্রেতা অতিরিক্ত দুইশত 'সা' গম গ্রহণ করল। খ. এক কেজি গমের বিনিময়ে এক কেজি যব বিক্রি করল। কিন্তু তারা তা তাদের হস্তগত করল না।

এ জাতীয় ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান হারাম। কেননা সুদ হারাম হওয়ার বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহয় যে দলীলসমূহ বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর আওতায় যেসব লেনদেন পরে, এগুলো তার অন্যতম। আর জাহেলী যুগে এ জাতীয় লেনদেন প্রচলিত ছিল। বর্তমানে সুদী ব্যাংকগুলো এই ধরনের লেনদেন করে থাকে। এ বিষয়ে আবু সাউদ খুদরী رض হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী رض স্বর্ণ এবং রূপার কথা উল্লেখ করার পর বলেন:

وَلَا تَبْيَعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ وَفِي لَفْظٍ «مَا كَانَ يَدَا بِيَدٍ فَلَا يَأْسٌ بِهِ، وَمَا كَانَ نَسِيَّةً فَهُوَ رَبُّهَا»

“তোমরা বাকির বিনিময়ে নগদ বিক্রি করো না।” অন্য শব্দে: তবে উভয়টি (পণ্য ও মূল্য) নগদ হয়, তাতে কোনো সমস্যা নেই। আর যদি কোনোটি বাকিতে হয়, তাহলে তাই সুদ হয়ে যাবে।”^{৬৯৬}

الْمَسَأَةُ الرَّابِعَةُ: صُورٌ لبعضِ الْمَسَائلِ الْرَّبُوِيَّةِ

চতুর্থ মাসআলা: সুদ সম্পর্কিত কতিপয় মাসআলার ধরন

নির্দলিত্বিত নীতিমালা ও তার অন্তর্ভুক্ত বিষয় প্রয়োগ এর মাধ্যমে আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে, কোন বিষয়টি সুদ আর কোন বিষয়টি সুদ নয়। আর এই নীতিমালাটি হচ্ছে: যখন একই জাতীয় জিনিস^{৬৯৭} বিক্রয় হবে, তাতে দুটি শর্ত থাকবে:

^{৬৯৬} সহীহ মুসলিম, ঘৰ, ৩৯৫৬, ফুআ, ১৫৮৯।

^{৬৯৭} যদি জিনিসটি পূর্বে উল্লিখিত আবু সাউদ খুদরী رض হাদীসের ৬ টি জিনিসের একটি অথবা তার সমপর্যায়ের হয়।

১. ক্রয়-বিক্রয়ের মজলিস থেকে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের পৃথক হওয়ার আগেই পণ্য ও মূল্য গ্রহণ করতে হবে।

২. বিনিময়ের উভয় পণ্যই শরীয়তী মাপের মাধ্যমে অর্থাৎ পরিমাপ বা ওজন করার মাধ্যমে সমান সমান হতে হবে।

তবে যদি সুদ হয় এমন দুটি ভিন্ন জাতীয় জিনিস একটি আরেকটির সাথে বিনিময় করা হয়, তাহলে উল্লিখিত দুটি শর্তের একটি প্রযোজ্য হবে। তা হচ্ছে মজলিস থেকে ওঠে যাওয়ার আগেই হ্রস্বগত করা। আর যদি সমান সমান হয়, তাতে কোনো শর্ত নেই। আর যদি সুদ হয় এমন জাতীয় জিনিস, সুদ হয় না এমন জিনিসের সাথে বিনিময় করা হয়ে, তাহলে তাতে কম-বেশিও করা যায়, আবার ক্রয়-বিক্রয়ের মজলিস থেকে বস্তুটি গ্রহণ না করেও ওঠা যায়।

সুদ সংশ্লিষ্ট কিছু মাসআলা এবং তার হৃকুম:

১. এক ব্যক্তি একশত গ্রাম স্বর্ণের বিনিময়ে একশত গ্রাম স্বর্ণ বিক্রি করল। কিন্তু তারা তা গ্রহণ করল এক মাস পরে। এটিই হারাম। কারণ তারা উভয়ে ক্রয়-বিক্রয়ের মজলিসে তা গ্রহণ করেনি।

২. এক ব্যক্তি এক কেজি যব কিনলো এক কেজি গমের বিনিময়ে। তাহলে এটি বৈধ হবে। কারণ এখানে দুটি পণ্যই ভিন্ন শ্রেণির। তবে শর্ত হলো, একই মজলিসে তা গ্রহণ করতে হবে।

৩. এক ব্যক্তি একটি ছাগলের বিনিময়ে পঞ্চাশ কেজি গম কিনলো। তাহলে এটি সব অবস্থায় বৈধ হবে। চাই একই মজলিসে গ্রহণ করুক বা না করুক।

৪. এক ব্যক্তি ১০০ ডলার বিক্রি করল ১১০ ডলারের বিনিময়ে। তাহলে এটি বৈধ হবে না।

৫. এক ব্যক্তি এক হাজার ডলার ঋণ হিসাবে নিলো এই শর্তে যে, সে একমাস বা তার বেশি সময় পরে বারোশত ডলার ফিরিয়ে দিবে তাহলে তা বৈধ হবে না।

৬. এক ব্যক্তি ১০০ রৌপ্য দিরহাম বিক্রি করল ১০টি স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে। যেই স্বর্ণ মুদ্রা পরিশোধ করবে এক বছর পর। তাহলে এটি বৈধ হবে না। যেহেতু এই জাতীয় ক্রয়-বিক্রয় নগদে করা শর্ত।

৭. সুদ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে কোনো ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না। কেননা এতে টাকার বিনিময়ে টাকা ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। অথচ তাতে সমতার ক্ষেত্রে পরিমাপ ঠিক রাখা হয় না এবং কখনো কখনো নগদও গ্রহণ করা হয় না।

الباب الثالث: في القرض তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ঋণ

المُسَأْلَةُ الْأُولَى: فِي تَعْرِيفِهِ، وَأَدْلَةِ مَشْرُوعِيهِ

প্রথম মাসআলা : ঋণ এর পরিচয় এবং তা শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল

ক্ষমতা বা ঋণ বলা হয়: উপকার লাভ করার জন্য কাউকে কোনো সম্পদ দেওয়া, যা সে পরে পরিশোধ করবে।

এটি শরীয়ত সম্মত। কারণ কুরআনের অনেক আয়াত ও ফযীলত সম্পর্কিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, পরস্পরের সহযোগিতা করা, মুসলমানের প্রয়োজন মিটানো, তার বিপদ ও অভাব দূর করতে অবদান রাখে। আর এজনই তা বৈধ হওয়ার বিষয়ে মুসলমানগণ একমত হয়েছেন। আবু হুরায়রা رض থেকে বর্ণিত।

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَشْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِيمَتْ عَلَيْهِ إِبْلٌ مِنْ إِبْلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرًا، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ، فَقَالَ: لَمْ أُجِدْ فِيهَا إِلَّا خَيَارًا زَيَّعًا، فَقَالَ: «أَعْطُهُ إِيَّاهُ، إِنَّ خَيَارَ النَّاسِ أَخْسَنُهُمْ قَضَاءً»

“আল্লাহর রসূল ﷺ এক ব্যক্তির থেকে একটি উটের বাচ্চা^{৬৯৮} ধার নেন। এরপর তার নিকট সদাকার উট আসে। তিনি আবু রাফিকে সে ব্যক্তির উটের ধার শোধ করার আদেশ দেন। আবু রাফি' আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট ফিরে এসে জানালেন যে, সদাকার উটের মধ্যে আমি সেরূপ দেখছি না, তার চেয়ে উৎকৃষ্ট উট আছে। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন: উটাই তাকে দাও। নিশ্চয়ই মানুষের মাঝে সে ব্যক্তির উত্তম যে ধার পরিশোধে উত্তম।”^{৬৯৯}

ঋণ দেওয়ার ফযিলতের বিষয়ে দলীল রয়েছে: ইবনু মাসউদ رض থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةٌ

“কোনো মুসলিম অপর মুসলিমকে দুইবার ঋণ দিলে সে সেই পরিমাণ মাল একবার দান-খয়রাত করার সমান সওয়াব পায়।”^{৭০০}

^{৬৯৮}- বুকুর উট।

^{৬৯৯} মুস্তাফাকুন্দ আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ২৩৯৩; সহীহ মুসলিম, হা. ৪০০০, ফুআ. ৭১৫।

^{৭০০} ইবনু মাজাহ: ২৪৩০; হাসান সহীহ; দেখুন, ইরওয়াউল গালীল ৫/২২৬।

المسألة الثانية: في شروطه وبعض الأحكام المتعلقة به د্বিতীয় মাসতালা: ঋণের শর্ত এবং ঋণ সংশ্লিষ্ট কিছু বিধান

১. কোনো মুসলিম তার অপর ভাইকে এই শর্তে ঋণ দিতে পারবে না যে, ঋণ পরিশোধ করার পর ঋণগ্রহীতা তাকে আবার ঋণ দিবে। কারণ ঋণদাতা এক্ষেত্রে লাভের শর্ত করছে। আর যে সকল ঋণ লাভ নিয়ে আসে, তা সুদ। যেমন- কেউ ঋণ নেওয়ার শর্তে ঋণদাতাকে টাকা ছাড়াই তার বাড়িতে বসবাস করার সুযোগ দিলো অথবা সন্তায় তাকে বাড়িতে থাকতে দিলো কিংবা টাকা ছাড়া তাকে বাহন দিলো। ঋণ নেওয়ার বিনিময়ে এই ধরনের যে-কোনো উপকার করাটাই অবৈধ। কেননা সাহাবীদের জামাআত এটি (এই ধরনের অতিরিক্ত উপকার নেওয়াকে) অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে ফতুয়া দিয়েছেন এবং ফকুইহগণও এই বিষয়ে একমত হয়েছেন।

২. ঋণদাতাকে অবশ্যই লেনদেনের উপর্যুক্ত ব্যক্তি হতে হবে। যেমন- তাকে হতে হবে প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। যেন সে ইচ্ছা করলে কাউকে স্বেচ্ছায় কোনো কিছু দানও করতে পারে।

৩. ঋণদাতা যে পরিমাণ সম্পদ ঋণ দিবে, তার থেকে বেশি সম্পদ ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে কেনোভাবেই গ্রহণ করতে পারবে না। কেননা তা সুদ। অতএব, প্রথমে ঋণ গ্রহীতাকে যে পরিমাণ সম্পদ দিবে, পরিশোধের সময় সেই পরিমাণই গ্রহণ করতে হবে।

৪. ঋণগ্রহীতা ঋণ দাতার কাছ থেকে যে পরিমাণ সম্পদ নিয়েছে পরিশোধের সময় যদি তা থেকে পরিমাণে বেশি দেয় অথবা উত্তম কিছু দেয় কোনো ধরনের শর্ত ছাড়াই তাহলে তা ঠিক আছে। কারণ তখন ঋণ পরিশোধকারীর পক্ষ থেকে তা হবে স্বেচ্ছায় প্রদান এবং উত্তম ঋণ পরিশোধকারীর পরিচায়ক। যা প্রমাণ করছে আবু রাফে'র পূর্ববর্তী হাদীস।

৫. ঋণদাতা যে জিনিস ঋণ হিসাবে দিচ্ছে, অবশ্যই তাকে সে জিনিসের মালিক হতে হবে। সুতরাং যে জিনিসের সে মালিক নয়, সে জিনিস কাউকে ঋণ হিসেবে দিতে পারবে না।

৬. বর্তমানে অনেক ব্যাংক সুদযুক্ত হারাম লেনদেন করে থাকে। তারা ঋণ দেওয়ার সময় ঋণ গ্রহীতার সাথে চুক্তি করে নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ দেয়। কিন্তু ঋণ ফেরত নেওয়ার সময় তার থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ বেশি নিয়ে থাকে। অথবা ঋণ গ্রহীতার সাথে ব্যাংক নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেওয়ার চুক্তি করে কিন্তু প্রদান করার সময় তার থেকে কম দেয়। আবার নেওয়ার সময় সেই নির্দিষ্ট পরিমাণই নিয়ে থাকে। যেমন কারো সাথে ব্যাংক চুক্তি করল এক লাখ টাকা দেওয়ার কিন্তু দেওয়ার সময় তাকে দিলো আশি হাজার। আবার নেওয়ার সময় সেই এক লাখই নিলো। এটিই হলো হারাম।



الباب الرابع: في الرهن চতুর্থ অনুচ্ছেদ : বন্ধক রাখা

এই বিষয়ে আছে দুটি মাসআলা রয়েছে:

المسألة الأولى: معناه وأدلة مشروعيته

প্রথম মাসআলা: বন্ধকের অর্থ এবং তা শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলিল

রহন বা বন্ধক বলা হয়: ঋণের প্রমাণ স্বরূপ নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ ঋণদাতার কাছে রাখা। যদি কোনো কারণে ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয় তাহলে যেন সেই বন্ধক রাখা সম্পদের মাধ্যমে তার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সক্ষম হয়। আর ঋণের ক্ষেত্রে সক্ষম হয়। রহন বা বন্ধক শরীয়ত সম্মত। আল্লাহ আর্আলা বলেন:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضٌ﴾

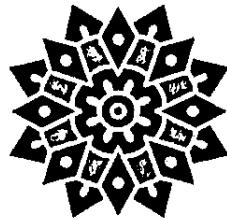
“যদি তোমরা সফরে থাকো ও লেখক না পাও, তাহলে বন্ধকী বস্তু নিজের দখলে রাখো।”

[সূরা বাক্সারাহ : ২৮৩]

যদিও এই আয়াতটি সফরে নায়ীল হয়েছে। কিন্তু তার হুকুমটি শুধু সফরের জন্যই বিশেষিত নয়। বরং সর্বাবস্থায় তা প্রযোজ্য। যেহেতু নাবী ﷺ কর্তৃক সফর ব্যতীতও বন্ধক রাখার বিষয়টি প্রমাণিত আছে। আয়িশাহ ৫৫: হতে বর্ণিত।

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَرَّى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ইহুদির নিকট থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে (বাকি) কিছু খাদ্য সামগ্রী খরিদ করেন এবং ঐ সময়ের জন্য তিনি ইহুদির নিকট তার বর্ম বন্ধক রাখেন।”^{৭০}



المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بـ দ্বিতীয় মাসআলা: বন্ধক সংক্রান্ত বিধান

১. যে জিনিস বিক্রি করা বৈধ নয় অথবা বন্ধকদাতা যে জিনিসের মালিক নয়, তা বন্ধক হিসেবে দেওয়া বৈধ নয়। যেমন: কুকুর অথবা ওয়াকফ করা কোনো সম্পদ। কেননা এগুলো থেকে ঝণ পরিশোধ সত্ত্ব নয়।

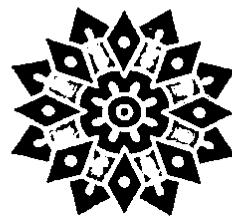
২. বন্ধক রাখা বস্তুর পরিমাপ ধরন এবং গুনাগুণ অবশ্যই জানা থাকতে হবে।

৩. বন্ধকদাতাকে অবশ্যই লেনদেন করার যোগ্য হতে হবে এবং বন্ধক রাখা জিনিসের মালিক হতে হবে কিংবা বন্ধক রাখার বিষয়ে অনুমতি প্রাপ্ত হতে হবে।

৪. বন্ধকদাতা বন্ধক গ্রহণকারী ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত বন্ধক রাখা বস্তুতে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। অনুরূপ যার কাছে বন্ধক রাখা হয়েছে সে বন্ধক দাতা ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া বন্ধক রাখা বস্তুর মালিক হতে পারবে না।

৫. যার কাছে বন্ধক রাখা হয়েছে সে বন্ধক রাখা বস্তুর মাধ্যমে কোনো উপকার নিতে পরবে না। তবে যদি তা বাহন হয়, তাহলে তাতে আরোহণ করতে পারবে। অথবা যদি দুঃখ দোহন করার মতো পঙ্গ হয়, তাহলে তা দোহন করতে পারবে সেই বন্ধক রাখা পঙ্গের খরচ চালিয়ে দেওয়ার জন্য।

৬. বন্ধক রাখা বস্তুটি বন্ধক গ্রহণকারীর কাছে আমানত হিসেবে থাকবে। অতএব, বস্তুটির যদি হঠাতে কোনো ক্ষতি হয়ে যায় আর এক্ষেত্রে যদি বন্ধক গ্রহণকারী কোনো ধরনের সীমালজ্বন না করে থাকে, তাহলে সে জিম্মাদার হবে না। যখন ঝণ পরিশোধের সময় হবে তখন ঝণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর আবশ্যক হবে ঝণ পরিশোধ করে দেওয়া। যদি সে ঝণ পরিশোধ না করে তাহলে বিচারক তাকে পরিশোধ করতে বাধ্য করবে। তারপরেও যদি পরিশোধ না করে তাহলে তাকে আটকিয়ে রাখবে এবং শাসন করবে। যেন সে তার ঝণ পরিশোধ করে। তারপরেও যদি পরিশোধ না করে তাহলে বন্ধক রাখা বস্তুটি বিচারক বিক্রি করে দিয়ে ঝণ পরিশোধ করবে।



الباب الخامس : في السلم পঞ্চম অনুচ্ছেদ : বাইয়ে সালাম

এই বিষয়ে দুটি মাসআলা আছে:

المسألة الأولى: في معناه وأدلة مشروعيته والحكمة من ذلك

প্রথম মাসআলা: বাইয়ে সালামের অর্থ এবং তা শরীয়ত সম্মত হওয়ার
দلীল ও তার হিকমাহ

বা বাইউস সালাম এবং বা بيع السلف একই অর্থবোধক।

- يَبْنُغ سِلْعَةً أَجْلَةً مَوْصُوفَةً فِي الدِّيْمَةِ يَتَمَّنِي مُقَدَّمٍ - آগে টাকা দিয়ে নির্দিষ্ট
সময়ের পরে পণ্য নেওয়া।

এটি শরীয়ত সম্মত। হাদীসে রয়েছে-

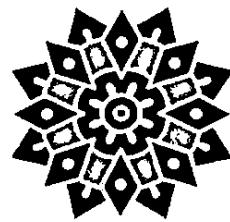
عَنْ أَبْنِي عَبَّاسِ، قَالَ: قَدَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّحَارِ السَّنَةَ وَالسَّيْنَ، فَقَالَ:
مَنْ أَسْلَفَ فِي تَحَارٍ، فَلَيُسْلِفَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“ইবনু আবু আবাস رض হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন
মদীনায় আসলেন, তখন মদীনাবাসী এক বা দুই বছর মেয়াদে বিভিন্ন ধরনের ফল অগ্রিম ক্রয়
করত। অতঃপর তিনি رض বলেন: কেউ খেজুর অগ্রিম ক্রয় করলে, সে যেন নির্ধারিত
পরিমাপ; নির্ধারিত ওজন; নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ক্রয় করে।”^{৭০২}

শরীয়ত সম্মত হওয়ার হিকমাহ:

মানুষের ব্যাপক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করে ইসলামী শরীয়ত এটিকে বৈধ করেছে। কারণ এমন
অনেক সময় আসে যখন চাষীর হাতে তেমন নগদ টাকা থাকে না। যার ফলে সে জমি মেরামত

^{৭০২} মুসাফরুন আলাইহি: সহীহ বুখারী, হা. ২২৪০; সহীহ মুসলিম, হা. ৪০১০, ফুআ. ১৬০৪



الباب الخامس : في السلم

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : বাইয়ে সালাম

এই বিষয়ে দুটি মাসআলা আছে:

المسألة الأولى: في معناه وأدلة مشروعيته والحكمة من ذلك
প্রথম মাসআলা: বাইয়ে সালামের অর্থ এবং তা শরীয়ত সম্মত হওয়ার
দلীল ও তার হিকমাহ

বাইডস সালাম এবং বাইডস সালাফ একই অর্থবোধক।

بَيْع سِلْعَةٍ أَجْلَى مَوْصُوفَةٍ فِي الْتِمَةِ يُشْمَنْ مُقَدَّمٌ - آগে টাকা দিয়ে নির্দিষ্ট
সময়ের পরে পণ্য নেওয়া।

এটি শরীয়ত সম্মত। হাদীসে রয়েছে-

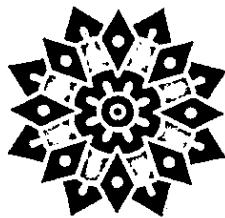
عَنْ أَبْنِي عَبَّاسِ، قَالَ: قَدِيمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِدِينَةَ، وَهُنْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمَارِ السَّنَةِ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ:
مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمَرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجْلٍ مَعْلُومٍ

“ইবনু আবাস رض হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন
মদীনায় আসলেন, তখন মদীনাবাসীরা এক বা দুই বছর মেয়াদে বিভিন্ন ধরনের ফল অগ্রিম ক্রয়
করত। অতঃপর তিনি বলেন: কেউ খেজুর অগ্রিম ক্রয় করলে, সে যেন নির্ধারিত পরিমাপ;
নির্ধারিত ওজন; নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ক্রয় করে।”^{১০২}

শরীয়ত সম্মত হওয়ার হিকমাহ:

মানুষের ব্যাপক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করে ইসলামি শরীয়ত এটিকে বৈধ করেছে। কারণ এমন
অনেক সময় আসে যখন চাষীর হাতে তেমন নগদ টাকা থাকে না। যার ফলে সে জমি মেরামত

^{১০২} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীতুল বুখারী, হা. ২২৪০; সহীহ মুসলিম, হা. ৪০১০, ফুআ. ১৬০৪



الباب السادس : في الحوالة ষষ্ঠি অনুচ্ছেদ : হাওয়ালা

এই বিষয়ে দুটি মাসআলা

لمسألة الأولى: معناها وأدلة مشروعيتها

প্রথম মাসআলা: হাওয়ালার অর্থ এবং তা শরীয়ত সম্মত হওয়ার প্রমাণ

الحوالة হাওয়ালা বলা হয়, একজনের জিন্না থেকে অপরজনের জিন্নায় ঝণ স্থানান্তরিত করা।

এটি শরীয়ত সম্মত। কারণ তাতে রয়েছে লেনদেনের সহজতা। মানুষের প্রতি সহমর্মিতা এবং ব্যাপক কল্যাণের প্রসারতা।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَإِذَا أَتَيْتَ أَحَدًا كُنْمَ عَلَى مَلِئِهِ فَلْيَبْتَغِ

“আবু হুরায়রা رض হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমাদের কারো প্রতি ঝণ পরিশোধের দায়িত্ব দিলে, সে যেন তা গ্রহণ করে।”^{৭০৩}

এর অর্থ হলো: যদি কোনো ঝণগ্রস্ত ব্যক্তি কোনো স্বচ্ছল ব্যক্তির উপর তার ঝণ হাওয়ালা করে, তাহলে ঝণদাতা যেন সেই হাওয়ালা গ্রহণ করে। কিন্তু ঝণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি ঝণদাতাকে দেউলিয়া কোনো ব্যক্তির কাছে হাওয়ালা করে, তাহলে তার হাওয়ালা নিজের কাছেই ফিরে আসবে। কারণ দেউলিয়া হওয়াটা একটি বিশেষ ক্রটি। তাই ঝণদাতা দেউলিয়া ব্যক্তির উপর সন্তুষ্ট না হলে, ঝণ গ্রহীতার কাছেই তার অধিকার ফিরে আসবে।

^{৭০৩} মুওফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হ্য. ২২৮৭; সহীহ মুসলিম, হ্য. ৩৮৯৪, ফুআ. ১৫৬৪।

المسألة الثانية: في شروط صحتها দ্বিতীয় মাসআলা: হাওয়ালা সঠিক হওয়ার শর্ত

হাওয়ালা সঠিক হওয়ার শর্তসমূহ নিম্নরূপ।

১. হাওয়ালা করার বিষয়ে হাওয়ালা কারী রাজি থাকতে হবে। কারণ খণ্ড পরিশোধ করা অথবা হাওয়ালা করা এ দুটির যে কোনোটির বিষয়ে তার ইখতিয়ার আছে। সুতরাং, হাওয়ালা করার জন্য কাউকে বাধ্য করা যাবে না।

২. যে সম্পদের জন্য হাওয়ালা করা হবে সেই সম্পদ এবং যে সম্পদ পরিশোধ করা হবে সেই সম্পদে পরিমাপ, ধরন ও গুণাগুণের ক্ষেত্রে একই হতে হবে।

৩. যে বস্তুর বিষয়ে হাওয়ালা করা হবে সেই বস্তু বা সম্পদ হাওয়ালাকৃত ব্যক্তির কাছে খণ্ড হিসাবে থাকবে।

সঠিকভাবে হাওয়ালা বাস্তবায়ন হওয়ার জন্য অবশ্যই উপর্যুক্ত নিয়মে হকটি হাওয়ালার দায়িত্বদাতা থেকে হাওয়ালা গ্রহণকারীর নিকট স্থানান্তরিত হতে হবে।

বর্তমানে হাওয়ালা করার কিছু ধরন নীচে উল্লেখ করা হলো।

ক. ব্যাংকের মাধ্যমে হাওয়ালা করা। এটি হলো, কেউ খণ্ড পরিশোধ করার জন্য ব্যাংকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দিলো। আর ব্যাংক সেই টাকা অন্য ব্যক্তির কাছে পৌছে দিলো। আর এর বিনিময়ে ব্যাংক নির্দিষ্ট পরিমাণ চার্ফ গ্রহণ করল।

খ. চেকের মাধ্যমে হাওয়ালা করা। এটি হলো, খণ্ডগ্রহীতা অথবা তার প্রতিনিধি খণ্ডদাতা বা তার প্রতিনিধির উদ্দেশ্যে একটি বইয়ে অথবা কাগজে সই করে পাঠিয়ে দিলো, যেন এই চেকের মাধ্যমে তারা খণ্ড পরিশোধ করে নিতে পারে। অথবা একজন মানুষ অন্যদেশে থাকা আরেকজন মানুষকে খণ্ড দিলো। তখন খণ্ডগ্রহীতা অথবা তার প্রতিনিধি অন্য দেশের খণ্ডদাতা বা তার প্রতিনিধির কাছে যাতে খণ্ড পরিশোধ করতে পারে। এখানে খণ্ডগ্রহীতা যে কাগজে লিখে তাকে সুফতাজাহ বা চেক বলে। এটি ফারসি শব্দ, যাকে আরবি করা হয়েছে।

উল্লিখিত পদ্ধতি দুটি বৈধ হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন অবৈধ। তবে সঠিক কথা হলো এটি বৈধ। যেহেতু উভয় পক্ষেরই কল্যাণ রয়েছে। কোনো পক্ষেরই ক্ষতি হচ্ছে না। তা ছাড়া শরীয়ত কর্তৃক সরাসরি কোনো নিষেধাজ্ঞাও বর্ণিত হয়নি।

الباب السابع: في الوكالة

সপ্তম অনুচ্ছেদ : প্রতিনিধি নিযুক্ত করা

এই বিষয়ে রয়েছে দুটি মাসআলা:

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: تَعْرِيفُهَا، وَحُكْمُهَا، وَأَدْلَةُ مَشْرُوعِيهَا

প্রথম মাসআলা: তার পরিচয়, হকুম এবং তা শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল

১. পরিচয়: কোনো ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিয়ে নিজের স্থলাভিষিক্ত করা।

“প্রতিনিধি বলতে বুঝায়, কোনো ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিয়ে নিজের স্থলাভিষিক্ত করা।”

২. হকুম: এটি শরীয়ত সম্মত। আর শরীয়তসম্মত হওয়ার দলীল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿فَابْعَثُوا أَحَدًا كُمْ بِوْرِقْكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾

“এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রা দিয়ে শহরে পাঠিয়ে দাও।” [সূরা কাহফ : ১৯]

মহান আল্লাহ আরও বলেন: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾

“সাদকা গরীব এবং অভাবগ্রস্তদের, আর সাদকার জন্য নিযুক্ত কর্মচারীদের।” [সূরা তাওবা : ৬০]

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সাদকা আদায়ের কাজে (عامل) শ্রমিক নিযুক্ত করাকে বৈধতা দিয়েছেন। যা প্রতিনিধি নিযুক্ত করারই নামান্তর।

عَنْ جَابِرٍ: أَرْدَثُتُ الْخَرْوَجَ إِلَيْ خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا...^{۷۰۳}

“জাবির رض হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খায়বার এলাকায় যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। তিনি رض বললেন: যখন তুমি আমার প্রতিনিধির নিকট আসবে, তার কাছ থেকে পনেরো ওয়াসক নিবে।”^{۷۰۴}

عَنْ عُزْرَةَ بْنِ أَبِي الْجَنْدِ قَالَ: عَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلْبَ، فَأَعْطَانِي دِينَارًا، فَقَالَ: أَيْ عُزْرَةُ أَنْتِ
الْجَلْبَ فَاشْتِرِ لَنَا شَاءَ...^{۷۰۵}

“উরওয়াহ ইবনু আবুল জাদ رض থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী رض কে কিছু আনার প্রস্তাব দিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে এক দিনার দিয়ে বললেন: উরওয়াহ, আমাদের জন্য একটি বকরী ক্রয় করে নিয়ে আসো।...”^{۷۰۶}

^{۷۰۳} سুনান আবু দাউদ, হা. ৩৬৩২; দারাকুত্বী ৪/১৫৫।

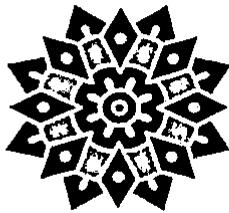
^{۷۰۴} সহীহ বুখারী, হা. ৩৬৪২; মূল মাতান মুসনাদে আহমাদ, হা. ১৯৩৬৭।

সাধারণভাবে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা বৈধ হওয়ার বিষয়ে মুসলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। যেহেতু তার প্রয়োজনীয়তা অনস্থীকার্য। কেননা সব মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় সব কাজ নিজে নিজেই করা। তাই প্রয়োজন শরীয়তে এর বৈধতা দাবি করে।

المسألة الثانية: شروطها، وأحكام المتعلقة بها

বিতীয় মাসআলা: প্রতিনিধি নিযুক্ত করা সংক্রান্ত বিধিবিধান

১. প্রতিনিধি নিযুক্তকারী ও প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তি উভয়কে লেনদেনের যোগ্য হতে হবে। অর্থাৎ তাদেরকে প্রাপ্ত বয়স, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি ও বিচক্ষণ হতে হবে।
২. প্রতিনিধি নিযুক্ত করা যাবে শুধু এমন সব ক্ষেত্রে যেগুলোতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা যায়। যেমন: ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়ে বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন করা অথবা তালাক ও খোলার মতো বিষয়ে চুক্তি করা বা বাতিল করা। অনুরূপভাবে যেসব ইবাদত প্রতিনিধির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব সেসব ইবাদাতের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা যায়। যেমন: যাকাত দেওয়া, কাফ্ফারা আদায় করা, মান্নত পূর্ণ করা, হাজ পালন করা ইত্যাদি।
৩. মহান আল্লাহর যেসব হক প্রতিনিধির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যায় না, সেসব হক আদায়ের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা যাবে না। যেমন: অজু করা, সলাত আদায় করা ইত্যাদি।
৪. প্রতিনিধি নিযুক্তকারীর অনুমতির অধীনে থেকে প্রতিনিধি তার কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। তবে শর্ত হলো- কোনোভাবে যেন প্রতিনিধি নিযুক্তকারীর ক্ষতি না হয়।
৫. নিযুক্ত কোনো প্রতিনিধি নিজে তার কোনো প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে পারবে না। তবে যদি প্রতিনিধি নিযুক্তকারী তাকে অনুমতি দেয় অথবা প্রতিনিধি নিজে ভালোভাবে কাজটি করতে না পারে কিংবা কাজটি করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, তাহলে তার স্থানে সে বিশ্বস্ত কাউকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে পারবে।
৬. যে কাজের জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয় সে কাজের ক্ষেত্রে সে আমানতদার হিসেবে থাকবে। সুতরাং কোনো কারণে যদি কাজের ক্ষতি হয়ে যায় তাহলে সে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে না। যদি না সে কোনো ধরনের সীমালংঘন না করে থাকে।
৭. প্রতিনিধি নিযুক্ত করা একটি বৈধ চুক্তি। যা উভয়েই বাতিল করার অধিকার রাখে।
৮. প্রতিনিধি নিযুক্ত করার চুক্তি বিভিন্ন কারণে বাতিল হতে পারে। যেমন উভয় পক্ষের কেউ মারা গেল অথবা পাগল হয়ে গেল কিংবা চুক্তি বাতিল করল। অথবা প্রতিনিধি নিযুক্তকারী কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিকে অপসারণ করা হলো। কিংবা নির্বুদ্ধিতার কারণে তার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো ইত্যাদি।



الباب الثامن : في الكفالة والضمان অষ্টম অনুচ্ছেদ : জিম্মাদারী এবং দায়িত্ব

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: فِي مَعْنَى الْكَفَالَةِ وَأَدْلَةِ مَشْرُوعِيهَا

প্রথম মাসআলা: জিম্মাদারীর পরিচয় এবং তা শরীয়ত সম্ভত হওয়ার দলীল

১. কাফা বা জিম্মাদারী বলা হয়, বাধ্যতামূলকভাবে এমন ব্যক্তিকে বিচারের মজলিসে উপস্থিত করা, যার কাছে তার সম্পদ পাওনা আছে।

২. কুরআন-সুন্নাহ এবং ইজমার দলীল দ্বারা এটি শরীয়তসম্ভত। যেমন- কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ رَعِيمٌ﴾

“তারা বলল, আমরা রাজাৰ পানপাত্ৰ হাৰিয়েছি; যে ওটা এনে দিবে, সে এক উট বোৰাই মাল পাবে এবং আমি ওৱ জামিনদার।” [সূরা ইউসুফ : ৭২]

﴿سَلَّهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ رَعِيمٌ﴾

“তুমি তাদেৱকে জিজ্ঞেস কৰো, তাদেৱ মধ্যে এই দাবিৰ জিম্মাদার কে?” [সূরা কুলাম : ৪০]

হাদীস থেকে:

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّةٌ، وَالْزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالَّذِينُ مَفْضِيٌّ

“ধার করা বস্তু ফেরত দিতে হবে। জামিনদার, পাওনা পরিশোধ করার দায় বহন করবে এবং ঝণ পরিশোধ করতে হবে।”^{১০৬}

الرَّبِيعُ الْأَعْمَامُ الْعَزِيزُ الْأَنْعَمُ বা নেতা হচ্ছে অভিভাবক বা জিম্মাদার।

এটি বৈধ হওয়ার বিষয়ে আলেমগণ একমত হয়েছেন। যেহেতু তাতে মানুষের প্রয়োজন রয়েছে এবং এর মাধ্যমে ঝণগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিও দূর করা যায়।

سَلَةُ الْثَانِيَةِ: أَرْكَانُ الْكَفَالَةِ وَشُرُوطُهَا

জাতীয় মাসআলা: الْكَفَالَةِ এর কুকুন ও শর্ত

ঘাক্যা বা প্রতিনিধি-এর কুকুন ৫টি। সেগুলো হলো-

১. ঘাক্যা বা দায়িত্ব গ্রহণ করার কথাবার্তা;
২. স্বয়ং দায়িত্বশীল ব্যক্তি;
৩. যার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করা হয় সেই ব্যক্তি;
৪. যার পক্ষ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করা হয় সেই ব্যক্তি;
৫. যে বিষয়ে দায়িত্বগ্রহণ করা হয় সেই বিষয়টি।

শুধুমাত্র দায়িত্ব গ্রহণকারীর দায়িত্ব গ্রহণের দ্বারাই এটা সাব্যস্ত হবে, যার দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে তার সম্মতির প্রয়োজন নেই।

দায়িত্ব গ্রহণকারী: যে ব্যক্তি অন্যের দায়িত্ব গ্রহণ করবে সে নারী হোক বা পুরুষ হোক, তাকে অবশ্যই এমন হতে হবে যে, সে ইচ্ছা করলেই কিছু দান করার ক্ষমতা রাখে। কারণ অন্যের পক্ষ থেকে এ ধরনের দায়িত্ব গ্রহণ করাটাও এক ধরনের দানের অন্তর্ভুক্ত।

এজন্যই কোনো পাগল, বেহশ ও শিশু এমন বিষয়ের জিম্মাদার হতে পারবে না। অনুরূপ নির্বাক্তিতার কারণে যার উপর লেনদেনের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, সেও এই ধরনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে না।

যার পক্ষ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়: যার পক্ষ থেকে এ জাতীয় দায়িত্ব নেওয়া হবে, তার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ থাকাটাও শর্ত নয়। তবে যে দায়িত্ব নিচ্ছে, তাকে অবশ্যই এই দায়িত্ব গ্রহণ করার বিষয়ে রাজি থাকতে হবে।

দায়িত্ব গ্রহণের স্থান: দায়িত্ব গ্রহণ করার বিষয়টি কখনো হতে পারে কোনো সম্পদ, যাকে বলা হয় জামানত। আবার কখনো হতে পারে মানুষের জীবন রক্ষা করা, যাকে বলা হয় জীবনের জামানত।

^{১০৬} সুনান আবু দাউদ, হ. ৩৫৬৫; তিরমিয়ী, হ. ১২৬৫; তিনি হাসান বলেছেন। শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, সিলসিলতুস সহীহহাহ, হ. ৬১০

الْمَسَأَةُ الْثَالِثَةُ: فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الْكَفَالَةِ الْثَالِثَةُ مَا سَأَلَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ: دَائِيَّتُهُمْ

١. এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে, যার উপর আর্থিক পাওনা আছে।
٢. এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে কেউ দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে না, যার উপর শরীয়তের হস্ত সাব্যস্ত হয়েছে।
٣. এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে না, যার উপর কিসাস সাব্যস্ত হয়েছে।
٤. যার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছে তার মৃত্যুর কারণে জিম্মাদার তাকে উপস্থিত করতে না পারলে, জিম্মাদার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে।
٥. মূল ব্যক্তি যদি ঋণ পরিশোধ করতে গতিমান করে কিংবা সঠিকভাবে আদায় না করে অথবা সে দেউলিয়া হয়ে যায়, তাহলে দায়িত্বগ্রহণকারী ব্যক্তি সে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে জিম্মাদার থাকবে।
٦. কোনো ব্যক্তি যদি ঋণগ্রাহকের জিম্মাদার না হয় আর তার দায়িত্ব যদি হয় শুধুমাত্র ঋণগ্রাহক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা, তাহলে সে ঋণ আদায়ের বিষয়ে জিম্মাদার হবে না। কেননা তার দায়িত্ব হলো শুধু ঋণগ্রাহক ব্যক্তির সম্মান দেওয়া এবং তাকে উপস্থিত করা। ঋণ আদায় করা নয়।
٧. যেকোনো ব্যক্তির বিষয়েও দায়িত্ব গ্রহণ করা যায়। আর তা হলো, ঋণগ্রাহক ব্যক্তিকে ঋণদাতার কাছে উপস্থিত করা অথবা বিচারের মজলিসে উপস্থিত করা।

الْمَسَأَةُ الْرَابِعَةُ: فِي الْخَضْمَانِ الْرَابِعَةُ مَا سَأَلَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ: دَائِيَّتُهُمْ

এখানে দায়িত্ব গ্রহণ করা মানে হলো অন্যের উপর যে দায়িত্ব রয়েছে, তা নিজের উপর আবশ্যিক করে নেওয়া। আর এটি জায়েয়। যেমন: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾

“যে সেটা এনে দিবে, সে এক উট বোঝাই মাল পাবে এবং আমি সেটার জামিন।” [সূরা ইউসুফ : ৭২]

অন্যদিকে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন: **وَالْزَعِيمُ عَارِمٌ**

“দায়িত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তিই ঋণ গ্রহণকারী হিসেবে গণ্য হবে।”^{১০৭}

এটি বৈধ হওয়ার বিষয়ে আলেমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তাহাড়াও এর রয়েছে ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা। এটি হলো মানুষের প্রয়োজন মেটানোর অন্যতম একটি বিষয়। যে বিষয়ে ইসলাম আদেশ করেছে।

জিম্বাদরী গ্রহণ করার হুকুম এবং তার শর্তসমূহ:

১. দায়িত্ব গ্রহণ করার কারণে কোনো বিনিময় গ্রহণ করা যাবে না।
 ২. দায়িত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তি একাধিক হতে পারে। কোনো একটি অধিকারের ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি জামিন হতে পারে।
 ৩. দায়িত্ব গ্রহণ করা সঠিক হওয়ার জন্য শর্ত নয় যে, যার পক্ষ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করা হচ্ছে তার কাছে তাকে পরিচিত হতে হবে।
 ৪. জানা বা অজানা যে-কোনো বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করা যাবে। তবে বিষয়টি অবশ্যই এমন হতে হবে, যা জানা সুন্নত। অনুরূপ বিক্রিত পণ্যের দায়িত্বও গ্রহণ করা যাবে।
 ৫. দায়িত্ব গ্রহণ করাটা সাব্যস্ত হবে এমন সব শব্দ দ্বারা যেগুলোর মাধ্যমে দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যেমন- কেউ বলল আমি জিম্বাদর, আমি দায়িত্বশীল ইত্যাদি।
 ৬. যার পক্ষ থেকে ঝণ পরিশোধ করে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছে, সে যখন ঝণ পরিশোধ করবে, সেটি হতে পারে পরিশোধ করার মাধ্যমে অথবা ক্ষমার মাধ্যমে, তখনই দায়িত্বগ্রহণকারী তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবে।
 ৭. কারো পক্ষ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করার শর্ত হলো, দায়িত্বশীলকে অবশ্যই রাজি থাকতে হবে। কিন্তু যদি তাকে দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য করা হয়, তাহলে এটি সঠিক হবে না। তবে যার পক্ষ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করা হচ্ছে অথবা যার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করা হচ্ছে, তার রাজি থাকা শর্ত নয়।
- যেমন সঠিক হওয়ার জন্য শর্ত:** কারো পক্ষ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য শর্ত হলো, অবশ্যই দায়িত্ব গ্রহণকারী দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য হতে হবে। যেমন তাকে প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মন্তিষ্ঠ সম্পন্ন ও বিচক্ষণ হতে হবে।



الباب التاسع : في الحجر নবম অনুচ্ছেদ : নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: مَعْنَاهُ وَأَدْلَةُ مَشْرُوعِيَّتِهِ وَأَنْواعُهِ

প্রথম মাসআলা: নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার অর্থ এবং তা শরীয়ত সম্মত
হওয়ার দলীল ও তার প্রকারভেদ

১. এর আভিধানিক অর্থ- কাউকে বিরত রাখা।

পরিভাষায়: **الحجر** হলো কোনো মানুষকে আর্থিক লেনদেন থেকে বিরত রাখা।

২. শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল: আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿وَلَا تُؤْثِرُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُم﴾

“আর তোমরা ধন-সম্পত্তি কম বুদ্ধিসম্পন্নদেরকে প্রদান করো না।” [সূরা নিসা : ৫]

এই আয়াতে (তোমাদের সম্পদ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তাদের ঐ সম্পদ যা তোমাদের অর্থাৎ অবিভাকদের কাছে থাকে। আর তোমরা তা পরিচালনা করে থাকো।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ قَإِنْ آتَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾

“আর ইয়াতীমরা বিয়ের যোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে পরীক্ষা করে নাও। অতঃপর যদি তাদের মধ্যে বিবেচনাবোধ লক্ষ্য করো, তাহলে তাদের ধন-সম্পত্তি তাদেরকে সমর্পণ করো।”
[সূরা নিসা : ৬]

তিনি আরও বলেন:

﴿قَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يُعْلَمُ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلَيْهِ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ﴾

“অতঃপর ঋগ্রগ্রহীতা যদি নির্বোধ অথবা অযোগ্য অথবা লিখিয়ে নিতে অসমর্থ হয়, তাহলে তার অভিভাবকরা ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখিয়ে নিবে এবং তাদের মধ্যে দুইজন পুরুষ সাক্ষীকে সাক্ষী করবে।” [সূরা বাক্সুরাহ : ২৮২]

এই আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, যারা নির্বোধ অথবা ইয়াতীম কিংবা যারা তাদের মতো, যেমন পাগল, শিশু; তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যাবে। যেন তাদের সম্পদ, তাদের কারণে ক্ষতির সম্মুখীন না হয়। হ্যাঁ, যখন তাদের মাঝে বিচক্ষণতা দেখা যাবে তখন তাদেরকে তাদের সম্পদ দেওয়া যাবে। প্রয়োজন হলে তাদের সম্পদ তাদের অভিভাবকরা কাজেও লাগাতে পারবে। যদি এতে নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত লোকদের উপকার হয়।

৩. নিষেধাজ্ঞার প্রকারভেদ: নিষেধাজ্ঞা দুই প্রকার।

প্রথম প্রকার: নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় নিষেধাজ্ঞা আরোপিত ব্যক্তির কল্যাণের জন্য। তারা হলো- শিশু, নির্বোধ, পাগল ইত্যাদি। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَا تُؤْثِرُوا السَّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ﴾

“আর তোমরা ধন-সম্পত্তি কম বুদ্ধিসম্পন্নদেরকে প্রদান করো না।” [সূরা নিসা : ৫]

দ্বিতীয় প্রকার: কারো উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় অন্যের কল্যাণের জন্য। যেমন: দেউলিয়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, যেন ঋগ্রগ্রহ ব্যক্তির ক্ষতির সম্মুখীন না হয়। মূর্মৰ ব্যক্তির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা করা হয়, তার সম্পদের তিন ভাগের একভাগের বেশি যেন মৃত্যুর আগে অন্যদের জন্য দান করে দিতে না পারে। অনরূপভাবে দাসের উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় যেন সে তার মনীবের অনুমতি ছাড়া সম্পদ খরচ করতে না পারে।

المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بالنوع الأول من الحجر، وهو الحجر على الإنسان لمصلحة نفسه

দ্বিতীয় মাসআলা: প্রথম প্রকার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে বিবিধান; নিষেধাজ্ঞা আরোপিত ব্যক্তির কল্যাণের জন্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ

১. যদি কারো উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় শিশু বা এ জাতীয় কোনো কারণে, এরপর কোনো ব্যক্তি বা সম্পদের ক্ষতি করে, তাহলে এর ক্ষতিপূরণ তাকে দিতে হবে। কারণ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কোনো বাঢ়াবাঢ়ি করেনি, ক্ষতি করার অনুমতিও দেয়েনি। হয়েছে সে এসবের সম্মুখীন হওয়ার কোনো যোগ্য নয়। তবে যদি কেউ নিজ সম্পদ কোনো শিশু, নির্বোধ বা পাগলের কাছে দেয় এবং তারা তা নষ্ট করে, তবে তাদের উপর ক্ষতিপূরণ আবশ্যিক নয়। কেননা সে নিজ ইচ্ছায় দিয়েছে।

২. ছেটো শিশুর থেকে নিষেধাজ্ঞা দূর হয়ে যায় দুটি বিষয়ের মাধ্যমে:

প্রথম বিষয়: যখন শিশু বালেগ হয়। আর এটি বুরা যায় বিভিন্ন আলামতের মাধ্যমে। সেগুলো হলো- মনি বের হওয়া, লজ্জাস্থানের চারপাশে শক্ত চুল গজানো অথবা পনেরো বছর বয়সে উপনীত হওয়া। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে বুরা যাবে তাদের ঝাতুমতী হওয়ার মাধ্যমে।

দ্বিতীয় বিষয়: বিচক্ষণতা। তা হলো আর্থিক লেনদেনে যোগ্য হওয়া। আব্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا التِّنَاجِحَ قَالُوا أَذْسِنْمُ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾

“ଇଯାତୀମରା ବିଯେର ଯୋଗ୍ୟ ନା ହୋଯା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଦେରକେ ପରୀକ୍ଷା କରେ ନାଓ । ଅତଃପର ସହି ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ବିବେଚନାବୋଧ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୋ, ତାହଲେ ତାଦେର ଧନ-ସମ୍ପଦି ତାଦେରକେ ସମର୍ପଣ କରୋ ।” ସୁରା ନିଃ : ୬

এই বিচক্ষণতাটা বুবা যাবে তাকে পরীক্ষা করার মাধ্যমে। যেমন লেনদেন করার জন্য তাকে কিছু সম্পদ দেওয়া হবে। তারপর সে কয়েকবার সম্পদ লেনদেন করবে। এই ক্ষেত্রে যদি সে বড়ো ধরনের কোনো ধোকা না খায় কিংবা হারাম কাজে ব্যয় না করে অথবা এমন কাজে খরচ না করে যাতে কোনো উপকার নেই, তখন বুবা যাবে যে, সে বিচক্ষণ হয়েছে।

৩. পাগল ব্যক্তি থেকে দুটি বিষয়ের মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা ওঠে যাবে।

প্রথম বিষয়: পাগলামী চলে যাওয়া এবং জ্ঞান ফিরে পাওয়ার মাধ্যমে।

দ্বিতীয় বিষয়: নির্বোধ। নির্বোধ ব্যক্তি থেকে যখন নির্বুদ্ধিতা এবং বোকামী চলে যাবে এবং আর্থিক লেনদেনের যোগ্য হবে, তখন তাকে বিচক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৪. যদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে তাদের অভিভাবক হবেন তাদের পিতা। যদি তিনি ন্যায় পরামর্শ ও বিচক্ষণ হয়। তিনি যদি না হতে পারেন তাহলে অভিভাবক হবেন এমন ব্যক্তি যার ব্যাপারে অসীয়ত করা হয়। যে ব্যক্তি তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করবে তার উপর অবশ্যক হলো সে যেন নিষেধাজ্ঞা আরোপিত ব্যক্তির সম্পদ এমন ক্ষেত্রে লেনদেন করে যাতে লাভ হওয়ার সম্ভাবনাই থাকে সবচেয়ে বেশি। যেমন: আল্লাহর তা'আলা বলেন:

﴿وَلَا تَقْرِبُوا مَالَ الْيَتَمِّ إِلَّا بِالْقِسْطِ هُنَّ أَخْسَنُ﴾

“ଆର ସଦୁଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଇଯାତୀମଦେର ଧନ-ସମ୍ପତ୍ତିର କାହେତି ଯେଓ ନା ।” [ସୁରା ଆନାମ : ୧୫୩]

যদিও এই আয়াতটি শুধু ইয়াতিমের বিষয়ে দলীল হিসেবে উপস্থাপিত হচ্ছে। কিন্তু যারাই এই শ্রেণির হবে তারাই এই আয়াতের দ্রুক্ষের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৫. ইয়াতিমের দায়িত্ব গ্রহণকারীর জন্য আবশ্যিক হলো সে যেন তার সম্পদের প্রতি যত্নবান হয়। তার সম্পদ যেন অন্যায় ভাবে অপবাদ দিয়ে বা কোনো প্রকার জুলুম করে ভক্ষণ না করে।
আল্লাহ তাঁর আলা বলেন:

فَإِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ۖ ظَلَمُوا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَضْلَعُونَ سَعِيرًاٰ

“যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমদের ধন-সম্পত্তি গ্রাস করে, নিশ্চয়ই তারা তাদের পেটে আগুনই ডকল করে এবং সত্ত্বরই তারা অগ্নি শিখায় প্রবেশ করবে।” [সুরা নিসা : ১০]

المسألة الثالثة: الأحكام المتعلقة بالنوع الثاني من الحجر، وهو الحجر على إنسان مصلحة غيره

তৃতীয় মাসআলা: তৃতীয় প্রকারের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধিবিধান; অন্যের কল্যানের জন্য কারো উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা

১. কোনো ঝণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর তার ঝণের কারণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যাবে না যতক্ষণ না তার ঝণ পরিশোধের সময় শেষ হয়ে যায়। কেননা ঝণ পরিশোধের সময় শেষ হওয়ার আগে সে তার ঝণ পরিশোধ করতে বাধ্য নয়। কিন্তু যদি কোনো ঝণগ্রস্ত ব্যক্তি এমন দীর্ঘ সফরের ইচ্ছা করে। যেখান থেকে ফিরে আসার আগেই ঝণ পরিশোধের সময় হয়ে যাবে, তাহলে ঝণদাতা তাকে সফর থেকে বিরত রাখতে পারবে। যেন সে তার কাছে কোনো কিছু বন্ধক হিসেবে রেখে যায় অথবা স্বচ্ছ কোনো ব্যক্তিকে তার জিম্মাদার বানিয়ে যায়।

২. নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা ব্যক্তির সম্পদ যদি তার ঝণের থেকে বেশি হয়, তাহলে সম্পদের বিষয়ে তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যাবে না। বরং ঝণ ফেরত চাওয়ার সময় তাকে ঝণ পরিশোধ করতে আদেশ করা হবে। যদি সে তা পরিশোধ না করে তাহলে তাকে আটকে রাখা হবে এবং বিচারের সম্মুখীন করা হবে। তারপরেও যদি সে না দেয়, তাহলে ঝণ পরিশোধ করার জন্য তার থেকে জোরপূর্বক সেই ঝণের পরিমাণ সম্পদ নেওয়া হবে। কিন্তু যদি তার সম্পদ ঝণের চেয়ে কম হয় তাহলে ঝণ চাওয়ার সময় থেকে তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। যাতে ঝণদাতা ব্যক্তিরা বেশি ক্ষতির সম্মুখীন না হয় এবং ঝণগ্রস্ত ব্যক্তিও যেন তার সম্পদের মাঝে কোনো লেনদেন করতে না পারে। যেমন কাউকে সে দান করল অথবা এমনিতেই সম্পদ ব্যয় করল। যদি সে এসব করে তাহলে ঝণদাতা ব্যক্তিরা আরও বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

৩. যার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, তাকে যদি কেউ ঝণ প্রদান করে অথবা তার কাছে কোনো কিছু বিক্রি করে, তাহলে তার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা ওঠে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার কাছ থেকে তা দাবি করতে পারবে না।

৪. কারো উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলে তার ব্যাপারে বিচারকের আধিকার আছে যে, তিনি তার সম্পদ বিক্রি করে দিবেন এবং তা ঝণদাতাদের মাঝে পরিমাণ অনুযায়ী বণ্টন করে দিবেন। বরং এটিই তাকে করতে হবে। এক্ষেত্রে বিলম্ব করাটা হবে তাদের প্রতি যুলুম ও অন্যায়। তবে বিচারক তার জন্য সেই পরিমাণ রেখে দিবেন, যা দিয়ে ঝণগ্রস্ত ব্যক্তি সাধারণ খরচ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে।



الباب العاشر: الشركة দশম অনুচ্ছেদ : অংশীদারিত্ব

এতে দুটি মাসআলা রয়েছে:

المُسَأَّلَةُ الْأُولَى: تعرِيفُ الشَّرْكَةِ وَحُكْمُهَا وَأَدْلَةُ مَشْرُوعِيَّتِهَا

প্রথম মাসআলা: অংশীদারিত্বের পরিচয় এবং তার হকুম ও
শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল

১. শর্ক বা অংশীদারিত্বের পরিচয়:

শর্ক শব্দটির আভিধানিক অর্থ: মিশন। অর্থাৎ এক জনের সম্পদ আরেকজনের সম্পদের সাথে মিশিয়ে ফেলা। যা আলাদা করা হয় না।

পরিভাষায়: শর্ক বলা হয় লেনদেনের অথবা অধিকারের ক্ষেত্রে একত্রিত হওয়া।

অধিকারের ক্ষেত্রে একত্রিত হওয়ার উদাহরণ। যেমন উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া অথবা অসীয়তের মাধ্যমে কিংবা দান সূত্রে পাওয়া সম্পদের ক্ষেত্রে অংশীদার হওয়া। এটি হতে পারে নির্দিষ্ট কোনো বস্তু অথবা নির্দিষ্ট কোনো উপকার লাভ। এটিকে আবার (এম্বা শর্ক) অংশীদারিত্বমূলক মালিকানা বলা হয়।

আর সম্বলিত লেনদেনটি شركَةِ العقُودِ বা অংশীদারিত্বমূলক চুক্তি হিসেবে পরিচিত। এখানে এটিই উদ্দেশ্য। অতএব বুঝা গেল যে, অংশীদারিত্বের বিষয়টি পরিচয়ের দিক দিয়ে দুই প্রকার।

২. শরীয়ত সম্মত হওয়া দলীল:

অংশীদারিত্বমূলক লেনদেন বা চুক্তি করাটা শরীয়ত সম্মত। যেহেতু তা বৈধ হওয়ার বিষয়ে কুরআনের আয়াত ও হাদীস দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَعْلَمُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾

“শরীকদের অনেকে একে অন্যের উপর অবিচার করে থাকে।” [সূরা সোয়াদ : ২৪]

﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْثُلُثِ﴾

“তারা এক তৃতীয়াংশ অংশীদার হবে।” [সূরা নিসা : ১২]

এটি বৈধ হওয়ার পাশাপাশি সমাজে এর ব্যাপক প্রয়োজন রয়েছে। যেহেতু এ জাতীয় অনেক কাজ মানুষের সম্মিলিত ভাবে করতে হয়, একাকি করতে পারে না, তাই শরীয়ত একে বৈধতা দিয়েছে।

المسألة الثانية: أنواع شركة العقود

الثانية: شروط الشركة المعاشرة

الثانية: شروط الشركة المعاشرة। এটি হলো দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একই সম্পদের মাঝে অংশীদার হবে এবং তা দিয়ে তারা ব্যবসা করবে। আর এটিকে আরবিতে **شركة العنوان** বলার কারণ হলো, অংশ গ্রহণকারী সকলেই লেনদেন করা ও সম্পদের মালিকানার ক্ষেত্রে সমান হয়ে থাকে। যেমন চলার ক্ষেত্রে সমান দুটি ঘোড়ার লাগাম সমান হয়ে থাকে।

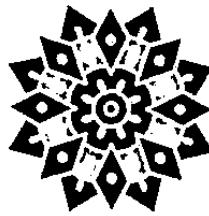
তবে এটি সঠিক হওয়ার জন্য শর্ত হলো, মূল সম্পদ অবশ্যই নগদ ও নির্ধারিত হতে হবে। পাশাপাশি প্রত্যেকে কি পরিমাণ লভ্যাংশ পাবে তাও নির্ধারিত হতে হবে।

الثانية: شروط الشركة المعاشرة। এটি হলো দুই অংশীদারের একজন আরেক জনকে সম্পদ দিবে। আর তা দিয়ে সে ব্যবসা করবে এবং সম্পদের মালিককে নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ দিবে।

الثانية: شروط الشركة المعاشرة। এটি হলো দুজনেই মাল কিনবে। তারপর বিক্রি করে লাভ ভাগ করে নিবে। তবে তাদের কাছে মূল সম্পদ থাকবে না। বরং তাদের উপর ব্যবসায়ীদের আস্থার উপর নির্ভর করবে।

الثانية: شروط الشركة المعاشرة। এটি হলো দুই ব্যক্তি তাদের শরীর খাটিয়ে বৈধভাবে উপার্জন করবে। যেমন- ঘাস কাটা, শিকার করা, খনিজ সম্পদ আরোহণ করা, লাকড়ি সংগ্রহ করা, কাপড় বুনা বা সেলাই করা ইত্যাদি। কাজ শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে লাভ বণ্টন করা হবে সেই হিসাবে, যেই হিসাবে তারা বণ্টন করার বিষয়ে একমত হয়েছিল।

যদি ব্যবসায় ক্ষতি হয়ে যায়, তাহলে ক্ষতিও তাদের মাঝে সম্পদ অনুপাতে বণ্টন করা হবে। প্রত্যেকেই ইচ্ছা করলে তাদের চুক্তি ঠিক রাখতে পারবে, আবার বাতিলও করতে পারবে। অনুরূপভাবে তাদের কেউ একজন মারা গেলে বা পাগল হলেও চুক্তি বাতিল হবে।



البَابُ الْحَادِيُّ عَشْرُ : الْإِجَارَةُ একাদশ অনুচ্ছেদ : ভাড়া দেওয়া

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المَسَأَةُ الْأُولُىٰ : مَعْنَاهَا وَأَدْلَهُ مَشْرُوعَيْهَا

প্রথম মাসআলা: ভাড়া দেওয়ার অর্থ এবং তা শরীয়ত সম্বত হওয়ার দলীল

১. ইজারা এর অর্থ ও পরিচয়:

ইজারা শব্দটি আরবি جرّا শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ বিনিময়। এজন্যই সওয়াবকে জর বা বিনিময় বা প্রতিদান বলা হয়।

পরিভাষায়: ইজারা বলা হয় নির্দিষ্টভাবে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বস্তু থেকে বৈধ পছায় উপকার গ্রহণ করার চুক্তি করা। যে উপকারটা কিছু কিছু করে নেওয়া হবে। অথবা নির্দিষ্ট কোনো কাজের বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনিময় গ্রহণ করা।

২. শরীয়ত সম্বত হওয়ার দলীলসমূহ:

শরীয়ত সম্বত হওয়ার দলীল। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَإِنْ أَرْضَعْتَ لَكُمْ فَأَتُوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾

“যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্য দান করে, তাহলে তাদেরকে পারিশ্রমিক দিবে।”

[সূরা ফ্লাক্স : ৬]

মহিমান্বিত আল্লাহ আরও বলেন:

﴿قَالَتْ إِخْدَاهُمَا يَا أَبَتْ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرَتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾

“তাদের একজন বলল, হে পিতা! আপনি একে মজুর নিযুক্ত করুন; কারণ আপনার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।” [সূরা কুসাস : ২৬]

এ ছাড়াও প্রমাণিত রয়েছে:

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَشْتَأْجَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدُّلَيْلِ، هَادِيًّا خَرِيْتَاهُ.

“নাবী ﷺ ও আবু বাকর رض বনু দীল গোত্রের একজন অত্যন্ত সচেতন ও অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক শ্রমিক নিয়োগ করেন।”^{৭০৮}

আল্লাহ বলেন:

”لَلَّاهُمَّ أَنَا حَضْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ... وَرَجُلٌ أَشْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْقَ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ.”

“কিয়ামতের দিনে আমি নিজে তিনি ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হবো... তাতে রয়েছে, আর ঐ ব্যক্তি, যে কোনো মজুর নিয়োগ করে, তার থেকে পুরো কাজ আদায় করে এবং তার পারিশ্রমিক দেয় না।”^{৭০৯}

ইবনু উমার رض বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

»أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقُهُ«

“শ্রমিকের দেহের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তোমরা তার মজুরী দিয়ে দাও।”^{৭১০}

المسألة الثانية: شروطها

দ্বিতীয় মাসআলা: ইজারার শর্তসমূহ

১. লেনদেনের উপযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া ভাড়া দেওয়া (জারি) সঠিক হবে না। যেমন তাকে হতে হবে সুস্থ মন্ত্রিক সম্পন্ন, প্রাণবয়ক, স্বাধীন ও বিচক্ষণ।

২. ভাড়া দেওয়ার মাধ্যমে যে উপকার নেওয়া হবে, তা অবশ্যই জানা থাকবে। কারণ এই উপকার নেওয়ার জন্যই মূলত চুক্তি করা হয়ে থাকে। সুতরাং শর্ত হলো সেটি ক্রয়-বিক্রয়ের মতোই জানা থাকতে হবে।

৩. ভাড়ার বিষয়টি জানা থাকবে। কারণ তাতে ক্ষতিগ্রস্ত চুক্তিতে ক্ষতিপূরণ দেওয়া যাবে। তাই আর্থিক মূল্য জানা আবশ্যিক।

৪. উপকার নেওয়াটা অবশ্যই বৈধ হতে হবে। অতএব জিনা, গান-বাজনা, অনর্থক খেলাধুলার বস্ত বিক্রি করা বিষয়ে ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া ঠিক হবে না।

৫. উপকার নেওয়ার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি বা বস্তকে ভাড়া নেওয়া হবে, তাকে অবশ্যই এমন যোগ্য হতে হবে, যার মাধ্যমে উপকার নেওয়া সম্ভব। সুতরাং এমন বস্ত বা ব্যক্তিকে ভাড়া

^{৭০৮} সহীল বুখারী, হ্য. ২২৬৩।

^{৭০৯} সহীল বুখারী, হ্য. ২২২৭।

^{৭১০} ইবনু মাজাহ, হ্য. ২৪৪৩।

নেওয়া ঠিক হবে না, যার মাধ্যমে উপকার নেওয়া অসম্ভব। যেমন কোনো অঙ্গ ব্যক্তিকে মজুর নেওয়া হলো কোনো বস্তুকে পাহাড়া দেওয়ার জন্য। অথচ সে দেখতেই পায় না।

৬. যে জিনিসটি ভাড়া দেওয়া হবে সেই জিনিসটি আবশ্যই ভাড়া দাতার মালিকানায় থাকতে হবে অথবা সেই বিষয়ে অনুমতিপ্রাপ্ত হতে হবে। কারণ ভাড়া দেওয়াটা হলো এক ধরনের উপকার বিক্রি করা। সুতরাং এই বিষয়ে ক্রয়-বিক্রয়ের মতোই শর্ত করা হয়েছে।

৭. ভাড়া দেওয়ার সময়টি নির্ধারিত হতে হবে। সুতরাং অনির্ধারিত সময়ের জন্য ভাড়া দেওয়া ঠিক নয়। কেননা এতে করে ঝগড়া-বিবাদ তৈরি হতে পারে।

الْمَسْمَى : حَكَامُ الْأَشْلَائِيَّةِ

তৃতীয় মাসআলা: ইজারার সাথে সম্পৃক্ত বিধানসমূহ

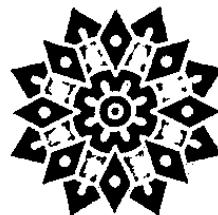
ভাড়া দেওয়ার সাথে বেশ কিছু অসম্ভব সম্পৃক্ত। নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. নেকট্যশীল কাজ এবং ইবাদাতের ক্ষেত্রে কাউকে মজুর নেওয়া বৈধ নয়। যেমন- আজান দেওয়া, হাজ্জ করা, বিভিন্ন মাসআলা মাসায়েলের সমাধান দেওয়া, বিচারিক ফয়সালা করা, ইমামতি করা, কুরআন শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি। কারণ এসব কাজের মাধ্যমে আল্লাহর নেকট্য লাভ করা হয়। হ্যাঁ, তবে যারা এসব দায়িত্ব পালন করবে, তারা (ল্যাপ্টপ) বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভরণপোষণের জন্য অর্থ নিতে পারবে।

২. যে ব্যক্তি ভাড়া দিবে, তার কর্তব্য ভাড়ার জিনিসটি ভাড়া গ্রহণকারীর কাছে পৌছে দিবে। যেন সে তার মাধ্যমে উপকার লাভ করতে পারে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ভাড়া নিবে তার জন্য আবশ্যিক ভাড়া নেওয়া জিনিস যত্নে রাখা এবং সময় শেষ হওয়ার সাথে বিনিময় প্রদান করা।

৩. কোনো এক পক্ষ থেকে ট্রাংশু বা ভাড়া দেওয়ার চুক্তি বাতিল করা বৈধ নয়। বাতিল করার ক্ষেত্রে উভয়কে রাজী থাকতে হবে। যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে আর ভাড়া দেওয়া বস্তুটি থেকে যাবে, তাহলেও চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে না। বরং এই ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস তার স্থলাভিষিক্ত হবে।

৪. যখন ভাড়া দেওয়ার বস্তুটি নষ্ট হয়ে যাবে অথবা তা থেকে উপকার নেওয়া বন্ধ হয়ে যাবে, যেমন: ভাড়া নেওয়া কোনো প্রাণী মারা গেল অথবা কোনো বাড়ি ধসে পড়লো, তাহলে ভাড়ার চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।



الباب الثاني عشر: المزارعة والمساقاة

দ্বাদশ অনুচ্ছেদ : বরগাচাষ ও ফসলের বরগাচাষ

এই বিষয়ে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: مَعْنَاهُمَا وَحُكْمُهُمَا

প্রথম মাসআলা: বরগাচাষ ও ফসলের বরগাচাষ এর অর্থ ও হ্রকুম

১. অর্থ:

مَزَارِعًا বা মুজারাআ বলা হয়: কাউকে চাষাবাদ করার জন্য জমি অথবা বীজ দেওয়া এবং এর বিনিময়ে উৎপন্ন শস্য থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্রহণ করা।

سَاقَاتٍ বা মুসাক্তাহ বলা হয়: নির্দিষ্ট পরিমাণ ফলদার বৃক্ষরোপন করে কাউকে দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া এবং এর বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য প্রদান করা।

আর মাঝে কিছু মিলও রয়েছে। যেমন: مَزَارِعًا হলো বীজ দিয়ে চাষাবাদ করা আর سَاقَاتٍ হলো গাছ দেখাশোনা করে ফল উৎপাদন করা। এ ছাড়াও দুটি বিষয়ের কর্মীর জন্য রয়েছে উৎপন্ন ফলের নির্দিষ্ট অংশ।

২. হ্রকুম: এ দুটিই শরীয়ত সম্মত বৈধ চুক্তি। মানুষের এ দুটির প্রয়োজনও রয়েছে। ইবনু উমার رض হতে বর্ণিত।

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلٌ أَهْلَ خَيْرٍ يُشَطِّرُ مَا يَجْرِيُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَعْعَبٍ

“নাবী সাল্লামাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম উৎপাদিত ফল বা ফসলের অর্ধেক শর্তে খায়বারের জমি বর্গা দিয়েছিলেন।”^{۱۱۱}

^{۱۱۱} সহীল বুখারী, ঘ. ২৩২৯।

الْمَسَأَةُ الثَّانِيَةُ: شَرْوَطُهَا

ثُالِثَيَّةُ مَأْسَاتِ الْأَلَّا: إِذْنُ دُوَّتِ الرُّشْدَةِ

শর্তগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. চুক্তিকারীকে লেনদেনের যোগ্য হতে হবে। সুতরাং যদি চুক্তিকারী বালেগ, স্বাধীন এবং বিচক্ষণ না হয়, তাহলে চুক্তি সম্পাদিত হবে না।
২. **فَاقِسٌ**। এর ক্ষেত্রে গাছ নির্ধারিত হতে হবে আর **عَارِضٌ**। এর ক্ষেত্রে বীজ নির্ধারিত হতে হবে।
৩. গাছ ফলদার হতে হবে। যেমন- খেজুর বা অন্যান্য ফলদার গাছ।
৪. ফলদার গাছ হতে নির্ধারিত একটি অংশ কর্মীর জন্য থাকবে। আর ফসল হলে এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ কিংবা এই ধরনের নির্দিষ্ট অংশ ব্যক্তির জন্য থাকবে।

الْمَسَأَةُ الثَّالِثَةُ: أَحْكَامُ الْمُتَعْلِقَةِ بِهَا

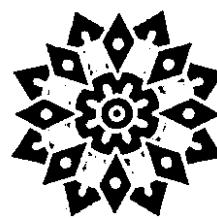
তৃতীয় মাসআলা: এ দুটি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত বিধান

বিধানগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো-

১. কর্মীর জন্য আবশ্যিক হলো, এমন সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যেসবের মাধ্যমে গাছ বা ফসলকে ফলনের উপযুক্ত করে তুলতে পারবে। যেমন- চাষাবাদ করা, পানি সেচ দেওয়া, পরিষ্কার করা, খেজুর বৃক্ষের পরাগায়ন করা, ফল শুকানো ইত্যাদি।
২. জমির মালিকের জন্য কর্তব্য হলো, মূল বিষয় ঠিক রাখার উপকরণের ব্যবস্থা করা। যেমন- কৃপ খনন করে দেওয়া, পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা, দেয়াল ঠিক করে দেওয়া, ঘির দেওয়া, পানির পাস্পার এবং মেশিনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।
৩. ফলন প্রকাশ পেলেই কর্মী তার অংশের মালিক হবে।
৪. চুক্তিকারীর প্রত্যেকেরই তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী চুক্তি বাতিল করার অধিকার আছে। কারণ এটি হলো একটি বৈধ চুক্তি। আবশ্যিক কোনো চুক্তি নয়।

ফলন প্রকাশিত হওয়ার পরে যদি চুক্তি বাতিল করা হয়, তাহলে শর্ত অনুযায়ী কর্মীকে নির্দিষ্ট অংশ দিতে হবে। কিন্তু ফলন প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই যদি কর্মী নিজে চুক্তি বাতিল করে, তাহলে সে কোনো অংশ পাবে না। কেননা সে নিজেই রাজি হয়ে তার অংশ বাতিল করে দিয়েছে। যেমনটি মুজারাবা চুক্তির ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে কর্মীরা করে থাকে। আর যদি কাজ শুরু করার পর ফলন প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে মালিক চুক্তি বাতিল করে, তাহলে কর্মীকে তার কর্মের মজুরি দিতে হবে।

৫. কোনো কর্মী যদি গাছ বা জমি নিয়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় কাজ করে, যে সময় পর্যন্ত কাজ করলে সাধারণত ফলন পাওয়া যায়। কিন্তু সেই বছর ফলন পাওয়া গেল না। তাহলে কর্মীর জন্য কোনো অংশ থাকবে না।



الباب الثالث عشر الشفعة والجوار অয়োদশ অনুচ্ছেদ : শুফ'আহ ও প্রতিবেশী

এই বিষয়ে রয়েছে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المسألة الأولى: في معناها وأدلة مشروعيتها

প্রথম মাসআলা: ^{٩١٢} الشفعة অর্থ এবং তা শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল

১. শفعة বা শুফআহর অর্থ:

الشفعة هي استحقاق الشرك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي.

“অংশীদারিত্বমূলক বস্তুর এক অংশের মালিকানা অন্য কোনো ব্যক্তির মালিকানায় যাওয়ার সময়, অপর অংশীদারের মালিকানা নেওয়ার দাবি করা এবং অর্থ দিয়ে তা ক্রয় করার অধিকার খাটোনো।”

এই পদ্ধতিকে শفعة বা জোড় বলা হয়। কারণ দ্বিতীয় অংশীদার তার নিজের মালিকানার সাথে আরেক অংশের মালিকানা জোড় করে নিয়ে থাকে। অথচ এটি করার পূর্বে তার মালিকানায় শুধু তার অংশই ছিল।

وقيل: هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة؛ لدفع الضرر.
কেউ কেউ বলেন: هللو أংশীদার হওয়ার কারণে অপর অংশ জোরপূর্বক মালিকানার নেওয়ার দাবি করা। যেন নুতন কোনো ব্যক্তি মালিক না হতে পারে। এটি ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকার জন্য করা হয়ে থাকে।

২. শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল:

শরীয়ত সম্মত। এর মূল বিষয়টি জাবির ^{৯১৩} এর হাদীসে রয়েছে।

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يَقْسِمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ
“আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সব সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়নি, তাতে শুফ'আহ এর ফয়সালা দিয়েছেন। যখন সীমানা নির্ধারিত ও রাস্তা পৃথক হয়ে যায়, তখন শুফ'আর অধিকার থাকে না।”^{৯১৩}

^{৯১২} আগে ক্রয় করার অধিকার; জোড়।

^{৯১৩} سহীল বুধারী, হা. ২২৫৬; সহীহ মুসলিম, হা. ১২২৯।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে:

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُنْسَمْ، رَبْعَةَ أَوْ حَافِظِ، لَا يَحْلُّ لَهُ أَنْ يَبْيَغِ حَسْنَ
يُؤْذَنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخْذَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ، فَإِذَا بَاعَ وَمَنْ يُؤْذِنُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

“আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সব সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়নি, তাতে শুফ্টআহ এর ফয়সালা দিয়েছেন, হোক জমি বা বাগান। আপন শরীককে না জানিয়ে তা বিক্রি করা বৈধ নয়। সে ইচ্ছে করলে রাখবে অন্যথায় ছেড়ে দিবে। যদি সে বিক্রি করে এবং শরীককে অবগত না করে, তাহলে সে শরীকই তা পাওয়ার অধিকতর হকদার।”^{১১৪}

জাবির অপর বর্ণনায় বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ

“বাড়ির প্রতিবেশী বাড়ির অধিক হকদার।”^{১১৫}

আলেমগণ এই বিষয়ে একমত যে, الشفعة বা শুফ্টআহ সাব্যস্ত হবে এমন সব অংশীদারের জন্য যাদের অংশ এখনো তাদের অপর অংশীদারের মালিকানার সাথে মিলে আছে। এখনো তা বণ্টন করে আলাদা করা হয়নি। এই বস্তুগুলো হতে পারে জমি, বাড়ি কিংবা দেয়াল ইত্যাদি। সুতরাং শুফ্টআহ বৈধ হওয়ার বিষয়টি কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

المَسَأَةُ الثَّانِيَةُ: الْحُكَمُ الْمُتَعَلِّقُ بِالشُّفْعَةِ

দ্বিতীয় মাসআলা: শুফ্টআহ-এর সাথে সম্পৃক্ত বিবিধিন

১. কোনো অংশীদারের জন্য বৈধ নয় যে, সে তার অপর অংশীদারকে না জানিয়ে বা তার অনুমতি না নিয়ে তার অংশীদারিত্বের মূল বস্তু বিক্রি করবে। তারপরেও যদি তাকে না জানিয়ে বিক্রি করে তাহলে তার অপর অংশীদারের এই বস্তুর ব্যাপারে শুফ্টআহ-এর দাবি করতে পারবে।

২. الشفعة বা অগ্রক্রয় অধিকারে কেবল জমি এবং স্থাবর সম্পদের মাঝে দাবি করা যাবে। এ ছাড়া অস্থাবর সম্পদ যেমন বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী এবং প্রাণী ইত্যাদির ক্ষেত্রে শুফ্টআহ দাবি করা যাবে না।

৩. الشفعة বা অগ্রক্রয় অধিকার একটি শরীয়ত সম্মত অধিকার। সুতরাং এই অধিকার বাতিল করার জন্য কোনো ধরনের কোশল অবলম্বন করাটা ঠিক নয়। কেবল এটি শরীয়ত সম্মত করা হয়েছে অপর অংশীদার থেকে ক্ষতি দূর করার জন্য।

^{১১৪} সঙ্গীত মুসলিম, পৃ. ৪০২০, ফুর্মা, ১৬০৮।

^{১১৫} তিরিমী, পৃ. ১৩৬৮ এবং তিনি সহীহ বলেছেন। সুনান আবু দাউদ, পৃ. ৩৫১৭; শাইখ আলবানী সহীহ বলেছে, ইরওয়া নং ১৫৩৯।

৪. বিভিন্ন অংশীদারদের জন্য ﴿الشَّفَاعَة﴾ সাব্যস্ত হবে তাদের মালিকানা অনুপাতে। সুতরাং যার জন্য শুফআহ সাব্যস্ত হবে, সে তা গ্রহণ করবে এই মূল্য দিয়ে, যে মূল্যে বস্তুটি বিক্রয় করা হয়েছে। তা হোক নগদে অথবা বাকিতে।

৫. অংশীদারিত্বমূলক সম্পদ যদি ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে মালিকানা পরিবর্তন হয়, তাহলেই কেবল ﴿الشَّفَاعَة﴾ দাবি করা যাবে। কিন্তু যদি ক্রয়-বিক্রয় ছাড়াই মালিকানা পরিবর্তন হয়। যেমন বিনিময় ছাড়াই কেউ কাউকে দান করল অথবা উত্তরাধিকার সুত্রে কেউ পেলো কিংবা অসীয়ত করার কারণে পেলো, তাহলে শুফআহ-এর দাবি করা যাবে না।

৬. বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থানান্তর যোগ্য স্থাবর সম্পদ অবশ্যই বণ্টন যোগ্য হতে হবে। অতএব, যদি তা বণ্টন করা না যায়, তাহলে তার বিষয়ে শুফআহ দাবি করা যাবে না। যেমন- ছেটো গোসলখানা, কৃপ, রাস্তা ইত্যাদি।

৭. ﴿الشَّفَاعَة﴾ বা অগ্রক্রয় অধিকার দাবি করতে হবে তখনই যখন সে বিক্রয়ের বিষয়টি জানতে পারবে। অতএব, যদি সে তখন দাবি না করে, তাহলে দাবি করার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। তবে যদি সে জানতে না পারে অথবা জানার পরেও গ্রহণযোগ্য কোনো ওজরের কারণে (যেমন শুফআহর বিধান না জানা) দাবি না করে, তাহলে সে ﴿الشَّفَاعَة﴾ দাবি করার হকদার থাকবে।

৮. ﴿الشَّفَاعَة﴾ দাবি করা যাবে এমন জমির ক্ষেত্রে যা বণ্টন করা ও সীমানা বির্ধারণ করা হয়নি। আর যেসব জমির মাঝে গাছ রোপন অথবা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে, সেগুলো ও বণ্টন করা হয়নি জমি হিসাবেই গণ্য হবে। কিন্তু যদি বণ্টন করা হয়ে যায় আর কিছু অংশীদারিত্বমূলক উপকার নেওয়ার মতো বস্তু প্রতিবেশীদের সাথে মালিকানা অবস্থায় থেকে যায়, যেমন রাস্তা, পানির উৎস ইত্যাদি। তাহলে আলেমদের দুটি মতের বিশেষ মত হলো শুফআহ-এর দাবি থেকে যাবে।

৯. ﴿الشَّفَاعَة﴾ বা অগ্রক্রয় অধিকার দাবিকারীকে অবশ্যই বিক্রিত বস্তুর পুরাটাই নিতে হবে। সুতরাং সে এক অংশ নিবে আরেক অংশ নিবে না, তাহলে তার জন্য ﴿الشَّفَاعَة﴾ এর হক সাব্যস্ত হবে না। কারণ এতে বিক্রেতার কষ্ট হবে।

الْمَسْأَلَةُ التَّالِيَةُ: فِي أَحْكَامِ الْجَوَارِ তৃতীয় মাসআলা: প্রতিবেশী বিষয়ক বিধিবিধান

এক প্রতিবেশীর অপর প্রতিবেশির উপর হক রয়েছে। নাবী ﷺ কে প্রতিবেশির ব্যপারে অনেক অসীয়ত করা হয়েছে। এমন কি তাঁর কাছে মনে হয়েছে যে, প্রতিবেশীকে মহান আল্লাহ তার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন।

সুতরাং কোনো প্রতিবেশির যদি অন্য প্রতিবেশির কাছে প্রয়োজন হয়। যেমন ক্ষেতে পানি দেওয়া অথবা তার মালিকানাধীন কোনো জায়গা অতিক্রম করা ইত্যাদি কোনো বিষয়ে। তাহলে প্রতিবেশির উপর দায়িত্ব হলো তার প্রয়োজন মেটানো। চাই কোনো কিছুর বিনিময়ে হোক কিংবা বিনিময় ছাড়াই হোক।

কোনো প্রতিবেশির জন্য বৈধ নয় যে, সে তার মালিকানাধীন জমিতে এমন কিছু করবে যা তার অপর প্রতিবেশির ক্ষতির কারণ হবে। যেমন কেউ এমন জায়গায় একটি জানালা খুলল যা দিয়ে তার প্রতিবেশির বাড়িতে বৃষ্টি পড়ে। অথবা এমন জায়গায় একটি কারখানা বানাল যার আওয়াজে তার প্রতিবেশির কষ্ট হয়। মোট কথা এমন কিছু করা যাবে না যাতে তার প্রতিবেশির কষ্ট হয়।

যদি দুই প্রতিবেশির মাঝে উভয়ের মালিকানাধীন একটি দেয়াল থাকে তাহলে তাতে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করা যাবে না এবং তার উপর বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কোনো কিছু রাখাও যাবে না। যেমন কেউ বাড়ির ছাদ দেওয়ার জন্য তার উপর কাষ্ট রাখলো। তাহলে যেন তাকে কাষ্ট রাখা থেকে নিষেধ না করা হয়। কেননা নাবী  বলেন:

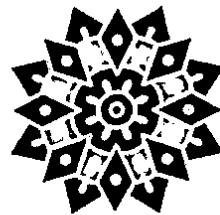
لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَةً أَنْ يَغْرِزَ حَسَبَةً فِي جَدَارِهِ

“কোনো প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেয়ালে খুঁটি পুঁততে নিষেধ না করে।”^{৭১৬}

المسألة الرابعة: في الطرقات

চতুর্থ মাসআলা: রাস্তা সম্পর্কে আলোচনা

১. মুসলমানদের চলাচলের রাস্তা সংকীর্ণ করে দেওয়া বৈধ নয়।
২. নিজের মালিকানাধীন জমিনে এমন কিছু করা যাবে না যা রাস্তাকে সংকীর্ণ করে দেয়।
৩. মানুষের চলাচলের রাস্তায় বাহন বা গাড়ি রাখার জায়গা বানানো যাবে না।
৪. রাস্তার বিষয়ে সবার অধিকার থাকে। অতএব পথচারিদের ক্ষতি করে এমন সবকিছু থেকে রাস্তাকে হেফাজত করা আবশ্যিক। কোনোভাবেই রাস্তায় ময়লা আবর্জনা রাখা ঠিক হবে না। তাছাড়াও রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করাটা ঈমানের অন্যতম একটি অঙ্গ।



الباب الرابع عشر: الوديعة والاتلافات চতুর্দশ অনুচ্ছেদ : আমানত রাখা এবং তা নষ্ট করা

এই বিষয়ে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المَسْأَلَةُ أُولَىٰ: تَعْرِيفُهَا وَأَدْلَةُ مَشْرُوعِيهَا

প্রথম মাসআলা: তার পরিচয় এবং তা শরীয়ত সম্মত হওয়ার প্রমাণ

১. الوديعة বা আমানত বলা হয়: কোনো জিনিস তার মালিক অথবা তার প্রতিনিধি কর্তৃক এমন কারো কাছে রেখে দেওয়া, যে তা কোনো ধরনের বিনিময় ছাড়াই সংরক্ষণ করবে।
২. شرীয়ত سম্মত হওয়ার দলীল: এর মূল হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী:

﴿فَلِيُؤْدِيَ الَّذِي أَرْتَمَنَ أَمَانَةً﴾

“যাকে বিশ্বাস করা হয়েছে তার উচিত আমানত ফিরিয়ে দেওয়া।” [সূরা বাক্সারা : ২৮৩]

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করছেন, আমানতের জিনিস ইকদারকে অর্পণ করো।”

[সূরা নিসা : ৫৮]

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

﴿أَذْ أَلْمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ اتَّسَمَّنَكَ، وَلَا تَخْنُونَ مَنْ خَائَكَ﴾

“কেউ তোমার কাছে আমানত রাখলে তাকে তা ফেরত দাও। যে তোমার সাথে খিয়ানত করে, তুমি তার সাথে খিয়ানত করো না।”^{১১৭}

^{১১৭} سুনান আবু দাউদ, হা. ৩৫৩৫; তিরমিয়ী, হা. ১২৬৪; শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, ইরওয়া ৫/৩৮১।

কেন্দ্র মানুষ তার বিভিন্ন প্রয়োজনেই অন্যের কাছে আমনত রেখে থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তির আমনত রক্ষা করার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস আছে, তার জন্য মুস্তাহাব হলো আমনত গ্রহণ করা। কারণ আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

وَاللّٰهُ فِي عَوْنٰى الْعَبْدٌ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنٰى أَجِيَّهُ

“বান্দাদের মধ্যে যে তার ভাইয়ের সহযোগিতা করবে, আল্লাহ সেই বান্দাকে সাহায্য করবেন।”^{৭১৮}

আর যদি কেউ নিজের ব্যাপারে এটা জানতে পারে যে, সে আমনত রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে তার জন্য কারো আমনত গ্রহণ করা বৈধ নয়।

مَسْأَلَةُ الثَّانِيَةِ: شَرْطٌ صَحْتَهَا

ত্বরীয় মাসআলা : আমনত সঠিক হওয়ার শর্ত

আমনত রক্ষাকারীকে লেনদেনের উপযুক্ত হতে হবে। অতএব লেনদেনের উপযুক্ত কোনো ব্যক্তি যদি শিশু, পাগল কিংবা নির্বোধ ব্যক্তির কাছে আমনত রাখে, অতঃপর সে তা নষ্ট করে ফেলে, তাহলে এর জন্য সে দায়ী থাকবে না।

পক্ষান্তরে যদি শিশু কিংবা এই শ্রেণির লোকেরা অন্য কোনো লেনদেনের উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে আমনত রাখে, আর সেই উপযুক্ত ব্যক্তি তা নষ্ট করে ফেলে, তাহলে এই জন্য সে জিম্মাদার হবে।

مَسْأَلَةُ الثَّالِثَةِ: فِي الْأَحْكَامِ الْمُتَعْلِقَةِ بِالْوَدِيعَةِ

ত্বরীয় মাসআলা : আমনতের সাথে সম্পৃক্ত বিধান

১. আমনতটা আমনত রক্ষাকারীর হাতে আমনত হিসেবেই থাকবে। যদি না সে কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘন করে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

لَا ضَمَانٌ عَلَىٰ مُؤْمِنٍ

“আমনত রক্ষাকারীর উপর কোনো জিম্মাদারিত্ব নেই।”^{৭১৯}

^{৭১৮} ”সহীহ মুসলিম, হ্য. ফুআ, ২৬৯৯।

^{৭১৯} দায়াকুর্দী, হ্য. ৪১১৩, মাশা, ২৯৬১; বাযহাকুরী ৬/২৮৯; ইমাম আলবানী হাসান বলেছেন, ইরওয়া ১৫৪৭।

২. যদি কেউ আমানতের বিষয়ে সীমালজ্বন করে। কিংবা তা রক্ষা করতে গিয়ে বাড়াবড়ি করে। আর এর ফলে তা নষ্ট হয়ে যায়। তাহলে সে তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে জিম্মাদার হবে। কারণ সে তখন হবে অন্যের সম্পদ নষ্টকারী।

৩. যার কাছে আমানত রাখা হয় তার উপর আবশ্যক হলো আমানতকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা। আল্লাহ তা'আলা আমানতকে তার মালিকের কাছে পৌছে দিতে আদেশ করেছেন। আর এটি তখনই সম্ভব যখন আমানতদার তা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করবে। যথাযথভাবে আমানত পৌছে দেওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্যই হলো তা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা। আমানতদার এটি করতে বাধ্য। যদি সে তা না করে তাহলে সে তার আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করল না।

৪. আমানত গ্রহণকারী ব্যক্তির জন্য বৈধ আছে, সেই আমানতের জিনিসটি এমন কারো কাছে দিবে যে স্বাভাবিকভাবে তা সংরক্ষণ করবে। যেমন তার স্ত্রী, দাস, প্রহরী, খাদেম। যদি তা এদের হাতে কোনো ধরনের সীমালজ্বন ছাড়াই নষ্ট হয়, তার জিম্মাদারীর ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে না।

৫. অন্যের নিকট কোনো ওজর ব্যতীত আমানতের জিনিসটি দেওয়া জায়েজ নয়। কিন্তু যদি ওজর থাকে, যেমন সফর, মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে তখন বৈধ। যদি ওজরের কারণে অন্যের কাছে দেয় এবং সে তা নষ্ট করে ফেলে, তাহলে এতে জিম্মাদারী নেই। আর যদি ওজর ছাড়া হয়, তাহলে এতে তার বাড়াবড়ি ও সীমালজ্বনের জন্য জিম্মাদার হবে।

৬. যখন আমানত গ্রহণকারী ব্যক্তি আমানতের জিনিসের ব্যাপারে ভীত সন্ত্রস্ত হবে অথবা সফরের ইচ্ছা করবে তখন তার জন্য আবশ্যক অন্যের নিকট তা ফিরিয়ে দেওয়া। যদি কাউকে না পায় তাহলে সে তা সফরে নিয়ে যাবে, যদি এটা বেশি সংরক্ষিত মনে হয় নয়তোবা বিচারকের কাছে দিবে। যদি সম্ভব না হয় তাহলে যাকে বিশ্বাস যোগ্য মনে হয় তাকে দিবে। কারণ নাবী ﷺ মদিনায় হিজরত করার পূর্বে সমস্ত আমানতের সম্পদ উষ্মে আয়মান ﷺ এর নিকট রেখে যান এবং আলী ﷺ কে সেগুলো প্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ দেন।^{১০} যদি যদি বিচারককে দেওয়া সম্ভব না হয় এবং বিশ্বাসযোগ্য কাউকে না পায়, আর সে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়, এমতাবস্থায় তার নিকট আমানত রাখা জিনিস থাকে, তা মালিকের নিকট ফিরিয়ে দিবে।

৭. যদি আমানত রাখা বস্তুটি চতুর্পদ জন্ম হয় তাহলে আমানতদার ব্যক্তি পশুকে ঘাস খাওয়াবে। যদি এতে অমনোযোগী হয় এবং তা মরে যায় তাহলে সে তার জিম্মাদার হবে। এর জন্য গুনাহগার হবে। কারণ প্রত্যেককে খাবার দিয়ে তাদের কলিজা ঠাণ্ডা করায় সওয়াব আছে।

^{১০} বায়হতুকী ৬/২৮৯; ইআহব, ইরওয়াউল গালীল ৫/৩৮৪।

৮. বিশ্বস্ত আমানত গ্রহণকারী যখন দাবি করবে যে, সে আমানত তার মালিকের নিকট অথবা মালিকের স্থলাভিষিক্ত কোনো ব্যক্তির নিকট ফিরিয়ে দিয়েছে, তবে তার কথা গ্রহণ করা হবে। যদি সে শপথ করে দাবি করে যে, তার পক্ষ থেকে কোনো ধরনের সীমালজ্বন ও বাড়াবাড়ি করা হয়নি, তবুও তা নষ্ট হয়ে গেছে, তাহলে তার কথা গ্রহণ করা হবে। যখন মালিক তার আমানত ফেরত চাইবে, সে কোনো ধরনের দেরি করা ছাড়াই তা দিয়ে দিবে। যদি কারণবশত দেরি করে আর তা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সে তার জামিনদার হবে।

৯. আমানত রাখার আধুনিক কিছু পদ্ধতি:

ব্যাংকিং আমানত: কোনো ব্যক্তি ব্যাংকে নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য টাকা জমা রাখল। এ টাকা দিয়ে ব্যাংক লেনদেন করে এবং তার মালিককে লভ্যাংশ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দেয়। আর এই টাকা ব্যাংকের কাছে ঝগের টাকা হিসাবে থাকে। ব্যাংক জিম্মাদার হিসেবে এই টাকার মালিক হয়। এই চুক্তিতে আবক্ষ হয় যে মালিক যখনই সেই টাকা ফেরত চাইবে, তখন তাকে মূল টাকা পুরোটাই ফেরত দিবে। এই পদ্ধতিটা হলো সুদ। সুতরাং মুসলমানদেরকে এধরনের আমানত রাখা থেকে সতর্ক থাকতে হবে। [লভ্যাংশ অনির্দিষ্ট এবং লাভ-ক্ষতি থাকলে সেটা ভিন্ন মাসআলা-অনু.]

আর যেসব আমানত রাখার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের লাভ আসে না। যেমন সেভিংস একাউন্টের ক্ষেত্রে, তাতে কোনো সমস্যা নেই। যেহেতু মালিক এখানে তার মূল অর্থের অতিরিক্ত লাভ নিচ্ছে না। কিন্তু যদি কাউকে এ ধরনের লাভ নিতে বাধ্য করা হয় এবং লাভ না নেওয়ার কারণে ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তাহলে সে লাভ নিবে এবং তা মুসলমানদের জন্য কল্যাণমূলক কাজে খরচ করবে।

الرابعة: تلافات চতুর্থ মাসআলা: খৎস বা নষ্ট করা

মানুষের সম্পদের উপর বাড়াবাড়ি করা হারাম এবং তা অন্যায়ভাবে গ্রহণ করাও হারাম। যে অন্যায়ভাবে গ্রহণ করে নষ্ট করবে, সে তার জামিনদার হবে। এমনিভাবে যে অন্যের সম্পদ নষ্ট করার কোনো কারণ বানাবে, সেও জিম্মাদার হবে।

যদি তার চতুর্থ জন্ত থাকে, তাহলে রাতে তাকে হেফাজত করতে হবে, যাতে মানুষের খেত খামার নষ্ট না করে। যদি সে এতে অমনোযোগী হয় এবং তা নষ্ট করে, তাহলে সে তার জামিন হবে। কারণ আল্লাহর রসূল ﷺ দিনে মানুষের সম্পদ হেফাজত করার ফয়সালা দেন এবং রাতে পশুর মালিককে তা হেফাজতের নির্দেশ দেন। সুতরাং যদি রাতে কারো পশু অন্যের সম্পদ নষ্ট করে তাহলে পশুর মালিক এর জিম্মাদার হবে। কারণ মুসলমানদের জান-মাল হলো নিরাপত্তার বিষয়। এই ক্ষেত্রে সীমালজ্বন করা বা সীমালজ্বনের কোনো কারণ সৃষ্টি করা সবই হারাম।

الصَّابِلُ هُلُوْ إِمَنْ مَانُوشْ বা প্রাণী, যে নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে নিরূপায় হয়ে অন্যকে হত্যা করে ফেলে। যদি কেউ একাপ করে ফেলে তাহলে এর জন্য সে কোনো ধরনের দায়ভার বহন করবে না। কারণ সে আত্মরক্ষার্থে একাপ করেছে।^{৭১} নাবী ﷺ বলেন:

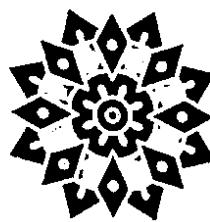
مَنْ أَرِيدَ مَالَهُ بِغْيَرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقْتَلَ فَهُوَ شَهِيدٌ

“জোরপূর্বক কোনো লোকের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিতে চায়, সে যদি এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে, তবে শহীদ হিসাব গণ্য হবে।”^{৭২}

পক্ষান্তরে যদি কোনো ব্যক্তি এমন সব জিনিস নষ্ট করে যা মহান আল্লাহ হারাম করেছেন। যেমন- অনর্থক খেলনার বস্তু, ক্রশ, মদের পাত্র, পথভ্রষ্টকারী ও বেদআতী বই-পুস্তক, খারাপ, মন্দ ও অশ্লীল সিডি রেকর্ড ইত্যাদি নষ্ট করে ফেলে, তাহলে সে এর জন্য জামিনদার হবে না। তবে অবশ্যই এধরনের কাজ বিচারকের আদেশ ও তত্ত্বাবধায়নে হতে হবে। যাতে কোনো ধরনের ফেতনা-ফাসাদ না হয়ে কাজটি কল্যাণকর হিসেবে সাব্যস্ত হয়।

^{৭১} الصَّابِلُ مَنْ إِلَّا إِنْسَانٌ বা মানুষের প্রতি অত্যাচারী: যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় বা স্বভাবগত অন্যের উপর আক্রমণ করে তার জীবন, সম্মান অথবা সম্পদ ছিনিয়ে নিতে চায়।

^{৭২} তিরিমিয়ি, হা. ১৪২০ এবং তিনি হাসান সহীহ বলেছেন। ইবনু মাজাহ, হা. ২৫৮২; ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহত তিরিমিয়ি, হা. ১১৪৭।



الباب الخامس عشر: في الغصب পঞ্চদশ অনুচ্ছেদ: জ্যোরপূর্বক কিছু নেওয়া

এই অনুচ্ছেদে দুটি মাসআলা রয়েছে:

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: تَعْرِيفُهُ وَحُكْمُهُ প্রথম মাসআলা: তার পরিচয় ও হুকুম

১. পরিচয়: এর শাব্দিক অর্থ: কোনো জিনিস অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেওয়া।

পারিভাষিক অর্থ: অন্যের অধিকারের উপর অন্যায় এবং শক্ততাবশত অন্যায়ভাবে প্রভাব বিস্তার করা।

২. তার হুকুম: এটা সবার ঐকমত্যে হারাম। আল্লাহর বাণী:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْتَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“তোমরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের ধন-সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।” [সূরা বাকুরাহ: ১৮৮]

لَا يَمْلِئُ مَالُ امْرِيٍّ مُسْلِمٌ إِلَّا بِطِيبٍ نَفْسِهِ

“কোনো মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ তার সন্তুষ্টি ব্যতীত বৈধ নয়।”^{৭২৩}

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন:

مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طَوْفَةُ اللَّهِ إِيَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

“যে ব্যক্তি এক বিঘত জমি অন্যায়ভাবে নিয়ে নেয়, কিয়ামতের দিন সাত জমি তার গলায় লটকিয়ে দেওয়া হবে।”^{৭২৪}

সুতরাং যদি কারো উপর অন্যায় হয়ে থাকে তাহলে তার উচিত হলো, আল্লাহর নিকট তাওবা করা এবং তার ভাইয়ের সাথে সমরোতা করা ও তার থেকে দুনিয়াতে মাফ চাওয়া। নাবী ﷺ বলেন:

^{৭২৩} আহমাদ ৫/৭২; দারাকুত্বী ৩/২৬; ইয়াম আলবানী সহীহ বলেছেন, ইরওয়া ১৪৫৯।

^{৭২৪} সহীহ বুখারী, হা. ২৪৫৩-৫২; সহীহ মুলিম, হা. ফুআ. ১৬১০।

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لَا يَخِيِّهُ مِنْ عَزْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلَيَتَحَلَّهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخْدَى مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخْدَى مِنْ سَيِّئَاتٍ صَاحِبِهِ فَعُحِيلَ عَلَيْهِ

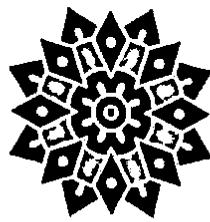
“যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মানহানি বা অন্য কোনো যুলুমের জন্য দায়ী থাকে, সে যেন আজই (ক্রেতই) তার কাছ হতে মাফ করিয়ে নেয়। সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন তার কোনো দিনার বা দিরহাম থাকবে না। সেই দিন তার কোনো সৎকর্ম না থাকলে তার যুলুমের পরিমাণ তা তার নিকট হতে নেওয়া হবে। আর তার কোনো সৎকর্ম না থাকলে তার প্রতিপক্ষের পাপ হতে নিয়ে তা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।”^{১২৫}

المَسَأَةُ الثَّانِيَةُ : فِي الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْغَصْبِ

ঘৃতীয় মাসআলা: এর সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াবলি

১. দখলকারীর উপর দখলকৃত জিনিস স্বত্ত্বাধার্য ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যিক। যদি সে তা নষ্ট করে ফেলে, তাহলে তার বদলা দিবে।
২. দখলকারী ব্যক্তির উপর আবশ্যিক দলখকৃত জিনিস বৃক্ষি করে ফিরিয়ে দেওয়া। তা একত্রিত বা পৃথক অবস্থায় হোক।
৩. যদি দখলকারী ব্যক্তি দলখকৃত জিনিসে কোনো বাড়ি নির্মাণ করে বা গাছ লাগায় তখন তার মালিকের আদেশে সেটি একে বারে ওঠিয়ে ফেলতে হবে।
৪. দখল করা জিনিস যদি পরিবর্তন হয়ে যায় অথবা কমে যায় কিংবা সম্ভা হয়ে যায়, তাহলে দখলকারী ব্যক্তি এর ক্ষতিপূরণ দিবে।
৫. অন্যায়ভাবে এই দখল কখনো ঝগড়া অথবা মিথ্যা শপথের মাধ্যমে হয়ে থাকে।
৬. দলখকারীর সর্বপ্রকার লেনদেন বাতিল হিসেবে গণ্য হবে। যতক্ষণ না তার মালিক অনুমতি দিবে।

^{১২৫} সহীহ বুখারী, খ. ২৪৪৯।



الباب السادس عشر: في الصلح ঘোড়শ অনুচ্ছেদ : সম্মত

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: مَعْنَاهُ، وَأَدْلَةُ مَشْرُوعِيَّتِهِ

প্রথম মাসআলা: তার অর্থ এবং তা শরীয়ত সম্মত হওয়ার প্রমাণ

১. তার অর্থ: শাব্দিক অর্থ: থামিয়ে দেওয়া অর্থাৎ ঝগড়া-বিবাদ বিচ্ছিন্ন করা।

পারিভাষিক অর্থ: এমন চুক্তি যার মাধ্যমে দুই ঝগড়াকারীদের মাঝের ঝগড়া দূর করা হয়।

২. শরীয়ত সম্মত হওয়ার প্রমাণ: এ ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা প্রমাণ করে।

কুরআন থেকে প্রমাণ। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ “মীমাংসাই উত্তম।” [সূরা নিসা : ১২৮]

মহান আল্লাহ আরও বলেন:

﴿وَرَأَنَّ طَالِبَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا﴾

“মুমিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিঙ্গ হলে, তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে।” [সূরা হজরাত: ৯]

মহান আল্লাহ আরও বলেন:

﴿لَا خَيْرٌ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِضْلَاجٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
إِيْتَقَاءً مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسُوفَ تُؤْتَيْهُ أَخْرَى عَظِيمًا﴾

“তাদের গোপন পরামর্শের অধিকাংশে কোনো কল্যাণ নেই। তবে (কল্যাণ আছে) যে নির্দেশ দেয় সাদকা কিংবা ভালো কাজ অথবা মানুষের মধ্যে মীমাংসার। আর যে তা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করবে তবে অচিরেই আমি তাকে মহাপুরুষার দান করব।” [সুরা নিসা : ১১৪] হাদীস থেকে প্রমাণ। নাবী ﷺ বলেন:

الصلحُ جائزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَمَ حَلَالًا

“মুসলিমদের পরম্পরের মাঝে মীমাংস করা বৈধ। তবে এমন বিষয়ে মীমাংসা বৈধ নয়, যা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করে।”^{১২৬}

নাবী ﷺ মানুষের মাঝে সন্ধি চুক্তি করতেন। আলেমগণ একমত যে, মানুষের মাঝে সন্ধি করা, যার উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি, তারপর যাদের মাঝে সন্ধি হবে তাদের সন্তুষ্টি...

সন্ধি করাটা শরীয়ত সম্মত হওয়ার বিষয়টি কুরআন সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

المسألة الثانية: في أنواع الصلح العامة বিতীয় মাসআলা: সাধারণ সন্ধির প্রকারসমূহ

মানুষের মাঝে সন্ধি করাটা কয়েক প্রকার।

১. স্বামী স্ত্রীর মাঝে ফাটল সৃষ্টি হওয়ার ভয় থাকলে তাদের মাঝে সন্ধি করা। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَإِنْ خَفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعُثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوقِقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾

“আর তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশংকা করলে তোমরা স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত কর; তারা উভয়ের নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।” [সুরা নিসা : ৩৫]

অথবা স্বামী-স্ত্রী যদি এক অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তাদের মাঝে অনগ্রহ সৃষ্টি হয় তাহলে তাদের মাঝে সন্ধি করা। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَإِنْ امْرَأٌ هُوَ حَافِظٌ مِنْ بَعْلِهَا نُشُرًا أَوْ إِغْرِاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾

“যদি কোনো নারী তার স্বামীর পক্ষ থেকে কোনো দুর্ব্যবহার অথবা উপেক্ষার আশঙ্কা করে, তারা উভয়ে কোনো মীমাংসা করলে তাদের কোনো অপরাধ নেই। সন্ধি কল্যাণকর।” [সুরা নিসা : ১২৮]

^{১২৬} সুনান আবু দাউদ, হা. ৩৫৯৪; তিরমিয়ী, হা. ১৩৫২ এবং তিনি হাসান সহীহ বলেছেন; ইবনু মাজাহ, হা. ২৩৫২; শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহ ইবনে মাজাহ, হা. ১৯০৫।

২. মুসলিমদের মাঝে যুদ্ধরত দুই দল এর মাঝে সঞ্চি করা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَإِنَّ طَاغِيَتَنِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾

“মুমিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে, তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে।” [সুরা হজরাত: ৯]

৩. মুসলিম এবং যুদ্ধরত কাফেরদের মাঝে সঞ্চি করা।

৪. সম্পদ ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে দুই ঝগড়াকারীর মাঝে সঞ্চি করা।

৫. সম্পদ নিয়ে ঝগড়াকারীদের মাঝে সঞ্চি করা। এটাই আলোচনার উদ্দিষ্ট বিষয়। এটা ২ প্রকার।

ক. স্বীকৃতির মাধ্যমে সঞ্চি। এটা আবার ২ প্রকার-

১. بِرَاءَ صَلَحٌ বা শিথিলতার সঞ্চি: তা হচ্ছে- অধিকারের বিষয়ে যাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় তার বিষয়ে সঞ্চি করা। যেমন রাশেদ কারো জন্য ঝণ অথবা কোনো জিনিসের স্বীকৃতি দিলো। তারপর যাকে স্বীকৃতি দেওয়া হলো সে তার প্রতিপক্ষের কাছ থেকে ঐ জিনিসের কিছু ঝণ বা অংশ কমিয়ে দেয় এবং বাকিটা গ্রহণ করে। তাহলে সঞ্চি করার কারণে সে কিছু ঝণ থেকে মুক্তি পাবে। এটা বৈধ। শর্ত হলো- মালিককে স্বেচ্ছা দানের উপযুক্ত হতে হবে। তবে এর জন্য শর্ত নয় যে স্বেচ্ছায় প্রদানের বিষয়টি হকদারকে স্বীকার করে নিতে হবে।

২. صَلَحٌ بِالْمَعْاوضَةِ বা বিনিময় গ্রহণের সঞ্চি: কোনো ব্যক্তি স্বীকার করল যে, সে জিনিস নিয়েছে। কিন্তু সঞ্চির মাধ্যমে ঠিক হলো যে, সে যা নিয়েছিল তা দিতে পারবে না। বরং অন্য কোনো জিনিস দিবে। যেমন- কেউ স্বীকার করল যে, তার কাছে অমুক ব্যক্তি ঝণ পায় অথবা এই জিনিসটি পায়। কিন্তু তারা সঞ্চি করল যে, পাওনাদার তার কাছ থেকে এর বিনিময় নিবে। সেই বস্তুটি নিবে না। যদি তারা এরূপ করে তা হবে ক্রয়-বিক্রয়ের হকুমে। পক্ষান্তরে যদি পাওনা বস্তু না নিয়ে শুধু তার থেকে লাভ নেয়, তাহলে তা হবে জরুরী বা ভাড়া দেওয়ার হকুমে।

৩. نَكَارٌ الصَّلَحٌ معَ الْأَسْبَابِ অস্বীকৃতির মাধ্যমে সঞ্চি: কোনো ব্যক্তি এই দাবি করল যে, সে অমুক ব্যক্তির কাছে একটি জিনিস পায় অথবা কিছু ঝণ পায়। কিন্তু যার ব্যাপারে এরূপ দাবি করা হয়েছে সে তা অস্বীকার করল অথবা তার জানা না থাকার কারণে চুপ থাকলো, তারপর দাবিকারী ব্যক্তি তার দাবির বিষয়ে নগদ অথবা বাকিতে কিছু সম্পদ নেওয়ার বিনিময়ে সঞ্চি করল। তাহলে এই অবস্থায় সঞ্চি করাটা ঠিক হবে। যদিও বিবাদী প্রতিপক্ষের দাবি সঠিক না হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। তারপরেও সে তাকে সম্পদ দিয়ে দেয় নিজের থেকে বিবাদ দ্বার করার জন্য এবং শপথের কাফ্ফারা দেওয়ার জন্য। এই অবস্থায় যদি বাদি তার দাবি সঠিক হওয়ার বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে তাহলে সে তার হকের বিনিময়ে সম্পদ নিয়ে নিবে।

المسألة الثالثة: في الأحكام المتعلقة بالصلح তৃতীয় মাসআলা: সঞ্চির সাথে সম্পত্তি হকুম

১. অনিদিষ্ট হকের ক্ষেত্রে সঞ্চি করা যায়। এই সঞ্চি করা যাবে যখন নির্দিষ্ট জানা স্তর না হবে। চাই সেটি খণ্ড হোক অথবা অন্য কোনো বস্তু হোক। যেমন দুজন ব্যক্তির মাঝে দীর্ঘ দিনের লেনদেনের হিসাব আছে। কিন্তু তাদের কেউ জানে না, একে অপরের কাছে কি পরিমাণ সম্পদ পায়।
২. সঞ্চি করা যাবে কেবল এমন সব বিষয়ে যেসব বিষয়ে বিনিময় গ্রহণ করা স্তর। যেমন- শরীয়ত নির্ধারিত কিসাসের দিয়াত নেওয়ার মাধ্যমে। দিয়াতের পরিমাণটা কম হোক অথবা বেশি হোক।
৩. এমন সব বিষয়ে সঞ্চি করা বৈধ নয় যেসব বিষয়ে বিনিময় গ্রহণ করা যায় না। যেমন- শরীয়ত নির্ধারিত হন্দের ক্ষেত্রে। কেননা তা শরীয়ত সম্মত করাই হয়েছে অপরাধীকে শাসন করার জন্য।



الباب السابع عشر: المسابقة সপ্তদশ অনুচ্ছেদ: প্রতিযোগিতা

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المُسَائِلَةُ الْأُولَى: مَعْنَاهَا، وَحُكْمُهَا
প্রথম মাসআলা: তার অর্থ ও হুকুম

১. এর অর্থ: তথা আগে বাড়ানো। অর্থাৎ ঘোড়া, উট এবং নিক্ষেপ করার মতো কোনো বিষয়ে একে অপরের সাথে বাজি রেখে প্রতিযোগিতা করা। তারপর যে আগে বাড়াবে বা প্রথম হবে সেই পুরুষকার গ্রহণ করবে।

المسابقة هي المُجَارَةُ بَيْنَ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ.

“প্রতিযোগিতা হচ্ছে প্রাণী এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে দৌড় প্রতিযোগিতা করা।”

وَالْمُنَاضِلَةُ وَالِبِضَالُ: المُسَائِلَةُ بِالرَّمِيِّ بِالسَّهَامِ وَنَحْوُهَا

“প্রতিবন্ধিতা ও লড়াই হচ্ছে তীর নিক্ষেপ জাতীয় জিনিসের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করা।”

২. তার হুকুম ও দলীল:

প্রতিযোগিতা করা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার মাধ্যমে বৈধ।

কুরআনের দলীল: মহান আল্লাহ বলেন:

وَأَعْدَوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعُتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

“তোমরা কাফেরদের মোকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি প্রস্তুত রাখবে।” [সূরা আনফাল : ৬০]

সুন্নাহ থেকে দলীল: ইবনু উমার رض বর্ণনা করেন।

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ "مِنَ الْحَقِيقَاءِ إِلَى ثَنَيَّةِ الْوَدَاعِ" وَوَبَينَ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنْهَا
مِنْ ثَنَيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مسجدِ بْنِي زَرِيقٍ.

“নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়ার জন্য হাফ্যা থেকে সানিয়্যাতুল ওয়াদা পর্যন্ত এবং প্রশিক্ষণবিহীন ঘোড়ার জন্য সানিয়্যাতুল ওয়াদা থেকে বালু যুরায়কের মাসজিদ পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন।”^{১২৮}

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন:

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ

“উটের দৌড় বা ঘোড় দৌড় অথবা তীর নিক্ষেপ ছাড়া অন্য কোনো প্রতিযোগিতা বৈধ নয়।”^{১২৯}

উট : ফলাবিশিষ্ট তীর ; الحافر : ঘোড়া ; النصل : الخف ;

মুসলিমগণ সার্বিকভাবে প্রতিযোগিতা করা জায়েয় হওয়ার ব্যপারে একমত হয়েছেন।

المسألة الثانية: أحكام المتعلقة بها الثانية: مسائل متعلقة بها

দ্বিতীয় মাসআলা: তার সাথে সম্পৃক্ত বিধিবিধান

১. ঘোড়া বা এ জাতীয় চতুর্পদ প্রাণী, বাহন, পায়ে দৌড় দিয়ে, অনুরূপ তীর নিক্ষেপ করে এবং অন্ত ব্যবহার করে প্রতিযোগিতা করা বৈধ।

২. উট, ঘোড়া ও তীর দিয়ে প্রতিযোগিতা করে বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ। যেমন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ

“উটের দৌড় বা ঘোড়ার দৌড় অথবা তীর নিক্ষেপ ছাড়া অন্য কোনো প্রতিযোগিতা বৈধ নয়।”^{১৩০}

৩. যে সব বিষয়ে শরীয়তের কল্যাণ রয়েছে। যেমন- জিহাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, ইলমি মাসআলা নিয়ে গবেষণা করা ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা বৈধ এবং এই প্রতিযোগিতা করে বিনিময় গ্রহণ করাও জায়েয়।

^{১২৭} تضمير الخيل: هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمى، ثم لا تلف إلا قوياً للخف، ويكون تضمير الخيل للغزو أو المسابق

^{১২৮} مুস্তাফাকুল আলাইহি: সহীহল বুখারী, হ্য. ২৮৬৮ ও সহীহ মুসলিম, হ্য. ফুআ. ১৮৭০।

^{১২৯} সুনান আবু দাউদ, হ্য. ২৫৭৪।

^{১৩০} সুনান আবু দাউদ, হ্য. ২৫৭৪।

৪. যে সব বিষয়ের মাধ্যমে শুধু সাধারণ খেলা এবং আনন্দ করা হয়ে থাকে, তাতে কোনো ক্ষতির সত্ত্বনা নেই, শরীয়ত তার বৈধতা দিয়েছে। পাশাপাশি এই বিষয়ে প্রতিযোগিতাও করা যায়। তবে শর্ত হলো তা যেন দ্বিনী কোনো বিষয় থেকে বিরত না রাখে। যেমন ফরজ সলাত বা এ জাতীয় কোনো বিষয়। তবে এধরনের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ নয়।
৫. প্রতিযোগীদের প্রত্যেকেই তার প্রতিযোগিতা বাতিল করতে পারবে যতক্ষণ না কেউ বিজয়ী হয়। সুতরাং যখন কেউ বিজয়ী হয়ে যাবে তখন কেবল সেই ব্যক্তিই প্রতিযোগিতা বাতিল করতে পারবে। পরাজিত ব্যক্তি নয়।
৬. দুই প্রতিযোগীর কোনো একজনের অথবা দুই বাহনের কোনো এক বাহনের মৃত্যুর কারণে প্রতিযোগিতা বাতিল হয়ে যাবে।
৭. উপস্থিত ব্যক্তি ও (রেফারীর) খেলা পরিচালনাকারী জন্য কোনো একজনের প্রশংসা ও দোষ বর্ণনা ঠিক নয়।

السؤال الثالث: شروط أخذ العوض في المسابقة

তৃতীয় মাসআলা: এর ক্ষেত্রে বিনিময় নেওয়ার শর্ত

১. তীর প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নিশ্চিপ্ত স্থান নির্দিষ্ট থাকবে অথবা বাহনের ক্ষেত্রে ঘোড়া নির্দিষ্ট থাকবে। এটা হবে স্বচক্ষে দেখার মাধ্যমে।
২. প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাহন বা ধনুক একই ধরনের হতে হবে। সুতরাং আরবীয় ও অনারবীয় বাহন বা আরবীয় ধনুক ও পারস্যের ধনুক এক সাথে করে প্রতিযোগিতা করা ঠিক হবে না।
৩. সীমানা এবং দূরত্ব নির্দিষ্ট থাকতে হবে। এটা দেখা ও মাপের মাধ্যমে হবে।
৪. বিনিময়টি নির্দিষ্ট ও বৈধ হতে হবে। কারণ এটা হচ্ছে সম্পদের চুক্তি। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বিনিময় জানা থাকা ও বৈধ হওয়া ওয়াজিব যেমন সকল চুক্তির ক্ষেত্রে হয়।
৫. বিনিময় প্রতিযোগী ব্যতীত অন্যদের থেকে হতে হবে। এর মাধ্যমে জুয়ার সাদৃশ্যতা থেবে মুক্ত থাকা যায়। কিন্তু যদি বিনিময় প্রতিযোগীদের থেকে বা তাদের একজন থেকে হয়, তাহলে প্রতিযোগিত বিশুদ্ধ হবে ন।



الباب الثامن عشر: العربية অষ্টাদশ অনুচ্ছেদ : ধার নেওয়া

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: مَعْنَاهَا وَأَدْلَةُ مَشْرُوعِيهَا

প্রথম মাসআলা: ধার-এর অর্থ ও তা শরীয়ত সম্মত হওয়ার প্রমাণ

- অর্থ: عَلَيْهِ حচ্ছে কোনো জিনিসকে অবশিষ্ট রেখেই তার মাধ্যমে বৈধ পত্তায় উপকার নেওয়া।
العربية: হচ্ছে উপকার নেওয়া উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা বস্তি। যেমন কোনো ব্যক্তি ভ্রমন করার উদ্দেশ্যে কাছ থেকে একটি গাড়ি ধার নিলো। তারপর আবার তাকে তা ফিরিয়ে দিলো।
- শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীলসমূহ: শরীয়ত সম্মত ও প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা সার্বজনীনভাবে বলেন: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَنْفَعُونَ﴾
“সৎকাজ করতে ও সংযমী হতে (তাকওয়া অর্জনে) তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করো।”

[সূরা মায়দাহ : ২]

তিনি আরও বলেন: ﴿وَيَمْنَعُونَ النَّاغُونَ﴾

“গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোটো খাটো সাহায্য জিনিস দানে বিরত থাকে।” [সূরা মাউন : ৭]

এই আয়াতে শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন বস্তি যা সাধারণত এক প্রতিবেশী আরেকে প্রতিবেশির কাছ থেকে ধার নিয়ে থাকে। যেমন- পাত্র, ডেক ইত্যাদি। যারা এধরনের সাধারণ জিনিসও তার প্রতিবেশিকে ধার হিসেবে দেয় না, তাদেরকে মহান আল্লাহ তিরক্কার করেছেন।

সুতরাং এখান থেকে বুঝা যায় এসব জিনিস ধার দেওয়া ভালো বা মুশাহাব কাজ। সাফওয়্যান
বিন উমাইয়া رض বর্ণনা করেন।

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَذْرُعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ

“নাবী  ইনাইনের যুক্তি তার থেকে অনেক বর্ম ধার নিয়েছিলেন।”^{৭৩১}

আনাস এই থেকে বর্ণিত আছে-

اشتخار النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسَّا مِنْ أَيِّ طَلْحَةَ

“নাবী  আবু তুলহা থেকে ঘোড়া ধার নিয়েছিলেন।”^{৭৩২}

المُسَأَّلَةُ الثَّانِيَّةُ: شُرُوطُهَا

ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସଅଳା: ଧାର ଏର ଶତସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ

১. ধার দাতা ও ধার গ্রহণকারী উভয়েই শরীয়াত সন্মতভাবে স্বেচ্ছা দানের উপযুক্ত হতে হবে।
আর ধারকৃত জিনিস অবশ্যই ধার দাতার সম্পদ হতে হবে।

২. ধারকৃত বস্তু দ্বারা উপকার নেওয়া বৈধ হতে হবে। সুতরাং গান বা এ জাতীয় কোনো কাজের জন্য কোনো কিছু ধার নেওয়া বৈধ নয়। অনুরূপভাবে পান করার জন্য স্বর্ণ বা রূপার পাত্র ধার নেওয়া বৈধ নয়। এমনিভাবে এমন জিনিস ধার নেওয়া বৈধ নয় যেসব দ্বারা উপকার নেওয়া হারাম।

৩. ধার নেওয়া বস্তুটি এমন হতে হবে, যার মাধ্যমে উপকার নেওয়ার পরেও তা অক্ষত থেকে যায়। কিন্তু যদি তা এমন হয় যা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তা ধার হিসেবে নেওয়া বৈধ হবে না।
যেমন- খাবার বা এ জাতীয় বস্তু।

المسألة الثالثة: بعض الأحكام المتعلقة بها

তৃতীয় মাসআলা: সংশ্লিষ্ট কর্তিপয় বিধানাবলি

୧. ଧାର ପ୍ରତିକାରୀର ଜନ୍ୟ ବୈଧ ନୟ ଧାରକୃତ ଜିନିସ ଅନ୍ୟକାଉକେ ଧାର ଦେଓଯା । କେନନା ଏଠା ତାର ସମ୍ପଦ ନୟ । ଏମନିଭାବେ ଏଠାକେ ବ୍ୟବସାୟ ଖାଟାନୋ ଠିକ ନା । ତବେ ଯଦି ତାର ମାଲିକ ଅନୁମତି ଦେଯ ତାହଲେ ବୈଧ ।

¹⁶³ आहमाद ४/२२२; सुनान आबू दाउद, इ. ३५६३; शाईथ आलबानी सहीह बलेहेन, इराओया नं १५१३।

^{१५४} युद्धामर्ग आलोइटि: सहीतुल बखारी, श. २६२७ ओ सहीह मसलिम, श. फजा, २३०७।।

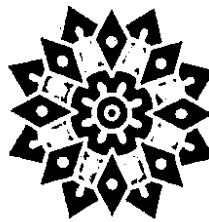
২. ধারকৃত জিনিসটি ধার গ্রহণকারীর হাতে আমানত। তার জন্য ওয়াজিব হচ্ছে তা সংরক্ষণ করা এবং তা অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া। যেভাবে সে তা গ্রহণ করেছে। এতে বাড়াবাড়ি বা সীমালঙ্ঘন করলে সে তার যামীন হবে।

৩. **৩.** বা ধার নেওয়া হলো এমন চুক্তি যা আবশ্যিকীয়ভাবে সংঘটিত হয় না। তাই ধারদাতা যে কোনো সময় তা ফিরিয়ে নিতে পারে যদি ধার গ্রহণকারীর কোনো ক্ষতি না হয়। কিন্তু যদি ধার গ্রহণকারীর কোনো ক্ষতি হয় তাহলে তা কখনোই ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ নয়।

৪. কয়েকটি বিষয়ের মাধ্যমে ধার দেওয়ার চুক্তি বাতিল হবে এবং ধার দেওয়া বস্তি তার মালিকের কাছে ফিরে আসবে। সেগুলো হলো:

- ▶ যখন বস্তির মালিক ধার দেওয়া বস্তি ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি করবে। যদিও তখন পর্যন্ত ধার গ্রহণকারীর উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত না হয়।
- ▶ ধার নেওয়া বস্তির মাধ্যমে উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হলে।
- ▶ ধারের জন্য নির্দিষ্ট সময় থাকলে তা অতিবাহিত হয়ে গেলে।
- ▶ ধার দাতা অথবা ধার গ্রহণকারীর মৃত্যু হলে। কারণ এতে তাদের চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

৫. ধার গ্রহণকারী ধার নেওয়া বস্তি থেকে পরিপূর্ণভাবে উপকার, নিতে পারবে। যেমন: কোনো ব্যক্তি কোনো বস্তি ভাড়া নিলে তা থেকে পরিপূর্ণভাবে উপকার নিতে পারে। সুতরাং ধার নেওয়া বস্তি থেকে সে নিজে এবং যাদের ব্যাপারে সে চাইবে তারাও উপকার নিতে পারবে। কারণ এক্ষেত্রে তার মূল মালিকের অনুমতি রয়েছে।



الباب التاسع عشر: إحياء الموات

উনবিংশ অনুচ্ছেদ : অনাবাদি জমি আবাদি করা

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: فِي مَعْنَاهُ وَحْكَمِهِ

প্রথম মাসআলা: তার অর্থ ও হকুম

১. **المَوَاتُ** এর আভিধানিক অর্থ: যার কোনো আত্মা নেই। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হলো এমন অনাবাদি জমিন যার কোনো মালিক নেই।

পরিভাষায় **হলো-** নির্দিষ্ট ও বিশেষ মালিকানা মুক্ত জমিন। সেটি হতে পারে এমন বিরান ভূমি যার কোনো মালিকানা নির্ধারণ হয়নি এবং তাতে আবাদ করার কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। অথবা তাতে মালিকানা বা আবাদের চিহ্ন থাকলেও তার মালিককে জানা যায়নি।

২. **তার হকুম ও দলীল:** এর মূল হচ্ছে নাবী ﷺ-এর হাদীস:

مَنْ أَخْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

“কেউ কোনো পতিত জমি আবাদ করলে সেটা তারই। অন্যায়ভাবে দখলকারীর পরিশ্রমের কোনো মূল্য নেই।”^{১০০}

হাদীসে হচ্ছে কোনো ব্যক্তি এমন জমিতে আসলো যা অন্য কেউ আবাদ করেছে সে সেখানে গাছ লাগালো অথবা চাষ করল যাতে এটা তার হয়ে যায়।

আবার কখনো জমি জীবিত করাটা মুশ্তাহাব এতে মানুষ ও পশু পাখির উপকার থাকার কারণে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

مَنْ أَخْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَهُ الْعَوَافِي” ফের লে চদ্দে

^{১০০} সুনান আবু দাউদ, হা. ৩০৭৩; তিরমিয়ী, হা. ১৩৭৮; শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, ইরওয়া নং ১৫৫১

“কেউ কোনো পতিত জমি আবাদ করলে সেটার জন্য তার সওয়াব হবে। তা থেকে জীবিকা অঙ্গেষণকারী যা খাবে, সেটা তার জন্য সাদক হবে।”^{৭৩৫}

الْمَسْأَلَةُ التَّانِيَةُ: شَرْوَطُهُ وَمَا يَحْصُلُ بِهِ

দ্বিতীয় মাসআলা: অনাবাদি জমি আবাদি করার শর্ত এবং যেভাবে তা অর্জিত হবে অনাবাদি জমিনকে সঠিকভাবে আবাদি করার দুটি শর্তআছে।

১. সেই জমির উপর কোনো মুসলিম ব্যক্তির মালিকানা থাকতে পারবে না। যদি কোনো মালিকানা থাকে তাহলে শারঙ্গ অনুমোদন ছাড়া তা আবাদ যোগ্য করার জন্য পিছু নেওয়া হারাম।

২. অনাবাদি জমিনকে আবাদকারীকে মুসলিম হতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রে কোনো কাফের অনাবাদি জমিকে আবাদি করতে পারবে না।

অনাবাদি জমিনকে আবাদি করার বিষয়টি অর্জিত হবে কয়েকটি বিষয়ের মাধ্যমে।

১. প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কোনো দেয়ালের মাধ্যমে যদি জমিনকে ঘেরাও করে। যা মানুষেরা সাধারণত করে থাকে তাহলে তা আবাদি করে তুললো বলে ধরে নেওয়া হবে। যেমন: নাবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: **مَنْ أَحَاطَ حَاطِطاً عَلَى أَرْضٍ فَهُوَ إِلَهُ أَرْضٍ**

“কেউ জমির চারপাশে (মালিকানাহীন) বেষ্টনী দিলে, সেটা তারই।”^{৭৩৬}

২. যখন কেউ অনাবাদি জমিতে কৃপ খনন করবে যেখানে পানি জমে থাকবে। তাহলে সে ওই জমিনকে আবাদি করে তুলল। যদি সেই কৃপে পানি না পৌছে তারপরেও সে অন্যের থেকে বেশি হকদার। অনুরূপ কেউ যদি তাতে কোনো নালা খনন করে, তাহলে সেও এর হকদার হবে।

৩. যখন কেউ অনাবাদি জমিনে ঝরনা, নালা ইত্যাদির মাধ্যমে পানি পৌছাবে তখন সে তার জীবিতকারী হিসেবে গণ্য হবে।

৪. যখন কোনো ব্যক্তি এমন কোনো অনাবাদি জমিনকে পরিষ্কার করে গাছ রোপন করবে। যা আগে গাছ রোপনের মতো কোনো যোগ্য জমি ছিল না। তাহলে সে তা জীবিতকারী হিসেবে গণ্য হবে।

৫. আলেমদের মধ্য হতে কেউ বলেন: অনাবাদি জমিনকে আবাদি করার ব্যাপারটি শুধু এই কয়েকটি বিষয়ের মধ্যেই সীমা বদ্ধ নয়, বরং এই ক্ষেত্রে মানুষের সাধারণ রীতিনীতিই বিবেচ হবে। সুতরাং মানুষেরা যে ব্যাপারটি জীবিত করা বলে গণ্য করবে, সেটিই জীবিত বলে গণ্য হবে। আর যেটাকে জীবিত বলে গণ্য করবে না সেটি জীবিত বলে গণ্য হবে না।

^{৭৩৫} যা জীবিকা অঙ্গেষণকারী সকল পশু-পাখিকে বুঝায়।

^{৭৩৬} দারেয়ী, হ্য. ২৬৪৯; আহমাদ, হ্য. ১৪৫০০; ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, ইরওয়া ৪/৬।

^{৭৩৭} সুনান আবু দাউদ, হ্য. ৩০৭৭; সামুরাহ ইবনে জুন্দুব প্রেরণ হতে বর্ণিত। শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, ইরওয়া ১৫৫৪।



الْمَسْأَلَةُ التَّالِيَةُ: بَعْضُ الْحُكُمَ الْمُتَعْلِقَةِ بِ الْعَوْنَى مَاسَّاً: এর সাথে সম্পৃক্ষ কিছু মাসতালা

১. যে ব্যক্তি অনাবাদি জমিনের কোনো অংশ আবাদি করবে সেই তার মালিক হবে। আল্লাহর রসূল ﷺ এর হাদীসের ব্যাপকতার উপর ভিত্তি করে। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

مَنْ أَخْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهُوَ يَرَهُ

“কেউ কোনো পতিত জমি আবাদ করলে সেটা তারই।”^{৭৩৭}

২. আবাদি জমির পাশের জমি অন্য কেউ আবাদ করার মাধ্যমে মালিক হতে পারবে না। কেননা আবাদি জমির মালিক তার পাশের জমির ব্যাপারে বেশি হকদার।

৩. মুসলিম শাসকের এই অধিকার আছে যে, তিনি অনাবাদি জমি আবাদকারী ব্যক্তির থেকে নিয়ে নিতে পারবেন। যেমন এই বিষয়ে ওয়ায়েল ইবনে হজুর ﷺ এর হাদীস রয়েছে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمُوتَ

“নিশ্চয়ই নাবী ﷺ তাকে হায়রা মাওতের এক খণ্ড জমি দিয়েছিলেন।”^{৭৩৮}

৪. যদি প্রয়োজন হয় এবং তাতে মুসলমানদের কোনো ক্ষতি বা সংক্রিংতা তৈরি না হয় তাহলে মুসলিম শাসকের এই অধিকার আছে যে, তিনি সদাকার উট ও মুজাহিদদের ঘোড়ার জন্য অনাবাদি জমিনকে ঘাস রোপনের জন্য রেখে দিবেন। আর এই অধিকার শুধু মুসলিম শাসকেরই আছে। অন্য কারো নেই। আর এটিকে শরীয়ত সম্মত করা হয়েছে ব্যাপক কল্যাণের জন্য। ছ'ব ইবনে জাসসামা ﷺ থেকে মারফু হাদীস রয়েছে-

لَا حَمْيَ إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ

“চারণভূমি আল্লাহ ও তাঁর রসূল ব্যক্তিত সংরক্ষণের অধিকার কারো নেই।”^{৭৩৯}

এর অর্থ হলো তাকে আড়াল করল, ঘেরাও করল। যার কাছে কিছু আসতে পারে না।

^{৭৩৭} সুনান আবু দাউদ, হ্য. ৩০৭৩; তিরমিয়ী, হ্য. ১৩৭৮; শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, ইরওয়া নং ১৫৫১।

^{৭৩৮} তিরমিয়ী, হ্য. ১৩৮১ এবং তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহ সুনানুত তিরমিয়ী, হ্য. ১১৬।

^{৭৩৯} সহীহস বুখারী, হ্য. ২৩৭০।



الباب العشرون : الجعالة বিংশ অনুচ্ছেদ : মজুরী, পারিশ্রমিক

এতে দুটি মাসআলা রয়েছে:

المَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: مَعْنَاهَا وَحُكْمُهَا প্রথম মাসআলা: তার অর্থ ও হুকুম

১. বলা হয় কর্তাকে নির্দিষ্টভাবে না দেখে নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা। যেমন কেউ বলল, যে আমার এই হারানো গাড়ি পাবে তার জন্য ১ হাজার রিয়াল।

২. তার হুকুম ও দলীল: এটা শরীয়তে বৈধ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত। এই বিষয়টি প্রমাণ করে মহান আল্লাহর বাণী, তিনি বলেন:

﴿وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ رَعِيمٌ﴾

“যে সেটা এনে দিবে, সে এক উট বোঝাই সম্পদ পাবে এবং আমি সেটার জামিনদার।” সূরা ইউসুফ: ৭৪

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرُوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَأَسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ، فَلَدُغَ سَيِّدُ الْخَيْرِ، فَقَالُوا لِلصَّحَابَةِ: هَلْ فِيهِمْ مِنْ رَاقِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، لَكِنْ لَا نَفْعَلُ إِلَّا أَنْ تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَجَعَلُوا لَهُمْ قطْعَيْ شَيْءَ، فَرَفَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَبَرَأَ الرَّجُلُ، فَأَتَوْهُمْ بِالشَّيْءَ، فَقَالُوا: لَا نَأْخُذُهَا حَتَّى نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَجَعُوا سَأَلُوهُ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ: «خُذُوهُ مِنْهُمْ، وَاضْرِبُو إِلَيْهِمْ مَعْكُمْ»

“আবু সাঈদ খুদরী ^{رض} থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কিছু সংখ্যক সাহাবী (কোনো এক সফরে) ছিলেন, তারা কোনো এক আরব সম্প্রদায়ের বসতির নিকট দিয়ে অতিক্রমের সময় তাদের নিকট মেহমানদারী করতে বললেন। কিন্তু তারা তাদের আতিথেয়তা করল না। অতঃপর তাদের গোত্র সরদারকে সাপে দৎশন করল। পরে তারা সাহাবীদেরকে বলল, তোমাদের দলে কি কোনো ঝাড়ফুঁককারী আছে? তারা ^{رض} বললেন, হ্যাঁ। তবে আমাদেরকে পারিশ্রমিক না দিলে তা করব না। তারপরে তারা তাদের জন্য কিছু বকরি নির্ধারণ করল। তাঁদের মধ্যে একজন তাকে সুরা ফাতিহাহ দিয়ে ঝাড়ফুঁক করার দরুন লোকটি ভালো হয়ে গেল। তারা তাঁদের জন্য বকরির পাল নিয়ে আসলো। তাঁরা তা নিতে আপত্তি জানিয়ে বলল, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত তা গ্রহণ করতে পারি না। অতঃপর তাঁরা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তাদের নিকট থেকে তা নিয়ে নাও এবং তোমাদের সঙ্গে আমার জন্যও একাংশ রেখো।”^{৭৪০}

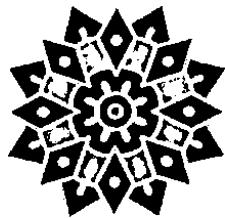
المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بـ

বিতীয় মাসআলা: মজুরী, পারিশ্রমিকের সাথে সম্পৃক্ত বিবিধান

এর সাথে সম্পৃক্ত হুকুম নিম্নে:

১. পারিশ্রমিক নির্ধারণকারী ব্যক্তির জন্য শর্ত হলো তাকে লেনদেনের উপযুক্ত হতে হবে এবং কর্মীর উপর শর্ত হলো ঐ কাজের উপর সক্ষমতা থাকতে হবে।
২. কাজটি বৈধ হতে হবে। সুতরাং হারাম কাজে তা বৈধ হবে না। যেমন- গান, বাজনা, মদ তৈরী ইত্যাদির ক্ষেত্রে।
৩. কাজটির জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা যাবে না। সুতরাং কেউ যদি বলে, যে ব্যক্তি সপ্তাহের শেষে আমার উট ফিরিয়ে দিবে তার জন্য দিনার আছে। তাহলে এটি ঠিক হবে না।
৪. এটি একটি বৈধ চুক্তি। উভয়েরই অধিকার আছে তা বাতিল করার। কিন্তু যদি পারিশ্রমিক নির্ধারণকারী তা বাতিল করে, তাহলে শ্রমিককে সমপরিমাণ মূল্য দিতে হবে। তবে যদি শ্রমিক তা বাতিল করে, তাহলে তাকে কিছুই দিতে হবে না।

^{৭৪০} মুত্তাফকুন আলাইহি: সহীল বুখারী, হা. ২২৭৬; সহীহ মুসলিম, হা. ৫৬২৫, ফুআ. ২২০১।



الباب الحادي والعشرون : اللقطة واللقيط একবিংশ অনুচ্ছেদ : কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু ও শিশু

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: مَعْنَى الْلِّقْطَةِ وَحُكْمُهَا

প্রথম মাসআলা: এর অর্থ এবং তার হৃকুম

১. তার অর্থ: এর অর্থ: শান্তিক অর্থ- কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস, এটা এমন জিনিস যা কোনো ব্যক্তি কুড়িয়ে পায় এবং তা গ্রহণ করে।

الشرع: هي أخذ مال محترم من مضئيحة؛ ليخفظه، أو ليتملكه بعد التعريف.

পারিভাষায়: হারিয়ে যাওয়া কোনো সম্পদ গ্রহণ করা, এটাকে সংরক্ষনের উদ্দেশ্যে অথবা প্রচারের পর এর মালিক হওয়ার উদ্দেশ্যে।

২. হৃকুম এর অর্থ ও তার দলীলসমূহ:

এই বিষয়ে মূল হচ্ছে যায়েদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী رض এর হাদীস। নিচেরই নাবী ص কে কুড়িয়ে পাওয়া সোনা অথবা রূপা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি ص বলেন:

«أَعْرِفُ وِكَائِهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرَفْتُهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَأَسْتَبْغِقَهَا، وَلَتَكُنْ عِنْدَكَ وَدِيعَةً، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا بِوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدْهِمُهَا إِلَيْهِ» وَسَأَلَهُ عَنْ صَالِهِ الْأَبِيلِ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا، دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءُ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَهَا رَبُّهَا» وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ، فَقَالَ: خُذْهَا، فَإِنَّهَا هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلَّذِيبِ»

“তুমি ব্যাগ ও বঙ্গন চিনে রাখবে। এরপর এক বছর এর ঘোষণা দিবে। যদি তুমি মালিকের সঙ্গান না পাও, তবে তা তুমি খরচ করতে পারো। কিন্তু তা তোমার নিকট আমানত হিসেবে

থাকবে। যদি কোনোদিন এর দাবিদার (মালিক) আসে তবে তা তুমি তাকে দিয়ে দিবে। তারপর সে হারানো উট সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করল। তিনি ﴿ বললেন: এতে তোমার কী আসে-যায়? তুমি তাকে ছেড়ে দাও। কারণ এর সাথে এর জুতা ও পানি সংরক্ষণের থলে আছে। সে নিজেই পানির ঘাটে যেতে এবং গাছ খেতে পারে। অবশেষে একদিন তার মালিকের সাক্ষাত পারে। তারপর সে বকরি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি ﴿ বললেন: তুমি সেটি নিয়ে যাও। কারণ তা তুমি নিবে অথবা তোমার ভাই নিবে অথবা নেকড়ে খেয়ে ফেলবে।”^{৭৪১}

المسألة الثانية: أقسام اللقطة

البيتية ماساتالا: القطة এর প্রকারভেদ

১. যে জিনিসের প্রতি মানুষের গুরুত্ব নেই: যেমন- চাবুক, ঝুঁটি, ফল, লাঠি এক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে, এটা কুড়িয়ে নেওয়া যাবে এবং এর দ্বারা সে উপকার লাভ করতে ও কোনো ধরনের ঘোষণা ছাড়াই তার মালিক হতে পারবে।

২. যে সব পশু নিজেকে ছেটো হিংস্র প্রাণী ও অন্যান্য জিনিস থেকে রক্ষা করতে পারে: যেমন উট, ঘোড়া, গরু, খচর ইত্যাদি। সেগুলোকে কুড়িয়ে নেওয়া হারাম এবং কেউ কুড়িয়ে ঘোষণা দেওয়ার মাধ্যমে মালিকও হতে পারবে না। যায়েদ বিন খালেদ আল জুহানীর পূর্ববর্তী হাদীসে রয়েছে।

مَالِكَ وَهَا، دَعْهَا، فَإِنْ مَعَهَا حِلَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّىٰ يَحْدَهَا رَبُّهَا

“এতে তোমার কী আসে-যায়? তুমি তাকে ছেড়ে দাও। কারণ এর সাথে এর জুতা এবং পানি সংরক্ষণের থলে আছে। সে নিজেই পানির ঘাটে যেতে এবং গাছ খেতে পারে। শেষে একদিন তার মালিক তাকে পেয়ে যাবে।”

৩. যা কুড়ানো বৈধ এবং ঘোষণা করা আবশ্যিক: যেমন- স্বর্ণ, রূপা, পণ্যসামগ্রী এবং এমন সব প্রাণী যা নিজেকে ছেটো হিংস্র প্রাণী ও অন্যান্য জিনিস থেকে রক্ষা করতে পারে না। যেমন- মেষ সাবক, মুরগী ইত্যাদি। এই বিধানটি পাওয়া যায় যায়েদ বিন খালেদ আল-জুহানীর পূর্ববর্তী হাদীস থেকে। আর এই বিধানটি ঐ ব্যক্তির জন্যই প্রযোজ্য যে নিজের প্রতি আস্থা রাখতে পারে এবং ঘোষণা দিতেও সক্ষম।

^{৭৪১} مُؤْمَنًا كُونَ آلاَهُ إِلَهٌ سَهْلٌ بُوْخَارِيٌّ، هـ. ٦١١٢؛ سَهْلٌ مُوسَلِيمٌ، هـ. فُؤُّادٌ، ١٧٢٢

وَالْوَكْـا: যে সুতা দিয়ে বস্তা, ব্যাগ ও অন্যান্য জিনিস বাধা হয়। العِفَاص: চামড়া বা অন্য কিছু দিয়ে তৈরি পাত্র যাতে ধন-সম্পদ রাখা হয়। এখানে উদ্দেশ্য হলো কুড়িয়ে পাওয়া বস্তর পরিচয় এমনভাবে জানা যে, যাতে বুঝতে পারে বর্ণনাকারীর বর্ণনা ঠিক।

مَسْأَلَةُ الْتَّالِيَةِ: بَعْضُ أَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا

তৃতীয় মাসআলা: কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান

১. যদি কুড়ানো বস্তু ভোজ্য প্রাণী হয় তাহলে তা এই অবস্থায় খাওয়া কিংবা তার মূল্য পরিশোধ করা অথবা বিক্রি করে দেওয়ার মাঝে তার ইখতিয়ার আছে। সে ইচ্ছা করলে কুড়ানো প্রাণিটির গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য জেনে তা বিক্রি করে তার মূল্য তার মালিকের জন্য সংরক্ষণ করতে অথবা প্রাণিটিকে নিজের কাছে রেখে দিতে পারে। সে তার জন্য নিজের মাল খরচ করতে কিন্তু তার মালিক হবে না। কিন্তু যদি মালিক ফিরে এসে তার কাছে সেই প্রাণিটি চায় তাহলে সে তাকে তা দিয়ে দিবে এবং তার থেকে খরচের টাকা নিবে। তবে কুড়িয়ে পাওয়া ব্যক্তি তা খেয়ে ফেলার আগেই যদি তার মালিক এসে যায় তাহলে তার মালিক তা নিয়ে নিবে।
২. যদি কুড়ানো বস্তু এমন হয় যা নষ্ট হওয়ার আশংখা থাকে। যেমন- ফল-ফলাদি। তাহলে যে তা কুড়িয়ে পাবে সে তা খেয়ে মূল্য মালিককে দিয়ে দিতে পারে অথবা তা বিক্রি করে তার মূল্য মালিকের জন্য সংরক্ষণ করতে পারে। যেন মালিক আসলেই তাকে তা দিয়ে দিতে পারে।
৩. যদি হারানো বস্তু টাকা, পাত্র বা পণ্য সামগ্রী হয় তাহলে আমানত হিসাবে সব কিছু নিজের হাতে সংরক্ষণ করা এবং সমাজে তার ব্যাপারে ঘোষণা করা আবশ্যিক।
৪. কুড়ানো বস্তু শুধুমাত্র এমন ব্যক্তিই নিয়ে রাখতে পারবে যে নিজেকে নিরাপদ মনে করে এবং তার ব্যাপারে ঘোষণা দিতে সক্ষম। কারণ কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুর বিষয়ে ঘোষণা দেওয়াটা ওয়াজিব। সুতরাং যখন সে তার ব্যাপারে ঘোষণা দিবে তখন তার গুণাগুণ বর্ণনা করবে। এভাবে সে পূর্ণ এক বছর ঘোষণা দিবে। আর এই ঘোষণাটি দিবে জন সম্মুখে। তারপর যদি তার মালিক এসে উপযুক্ত গুণাগুণ বর্ণনা করে তাহলে সে তা তাকে দিয়ে দিবে। কিন্তু এক বছর ঘোষণা দেওয়ার পরেও যদি তার মালিক না আসে তাহলে সে তার মালিক হয়ে যাবে।
৫. যে ব্যক্তি কুড়িয়ে পাবে সে পূর্ণ এক বছর ঘোষণা দেওয়ার পরে তার মালিক হয়ে যাবে। কিন্তু সে কুড়ানো বস্তুটির বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ না জেনে তাতে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। সুতরাং যখনই তার মালিক এসে উপযুক্ত গুণাগুণ বর্ণনা করবে তখনই কোনো ধরনের প্রমাণ ও শপথ ছাড়াই তাকে তা দিয়ে দিবে। পূর্ববর্তী যায়েদ বিন খালেদ আল-জুহানী رض এর হাদীসে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করেছেন।
৬. যদি ছোট শিশু বা নির্বোধ কেউ কিছু কুড়িয়ে পায় তাহলে তাদের অভিভাবক লেনদেন করবে। যেমন: পূর্বে তার বর্ণনা গত হয়েছে।
৭. হারাম এলাকায় কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুর কেউ মালিক হতে পারবে না। বরং যে পাবে তার জন্য আবশ্যিক হবে দীর্ঘ কাল তা ঘোষণা করতে থাকা।

المسألة الرابعة: في القبط

চতুর্থ মাসআলা: কুড়িয়ে পাওয়া শিশু

এমন শিশু যাকে অবহেলিত অবস্থায় রাস্তায় কিংবা মসজিদের দরজায় পাওয়া যায়। অথবা যে তার পরিবার থেকে পথ হারিয়ে ফেলেছে। যার ফলে তার কোনো বৎশ বা দায়িত্বশীল সম্পর্কে জানা যায় না। এই অবস্থায় কুড়িয়ে পাওয়া শিশুকে ফেলে রাখা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَتَعَاوُنًا عَلَى الْبَرِّ وَالْمَقْوَمِ ﴿٢﴾

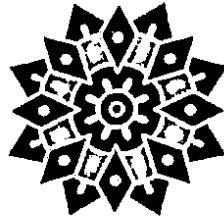
“সৎকাজ ও তাক্রাওয়ার ব্যাপারে তোমরা পরম্পরকে সহযোগিতা করো।” [সূরা মায়দাহ : ২]

উক্ত আয়াতের ব্যাপকতা এটাই প্রমাণ করে যে, কুড়িয়ে পাওয়া শিশুকে গ্রহণ করা আবশ্যিক। সুতরাং তাকে রেখে দেওয়া এবং তার জন্য খরচ করাটা ফরজে কিফায়া। কারণ তাকে গ্রহণ করার অর্থই হলো একটি আত্মাকে জীবিত রাখা। আর কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর কাছে যে সম্পদ পাওয়া যাবে, তার মালিক সেই হবে যে তাকে কুড়িয়ে নিবে। শিশুটির উপর তারই দায়িত্ব থাকবে। সে নিজের থেকেই তার জন্য সম্পদ খরচ করবে। যদি তার কোনো সম্পদ না থাকে তাহলে বাইতুল মাল থেকে তার জন্য খরচ করবে। কুড়িয়ে পাওয়া শিশুটি সকল বিধানের ক্ষেত্রে মুসলিম হিসেবে বিবেচিত হবে, তবে যদি তাকে কোনো কাফের রাষ্ট্রে পাওয়া যায় তাহলে সে কাফের হিসেবেই বিবেচিত হবে।

কুড়িয়ে পাওয়া শিশুটির বৎশ তার সাথেই সাব্যস্ত হবে যে তার দাবী করবে এবং তার সাথে তার বৎশ সাব্যস্ত হওয়ার স্বাভাবনা থাকবে। কিন্তু যদি একাধিক ব্যক্তি তার বৎশ সাব্যস্ত করার জন্য দ্বন্দ্বে লিঙ্গ হয় আর তাদের কোনো প্রমাণ না থাকে তাহলে তার সাথেই বৎশ সাব্যস্ত হবে যার সাথে তার মিল থাকবে।

সুতরাং শিশুকে যে ব্যক্তি কুড়িয়ে পাবে, সেই তার ব্যাপারে বেশি হকদার হবে। তবে শর্ত হলো তাকে হতে হবে স্বাধীন, বিশ্বস্ত, ন্যায় পরায়ণ ও বিচক্ষণ। তবে শিশুর অধিকারী হওয়ার ব্যাপারে কোনো মুসলিম ব্যক্তির উপর কাফের বা ফাসেক প্রাধান্য পাবে না।

শিশু কুড়িয়ে পাওয়া ব্যক্তির জন্য শর্ত: (তার মাঝে থাকতে হবে) জ্ঞান, প্রাপ্তি বয়স, স্বাধীনতা, ইসলাম, ন্যায়পরায়ণতা ও বিচক্ষণতা। সুতরাং কোনো শিশুকে, পাগল, দাস, ফাসেক এবং নির্বোধ ব্যক্তি যদি কুড়িয়ে পায়, তাহলে তা ঠিক হবে না। অনুরূপ কোনো মুসলিম শিশুকে যদি কোনো কাফের কুড়িয়ে পায় তাহলেও তা ঠিক হবে না।



الباب الثاني والعشرون: الوقف দ্বাবিংশ অনুচ্ছেদ : ওয়াকফ

এই অনুচ্ছেদে দুটি মাসআলা রয়েছে।

المَسْأَلَةُ أَوْلَىٰ: مَعْنَاهُ وَحِكْمَهُ প্রথম মাসআলা: তার অর্থ ও বিধান

১. অর্থ: কোনো জিনিসকে এমনভাবে আটকে রাখা যা অক্ষত রেখেই আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তার মাধ্যমে উপকার নেওয়া স্তুতি। সুতরাং এটি হলো মূলকে ঠিক রেখে তার থেকে লাভ নেওয়া।

উদাহরণ: কেউ তার বাড়িকে ওয়াকফ করে ভাড়া দিলো। তারপর সে ভাড়ার টাকা মুখাপেক্ষী, মসজিদ অথবা দ্বিনি কিতাব ছাপানোর কাজে ব্যয় করল।

২. তার ছক্ষুম ও দলীল:

এটি একটি মুস্তাহাব কাজ। এই বিষয়ে মূল দলীল হলো উমার رض থেকে বর্ণিত হাদীস।

أَنَّ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قُطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ
بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا غَيْرَ أَنْ لَا يُتَابَعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوَهَّبُ وَلَا يُورَثُ

“নিশ্চয়ই তিনি খায়বারে কিছু জমি লাভ করেন। তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আমি খায়বারে এমন উৎকৃষ্ট কিছু জমি লাভ করেছি, ইতঃপূর্বে এমন সম্পদ আর কখনো পাইনি। আপনি আমাকে এ ব্যাপারে কী আদেশ দেন? আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি ইচ্ছা করলে জমির মূল মালিকানা নিজে রাখো এবং এভাবে সাদকা করতে পারো যে তা বিক্রি করা যাবে না, দান করা যাবে না এবং কেউ এর উত্তরাধিকারী হবে না।”^{৭৪২}

আবু হুরায়রা رض বর্ণিত হাদীস-

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، وَعِلْمٍ يُتَسْقَعُ بِهِ، وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُ لَهُ

^{৭৪২} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ২৭৩৭; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৬৩২।

“আদম সত্তান মারা গেলে তিনটি আমল ব্যতীত সকল আমলই বন্ধ হয়ে যায়। ১. সদাকায়ে জারিয়া (ওয়াকফ); ২. উপকারী বিদ্যা; ৩. পুণ্যবান সত্তান যে তার জন্য দুআ করে।”^{১৪৩}
এই হাদীসে সদাকায়ে জারিয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওয়াকফ।

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: أَحْكَامُ الْمُتَعْلِقَةِ بِهِ

দ্বিতীয় মাসআলা: এর সাথে সম্পৃক্ত হৃত্কুম

ওয়াকফ এর সাথে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পৃক্ত:

১. ওয়াকফকারীকে লেনদেনের উপযুক্ত হতে হবে। তাকে হতে হবে জ্ঞানী, প্রাণবয়স্ক, স্বাধীন এবং বিচক্ষণ।
২. ওয়াকফ করা বস্তুটি এমন হতে হবে যা অক্ষত রেখে সার্বক্ষণিকভাবে তার মাধ্যমে উপকার নেওয়া সম্ভব।
৩. ওয়াকফ হতে হবে সৎ ও ভালো কাজের জন্য। যেমন- মসজিদ, মিসকিন, দ্বিনি কিতাব ছাপানো ইত্যাদি কাজের জন্য। কারণ এর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা হয়ে থাকে। সুতরাং কাফেরদের উপাসনা বা হারাম বস্তু কেনার কাজে ওয়াকফ করা হারাম।
৪. ওয়াকফ করা বস্তু থেকে যদি উপকার নেওয়া শেষ হয়ে যায়। আর কোনোভাবেই তা থেকে উপকার নেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে তা বিক্রি করে দিবে। তারপর তার মূল্য অনুরূপ কাজে ব্যয় করবে। যেমন মসজিদ হলে তার মূল্য অন্য মসজিদ নির্মানের কাজে ব্যয় করবে। বাড়ি হলে তা বিক্রি করে তার মূল্য দিয়ে অন্য আরেকটি বাড়ি ক্রয় করবে। কারণ এটিই হলো ওয়াকফকারীর কাছাকাছি উদ্দেশ্য।
৫. ওয়াকফ করা একটি বৈধ চুক্তি। এটি শুধুমাত্র কথার মাধ্যমেই সাব্যস্ত হবে। তা বাতিল করা বা বিক্রি করে দেওয়া বৈধ নয়।
৬. ওয়াকফ করা বস্তুটি নির্দিষ্ট হতে হবে। সুতরাং অনির্দিষ্ট কোনো বস্তু ওয়াকফ করা সঠিক নয়।
৭. ওয়াকফ পরিপূর্ণভাবে হতে হবে। সুতরাং কোনো কিছুর সাথে ঝুলিয়ে বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ওয়াকফ করা বৈধ হবে না। তবে কারো মৃত্যু বরণের সাথে যদি সম্পৃক্ত করা হয় তাহলে এটি ভিন্ন বিষয়।
৮. ওয়াকফকারীর শর্ত অনুযায়ী কাজ করতে হবে। যদি না তা শরীয়তের বিপরীত হয়।
৯. যদি কেউ সত্তানদের জন্য ওয়াকফ করে, তাহলে এক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সবাই সমান হিসেবে গণ্য হবে।



الباب الثالث والعشرون: الهبة، والمعطية অযোবিঃশ অনুচ্ছেদ : হিবা ও দান

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المسألة الأولى: معناها وأداتها প্রথম মাসআলা: তার অর্থ এবং দলীলসমূহ

১. তার অর্থ: হিবা বা হিবা হলো লেনদেনের উপযুক্ত ব্যক্তি তার জীবদ্ধায় কাউকে কোনো বিনিময় ছাড়াই স্বেচ্ছায় নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট সম্পদ প্রদান করা।

২. তার হৃকুম ও দলীলসমূহ:

হিবা একটি মুখ্যাহাব কাজ। যখন সে এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি করার ইচ্ছা করবে, যেমন সৎলোক, দরিদ্র ব্যক্তি, আত্মীয়-স্বজনকে দান করা।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَهَادُوا مَحَابِيْوَا

“আবু হুরায়রা رض হতে বর্ণিত। নিশ্চয়ই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: পরম্পরের ভালোবাসার নির্দর্শনে হাদীয়া দাও।”^{১৪৪}

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِلُ الْهَدِيرَةَ وَيُئْبِبُ عَلَيْهَا

“আয়িশাহ رض হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীয়া গ্রহণ করতেন এবং তার প্রতিদানও দিতেন।”^{১৪৫}

হিবা যদি লোক দেখানো, সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন ও অহংকার প্রদর্শনে হয়, সেটা মাকরুহ হবে।

^{১৪৪} বায়হাকী ৬/১৬৯; ইমাম আলবানী হাসান বলেছেন, ইরওয়া নং ১৬০১।

^{১৪৫} সহীল বুখারী, ঘ. ২৫৮৫।

المسألة الثانية: شروط الهببة الثالثة: هببة ماساتالا

হিবার সাথে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পৃক্ত:

১. হিবাকারীকে লেনদেনের উপযুক্ত ব্যক্তি হতে হবে। তা হলো স্বাধীন, মুকাল্লাফ (যার উপর শারঙ্গ বিধান অর্পণ হয়), চালাক প্রকৃতির হওয়া।
২. হিবাকারীর ইচ্ছার মাধ্যমে হতে হবে জোর পূর্বক হলে চলবে না।
৩. হিবাকৃত জিনিস এমন হবে যা বিক্রয় করা যাবে। যা বিক্রি করা যাবে না তা হিবা করা যাবে না। যেমন- মদ, শুকর।
৪. যাকে হিবা করা হয়েছে সে হিবাকৃত জিনিস গ্রহণ করবে। কারণ হিবা হলো মালিকানার চুক্তি। সুতরাং এক্ষেত্রে ইজাব ও কবুল-এর প্রয়োজন আছে।
৫. হিবা একেবারে হতে হবে, সময় সাপেক্ষে চলবে —। যেমন কেউ বলল, আমি তোমাকে এক মাস বা এক বছরের জন্য দান করলাম, তাহলে ঠিক হবে কলনা হিবা একটি মালিকানায় চুক্তি।
৬. হিবা কোনো বিনিময় মুক্ত হতে হবে। কারণ এটা হচ্ছে দান।

المسألة الثالثة: بعد الأحكام المتعلقة بها الرابعة: هببة ماساتالا: هببة ماساتالا

হিবার সাথে নিম্নোক্ত বিধানগুলো সম্পৃক্ত।

১. যখন দানকারী ব্যক্তি কাউকে তা দান করবে এবং সে ঐ দান গ্রহণ করবে, তখন তা দান হিসাবে অবধারিত হয়ে যাবে। তারপর এটি ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে দানকারীর কোনো অধিকার থাকবে না। যেহেতু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

العَادُلُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقْيُؤُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

“যে দান করে তা ফিরিয়ে নেয়, সে ঐ কুকুরের মতো, যে বমি করে তা আবার খায়।”^{৭৪৬}
তবে পিতা এই বিধানের বাইরে। তিনি তার কোনো ছেলেকে দান করলে তা ফেরত নিতে পারবেন। যেমন ইবনু আবাস رض-এর হাদীস, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدُ فِيهَا يُعْطِيَ وَلَدُهُ

^{৭৪৬} মুস্তাফাকুন আলাইহি: সহীহুল বুখারী, হা. ২৬২২; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৬২০।

“কিছু দান করার পর পুনরায় তা ফেরত নেওয়া দানকারীর জন্য হালাল নয়। তবে পিতা তার পুত্রকে যা দান করে তা ফেরত নিতে পারে।”^{৭৪৭}

২. যদি কোনো পিতা তার সন্তানদেরকে দান করে, তাহলে তার জন্য আবশ্যক হলো তাদের মাঝে সমতা রক্ষা করা। সুতরাং সে যদি নির্দিষ্টভাবে কাউকে বেশি দেয় বা প্রাধান্য দেয় অন্যদের সন্তুষ্টি ছাড়া তাহলে তা ঠিক হবে না। যদি তারা সন্তুষ্ট থাকে তাহলে ঠিক হবে। আর এটি এই কারণে যে, নুমান বিন বাশীর رض এর হাদীসে আছে, তার পিতা তাকে কিছু সম্পদ দিলেন। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন:

أَكُلُّ وَلَدِكَ أَعْطِيْتَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ لَا، قَالَ: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا يَنْ أَوْلَادِكُمْ ،
وَنِي رَوَاهُ لَأْشْهِدُنِي عَلَى جَنْرِ

“তোমার সব ছেলেকেই কি এ ধরনের দান করেছ? তিনি (বাশীর) বললেন, না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তবে আল্লাহকে ভয় করো এবং আপন সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা করো।”

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমাকে অন্যায়ের সাক্ষী করো না।”^{৭৪৮}

৩. যদি কোনো পিতা মৃত্যু শয্যায় কোনো সন্তানকে প্রাধান্য দিয়ে বেশি সম্পদ দেয়। আর অন্যদেরকে না দেয় তাহলে এটি ঠিক হবে না। তবে যদি অন্য ওয়ারিশরা অনুমতি দেয় তাহলে তা ঠিক হবে।

৪. কোনো কিছুর সাথে সম্পৃক্ত করে দান করাটাও বৈধ হবে। যেমন কেউ বলল, যখন মুসাফির আসবে অথবা বৃষ্টি নামবে তখন আমি তোমাকে এই জিনিসটি দিবো।

৫. কারো পাওনা ঋণ হিবা করা বৈধ আছে। সেটি হবে ঋণ থেকে মুক্তি প্রদান।

৬. দান বা হাদীয়া ফিরিয়ে দেওয়া উচিত নয়। যদিও তা কম হয়। তবে সুন্নাহ হলো এর বিনিময়ে কিছু প্রদান করা। যেমন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীয়া গ্রহণ করতেন এবং তার প্রতিদানও দিতেন।”^{৭৪৯}

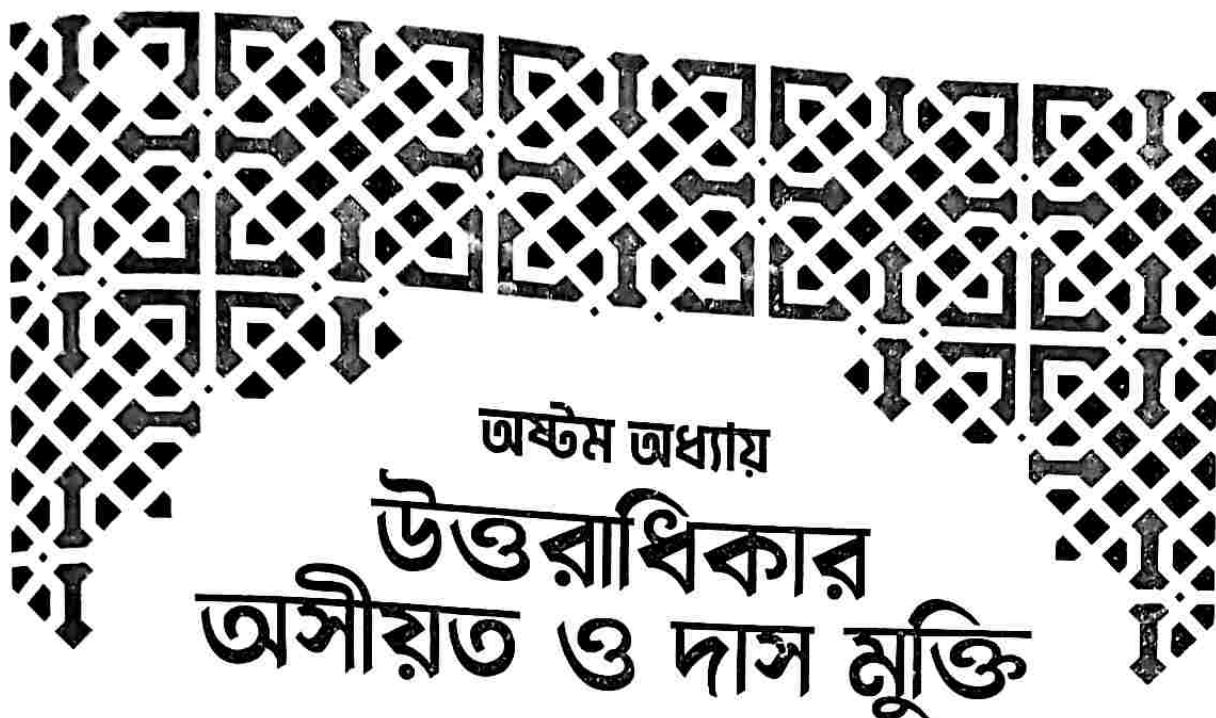
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِلُ الْهِدْيَةَ وَيُنْهِيْ عَلَيْهَا

“আয়িশাহ رض হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীয়া গ্রহণ করতেন এবং তার প্রতিদানও দিতেন।”^{৭৪৯}

^{৭৪৭} সুনান আবু দাউদ, খ. ৩৫২২; তিরমিয়ী, খ. ১২৯৯ এবং তিনি হাসান সহীহ বলেছেন। ইবনু মাজাহ, খ. ২৩৭৭; শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, ইরওয়া নং ১৬২৪।

^{৭৪৮} মুত্তাফাকুল আলাইহি: সহীহল বুখারী, খ. ২৫৮৭; সহীহ মুসলিম, খ. ফুআ. ১৬২৩।

^{৭৪৯} সহীহল বুখারী, খ. ২৫৮৫।



نَامَةُ كِتَابِ الْمَوَارِيثِ وَالْوَصَابَاتِ وَالْعَنَقِ

এতে ০৪টি অনুচ্ছেদ রয়েছে

প্রথম অনুচ্ছেদ : রূপ্য ব্যক্তির খরচ করা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : অসীয়ত

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : দাস মুক্তি, মুকাতাব গোলাম ও মুদাকার গোলাম

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : সম্পত্তির অংশ ও উত্তরাধিকার



البَابُ الْأَوَّلُ : تَصْرِيفَاتُ الْمَرِيضِ

প্রথম অনুচ্ছেদ : কৃষ্ণ ব্যক্তির খরচ করা

মানুষ যখন সুস্থ ও রোগ মুক্ত অবস্থায় থাকবে তখন তার ইচ্ছামতো নিজ মাল থেকে খরচ করতে পারবে। তবে সেটা শারঙ্গ সীমারেখার আদলে হতে হবে।

আর যখন এমন অসুস্থ হবে যেটা আশঙ্কাজনক নয় অর্থাৎ যে অসুস্থতার কারণে মৃত্যুর ভয় থাকে না। যেমন- দাঁত ব্যথা, আঙ্গুল ব্যথা, মাথা ব্যথা, শরীর ব্যথা ইত্যাদি অসুস্থতা। যা কোনো প্রভাব ফেলে না এবং রোগ সেরে ওঠা বা আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, এই প্রকৃতির অসুস্থ হলে তার ব্যয় করাটা সুস্থ ব্যক্তির ব্যয় করার মতো বিবেচ্য হবে এবং নিজ সম্পত্তি হতে দান করা ও উপহার দেওয়া সঠিক হবে; যদিও দিনে দিনে তার স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে, এমনকি মৃত্যুও হয়ে যায়। কারণ লক্ষণীয় বিষয় হলো, দান বা সাদকা করার সময় তার অবস্থা কেমন ছিল। আর সে ব্যক্তি দান করার সময় তো সুস্থ ব্যক্তির হকুমেই ছিল।

আর যদি রোগটি এমন আশঙ্কাজনক হয় যে, এর কারণে মৃত্যু হতে পারে; যেমন বিভিন্ন জটিল রোগ ও দুরারোগ্য ব্যাধি। এমন পরিস্থিতিতে সে তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ দান করতে পারবে, পুরো সম্পদ নয়।

যদি দানকৃত সম্পত্তি সমস্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ হয় বা তার চেয়ে কম হয়, তাহলে দান বাস্তবায়িত হবে। আর যদি এক-তৃতীয়াংশের বেশি হয়, তাহলে তার মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকারীদের সম্মতি বা অনুমোদন ছাড়া দান বাস্তবায়িত হবে না। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ تَسْدِيقَ عَلَيْكُمْ، عِنْدَ وَفَاتِكُمْ، بِثُلُثٍ أَمْوَالِكُمْ، زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ

“তোমাদের মৃত্যুর সময়ও তোমাদের সম্পদ থেকে আল্লাহ তা'আলা এক-তৃতীয়াংশ অসীয়ত করার অধিকার প্রদান করে, তোমাদের নেক আমলের পরিমাণ আরও বাড়ানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।”^{৭৫০}

^{৭৫০} ইবনু মাজাহ, ঘ. ২৭০৯; সুনানুদ দারাকুঞ্জী ৪/৪৫০; বাযহাকী ৬/২৬৪ এবং হাদীসটি সহীহ; দেখুন, ইরওয়াউল গালীল ৬/৭৭।

উক্ত হাদীস এবং অনুরূপ অর্থবোধক হাদীসগুলো প্রমাণ করে, ব্যক্তি মরণাপন্ন অবস্থায় তার সম্পূর্ণ সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ ব্যয় করা বৈধ। কারণ তার সম্পূর্ণ মাল থেকে খরচ করাটা তার ওয়ারিশদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এজন্যই এক-তৃতীয়াংশ খরচ করার কথা বলা হয়েছে; যেমন অসীয়ত করা।

আর যখন রোগটি দীর্ঘস্থায়ী হবে কিন্তু আশঙ্কাজনক নয় যে তাকে সর্বদায় বিছানায় থাকতে হয়; যেমন ডায়াবেটিস অথবা অনুরূপ রোগসমূহ। এই পরিস্থিতিতে সে সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় খরচ করতে পারবে। কারণ তার ক্ষেত্রে বয়োঃবৃদ্ধের ন্যায় অল্প সময়ের মধ্যেই মৃত্যু হওয়ার স্থাবনা নেই। আর যখন রোগটি এমন হবে যে, সর্বদা তাকে বিছানায় থাকতে হয়, সেক্ষেত্রে ওয়ারিশ ছাড়া অন্য কাউকে এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তির বেশি প্রদান করা এবং অসীয়ত করা বিশুद্ধ হবে না। কারণ সে এমন রোগী যে তাকে সর্বদা বিছানায় থাকতে হয় এবং তার উপর মৃত্যুরও আশংকা রয়েছে। কাজেই এমতাবস্থায় তার ব্যয় এবং দান করাটা মরণব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির মতো নয়।



الباب الثاني: الوصية দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: অসীয়ত

এই অনুচ্ছেদে দুইটি মাসআলা রয়েছে:

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: مَعْنَاهَا وَأَدْلَةُ مَشْرُوعِيَّتِهَا

প্রথম মাসআলা: অসীয়তের পরিচয় ও তা শরীয়ত সম্বত হওয়ার দলীল

১. **পরিচয়:** বা অসীয়ত এর শাব্দিক অর্থ: **العهد إلى الغير، أو أمر.**

অপরকে কোনো কিছুর প্রতিশ্রুতি দেওয়া বা আদেশ করা।

পারিভাষিক অর্থ:

هبة إنسان غيره علينا، أو ديناً، أو منفعة، على أن يملك الموصى له البهنة بعد موت الموصي.

“কাউকে সম্পত্তি বা খণ্ড দেওয়া অথবা কোনো জিনিসের উপকার গ্রহণ (ব্যবহার) করতে দেওয়া এই মর্মে যে, অসীয়তকারীর মৃত্যুর পর অসীয়তকৃত ব্যক্তি ঐ বস্তুটির মালিক হয়ে যাবে।”

কখনো কখনো অসীয়ত উল্লিখিত সংজ্ঞা অপেক্ষা আরও অধিক অর্থবোধক হয়ে থাকে। যেমন মৃত্যুর পর সম্পত্তি থেকে খরচ করার জন্য আদেশ করে যাওয়া (এভাবে কেউ কেউ সংজ্ঞায়িত করেছেন)। কাজেই অসীয়ত কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাকে গোসল দেওয়া, তার জানায়ার স্থাতে ইমামতি করা অথবা তার সম্পত্তি থেকে বিশেষ খাতে খরচ করাকে কেউ শামিল করে।

২. **তা শরীয়ত সম্বত হওয়ার দলীলসমূহ:** এটি কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমার মাধ্যমে শরীয়ত সম্বত বলে প্রমাণিত। আল্লাহর বাণী:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا أُرْصِيَّةً لِلْمُوَالِدِينَ وَالْأَفْرَيْقَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ
خَفَّاً عَلَى الْمُتَّقِيْنَ﴾

“তোমাদের কারও মৃত্যু নিকটবর্তী বলে মনে হলে, সে যদি রেখে যাওয়া ধন সম্পত্তি মাত্র-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য বৈধভাবে অসীয়ত করে, তাহলে তা তোমাদের জন্য বিধানসম্ভত করা হলো। মুক্তাকীদের জন্য এটা অবশ্য করণীয়।” [সূরা বাকুরাহ : ১৮০]

আবদুল্লাহ ইবনে উমার رض থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَا حَقٌّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبْيَثُ لِيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ انْ يُوصِي فِيهِ، إِلَّا وَرَصِيَّةً مَكْتُوبَةً عِنْدَ رَبِّهِ

“যে ব্যক্তির কিছু অর্থ সম্পদ রয়েছে, আর সে এ সম্পর্কে অসীয়ত করতে চায়, সেই মুসলিম ব্যক্তির উচিত হবে না অসীয়ত লিখে তার মাথার কাছে না রেখে দুটি রাতও অতিবাহিত করা।”^{৫১}
আলেমগণ অসীয়ত করা বৈধ হওয়ার উপরে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

المَسَأَةُ الثَّانِيَةُ: الْأَحْكَامُ الْمُتَعْلِقَةُ بِهَا

দ্বিতীয় মাসআলা: অসীয়ত সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান

নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অসীয়তের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত:

১. পূর্বে উল্লিখিত ইবনু উমার رض-এর হাদীসের নির্দেশনা মোতাবেক প্রত্যেক মুসলিমের জন্য তার সমস্ত দেনা-পাওনা একটি অসীয়তনামায় স্পষ্ট করে লিখে যাওয়া আবশ্যিক।
২. সমস্ত সম্পদের কিছু অংশ অসীয়ত করা করা মুস্তাহাব, যেটি বিভিন্ন কল্যাণকর, মঙ্গলজনক ও পরোপকারী খাতে ব্যয় করা হবে। যাতে এর সওয়াবটা মৃত্যুর পর তার নিকট পৌছে যায়।
আবু দারদা رض থেকে বর্ণিত। যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ، عِنْدَ وَفَاتِكُمْ، بِشُلْبٍ أَمْوَالِكُمْ، زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ

“তোমাদের মৃত্যুর সময়ও তোমাদের সম্পদ থেকে আল্লাহ তা‘আলা এক-তৃতীয়াংশ অসীয়ত করার অধিকার প্রদান করে, তোমাদের নেক আমলের পরিমাণ আরও বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।”^{৫২}

^{৫১} বুধাবী, হ্য: ২৭৩৮; সহীহ মুসলিম, হ্য: ৪০৯৬, ফুআ. ১৬২৭।

৩. সম্পূর্ণ সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে কম অসীমিত করা বৈধ। দলীল:

سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرْضِ مَوْتِهِ: أَتَصَدِّقُ بِثُلُثِي مَالِي؟
قَالَ: لَا، وَقَالَ: قُلْتُ: فَالثُّلُثُ قَالَ لَا، قُلْتُ: فَالثُّلُثُ قَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

“সাদ বিন আবু ওয়াক্স ~~কে~~ তার মরণব্যাধির সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লামকে জিঞ্জেস করেছিলেন, আমি কি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ দান করব? তিনি
বললেন, না। আমি বললাম, অর্ধেক? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, এক-তৃতীয়াংশের
মাধ্যমে? তিনি বললেন, এক-তৃতীয়াংশ চলে, এক-তৃতীয়াংশই অনেক।”

সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের কমে দান মুণ্ডাহাব হওয়ার দলিল ইবনু আব্বাস رضي الله عنه-এর হাদীস।

لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضِبُوا مِنَ الْثُلُثِ إِلَى الرُّبُعِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْثُلُثُ، وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ

“ମାନୁଷେବା ଯଦି ଅସୀଯତକେ ଏକ-ତୃତୀୟାଂଶ ଥେକେ କମିଯେ ଏକ-ଚତୁର୍ଥାଂଶେ ନିଯେ ଆସତ! କାରଣ ରସ୍ମୁଲମ୍ବାହ ସାମ୍ବାଲମ୍ବାହ ଆଲାଇହି ଓଯା ସାମ୍ବାମ ବଲେଛେ: ଏକ-ତୃତୀୟାଂଶ ଚଲେ, ତବେ ଏହି ଅନେକ ।”^{୫୩}

৪. পূর্বে উল্লিখিত সাদ বিন আবু ওয়াকাস رض এর হাদীসের নির্দেশনা অনুযায়ী যে ব্যক্তির উত্তরসূরী রয়েছে, তার উত্তরসূরিদের অনুমতি ছাড়া সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি অসীয়ত করা বৈধ নয়। আর যখন তার কোনো উত্তরসূরী না থাকবে তখন সমস্ত সম্পদ অসীয়ত করা বিশুদ্ধ।

৫. উত্তরসূরিদের মধ্য হতে কারো জন্য অসীয়ত করা বৈধ না। আবু উমামা  সুত্রে বর্ণিত।
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيهَةَ لِوَارِثٍ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক হকদারের অংশ নির্দিষ্ট করেছেন। সুতরাং কোনো উত্তরাধিকারের জন্য অসীয়ত করা যাবে না।”^{৭৫৪}

৬. পাপের বিষয়ে অসীয়ত করা হারাম। কারণ অসীয়ত শরীয়ত সম্মত করা হয়েছে অসীয়তকারী ব্যক্তির সওয়াব বৃদ্ধি করার জন্য। যেমনটা আবু দারদা رض এর হাদিসে গত হয়েছে।

৭. ঝগ ও শরীয়তের আবশ্যকীয় বিষয় যেমন- যাকাত, হাজি, কাফফারা এগুলো অসীয়ত এর উপর প্রাধান্য পাবে। মহান আল্লাহ বলেন:

^{४५} इब्नु माजाह, हा. २७०९; दाराकूळी ४/८५०; बायहाफ्फी ६/२६४ एवं हादीसटि सहीह; देखुन, इरउयाउल गलील ६/११।

^{৪০} সবীহল বুখারী, হা. ২৭৪৩; সবীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৬২৮।

^{১৪৪} শূন্যান আবু দাউদ, হা. ২৮৫৩; তিরমিয়ী, হা. ২২০৩; ইবনু মাজাহ, হা. ২৭১৩; ইয়াম আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহ ইবনু মাজাহ, হা. ২১৯৩।

﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾

“এ সবই সে যা অসীয়ত করে তা দেওয়া এবং খণ্ড পরিশোধের পর।” [সূরা নিসা : ১১]

আলী ﷺ বলেন,

قَضَى النَّبِيُّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

“নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসীয়তের পূর্বে খণ্ড পরিশোধ করেছেন।”^{৭৫৫}

৮. অসীয়তকারী ব্যক্তির জন্য শর্ত হচ্ছে তাকে তার সম্পদ থেকে ব্যয় করার জন্য ঘোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। অর্থাৎ তাকে জ্ঞানসম্পন্ন, সাবালক, স্বাধীন এবং স্বেচ্ছাধীন হতে হবে।

৯. গুনাহ হয় এমন কোনো খাতে অসীয়ত করা হারাম। যেমন কোনো ব্যক্তি কাফেরদের উপাসনালয়ের স্বার্থে, বিনোদনের বিভিন্ন যত্ন কেনার জন্য অথবা এ ধরনের কোনো খাতে অসীয়ত করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

১০. ওই ব্যক্তির জন্য অসীয়ত করা মুস্তাহাব যার বিপুল সম্পত্তি রয়েছে এবং তার উত্তরাধিকারীরা সেই সম্পদের কাঙ্গাল নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَخَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكُ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾

“তোমাদের কারো মৃত্যু নিকটবর্তী বলে মনে হলে সে যদি রেখে যাওয়া ধন সম্পত্তি বৈধভাবে অসীয়ত করে, তাহলে তা তোমাদের জন্য বিধানসম্ভত করা হলো।” [সূরা বাকুরাহ : ১৮০]

আয়াতের মধ্যে খয়র বলতে বুঝানো হয়েছে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তিকে। আর যে ব্যক্তির সম্পত্তি কম আর তার উত্তরাধিকারীরা সে সম্পদের মুখাপেক্ষী হয়, তাহলে সে ব্যক্তির জন্য অসীয়ত করা মাকরহ। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّكَ أَنْ تَذَرُ وَرَثَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَكْفُفُونَ النَّاسَ

“তোমার উত্তরাধিকারীদেরকে সম্পদশালী রেখে যাওয়া এর চেয়ে উত্তম যে, তাদেরকে নিঃশ্ব রেখে যাবে ফলে তারা অন্যের নিকট ভিক্ষা করবে।”^{৭৫৬}

তাছাড়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে অনেকেই অসীয়ত না করেই মৃত্যুবরণ করেছেন।

^{৭৫৫} তিরামিয়ী, ঘ. ২০৯৪; ইবনু মাজাহ, ঘ. ২৭১৫।

^{৭৫৬} সহীহল বুখারী, ঘ. ১২৯৫।

○ ﴿ ﻋَلَيْكُمْ أَسْتِرْأَيْتُمْ ﻭَمَا مُنْزِلْتُ لَكُمْ ۝ ۸۲۷

১১. অসীয়তকারী যখন উত্তরাধিকারীদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে অসীয়ত করবে তখন সেটা হারাম বলে বিবেচ্য হবে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿عَلَيْكُمْ مُنْتَهٰى كَوْتَافِكُمْ﴾ “কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে।” [সূরা নিসা : ১২]

১২. অসীয়তকারীর মৃত্যুর পূর্বে অসীয়ত কবুল করা বা নিয়ে নেওয়া অথবা তার মালিকানা গ্রহণ করা সঠিক নয়। কারণ মৃত্যুই হলো তার প্রাপ্য নির্ধারণ হওয়ার সঠিক সময়। আর এটা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির জন্য অসীয়ত হলে প্রযোজ্য হবে। আর যদি অসীয়ত নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য না হয়ে ফকির-মিসকিন, ছাত্র কল্যাণ, মসজিদ নির্মাণ অথবা ইয়াতীমদের জন্য হয়, সেক্ষেত্রে অসীয়ত কবুলের কোনো প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র অসীয়তকারীর মৃত্যুর মাধ্যমে অসীয়ত কার্যকর হয়ে যাবে।

১৩. অসীয়তকারীর জন্য তার অসীয়তকৃত পূর্ণ সম্পত্তি বা তার কিছু অংশ গ্রহণ করা অথবা পুরোপুরিভাবে অসীয়ত প্রত্যাহার করা বৈধ রয়েছে। উমার ৫৫^১ বলেছেন,

يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مَا شَاءَ مِنَ الْوَصِيلَةِ

“কোনো ব্যক্তি তার অসীয়তকে ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তন করতে পারবে।”^{১৫৭}

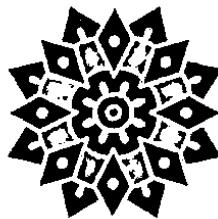
১৪. এমন প্রত্যেক ব্যক্তিরই অসীয়ত করা সঠিক হবে যারা অন্য কাউকে মালিক বানাতে পারে। চাই সে হোক মুসলিম কিংবা কাফের। মহান আল্লাহ বলেন:

إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أُولِيَّا بِكُمْ مَغْرُوفًا

“তবে তোমরা তোমাদের বন্ধুবাক্ষবদের প্রতি কল্যাণকর কিছু করতে চাইলে, সেটা ভিন্ন কথা।”

[সূরা আহ্যাব : ৬]

^{১৫} সুলামুল বায়তুল কুরআন ৬/২৮১; ইমাম আবদুর রায়হাক তার মুসল্লাফে ‘আতা; ফুউস ও আবুশ শাশা এর আসার থেকে বর্ণনা করেন ১/৭১



الباب الثالث: في العتق، والكتابة، والتدبیر

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : দাস মুক্তি, মুকাবাব শোলাম ও মুদাক্বার শোলাম

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: فِي تَعْرِيفِ الْعَتْقِ، وَمِشْرُوعِيهِ، وَفَضْلِهِ، وَحِكْمَةِ مِشْرُوعِيهِ

প্রথম মাসআলা: দাস মুক্তির পরিচয়, শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল, তার
ক্ষয়ীলত এবং শরীয়ত সম্মত হওয়ার হিকমাহ

১. عتق (দাস মুক্তির) পরিচিতি:

এর শাব্দিক অর্থ: عَنْ بَرْنَهُ يَهُوَ وَبَرْنَهُ سَاكِنٌ دِيَّوْهُ أَرْثُ هَلَّوْ: স্বাধীনতা ও নিষ্কৃতি লাভ
করা, তাদের প্রচলিত কথা عَتْقُ الْفَرْسِ থেকে নির্গত। বাক্যটি তখন বলা হয়ে থাকে যখন
ঘোড়াটি অন্য ঘোড়াদের অগ্রবর্তী হয়ে যায়। আর عَتْقُ الْفَرْخِ অর্থাৎ পাখির ছানাটি মুক্তি পেয়েছে;
বাক্যটি তখন ব্যবহার করা হয় যখন সেটি উড়ে যায়, স্বাধীন হয়ে যায় এবং নিষ্কৃতি লাভ করে।

وَشَرِيعًا: هو تحرير الرقبة وتخلصها من الرق، وإزالة الملك عنها، وثبتت الحرية لها.

শারঙ্গ পরিভাষায়: عَتْقٌ هَلَّوْ দাসদের মুক্তি করে দাসত্বের গতি থেকে নিষ্কৃতি প্রদান করা, তার
থেকে সর্বপ্রকার কর্তৃত্ব অপসারণ করা এবং তার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

২. شریعت سম্মত হওয়ার দলীল:

এটি শরীয়ত সম্মত হওয়ার মূল ভিত্তি হলো কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা।

কুরআন থেকে দলীল: মহান আল্লাহর বাণী: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ﴾

“তাহলে একজন দাসকে মুক্ত করবে।” [সূরা নিসা : ৯৬]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন: ﴿فَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَئْمَسَأَهُ﴾

“একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একজন দাসকে মুক্তি করবে।” [সূরা মুজাদালাহ : ৩]

সুন্নাহ থেকে দলীল: আবু হুরায়রা رض হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

مَنْ أَعْنَقَ رَقَبَةً، أَعْنَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضُوٍّ مِّنْهَا عُضُواً مِّنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ، حَتَّىٰ فَرَجَهُ بِفَرْجِهِ

“কেউ কোনো একজন দাস মুক্তি করলে আল্লাহ সেই দাসের প্রত্যেকটি অঙ্গের বিনিময় তার অঙ্গকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন। এমনকি লজ্জাস্থানের বিনিময়ে তার লজ্জাস্থানকেও।”^{৭৫৮}

ইজমা থেকে দলীল: দাস মুক্তির বিশুদ্ধতা এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের ব্যাপারে উদ্ধতের ইজমা হয়েছে।

৩. ফয়লত: দাস মুক্তি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের অন্যতম একটি মাধ্যম এবং বিরাট আনুগত্যের কাজও বটে। যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা দাস মুক্তির ফজিলতের ব্যাপারে এরশাদ করেন

﴿فَلَكُلُّ رَقَبَةٍ﴾

“ব্যক্তিকে দাসত্বের মানি থেকে মুক্তি দেওয়া।” [সূরা বালাদ : ১৩]

আর উক্ত আলোচনাটি এমন কিছু পথ অবলম্বনের আলোচনায় নিয়ে আসা হয়েছে, যে পথ ধরে কোনো ব্যক্তি চললে তার জন্য রয়েছে মুক্তি এবং কল্যাণ। আর সে পথটি হলো, দাস মুক্তি করা। আর একটু আগেই আবু হুরায়রা رض এর হাদীসে দাস মুক্তির ফয়লত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং আবু উমামা رض নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন।

إِنَّمَا امْرِيٌ مُسْلِمٌ، أَعْنَقَ امْرًا مُسْلِمًا، كَانَ فَكَارَهُ مِنَ النَّارِ... الحَدِيث

“কোনো মুসলিম ব্যক্তি অপর মুসলিমকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিলে এটিই তার জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের জন্য যথেষ্ট।”^{৭৫৯}

এর ফয়লতের ব্যাপারে বহু উদ্ধৃতি রয়েছে।

মহিলা মুক্তি করা অপেক্ষা পুরুষকে মুক্তি করা উত্তম। আর অন্যান্য দাসের তুলনায় মূল্যবান ও উৎকৃষ্ট দাস মুক্তি করা অধিক উত্তম।

৪. শরীয়ত সম্মত হওয়ার হিকমাহসমূহ:

ইসলামে কতিপয় মহৎ উদ্দেশ্য ও বিশুদ্ধ কিছু হিকমাহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দাস মুক্তিকে শরীয়ত সম্মত করা হয়েছে। তা হলো: নির্দোষ মানুষদেরকে দাসত্বের ধৃষ্টতা থেকে মুক্তি দেওয়া, যাতে

^{৭৫৮} মুজাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, ঘ. ২৫১৭; সহীহ মুসলিম, ঘ. ফুআ. ১৫০৯।

^{৭৫৯} তিরমিয়ী, ঘ. ১৫৪৭ এবং তিনি সহীহ বলেছেন। ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহ সুনানুত তিরমিয়ী, ঘ. ১২৫২।

সে যেন স্বীয় মালিকানা গ্রহণ করতে পারে এবং তার উপকার সাধনের জন্য ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী খরচ করতে সামর্থ্যবান হয়।

আর এজন্যই আল্লাহ সুবহনাহওয়া তা'য়ালা হত্যা, রমাযানে স্তু সঙ্গম এবং শপথ ভঙ্গের কাফকারা স্বরূপ দাস মুক্তিকে নির্ধারণ করেছেন।

المسألة الثانية: أركان العتق، وشروطه، وصيغته وألفاظه

দ্বিতীয় মাসআলা: দাস মুক্তির কৃকন শর্ত ও শব্দাবলি

১. দাস মুক্তির কৃকনসমূহ: দাস মুক্তির কৃকন তিনটি:

ক. **الْعَنْقُ** বা মুক্তিকারী: তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যার মাধ্যমে অন্যকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করা হয়।

খ. **الْمُفْتَقِ** বা মুক্তিপ্রাপ্ত: তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যাকে আজাদ করা হয় অথবা মুক্ত হওয়াটা যার জন্য প্রযোজ্য হয়।

গ. **শব্দসমূহ:** আর এগুলো হলো সেই শব্দগুচ্ছ যেগুলোর মাধ্যমে আজাদ করাটা বাস্তবায়িত হয়।

২. তার শর্তসমূহ: দাস মুক্ত করা বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য নিম্নে বর্ণিত শর্তগুলো জরুরি:

► মুক্তিকারীকে উদ্দিষ্ট কাজের যোগ্য হতে হবে। অর্থাৎ তাকে প্রাপ্তবয়স্ক, বিবেকবান, বিচক্ষণ এবং স্বেচ্ছাধীন হতে হবে। কাজেই শিশু, উন্নাদ মানসিক বিকারগ্রস্ত এবং অনিচ্ছুক ব্যক্তির দাস মুক্তি করা বিশুদ্ধ হবে না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

رُفِعَ الْقَلْمَنْ عَنْ تَلَاثَةِ، عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَلْعَفَ، وَعَنِ الْمُجْنُونِ حَتَّىٰ يُفْقَيَ، وَعَنِ النَّاَئِمِ حَتَّىٰ يَسْتَفِقَظُ

“তিনি ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। শিশু বালেগ হওয়ার আগ পর্যন্ত, উন্নাদ বোধ শক্তি ফিরে পাওয়ার আগ পর্যন্ত ও ঘুমন্ত ব্যক্তির জাগ্রত হওয়ার আগ পর্যন্ত।”^{৭৬০}

তাছাড়া যাকে বাধ্য করা হয়েছে এমন ব্যক্তির দাস মুক্তি বিশুদ্ধ হবে না যেমনিভাবে তার কোনো কাজই গৃহীত হয় না।

► তাকে সেই দাসের মালিক হতে হবে। কাজেই যে মালিক নয় তার পক্ষ থেকে দাস মুক্ত করা বিশুদ্ধ হবে না।

- ▶ দাসকে এমন কোনো হকের সাথে জড়িত থাকা যাবে না যেটি তাকে মুক্ত হতে বাধাগ্রেস্ত করে। যেমন ঝণ অথবা দিয়াত। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত সে এই ঝণ পরিশোধ না করবে অথবা দিয়াত প্রদান না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে মুক্ত করাটা সঠিক হবে না।
 - ▶ অবশ্যই দাস মুক্ত করাটা হতে হবে স্পষ্ট, দ্যথহীন শব্দ উচ্চারণ অথবা এমন ইঙ্গিতের মাধ্যমে যেটা স্পষ্ট শব্দ উচ্চারণের স্থলাভিষিক্ত হবে। শুধুমাত্র নিয়ত করার মাধ্যমে দাস মুক্ত করা বাস্তবায়ন হবে না। কেননা নিয়ত এর মাধ্যমে মালিকানা অপসারিত হয় না।

୭. ଶବ୍ଦମୟୁହ

- ▶ স্পষ্ট শব্দাবলীর মাধ্যমে; যেমন মুক্ত করা বা স্বাধীন করার শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে অথবা অনুরূপ অর্থবোধক শব্দের মাধ্যমে যেমন- ‘তুমি স্বাধীন, মুক্ত, বন্ধনহীন, আজাদকৃত’ অথবা ‘আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম।’
 - ▶ পরোক্ষভাবে; যেমন যেখায় খুশি চলে যাও! অথবা তোমার উপর আমার কোনো মালিকানা নেই অথবা তোমার উপর আমার কোনো কর্তৃত্ব নেই! দূরে কোথাও চলে যাও!, দূর হও!, আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম এবং অনুরূপ শব্দাবলী। এ ধরনের পরোক্ষ শব্দ উচ্চারণ এর মাধ্যমে দাস মুক্ত করা বাস্তবায়িত হবে না। তবে যদি ব্যক্তি তাকে মুক্ত করে দেওয়ার নিয়ত করে তাহলে বাস্তবায়িত হবে।

المُسَأَّلَةُ التَّالِثَةُ: مِنْ أَحْكَامِ الْعُقُوقِ

১. কোনো দাস বা দাসীর মালিকানায় একাধিক ব্যক্তির যৌথ অংশগ্রহণ বৈধ রয়েছে।
 ২. যখন কোনো ব্যক্তি যৌথভাবে ক্রয়কৃত গোলামকে মুক্ত করবে তখন শুধুমাত্র তার অংশটাই মুক্ত করা হবে। আর অপর মালিকের অংশের ক্ষেত্রে করণীয় হলো, মুক্তকারী ব্যক্তি সামর্থ্যবান হলে সে অপর অংশীদারের অংশ আজাদ করে দিবে এবং গোলামের মূল্য নির্ধারণ করে অপর অংশীদারকে তা প্রদান করবে। আর যদি মুক্তকারী অংশীদার স্বাবলম্বী না হয় তাহলে তাকে অপর অংশীদারের অংশ প্রদান করতে হবে না। বস্তুত গোলাম নিজেই অপর অংশীদারের মূল্য জোগাড় করার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে। অতঃপর তাকে মূল্য প্রদানের মাধ্যমে সে নিজেকে মুক্ত করে নিবে। আর এক্ষেত্রে বিষয়টি মুকাতাব গোলাম এর মতো।

ଦୀନୀଳ: ରାମୁଲୁନ୍ଧାଇ ସାନ୍ଧାନ୍ଧାଇ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ଧାମ ଏର ବାଣିଃ

«مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَا لَيْلَةٌ يَلْغُ تَمَنَّى الْعَبْدُ قُومٌ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةُ عَذْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصْمَصَهُمْ، وَعَقَّ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»

“কেউ যদি কোনো ক্রীতদাস হতে নিজের অংশ মুক্ত করে আর ক্রীতদাসের মূল্য পরিমাণ অর্থ তার কাছে থাকে, তবে তার উপর দায়িত্ব হবে ক্রীতদাসের ন্যায্য মূল্য নির্ণয় করা। তারপর দেশীকদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশ পরিশোধ করবে এবং ক্রীতদাসটি তার পক্ষ হতে মুক্ত হয়ে যাবে, কিন্তু (সে পরিমাণ অর্থ) না থাকলে তার পক্ষ হতে ততটুকুই মুক্ত হবে যতটুকু সে মুক্ত করেছে।”^{৭৩} নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন:

(مَنْ أَعْنَتْ نَصِيبًا—أَوْ شَقِيقًا—فِي مُكْلُوكٍ، فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا قَوْمٌ عَلَيْهِ، فَإِنْ شَتَّى عِرْضَةً فِي عَلَيْهِ)

“কেউ অংশীদারিত্ব ক্রীতদাস হতে নিজের ভাগ বা অংশ মুক্ত করে দিলে অর্থ ব্যয়ে সেই ক্রীতদাসকে নিষ্কাতি দেওয়া তার উপর কর্তব্য, যদি তার কাছে পর্যাপ্ত অর্থ থাকে। অন্যথায় তার ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করা হবে এবং তাকে অতিরিক্ত কষ্ট না দিয়ে উপার্জন করতে বলা হবে।”^{৭৪} প্রকাশ থাকে যে বিষয়টি দাসের ইচ্ছার আনুপাতিক হবে।

৩. অন্য কেউ নয়, দাসের রেখে যাওয়া সম্পদ কেবল মুক্তকারীই পাবে। কারণ দাসের রেখে যাওয়া সম্পদ মুক্তকারীর জন্যই; যেমনিভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

الوَلَايَةُ لِمَنْ أَعْنَتْ

“দাসের রেখে যাওয়া সম্পদ মুক্তকারীর জন্যই সাব্যস্ত হবে।”^{৭৫}

নাবী ﷺ বা মালিকানাকে বংশীয় সমপর্কের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন:

الوَلَايَةُ لِمَنْ كَلَّ خَمْرَةِ النَّسَبِ^{৭৬}

“ওয়ালা একটা বলিষ্ঠ সম্পর্ক যেমন রক্তের সম্পর্ক।”^{৭৭}

৪. যে ব্যক্তি তার দাসকে অন্যায়ভাবে প্রহার, কঠোর শাস্তি দিবে, নির্যাতন ও অঙ্গহানি করবে অথবা অনুরূপ কোনো কিছু করবে, তাহলে তার করণীয় হলো, সেই দাসকে মুক্ত করে দিবে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًا أَمْ يَأْتِيهِ، أَوْ لَطَمَهُ، فَإِنَّ كَفَارَهُ أَنْ يُغْنِمَهُ

^{৭৩} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহ বুখারী, হা. ২৫২২; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৫০১।

^{৭৪} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহ বুখারী, হা. ২৫২৭; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৫০৩।

^{৭৫} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহ বুখারী, হা. ১৪৯৩; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৫০৫।

^{৭৬} معناه: المغالطة في الولاية، وأنها تجري مجرى النسب في الميراث

^{৭৭} ইমাম শাফেক্স তার কিতাবুল উম, হা. ১২৩২; ইমাম হকিম তা মুসতাদরাকে ৪/৩৪১ এবং তিনি সহীহ বলেছেন; ইমাম বাযহাকী ১০/২৯২ সহীহ বলেছেন; শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহল জামে' হা. ৭১৫৭ এবং ইরওয়া ৬/১০৯।

"যে ব্যক্তি নিজ গোলামকে বিনা অপরাধে প্রহার করল কিংবা চপেটাঘাত করল, এর কাফফারা গুলা তাকে মক্ষ করে দিবে।" ৭৬৬

ତବେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଶିକ୍ଷା ଦେଓଯାର ଜନ୍ୟ ମାମଲି ଆଘାତ କରିଲେ କୋନୋ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ।

المسألة الرابعة: التدبر

চতুর্থ মাসআলা: আত-তাদবির তথা মুদ্দাব্বার গোলাম

১. পরিচয়: “মনিবের মৃত্যুর সাথে দাসের মুক্তি হওয়া
সম্পর্ক্যুক্ত করা।”

যেমন বলা হয় দَبَرُ الرَّجُلِ عَبْدِهِ تَدِيرًا তার দাসের জন্য মুক্তির ব্যবস্থা করেছিল।
মৃত্যুর পর কোনো ব্যক্তি তার দাসকে মুক্ত করলে এটি ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে **أعتقد عن**
وَ বা সে তাকে পরে মুক্তি দিল এবাক্যটিও ব্যবহৃত হয়।

المدير: هو العبد الذي حصل له التدبير

মুদ্রাক্ষার: সেই গোলাম যাকে মালিকের মৃত্যুর পর মুক্তির ব্যবস্থা হয়।

ଆର ତାକେ ମୁଦାକାର ନାମେ ନାମକରଣ କରାର କାରଣ: ତାର ମୁକ୍ତ ହୋଯା ମନିବେର ମୃତ୍ୟୁର ପରିବାରୀଯିତ ହୟ । ତାହାଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନେର ପରେଇ ଆସେ ।

২. হৃকুম ও দলীল: মুদাক্বার গোলাম এহুণ ইসলামে বৈধ রয়েছে এবং এর বিশুদ্ধতার উপর গোলামায়ে কেবাম একমত্য পোষণ করেছেন। এর দলীল জাবির সাহ এর হাদীস।

فَقَالَ: «مَنْ يُشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَأَشْتَرَاهُ نُعْيِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ مَهْمَانٍ مِائَةً دِرْهَمًا، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ

“ଆନସାରୀ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି (ମୃତ୍ୟୁର ପର ମୁକ୍ତ ହବେ ଏହି ଶତେ) ତାର ଗୋଲାମକେ ମୁକ୍ତ କରେଛିଲେନ, ତାର ଏହି ଗୋଲାମଟି ଛାଡ଼ା ଆର କୋଣୋ ସମ୍ପଦ ଛିଲ ନା । ଅତଃପର ଏ ସଂବାଦଟି ରସ୍ତୁଲୁଲ୍ଲାହ ସାନ୍ନାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓସା ସାନ୍ନାମ-ଏର ନିକଟ ପୌଛାଲେ ତିନି ବଲଲେନ: ତାକେ ଆମାର କାହିଁ ଥେକେ କେ କ୍ରୟ କରିବେ? ଅତଃପର ନାଈମ ବିନ ଆଦ୍ଦୁଲ୍ଲାହ ଆଟଶତ ଦିରହାମେର ବିନିମୟେ ତାକେ କ୍ରୟ କରେ ନେନ । ଅତଃପର ତିନି ଦେଇ ବିନିମୟ ତାର ନିକଟ ପ୍ରଦାନ କରେନ ।”^{୧୬୭}

ନାଟ୍ୟଶ ମୁଦ୍ରଣିମ, ଶ୍ରୀ ଫୁଲା. ୧୯୫୭-୩୦ ।

ମୁଖ୍ୟାକ୍ଷାନ୍ତ ଆଲାହିଟି; ସହୀହ ବୁଖାରୀ, ହ. ୧୪୯୩; ସହୀହ ମୁସଲିମ, ହ. ୧୯୭।

৩. মুদাক্কার গোলামের বিধান:

- স্বাভাবিকভাবে প্রয়োজনের তাপিদে মুদাক্কার গোলাম বিক্রি করা বৈধ রয়েছে। তাছাড়া কিছু আহলু ইলম প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে উভয় ক্ষেত্রে বিক্রয় করার বৈধতা প্রদান করেছে। পূর্বে উল্লিখিত জাবির ~~কারণ~~ এর হাদীসের উপর নির্ভর করে।
- মালের এক-তৃতীয়াংশ হতে মুদাক্কার গোলামকে মুক্ত করতে হবে, সম্পূর্ণ মাল থেকে নয়। কেননা তার হৃকূম অসীয়তের অনুরূপ। এ দুটোই মৃত্যুর আগে বাস্তবায়িত হয় না।
- মুদাক্কার গোলামকে দান করে দেওয়া মনিবের জন্য বৈধ রয়েছে। কারণ দান করা বিক্রয় করার মতোই। মালিকের জন্য মুদাক্কার দাসীর সাথে সঙ্গম করা বৈধ রয়েছে। কারণ প্রকৃতপক্ষে সে একজন দাসীই। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أُوْمَّ مَلَكُتُ أَيْمَانِهِمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾

“নিজেদের স্ত্রী ও মালিকানাত্তুক দাসী ব্যতীত, এক্ষেত্রে তারা নিন্দিত হবে না।” [সূরা মুমিনুন : ৬]

المسألة الخامسة: المكاتب পঞ্চম মাসতালা: মুকাতাব গোলাম

১. তার পরিচয়:

মকাতব এর শাব্দিক অর্থ: শব্দটি কৃত মূল ধাতু থেকে গৃহীত। অর্থ অত্যাবশ্যক করা, বাধ্যতামূলক করে দেওয়া।

وشرع: هي إعناق العبد نفسه من سيده بمال يكون في ذمته يؤدى مؤجلًا.

পরিভাষায়: নির্ধারিত সময়ে মূল্য পরিশোধ করার মাধ্যমে গোলাম নিজেকে তার মনিবের করায়ত থেকে মুক্ত করে নেওয়া।

মুকাতাব মকাতব শব্দের এ বর্ণে যবর দিয়ে: এ গোলামকে বুঝায় যার মুক্ত হওয়া ন্যস্ত থাকে এই সম্পর্কের উপর যে সম্পদ তার মনিবকে প্রদান করতে হয়।

আর এ বর্ণে যের দিয়ে, যে মুক্ত করে তাকে বুঝায়।

আর এটিকে কিতাবাহ (বৃত্ত) নামে নামকরণের কারণ হলো, মনিব তার ও তার দাসের মধ্যস্থতায় এমন একটি চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করেন যেটির উপর দুইজনেই পরিতুষ্ট থাকেন।

২. তার হকুম ও দলীলসমূহ:

মনিবের চাহিদাকৃত সম্পদ প্রদানে সামর্থ্যবান উপার্জনকারী সত্যবাদী দাস যখন স্বাধীন হতে চাইবে তখন তাকে এ পক্ষতিতে মুক্ত করা মুস্তাহাব। আল্লাহ তাআলার বাণী,

﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾

“তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চাইলে, তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে বলে জানতে পার।” [সূরা নূর : ৩৩]

৩. মুকাতাব দাসের বিধিবিধান:

➤ দাস-দাসী যখন তাদের মনিবের সাথে চুক্তিকৃত সম্পদ প্রদান করতে পারবে তখন তারা মুক্ত হয়ে যাবে। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

الْمَكَاتِبُ عَبْدُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ

“নির্দিষ্ট অংকের অর্থ পরিশোধ করার বিনিময়ে মুক্তিলাভের চুক্তিতে আবদ্ধ দাস তা হতে এক দিরহাম অবশিষ্ট থাকলেও সে দাসই থেকে যাবে।”^{৭৬৮}

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, যখন দাস চুক্তিকৃত সম্পদ তার মনিবকে প্রদান করবে তখন সে আর দাস থাকবে না, স্বাধীন হয়ে যাবে।

➤ উপরিউক্ত হাদীসটির আলোকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, চুক্তিকৃত সম্পূর্ণ সম্পদ গোলাম তার মনিবকে প্রদান করার আগ পর্যন্ত স্বাধীন বলে বিবেচ্য হবে না।

➤ গোলাম তার চুক্তিকৃত সম্পদ মনিবকে প্রদান করার পর তার অলা (রেখে যাওয়া সম্পদ) তার মনিবের হয়ে যাবে। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

الوَلَاءُ لِنِّيْ أَعْنَىْ

“দাসের রেখে যাওয়া সম্পদ মুক্তকারীর জন্যই সাব্যস্ত হবে।”^{৭৬৯}

➤ মনিবের উচিত চুক্তিকৃত সম্পদ থেকে কিছু ছাড় দেওয়া। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَأَنْوَهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْتُمْ﴾

“আর আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তাদেরকে দাও।” [সূরা নূর : ৩৩]

^{৭৬৮} সুনান আবু দাউদ, ঘ. ৩৯২৬; তিরমিয়ী, ঘ. ১২৬০ এবং তিনি হাসান বলেছেন; শাব্দিক বর্ণনা ইয়াম আবু দাউদের। ইয়াম আপবানী হসান বলেছেন, ইরওয়া নং ১৬৭৩।

^{৭৬৯} মুস্তাফাকুন আলাইহি: সহীহ বুখারী, ঘ. ১৪৯৩; সহীহ মুসলিম, ঘ. ফুআ. ১৫০৫।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আবুস বলেন,

ضَعُوا عَنْهُمْ مِنْ مُكَاتِبِهِمْ

“তোমরা তোমাদের গোলামের দায়ভার কিছুটা কমিয়ে দাও।”^{৭৭০}

তাছাড়া তাকে ছাড় দেওয়া-না দেওয়া বা সেই সম্পদ পুনরায় তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি মনিবের ইচ্ছাধীন।

- গোলাম চুক্তিকৃত মূল্য এক কিণ্ঠি^{৭১}, দুই কিণ্ঠি বা ততোধিক কিণ্ঠিতে পরিশোধ করতে পারবে। তবে শর্ত হলো- কিণ্ঠি সংখ্যা ও প্রত্যেকটিতে যে পরিমাণ মূল্য পরিশোধ করবে সেটি নির্ধারিত থাকতে হবে।
- মুকাতাব গোলাম তার মনিবের বিনা অনুমতিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না।
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّمَا عَبْدٌ تَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ

“যেকোনো ক্রীতদাস তার মনিবের অনুমতি ছাড়া বিশে করবে সে ব্যতিচারী।”^{৭৭২}

এমনকি বিনা অনুমতিতে কোনো উপপত্তি বা রক্ষিতা গ্রহণ করতে পারবে না।

- মুকাতাব গোলাম বিক্রি করা বৈধ এবং এই চুক্তিটা ক্রেতার নিকট হস্তান্তর হয়ে যাবে। গোলাম তার পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করতে পারলে মুক্ত হয়ে যাবে এবং তার অলা (রেখে যাওয়া সম্পদ) ক্রেতার জন্য নির্ধারিত হবে। বারিরা^{আলুহু}-এর ঘটনায় আয়িশাহ^{আলুহু}-এর হাদীস:

اَشْتَرِيهَا وَأَعْتَقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِنِّيْ اَعْتَقَ

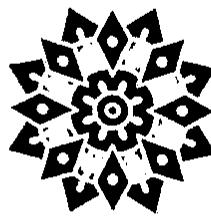
“তুমি তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দাও। নিশ্চয়ই মালিকানা তারই হবে যে মুক্ত করে।”^{৭৭৩}

^{৭৭০} বায়হাকী তার সুনানুস সগীর, হা. ৩৪৭৮।

النجم: هو الوقت الذي يحل فيه الأداء، يقال: تجمت عليه الدین إذا جعلته نجمًا.

^{৭৭১} সুনান আবু দাউদ, হা. ২০৭৮; তিরমিয়ী, হা. ১১১১ এবং তিনি হাসান বলেছেন; শাইখ আলবানী হাসান বলেছেন, সহীহ সুনান তিরমিয়ী, হা. ৮৮৭; غابر: ব্যতিচারী।

^{৭৭২} মুত্তাফকুন আলাইহি: সহীহ বুখারী, হা. ২৫৬৫; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৫০৪-১২।



الباب الرابع: الفرائض والمواريث চতুর্থ অনুচ্ছেদ: সম্পত্তির অংশ ও উত্তরাধিকার

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المُسَأَّلَةُ الْأُولَى: مَعْنَاهَا وَالْحِثُّ عَلَى تَعْلِمِهَا প্রথম মাসআলা: তার অর্থ ও তা শিক্ষার গুরুত্ব

ইলমুল ফারায়েয বা উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টননীতি একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান, যা প্রতিটি মুসলিমের উপর গুরুত্ব প্রদানপূর্বক শিক্ষা করা ওয়াজিব; কারণ এটি অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়।

এই সৈলিঙ্গকে ফারায়েয নাম দেওয়া হয়েছে, এটি শব্দটি (الفرائض) শব্দের বহুবচন, যা শব্দমূল থেকে গৃহীত, যার অর্থ: নির্ধারণ করা। এই অর্থে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾

“তোমরা যা নির্ধারণ করেছ, তার অর্ধেক।” [সূরা বাকুরাহ : ২৩৭]

الفرض في الشرع: نصيب مقدر شرعاً لمستحقه.

পরিভাষায ফারায়েয বলা হয়: উপযুক্ত হকদারের জন্য শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত অংশ।

علم الفرائض: هو العلم بالمواريث من حيث فقه أحكامها ومعرفة الحساب الموصول إلى قسمتها
ইলমুল ফারায়েয বলা হয়: মিরাস বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধি-বিধান ও বন্টনের হিসাব সম্পর্কে অধ্যয়ন করা।

আর ফ্রেজ শব্দটি (المواريث) শব্দের বহুবচন, যার অর্থ: উত্তরাধিকারের জন্য মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদের অধিকার।

উত্তরাধিকারের ব্যাপারে প্রতিটি মুসলিমেরই গুরুত্ব দেওয়া উচিত। মিরাসের ক্ষেত্রে শরীয়ত কর্তৃক বেঁধে দেওয়া সীমারেখার বাইরে কোনোভাবেই যাওয়া যাবে না। উত্তরাধিকারী তালিকার বহির্ভূত কাউকে উত্তরাধিকারী বানানো যাবে না এবং আসল উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে তার পরিপূর্ণ ইক কিংবা আংশিক হক থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। কিন্তু এমনটি যদি কেউ করেই ফেলে তবে তাকে আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

المسألة الثانية: الحقوق المتعلقة بالتركة وأسباب الميراث وموانعه দ্বিতীয় মাসআলা: উত্তরাধিকার সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট অধিকার, উত্তরাধিকারের কারণ ও তার প্রতিবন্ধকর্তাসমূহ

১. উত্তরাধিকার সম্পত্তি-সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব: মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া নগদ অর্থ, জিনিসপত্র কিংবা হকসমূহকে পরিত্যক্ত সম্পত্তি বলা হয়। [আরবী ভাষায় যাকে بحريّا বলা হয়।-অনুবাদক] মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে চারটি হক জড়িত:

ক. প্রথমত, মৃতব্যক্তির দাফন-কাফনের ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক তৎসংশ্লিষ্ট খরচ বহন করতে হবে। যেমন- কাফনের কাপড়, সুগন্ধী, দাফনের পারিশ্রমিক, গোসল ইত্যাদি।

খ. অতঃপর ঝণ পরিশোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে যাকাত, সাদাকাতুল ফিতর, কাফফারা, মানত এবং এজাতীয় যা কিছু আল্লাহর ঝণের সাথে সম্পৃক্ত সেগুলো সর্বপ্রথম পরিশোধ করতে হবে। অতঃপর মানুষের ঝণ পরিশোধ করতে হবে।

গ. অতঃপর অসীয়ত পূরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে অসীয়তের পরিমাণ মোট সম্পদের এক তৃতীয়াংশের বেশি না হয়।

ঘ. অতঃপর উত্তরাধিকারীদেরকে তাদের প্রাপ্য বন্টন করে দিতে হবে।

ঢুঢ়া বা উত্তরাধিকার: কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে মৃতের সম্পত্তি জীবিতদের মালিকানায় চলে যাওয়াকে ঢুঢ়া বলা হয়।

কখনও কখনও মৃতব্যক্তির সম্পদের সাথে অন্যের অধিকারও জড়িয়ে পড়ে। এগুলোকে বঙ্গুত্তে হক বলা হয়। যেমন- মৃত ব্যক্তি যদি বিক্রেতা হয়ে থাকে তবে তাকে ক্রেতার কাছে পণ্য হস্তান্তর করতে হবে। অথবা সে যদি বন্ধুকদাতা হয়ে থাকে তবে তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। যেহেতু এই সম্পদগুলো 'উত্তরাধিকারে' পরিণত হওয়ার আগে ব্যক্তির মূল সম্পদের অভর্তুন্ত ছিল, সেহেতু এক্ষেত্রে উল্লিখিত হকগুলো মৃতের দাফন-কাফনের পূর্বেই আদায় করতে হবে।

২. উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হওয়ার কারণসমূহ: উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হওয়ার তিনটি কারণ রয়েছে:

প্রথম কারণ: বিবাহ: দুইজন সাক্ষী ও একজন ওলীর মাধ্যমে বৈধ বিবাহ হতে হবে। এক্ষেত্রে সহবাস কিংবা নির্জনাবাস সাব্যস্ত হওয়া শর্ত নয়। সার্বজনীনভাবে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَئِمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُهُمْ﴾

"তোমাদের স্ত্রীদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক তোমাদের জন্য।" [সূরা নিসা : ১৪]

দ্বিতীয় কারণ: বংশীয় সম্পর্ক: মৃতের নিকটাত্তীয়। সেটা হলো: মানুষের একে অপরের সাথে জৈবিক সম্পর্ক। সেটা নিকটবর্তী কিংবা দূরবর্তী হতে পারে। ব্যক্তির পূর্বপুরুষ, উত্তরপুরুষ, হওয়াশী (আতীয়তার বা ভাই ও চাচা) বংশীয় সম্পর্কের আওতাভুক্ত।

পূর্বপুরুষ: বাবা, দাদা এবং তাদের উর্ধ্বতন পুরুষ।

উত্তরপুরুষ: ছেলে, ছেলের ছেলে এবং তাদের অধিষ্ঠন পুরুষ।

তৃতীয় কারণ: আল-ওয়ালা: এটি এমন একটি বন্ধন যা মনিব কর্তৃক তার দাসকে মুক্ত করার মাধ্যমে তৈরি হয়। সকলের একমতে, আজাদকৃত দাস কখনও মনিবের ওয়ারিস হতে পারে না। সুতরাং, ওয়ারিস সাব্যস্ত হওয়ার দুটি কারণ পাওয়া গেল: ১. বংশীয় সম্পর্ক ২. বৈধ বৈবাহিক সম্পর্ক

৩. উত্তরাধিকারী হওয়ার প্রতিবন্ধকতাসমূহ: উত্তরাধিকারী না হওয়ার তিনটি প্রতিবন্ধকতা:

ক. হত্যা: সকল আলেম এব্যাপারে একমত যে, ‘ইচ্ছাকৃত হত্যা’ উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হওয়ার জন্য অন্যতম একটি প্রতিবন্ধকতা। সুতরাং, কেউ যদি অন্যায়ভাবে তার পূর্বসূরীকে হত্যা করে তবে সে তার উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। রসূল ﷺ বলেছেন:

لَيْسَ لِلْعَاقِلِ مِنَ الْمُرَاثِ شَيْءٌ

“হত্যাকারীর জন্য মীরাসের কোনো অংশ নেই।”^{৭৭৪}

খ. দাসত্ব: একজন দাস তার নিকট আত্মায়ের উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। কারণ, উত্তরাধিকারী সূত্রে দাস কোনো সম্পত্তির মালিক হলে সেটা মূলত তার মনিবের মালিকানায় চলে যায়। অনুরূপভাবে, একজন দাসও কাউকে উত্তরাধিকারী বানাতে পারে না; কারণ সে কোনো সম্পদের মালিক নয়।

গ. পূর্বসূরী বা উত্তরাধিকারী রেখে যাওয়া ব্যক্তি ও উত্তরাধিকারির মধ্যে দ্঵ীনের পার্থক্য: এটা উত্তরাধিকারের প্রতিবন্ধকতা। নাবী ﷺ বলেন:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“কোনো কাফেরের কোনো মুসলিমের উত্তরাধিকারী হবে না এবং কোনো মুসলিম কোনো কাফেরের উত্তরাধিকারী হবে না।”^{৭৭৫}

المسألة الثالثة: أقسام الوراثة

তৃতীয় মাসআলা: উত্তরাধিকারের প্রকার

উত্তরাধিকার দুই প্রকার: পুরুষ ও মহিলা।

পুরুষদের মধ্য থেকে উত্তরাধিকার ১০ প্রকার:

১ ও ২. ছেলে ও তার ছেলে এবং অধিষ্ঠন পুরুষ: মহান আল্লাহর বাণীর ভিত্তিতে।

^{৭৭৪} মুদ্দাস দারাকুত্বী, হ্য. ৪১৪৮; বাযহাবী, হ্য. ১২২৪১; শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, ইরওয়াউল গালীল নং ১৬৭১।

^{৭৭৫} সহীহ মুসলিম, হ্য. ফুআ. ১৬১৪।

﴿يُوصِيْكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِيَلْدَكِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْتَيْنِ﴾

“আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক পুত্রের জন্য দুই কন্যার অংশের সমপরিমাণ।” [সূরা নিসা : ১১]

৩ ও ৪. বাবা ও তার বাবা এবং উর্ধ্বতন পুরুষ: মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَاَبُوْنِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَسْدُسٌ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾

“আর যদি তার সন্তান থাকে তবে তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে তার পিতামাতা প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ।” [সূরা নিসা : ১১]

আয়াতাংশে উল্লিখিত ‘পিতা’র মাঝে ‘দাদা’ও অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর রসূল ﷺ দাদার জন্য এক-ষষ্ঠমাংশ নির্ধারণ করেছেন।

৫. যে-কোনো দিক থেকে ভাই (সহোদর, বৈমাত্রেয়, বৈপিত্রেয়):

﴿إِنْ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ يَأْخُذْ فَلَهَا نِصْفٌ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾

“কোনো ব্যক্তি যদি নিঃসন্তান হয়ে মারা যায় এবং তার এক বোন থাকে, তবে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক। আর সে (মহিলা) যদি নিঃসন্তান হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে।” [সূরা নিসা : ১৭৬]

মহান আল্লাহ আরও বলেন:

﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ أَمْرَأً أَوْ أَخْ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَسْدُسٌ﴾

“যদি কোনো পুরুষ অথবা নারী ‘কালালাহ (পিতা-মাতা ও সন্তানহীন) উত্তরাধিকারী হয়, আর তার এক ভাই অথবা বোন থাকে, তবে প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ।” [সূরা নিসা : ১২]

৬. বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ছেলে ওয়ারিস হলেও বৈপিত্রেয় ভাইয়ের ছেলে ওয়ারিস হবে না; কেননা সে ‘যুল আরহামে’র অন্তর্ভুক্ত।

৭ ও ৮. চাচা ও চাচার ছেলে; সে বাবার আপন ভাই হতে পারে অথবা তার বৈমাত্রেয় ভাইও হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে ‘যুল আরহাম’ হওয়ার কারণে বৈপিত্রেয় ভাই ওয়ারিস হতে পারবে না।

৯. স্বামী: মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَلَكُمْ نِصْفٌ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾

“তোমাদের স্ত্রীদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক তোমাদের জন্য।” [সূরা নিসা : ১২]

১০. দাস আজাদকারী অথবা তার সমপর্যায়ের ব্যক্তি: আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

الْوَلَاءُ لِحُكْمِهِ كُلُّ خَمْمَةٍ النَّسَبِ

“ওয়ালা একটা শক্তিশালী সম্পর্ক যেমন রজের সম্পর্ক।”^{৭৭৬}

^{৭৭৬} ইমাম শাফেঈ তার কিতাবুল উম, হা. ১২৩২; ইমাম হকিম তা মুসতাদরাকে ৪/৩৪১ এবং তিনি সহীহ বলেছেন; ইমাম বায়হাকী ১০/২৯২ সহীহ বলেছেন; শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীলুল জামে’ হা. ৭১৫৭ এবং ইরওয়া ৬/১০৯।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন : إِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْنَى

“দাসের রেখে যাওয়া সম্পদ মুক্তকারীর জন্যই সাব্যস্ত হবে।”^{৭৭৭}

মহিলাদের মধ্য থেকে উত্তরাধিকার ৭ প্রকার :

১ ও ২. কন্যা, ছেলের কন্যা বা নাতনী এবং তার অধিষ্ঠন ছেলের কন্যা : মহান আল্লাহ বলেন :

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّهِ كُلُّ حَظٍّ أَلْأَثْنَيْنِ إِنَّ كُلَّ نِسَاءٍ فَوْقَ أَثْنَتِينِ فَلَهُنَّ ثُلَّةً مَا تَرَكُ رَبَّانِي
كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا الْتِصْفُ﴾

“আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক পুত্রের জন্য দুই কন্যার অংশের সমপরিমাণ। কিন্তু শুধু কন্যা দুইয়ের বেশি থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ। আর এক কন্যা থাকলে তার জন্য অর্ধেক।” [সূরা নিসা : ১১]

৩. মা : মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَلَا يَبُوئِهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلْسُدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُهُ فَلَأُمِّهُ
الْفُلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ زَوْجٌ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الْسُّدُسُ﴾

“আর যদি তার সন্তান থাকে তবে তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে তার পিতামাতা প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার উত্তরাধিকার হয় তার পিতামাতা তখন তার মায়ের জন্য তিন ভাগের এক ভাগ। আর যদি তার ভাই-বোন থাকে তবে তার মায়ের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ।” [সূরা নিসা : ১১]

৪. দাদী : নাবী ﷺ তার জন্য এক-ষষ্ঠমাংশ ধার্য করেছেন। এ ব্যাপারে বুরাইদা رض থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে-

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُوْنَهَا أُمٌّ

“নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃতের মাতা না থাকার অবস্থায় সম্পত্তি থেকে দাদীর জন্য এক ষষ্ঠমাংশ দিয়েছেন।”^{৭৭৮}

সুতরাং, এক্ষেত্রে দাদীর জন্য এক-ষষ্ঠমাংশ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য মায়ের অনুপস্থিতি শর্ত।

৫. বোন : এক্ষেত্রে সে আপন কিংবা বৈমাত্রেয় কিংবা বৈগিত্রেয় হতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ أُمْرَأً أَوْ أُخْتَهُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلْسُدُسُ﴾

^{৭৭৭} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহ বুখারী, হা. ১৪৯৩; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৫০৫।

^{৭৭৮} সুনান আবু দাউদ, হা. ২৮৯৪; ইবনু মাজাহ, হা. ২৭২৪; তিরমিয়ী, হা. ২১০১। হাফেয ইবনু যাজার বলেন, ইবনু খুয়ায়মাহ ও ইবনু লক্তম সহীহ বলেছেন এবং ইবনু আদী শক্তিশালী করেছেন, বুলুগুল মারাম নং ৮৯৬।

“যদি কোনো পুরুষ অথবা নারী ‘কালালাহ (পিতা-মাতা ও সন্তানহীন) উত্তরাধিকারী হয়, আর তার এক ভাই অথবা বোন থাকে, তবে প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ।” [সূরা নিসা : ১২]

মহান আল্লাহ আরও বলেন: ﴿إِنْ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفٌ مَا تَرَكَ﴾

“কোনো ব্যক্তি যদি নিঃসন্তান হয়ে মারা যায় এবং তার এক বোন থাকে, তবে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক।” [সূরা নিসা : ১৭৬]

মহান আল্লাহ আরও বলেন: ﴿فَإِنْ كَانَتَا أَنْتَيْنِ فَلَهُمَا الْكُلُّانِ مِمَّا تَرَكَ﴾

“অতঃপর যদি দুই বোন থাকে তবে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ।” [সূরা নিসা : ১৭৬]

৬. স্ত্রী: মহান আল্লাহন বাণীর ভিত্তিতে । ﴿وَلَهُنَّ أَرْبُعٌ مِمَّا تَرَكُنَّ﴾

“তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ।” [সূরা নিসা : ১২]

৭. দাস মুক্তিকারিণী: নারী ﴿إِنَّ الْوَلَاءَ إِنْ أَعْنَقَ﴾ বলেন:

“দাসের রেখে যাওয়া সম্পদ মুক্তিকারীর জন্যই সাব্যস্ত হবে।”^{৭৭৯}

المسألة الرابعة: أقسام الورثة باعتبار الإرث

চতুর্থ মাসআলা: উত্তরাধিকার অনুসারে উত্তরাধিকারীদের প্রকার

প্রথম প্রকার: যে সমস্ত ব্যক্তি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট অংশ সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়। এ জাতীয় সাত প্রকার ব্যক্তি রয়েছে। তারা হলো: স্বামী-স্ত্রী, দাদী-নানী, মা, মায়ের পক্ষের ছেলে-মেয়ে।

দ্বিতীয় প্রকার: যে সমস্ত ব্যক্তি শুধুমাত্র আসাবা (তথা যাদের জন্য নির্ধারিত কোনো সম্পদ নেই, বরং নির্দিষ্ট অংশের অধীকারীদের হক দিয়ে দেওয়ার পর যা বাকি থাকে তারা সেটার মালিক হয়।-সম্পাদক) হিসেবে সম্পদ পেয়ে থাকেন। এ জাতীয় ব্যক্তি রয়েছে বারোজন। তারা হলো: ১. ছেলে, ২. ছেলের ছেলে/নাতি, ৩. সহোদর ভাই ৪. সহোদর ভায়ের ছেলে, ৫-৬. বৈমাত্রিক ভাই ও তার ছেলে, ৭-৮. আপান চাচা ও তার ছেলে, ৯-১০. বৈমাত্রের চাচা ও তার ছেলে, ১১-১২. দাসদাসী আজাদকারী পুরুষ ও নারী।

তৃতীয় প্রকার: যে সমস্ত ব্যক্তি কখনো আসাবা হিসেবে উত্তরাধিকারী হয় আবার কখনো নির্দিষ্ট অংশের উত্তরাধিকারী হয়। আবার কখনো একইসাথে আসাবা ও নির্দিষ্ট অংশ উভয়টির মাধ্যমে উত্তরাধিকারী হয়। তারা হলো: পিতা ও দাদা।

^{৭৭৯} মুন্তাফাকুন আলাইহি: সহীহ বুখারী, হা. ১৪৯৩; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৫০৫।

চতুর্থ প্রকার: যে সমস্ত ব্যক্তি কখনো নির্দিষ্ট অংশের মাধ্যমে আবার কখনো আসাবার মাধ্যমে সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়। তবে তারা একইসাথে আসাবা ও নির্দিষ্ট অংশের মাধ্যমে উত্তরাধিকারী হয় না। তারা হলো: স্বামী ব্যতীত অন্যান্য যারা অর্ধেক অংশ পেয়ে থাকে এবং যারা দুই তৃতীয়াংশ পেয়ে থাকে।

সামষ্টিকভাবে নির্দিষ্ট অংশ পেয়ে থাকে এমন ব্যক্তি রয়েছে একুশজন:

যারা নির্দিষ্ট অংশ পেয়ে থাকে তাদের নির্দিষ্ট অংশ ছয়টি। সেগুলো হলো, অর্ধেক; একচতুর্থাংশ; এক অষ্টমাংশ; দুই তৃতীয়াংশ; এক তুতীয়াংশ এবং এক ষষ্ঠাংশ।

প্রথমত: যারা অর্ধেক অংশের উত্তরাধিকারী হয় তারা পাঁচ প্রকার:

১. **স্বামী:** যখন স্বামীর পক্ষ হতে অথবা অন্যপক্ষ থেকে ছেলে-মেয়ে ওয়ারিস থাকবে না।

২. **কন্যা:** যখন তার সাথে বোনের মধ্য থেকে কোনো শরীকানা থাকবে না এবং তাকে আসাবা করে দেয় এমন কোনো ভাই থাকবে না।

৩. **ছেলের মেয়ে/নাতনী:** যখন তার কোনো অংশীদার এবং তাকে আসাবা করে দেয় এমন কেউ এবং মৃতব্যক্তির কোনো সন্তান থাকবে না।

৪. **সহোদর বোন:** যখন তার সাথে তাকে আসাবা করে দেয় এমন কেউ, অংশীদার এবং ফারয়ে ওয়ারিস (সন্তান) ও আসলে ওয়ারিস (পিতা, দাদা) থাকবে না।

৫. **বৈমাত্রেয় বোন:** যখন তার সাথে তাকে আসাবা করে দেয় এমন কেউ অংশীদার, মৃতব্যক্তির কোনো সন্তান, মৃতব্যক্তির পিতা, সহোদর ভাই এবং সহোদর বোন থাকবে না।

দ্বিতীয়ত: যারা এক চতুর্থাংশ অংশ পেয়ে থাকে এ ধরনের ব্যক্তি দুইজন:

১. **স্বামী:** যখন মৃতব্যক্তির সন্তান থাকবে তখন এ সে অংশের অধিকারী হবে।

২. **স্ত্রী:** যখন (মৃত ব্যক্তির) মৃতব্যক্তির কোনো সন্তান থাকবে না, তখন সে এ অংশের মালিক হবে।

তৃতীয়: যারা এক অষ্টমাংশ অংশের উত্তরাধিকারী: তারা হলো, স্ত্রীগণ, চাই একজন হোক বা একাধিক। এটা তখন হবে যখন মৃত ব্যক্তির ফারয়ে ওয়ারিস থাকবে।

চতুর্থত: যারা দুই তৃতীয়াংশ অংশের উত্তরাধিকারী: ১. **কন্যা:** যখন তাদেরকে আসাবা করে দেয় এমন কেউ না থাকে আর আসাবা করে দেয় এমন ব্যক্তি হলো মৃত ব্যক্তির আপন সন্তান। কণ্যাগণ এ অংশের অধিকারী তখন হবে যখন কণ্যাগণ দুই বা ততোধিক হবে।

২. **ছেলের কন্যা/নাতনী:** যখন তাদের সাথে তাদেরকে আসাবা করে দেয় এমন কেউ থাকবে না, আর আসাবাকারী হলো: ছেলের ছেলে/নাতি। এবং যখন ফারয়ে ওয়ারিস থাকবে না। আর ফারয়ে ওয়ারিস হলো: (মৃত ব্যক্তির) ছেলে। এক্ষেত্রে তাদেরকে দুই বা ততোধিক হতে হবে।

৩. সহোদর বোন: যখন তারা দুই বা ততোধিক হয় এবং তাদেরকে আসাবাকারী না থাকে। তাদেরকে আসাবাকারী হলো: সহোদর ভাই। আর যখন তাদের ফারয়ে ওয়ারিস থাকবে না। ফারয়ে ওয়ারিস হলো: (মৃত ব্যক্তির) সন্তানগণ এবং (মৃত ব্যক্তির) ছেলের সন্তানগণ।

৪. বৈমাত্রিক বোন: যখন তারা দুইজন বা ততোধিক হবে। যখন আসাবাকারী থাকবে না। ফারয়ে ওয়ারিস থাকবে না এবং কোনো সহোদর ভাই বোন থাকবে না।

পঞ্চমত: যারা একত্রুতীয়াৎশের উত্তরাধিকারী হন। এ জাতীয় ব্যক্তি দুইজন:

১. মা: যখন মৃতব্যক্তির কোনো সন্তান এবং একাধিক ভাইবোন থাকবে না তখন সে এ অংশের অধিকারী হবে।

২. বৈপিত্রেয় ভাই: যখন তারা দুই বা ততোধিক হবে, ফারয়ে ওয়ারিস থাকবে না অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সন্তান ও ছেলের সন্তানগণ থাকবে না এবং পুরুষ আছলে ওয়ারিস থাকবে না অর্থাৎ মৃতব্যক্তির পিতা ও দাদা থাকবে না।

ষষ্ঠত: যারা এক ষষ্ঠাংশ অংশের উত্তরাধিকারী হয়। এ জাতীয় ব্যক্তি হলো সাতজন।

১. পিতা: যখন ফারয়ে ওয়ারিস বা মৃত ব্যক্তির সন্তানগণ বা মৃত ব্যক্তির ছেলের সন্তানগণ না থাকবে।

২. দাদা: যখন ফারয়ে ওয়ারিস বা মৃতব্যক্তির সন্তান বা মৃত ব্যক্তির ছেলেদের সন্তান থাকবে।

৩. মা: যখন ফারয়ে ওয়ারিস থাকবে অথবা (মৃত ব্যক্তির) একাধিক ভাই থাকবে।

৪. নানী: যখন মা না থাকবে।

৫. ছেলের কন্যা/নাতনী: যখন কোনো আসাবাকারী থাকবে না এবং তার উপরের স্তরের কোনো ফারয়ে ওয়ারিস থাকবে না। তবে যে অর্ধেক অংশের উত্তরাধিকারী হবে সে ব্যতীত। কেননা তার অর্ধেক অংশের মাঝেই সে এক ষষ্ঠাংশ সম্পদ গ্রহণ করেছে।

৬. বৈমাত্রেয় বোন: যখন তাকে কোনো আসাবাকারী থাকবে না। আসাবাকারী হলো তার ভাই। তার সাথে থাকবে মৃত ব্যক্তির সহোদর/আপন বোন, যে অর্ধেক অংশের উত্তরাধিকালী হবে।

৭. বৈপিত্রেয় ভাই-বোন: যখন ফারয়ে ওয়ারিস ও আসলে ওয়ারিস থাকবে না এবং যখন সে একাকী থাকবে।

المسألة الخامسة: في التعصيب

পঞ্চম মাসআলা: আসাবা বানানো

আসাবা (বাচ্চা) তারা হলো ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা নির্ধারিত অংশ ছাড়াই সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। কারণ আসেব (বাচ্চা) যখন একাকী থাকে, তখন সে একাই সমস্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী

হয়। আর যখন তার সাথে অন্য কোনো নির্ধারিত অংশের হকদার থাকে, তখন তারা তাদের সম্পদ নিয়ে নেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা সে গ্রহণ করে। কারণ নাবী  বলেছেন:

الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا يَقِي فِلَاؤِي رَجُلٌ ذَكَرٌ

“তোমরা নির্ধারিত অংশের হকদারদের হক দিয়ে দাও, অতঃপর যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে তা নিকটবর্তী পুরুষদের জন্য।”^{৭৮০}

আসাৰা তিনি প্ৰকাৰः

١. العصبة بالنفس، باه سکل بیکنی نیجے نیجے هی آسافا هی!
 ٢. العصبة بالغیر، باه سکل بیکنی اننے رے مادھیمے آسافا هی!
 ٣. العصبة مع الغیر، باه سکل بیکنی اننے رے ساتھے آسافا هی!

১. যে ব্যক্তিরা নিজে নিজেই আসাবা হয়: তারা হলো: ছেলে, ছেলের ছেলে বা আরও নিচের পর্যায়ে যারা থাকবে তারা। পিতা, দাদা, পরদাদা বা তার উপর পর্যায়ে যারা থাকবে তারা। সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই ও তাদের উভয়ের সন্তান, যদিও তা আরও উঁচু স্তরের হয়। সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই, ও তাদের উভয়ের সন্তান, যদিও তা আরও নিচ পর্যায়ের হয়। আপান চাচা, বৈমাত্রেয় চাচা, বা আরও যারা উপর পর্যায়ের রয়েছে এবং তাদের উভয়ের সন্তানগণ, যদিও তারা নিচ পর্যায়ের হয়। দাস-দাসী আজাদকারী পুরুষ ও নারী।

তাদের মধ্যে যে উত্তরাধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে একাই থাকবে, সে একাই সমস্ত সম্পদ গ্রহণ করবে। আর যখন নির্ধারিত অংশের উত্তরাধিকারীদের সাথে থাকবে, তখন তারা তাদের নির্ধারিত অংশ নিয়ে নেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা তারা পাবে। আর যদি কিছুই অবশিষ্ট না থাকে, তবে তারা কিছুই পাবে না।

২. যারা অন্যের মাধ্যমে আসাবা হয়: তারা হলো: কন্যা, ছেলের কন্যা বা নাতনী, সহোদর বোন, বৈমাত্রেয় বোন। এরা সকলে তাদের ভাইদের সাথে আসাবা হয়। আর নাতনী তার স্তরে যারা নাতি থাকে, চাই সে নাতনীর আপন ভাই হোক বা চাচাত ভাই হোক, তার মাধ্যমে বা প্রয়োজন তার চেয়ে আরও নিছু স্তরের কেউ যদি থাকে, তাবে তার মাধ্যমেও সে আসাবা হতে পারে। এ ছাড়া আরও অন্যান্য যে পুরুষরা রয়েছে, তারা তাদের বোনদের ওয়ারিস বানাবে না। যেমন- ভাইদের সন্তানগণ ভাতিজারা, চাচা এবং চাচার সন্তনেরা।

৩. যারা অন্যের সাথে আসাবা হয়: তারা হলো: সহোদর বোনেরা (মৃত ব্যক্তির) কন্যাদের সাথে বা নাতনীদের সাথে আসাবা হয়। আর যদি দুই বা ততোধিক আসাবা একত্রিত হয়, আর তারা

୧୦ ସହୀତୁ ବ୍ୟାକୀ ଥେଣୁ, ସହୀତ ମସରିମ ୨/୧୬୧୫ ।

যদি আত্মীয়তা সম্পর্কে সুন্দর বন্ধন ও স্থরের দিক দিয়ে সমান হয়, তবে তারা উভয়েই সম্পদের অংশীদার হবে। যেমন- ছেলেরা ও ভায়েরা।

আর আত্মীয়তা সম্পর্কের দিক যদি ভিন্ন হয়, তবে শক্তিশালী দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। যেমন- ছেলে ও পিতা।

আর যদি সম্পর্কের দিক যদি একই রকম হয়, কিন্তু স্থরের দিকে ভিন্নতা থাকে, তবে নিকটবর্তী স্তরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যেমন- নাতির উপর ছেলেকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

আর যদি আত্মীয়তা সম্পর্কের দিক ও স্তর সমান হয়, কিন্তু আত্মীয়তার বন্ধন শক্তিশালী হওয়ার দিক থেকে ভিন্নতা থাকে, তবে অধিক শক্তিশালী দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। যেমন- সহোদর ভাইকে বৈমাত্রে ভায়ের উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে।

السؤال السادسة: الحجب

ষষ্ঠ মাসআলা: বাঁধা দেওয়া (উত্তরাধিকারীকে তার উত্তরাধিকার থেকে বাঁধা দেওয়া)

الحجب তথা বাঁধা দেওয়া হলো: সমস্ত সম্পদ হতে বা কিছু সম্পদ হতে উত্তরাধিকারীকে তার উত্তরাধিকার হতে বাঁধা দেওয়া, এমন ব্যক্তির উপস্থিতির কারণে যে ব্যক্তি তার চেয়ে অধিক বেশি হকদার। এটা দুই প্রকার:

১. حجب أولاً وصاف তথা কর্ম বা বিশেষণের কারণে সম্পদ হতে বঞ্চিত হওয়া: যে ব্যক্তি সম্পদ হতে বঞ্চিত হওয়ার তিনটি কারণ: দাস হওয়া বা হত্যা করা, বা মুরতাদ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। যে কোনো একটির সাথে সম্পৃক্ত হবে, সে সম্পদ হতে বঞ্চিত হবে। তার থাকাকে না থাকা বলে গণ্য করা হবে। এটা সকল উত্তরাধিকারীদের ক্ষেত্রে হতে পারে।

২. حجب ألا شخص তথা ব্যক্তির কারণে সম্পদ হতে বঞ্চিত হওয়া: স্বাভাবিকভাবে সম্পদ থেকে বঞ্চিত হওয়া বলতে এটাকেই বুঝায়। এটা দুই প্রকার:

প্রথমতঃ তথা পরিপূর্ণভাবে (সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়া থেকে) বঞ্চিত হওয়া: তা হলো, নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি সামগ্রিকভাবে সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়া থেকে বঞ্চিত হওয়া। এটা সমস্ত ওয়ারিসদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, শুধুমাত্র ছয় প্রকার ব্যক্তি ব্যতীত। তারা হলো: বাবা, মা, স্বামী, স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ে।

দ্বিতীয়তঃ তথা অধিক সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়া থেকে বঞ্চিত হওয়া: তা হলো, অধিক সম্পদ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে কম সম্পদ পাওয়া। এ পদ্ধতিতে সম্পদ হতে বঞ্চিত

হওয়ার কারণ হলো: সে ব্যক্তির চেয়ে বেশি হকদার ব্যক্তি থাকা। এজন্য এটার নামকরণ করা হয়েছে **তথা ব্যক্তির কারণে সম্পদ হতে বঞ্চিত হওয়া**। এটা আবার সাত প্রকার:

[নোট: আসাবা-অনিধারিত অংশ অর্থাৎ যাদের জন্য উত্তরাধিকার সম্পদে নির্ধারিত অংশ থাকে না]

১. অধিক অংশ হতে কম অংশে স্থানান্তরিত হওয়া। এটা ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে যাদের নির্ধারিত দুটি অংশ রয়েছে। যেমন: স্বামী-স্ত্রী, মাতা, নাতনী এবং বৈমাত্রেয় বোন।

২. নির্ধারিত অংশ হতে আসাবাতে স্থানান্তরিত হওয়া। এটা হয়ে থাকে যারা অর্ধেক ও দুই তৃতীয়াংশের উত্তরাধীকারী হয়। যখন তাদের সাথে আসাবাকারী থাকে।

৩. আসাবা থেকে নির্ধারিত অংশের দিকে ফিরে যাওয়া, যা আসাবা থেকে কম। এটা পিতা ও দাদার ক্ষেত্রে হওয়ে থাকে, যখন তারা আসাবা থেকে নির্ধারিত অংশের দিকে আসে।

৪. এক আসাবা হতে আরেক আসাবায় যাওয়া, যা তুলনামূলক কম। এটা সহোদর বোন ও বৈমাত্রেয় বোনের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কারণ তারা মেয়ে ও নাতনীর সাথে থাকলে যতটুকু সম্পদ পেতো, তারা তাদের ভায়ের সাথে আসাবা হলে, তার চেয়ে কম পেয়ে থাকে।

৫. নির্ধারিত অংশ বন্টনের ক্ষেত্রে অনেক লোকের সমাগম হওয়া। যেমন এক চতুর্থাংশ সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে দুজন স্ত্রীর একত্রিত হওয়া অথবা এক ষষ্ঠাংশ সম্পদ বন্টনে একাধিক দাদী থাকা।

৬. আসাবার ক্ষেত্রে অনেক লোকের সমাগম হওয়া। যেমন সম্পূর্ণ সম্পদ বা অবশিষ্ট সম্পদের ক্ষেত্রে অনেক আসাবা হওয়া।

৭. নির্ধারিত অংশের অধিকারীদের আউলে (عول)^{৭৮১} সমাগম ঘটা। যে সমস্ত আসলের ক্ষেত্রে আউল (عول) সংঘটিত হয়ে থাকে।

এরই উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি: যে ব্যক্তি কারো মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত হয়,^{৭৮২} এই সম্পর্ক মাধ্যমই ব্যক্তি তাকে বঞ্চিত করে। আর মৃতব্যক্তির আসলকে (পিতা, দাদা, বা পরদাদাকে) আসলই বঞ্চিত করে (অর্থাৎ পিতা থাকলে দাদাকে বঞ্চিত করবে, আবার যদি পিতা না থাকে, কিন্তু দাদা ও পরদাদা থাকে তবে দাদা পরদাদাকে বঞ্চিত করে)। আর ফুরু ফরুজ কে তার উচু স্তরের ফরুজ ই বঞ্চিত করবে (অর্থাৎ ছেলে, নাতি, নাতির ছেলে এগুলো ফরুজ)। যদি ছেলে থাকে, তবে নাতিকে বঞ্চিত করবে, আর যদি ছেলে না থাকে, কিন্তু নাতি ও নাতির ছেলে থাকে, তবে নাতি নাতির ছেলেকে বঞ্চিত করবে।)। আর হোঁশি (মৃতব্যক্তির ভাই-বোন) কে আসল (বাপ-দাদা) ও ফরুজ বা ফুরু (ছেলে-নাতনী) ও হোঁশি (নিকটবর্তী ভাই-বোন দূরবর্তী ভাইবোনকে) বঞ্চিত করে থাকে।

^{৭৮১} আউল: উত্তরাধিকারের সামষ্টিক নির্ধারিত ভাগের সংখ্যা বৃক্ষি করা এবং তাদের প্রতোকের নির্ধারিত অংশকে ছাস করা।

^{৭৮২} পুত্র বা আল ইদলা: মৃতের সাথে সম্পর্ক। সেটা হবে সরাসরি রক্তের সাথে। যেমন- পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা। অথবা কারো মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত হবে। যেমন- পুত্রের পুত্র বা নাতির সম্পর্ক ছেলের মাধ্যমে অথবা নাতনির সম্পর্ক ছেলের মাধ্যমে।

المسألة السابعة: في ذوي الأرحام

সপ্তম মাসআলা: নিকটাতীয়দের সম্পর্কে

১. যাদেরকে মৃত ব্যক্তির দিকে সম্পৃক্ত করা হয়। তারা হলো: কন্যাদের সন্তানগণ, নাতনীদের সন্তান বা আরও নিচের স্তরে যারা থাকবে তারা।

২. মৃত ব্যক্তিকে যাদের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়। তারা হলো: সম্পদ হতে বাদ পড়ে যাওয়া দাদা-নানা ও দাদী-নানী ও উচু স্তরের।

৩. যাদেরকে মৃত ব্যক্তির পিতা-মা তার দিকে সম্পৃক্ত করা হয়। তারা হলো: বোনদের সন্তানগণ, ভায়ের কন্যাগণ, বৈপিত্রেয় ভায়ের সন্তানগণ এবং তাদের নিকটাতীয় থাকবে যারা, যদিও তারা নিচের স্তরের হয়।

৪. যাদেরকে মৃত ব্যক্তির দাদা-নানা ও দাদী-নানীদের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়। তারা হলো: মায়ের চাচা ও ফুফুগণ, চাচার কণ্যাগণ বা চাচাত বোনেরা, মামাগণ ও তাদের সন্তানগণ, যদিও তারা দূরের হয় এবং নিচের স্তরের হয়। তাদের ওয়ারিস হওয়ার ক্ষেত্রে দলীল আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿رَأَوْلُوا الْأَرْحَامَ بِعَصْبِهِمْ أُولَئِنَّ بِيَنْعِضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾

“আর নিকটাতীয়গণ, আল্লাহর বিধানে তাদের কতক কতকের চেয়ে বেশি নিকটবর্তী।”

[সূরা আনফাল: ৭৫]

আর আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন: ﴿أَخْلُقُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ﴾

“যার কোনো ওয়ারিস নেই, মামা তার ওয়ারিস হবে।”^{৭৮৩}

তাদের ওয়ারিস হওয়ার পক্ষতি হলো- তারা প্রত্যেকে যার মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত হবে, তারা প্রত্যেক সে সম্পৃক্তকারী ব্যক্তির অনুযায়ী সম্পদ লাভ করবে।

আল্লাহ তা'আলাই অধিক জানেন।

^{৭৮৩} আহমাদ ১/২৮; সুনান আবু দাউদ, হা. ২৮৯৯; তিরমিয়ী, হা. ২১০৩ এবং তিনি বলেন: হাদীসটি হসান ও সহীহ; শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহ সুনানুত তিরমিয়ী, হা. ১৭০৯।



নবম অধ্যায়

বিবাহ এবং তালাক

تاسعاً: كتاب النكاح والطلاق

এতে ১১টি অনুচ্ছেদ রয়েছে

প্রথম অনুচ্ছেদ : বিবাহ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : মোহর, বিবাহের অধিকার, স্বামীর কর্তব্য এবং বিবাহের অলীমা

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : খোলা তালাক

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : তালাক

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : ইলা (কসম)

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : যিহার

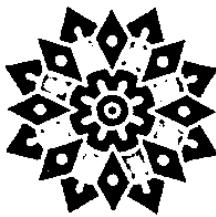
সপ্তম অনুচ্ছেদ : লিআন

অষ্টম অনুচ্ছেদ : ইদত এবং শোক পালন

নবম অনুচ্ছেদ : দুধ পান করানো

দশম অনুচ্ছেদ : লালনপালন এবং তার বিধিবিধান

একাদশ অনুচ্ছেদ: খোরপোশ বা খরচ করা



الباب الأول : في النكاح প্রথম অনুচ্ছেদ : বিবাহ

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: تَعْرِيفُ النِّكَاحِ، وَأَدْلَةُ مِشْرُوعِيَّتِهِ

প্রথম মাসআলা: বিবাহের পরিচয় এবং তা শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীলসমূহ

ক. বিবাহের পরিচয়:

النِّكَاحُ বা নিকাহ-এর শাব্দিক অর্থ: جمأ كرَا، اكْتَرِيتَ كرَا، بِتَرَرَ
থবেশ করা। বলা হয়ে থাকে (تَنَكَّحَتْ أَشْجَانْ) বাক্য থেকে শব্দটি নেওয়া হয়েছে। কারণ গাছ
একটি আরেকটির সাথে সংযুক্ত থাকে। অথবা (نَحْ كَحَ المَطْرَ أَرْضَ) বাক্য থেকে নেওয়া হয়েছে।
কারণ বৃষ্টি জমির ভেজা মাটির সাথে মিশে যায়।

شرعًا: عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر، على الوجه المشروع
পারিভাষিক অর্থ: বিবাহ এমন একটি চুক্তি যার দ্বারা শরীয়তের অনুমতিতে স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী
স্বামীকে উপভোগ করার বৈধতা লাভ করে।

খ. বিবাহ শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীলসমূহ:

বিবাহ শরীয়ত সম্মত হওয়ার মূল হচ্ছে: কুরআন-সুন্নাহ এবং ইজমা।

কুরআনুল কারীমের অনেক আয়াত বিবাহ শরীয়ত সম্মত হওয়ার পক্ষে দলীল: তন্মধ্যে হচ্ছে
মহন আল্লাহ বলেন:

﴿فَإِنْ يَكُحُوا مَا ظَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعٌ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلِكُتُ أَيْمَانَكُمْ﴾

“তোমাদের ভালো লাগে এমন নারীদের মধ্যে থেকে বিয়ে করবে দুই, তিন বা চারটি; আর যদি আশংকা করো যে সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকেই বিয়ে করবে বা তোমাদের অধিকারভূক্ত দাসীকে গ্রহণ করো।” [সূরা নিসা : ৩]

﴿وَأَنِّي كُحْوا الْأَيَامِ﴾^{৭৪} مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامِكُمْ

“তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস-দাসীদের বিবাহ দাও।”
[সূরা নূর: ৩২]

বিবাহ বৈধ হওয়ার পক্ষে অনেক হাদীস রয়েছে: তার মধ্যে একটি হাদীস ইবনু মাসউদ رض নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি رض বলেন:

بِأَنَّهُمْ أَنْفَقُوا مِنْ أَمْلَاقِهِمْ فَلَمْ يَرْجِعُوهُمْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَكُنْ لَّهُ بِهِمْ حِلٌّ
بَلْ يَنْهَا هُنَّا كُلُّهُمْ لِلْفَقِيرِ، وَمَنْ لَمْ يَ
بَسْطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءَ

“হে যুব সম্পদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিয়ে করে। কারণ বিয়ে তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থান হিফায়ত করে এবং যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, সে যেন সওম পালন করে। সওম তার কামনাকে দমন করবে।”^{৭৪৬}

আরেকটি হাদীস মাকিল ইবনে ইয়াসার رض থেকে বর্ণিত। নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

تَرَوْجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنَّ مُكَاثِرَ بِكُمُ الْأَمْمَ

“এমন নারীকে বিয়ে করো যে প্রেমময়ী এবং অধিক সন্তান প্রসবকারী। নিশ্চয়ই আমি অন্যান্য উপ্রাতের কাছে তোমাদের সংখ্যার আধিক্যের কারণে গর্ব করব।”^{৭৪৭}

আর সকল মুসলিম বিবাহ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

^{৭৪৪} ﴿وَأَنِّي كُحْوا الْأَيَامِ﴾: এটি بির শব্দের বহুবচন। অর্থ যার পুরুষের মধ্য থেকে স্বামী নেই। যার মহিলার মধ্য থেকে বউ নেই।

^{৭৪৫} ﴿وَأَنِّي كُحْوا الْأَيَامِ﴾: অর্থ বিবাহ ও বিবাহ করা। এখানে উদ্দেশ্য বিয়ের সামর্থ্য ও ব্যয়ভার।

^{৭৪৬} মুস্তাফাকুন আলাইহি: সহীহ বুখারী, হা. ৫০৬৬; সহীহ মুসলিম, হা. ফুল্মা, ১৪০০।

^{৭৪৭} সুনান আবু দাউদ, হা. ২০৫০; নাসাই, হা. ৬৫১৬; শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহন নাসাই, হা. ৩০২৬।

المسألة الثانية: الحكمة في مشروعية النكاح

ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସଅଳା: ବିବାହ ଶରୀଯତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହେଉଥାର ତାଣପର୍ଯ୍ୟସମୂହ

ଆଲାହ ତା'ଆଲା କିଛୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହିକମତେର କାରଣେ ବିବାହକେ ଶରୀୟତ ସମ୍ମତ କରେଛେ । ନିମ୍ନ ଏଣ୍ଟଲୋର ସାର-ସଂକ୍ଷେପ ଆଲୋଚନା କରା ହଲୋ ।

১. মানুষের যৌনাঙ্গগুকে নিষ্পাপ রাখা। কারণ আল্লাহ তা'আলা নিজে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টির সময়ই মানুষের প্রকৃতিতে যৌন বাসনা স্থাপন করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বিবাহকে শরীয়ত সম্মত করেছেন এই বাসনাকে তৃপ্ত করার জন্য এবং এই বাসনা নিয়ে খেলতামাশা দূর করার জন্য।

- ২.শামী-স্ত্রীর মাঝে বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা তৈরি হওয়া। সেই সাথে উভয়ের মাঝে আনন্দ, ভালবাসা, শান্তি ও প্রশান্তি অর্জিত হওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾

“ଆର ତାଁର ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନାବଲୀର ମଧ୍ୟ ରଯେଛେ ତିନି ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟ ଥିକେ ଜୋଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ; ଯାତେ ତୋମରା ତାଦେର କାହେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ପାଓ । ଆର ତିନି ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟ ଭାଲୋବାସା ଓ ସହମର୍ମିତା ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ ।” [ସୂରା ରୂପ: ୨୧]

৩. বৎশ সুরক্ষিত থাকা, একে অন্যের মাধ্যমে পরস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং রক্তের বন্ধন তৈরি হওয়া।
 ৪. মানব বৎশকে টিকিয়ে রাখা এবং মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা তৈরি করা; যাতে করে মুসলিমদের মাধ্যমে কাফেরদেরকে দমন করা যায় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রচার করা যায়।
 ৫. অবৈধ সম্পর্ক আর জিনার মাধ্যমে ধ্বংস ও বিনাশ হওয়া থেকে মানুষের চরিত্রকে রক্ষা করা।

المسألة الثالثة: حكم النكاح و اختيار الزوجة

তৃতীয় মাসআলা: বিবাহের হুকুম এবং স্তৰী নির্বাচন

- ১. বিবাহের ছক্কুম:** ব্যক্তির অবস্থার ভিন্নতার কারণে বিবাহের ছক্কুম ভিন্ন হয়ে থাকে।
প্রথমত: বিবাহ করা ওয়াজিব: কোনো ব্যক্তি যদি বিবাহের দায়িত্ব ও খরচ বহনে সক্ষম হয়, জিনায় জড়িয়ে যাওয়ার আশংকা করে, তবে তার উপর ওয়াজিব। কারণ বিবাহই একমাত্র পথ যা তাকে নিষ্পাপ রাখবে এবং হারাম কাজে লিঙ্গ হওয়া থেকে হেফাজত করবে। আর যদি

বিবাহের দায়িত্ব ও খরচ বহন করতে সক্ষম না হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে সচ্ছল বানিয়ে দেওয়া পর্যন্ত তার জন্য রোজা রাখা আবশ্যিক।

দ্বিতীয়ত: সুন্নত ও উত্তম কাজ: কোনো ব্যক্তি এমন অবস্থার মাঝে আছে যে, তার যৌন চাহিদাও আছে, বিবাহ করার মতো অর্থও তার আছে। তবে সে নিজের ব্যপারে জিনার জড়িয়ে যাওয়ার আশংকা করে না। তবুও তার জন্য বিবাহ করা সুন্নত। কারণ মানুষকে বিবাহের প্রতি আগ্রহী ও উত্তুন্ন করে অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে।

তৃতীয়ত: মাকরহ তথা অপছন্দনীয়: যদি কোনো ব্যক্তি বিবাহের প্রয়োজন অনুভব না করে, হতে পারে সে এমন বৃক্ষ বা অসুস্থ যার কোনো যৌন চাহিদা নেই অথবা হতে পারে সে (عِنْ) অর্থাৎ তার স্ত্রী মিলনের সক্ষমতা নেই অথবা নারীর প্রতি তার কোনো আগ্রহ জাগে না।

২. স্ত্রী নির্বাচনে যা করণীয়:

বিবাহের পাত্রী দেখার ব্যাপারে কিছু মূলনীতিকে সুন্নাত করা হয়েছে। যেমন: পাত্রীর দ্বীনদারিতা, তার চারিত্রিক পবিত্রতা, তার মৌলিক ভালোগুণ, তার বংশ মর্যাদা এবং সৌন্দর্য। যে হাদীসটির কারণে নারীর এই গুণাবলিকে সুন্নত করা হয়েছে সেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবু হুরায়রা رض। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

تَكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: يَلِهَا وَلِحَسِبِهَا وَجَمَاهِلَهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ بِذَاكِرَةِ

“নারীদেরকে চারটি গুণ দেখে বিবাহ করা হতো: তার ধন-সম্পদ, বংশ-মর্যাদা, রূপ-লাভন্য এবং দ্বীনদারিতা। তবে দ্বীনদারিতাকে প্রাধান্য দিবে। আর তা না করলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।”^{৭৮}

সুতরাং ব্যক্তি সর্বাগ্রে দ্বীনকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং এটাকেই পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের মূল মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করবে। অনুরূপভাবে অধিক সন্তান জন্মানকারিণী নারীকে স্ত্রী হিসেবে নির্বাচন করাও সুন্নাত। হাদীসটি আনাস رض আল্লাহর রসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি رض বলেন:

تَرَوْجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاوِرٌ بِكُمُ الْأَمْمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“তোমরা অধিক মমতাময়ী ও অধিক সন্তান জন্মানকারী নারী বিবাহ করো! আমি কিয়ামতের দিন তোমাদের সংখ্যার আধিক্য নিয়ে গর্ব করব।”^{৭৯}

এছাড়াও কুমারী নির্বাচন করা সুন্নাত। আল্লাহর রসূল ﷺ জাবির رض কে বলেছিলেন:

^{৭৮} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহ বুখারী, হা. ৫০৯০; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৪৬৬।

^{৭৯} সুন্নান আবু দাউদ, হা. ২০৫০; নাসাই, হা. ৬৫১৬; ইয়াম আগবানী সহীহ বলেছেন, সহীহন নাসাই, হা. ৩০২৬।

فَهَلْ بِكُرَّا تُلَا عَبْهَا وَتُلَا عَبْكَ

“তুমি কি কুমারী নারী খুঁজে পেলে না! সে তোমাকে আনন্দ দিত এবং তুমিও তাকে সোহাগ দিতে!”^{৭৯০}

তবে যদি পূর্বে বিবাহিত নারীকে বিবাহ করার মাঝে কোনো কল্যাণ থাকে, তাহলে বিবাহিত নারীই নির্বাচন করবে ও কুমারী নারীর উপর বিবাহিত নারীকে প্রাধান্য দিবে। তবে সুদর্শনা নারী নির্বাচন করবে। তাহলে সেই নারী তার চিন্তকে প্রশান্ত রাখবে। তার চোখকে অন্য নারী থেকে ফিরিয়ে রাখবে এবং তার ভালোবাসাকে বারবার জাগিয়ে তুলবে।

المسألة الرابعة: من أحكام الخطبة، وأدابها

চতুর্থ মাসআলা: বিবাহ প্রস্তাবের নিয়মনীতি এবং তার শিষ্টাচারসমূহ

الخطبة এর অর্থ হলো নির্দিষ্ট এক নারীকে বিবাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করা। সেই ইচ্ছার কথা তার অভিভাবককে জানিয়ে দেওয়া।

বাগদান এর নিয়ম-নীতি এবং শিষ্টাচার:

১. কন্যাপক্ষকে কেউ প্রস্তাব দিয়েছে এবং কন্যাপক্ষ সেই প্রস্তাবে সম্মতিও প্রকাশ করেছে। এই সম্মতি প্রকাশ যদি ইশারা ইঙ্গিতেও হয়ে থাকে, এ অবস্থায় প্রথম প্রস্তাবের সম্মতির কথা জানার পর অন্য কোনো মুসলিমের সেখানে বিবাহ প্রস্তাব প্রদান করা হারাম। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَىٰ خُطْبَةِ أُخْيِيهِ حَتَّىٰ يَنْكِحَ أُزْبَرْكَ

“কোনো লোক তার মুসলিম ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব পেশ করতে পারবে না; যতক্ষণ না প্রথম ব্যক্তি বিবাহ করে অথবা তা ছেড়ে দেয়।”^{৭৯১}

কারণ দ্বিতীয় প্রস্তাব প্রথম প্রস্তাবকে নষ্ট করে দিবে এবং পরম্পরার মাঝে শক্তি সৃষ্টি করবে।

২. **بَعْدَةِ الْبَلَانِ** বা তালাকে বায়েনাহ (চূড়ান্ত তালাকপ্রাপ্ত) প্রাপ্তা নারী। যে ইদত পালন করছে, তাকে স্পষ্টভাবে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া হারাম। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمُ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ﴾

“আর যদি তোমরা ইশারায় নারীদের বিয়ের প্রস্তাব দাও বা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখো, তবে তোমাদের কোনো পাপ নেই।” [সূরা বাক্সারাহ : ২৩৫]

^{৭৯০} مুতাফকুন আলাইহি: সহীহ বুখারী, হা. ৫০৭৯; সহীহ মুসলিম, হা. যুআ. ৭১৫।

^{৭৯১} সহীহ বুখারী, হা. ৫১৪৪।

তবে তাকে ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমে প্রস্তাব দেওয়া যাবে। যেমন: কেউ বলল, আমি চাছি যে, কোনো সৎ নারীকে আল্লাহ যেন আমার জন্য সহজ করে দেন। অথবা বলল, আমি বিবাহ করতে চাই। সুতরাং ইশারার মাধ্যমে প্রস্তাব দেওয়া বৈধ আছে। এ কথাটি প্রমাণ করে যে, স্পষ্টভাবে প্রস্তাব দেওয়া জায়েয় নেই। কেননা এ অবস্থাতে কোনো নারীকে স্পষ্টভাবে প্রস্তাব দিলে সে ইদ্দত শেষ না করেই বিবাহ বসার জন্য আগ্রহী হয়ে যেতে পারে।

আর রাজস্ব মুণ্ডের রেখার মধ্যে নারী রাজস্ব তালাক নিয়ে ইদ্দত পালন করছে, তাকে কোনোভাবেই প্রস্তাব দেওয়া যাবে না; স্পষ্টভাবেও না, ইশারা ইঙ্গিতও না। কেননা সে এখনো স্তৰীয় হৃকুমে আছে।

৩. পাত্র এবং পাত্রীর ব্যাপারে যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হবে তার জন্য আবশ্যিকীয় হলো, সে দোষ-গুণ সবই উল্লেখ করবে। এটা গীবত হবে না; বরং এটা সৎ পরামর্শ। এ ব্যাপারে শরীয়ত উৎসাহ দিয়ে থাকে।

৪. ‘বাগদান’ ওই মেয়ের প্রতি বিবাহের প্রতিশ্রুত ও আগ্রহ প্রকাশ মাত্র। ‘বাগদান’ কখনোই বিয়ে নয়। তাই ছেলে এবং মেয়ে প্রত্যেকেই অন্যের কাছে গাইরে মাহরাম হিসেবে গণ্য হবে।

المسألة الخامسة: حكم النظر إلى المخطوبة পঞ্চম মাসতালা: পাত্রী দেখার বিধান

কেউ নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দিতে ইচ্ছা করলে সে স্বাভাবিক অবস্থায় নারীর যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খোলা থাকে, তা দেখতে পারবে। এটা শরীয়ত সম্মত এবং সন্নাহ। যেমন- চেহারা, হাতের কঁজি ও পা। সাহল ইবনে সাদ رض থেকে বর্ণিত হাদীসের আলোক।

أَنْ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حِنْثٌ لِأَهْبَتْ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَعَدَ النَّظَرُ إِلَيْهَا وَصَوْبَاهُ، ثُمَّ طَأَطَارَ أَسْأَهُ

“এক নারী আল্লাহর রসূল ﷺ এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আমি নিজেকে আপনার জন্য উৎসর্গ করলাম। তখন আল্লাহর রসূল ﷺ তার দিকে তাকালেন, তাকে দেখলেন। এরপর মাথা নীচু করে ফেললেন।”^{১১২}

আবু হুরায়রা رض থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَإِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

^{১১২} মুত্তাফুল আলাইহি: সঞ্চার বুখারী, পাঁ. ৫০৮৭। সহীহ মুসলিম, পাঁ. ফুআ. ১৪২৫

“আমি নারী **كُنْ** এর নিকটে ছিলাম। তখন এক লোক আল্লাহর রসূল **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** এর কাছে এসে বলল, সে এক আনসারী নারীকে বিবাহ করতে চায়। তখন আল্লাহর রসূল **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি তাকে দেখেছ? লোকটি বলল, না আমি তাকে দেখিনি। তিনি **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** বললেন, তুমি যাও তাকে ভালোভাবে দেখে আসো। আনসারী নারীদের চোখে কি যেন থাকে।”^{১১৩}

জাবির **عَلِيٌّ** এর বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** বলেছেন:

إِذَا حَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمُرْأَةَ، فَإِنْ أَسْتَطَاعَ أَنْ يَنْتَظِرْ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعُلْ ، قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَنْبِئُهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَاهُ إِلَى نِكَاحِهَا وَتَرَوْجِهَا فَتَرَوْجِهَا

“তোমাদের কেউ যখন কোনো নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দিবে তখন সে সাধ্যের মধ্যে থেকে তার ঐ অঙ্গলো দেখে নিবে, যেগুলো বিবাহের দিকে আহবানকারী। জাবির **عَلِيٌّ** বলেন, তখন আমি এক নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দিলাম। আড়াল থেকে তার এমন কিছু দেখে নিলাম, যা বিবাহের আহবানকারী। এরপর তাকে বিবাহ করে ফেললাম।”^{১১৪}

বিবাহের পূর্বে কন্যা দেখার হিকমাহ:

ছেলের মনে মেয়েটির কাছের মানুষ হওয়ার জন্য সবচেয়ে কার্যকরী হলো বিয়ের আগে কন্যা দেখে নেওয়া। সেই সাথে এর মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে মায়া-মমতা ও স্নেহ ভালোবাসার স্থায়ীভুত্তি বৃদ্ধি হয়ে থাকে। যেমন মুগীরা **عَلِيٌّ** এক মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তখন আল্লাহর রসূল **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** তাকে বলেছিলেন, তুমি তাকে দেখে নাও! কারণ এতে উভয়ের মাঝে মিল-সহৰত বেশি হবে। অর্থাৎ উভয়ের মাঝে ভালোবাসা এবং ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হবে।

المسألة السادسة: شروط النكاح وأركانه ষষ্ঠ মাসআলা: বিবাহের শর্ত ও কুকুনসমূহ

প্রথম. বিবাহের শর্তসমূহ:

১. বর এবং কনেকে নির্দিষ্ট করা। অনিদিষ্ট কনের উপর আকদে নিকাহ বা বিবাহের চুক্তি সহীহ হবে না। যেমন কোনো ব্যক্তির একাধিক মেয়ে আছে। সেই ব্যক্তি বলল, আমার মেয়েকে

^{১১৩} সহীহ মুসলিম, ঘ. ৩৩৭৬, ফুআ. ১৪২৪; ^{১১৪} দ্বিতীয় দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কেউ বলেন ছোটো, আর কেউ নীল রঙ।

^{১১৫} মুনাফ আবু দাউদ, ঘ. ২০৮২; আহমাদ ৩/৩০৪; ইমাম ঘাকিম তার মুসতাদরাকে ২/১৬৫ এবং তিনি বলেন, ইমাম মুসলিমের শর্তে সহীহ; ইমাম যাহাবী ঐকমত্য পোষণ করেছেন; ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সিলসিলাতুস সহীহাহ, ৯৯ নং

তোমার কাছে বিবাহ দিলাম। অথবা কোনো ব্যক্তির একাধিক ছেলে আছে সেই ব্যক্তি বলল, আমার ছেলেকে তার সাথে বিবাহ দিলাম। এভাবে আকদে নিকাহ সহীহ হবে না। বরং এক্ষেত্রে নাম নির্দিষ্ট করতে হবে। যেমন ফাতিমা, আলী। অথবা গুণ উল্লেখ করতে হবে। যেমন বড়ো মেয়ে, ছেটো মেয়ে অথবা বড়ো ছেলে, ছেটো ছেলে।

২. বর এবং কনে উভয়ে একে অপরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে হবে: সুতরাং জোড় করে বিবাহ দেওয়া বৈধ নয়। কারণ আবু খুরায়রা ^{৭৯৩} থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল ^{৭৯৪} বলেছেন:

لَا تُنْكِحُ الْأَيْمُ حَتَّى تُسْتَأْمِرْ، وَلَا تُنْكِحُ الْبِنْرُ حَتَّى تُسْتَأْذِنْ

“সম্মতি ব্যতীত বিধবা মহিলাকে বিবাহ দিবে না এবং অনুমতি ব্যতীত কুমারী নারীকে বিবাহ দিবে না।”^{৭৯৫}

৩. বিবাহের অভিভাবকত্ব: একমাত্র অভিভাবক কনের পক্ষ হতে বিবাহের চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে। অন্য কেউ তা করতে পারবে না। হাদীসে এসেছে-

لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ

“অভিভাবক ছাড়া কোনো বিবাহ নেই।”^{৭৯৬}

অভিভাবক হওয়ার জন্য শর্ত হলো অবশ্যই তাকে পুরুষ, বালেগ, সুস্থমস্তিষ্ঠ সম্পন্ন এবং অন্তত বাহ্যিকভাবে নীতিবান লোক হতে হবে।

৪. আকদে নিকাহ বা বিবাহের চুক্তির সময় সাক্ষী উপস্থিত থাকা: সুতরাং দুজন সাক্ষী ছাড়া বিবাহ হবে না। সাক্ষী দুজনকে অবশ্যই মুসলিম এবং বালেগ হতে হবে। সেই সাথে অন্তত বাহ্যিকভাবে নীতিবান লোক হতে হবে। আল্লাহর রসূল ^{৭৯৫} বলেছেন:

لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَمَا كَانَ عَنْ ذِلِكَ فَهُوَ باطِلٌ

“একজন অভিভাবক এবং দুইজন নীতিবান সাক্ষী ছাড়া বিবাহ হবে না। এ ছাড়া যত বিবাহ আছে সব বিবাহ বাতিল।”^{৭৯৭}

ইমাম তিরমিয়ী ^{৭৯৮} বলেন, আল্লাহর রসূল ^{৭৯৪} এর সাহাবীদের মধ্য হতে যারা আহলু ইলম ছিলেন তারা এর উপরই আমল করেছেন। তাদের পরে তাবেঙ্গন এবং অন্যরাও এর উপর আমল করেছেন। তারা সকলেই বলেছেন, সাক্ষী ছাড়া বিবাহ হবে না। বিবাহের ক্ষেত্রে

^{৭৯৫} মুস্তাফাকুন আলাইহি। সহীহল বুখারী, ঘ. ৫১৩৬, সহীহ মুসলিম ১৪১৯/৬৪।

^{৭৯৬} তিরমিয়ী, ঘ. ১১০১; সুনান আবু দাউদ, ঘ. ২০৮৫; ইবনু মাজাহ, ঘ. ১৯০৭, ১৯০৮; শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহ সুনানু মাজাহ, ঘ. ১৫৩৭, ১৫৩৮।

^{৭৯৭} ইবনু হিজ্বান, ঘ. ৪০৭৫; ইমাম ইবনে হাযাম তার মুহাফা এছে ৯/৩৪৬৫।

সাক্ষীকে শর্ত করা হয়েছে যেন বংশ সুরক্ষিত থাকে। পরবর্তীতে কেউ যেন বিবাহকে অস্বীকার করতে না পারে।

৫. বিবাহকে বাধা দেয় এমন বিষয় থেকে বর এবং কনে উভয়কে মুক্ত থাকতে হবে। যেমন: বংশগত, দুর্ঘটণা (رُضَاعَة) এবং বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকা। কিছু প্রতিবন্ধকতা অন্যান্য কারণেও হয়ে থাকে। যেমন ধর্মের ভিন্নতা থাকার কারণে, বর বা কনে উভয়ের কেউ হাজ্জ বা উমরার ইহরামে থাকার কারণে।

দ্বিতীয়. বিবাহের রুক্ন

যে বিষয়গুলোর মাধ্যমে বিবাহ সংঘটিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়, সেগুলোকে বিবাহের রুক্ন বলে। সেগুলো হলো:

১. দুইজন চুক্তিকারী থাকবে। একজন বর, একজন কনে, তারা ঐসকল প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত থাকবে যা বিবাহকে বাধা দিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ আগেই এব্যাপারে ইশারা করা হয়েছে। বাকিগুলো মুহাররমাত এর অধ্যায়ে আসবে।

২. প্রস্তাব করা: এমন কিছু শব্দ যেগুলো অভিভাবক বা তার স্থানে থাকা উকিলের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হবে। অর্থাৎ (حَكَلَ) নিকাহ এবং (حَنْوَلَ) তায়উইজ শব্দ দ্বারা হবে।

৩. প্রস্তাব করুল করা: অর্থাৎ এমন কিছু শব্দ বর বা তার প্রতিনিধির কাছ থেকে প্রকাশ পাবে। যেমন সে বলবে, আমি এই বিবাহ করুল করলাম অথবা বলবে, আমি এই বিবাহে খুশী হলাম। প্রস্তাব অবশ্যই করুলের পূর্বে হতে হবে।

المسألة السابعة: المحرمات في النكاح সপ্তম মাসআলা: বিবাহ নিষিদ্ধ নারীগণ

বিবাহ-নিষিদ্ধ নারী প্রধানত দুই প্রকার। প্রথম প্রকার চিরস্থায়ী নিষিদ্ধ। দ্বিতীয় প্রকার সামাজিক সময়ের জন্য নিষিদ্ধ।

প্রথম প্রকার: চিরস্থায়ী নিষিদ্ধ নারীগণ:

চিরস্থায়ী বিবাহ নিষিদ্ধ এমন নারী ১৪ জন। সাত জন বংশগতভাবে এবং সাত জন অন্য কারণে। দ্বিতীয় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পরিস্থিতি যাই হোক যাদেরকে চিরস্থায়ী বিবাহ করার বৈধতা বিলুপ্ত করা হয়েছে। এই নিষিদ্ধতার তিনটি কারণ রয়েছে:

ক. আত্মীয়তার সম্পর্ক; খ. বৈবাহিক সম্পর্ক; গ. দুর্ঘটণা সম্পর্ক।

প্রথম: আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে বিবাহ নিষিদ্ধ নারীগণ:

১. মা, মায়ের মা, বাবার মা। কারণ তাদেরকে (صَوْلٌ لِسَانٌ) মানুষের মূল বলা হয়ে থাকে।
 ২. মেয়ে, মেয়ের মেয়ে, ছেলের মেয়ে। কারণ তাদেরকে (فَرُوعٌ لِسَانٌ) মানুষের (নিজের) শাখা প্রশাখা বলা হয়ে থাকে।
 ৩. আপন বোন, সৎ বোন, পিতার দিক থেকে হোক অথবা মায়ের দিক থেকে হোক। কারণ তাদেরকে (فَرُوعٌ بَوْيْنٌ) বা বাবা-মার শাখা-প্রশাখা বলে।
 ৪. আপন ভাইয়ের মেয়ে, বাবার দিক থেকে অথবা মায়ের দিক থেকে সৎ ভাইয়ের বা বৈপিত্রীয় ভাইয়ের মেয়ে।
 ৫. আপন বোনের মেয়ে, বাবা অথবা মায়ের দিক থেকে সৎ বোনের মেয়ে।
 ৬. ফুফু, যিনি বাবার বোন, অনুরূপভাবে বাবার ফুফু এবং মায়ের ফুফু। কারণ তাদেরকে (فَرُوعٌ بَهْدِيْنٌ مِنْ جَهَةٍ لِجَدِيْنٍ) বা দাদাদাদির শাখা বলা হয়ে থাকে।
 ৭. খালা, তিনি হলেন মায়ের বোন। অনুরূপভাবে মায়ের খালা এবং বাবার খালা। কারণ তাদেরকে (نَانَا-نَانِيْর) নানা-নানীর শাখা-প্রশাখা বলা হয়ে থাকে। সুতরাং এই সকল নারীদের কাউকে কোনো অবস্থাতেই বিবাহ করা বৈধ নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,
- ﴿خَرِّمْتَ عَلَيْنِكُمْ أَمْهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾
- “তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, মেয়ে, বোন, ফুফু, খালা, ভাইয়ের মেয়ে, বোনের মেয়ে।” [সূরা নিসা : ২৩]

দ্বিতীয়: বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে নিম্নে বর্ণিত নারীগণকে বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

১. পিতার স্ত্রী (সৎ মা)। অনুরূপভাবে দাদার স্ত্রী (সৎ দাদী); নানার স্ত্রী (সৎ নানী)। কারণ তাদেরকে (زَوْجَاتُ الْأَصْوَل) পূর্ব পুরুষদের স্ত্রী বলা হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَا تُنْكِحُوا مَا نَكَحْتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمُقْنَثًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

“নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাদেরকে বিয়ে করেছেন, তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো না, তবে পূর্বে যা সংঘটিত হয়েছে (সেটা ক্ষমা করা হলো)। নিশ্চয়ই তা ছিল অশ্রীল, মারাত্মক ঘৃণ্ণ ও নিকৃষ্ট পদ্ধা।” [সূরা নিসা : ২৪]

২. পুত্রবধু, ছেলের পুত্রবধু (নাতবৌ), মেয়ের পুত্রবধু (নাতবৌ): অনুরূপভাবে শাখা প্রশাখার যত বধু আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَحَلَّا إِلَيْكُمْ أَبْنَاءِ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾

“আর তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তোমাদের ওরসজাত ছেলের স্তৰী।” [সুরা নিসা : ২৩]

৩. স্তৰীর মা অর্থাৎ শাশুড়ী। অনুরূপভাবে স্তৰীর যত “মহিলা মূল” আছে। যেমন স্তৰীর নানী।
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: ﴿رَأْمَهَا ثُنْسَابِكُمْ﴾

“আর তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তোমাদের শাশুড়ীকে।” [সুরা নিসা : ২৩]

বিবাহ চুক্তি হলেই এই তিনি প্রকার নারী বিবাহ নিষিদ্ধ হবেন। নিষেধমূলক অন্য কোনো কারণ তাদের থাকুক বা না থাকুক, তাতে কোনো সমস্যা নেই।

৪. স্তৰীর পূর্ব স্বামীর কল্যা। তাকে ﴿بِإِيمَانِ﴾ অর্থাৎ সৎ মেয়ে বলা হয়। সে মায়ের স্বামীর জন্য নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَرَبَابِكُمُ الْأَتْقَى فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَابِكُمُ الْأَلْأَتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾

“তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তোমাদের স্তৰীদের মধ্যে যার সাথে সঙ্গত হয়েছে তার পূর্ব স্বামীর ওরসজাত মেয়ে যারা তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে।” [সুরা নিসা : ২৩]

সৎ মেয়ে মায়ের স্বামীর কাছে লালিত পালিত হওয়াটা হারাম হওয়ার জন্য শর্ত নয়। তবে কুরআনে (فِي حُجُورِكُمْ) বা নিজ গৃহে পালিত উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণ অবস্থাকে বর্ণনা করার জন্য। এই মেয়েটি কোনো লোকের জন্য নিষিদ্ধ হবে তখন যখন সেই লোক তার মায়ের সাথে বাস করবে। লোকটি যদি তার মায়ের সাথে বাস করতে না পারে। যেমন মিলিত হওয়ার আগে মহিলাটি মারা গেল অথবা লোকটি মহিলাকে তালাক দিয়ে দিল। তখন মহিলার মেয়েটিকে বিবাহ করা এই লোকের জন্য বৈধ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾

“তবে যদি তাদের সাথে তোমরা সহবাস না করে থাকো, তবে (তাদের বদলে তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করলে) তোমাদের গুনাহ নেই।” [সুরা নিসা : ২৩]

৫. নারীদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে তার মায়ের যে-কোনো স্বামীকে এবং তার মেয়ের স্বামীকে, স্বামীর ছেলেকে এবং স্বামীর বাবাকে।

তৃতীয়: رِضَاع দুঃঘট সম্পর্কের কারণে বিবাহ নিষিদ্ধ নারীগণ:

সাতজন নারীকে দুঃঘট সম্পর্কের কারণে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। কুরআন দুই জনের কথা উল্লেখ করেছে। বাকি পাঁচজনের কথা হাদীসে উল্লেখ রয়েছে।

ক. কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী বিবাহ নিষিদ্ধ নারীগণ:

১. দুধ মাতা। সে হলো ঐ নারী যে আপনাকে দুধ পান করিয়েছে। তার সাথে তার মা, তার মায়ের মা এবং তার বাবার মা-ও একই হ্রক্ষেত্রে হবে।

২. দুধ বোন। সে হলো ঐ মেয়ে যে আপনার মায়ের দুধ পান করেছে। অথবা আপনি তার মায়ের দুধ পান করেছেন। অথবা আপনি এবং সেই মেয়ে একই নারীর দুধ পান করেছেন। অথবা আপনি তার বাবার স্ত্রীর দুধ পান করেছেন। অথবা সে আপনার বাবার স্ত্রীর দুধ পান করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَأَمْهَاتُكُمُ الَّا تِي أَرْضَعْتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾

“তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তোমাদের সেই মা যারা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছেন এবং তোমাদের দুধ বোন।” [সূরা নিসা : ২৩]

খ. হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী বিবাহে নিষিদ্ধ নারীগণ:

১. দুধ ভাইয়ের মেয়ে;

২. দুধ বোনের মেয়ে;

৩. দুধ ফুফু। ঐ নারী যিনি আপনার পিতার সাথে (একই নারী থেকে) দুধ পান করেছেন।

৪. দুধ খালা। ঐ নারী যিনি আপনার মায়ের সাথে (একই নারী থেকে) দুধ পান করেছেন।

৫. দুধ মেয়ে। ঐ মেয়ে যে আপনার স্ত্রীর দুধ পান করেছে। এ অবস্থায় সে লোক মেয়েটির দুধ পিতা হয়ে যায়।

এই নারীগণ বিবাহে নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল হলো আয়িশাহ رض এর বর্ণিত হাদীস।

إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحْرِمُ مَا تُحِرِّمُ الْوِلَادَةُ

“নিশ্চয়ই দুধের সম্পর্ক তাদের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ করে, জন্মসূত্রে যাদের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ।”^{১১৮}

ইবনু আবাস رض এর হাদীস। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম হাময়াহ رض এর মেয়ের ব্যাপারে বলেন:

إِنَّهَا لَا تَحْلُلُ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أُخْرِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرِمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرِمُ مِنَ الرَّجِمِ

^{১১৮} মুওাফাকুন আলাইহি: সহীতুল বুখারী, বা. ৫০৯৯, সহীহ মুসলিম ১৪৪৪।

“সে আমার জন্য (বিবাহের জন্য) বৈধ নয়। কেননা সে আমার দুধ সম্পর্কের ভাইয়ের মেয়ে।
রক্ত সম্পর্কের কারণে যাদের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ, দুধ সম্পর্কের কারণেও তাদের সাথে বিয়ে
নিষিদ্ধ।”^{১৯৯}

দ্বিতীয় প্রকার: সাময়িকভাবে বিবাহ নিষিদ্ধ নারীগণ:

যে সকল নারী সাময়িকভাবে বিবাহ নিষিদ্ধ, তারা দুই ভাগে বিভক্ত:

প্রথম ভাগ: একত্রিত (সহবাস) হওয়ার কারণে নিষিদ্ধ;

দ্বিতীয় ভাগ: অন্যান্য প্রতিবন্ধকর্তার কারণে নিষিদ্ধ।

প্রথম ভাগ: একত্রিত (সহবাস) হওয়ার কারণে যারা নিষিদ্ধ:

১. দুই বোন একত্র হওয়া; আপন বোন হোক অথবা দুধ বোন। দুই জনের আকদে নিকাহ একত্রে
হোক অথবা ভিন্ন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿وَأَنْ تَجْمِعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْرِينَ﴾

“তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ একত্রে দুই বোনকে (বিবাহ বন্ধনে) রাখা।” [সূরা মিসা : ২৩]

২. কোনো মহিলা এবং তার ফুফু অথবা খালাকে একত্র করা। কোনো মহিলা আর তার ভাই
অথবা বোনের মেয়ে অথবা ছেলের বা মেয়ের মেয়েকে একত্র করা।

القاعدة هنا: أن الجمع بحرم بين كل امرأتين لوفرضت إحداهما ذكرًا مما جاز له أن يتزوج الأخرى.

মূলনীতি: এমন দুইজন নারী একত্র হওয়া নিষিদ্ধ, যাদের একজনকে পুরুষ ও অন্যজনকে নারী
ধরা হলে একজন আরেকজনকে বিবাহ করা বৈধ হবে না।

এর দলীল আবু হুরায়রা ^{رض} হাদীস। নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল ^ﷺ বলেন:

لَا يُجْمِعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمْتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالِتِهَا

“কেউ যেন ফুফু ও তার ভাতিজিকে এবং খালা ও তার ভাগনিকে একত্রে বিয়ে না করে।”^{২০০}

আবু হুরায়রা ^{رض} আরেকটি হাদীস:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَرَّأَ مِنْ أَنْ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمْتِهَا، وَلَا الْعَمْمَةُ عَلَى بُنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالِتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بُنْتِ أَخِيهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى، وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى

^{১৯৯} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহুল বুখারী, পৃ. ৫১০০, সহীহ মুসলিম ১৪৪৭।

^{২০০} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহুল বুখারী, পৃ. ৫১০৯, সহীহ মুসলিম ১৪০৮।

“নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো নারীকে তার ফুফুর সাথে; কোনো ফুফুকে তার ভাতিজির সাথে একত্রে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন। অনুরূপভাবে কোনো নারীকে ও তার খালা এবং কোনো খালা ও তার ভাগনিকে একত্রে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন। অনুরূপ বড়ো (বোন)-কে ছোটোর (বোন) সাথে এবং ছোটোকে বড়োর (বোন) সাথে একত্রে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন।”^{১০১}

আলেমগণও এই নিষিদ্ধ হওয়ার উপর একমত হয়েছেন।

দ্বিতীয় ভাগ: অন্যান্য প্রতিবন্ধকর্তার কারণে যারা বিবাহে নিষিদ্ধ হয়েছেন।

১. অন্যের ইদত পালন করছে এমন নারীকে বিবাহ করা হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَلَا تَغْزِمُوا عَقْدَةَ الْكَبَّاجَ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلُهُ﴾

“ইদত (নির্ধারিত সময়) পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা করো না।”

[সুরা বাকুরাহ: ২৩৭]

২. যে নিজের স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে তার জন্য এই স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম। যতক্ষণ না নিকাহে সহীর মাধ্যমে অন্য কোনো স্বামী এই মহিলার সাথে মিলন করবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَإِنْ ظَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ رَوْجَّا غَيْرَهُ﴾

“অতঃপর যদি সে তাকে (চূড়ান্ত) তালাক দেয়, তবে এরপর তার জন্য সে (স্ত্রী হিসেবে) হালাল নয়। যে পর্যন্ত না সে (স্ত্রী) অন্য কাউকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে।” [সুরা বাকুরাহ: ২৩০]

৩. ইহরাম বাধা নারীকে বিবাহ করা হারাম। যতক্ষণ না সে তার ইহরাম থেকে হালাল হচ্ছে। উসমান رض থেকে বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে। নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ

“মুহরিম ব্যক্তি বিবাহ করবে না, অন্যকে বিবাহ করাবে না এবং বিবাহের প্রস্তাব দিবে না।”^{১০২}

৪. কাফেরের জন্য মুসলিম নারীকে বিবাহ করা হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا﴾

“তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে।” [সুরা বাকুরাহ: ২২১]

^{১০১} সুনান আবু দাউদ, হা. ২০৬৫; নাসাই ৬/৯৬; তিরমিয়ী, হা. ১১২৬ এবং তিনি হাসান সহীহ বলেছেন; শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, ইরওয়া ৬/২৯০।

^{১০২} সহীহ মুসলিম ১৪০৯।

৫. মুসলিম পুরুষের জন্য কাফের মহিলাকে বিবাহ করা হারাম। কিন্তু সে কিতাবী মহিলাকে বিবাহ করতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ﴾

“তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে।” [সূরা বাক্সারাহ : ২২১]
 আরও বলেছেন:

﴿وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾

“তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের সচরিও নারীদেরকে (বিবাহ করা) বৈধ।” [সূরা মায়িদাহ : ৫] অর্থাৎ কিতাবীরা তোমাদের জন্য হালাল।

৬. কোনো মুসলিম স্বাধীন পুরুষের মুসলিম দাসীকে বিবাহ করা হারাম। তবে অবস্থা যদি এমন হয় যে, সে জিনায় জড়িয়ে যাওয়ার আশংকা করছে অপর দিকে কোনো স্বাধীন মহিলার মোহর অথবা দাসী কেনার টাকা তার কাছে নেই। সেই অবস্থায় মুসলিম দাসীকে বিবাহ করা তার জন্য বৈধ আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طُولًا أَنْ يَنكِحَ الْمُخْصَنَاتِ فَإِنَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَّبَتْكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِنْ كَثُرُوهُنَّ يَأْذِنُ أَهْلَهُنَّ وَعَلَيْهِنَّ أَجُورُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُخْصَنَاتٍ غَيْرُ مُسْلِمَاتٍ وَلَا مُتَّخِلَّاتٍ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَخْصَنَ قَوْنَانَ أَتَيْنَ بِقِرْحَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُخْصَنَاتِ مِنْ الْعَدَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَيَّرَ اللَّهَتِ مِنْكُمْ﴾

“তোমাদের যে ব্যক্তির স্বাধীনা মুমিন নারী বিবাহের ক্ষমতা না থাকে, সে যেন তোমাদের অধীন মুমিনা দাসী বিবাহ করে এবং আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে জানেন। তোমাদের একজন অন্যজন থেকে উত্তৃত। কাজেই তাদেরকে বিয়ে করো তাদের মালিকের অনুমতি নিয়ে, ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের মোহরানা তাদেরকে দিয়ে দাও, তারা হবে সচরিও, ব্যভিচারিণী নয়, উপপত্তি গ্রহণকারিণীও নয়। বিবাহ করে সুরক্ষিত হওয়ার পর তারা যদি ব্যভিচার করে, তবে তাদের শাস্তি স্বাধীন নারীদের অর্ধেক; এ ব্যবস্থা তার জন্য তোমাদের যে ব্যক্তি (অবিবাহিত থাকার কারণে) ব্যভিচারের ভয় করে।” [সূরা নিসা : ২৫]

৭. মুসলিম ক্রীতদাসের জন্য তার মহিলা মনিবকে বিবাহ করা হারাম। কারণ এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত হয়েছেন। আরেকটি কারণ হলো, স্ত্রী মনিব আর স্বামী গোলাম হলে তাদের মাঝে অনেক বিরোধিতা দেখা দিবে।

৮. মালিকের নিজের দাসীকে বিবাহ করা হারাম। কারণ মালিকানা চুক্তি বিবাহ চুক্তি থেকে বেশি শক্তিশালী।

المسألة الثامنة: حكم نكاح الكتابية

অষ্টম মাসআলা: কিতাবী নারীকে বিবাহের বিধান

ইসলাম স্বাধীন আহলে কিতাবী নারীকে বিবাহ করা বৈধ করেছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿إِنَّمَا أُحِلُّ لَكُمُ الظَّبَابَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالسُّخْنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُخْسَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾

“আজ তোমাদের জন্য যাবতীয় ভালো ও পবিত্র বস্তু হালাল করা হলো ও যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল। আর তোমাদের খাদ্য ও তাদের জন্য হালাল। সচরিত্বা মুমিন নারী এবং তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের সচরিত্বা নারী তোমাদের জন্য হালাল করা হলো যখন তোমরা তাদেরকে (বিয়ের জন্য) মোহরানা প্রদান করো।” [সূরা মায়দাহ : ৫]

আহলে কিতাবী নারীকে বিবাহ করা জায়ে। এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত। আহলে কিতাবদের মাঝে যেসকল নারীদেরকে বিবাহ করা বৈধ, তারা হলো যারা তাওরাত ও ইঞ্জিল ধারণ করে আছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّا أَنْزَلْنَا الْكِتَابَ عَلَىٰ طَالِبَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا﴾

“যেন তোমরা না বলতে পারো যে, কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে দুই (ইহুদি ও নাসারা) সম্প্রদায়ের প্রতিই নাফিল হয়েছিল।” [সূরা আনআম : ১৫৬]



**الباب الثاني: في الصداق وحقوق الزواج وواجباته، ووليمة العرس
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : মোহর, বিবাহের অধিকার, স্বামীর কর্তব্য
এবং বিবাহের অলৌকা**

এতে কিছু মাসআলা রয়েছে:

المُسَالَةُ الْأُولَى: تَعْرِيفُ الصَّدَاقِ، وَمَشْرُوعِيَّتِهِ، وَحُكْمُهِ
প্রথম মাসআলা: মোহরের পরিচয়, মোহরের বৈধতা এবং
তার বিধান সম্পর্কে আলোচনা

ক. মোহরের (الصادق) পরিচয়:

شرعًا: هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته؛ بسبب عقد النكاح.

পরিভ . এ সম্পদ যা বিবাহ চুক্তির কারণে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে দেওয়া ওয়াজিব।

মোহর করে **الصدق** বলে নামকরণ করা হয়েছে বিবাহের প্রতি মোহর প্রদানকারীর আগ্রহের সত্ত্বতা প্রকাশ স্বরূপ। এটাকে আরবীতে **الغُفر**, **النَّخْلَة**, **الْمَرْ** ও বলা হয়।

খ. মোহরের বৈধতা:

কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা মোহর বৈধ হওয়ার মূল দলীল। এর ব্যাখ্যা মোহরের ছক্কের আলোচনায় আসবে।

গ. মোহরের ছক্কম:

গুরুমাত্র বিবাহ চুক্তি সম্পন্ন হলেই সম্পদ দিয়ে দেওয়া স্বামীর জন্য ওয়াজিব। এটিকে রহিত করা বৈধ নয়। এই বিধানের স্বপক্ষে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدْقَاتِهِنَّ بِخَلْقٍ﴾

“তোমরা সম্পর্কে চিঠি নারীদেরকে তাদের মোহরারা প্রদান করো।” [সূরা নিসা : ৪]

মহান আল্লাহ আরও বলেন:

﴿فَمَا أَسْتَعْنَتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ﴾

“অতঃপর তাদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা সঙ্গে করেছ, তাদেরকে তাদের ধার্যকৃত মোহর প্রদান করো।” [সূরা নিসা : ২৪]

মহান আল্লাহ আরও বলেন:

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرُضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾

“যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ না করে থাক অথবা তাদের মোহর নির্ধারণ করার পূর্বে তালাক প্রদান করো, তাহলে তাতে তোমাদের কোনো দোষ নেই।” [সূরা বাকুরাহ : ২৩৬]

সাহল ইবনে সাদ رض থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন,

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّهَا وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ،
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ. فَقَالَ رَجُلٌ: زَوْجِيَّهَا، فَقَالَ: أَعْطِهَا ثُوْبًا....

“সাহল ইবনে সাদ رض থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা নাবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, সে নিজেকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য নিবেদন করছে। এ কথা শনে নাবী ﷺ বললেন: আমার কোনো মহিলার প্রয়োজন নেই। জনেক ব্যক্তি বলল, একে আমার সঙ্গে বিবাহ করিয়ে দিন। নাবী ﷺ তাকে বললেন: তাকে একটি কাপড় দাও।... হাদীস।”^{৮০৩}

আনাস ইবনে মালেক رض থেকে বর্ণিত হাদীস:

^{৮০৩} মুস্তাফাকুন আলাইহি: সহীল বুখারী, খ. ৫০২৯, সহীহ মুসলিম, খ. ফুআ. ১৪২৫।

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أثْرَ زَعْفَرَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهِيمٌ؟ يَعْنِي: مَا شَانَكَ وَمَا أَمْرَكَ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، قَالَ: مَا أَضَدَّتْهَا؟ قَالَ: وَزْنُ نَوَافِرِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: بَارِكْ اللَّهُ لَكَ، أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاءَ.

"নাবী ﷺ আদুর রহমান ইবনে আওফ ﷺ কে জাফরানের চিহ্নে দেখলেন। নাবী ﷺ বললেন: এটা কি? অর্থাৎ তোমার ব্যাপারটি কী বা তোমার বিষয়টি কী? তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি এক মহিলাকে বিয়ে করেছি। তিনি বললেন: তাকে কি মাহর প্রদান করেছ? তিনি বলেন, খেজুরের আঁটির সমপরিমাণ ওজনের স্বর্ণ। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: অলীমার আয়োজন করো, যদিও তা একটি বকরী দিয়েও হয়।"^{৮০৪}

বিবাহের মোহর বৈধ হওয়ার ব্যাপারে সকল মুসলিম একমত হয়েছেন।

المسألة الثانية: حدُه، وحكمته، وتسميتها

দ্বিতীয় মাসআলা: মোহরের নির্ধারিত পরিমাণ, তার তাৎপর্য এবং তা নির্ধারণ

ক. মোহরের নির্ধারিত পরিমাণ:

মোহরের সর্বোচ্চ অথবা সর্বনিম্ন বির্ধারিত কোনো পরিমাণ নেই। চলমান বাজারে যেটা মূল্য বা পারিশ্রমিক হতে পারে, সেটাই বিবাহের মোহর হতে পারে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَأَءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾

"উল্লিখিত নারীগণ ছাড়া অন্য নারীকে মোহর নির্ধারণ করে বিয়ে করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো।" [সূরা নিসা : ২৪]

আয়াতটিতে মাল বা সম্পদের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি। সাহল ইবনে সাদ رض এর বর্ণিত হাদীসে নাবী ﷺ এক মহিলা সম্পর্কে বলেছিলেন, যিনি নিজেকে হেবা বা নিবেদিত করে দিয়েছিলেন।

أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

"তাকে লোহার একটি আঁটি হলেও মোহর দাও।"^{৮০৫}

^{৮০৪} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৩৭৮১, সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৪২৭।

^{৮০৫} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৫১৪৯, সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৪২৫।

এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, সম্পদ বলা যায় এমন বস্তুর সর্বনিম্ন পরিমাণও মোহর হওয়া বৈধ। মোহর যত বেশি হোক সেটা বৈধ হওয়ার দলিল রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ رَزْقَكُمْ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾

“আর তোমরা যদি এক স্তৰীর স্থানে অন্য স্তৰী গ্রহণ করতে হির করো এবং তাদের একজনকে অচেল অর্থও দিয়ে থাকো, তবুও তা থেকে কিছুই ফেরত নিও না।” [সূরা নিসা : ২০]

আর (আল-কিনতার) অর্থ প্রচুর সম্পদ।

খ. মোহরকে শরীয়ত সম্মত করার তাৎপর্য:

মোহরের মাধ্যমে স্তৰীর সাথে স্বামীর উন্নত সম্পর্ক ও সম্মানজনক বৈবাহিক জীবন গঠনের নিশ্চয়তা প্রকাশ পায়। এছাড়াও মোহরের মাধ্যমে স্তৰীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় এবং তাকে বিবাহের প্রস্তুতি গ্রহণের (পরিধেয় বস্তু বা ইত্যাদি খরচ) সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হয়।

গ. মোহরকে পুরুষের উপর নির্ধারণ করার হিকমাহ বা তাৎপর্য:

ইসলাম পুরুষের উপর মোহর ধার্য করেছে; এই আকাঙ্ক্ষায় যে, পুরুষকে ঘৌতুক হিসেবে দেওয়ার জন্য নারী যে সম্পদ জমা করে, তার অবয়াননা থেকে নারীর মর্যাদাকে সমৃদ্ধ রাখতে। আর এটা শারঙ্গ মূলনীতির সাথেও সামাজিক্যপূর্ণ যে, ভরণপোষণের অপরিহার্য দায়িত্ব পুরুষের উপর, নারীর নয়।

ঘ. মোহরের মালিকানা:

মোহর স্তৰীর একক সম্পত্তি। এতে তার অভিভাবকের কারো কোনো হক নেই। তাদের শুধু মোহর উসূল করে দেওয়ার অধিকার রয়েছে। তবে তারা সেটা কনের পক্ষ থেকে গ্রহণ করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿فَإِنْ طِنْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ تَفْسِّا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾

“অতঃপর তারা যদি তা থেকে সন্তুষ্ট হয়ে তোমাদেরকে কিছু দেয়, তবে তা তৃপ্তির সাথে থাও।” [সূরা নিসা : ৪]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন:

﴿فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْنَانًا وَأَشْمًا مُبِيئًا﴾

“তা থেকে কিছুই ফেরত নিও না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য গুনাহ দিয়ে তা গ্রহণ করবে?” [সূরা নিসা : ২০]

ঙ. আকদে নিকাহের সময় মোহরের কথা উল্লেখ করা:

আকদে নিকাহ বা বিবাহের চুক্তির সময় মোহর এবং তার পরিমাণের কথা উল্লেখ করা সুন্নাত। কারণ আল্লাহর রসূল ﷺ সকল বিবাহের ক্ষেত্রেই মোহরের কথা উল্লেখ করেছেন। সেই সাথে মোহর উল্লেখ করার মাধ্যমে তর্ক-বিতর্ক এবং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিবাদ দূর হয়।

চ. মোহরের শর্তসমূহ এবং কোন জিনিস মোহর হবে আর কোন জিনিস হবে না:

১. মোহর হতে হবে এমন সম্পদ যা মূল্যমান রয়েছে এবং বৈধ। যার মালিক হওয়া, বিক্রি করা এবং যার দ্বারা উপকার লাভ করা বৈধ। সুতরাং মদ-শুকর এবং উভয় পক্ষের জ্ঞাতসারে ছিনতাই করা সম্পদ মোহর হতে পারবে না।

২. এমন সম্পদ যা ধোকামুক্ত। সুতরাং তা নির্দিষ্ট এবং নির্ধারিত হতে হবে। অতএব অনির্দিষ্ট সম্পদকে মোহর বানানো সঠিক হবে না। যেমন অনির্দিষ্ট বাড়ি অথবা মুক্তভাবে কোনো বাহন অথবা অনির্দিষ্ট কোনো বাহন অথবা অনির্দিষ্টভাবে গাছ যে ফল দিবে কিংবা এবছর যতগুলো ফল দিবে অথবা এরকম কিছু।

এখান থেকে বুঝা যায় যে, যা কোনো কিছু মূল্য অথবা পারিশ্রমিক হতে পারে তা মোহর হতে পারে। হোক তা নগদ সম্পদ বা ঋণের সম্পদ। অথবা নির্দিষ্ট কোনো সুবিধা।

ছ. মোহর নগদ আদায় করা এবং বাকিতে আদায় করা:

মোহরের পুরো অংশ অথবা কিছু অংশ নগদ বা বাকিতে প্রদান করা জায়েয় আছে। এটা সামাজিক প্রচলন এবং আচার-আচরণের উপর নির্ভর করে। তবে শর্ত হলো বাকিতে আদায় করার সময়টা একেবারে অজানা হতে পারবে না। এবং সময়টা বেশি দীর্ঘও হতে পারবে না। কেননা এতে মোহর হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

الثالثة: حكم المغافلة في الصداق

তৃতীয় মাসতালা : মোহর নিয়ে বাড়াবাড়ির লকুম

কিছু হাদীসের মাধ্যমে বুঝা যায় মোহর নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা মুস্তাহব:

১. আয়িশাহ رض সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীস। নিচয়ই তিনি বলেন:

مِنْ يُمْنِي الْمُرْأَةُ تَسْهِيلُ أَمْرِهَا وَقَلْةُ صَدَاقِهَا

“ঐ মহিলা বরকতময় যে তার বিষয়গুলো সহজ করেন এবং মোহরানা করেন।”^{৮০৬}

^{৮০৬} ইবনে হিজাব, ঘ . ৪০৯৫; হাকিম ২/১৮১ এবং তিনি ইমাম মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। ইমাম আলবানী হাসান বলেছেন, যদিকাহ, ৩/২৪৪।

২. উমার খন্দি থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন,

أَلَا تُغَالِوْ إِصْدِقِ النَّسَاءِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَعْوِي عِنْدَ اللَّهِ، كَانَ أَوْلَأَكُمْ هُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أَصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَيْنَ عَشْرَةَ أُوْرِيقَيْهِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْلِبُ بِصَدْقَةِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاؤُهُ فِي قَلْبِهِ، وَحَتَّى يَقُولَ كَلِفْتُ فِيْكَ عَلَقَ الْقِرْزَةِ...

“সাবধান! তোমরা নারীদের মোহর নির্ধারণে বাড়াবাড়ি করো না। কারণ যদি তা দুনিয়ার মর্যাদার বিষয় হতো এবং আল্লাহর নিকট তাকওয়ার প্রতীক হতো, তবে তোমাদের চেয়ে নারী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে অধিক যোগ্য ও অগ্রগণ্য ছিলেন। অথচ তিনি তাঁর স্ত্রীদের কারো মোহর এবং তাঁর কন্যাদের কারো মোহর বারো উকিয়ার অধিক ধার্য করেননি। কখনও স্ত্রীর অধিক মোহর স্বামীর উপর বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর মনে শত্রুতা সৃষ্টি হয়। এমনকি সে বলতে থাকে, আমি তোমার জন্য পানির মশক বহনে বাধ্য হয়েছি।”^{৮০৭}

৩. আবু সালামা খন্দি থেকে বর্ণিত। হাদীস:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: عَنْ صَدَاقِ النِّسَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتِ: أَنْتَ عَشْرَةَ أُورِيقَيْهِ، وَنَسْنَاءٌ، قَالَتْ: أَتَذَرِي مَا النَّسْنُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُورِيقَيْهِ

“আবু সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশাহ খন্দি কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিবাহে মোহর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, মোহরের পরিমাণ ছিল বারো উকিয়াহ ও এক নাশ। তিনি বললেন, তুমি কি জানো নাশ এর পরিমাণ কতটুকু? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, এক নাশ এর পরিমাণ আধা উকিয়াহ।”^{৮০৮}

المُسَأَّلَةُ الرَّابِعَةُ: الْحُقُوقُ الْزَوْجِيَّةُ

চতুর্থ মাসআলা: বিবাহিত জীবনের অধিকারসমূহ

কোনো বিবাহ যখন সহীহভাবে সম্পন্ন হয় তখন তার উপর ভিত্তি করে স্বামী-স্ত্রীর অনেক অধিকার স্বাভ্যন্ত হয়।

^{৮০৭} সুনান আবু দাউদ, ঘা. ২১০৬, আহমদ ১/৪০; তিরমিয়ী, ঘা. ১১১৪; ইবনু মাজাহ, ঘা. ১৮৮৭; শাইখ আলবানী বলেন, হাসান সহীহ, সহীহত তিরমিয়ী, ঘা. ১৫৩২। عَلَى الْعِرْفِ: তার দফ্তি তাকে ঝুঁকিয়ে রেখেছে। এর স্বারা উদ্দেশ্য: তোমার জন্য সবকিছুই বহন করিবি এমনকি মটকা বহন করেছি। এর বদলে উল্লেখ করিব বর্ণিত আছে।

^{৮০৮} সহীহ মুসলিম, ঘা. ৩৩৮০, ফুআ. ১৪২৬।

প্রথম: স্ত্রীর অধিকার

স্বামীর উপর স্ত্রীর কিছু আর্থিক অধিকার থাকে। যেমন: মোহর ও ভরণপোষণের ব্যায়। আর্থিক অধিকারের পর কিছু আভ্যন্তরীণ অধিকারও সাধ্যশুল্ক হয়ে থাকে। যেমন স্ত্রীর প্রতি ন্যায় বিচার করা, সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখা এবং স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করা। এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে আসছে।

১. মোহর: এটি স্বামীর উপর স্ত্রীর একটি অধিকার। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَأَنْتُمْ إِنْسَانٌ صَدُّقَاتِهِنَّ بِخَلْقِهِنَّ﴾

“তোমরা সম্মতিতে নারীদেরকে তাদের মোহরারা প্রদান করো।” [সূরা নিসা : 8]

অন্যান্য আরও দলীল পিছনে গত হয়েছে।

২. ভরণপোষণ, পোশাক-আশাক এবং বসবাসের ব্যবস্থা: স্ত্রীর জন্য এগুলোর ব্যবস্থা করে দেওয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرِضِّعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

“যে ব্যক্তি দুধপানের সময় পূর্ণ করতে চায়, তার জন্য মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে। পিতার কর্তব্য ভালোভাবে তাদের ভরণপোষণ করা।” [সূরা বাক্সারাহ : ২৩৩]

এবং অন্যত্র বলেছেন:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

“পুরুষরা নারীদের অভিভাবক। কারণ আল্লাহ তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং এজন্য যে, পুরুষ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে।” [সূরা নিসা : ৩৪]

পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করা হাকীম ইবনে মুয়াবিয়া আল-কুশাইরী এর হাদীস।

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجِي؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَأَنْ تَكْسُوَهَا إِذَا أَكْسَيْتَ،

“তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! স্ত্রীর প্রতি কী হক রয়েছে? তিনি ~~বলেন~~ বলেন: তুমি যখন খাবে তাকেও খাওয়াবে। তুমি পোশাক পরিধান করলে তাকেও পোশাক দিবে।”^{৮০৯}

^{৮০৯} সুনান আবু দাউদ, ঘ্য. ২১৪২, আহমাদ ৪/৪৪৭; হাকিম ২/১৮৭ এবং তিনি সহীহ বলেছেন; শাহিথ আলবালি সহীহ বলেছেন, ইবনে যাত্তা, ঘ্য. ২০৩৩।

আল্লাহর রসূল ﷺ এর খুতবা থেকে জাবির ৩৫২ এর বর্ণিত হাদীস। তাতে রয়েছে

وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقٌ مَّوْهِنٌ وَكِسْوَتٌ مُّهِنٌ بِالْمَعْرُوفِ

“তাদের জন্য ন্যায়সংগত খাদ্য ও পোশাকের ব্যবস্থা করা তোমাদের কর্তব্য।”^{৮১০}

৩. মিলনের মাধ্যমে জীকে নিষ্পাপ রাখা: বিবাহে তার যে অধিকার এবং উপকার রয়েছে সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং ফিতনাকে তার থেকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্য। আয়াতের ব্যাপকতা থেকে এটা প্রমাণিত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

فَإِذَا نَظَرْتُنَّ فَأُثْوَهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ

“তারপর তারা যখন পরিশুল্ক হবে তখন তাদের সহবাস করো, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন।” [সূরা বাকুরাহ : ২২২]

فَسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأُثْوَرُوا حَرْثَكُمْ أَئِ شَيْشَمْ

“তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছে গমন করতে পারো।” [সূরা বাকুরাহ : ২২৩]

وَفِي بُضْعِ أَحَدُكُمْ صَدَقَةٌ

“আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও একটি সাদক।”^{৮১১} অর্থাৎ মিলন।

৪. স্ত্রীর সাথে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং সুন্দর আচরণ করাঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করবে।” [সূরা নিসা : ১৯]

সুন্দরাং স্ত্রীর সাথে উভয় সম্পর্কের মাধ্যমে তার অন্তরঙ্গ হয়ে যাবে, তার থেকে যে কষ্টদায়ক আচরণ প্রকাশ পায় সেগুলোর উপর ধৈর্য ধারণ করবে এবং তার প্রতি ভালো ধারনা রাখবে।
আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন: حَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ لِعَلِيهِ

“তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই যে তার পরিবারের নিকটে উভয়।”^{৮১২}

৫. জীরদের মাঝে ভরণপোষণ এবং রাত্রিযাপনে নিরপেক্ষ থাকাঃ এটা সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে যার একাধিক স্ত্রী রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

^{৮১০} সহীহ মুসলিম, ঘ. ২৮৪০, ফুআ. ১২১৮।

^{৮১১} সহীহ মুসলিম, ঘ. ২২১৯, ফুআ. ১০০৬।

^{৮১২} আহমাদ ৪/৪৭২; সুনান আবু দাউদ, ঘ. ৪৬৮৬; শাইখ আলবানী যদিফ বলেছেন, ফাটফাহ ২/২৪২।

﴿فَإِنْ خَفِئْتُمْ لَا تَعْدِلُوا﴾

“যদি তোমরা ইনসাফ করতে না পারার ভয় করো।” [সূরা নিসা : ৩]

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشَعُّ نُشُورًا، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْتَهُنَّ، لَا يَتَهَيَّإِلَى الْمُرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تَسْعِ
‘নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নয়জন সহধর্মী ছিলেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লাম তাদের মাঝে পালাবণ্টনে নয় দিনের আগে (পালার) প্রথম স্ত্রীর কাছে পুনরায়
পৌছাতেন না।”^{৮১৩}

দ্বিতীয়: স্বামীর অধিকার

স্ত্রীর থেকে প্রাপ্য স্বামীর অধিকারগুলো স্বামী থেকে পাওয়া স্ত্রী অধিকারের থেকে বড়ো। আল্লাহ
তা‘আলা বলেন: ﴿لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرْجَاتٌ﴾

“পুরুষদেরকে তাদের উপর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।” [সূরা বাক্সারাহ : ২২৮]

রসূল ﷺ বলেছেন:

لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمْرَتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَا تُؤْدِي الْمُرْأَةُ حَقًّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا
كُلَّهُ، حَتَّى تُؤْدِيَ حَقًّا رَوْجَهَا عَلَيْهَا كُلَّهُ

“আমি যদি কোনো ব্যক্তিকে অপর কাউকে সাজদা করার আদেশ করতাম, তাহলে অবশ্যই
স্ত্রীকে তার স্বামীকে সাজদা করতে নির্দেশ দিতাম। কোনো মহিলা তার উপর অর্পিত আল্লাহর
হক সম্পূর্ণ আদায় করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার স্বামীর হক আদায় করবে।”^{৮১৪}

স্ত্রীর কাছে স্বামীর প্রাপ্য অধিকার:

১. স্বামীর গোপন বিষয়কে হেফাজত করা, কারো কাছে প্রকাশ না করা: কারণ আল্লাহ
তা‘আলা বলেন:

﴿فَالصَّالِحَاتُ قَاتِنَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾

“যে সকল নারী পুণ্যবতী তারা আনুগত্য করে, লোকচক্ষুর আড়ালে আল্লাহর সংরক্ষিত বিষয়
সংরক্ষণ করে।” [সূরা নিসা : ৩৪]

^{৮১৩} সহীহ মুসলিম, ঘ. ৩৫২০, ফুআ. ১৪৬২।

^{৮১৪} ইবনু মাজাহ, ঘ. ১৮৫২; বায়হাকী ৭/২৯২; শাইখ আলবানী ইমাম মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন, সহীহাহ ৩/২০২।

২. সৎ কাজে স্বামীর অনুগত থাকা ওয়াজিব: আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾

“পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক /” [সূরা নিসা : ৩৪]

৩. স্বামী যখন বিছানায় ডাকবে তখন নিজেকে তার কাছে অর্পণ করাঃ যখন শারঙ্গি কোনো বাধা থাকবে না। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبْتَأْنِي أَنْ تَحْبِيْءَ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُضْبَحَ

“যদি পুরুষ তার স্ত্রীকে তার সঙ্গে বিছানায় শোয়ার জন্য ডাকে, আর সে আসতে অস্বীকার করে, অতঃপর স্বামী স্ত্রীর উপর রাগান্বিত হয়ে রাত্রি যাপন করে, তাহলে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতাগণ ঐ মহিলার ওপর লান্ত বর্ষণ করতে থাকেন।”^{৮১৫}

৪. স্বামীর অর্থ-সম্পদ, ঘরবাড়ি এবং সন্তান-সন্ততিকে রক্ষণাবেক্ষণ ও উত্তমভাবে লালন-পালন করাঃ আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، إِلَمَّا مُرِّعَ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ... وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتٍ زُوْجَهَا وَهِيَ سَرُّولَهُ عَنْ رَعِيَّتِهَا

“তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই অধীনদের (দায়িত্ব) সংস্কারে জিজ্ঞেস করা হবে। ইমাম দায়িত্বশীল; তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।...নারী তার স্বামী-গৃহের কঢ়ী, তাকে তার অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।”^{৮১৬}

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন:

وَكُلُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوْطِنَ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرِهُونَهُ

“তাদের উপরে তোমাদের অধিকার হলো, তারা যেন তোমাদের বিছানায় এমন কাউকে স্থান না দেয় যাকে তোমরা অপছন্দ করো।”^{৮১৭}

৫. আন্তরিকতার সাথে স্বামীর সঙ্গী হওয়া। স্বামীর সাথে উত্তম আচরণ করা। তাকে কষ্ট না দেওয়াঃ আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

^{৮১৫} মুস্তাফাকুন আলাইহি: সহীহ বুখারী, ঘা. ৫১৯৩, ৫১৯৪, সহীহ মুসলিম, ঘা. ফুআ. ১৪৩৬-১২২।

^{৮১৬} মুস্তাফাকুন আলাইহি: সহীহ বুখারী, ঘা. ৮৯৩, সহীহ মুসলিম, ঘা. ফুআ. ১৮২৯।

^{৮১৭} সহীহ মুসলিম, ঘা. ২৮৪০, ফুআ. ১২১৮।

لَا تُؤْذِي امْرَأَةً رَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا قَالَتْ رَوْجَتُهُ مِنَ الْخُورِ الْعَيْنِ: لَا تُؤْذِيَهُ، قَاتَلَكَ اللَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ
يُوْشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا

“যখন স্ত্রী তার স্বামীকে কষ্ট দেয়, তখন জান্নাতে তার আয়তালোচনা হর স্তুগণ বলতে থাকেন, ওহে! আল্লাহ তোমার ধৰ্মস করুন। তুমি তাকে কষ্ট দিও না। সে তোমার নিকট অন্ত দিনের মেহমান। অচিরেই সে তোমাকে ত্যাগ করে আমাদের নিকট চলে আসবে।”^{৮১৮}
الدُّخِيل
বা আদ দাখিল অর্থ হলো- মেহমান, কুটুম্ব।

তৃতীয়: স্বামী-স্ত্রীর ঘোথ অধিকার

পূর্বে উল্লিখিত অধিকারগুলোর অধিকাংশই স্বামী-স্ত্রীর ঘোথ অধিকার। এগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলো উপভোগ এবং এর সাথে সম্পূর্ণ অধিকারগুলো। সেই সাথে স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকেই অপরের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। অপরের দেওয়া কষ্ট বা আচার-আচরণকে মেনে নিতে হবে। অপরের অধিকারকে ঝুলিয়ে রাখতে পারবে না। একে অন্যকে অপছন্দ করতে পারবে না এবং অন্যকে কষ্ট ও খোঁটা দিতে পারবে না। কেননা আল্লাহ তাঁ'আলা বলেছেন: ﴿وَعَاشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

“তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করবে।” [সূরা নিসা : ১৯]

আরও বলেছেন: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

“নারীদের ন্যায়সংগত অধিকার রয়েছে তাদের উপর পুরুষদের অধিকারের মতোই।”

[সূরা বাক্সারাহ : ২২৮]

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন: ﴿خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ﴾

“তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই যে তার পরিবারের নিকটে উত্তম।”^{৮১৯}

সেই সাথে স্বামীর কাছে স্ত্রী অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও তাকে রেখে দেওয়ার বিধান করা হয়েছে। কারণ আল্লাহ তাঁ'আলা বলেন:

﴿وَعَاشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهُتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

“তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করো; তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ করেও থাকো, তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ অগণিত কল্যাণ রেখেছেন।” [সূরা নিসা : ১৯]

^{৮১৮} মুসলামে আহমাদ ৫/২৪২; ইবনু মাজাহ, হা. ২০১৪; শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহাহ, হা. ১৭৩।

^{৮১৯} আহমাদ ৪/৪৭২; সুনান আবু দাউদ, হা. ৪৬৮৬; শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, যফাহ ২/২৪২।

المسألة الخامسة: إعلان النكاح

পঞ্চম মাসআলা: বিবাহের কথা প্রচার করা

বিবাহের কথা প্রচার-প্রসার করা এবং তাতে দফ বাজানো সুন্নত। আল্লাহ আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

فَصُلِّ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحُرْمَامِ الصَّوْتُ وَالدُّفُّ فِي النَّكَاحِ

“বিবাহে হালাল ও হারামের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে ঘোষণা দেওয়া ও দফ বাজানো।”^{৮১০}

দফ বাজাবে শুধু মেয়েরা, ছেলেরা নয়। তবে শর্ত হলো দফের সাথে অশ্লীল বা শরীয়ত বিরোধী কোনো কথা থাকতে পারবে না।

المسألة السادسة: الوليمة في النكاح

ষষ্ঠ মাসআলা: বিবাহের অলীমা

الوليمة: طعام العرس يدعى إليه الناس ويجمعون.

অলীমা: বাসরকে কেন্দ্র করে যে খাবারের আয়োজনে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া হয়।

অলীমা করাকে সুন্নত করা হয়েছে। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ رض এর বর্ণিত হাদিসের কারণে। তিনি এক নারীকে বিবাহ করার পর আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছিলেন:

أَفْلَمْ وَلَوْبِشَاءَ

“একটি ছাগল দিয়ে হলেও অলীমা করো।”^{৮১১}

এবং আল্লাহর রসূল ﷺ নিজেও অলীমা করেছেন।

أَوْمَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَبِّنَبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِخُبْزٍ وَلَسْمِ

“নাবী ﷺ যায়নাব رض কে বিবাহ করে রুটি ও গোশত দিয়ে অলীমা করেছেন।”^{৮১২}

^{৮১০} আহমাদ ৩/১৪৮, নাসাই ২/৯১, তিরমিয়ী, হা. ১০৮৮ এবং তিনি হসান বলেছেন: ইমাম আলবানী হসান বলেছেন, ইরওয় নং ১৯৯৪।

^{৮১১} মুস্তালাকুন আলাইহি : সহীহল বুখারী, হা. ২০৪৮, মুসলিম ১৪২৮।

^{৮১২} মুস্তালাকুন আলাইহি : সহীহল বুখারী, হা. ৫১৫৪, মুসলিম ১৪২৮।

المسألة السابعة: حكم إجابة دعوة وليمة العرس

সপ্তম মাসআলা: অলীমার দাওয়াত কবুল করার বিধান

অলীমার দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব। দলীল ইবনু উমার رض এর বর্ণিত হাদীস।

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الولِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

“তোমাদের কাউকে অলীমার দাওয়াত দেওয়া হলে তাতে অংশগ্রহণ করবে।”^{৮২৩}
এবং আবু হুরায়রা رض থেকে বর্ণিত। হাদীস।

مَنْ لَمْ يُحِبِ الدُّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

“যে ব্যক্তি দাওয়াত কবুল করল না, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফারমানী করল।”^{৮২৪}

অলীমার দাওয়াত কবুল করার শর্তসমূহ:

১. বিবাহের প্রথম দিন অলীমা হতে হবে। যদি দ্বিতীয় দিন অলীমা হয় তাহলে সেই দাওয়াত কবুল করা মুন্তাহাব। আর তৃতীয় দিন অলীমা করা মাকরাহ। ইবনু মাসউদ رض থেকে বর্ণিত হাদীস। নিশ্চয়ই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

طَعَامُ أُولِيَّ بَوْمِ حَقٌّ، وَطَعَامُ بَوْمِ الثَّانِي سُنَّةُ، وَطَعَامُ بَوْمِ الثَّالِثِ سُنْنَةُ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمْعَ اللَّهِ بِهِ

“বিয়ের প্রথম দিনে খাবারের (অলীমা) ব্যবস্থা করা আবশ্যক। দ্বিতীয় দিনে ব্যবস্থা করা সুন্নাহ এবং তৃতীয় দিনে খাবারের (অলীমা) ব্যবস্থা করা হয় নাম-ডাক ছড়ানোর উদ্দেশ্যে। যে ব্যক্তি নাম-ডাক ছড়াতে চায়, আল্লাহ তা'আলা তাতে তেমনিই প্রকাশ করবেন।”^{৮২৫}

২. দাওয়াতকারী মুসলিম হতে হবে। সুতরাং কাফেরের দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব নয়।

৩. দাওয়াতকারী (শরীয়তের) অবাধ্য, প্রকাশ্য গুনাহকারী, অত্যাচারী এবং হারাম মালের অধিকারী হতে পারবে না।

৪. দাওয়াত নির্দিষ্টভাবে হতে হবে। সুতরাং যদি আমভাবে দেওয়া হয়। তাহলে তা কবুল করা ওয়াজিব নয়।

৫. দাওয়াতের উদ্দেশ্য হতে হবে সম্মৌতি ও নৈকট্য লাভ। সুতরাং যদি ভয়ের কারণে অথবা প্রভাবশালীতার কারণে কাউকে দাওয়াত দেওয়া হয়। তাহলে সেই দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব নয়।

^{৮২৩} মুত্তালাকুন আলাইহি : সহীহল বুখারী, হা. ৫১৭৩, সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৪২৯/৯৬।

^{৮২৪} সহীহ মুসলিম, হা. ৩৪১৩, ফুআ. ১৪৩২।

^{৮২৫} তিরমিশী, হা. ১০৯৭; একই অর্থে আহমাদ ইবনে হাফল তার মুসনাদে ৮/২৮; আলবানী ঘষফ বলেছেন, ইরওয়া, নং ১৯৫০।

৬. অলীমার মধ্যে খারাপ কিছু থাকতে পারবে না। যেমন মদ খাওয়া, গান-বাজনা করা অথবা নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা। সুতরাং এগুলো পাওয়া গেলে দাওয়াত করুল করা ওয়াজিব হবে না। জাবির ^{ক্ষেত্রে} এর বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে। আল্লাহর রসূল ^{ক্ষেত্রে} বলেন:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَقْعُدُنَّ عَلَىٰ مَائِذَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْحَفْرُ

“যে আল্লাহ ও পরিকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে যেন এমন দণ্ডরখানে না বসে যেখানে মদ পরিবেশন করা হয়।”^{৮২৬}

তবে যদি দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়ে এগুলো দূর করার ক্ষমতা রাখে, তাহলে দাওয়াত করুল করা এবং সেখানে উপস্থিত হয়ে এই খারাপ কাজগুলো প্রতিহত করা তার জন্য ওয়াজিব। আবু সাউদ খুদরী ^{ক্ষেত্রে} আল্লার রসূল ^{ক্ষেত্রে} থেকে বর্ণনা করেন:

مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكِرًا فَلْيُغَيِّرْهُ إِبَدَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَافُ الْإِيمَانِ

“তোমাদের কেউ অন্যায় কাজ হতে দেখলে সে যেন নিজ হাতে (শক্তি প্রয়োগে) পরিবর্তন করে। যদি তার সে ক্ষমতা না থাকে, তবে মুখ (বাক্য) দ্বারা এর পরিবর্তন করবে। আর যদি সে সাধ্যও না থাকে, তখন অন্তর দ্বারা করবে। তবে এটা ইমানের দুর্বলতম পরিচায়ক।”^{৮২৭}

^{৮২৬} আহমাদ ১/২০; শাইখ আলবানী সন্তুষ্ট বলেছেন, ইরওয়া ১৯৪৯।

^{৮২৭} সন্তুষ্ট মুসলিম, ঘ. ৮১, ফুআ, ৪৯



الباب الثالث: في الخلع তৃতীয় অনুচ্ছেদ : খোলা তালাক

এই অনুচ্ছেদে দুটি মাসআলা রয়েছে।

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: مَعْنَاهُ، وَأَدْلَهُ مَشْرُوعِيَّتِهِ

প্রথম মাসআলা: খোলার অর্থ এবং তা শরীয়তসম্মত হওয়ার দলীলসমূহ

ক. খোলা তালাকের পরিচয়:

খোলার শাব্দিক অর্থ: (পোশাক খুলে) ফেলা বাক্য থেকে শব্দটি নেওয়া হয়েছে। কারণ স্বামী এবং স্ত্রী একে অন্যের জন্য পোশাক স্বরূপ।

شرعًا: فُرْقَةٌ تجْرِي بَيْنَ الرَّوَاجِينَ عَلَى عَوْضٍ تَدْفَعُهُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، بِالْفَاظِ مُخْصُوصَةٍ

পারিভাষিক অর্থ: স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে প্রদান করা কোনো সম্পদের বিনিময়ে নির্দিষ্ট কিছু শব্দ দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ফেলা।

খ. খোলা তালাক শরীয়ত সম্মত করা হয়েছে কুরআনের মাধ্যমে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقْبِلَ حَدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

“অতঃপর তোমরা যদি আশংকা করো, আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে পারবে না, সেই অবস্থায় স্ত্রী কোনো কিছুর বিনিময়ে মুক্তি চাইলে, তাতে উভয়ের কোনো দোষ নেই।” [সূরা বাকারাহ : ২২৯]

ইবনু আবুস হুসেন এর বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে।

عَنْ أَبْنِي عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتَ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَغْتَبْتُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِي أَكْرَهُ^{٢٢٨} الْكُفَّارَ فِي الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكْرَهُ دِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتُهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَفْبِلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلَقْهَا تَطْلِيقَةً»

২২৮) সে সঙ্গীর অবিধাসে পরিণত হওয়া ও প্রাপ্য অধিকারের কম পাওয়াকে অপছন্দের করে। এটি হয় তাকে তীব্র অপছন্দ করার ফলে, হাদেসের কোনো দোষের জন্য নয়।

‘ইবনু আবাস খেল হতে বর্ণিত। সাবিত ইবনু কায়স এর স্ত্রী নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! চরিত্রগত বা দ্বিনী বিষয়ে সাবিত ইবনু কায়সের উপর আমি দোষারোপ করছি না। তবে আমি ইসলামের মধ্যে থকে কুফরী করা অর্থাৎ স্বামীর সঙ্গে অমিল) পছন্দ করছি না। রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি কি তার বাগানটি ফিরিয়ে দেবে? সে বলল: হ্যাঁ। রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি বাগানটি গ্রহণ করো এবং তাকে এক তালাক দিয়ে দাও।’^{৮২৯}

المسألة الثانية: أحكام المتعلقة به، والحكمة منه

ঘৃতীয় মাসআলা: খোলা তালাকের সাথে সম্পৃক্ত বিধান এবং এর সংশ্লিষ্ট হিকমাহ
ক. খোলা তালাকের বিধি-বিধান:

খোলা তালাকের বিধি-বিধানের সার-সংক্ষেপ:

১. স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের অবনতির কারণে খোলা তালাক বৈধ হয়ে থাকে। এটা সম্পদের বিনিময় ছাড়া সংগঠিত হয় না। সম্পদের পরিমাণ স্ত্রী নিজে স্বামীর জন্য ধার্য্য করবে।
২. অপ্রাপ্ত বয়স্ক স্ত্রীর মাধ্যমে খোলা তালাক সংগঠিত হবে না। কেননা স্বামী-স্ত্রীর মাঝের সম্পর্ক ছিল করার কোনো অবস্থানে থাকে না।
৩. মহিলা যখন সাথে খোলা তালাকের চুক্তি সম্পন্ন করবে তখন খোলা তালাক পাওয়ার কারণে মহিলা নিজের মালিক হয়ে যাবে। স্বামীর কোনো ক্ষমতাই তার উপর থাকবে না। এমনকি স্বামী তাকে আর ফেরাতেও পারবে না।
৪. খোলা তালাক দেওয়ার ইদত পালনকালে খোলাপ্রাপ্ত নারীর সাথে কোনো রকমের তালাক, যিন্হির বা ইলা সংযুক্ত হবে না। কেননা এই নারী তার স্বামী থেকে একেবারেই অপরিচিত হয়ে গেছে।
৫. হয়েয় এবং সহবাস হওয়া তুহুরের ভিতর খোলা তালাক দেওয়ার বৈধতা আছে। কারণ এর মাধ্যমে স্ত্রীর যাতে কোনো ক্ষতি না হয়। আর আল্লাহ তা'আলা খোলা তালাককে মুক্তভাবে রেখে দিয়েছেন। এটাকে কোনো সময় দ্বারা শর্তযুক্ত করেননি।
৬. পুরুষের জন্য এটা হারাম যে, সে তার স্ত্রীকে কষ্ট দিবে এবং স্ত্রীর হক আটকে দিয়ে স্ত্রীকে খোলা তালাক নিতে বাধ্য করবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَلَا تَنْعَلِهِنَّ لِئَذْهَبُوا بِعَضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾

“তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে কিছু আত্মান করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকে রেখো না, যদি না তারা স্পষ্ট খারাপ আচরণ করে।” [সূরা নিসা : ১৯]

^{৮২৯} সহীল বুখারী, ঘ. ৫২৭৩।

୭. ଖୋଲା ତାଲାକ ନେଓଯାର ମତୋ କୋନୋ କାରଣ ନେଇ ଏବଂ ଅବଶ୍ୱାସ ଭାଲୋ ଯାଚେ, ଏମତାବଶ୍ୱାସ କୋନୋ ମହିଳାର ଖୋଲା ତାଲାକେର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଓଯା ମାକରୁହ ଏବଂ ନିଷେଧ । ତବେ ଯଦି ସ୍ଵାମୀର ଜନ୍ମଗତ କୋନୋ କ୍ରତି ଥାକେ ଯେହି କ୍ରତି ନିୟେ ସଂସାର କରା ମହିଳାର ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନା । ଅଥବା ସ୍ଵାମୀର ଚରିତ୍ର ଖାରାପ । ଅଥବା ମହିଳା ଆଶଙ୍କା କରଛେ ଯେ, ସେ ଆଲ୍ଲାହର ସୀମା ରକ୍ଷା କରତେ ପାରବେ ନା । ତାହାଲେ ଭିନ୍ନ କଥା ।

୮. ଖୋଲା ତାଲାକ ଶରୀୟତ ସମ୍ଭବ କରାର ହିକମାହ: ଏଠା ସକଳେରଇ ଜାନା ବିଷୟ ଯେ, ବିବାହ ସ୍ଵାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀର ମାଝେ ବଞ୍ଚନ ଓ ସୁସମ୍ପର୍କ ତୈରି କରେ । ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଆଲା ବଲେଛେ:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾

“ଆର ତା’ର ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନାବଳୀର ମଧ୍ୟେ ରଯେଛେ ଯେ, ତିନି ତୋମାଦେର ଜନ୍ଯ ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟ ଥିକେ ତୋମାଦେର ସଙ୍ଗିନୀଦେରକେ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ; ଯାତେ ତୋମରା ତାଦେର କାହେ ଶାନ୍ତି ପାଓ ଏବଂ ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାଲୋବାସା ଓ ସହମର୍ମିତା ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ ।” [ସୂରା ରୂମ : ୨୧]

ଆର ଏଠାଇ ହଲୋ ବିବାହେର ଫଳାଫଳ । ସୁତରାଂ ଯଦି ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାନ୍ଧବାୟିତ ନା ହୟ । ଅର୍ଥାତ୍, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ହତେ ଆନ୍ତରିକତା ପାଓଯା ନା ଯାଯ କିଂବା ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଵାମୀର ପକ୍ଷ ଥିକେ ଆନ୍ତରିକତା ନା ପାଓଯା ଯାଯ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଖାରାପ ହୟେ ଯାଯ ଓ ସମାଧାନ କଠିନ ହୟେ ଯାଯ ତବେ ଶ୍ରୀକେ ସୁନ୍ଦରଭାବେ ଛେଡ଼େ ଦେଓଯାର ବ୍ୟପାରେ ସ୍ଵାମୀକେଇ ଆଦେଶ ଦେଓଯା ହୟେଛେ । ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଆଲା ବଲେଛେ,

﴿فَإِمْسَاكٌ يَتَعْرُوفُ أَوْ شَرِيعٌ يُبَخْسَانٌ﴾

“ଅତଃପର ଉତ୍ସମଭାବେ ରେଖେ ଦାଓ ଅଥବା ସୁନ୍ଦରଭାବେ ଛେଡ଼େ ଦାଓ ।” [ସୂରା ବାକ୍ରାରାହ : ୨୨୯]

ଆର ଯଦି ବିଷୟଟା ଉଲ୍ଲେଷ୍ଟ ହୟ । ସ୍ଵାମୀର ପକ୍ଷ ଥିକେ ଭାଲୋବାସା-ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତି ପାଓଯା ଯାଯ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀର ପକ୍ଷ ଥିକେ ଏଗ୍ରଲୋ ପାଓଯା ନା ଯାଯ । ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ସ୍ଵାମୀର ଆଚାର-ଆଚରଣ ଅଥବା ତାର ଦ୍ଵିନଦାରିତ୍ତେର ଘଟିତିକେ ଅପଛନ୍ଦ କରେ । ଅଥବା ସ୍ଵାମୀର ହକ ଉପେକ୍ଷା କରାର ଦ୍ୱାରା ଗୋନାହଗାର ହୁଏଯାର ଆଶଙ୍କା କରେ ଏ ଅବଶ୍ୱାସ ମହିଳାର ଜନ୍ଯ ଜାଯେଯ ହବେ ସ୍ଵାମୀର ଥିକେ ବିଚ୍ଛେଦ ଚାଓଯା ଏମନ ସମ୍ପଦେର ବିନିମୟେ ଯା ସେ ନିଜେଇ ସ୍ଵାମୀର ଜନ୍ଯ ଖରଚ କରବେ । ଏବଂ ସେଇ ସମ୍ପଦେର ବିନିମୟେ ନିଜେକେ ମୁକ୍ତ କରବେ । ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଆଲା ବଲେଛେ:

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾

“ଅତଃପର ତୋମରା ଯଦି ଆଶଙ୍କା କରୋ ଯେ, ଆଲ୍ଲାହର ସୀମାରେଖା ରକ୍ଷା କରତେ ପାରବେ ନା, ସେଇ ଅବଶ୍ୱାସ କୋନୋ କିଛୁର ବିନିମୟେ ମୁକ୍ତି ଚାଇଲେ, ତାତେ ଉଭୟେର କୋନୋ ଦୋଷ ନେଇ ।” [ସୂରା ବାକ୍ରାରାହ : ୨୨୯]



الباب الرابع : في الطلاق চতুর্থ অনুচ্ছেদ : তালাক

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: مَعْنَاهُ، وَأَدْلَةُ مَشْرُوعِيَّتِهِ، وَحُكْمَتِهِ

প্রথম মাসআলা: তালাকের অর্থ, শরীয়তসম্মত হওয়ার প্রমাণসমূহ এবং
তালাকের হিকমাহ

ক. তালাকের পরিচয়:

(طَلَقَ النَّاقَةُ إِذَا سَرَحَتْ - التَّخْلِيَّةُ - বা মুক্ত হওয়া। বলা হয়- তালাক বা তালাকের শাব্দিক অর্থ - বা মুক্ত হওয়া। বলা হয়-
অর্থাৎ উটনিটি মুক্ত হয়েছে যখন সে চলে গিয়েছে তার ইচ্ছামতো।

شرع: حل قيد النكاح أو بعضه.

পারিভাষিক অর্থ: বিবাহ বা তার কিছু অংশের বন্ধনকে মুক্ত করা।

খ. যার তালাক বৈধ হবে: বৌধসম্পন্ন, ভালো-মন্দ পার্থক্যকারী, জ্ঞানসম্পন্ন, প্রাপ্তবয়স্ক স্বামীর
তালাক বৈধ হবে। অথবা তালাকের উকিল এর পক্ষ থেকে তালাক বৈধ হবে। সুতরাং স্বামী
ছাড়া অন্য কারো তালাক বৈধ হবে না, নাবালেগ এর তালাক বৈধ নয়। পাগল, মাতাল,
নেশাগ্রস্ত এবং বাধ্যকৃত ব্যক্তির তালাক বৈধ নয় এবং এমন প্রচণ্ড রাগান্বিত ব্যক্তির তালাক বৈধ
নয় যে রাগের সাথে কি বলছে সে নিজেও জানে না।

ଗ. ତାଲାକ ଶରୀୟତ ସମ୍ମତ ହେଉଥାରୁ ସମ୍ପର୍କେ: ବିବାହରେ କ୍ଷେତ୍ରେ ସ୍ଵାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀର ମାଝେ ଦାସ୍ତତ୍ୟଜୀବନ ସଚଳ ରାଖାଇ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଆର ଅବଶ୍ୟକ ଆଜ୍ଞାହ ତା'ଆଲା ବିବାହରେ କ୍ଷେତ୍ରେ ଦାସ୍ତତ୍ୟ ଜୀବନ ସଚଳ ରାଖାର ଜନ୍ୟ ଅନେକ ଆହକାମ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଷ୍ଟାଚାର ପ୍ରଗଯନ କରେଛେ । ଏବଂ ତା ବାକି ରାଖାର ଆହକାମ ଚାଲୁ ରେଛେ । ତବେ ଏହି ନିୟମ କାନୁନଗୁଲୋ କଥନୋ କଥନୋ ସ୍ଵାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ବା କୋନୋ ଏକଜନେର ପକ୍ଷ ଥେକେ ଯଥନ ରକ୍ଷା କରା ହୟ ନା ତଥନ ତାଦେର ଉଭୟେର ମାଝେ ବୈପରୀତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୟ । ଏମନକି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ତା ସଂଶୋଧନେର କୋନୋ ଉପାୟ ବାକି ଥାକେ ନା । ସୁତରାଂ ଏମନ କିନ୍ତୁ ଆହକାମ ପ୍ରଗଯନ କରା ଆବଶ୍ୟକ ଯାର ମାଧ୍ୟମେ ବିବାହ ବନ୍ଧନକେ ମୁକ୍ତ କରା ଯାଯ । ତା ଏମନଭାବେ ଯେ, ଯାତେ ସ୍ଵାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ କାରୋ ଅଧିକାର ନଷ୍ଟ ନା ହୟ । ଏଟା ତଥନଇ ହବେ ଯଥନ ଉଭୟେର ମାଝେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥାକବେ । ତାଲାକ ଶରୀୟତେ କୁରାଆନ ସୁନ୍ନାହ ଏବଂ ଇଜମା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମଦିତ ।

କୁରାଆନ ଥେକେ ପ୍ରମାଣ: ଆଜ୍ଞାହ ତା'ଆଲା ବଲେନ:

﴿الظَّلَاقُ مَرْتَانٌ فِيمَسَاكٍ يُعْرُوفٌ أَوْ تَسْرِيعٌ بِإِحْسَانٍ﴾

“ତାଲାକ ଦୁଇ ବାର । ଅତଃପର ଉତ୍ସମଭାବେ ରେଖେ ଦିବେ ଅଥବା ସୁନ୍ଦରଭାବେ ଛେଡେ ଦିବେ ।” [ସୁରା ବାକ୍ତାରାହ : ୨୨୯]

﴿إِنَّمَا أَنْهَا الَّتِيْنِ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَظَلَقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾

“ହେ ନାବୀ! ଯଥନ ତୋମରା ତୋମାଦେର ସ୍ତ୍ରୀଦେରକେ ତାଲାକ ଦିବେ ତଥନ ତାଦେର ଇନ୍ଦରେ ପ୍ରତି ଖେଯାଲ ରେଖେ ତାଲାକ ଦିବେ ।” [ସୁରା ତାଲାକ: ୧]

ସୁନ୍ନାହ ଥେକେ ପ୍ରମାଣ: ଇବନୁ ଉମାର ରୂପାଙ୍କଣ ଏର ହାଦୀସ ।

اَنَّهُ طَلَقَ اُمَرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: «إِنَّمَا طَهَرَتْ فِإِنْ شَاءَ فَلْيَطَلَّقْهَا»

“ତିନି ତାର ସ୍ତ୍ରୀକେ ହାଯେୟ ଅବସ୍ଥାଯ ତାଲାକ ଦିଲେନ । ତଥନ ନାବୀ ରୂପାଙ୍କଣ ଉମାରକେ ବଲଲେନ: ସେ ଯେନ ତାକେ ଫିରିଯେ ଆନେ । ହାଯେୟ ଥେକେ ପବିତ୍ର ହେଉଥାର ପର ସେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରେ ତାହଲେ ସେ ତାକେ ତାଲାକ ଦିତେ ପାରବେ ।”^{୮୩୦}

ଉପରେ ଆଲେମଗଣ ତାଲାକ ବୈଧ ଓ ଶରୀୟତସମ୍ମତ ହେଉଥାର ଉପର ଐକମତ୍ୟ ପୋଷଣ କରେଛେ ।

ଗ. ତାଲାକ ଶରୀୟତ ସମ୍ମତ ହେଉଥାର ତାତ୍ପର୍ୟ:

ତାଲାକକେ ଶରୀୟତସମ୍ମତ କରା ହେଯେଛେ । କାରଣ ତାତେ ଦାସ୍ତତ୍ୟ ଜୀବନେର ଅନେକ ବିପଦ ଏବଂ କଳହ ଦୂରୀକରନେର ସମାଧାନ ରହେଛେ । ବିଶେଷ କରେ ଉଭୟେର ମଧ୍ୟେ ଅମିଳ ଏବଂ ପରମ୍ପର ବିଦେଶ ଦେଖା ଦିଲେ, ଯେତୋଟିର କାରଣେ ସ୍ଵାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀର ମାଝେ ଆଜ୍ଞାହର ବିଧାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରା ଏବଂ ଦାସ୍ତତ୍ୟ ଜୀବନ ସଚଳ ରାଖା ସନ୍ତ୍ଵନ ହୟ ନା । ଆର ଏହି କାରଣେ ତାଲାକର ବିଧାନ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଏକଟି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଟେ ।

^{୮୩୦} ମୁହାମ୍ମଦ ଆଜ୍ଞାହିଛି : ସହିତ୍ତ ବୁଖାରୀ, ହ. ୫୨୫୨, ମୁସଲିମ ୧୪୭୧-୧୦ ।

المسألة الثانية: حكم الطلاق، وبيد من يكون؟

তৃতীয় মাসআলা: তালাকের হুকুম এবং কার মাধ্যমে তালাক সংষ্টিত হবে?

প্রয়োজনের সময় তালাক দেওয়া বৈধ। এটাই মূল। যেমন মহিলার খারাপ চরিত্র এবং খারাপ মেলামেশার কারণে। অপ্রয়োজনে তালাক দেওয়া মাকরাহ। কারণ তালাকের মাধ্যমে অনেক কল্যাণের বিবাহ বন্ধনকে দূর করা হয়, যে কল্যাণগুলো মহিলার সাথে সম্পৃক্ত থাকে। যেমন স্বামীর পবিত্রতা রক্ষা করা, সন্তান-সন্ততি লাভ করা ইত্যাদি।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে তালাক দেওয়া হারাম। যার বর্ণনা অবশ্যই তালাকে বিদআত এর আলোচনায় আসবে। আবার কখনো কখনো স্বামীর উপর তালাক দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন স্বামী যখন স্ত্রীর পাপাচার সম্পর্কে জানতে পারবে এবং স্ত্রীর জিনা প্রকাশ হয়ে যাবে। যাতে করে নিজেকে দাইয়ুস হতে না হয় এবং আবেধ সন্তান তাকে চাপিয়ে দেওয়া না হয়। অনুরূপভাবে যদি স্ত্রী তার ধর্মের ব্যাপারে অটল না থাকে। যেমন সলাত পরিত্যাগ করা; সলাত পড়ার উপর অটল না থাকা।

المسألة الثالثة: ألفاظ الطلاق

তৃতীয় মাসআলা: তালাকের শব্দ

তালাকের শব্দসমূহ দুই প্রকার:

১. স্পষ্ট শব্দসমূহ: তা হলো এমন শব্দসমূহ যা শুধু তালাকের অর্থেই গঠন করা হয়েছে। অন্য অর্থ গ্রহণ করে না। শব্দটি হচ্ছে طلاق এবং এ শব্দ থেকে ঝুপান্তরিত শব্দগুলো। যেমন: অতীতকাল বুবায় এমন শব্দ (আমি তোমাকে তালাক দিয়েছি) অথবা কর্ম বাচক নাম হবে। যেমন- انت طلاق (তুমি তালাক) অথবা অকর্মবাচক নাম হবে مطلق (তুমি তালাক প্রাণ্ডা)। সুতরাং এ শব্দগুলোর দ্বারা তালাক প্রতিত হওয়ার অর্থ বোঝায় কিন্তু ভবিষ্যত অর্থবোধক ক্রিয়া বা আদেশ সূচক ক্রিয়া দ্বারা তালাক কার্যকর হবে না। যেমন- مطلقين (তুমি তালাক দিবে) (তুমি তালাক দাও) ইত্যাদি।

২. ইঙ্গিতসূচক শব্দ: সেগুলো এমন শব্দ যা তালাক ছাড়া অন্য অর্থও গ্রহণ করে। যেমন স্বামী তার স্ত্রীকে বলল- তুমি খালি, তুমি মুক্ত, তুমি পৃথক, তোমার রশি তোমার কাঁধে, অথবা তুমি তোমার পরিবারের সাথে যুক্ত হও ইত্যাদি।

তালাকের ক্ষেত্রে ইঙ্গিত সূচক শব্দ এবং স্পষ্ট শব্দের মাঝে পার্থক্য: স্পষ্ট শব্দের মাধ্যমে তালাক কার্যকর হবে, যদিও সে তালাকের নিয়ত না করে। চাই সে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বলুক বা মজা কিংবা ঠাট্টা করে। তার প্রমাণ হলো নাবী ﷺ এর হাদীস।

ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌ، وَهُزْمُهُنَّ جَدٌ: النَّكَاحُ، وَالْطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ

“তিনটি বিষয় এমন যেগুলো উদ্দেশ্য মূলকভাবে বললেও মূল অর্থ গ্রহণ করা হবে এবং ঠিক্কা করে বললেও মূল অর্থ গ্রহণ করা হবে। তা হচ্ছে: বিবাহ, তালাক এবং স্ত্রীকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার বিষয়।”^{৮৩১}

পক্ষান্তরে ইঙ্গিতসূচক শব্দ দ্বারা তালাক প্রতিত হবে না, তবে যদি না সে এমন নিয়ত করে যেটা তার উচ্চারিত শব্দের সাথে সামাজিকস্যপূর্ণ। কারণ এ শব্দগুলো তালাক ছাড়া অন্য অর্থও গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং নিয়ত ছাড়া তালাক কার্যকর হবেনা, তবে যদি স্বামীর নিয়তের কোনো আলামত পাওয়া যায় তবে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।

المسألة الرابعة: طلاق السنة وحكمه

চতুর্থ মাসআলা: সুন্নত তালাক এবং তার বিধান

ক. সুন্নত তালাক:

সুন্নত তালাক দ্বারা উদ্দেশ্য- সুন্নত তালাক হলো ঐ তালাক, শরীয়তপ্রণেতা যার অনুমোদন দিয়েছেন, ইসলামী শরীয়তের শিক্ষা অনুযায়ী যা স্তর অনুযায়ী কার্যকর হয়। আর উহা দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে কার্যকরী হবে। ১. তালাকের সংখ্যা ২. তালাক কার্যকরী হওয়ার অবস্থা।

সুন্নাহ হলো স্বামীর যদি তালাকের প্রয়োজন হয় তবে পবিত্রতাকালীন অবস্থায় তালাক দিবে, যে পবিত্রতায় সে তার সাথে সহবাস করেনি। অতঃপর সে তাকে ছেড়ে দিবে এবং তার ইদত অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় তালাক দিবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّبِيعُ إِذَا ظَلَقْتُمُ الْبِسَاءَ فَظْلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾

“হে নবী! যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দিবে তখন তাদের ইদতের প্রতি খেয়াল রেখে তালাক দিবে।” [সুরা তালাক: ১]

অর্থাৎ, ঐসময়ের মধ্যে যখন নারীরা ইদত পালন শুরু করবে। আর ইদত হলো তাদের পবিত্রতাকালীন সময়। যেহেতু হায়েয়ের সময়কে ইদত বলে গণনা করা হয় না।

ইবনু উমার ইবনু আবু আবাস এবং সাহাবীদের একটি জামাআত এই আয়ত সম্পর্কে বলেছেন যে, بِالْطَّلاقِ বা পবিত্র অর্থ হচ্ছে এমন পবিত্রতাকালীন সময় যে সময়ে সহবাস করা হয়নি।

^{৮৩১} সুন্নাহ আবু দাউদ, হা. ২১৯৪; তিরমিয়ী, হা. ১১৮৪; ইবনু মাজাহ, হা. ২০৩৯; শাইখ আলবানী হাসান বলেছেন, সহীহ সুন্নাহ ইবনে মাজাহ, হা. ১৬৭১।

খ. সুন্নাত তালাকের হকুম: আলেমগণ সুন্নাত তালাক কার্যকর হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَظَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾

“হে নবী! যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দিবে তখন তাদের ইদতের প্রতি খেয়াল রেখে তালাক দিবে।” [সূরা তালাক: ১] অর্থাৎ পবিত্র অবস্থায়।

المسألة الخامسة: الطلاق البدعي وحكمه

পঞ্চম মাসআলা: বিদআতী তালাক এবং তার বিধান

ক. তালাকে বিদয়ী হলো এমন তালাক যা স্বামী নিষিদ্ধ পস্থায় কার্যকর করে। যা শরীয়ত প্রণেতা নিষেধ করেছেন। আর তা কার্যকর হয় দুটি বিষয়ের একটির মাধ্যমে:

১. তালাকের সংখ্যা; ২. তা কার্যকর করার অবস্থা।

যদি এক শব্দের মাধ্যমে তিন তালাক দেয় অথবা একই পবিত্রতায় ভিন্ন ভিন্নভাবে তালাক দেয়, অথবা তাকে নেফাস বা হায়েয অবস্থায় তালাক দেয় অথবা এমন পবিত্রতা অবস্থায় তালাক দেয়, যে পবিত্র অবস্থায় তার সাথে সহবাস করেছে, কিন্তু তার গর্ভ ধারণ স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়নি তবে এসব তালাক হলো তালাকে বিদয়ী, যা হারাম এবং শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ এবং তা কার্যকরকারী গুনাহগার হবে।

সংখ্যার দিক থেকে তালাকে বিদয়ী স্ত্রীকে তার স্বামীর উপর হারাম করে দেয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্য কাউকে বিবাহ না করে। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحْلِلْ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَقِّيْ قَرْجَانَ غَيْرِهِ﴾

“অতঃপর যদি সে তাকে (চূড়ান্ত) তালাক দেয়, তবে এরপর তার জন্য সে (স্ত্রী হিসেবে) হালাল নয়। যে পর্যন্ত না সে (স্ত্রী) অন্য কাউকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে।” [সূরা বাকুরাহ: ২৩০]

আর সময়ের দিক থেকে তালাকে বিদয়ীর ক্ষেত্রে স্ত্রীকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা মুশাহাব। তার প্রমাণ হলো ইবনু উমার رض এর হাদীস।

أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُرَاجَعَتِهَا

“তিনি তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়ার পর নাবী  তাকে ফিরিয়ে আনার আদেশ করেছেন।”^{৮৩২} যখন সে তাকে ফিরিয়ে আনবে তখন পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাকে কাছে রাখা ওয়াজিব। অতঃপর সে ঢাইলে তাকে তালাক দিবে অথবা রেখে দিতে পারবে।

ধ. তালাকে বিদ্যী এর হকুম: স্বামীর উপর তালাকে বিদ্যী হারাম। চাই সেটা সংখ্যার দিক থেকে হোক বা সময়ের দিক থেকে হোক। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

(الظلّاق مرّتان فامسألك بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَشْرِيفٍ بِإِحْسَانٍ)

‘তালাক দুই বার। অতঃপর উভয়ভাবে রেখে দিবে অথবা সুন্দরভাবে ছেড়ে দিবে।’ [সূরা বাক্সারাহ : ২২৯]

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطِلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾

“ହେ ନାବୀ! ସଥନ ତୋମରା ତୋମାଦେର ଶ୍ରୀଦେରକେ ତାଲାକ ଦିବେ ତଥନ ତାଦେର ଇନ୍ଦତେର ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରେଖେ ତାଲାକ ଦିବେ ।” ସୁରା ତାଲାକ: ୧

ଅର୍ଥାତ୍ ଏମନ ପବିତ୍ରତାର ସମୟ ଯେ ପବିତ୍ରତାଯ ସହବାସ ହୁଯନି । ଇବନୁ ଉମାର ଯଥନ ତିନି ତାର ସ୍ତ୍ରୀକେ ହୁଯେୟ ଅବସ୍ଥାୟ ତାଲାକ ଦିଲେନ ତଥନ ନାବୀ ତାକେ ସ୍ତ୍ରୀକେ ଫିରିଯେ ଆନାର ଜନ୍ୟ ଆଦେଶ କରଲେନ ।

ଆର ତାଲାକେ ବିଦୟୀ ସୁମାତ ତାଲାକେର ମତୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକର ହ୍ୟ । କାରଣ ନାବି ଇବନୁ ଉମାର କେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକେ ଫିରିଯେ ଆନାର ଜନ୍ୟ ଆଦେଶ କରେଛେ । ଆର ଫିରିଯେ ଆନା କେବଳ ତାଲାକ ପତିତ ହୁଏଯାର ପରେଇ ସମ୍ଭବ ହ୍ୟ । ତଥନ ଏହି ତାଲାକ ସ୍ତ୍ରୀକେ ତାଲାକ ଦେଓଯାର ମଧ୍ୟେଇ ଗଣ୍ୟ ହବେ ।

المُسَأَّلَةُ الْسَّادِسَةُ: الرَّجْعَةُ

ষষ্ঠ মাসআলা: ফিরিয়ে আনা

ক. এর পরিচয়: ^{وَجْه} এর শাব্দিক অর্থ একবারে ফিরিয়ে আনা।

شرعًا: إعادة زوجته المطلقة طلاقاً غير يائز إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بدون عقد.

পারিভাষিক অর্থ: নৃতন কোনো চুক্তি ব্যতীত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিচ্ছেদ অবস্থা থেকে তার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা।

খ. رجعہ، বা ফিরিয়ে আনা শরীয়ত সম্মত হওয়া: شریعت سمعت ہوئے سامنے کر کুরআন, پুনাহ এবং ইজমার দলীল রয়েছে।

ମୁଦ୍ରାକଳନ ଆଲୋଟିପି : ସହୀତୁଳ ବଖାରୀ, ହ୍ୟ. ୫୩୩୨, ମୁସଲିମ ୧୪୭୧।

কুরআনের দলীল: আল্লাহ তা'আলা বাণী:

﴿وَبُعْلَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَّهُنَّ فِي ذَلِكَ إِنَّ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾

“যদি তারা সংশোধন চায় তবে তাদের স্বামীগণ এই ক্ষেত্রে তাদেরকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে অধিক হকদার !” [সূরা বাকুরাহ : ২২৮]

আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ قَبْلَغُنَّ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾

“যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও অতঃপর তারা তাদের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৌছে যায়, তখন তোমরা তাদেরকে ন্যায়ভাবে রেখে দাও !” [সূরা বাকুরাহ : ২৩১] (ব. এর মাধ্যমে)।

সুন্নাহ থেকে দলীল: ইবনু উমার رض এর হাদীস যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং আল্লাহর রসূল ﷺ এর বাণী ب অর্থাৎ তাকে আদেশ করো সে যেন তাকে ফিরিয়ে আনে।

আলেমগণ একমত্য পোষণ করেছেন যে, তিনি তালাকের কম তালাকদাতার জন্য ইদতের মধ্যে ফিরিয়ে আনার অনুমোদন রয়েছে।

গ. ب বা ফিরিয়ে আনার হিকমাহ: ب বা ফিরিয়ে আনার তাৎপর্য হলো স্বামীকে সুযোগ দান করা; যখন সে তালাক পতিত হওয়ার উপর লজিত হয় এবং নৃতন করে দাম্পত্য জীবনের ইচ্ছ্য করে তখন সে তার সামনে একটি উপায় খুজে পায়। আর এটি হলো বান্দার প্রতি আল্লাহর রহমত এবং করুণা।

ঘ. ب এর শর্তসমূহ: কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে ب ছান্নীহ হবে, তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

১. তালাক ঐ সংখ্যার চেয়ে কম হওয়া, স্বামী যে সংখ্যার মালিক: স্বাধীন পুরুষ তিনি তালাকের মালিক এবং গোলাম দুই তালাকের মালিক। তালাকের সংখ্যা পূর্ণ হয়ে গেলে অন্য কারো সাথে স্ত্রীর বিবাহ ব্যতীত স্বামীর জন্য স্ত্রী আর বৈধ থাকবে না।

২. তালাকপ্রাপ্তা মহিলার সাথে সহবাস হওয়া: কেননা ب বা ফিরিয়ে আনা কেবলমাত্র ইদতের মধ্যেই সাব্যস্ত হবে। আর যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়নি তার উপর কোনো ইদত নেই। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿فِيمَا أَئْتَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْنَاهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَتَأْتُمْهُنَّ عَلَيْنَاهُنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا﴾

“হে মুমিনগণ! যখন তোমরা মুমিন নারীদেরকে বিবাহ করো অতঃপর তাদের সাথে সহবাস করার পূর্বেই তালাক দাও, তাহলে তোমাদের জন্য তাদের উপর কোনো ইদত নেই যা তোমরা গালন করবে।” [সূরা আহয়াব : ৪৯]

৩. বিনিময় ছাড়া তালাক হওয়া: তালাকের ক্ষেত্রে বিনিময়টা স্তুর নিজের জন্য স্বামীর থেকে মুক্তিপণ স্বরূপ। আর ফিরানোর ক্ষেত্রে স্তুর জন্য তা সম্ভব নয়। স্তুর সন্তুষ্টির মাধ্যমে নৃতনভাবে বিবাহ বন্ধন ব্যতীত হালাল হবে না।

৪. বিবাহ বিশুদ্ধ হওয়া: বাতিল বিবাহের ক্ষেত্রে তালাকের পর পুনরায় গ্রহণ করা বৈধ হবে না। কারণ বিবাহ সঠিক না হলে তার তালাকও শুন্দ হবে না। কেননা তালাক হলো বিবাহের শাখা। আর যখন তালাক সঠিক হবে না, তখন পুনরায় গ্রহণ করাও শুন্দ হবে না।

৫. পুনরায় গ্রহণ করা ইদতের মধ্যে হওয়া: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَبُعْلَثُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَّهُنَّ فِي ذَلِكَ﴾

“তাদের স্বামীদের অধিকার হলো ইদতের মধ্যে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা।” [সূরা বাকুরাহ : ২২৮]

৬. رجعة বা পুনরায় গ্রহণ করা সম্পূর্ণভাবে হওয়া: সুতরাং ঝুলন্তভাবে ফিরিয়ে নিলে শুন্দ হবে না। যেমন: স্বামী বলল- যখন এমনটি হবে তখন আমি তোমাকে গ্রহণ করব।

৭. কি দ্বারা رجعة বা পুনরায় গ্রহণ করা সম্পূর্ণ হবে?

১. رجعة সম্পূর্ণ হবে শব্দের মাধ্যমে। যেমন স্বামী বলল, আমি আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনলাম, আমি তাকে রেখে দিলাম, আমি তাকে ফিরালাম।

২. যদি সহবাসের মাধ্যমে رجعة এর নিয়ত করে তবে স্ত্রীর সাথে সহবাসের মাধ্যমে رجعة হবে।

৮. তালাকে রাজয়ীর হকুমসমূহ:

১. তালাকে রাজয়ীপ্রাপ্তা মহিলা স্ত্রী হিসেবে থাকবে, যতক্ষণ ইদতের সময় বাকি থাকবে। অন্যান্য স্ত্রীদের মতোই সে ভরণপোষণ, বস্ত্র এবং বাসস্থানের অধিকারী হবে। অন্যান্য স্ত্রীদের মতোই তার জন্য স্বামীর বাড়িতে অবস্থান করা আবশ্যিক। স্বামীর জন্য তার সঙ্গ গ্রহণ করা বৈধ এবং স্বামী তার সাথে নির্জন সময় কাটাবে ও তার সাথে সহবাস করবে। একজন আরেকজনের উত্তরাধিকারী বলে গণ্য হবে।

২. رجعة বা তালাকে রাজয়ীর ক্ষেত্রে স্ত্রী বা তার অলৌর সন্তুষ্টি শর্ত নয়। তার প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿وَبُعْلَثُهُنَّ أَحَقُّ بِرَادُوا إِصْلَاحًا﴾

“যদি তারা সংশোধন চায় তবে তাদের স্বামীগণ এই ক্ষেত্রে তাদেরকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে
অধিক ইকদার !” [স্বরা বাক্তৃতাহ : ২২৮]

৩. রাজয়ীর সময় শেষ হয় ইন্দতের সময় শেষ হওয়ার মাধ্যমে। সে তিন হায়ে ইন্দত পালন
করবে। যদি তালাকে রাজয়ীপ্রাণ্তা মহিলা তৃতীয় হায়ে থেকে পবিত্র হয় এবং তার স্বামী তাকে
রাজয়ী বা পুনরায় গ্রহণ না করে, তাহলে ছোটো তালাকে বায়েন হয়ে যাবে। একজন অভিভাবক
এবং দুইজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর মাধ্যমে নৃতনভাবে বিবাহের চুক্তি ব্যক্তিত সে তার স্বামীর জন্য
হালাল হবে না।

৪. তালাকে রাজয়ী প্রাণ্তা মহিলা ফিরে আসবে এবং ঐ তালাকে বায়েন প্রাণ্তা মহিলা ফিরে
আসবে, স্বামী যাকে পুনরায় বিবাহ করেছে। তবে তালাকে বায়েন প্রাণ্ত মহিলা ফিরে আসবে,
তার অবশিষ্ট তালাকের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে।

৫. যখন স্বামীর মালিকনাধীন তিন তালাক পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যাবে
এবং বড়ো তালাকে বায়েন হয়ে যাবে। অন্য কারো সাথে সহীহ বিবাহের মাধ্যমে সহবাস করা
ব্যক্তিত সেই স্ত্রী পূর্বের স্বামীর জন্য হালাল হবে না।



الباب الخامس: في الإيلاء পঞ্চম অনুচ্ছেদ : ইলা (কসম)

১. إيلاء এর পরিচয় এবং তার দলীল:

ক. إيلاء এর শাব্দিক পরিচয়: إيلاء শব্দটিকে কসমের অর্থবোধক ঈলায় শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে। বলা হয় যে আলি ফলন যোগী আলো অর্থাৎ অমুক কসম করেছে বা করে, মুক্তি এর অর্থ হচ্ছে (সে কসম করল)

شرع: أن يحلف زوج بالله أو بصفة من صفاته - وهو قادر على الوطء - على ترك وطء زوجته في قبلها أبداً،
أو أكثر من أربعة أشهر.

পারিভাষিক অর্থ: স্বামী আল্লাহ অথবা তার সিফাতী নামের মাধ্যমে কসম করবে (অথচ সে সহবাসের সামর্থ্য রাখে) এই মর্মে যে, সে কখনো তার স্ত্রীর সাথে লজ্জাস্থানে সহবাস করবে না অথবা চার মাসের অধিক সময় সহবাস করবে না।

খ. إيلاء এর দলীল: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرْبُضُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ قَامُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

“যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে ইলা করে, তাদের জন্য চার মাস অপেক্ষা করার বিধান রয়েছে। যদি তারা কসম থেকে ফিরে আসে, তাহলে তো আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল এবং দয়াময়। আর যদি তারা তালাকের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে, তাহলে তো আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠা, সর্বজ্ঞানী।” [সূরা বাকুরাহ: ২২৬-২২৭]

২. ইলার শর্তসমূহ:

ক. সহবাসে সক্ষম এমন স্বামীর পক্ষ থেকে ১৫শ হতে হবে। সুতরাং এমন রোগের কারণে সহবাসে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ থেকে ইলা শুন্দ হবে না, যার রোগ ভালো হওয়ার আশা করা যায় না। যেমন- পক্ষাধ্যাত বা প্যারালাইসিস অথবা একবারে পুরুষত্বহীন।

খ. আল্লাহ এবং তার গুণবাচক নামের মাধ্যমে কসম করা। তালাক, আজাদ এবং মানতের শব্দের মাধ্যমে নয়।

গ. চার মাসের অধিক সময় সহবাস না করার কসম করা।

ঘ. লজ্জাস্থান বা সামনের রাস্তায় সহবাস না করার কসম খাওয়া। যদি গুহ্যস্থারে সহবাস না করার কসম করে তাহলে সে ইলাকারী হবে না। কেননা তার আবশ্যিক সহবাস ছেড়ে দেওয়া হলো না।

ঙ. স্তৰী সহবাসযোগ্য হওয়া; সহবাসের অযোগ্য স্তৰী যেমন عَيْنِهِ (এমন মহিলা যার লজ্জাস্থান মিলিত হয়ে যাওয়ার কারণে তার সাথে সহবাস করা অসম্ভব) এবং فَرِنَاء (এমন মহিলা যার লজ্জাস্থানে হাঙ্গি, মাংস বা চর্বির মোটা আবরনের কারণে পুরুষাঙ্গ প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়) এমন স্তৰীর থেকে ইলা সঠিক হবে না।

৩. ইলার হৃকুম:

ইসলামে ইলা করা হারাম। কারণ তা হচ্ছে ওয়াজিব কাজকে ছেড়ে দেওয়ার কসম খাওয়া। যখন স্বামী তার স্তৰীর সাথে কখনো সহবাস না করার কসম করে অথবা চার মাসের অধিক সময় সহবাস না করার কসম করে, তখন সে ইলাকারী হয়। যখন স্বামীর মাধ্যমে স্তৰীর সাথে সহবাস হয় এবং চার মাস শেষ হওয়ার পূর্বেই কসমের কাফফারা আদায় করে তখন সে কসম থেকে ফিরে আসে। অর্থাৎ সে তার বর্জন করা কাজে পুনরায় ফিরে আসলো। আল্লাহ তার কৃত অপরাধ ক্ষমা করবেন, আর যদি ইলার মুদ্দত বা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর স্বামী সহবাস করতে অস্বীকার করে আর স্তৰী সহবাস করতে চায়, তাহলে বিচারক দুটি বিষয়ের যে কোনো একটির আদেশ করবেন:

১. কসম থেকে স্বামীকে ফিরে আসা এবং স্তৰীর সাথে সহবাস করা এবং কসমের কাফফারা আদায় করতে বলবেন।

২. যদি কসমের উপর অটল থাকে তবে স্বামীকে তালাক দেওয়ার আদেশ করবেন।

উপরিউক্ত দুটি বিষয় যদি স্বামী প্রত্যাখ্যান করে তাহলে বিচারক স্বামীর পক্ষ থেকে তালাক দিবেন অথবা বিবাহ ভেঙ্গে দিবেন। কারণ ইলাকারীর পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধকতা আসলে বিচারক তখন ইলাকারীর স্থলাভিষিক্ত হবেন। আর তালাকের ক্ষেত্রে স্থলাভিষিক্ত হওয়া যায়। আর যদি

ইলার নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে যায় এমতাবস্থায় যে, স্বামী-স্ত্রীর কেউ সহবাসে অক্ষম, এমন কোনো ওয়র থাকে তাহলে বিচারক স্বামীকে তার যবান দ্বারা ফিরে আসার জন্য আদেশ করবেন। তখন স্বামী বলবে- যখন আমি সক্ষম হবো তখন তোমার সাথে সহবাস করব। কারণ ফিরে আসার ইচ্ছাটাই হলো স্ত্রীকে ক্ষতি করার ইচ্ছাকে বর্জন করা। আর ফকীহগণ এই বিষয়ে কসম ব্যতীত ক্ষতি সাধনের লক্ষ্যে চার মাসের অধিক সময় স্ত্রীর সাথে সহবাস ত্যাগকারীকে ওয়র ছাড়াই ইলাকারী হিসেবেই সাব্যস্ত করেছেন।

৪. ইলার বিধানসমূহ:

১. ইলা সংঘটিত হবে এমন প্রত্যেক স্বামীর পক্ষ থেকে, যার তালাক দেওয়া সঠিক হয়। মুসলমান হোক বা কাফের; স্বাধীন হোক বা গোলাম; রাগান্বিত হোক বা অসুস্থ এবং এমন স্ত্রীর পক্ষ থেকেও ইলা সংঘটিত হবে যার সাথে সহবাস করা হয়নি। আয়াতের অর্থে ব্যাপাকতা থাকার কারণে এমন বিধান।
২. আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এই প্রজ্ঞাময় বিধানের মধ্যে রয়েছে (ইলাকারীর প্রতি সহবাস বা তালাকের আদেশ) স্ত্রীর থেকে জুলুম ও ক্ষতিকে দূরীকরণ এবং জাহেলী যুগে ইলার সময়কে দীর্ঘায়িত করার প্রথাকে বাতিল করণ।
৩. পাগল এবং মাতাল এর পক্ষ থেকে ইলা সংঘটিত হবে না। কারণ তারা যা বলে, তা মনে ধারণ করতে পারে না। তারা স্বচ্ছাধীন নয়।

الباب السادس: في الظهار ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : যিহার

১. যিহারের পরিচয় ও হৃকুম:

ক. যিহারের পরিচয়:

যিহারের আভিধানিক অর্থ: যিহার শব্দটা থেকে নেওয়া হয়েছে, অর্থ পৃষ্ঠদেশ।

شرعًا: أن يُشَبِّهَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فِي الْحَرْمَةِ بِإِحْدَى مَحَارِمِهِ، بِنَسْبٍ، أَوْ رِضَاعٍ أَوْ مَصَاهِرَةً، أَوْ بِبَعْضِهَا، فَيَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ الْإِمْتِنَاعَ عَنِ الْإِسْتِمَاعِ بِزَوْجَتِهِ: أَنْتَ عَلَيْكَ كَظَهَرُ أُمِّي، أَوْ أَخِي أَوْ غَيْرَهُمَا، فَمَتَى فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ.

পরিভাষায়: কোনো ব্যক্তির তার স্ত্রীকে যাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম; বংশীয় কারণে অথবা দুধ পানের কারণে অথবা বৈবাহিক কারণে, তাদের কোনো একজনের সাথে সাদৃশ্য দেওয়া। সে যখন তার স্ত্রীকে উপভোগ করা থেকে বিরত থাকতে চায় তখন বলে: তুমি আমার কাছে আমার মায়ের পিঠের মতো অথবা আমার বোনের অথবা অন্য কারো মতো; এ জাতীয় কথা বলা।

খ. যিহারের হৃকুম: যিহার করা হারাম, আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ يَسَايِهمْ مَا هُنَّ أَمْهَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ وَلَدَنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا
مِنَ الْقَوْلِ وَرُورًا﴾

“তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, তারা জেনে রাখুক তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়। বরং যারা তাদেরকে জন্মদান করে তারাই তাদের মা; তারা কেবল অসঙ্গত ও অসত্য কথাই বলে।” [সূরা মুজাদলাহ : ৬]

আর যিহার জাহিলিয়াতের যুগে তালাক হিসেবে পরিগণিত হতো। অতঃপর ইসলাম জাহিলী যুগের বিধানকে বাদ দিয়ে সেটা এমন শপথের বিধানে নিয়ে আসে, যার কাফফারা রয়েছে। এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্য দয়া ও সহজ করার বিধান।

যিহারকারী ও যার থেকে যিহার করা হয়েছে, তারা একে অপরকে উপভোগ করতে পারবে না; সহবাসের মাধ্যমে এবং অন্য কোনো মাধ্যমে। যেমন কাফফারা আদায়ের পূর্বে চুম্বন এবং লজ্জাস্থান ছাড়া অন্যভাবেও ভোগ করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ يَسَايِهمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَعْمَلَ سَاءً﴾

“আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে এবং পরে তাদের কথা প্রত্যাহার করে নেয়, তবে একে অন্যকে স্পর্শ করার আগে একটি দাস মুক্ত করবে।” [সূরা মুজাদলাহ : ৩]

নাবী ﷺ যিহারকারী সম্পর্কে বলেন: **لَا تَنْهِيْهَا حَتَّىْ تَفْعَلْ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ**

“আল্লাহ তোমাকে যা হকুম করেছেন তা পালনের পূর্বে আর তার নিকটে যেও না।”^{৮৩৩}

২. যিহারের কাফফারা:

যিহারের কাফফারা নিম্নোরপে সাজানো হয়েছে:

ক. ত্রিমুক্ত একজন মুমিন দাসী মুক্ত করা।

খ. যদি দাসী মুক্ত না করতে পারে বা মূল্য তার কাছে না থাকে, তাহলে একাধারে চন্দ্রমাসের হিসাবে দুই মাস সিয়াম পালন করবে। এই দুই মাসের মাঝে কোনো বিরতি থাকতে পারবে না। তবে যদি দুই মাসের মাঝে রয়ায়ানের সিয়াম বা ঈদের দিন (ঈদের দিন রোজা রাখা নিষিদ্ধ) বা আইয়ামুত তাশরীক এসে পড়ে অথবা অসুস্থতা কিংবা সফরের কারণে রোজা ভাঙ্গতে বাধ্য হয়, তবে কোনো সমস্যা নেই।

গ. যদি সিয়াম পালনে সঙ্কম না হয় তাহলে ষাটজন মিসকিনকে খাদ্য খাওয়াবে। প্রত্যেকজনকে এক মুদ করে যব দিবে। অথবা দেশের প্রধান খাদ্য থেকে অর্ধ সা খাদ্য দিবে। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَاءِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرٌ رَّقْبَةٌ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَسَّأَ...﴾

“আর যারা নিজেদের সাথে যিহার করে এবং পরে তাদের কথা প্রত্যাহর করে নেয়, তবে একে অন্যকে স্পর্শ করার আগে একটি দাস মুক্ত করবে।” [সূরা মুজাদালাহ : ৩]

সালমা ইবনে সাখর আল-বায়ায়ীর হাদীস :

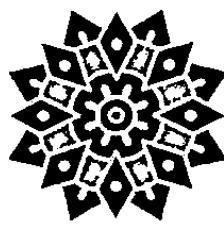
جَعَلَ أَمْرَاهُ عَلَيْهِ كَظَهِيرًا أَمْرَهُ أَمْرَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتِقُ رَقْبَةً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُسْتَأْعِنِينَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالإِطْعَامُ

“সে তার স্ত্রীকে মায়ের পিঠের সাথে যিহার করে। নাবী ﷺ তাকে একটি দাস মুক্তির আদেশ করেন। যদি সে এত সঙ্কম না হয়, তবে একাধারে দুই মাস সিয়াম রাখার আদেশ করেন। এতেও সে সঙ্কম না হলে খাদ্য খাওয়ানোর আদেশ দেন।”^{৮৩৪}

যদি যিহারকারী ব্যক্তি কাফফারা আদায় করার পূর্বে সহবাস করে, তাহলে সে গুনাগার হবে। তার উপর কাফফারা একবারই ওয়াজিব এবং সেটা আদায় না করা পর্যন্ত তার থেকে তা রহিত হবে না এবং যতদিন কাফফারা আদায় না করবে, ততদিন তার উপর হারাম থাকবে।

^{৮৩৩} তিরমিয়ি, হ্য. ১১৯৯ এবং তিনি হাসান বলেছেন; ইবনু মাজাহ, হ্য. ২০৯৫, শাইখ আলবানী হাসান বলেছেন, ইরওয়া ২০৯২।

^{৮৩৪} তিরমিয়ি, হ্য. ১২০০ এবং তিনি হাসান বলেছেন; সুনান আবু দাউদ, হ্য. ২২১৩, ইবনু মাজাহ, হ্য. ২০৯২, শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, ইরওয়া ২০৯১।



الباب السابع: في اللعan সপ্তম অনুচ্ছেদ : লিআন

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المسألة الأولى: تعريف اللعan، ودليل مشروعيته، وحكمته

প্রথম মাসআলা: লিআনের পরিচয় এবং তা শরীয়ত সম্বত হওয়ার দলীল ও হিকমাহ

১. লিআনের পরিচয়:

আভিধানিক অর্থ: এটা এর মাসদার। যা থেকে নেওয়া। অর্থ: তাড়িয়ে দেওয়া, দূরে সরিয়ে রাখা।

شرعًا: شهادات مؤكّدات بالآيمان، مقرّونة باللعan من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، قائمة مقام حد القذف في حق الزوج، ومقام حد الزنى في حق الزوجة.

পরিভাষায়: কসম বিশিষ্ট একাধিক সাক্ষ্য, যা স্বামীর পক্ষ থেকে অভিশাপযুক্ত আকারে আর স্ত্রীর পক্ষ থেকে ক্রোধ আকারে এসে থাকে। যা হবে স্বামীর উপর অপবাদের শাস্তি এবং স্ত্রীর উপর ব্যভিচারের শাস্তি স্বরূপ।

আর এটাকে লعan বা লিআন নামে নামকরণ করার কারণ হলো- স্বামী পক্ষমবার একথা বলে যে, নিশ্চই আমার উপর আল্লাহর অভিশাপ, যদি আমি মিথ্যাবাদী হই। তাদের দুজনের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী হবে। অতঃপর অভিশঙ্গ হবে।

২. লিআন শরীয়ত সম্বত হওয়ার দলীল: লিআন শরীয়ত সম্বত হওয়ার উপর আল্লাহ তা'আলার এই বাণী প্রমাণ করে। তা হলো-

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءٌ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُمْ أَحَدُهُمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِإِلَهِهِ إِنَّهُ لَيْنَ أَصْلَدِقَيْنَ ﴾ ٦

“আর যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোনো সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য হবে এই যে, সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী।” [সূরা নূর : ৬] [বিস্তারিত সূরা নূর ৬ থেকে ১০ আয়াত।]

সাহল ইবনু সাদ رض এর হাদীস।

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيْقُنْتُهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعُلُ؟ فَأَنَّزَ اللَّهُ فِي شَأْنِهِ مَا ذَكَرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُتَلَاقِعَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَذَقَّهُ اللَّهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ» قَالَ: فَتَلَاعَنَاهُ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ،

وَفِي رَوَايَةٍ: فَتَلَاعَنَاهُ وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি রসূলপ্রাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কী বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ অবস্থায় অন্য কোনো লোককে দেখতে পায়, তবে কি সে তাকে হত্যা করবে? অথবা কী করবে? এরপর আল্লাহ তা'আলা তার ব্যাপারে কুরআনে উল্লিখিত লিআনের বিধান অবতীর্ণ করেন। তখন নাবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আল্লাহ তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে ফয়সালা দিয়েছেন। রাবী বলেন, তারা উভয়ে মসজিদে লিআন করল আর আমি উপস্থিত ছিলাম।”

অন্য বর্ণনায় রয়েছে: তারা উভয়ে লিআন করল আর আমি মানুষের সাথে আল্লাহর রসূল رض এর কাছেই ছিলাম।”^{৮৩৫}

৩. লিআনকে শরীয়ত সম্মত করার হিকমাহ:

লিআনকে স্বামীর জন্য শরীয়ত সম্মত করার হিকমাহ: স্ত্রীর জিনার কারণে যেন তাকে লজ্জিত না হতে হয়, তার বিছানাকে কেউ নষ্ট না করে এবং অন্যের সন্তানকে যেন তার দিকে সম্পৃক্ত না করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সে তার স্ত্রীর উপর প্রমাণ স্থাপন করতে পারে না এবং তার অপরাধ শীকার করে না। কেননা তার উপর তার কথা গ্রহণযোগ্য হয় না। কারণ দুজনের মাঝে শক্তিশালী শপথ ছাড়া আর কিছু প্রমাণ অবশিষ্ট থাকে না। সমস্যা সমাধান ও সংকীর্ণতা দূর করা এবং তার থেকে অপবাদের শাস্তি দূর করার জন্যই লিআনের বৈধতা। যখন সে নিজে ব্যক্তিত তার কোনো সাক্ষী থাকবে না এবং মহিলা তার শপথের বিপরীতে তার মতকেই পুনরাবৃত্তি করবে। তখন মহিলা থেকে শাস্তি রহিত হয়ে যাবে। অন্যথায় তার উপর শাস্তি আবশ্যিক হবে।

যদি স্বামী শপথ করা থেকে সরে আসে, তাহলে তার উপর অপবাদের শাস্তি বাস্তবায়ন হবে। যদি স্ত্রী তার স্বামীর শপথের পর শপথ থেকে সরে আসে, তাহলে তার স্বামীর শপথ ও তার শপথ থেকে সরে আসা, এ দুটি স্ত্রীর বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রমাণ হিসেবে সাব্যস্ত হবে। যা থেকে আর ফিরে আসা যাবে না এবং তার উপর তখন ব্যভিচারের শাস্তি বাস্তবায়ন করা হবে।

^{৮৩৫} মুসলাকুন আলাইহি : সহীহল বুখারী, খা. ৫৩০৮, মুসলিম ১৪৯২।

المسألة الثانية: شروطه وكيفيته

দ্বিতীয় মাসআলা: লিআনের শর্ত ও পদ্ধতি

১. লিআনের শর্ত সমূহ:

ক. স্বামী-স্ত্রীর উভয়েই মুকাল্লাফ হওয়া (প্রাপ্ত বয়স্ক, জ্ঞানবান হওয়া)। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾

“আর যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে ।” [সূরা নূর : ৬]

খ. স্বামী তার স্ত্রীকে একথা বলে অপবাদ দেওয়া যে, হে ব্যভিচারিনী, অথবা আমি দেখেছি তুমি ব্যভিচার করছো, অথবা তুমি ব্যভিচার করেছো ।

গ. স্ত্রী তার স্বামীর অপবাদকে মিথ্যারোপ করবে এবং তার উপর অটল থাকবে লিআন শেষ হওয়া পর্যন্ত ।

ঘ. বিচারকের বিচারের মাধ্যমে লিআন বাস্তবায়িত হবে ।

২. লিআনের পদ্ধতি ও ধরন:

লিআনের পদ্ধতি: স্বামী বিচারকের নিকট একদল মানুষের উপস্থিতিতে চারবার বলবে: আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিয়ে বলছি যে, আমি আমার অমুক স্ত্রীর উপর যে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করেছি (স্ত্রী উপস্থিত থাকলে ইশারা করবে, অনুপস্থিত থাকলে নাম উল্লেখ করবে যাতে চিনা যায়) এবং এই ব্যাপারে আমি সত্যবাদী । অতঃপর পঞ্চমবার বাড়িয়ে বলবে: আমি যদি মিথ্যবাদী হই তাহলে আমার উপর আল্লাহর অভিশাপ । অতঃপর স্ত্রী চারবার বলবে, আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিয়ে বলছি যে, আমার স্বামী আমার উপর যে অপবাদ দিয়েছে এ ব্যাপারে সে মিথ্যবাদী । পঞ্চমবার বাড়িয়ে বলবে, যদি সে সত্যবাদী হয় তাহলে আমার উপর আল্লাহর গ্যব । আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءٌ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِإِنَّمَا لَهُنَّ أَصْلَادِيقٌ ۖ ۷ وَالْخَمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۸ وَيَدْرُو أَعْنَهَا الْعَذَابُ أَنْ تَشَهَّدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِإِنَّمَا لَهُنَّ أَصْلَادِيقٌ ۙ ۹ وَالْخَمِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الْأَصْلَادِيقِ ۚ ۱۰﴾

“যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোনো সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহর নামে চার বার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী । আর পঞ্চম বারে বলবে যে, সে যদি মিথ্যবাদী হয় তাহলে তার উপর

নেমে আসবে আল্লাহর লাভনত । আর স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে চার বার আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যবাদী । আর পঞ্চমবারে বলবে যে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর নেমে আসবে আল্লাহর গবেষণা ।” [সূরা নূর : ৬-৯]

الْمَسْأَلَةُ التَّالِيَّةُ: حُكْمُ الْمُتَرْتَبَةِ عَلَى اللِّعَانِ

তৃতীয় মাসআলা: লিআনের সাথে সম্পৃক্ত হকুমসমূহ

যদি লিআন সম্পন্ন হয় তাহলে নিম্নের বিষয়গুলো প্রযোজ্য হবে:

১. স্বামীর উপর থেকে অপবাদের শাস্তি রহিত হয়ে যাবে ।
২. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ সাব্যস্ত হবে এবং একে অপরের জন্য চিরস্থায়ী হারাম হিসেবে গণ্য হবে । যদিও তাদের বিচারক পৃথক না করে ।
৩. স্বামীর থেকে সন্তানের বৎশের সম্পর্ক বাদ দেওয়া হবে আর স্বামী লিআনের সময় স্পষ্টভাবে সন্তানকে অস্বীকার করবে এই বলে যে,

أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميها به من الزنى، وما هذا بولدي

“আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিয়ে বলছি, আমি সত্যবাদী । আমি তাকে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করেছি এবং এটা আমার সন্তান না ।”

ইবনু উমার  এর হাদীস ।

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْنِي بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِيهِ، فَفَرَقَ بَيْنَهُمَا، وَلَحْقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ

“নিশ্চয়ই নাবী  এক লোক ও তার স্ত্রীর মাঝে লিআন করালেন । তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন এবং সন্তান মহিলাকে দিয়ে দিলেন ।”^{৮০৬}

৪. যদি স্ত্রী লিআন না করে তাহলে তার উপর ব্যভিচারের শাস্তি ওয়াজিব হবে । কারণ তার স্বামীর শপথ সত্ত্বেও শপথ থেকে তার সরে আসাটা একটি শক্তিশালী প্রমাণ । যেটা তার উপর ব্যভিচারের শাস্তি আবশ্যিক করে ।

^{৮০৬} মুফাফিল আলাইহি: সহীহল বুখারী, হ. ৫৩১৫; সহীহ মুসলিম, হ. ফুআ. ১৪৯৪ ।



الباب الثامن : في العدة والإحداد অষ্টম অনুচ্ছেদ : ইদত এবং শোক পালন

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: تَعْرِيفُ الْعَدَةِ وَدَلِيلُ مِشْرُوعِيهَا، وَالْحُكْمُ مِنْهَا
প্রথম মাসআলা: ইদত এর পরিচয়, তা শরীয়ত সম্বত হওয়ার
দলীল এবং তার তাৎপর্য

১. ইদতের পরিচয়:

ইদতের শাব্দিক অর্থ: এটি | عَدَّ، يَعْدُ، عَدْ | এম মস্ত এর পরিচয় নেওয়া হয়েছে গণনা করা এবং নির্ণয় করা থেকে। কারণ এই শব্দটি কিছু সময় এবং কয়েকটি মাসকে অন্তর্ভুক্ত করে।
এর পারিভাষিক অর্থ: ইদত হলো একটি নির্দিষ্ট সময় যে সময় মহিলা আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে অথবা স্বামী হারানোর শোক প্রকাশার্থে অথবা জড়ায় মুক্ত করার উদ্দেশ্যে অপেক্ষা করে।

ইদত হলো, তালাক অথবা মৃত্যুর পশ্চাত্গামী বা পরবর্তী পালনীয় বিষয়।

২. ইদত শরীয়ত সম্বত হওয়ার দলীল:

ইদত পালন করা ওয়াজিব। তা শরীয়ত সম্বত হওয়ার ব্যাপারে মূল হলো কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা।
কুরআনের দলীল: আল্লাহ সুবানাহ ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿وَالْمُظْلَقَاتُ يَتَرَبَّضُنَ بِأَنفُسِهِنَ تَلَاثَةُ قُرُونٍ﴾

“তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ তিন মাসিকস্তুব সময় প্রতীক্ষায় থাকবে।” [সূরা বাকুরাহ : ২২৮]

মহামহিয়ান আল্লাহ আরও বলেন:

﴿وَاللَّায়ি بَيْسِنَ مِنَ الْمُجِিসِ مِنْ نِسَابِكُمْ إِنْ ارْتَبَثْ فَعِدَّتْهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّায়ি لَمْ يَحْضُنْ وَأَوْلَاثُ الْأَخْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضْعُنَ حَمْلَهُنَّ﴾

“তোমাদের যেসব স্তীদের ঝুতুমতী হওয়ার আর আশা নেই, তাদের ইদত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে, তাদের ইদতকাল হবে তিন মাস। এবং যারা এখনো ঝুতুর বয়সে উপনীত হয়নি তাদেরও; আর গর্ভবতী নারীদের ইদতের সময় সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত।” [সূরা তালাক : ৪]

মহামহিয়ান আল্লাহ আরও বলেন:

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَقَّونَ مِنْكُمْ وَيَنْدِرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّضُنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرًا﴾

“তোমাদের মধ্যে যারা স্তী রেখে মারা যায়, তাদের স্তীগণ চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে।”

[সূরা বাকুরাহ : ২৩৪]

সুন্নাহ থেকে দলীল: মাসকুর ইবনে মাখরমা^{সাল্লাল্লাহু আল্লাহু আব্দুল্লাহু} থেকে বর্ণিত।

أَنَّ سُبْبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تُفَسِّرُ بَعْدَ وَفَاءِ زَوْجِهَا بِلِيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْسَادَتْهُ أَنْ تُنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهُ فَنَكَحَ

“সুবায়আহ আল-আসলামীয়া তার স্বামীর মৃত্যুর কয়েকদিন পর সন্তান প্রসব করে। এরপর তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বিয়ে করার অনুমতি প্রার্থনা করেন, তিনি তাকে অনুমতি দেন। তখন সে বিয়ে করে।”^{৮৩৭}

تُفَسِّرُ: অর্থ: জন্ম দিয়েছে

৩. ইদত শরীয়ত সম্মত হওয়ার তাৎপর্য: মহিলার জড়ায়ুকে গর্ভধারণ থেকে পরিষ্কার করা, যাতে করে বৎশ নিয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরি না হয়। এছাড়াও তালাকদাতা স্বামীকে সুযোগ দেওয়া, যখন সে লজ্জিত হবে তখন যেন সে নিজেকে নিয়ে বোৰাপড়া করতে পারে। সেটা হবে রজস্ট তালাকের ক্ষেত্রে। সেই সাথে আরেকটা সুবিধা হলো, গর্ভধারণের অধিকার যেন সুরক্ষিত থাকে। তখন বিচ্ছেদটা নির্ভর করবে গর্ভধারণের উপর।

المسألة الثانية: أنواع العدة المحتوى الماسأة: ইদতের প্রকার

স্ত্রীলোকের ইদতকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়।

১. মৃত্যুর ইদত; ২. বিবাহ বিচ্ছেদের ইদত।

প্রথম: মৃত্যুর ইদত: স্বামী মারা যাওয়ার কারণে মহিলার উপর যে ইদত ওয়াজিব হয়। এক্ষেত্রে অবস্থা দুই রকম হতে পারে।

-মহিলাটি হয়তো গর্ভবতী হবে -অথবা গর্ভবতী হবে না।

আর মহিলাটি যদি গর্ভবতী হয়। তাহলে তার ইদত শেষ হবে গর্ভের বাচ্চা প্রসবের মাধ্যমে। স্বামী মারা যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই যদি বাচ্চা প্রসব হয়, তবুও তার ইদত শেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَأُولَئِكَ الْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضْعَفُنَ حَمَلُهُنَ﴾

“আর গর্ভবতী নারীদের ইদতের সময় সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত।” [সূরা তালাক : ৪]

এবং মাসরুর ইবনে মাখরমা رضي الله عنه এর হাদীসের কারণে।

أَنَّ سُبُّعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ رضي الله عنها نُفِسِتَ بَعْدَ وَفَاءِ رَوْجَهَا بِلِيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْأَذَنَهُ أَنْ تُنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ

“সুবায়আহ আল-আসলামীয়া তার স্বামীর মৃত্যুর কয়েকদিন পর সন্তান প্রসব করে। এরপর তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বিয়ে করার অনুমতি প্রার্থনা করেন, তিনি তাকে অনুমতি দেন। তখন সে বিয়ে করে।”^{৮৩৮}

আর মহিলাটি যদি গর্ভধারিনী না হয়, তাহলে তার ইদত হলো চার মাস দশ দিন। এই দিন গণনা শুরু হবে মুতলাকু বা সাধারণভাবে তথা শততীনভাবে। স্বামী তার সাথে মিলন করুক অথবা না করুক। আল্লাহ তা'আলার বাণীর ব্যাপকতার ভিত্তিতে:

﴿هُوَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُوْنَ أَرْوَاحًا يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلُهُنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا قَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ يُعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ﴾

“তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে। যখন তারা ইদত (চার মাস দশ দিন) পূর্ণ করবে, তখন তারা নিজেদের জন্য কোনো কল্যাণকর

কাজ করলে, তাতে তোমাদের কোনো পাপ হবে না। তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে
সম্মত অবগত।” [সুরা বাকুরাহ : ২৩৪]

এই আয়াতকে নির্দিষ্ট করবে এমন কোনো দলীলও বর্ণিত হয়নি।

দ্বিতীয়: বিবাহ বিচ্ছেদের কারণে ইদত:

তা হলো এই ইদত যা ফিসখ (নষ্ট হয়ে যাওয়া) বা তালাক বা খোলা তালাকের মাধ্যমে স্বামীর
থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া অপরিহার্য করে।

এক্ষেত্রে তিনি রকম অবস্থা হতে পারে।

- ▶ মহিলাটি গর্ভবতী হবে;
- ▶ মহিলাটি গর্ভবতী হবে না;
- ▶ ছেটো হওয়ার কারণে হায়েয দেখেনি অথবা বার্ধক্যের কারণে স্বায়ীভাবে মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে।
অতএব যদি গর্ভধারিনী হয়, তাহলে তার ইদত শেষ হবে বাচ্চা প্রসবের মাধ্যমে;
কুরআনের আয়াতের ব্যাপকতার কারণে।

﴿وَأُولَاتُ الْأَخْمَالِ أَجْلَهُنَّ أَنْ يَضْعَنَ حَمْلَهُنَّ﴾

“আর গর্ভবতী নারীদের ইদতের সময় সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত।” [সুরা তালাক : ৪]

আর যদি মহিলাটি গর্ভধারিনী না হয় এমতবস্তায় সে হায়েয (ঝাতশ্বাব) হবে তাহলে এই মহিলার
ইদত হলো, বিচ্ছেদের পর তিনি তুহুর অতিবাহিত করা। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَالْمُظْلَقَاتُ يَتَرَبَّضُنَ إِنْفَسِهِنَ تَلَائِهَ قُرُونٌ وَلَا يَحْلُ لَهُنَّ أَنْ يَكْثُرُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْجَاهِمِهِنَ إِنْ كُنُّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالنَّوْمُ الْآخِرِ﴾

“তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ তিনি মাসিকশ্বাব সময় প্রতীক্ষায় থাকবে (বিবাহ থেকে বিরত থাকবে।
তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হলে তাদের গর্ভশয়ে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন
করা তাদের জন্য বৈধ নয়।” [সুরা বাকুরাহ : ২২৮]

আর যদি মহিলাটি এমন হয় যে, ছেটো হওয়ার কারণে মাসিক দেখেনি। অথবা বার্ধক্যের
কারণে স্বায়ীভাবে মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে। তাহলে তার উদ্দত শেষ হবে স্বামীর বিচ্ছেদের পর
তিনি মাস অতিবাহিত হওয়ার মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَاللَّابِيَ يَوْسِنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَاءِكُمْ إِنْ ارْتَبَّتْمُ فَعِدَّتُهُنَّ تَلَائِهَ أَشْهُرٌ وَاللَّابِي لَمْ يَحْضُنَ﴾

“তোমাদের যেসব স্ত্রীদের ঝাতুমতী হওয়ার আর আশা নেই, তাদের ইদত সম্পর্কে তোমরা
সন্দেহ করলে, তাদের ইদতকাল হবে তিনি মাস। এবং যারা এখনো ঝাতুর বয়সে উপনীত হয়নি
তাদেরও।” [সুরা তালাক : ৪]

সহবাসের পূর্বে তালাকপ্রাপ্ত নারীর বিধান:

স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে মিলন করার পূর্বে বিবাহ বন্ধন বাতিলের মাধ্যমে বা তালাকের মাধ্যমে স্ত্রী থেকে আলাদা হয়ে যায়, তাহলে ঐ স্ত্রীর জন্য কোনো ইদত নেই। কারণ আল্লাহ বলেছেন:

﴿فِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ ظَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَذَابٍ تَعْذِيدُونَهَا فَمَعَتُّهُنَّ وَسَرِحُوهُنَّ سَرَا حَا جَمِيلًا﴾

“হে মুমিনগণ! তোমরা মুমিনা নারীদেরকে বিবাহ করার পর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও, তবে তোমাদের জন্য তাদের কোনো ইদত নেই। সুতরাং তোমরা তদেরকে কিছু সামগ্রী প্রদান করো এবং সৌজন্যের সাথে ওদেরকে বিদায় করো।” [সূরা আহ্�মাব : ৪৯]

আহলুল ইলম এর ঐকমত্যের মাধ্যমে এই হ্রস্বমের ক্ষেত্রে মুমিন স্ত্রী এবং কিতাবী স্ত্রীদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। সবাই এক। তবে কুরআনে শুধু মুমিনা স্ত্রীদের কথা বলা হয়েছে আধিক্যের ভিত্তিতে।

الْمُسَأَلَةُ التَّالِثَةُ: التَّزَامَاتُ الْعَدَةِ، وَمَا يَتَرَبَّ عَلَيْهَا

তৃতীয় মাসআলা: ইদতের সাথে সংশ্লিষ্ট আবশ্যিকীয় বিষয়াবলী এবং ইদত পরবর্তী ফলাফল

১. তালাকের ইদত:

মহিলা যখন তালাকের ইদত গণনা করবে তখন তার দুই অবস্থা:

- যে রাজস্ত তালাক প্রাপ্ত;
- বা বাস্তিন তালাক প্রাপ্ত।

প্রথমত: রাজস্ত তালাক প্রাপ্ত মহিলার জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো ধার্য করা হবে:

- অবশ্যই তার জন্য স্বামীর সাথে বসবাসের ব্যবস্থা করতে হবে; যদি সেখানে কোনো শারপ্ত প্রতিবন্ধকতা না থাকে।
- অবশ্যই তার জন্য খাবার, পোশাক এবং অন্যান্য ভরণ-পোষনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- আবশ্যই তাকে সেই বাড়িতে বসবাস করতে হবে। প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে যাবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ رُجُلِكُمْ﴾

“তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যে স্থানে বাস করো, তাদেরকেও সে স্থানে বাস করতে দাও।” [সূরা তালাক : ৬]

আরও বলেছেন:

﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاجِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾

“তোমরা তাদেরকে তাদের বাসগৃহ হতে বের করো না এবং তারা নিজেরাও যেন বের না হয়; যদি না তারা স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিঙ্গ হয়।” [সূরা তালাক : ১]

৪. কোনো পুরুষের বিবাহ প্রস্তাব গ্রহণ করা তার জন্য হারাম। কারণ সে এখনো স্বামীর বিবাহে আছে এবং স্ত্রীর হৃকুমে আছে। কেনন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَبَعْلَوْتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَّهُنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾

“যদি তারা সংশোধন চায় তবে তাদের স্বামীগণ এই ক্ষেত্রে তাদেরকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে অধিক হকদার।” [সূরা বাকুরাহ : ২২৮]

দ্বিতীয়ত: বাইন তালাকের ইন্দ্রত পালনকারিণী মহিলা:

-হয়তো সে গর্ভবতী হবে।

-অথবা গর্ভবতী হবে না।

প্রথম: যদি গর্ভবতী হয় তাহলে নিম্নবর্তী বিষয়গুলো আবশ্যিক হবে:

১. অবশ্যই স্বামীর পক্ষ হতে তাকে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿إِنَّمَا أَنْهَا اللَّهُ أَيْذًا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ قَطْلِقْوْهُنَّ لِيَعْدِتُهُنَّ وَأَخْضُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاجِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾

“হে নাবী! (তোমার উপ্পত্তকে বল) তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে ইচ্ছা করো তখন তাদেরকে ইন্দ্রতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দিও, ইন্দ্রতের হিসাব রেখো এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা তাদের বাসগৃহ হতে বের করো না এবং তারা নিজেরাও যেন বের না হয়; যদি না তারা স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিঙ্গ হয়।” [সূরা তালাক : ১]

২. ভরণপোষণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾

“তারা গর্ভবতী থাকলে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাদের জন্য খরচ করো।” [সূরা তালাক : ৬]

৩. যে বাড়িতে ইন্দ্রত পালন করছে সে বাড়িতেই তাকে থাকতে হবে। কোনো প্রয়োজন ব্যতীত সেই বাড়ি থেকে বের হতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿لَا تُخْرِجُهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾

“তোমরা তাদেরকে তাদের বাসগৃহ হতে বের করো না এবং তারা নিজেরাও যেন বের না হয়।”

[সূরা তালাক : ১]

আর প্রয়োজনে বের হওয়ার দলীল জাবির শাস্তি এর হাদীস।

طَلَقْتُ حَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجْدِي تَخْلِهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: بَلَّ
اخْرُجِي، فَجُدِّي تَخْلِكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصْدِقِي، أَوْ تَفْعِلِي مَعْرُوفًا

“আমার খালা তালাকপ্রাপ্ত হন। এরপর তিনি তাঁর (খেজুর বাগানের) খেজুর পাড়ার ইচ্ছা করলেন। জনৈক ব্যক্তি তাকে বাইরে যেতে বাঁধা দিলেন। তখন তিনি নাবী ﷺ এর কাছে এলেন। নাবী ﷺ বললেন: হ্যাঁ, তুমি তোমার বাগানের খেজুর পাড়ার জন্য বাইরে যেতে পারো। কারণ স্তবত তা থেকে অন্যদের সাদকা করবে অথবা অন্য কোনো ভালো কাজ করবে।”^{৮৩}

দ্বিতীয়: মহিলা যদি গর্ভধারিণী না হয়: তাহলে সে গর্ভবতী মহিলার মতো সবই পাবে। শুধু ভরণপোষণ জাতীয় জিনিস ছাড়া; যেমন কাপড়। এর দলীল ফাতিমা বিনতে কায়েস শাস্তি এর হাদীস; তাকে যখন তার স্বামী অবশিষ্ট একটি তালাক দিয়ে দিলো, তখন নাবী ﷺ বললেন:

لَا نَفْقَهَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلَةً

“সে গর্ভবতী না হলে, তার জন্য কোনো খোরপোষ নেই।”^{৮৪}

খ. স্বামী মারা যাওয়ার ইদ্দত পালন:

মৃত স্বামীর ইদ্দত পালনকালে যে বিষয়গুলো মহিলার জন্য আবশ্যিক হবে, সেগুলো হলো:

১. তার উপস্থিতিতে স্বামী যেই বাড়িতে মারা গেছে সেই বাড়িতেই তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে। সেটা ভাড়া বাড়ি হোক অথবা ঝন হিসেবে অন্যের থেকে পাওয়া বাড়ি হোক। দলীল

امْكُثْيَ فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَلْعَنَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

“ইদ্দত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার পূর্ব গৃহেই অবস্থান করবে।”^{৮৫}

امْكُثْيَ فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ تَعْبُيُ زَوْجِكِ....

^{৮৩} সহীহ মুসলিম, হ্য. ৩৬১৩, ফুআ. ১৪৮৩।

^{৮৪} সুনান আবু দাউদ, হ্য. ২২৮৬; নাসাই ৬/২১০; অর্থগতভাবে সহীহ মুসলিম, হ্য. ৩৫৮৯, ফুআ. ১৪৮০; শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহ সুনানুল নাসাই, হ্য. ৩৩২৪।

^{৮৫} তিরিমিথী, হ্য. ১২২৪ এবং তিনি সহীহ বলেছেন; ইবনু মাজাহ, হ্য. ২০৩১; শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহ ইবনে মাজাহ, হ্য. ১৬৫।

“ତୋମାର ସ୍ଵାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ସଂବାଦ ଯେଖାନେ ପେଯେଛୁ, ଇନ୍ଦତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଁଯା ତୁମି ଐ ଘରେଇ ଅବସ୍ଥାନ କରୋ ।”

କୋନୋ ଓଜର ବ୍ୟତୀତ ସେଇ ବାଡ଼ି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରତେ ପାରବେ ନା । ଯେମନ ସେଖାନେ ତାର ଜୀବନେର ସୁକି ଆଛେ ଅଥବା ତାକେ ବାଧ୍ୟ କରା ହେଁଯେଛେ ବା ଏ ଜାତୀୟ ଅନ୍ୟ କୋନୋ ସମସ୍ୟାର କାରଣେ ସେ ତାର ମନ ମତୋ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରତେ ପାରେ ।

୨. ଯେ ବାଡ଼ିତେ ସେ ଇନ୍ଦତ ପାଲନ କରବେ ସେଇ ବାଡ଼ିତେଇ ତାକେ ଥାକତେ ହବେ । ପ୍ରୋଜନ ଛାଡ଼ା ସେଖାନ ଥେକେ ବେର ହତେ ପାରବେ ନା । ସମ୍ଭାବନା ଥାକେ । ସୁତରାଂ ଅଧିକ ପ୍ରୋଜନ ବ୍ୟତୀତ ରାତେ ବେର ହବେ ନା । କେନନା ଦିନଇ ପ୍ରୋଜନ ପୂରଣେର ସମୟ ।

୩. ତାକେ ଇନ୍ଦତ ପାଲନକାଳେ ସାଜସଙ୍ଗ୍ଜା ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧୀ ତ୍ୟାଗ କରତେ ହବେ ଅର୍ଥାଂ ସ୍ଵାମୀର ଜନ୍ୟ ଶୋକ ପାଲନ କରତେ ହବେ । ଶୋକ ପାଲନେର ଲୁକୁମ ଆହକାମେର ବିଷ୍ଟାରିତ ଆଲୋଚନା ସାମନେ ଆସଛେ ।

୪. ତାର ଜନ୍ୟ କୋନୋ ଭରଣପୋଷଣ ନେଇ । କେନନା ସ୍ଵାମୀର ମୃତ୍ୟୁର ମାଧ୍ୟମେ ତାର ବୈବାହିକ ଜୀବନେର ଇତି ଘଟେଛେ ।

المسألة الرابعة: في الإحداد صُلْطَنَةِ مَسَاعِيَ الْمَوْلَى: شَوْكُ الْمَالَةِ

إحداد! ଏର ପରିଚୟ ଏବଂ ତା ଶରୀଯତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହେଁଯାର ଦଲୀଲ:

୧. إحداد! ଏର ପରିଚୟ:

إحداد! ଏର ଶାବ୍ଦିକ ଅର୍ଥ ବିରତ ଥାକା । କୋନୋ ମହିଳା ଯଥନ ସାଜସଙ୍ଗ୍ଜା ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧୀ ଛେଡ଼େ ଦେଇ ତଥନ ସେଇ ମହିଳାକେ ଆରବୀ ଭାଷା ମୁହଁରୁ, مُحِبٌّ ବଲା ହେଁଯେ ଥାକେ ।

ପରିଭାବାୟ: ବଲା ହେଁଯ, କୋନୋ ମହିଳାର ସାଜ ସଙ୍ଗ୍ଜା, ସୁଗନ୍ଧୀ ଛେଡ଼େ ଦେଓଯା । ମହିଳାର ପ୍ରତି ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ମିଳନେର ଚାହିଦା ତୈରି କରେ, ଏମନ ବିଷୟକେ ତ୍ୟାଗ କରା ।

୨. إحداد! ଶରୀଯତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହେଁଯାର ଦଲୀଲ:

إحداد! ଯେ ମହିଳାର ସ୍ଵାମୀ ମାରା ଯାଏ ତାର ଉପର ଶୋକ ପାଲନ ଓ ଯାଜିବ । ଉମ୍ରେ ହାବିବା ଏବଂ ହାଦୀସ ।

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَزْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোনো নারীর জন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি শোক পালন করা বৈধ হবে না। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।”^{৮৪২}

এবং উক্ষে আতীয়া আনছারী শোক এর বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন,

كَيْفَيْتُ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرًا، وَلَا تَكْتَحِلَ وَلَا تَتَطَبِّبَ وَلَا تَلْبِسَ
تَوْبَامَصْبُوغًا، إِلَّا قُوبَ عَصْبُ...

“কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি শোক পালন করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হতো। তবে স্বামী মারা গেলে চার মাস দশ দিন শোক পালন করতে হবে এবং আমরা যেন সুরমা, সুগন্ধি ব্যবহার না করি, রঙিন কাপড় না পরি; তবে হালকা রঙের হলে পরা যাবে।”^{৮৪৩}

শোক পালনকারী মহিলার ক্ষেত্রে অপরিহার্য হলো-

১. সে সুগন্ধি ব্যবহার ও সাজ-সজ্জা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। তাই সে উজ্জ্বল রংয়ের কাপড় পরবে না, সুরমা ব্যবহার করবে না, স্বর্ণ ঝুঁপা বা অন্য কিছুর অলংকার ব্যবহার করবে না। সে কোনো ধরনের রং ও ব্যবহার করবে না। উক্ষে সালামা শোক থেকে মারফু হাদীস।

الْمُرْتَقِي عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبِسُ الْمَعْصِفَ مِنَ النِّيَابِ، وَلَا الْمُمْسَقَةَ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ

“কোনো মহিলার স্বামী মারা গেলে সে রঙিন পোশাক, কারুকাজ করা জামা ও অলংকার পরবে না। মেহেদী লাগাবে না ও সুরমা ব্যবহার করবে না।”^{৮৪৪}

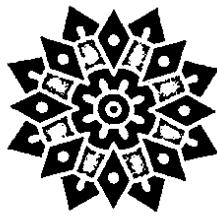
এবং উক্ষে আতীয়া শোক এর পূর্ববর্তী হাদীস। যা অতিবাহিত হয়েছে।

২. যে বাড়িতে সে ইদত পালন করবে সে বাড়িতেই থাকবে। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বের হবে না। যেমন- ফুরাইয়া বিনতে মালেক শোক এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

^{৮৪২} মুগাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৫৩০৪; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৪৮৬।

^{৮৪৩} মুগাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৫৩৪১; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৩৮।

^{৮৪৪} সুনান আবু দাউদ, হা. ২৩০৪; নাসাই, হা. ৩৫৩৫; শাহিদ আলবানী সহীহ বলেছেন, ইরওয়া, নং ২১২৯।



الباب التاسع: في الرضاع নবম অনুচ্ছেদ: দুধ পান করানো

এই অনুচ্ছেদে কিছু মাসআলা রয়েছে:

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: تعرِيفُ الرضاعِ، وَدَلِيلُ مَشْرُوعِيَّتِهِ، وَحُكْمِهِ

প্রথম মাসআলা: স্তন্যপানের পরিচয়, শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল এবং বিধান

১. رضاع বা رিয়া'- এর পরিচয়:

رضاع -এর শাব্দিক অর্থ : رضاع شব্দের রহফে যবর দিয়ে, যের দিয়ে পড়াও বৈধ রয়েছে।
অর্থ স্তন থেকে দুধ চোষা বা পান করা।

شرعًا: هو من طفل دون الحولين لبيان ثاب عن حمل، أو شربه أو نحوه.

পরিভাষিক অর্থ: سُسْطَانَةَ بَيْنَ جَنْبَيْنِهِ جَنْبَيْنَهُ كরা ۲ বছরের কম শিশুর দুধ চোষা অথবা পান করা অথবা অনুরূপ।

২. স্তন্যপান শরীয়ত সম্মত হওয়ার প্রমাণ:

স্তন্যপান শরীয়ত সম্মত। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَإِنْ تَعَاسِرُوا فَسَتْرُضْعُ لَهُ أُخْرَى﴾

“তোমরা যদি নিজ নিজ দাবিতে অনমনীয় হও তাহলে অন্য নারী তাকে দুধপান করাবে।”

মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾

“আর যদি তোমরা তোমাদের সত্তানদের কোনো ধাত্রীর দুধপান করাতে চাও, তাতেও তোমাদের কোনো দোষ নেই।” [সূরা বাকুরাহ : ২৩৩]

৩. স্তন্যপান-এর হকুম: বিবাহ হারাম হওয়া, মাহরাম সাব্যস্ত হওয়া, নির্জনে সাক্ষাতের বৈধতা ও তাকানোর ক্ষেত্রে বংশীয় সম্পর্কের যে হকুম, রضاع এর ক্ষেত্রে একই হকুম। সুতরাং এটি আত্মায়তা আবশ্যিক করে এবং বিবাহ হারাম সাব্যস্ত করে।

রضاع এর কারণে হারাম সাব্যস্ত হওয়ার দলীল হলো কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা।

কুরআনের দলীল: মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَأَمْهَاتُكُمُ الَّا قِيَ أَرْضَعْتُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾

“তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তোমাদের সেই মা যারা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছেন এবং তোমাদের দুধ বোন।” [সূরা নিসা : ২৩]

এই আয়াত নারীদের মধ্য থেকে বিবাহ নিষিদ্ধ সম্পর্কে।

সুন্নাহ থেকে দলীল: আয়িশাহ رض এর হাদীস। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحْرِمُ مَا تُحْرِمُ الْوِلَادَةُ

“জন্মসূত্রে যা হারাম, দুধপান সূত্রও তাকে হারাম করে।”^{৮৪৫}

ইবনু আবুস জাহান্সুর এর হাদীস। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাহ হামযাহ رض এর মেয়ের ব্যাপারে বলেন:

إِنَّمَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّمَا ابْنَةُ أُخْيٍ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرِمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرِمُ مِنَ الرَّحِمِ

“সে আমার জন্য (বিবাহের জন্য) বৈধ নয়। কেননা সে আমার দুধ সম্পর্কের ভাইয়ের মেয়ে। দুধ সম্পর্কের কারণে তাদের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ, রক্ত সম্পর্কের কারণেও যাদের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ।”^{৮৪৬}

ইজমা থেকে দলীল: দুধপান করার মাধ্যমে বিবাহ হারাম সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়ে উল্লেখের আলেমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

^{৮৪৫} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ২৬৪৬; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৪৪৪।

^{৮৪৬} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৫১০০; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৪৪৭ শব্দ ইমাম মুসলিমের।

المُسَأَلَةُ الثَّانِيَةُ: شُرُوطُ الرُّضَاعِ الْمُحْرَمِ، وَمَا يُتَرَبَّ عَلَى قِرَابَةِ الرُّضَاعِ
বিতীয় মাসত্ত্বালা: হারামকারী দুধপান-এর শর্ত এবং দুধপানের কারণে
তৈরি আতীয়তার বন্ধন

১. হারামকারী দুধপান-এর শর্তসমূহ:

দুধপান করাকে আত্মীয়তার হিসেবে গণ্য করা এবং হারাম সাব্যস্তকারী হবে ২টি শর্ত সাপেক্ষে।
সে দুটি হলো:

১. দুধপান করাটা শিশুর প্রথম ২ বছরের মধ্যে হতে হবে। ২ বছরের পর হলে তা গণ্য করা হবে না। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّ الرَّضَاعَةُ﴾

“যে ব্যক্তি দুধপানের সময় পূর্ণ করতে চায়, তার জন্য মায়েরা তাদের সত্তানদেরকে পূর্ণ দুই
বছর দুধ পান করাবে।” [সূরা বাক্সারাহ : ২৩৩]

এর সাথেই মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَفَصَالَهُ فِي عَامِينِ﴾

“ଦୁଧ ଛାଡାନୋ ହ୍ୟ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ।” [ସୁରା ଲୁକମାନ : ୧୫]

উন্মু সালামাহ  এর হাদীস। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল  বলেছেন:

«لَا يُحِرِّمُ مِنَ الرِّضَا عَيْنَ إِلَّا مَا فَتَّقَ الْأَمْعَاءُ فِي الثَّدَىٰ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ»

“দুধ ছাড়ানোর সময়ের (বয়সের) পূর্বে শনের বোটা হতে শিশুর পাকস্থলীতে দুধ না গেলে দুধপানের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয় না (দুধপানের ফলে নিষিদ্ধ বিষয় কার্যকর হয় না)।”^{৪৮৭}

‘মুক্তি’ এর অর্থ হচ্ছে পেটে পৌঁছেছে এবং শরীর বৃক্ষি পেয়েছে। সুতরাং দুধপানের ফলে নিবেদাজ্ঞার ক্ষেত্রে ছোটো বেলায় দুধ পান করতে হবে; যে সময় তা শিশুর খাদ্যের পরিপূরক হয় এবং শারীরিক গঠন বৃক্ষিতে সহায়ক হয়।

২. তৃষ্ণিভরে পাঁচ চোষণ বা তার বেশি খাওয়াতে হবে। আয়িশাহ সন্দেহ এর হাদীস। তিনি বলেন,

كَانَ فِيهَا نَزَلٌ مِّنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَّضَعَاتٍ مَعْلُوَّاتٍ يُجْرِي مِنْ، ثُمَّ تُسْخِنَ، بِخَمْسٍ مَعْدِرٍ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُنَّ فِيهَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

^{৪৭} তিমুনিয়া, ঘ. ২১৩১ এবং তিনি হাসান সহীহ বলেছেন। শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, ইরওয়া, নং ২১৫০।

“কুরআনে এ আয়াত অবর্তীণ হয়েছিল ﴿عَشْرُ رَضَاعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ ‘দশবার দুধপানে হারাম সাব্যস্ত হয়’ অতঃপর তা রহিত হয়ে যায় ﴿خَمْسٌ مَعْلُومَاتٍ﴾ এর দ্বারা ‘পাঁচবার পান করলে হারাম সাব্যস্ত হয়’। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেন অঢ় ঐ আয়াতটি কুরআনের আয়াত হিসেবে তিলাওয়াত করা হতো।”^{৮৪৮}

এর তিলাওয়াত মানসুখ হয়েছে কিন্তু তার বিধান রয়ে গেছে।

যদি চোষণ দিয়ে দুধপান করা ব্যতীত শিশুর পেটে দুধ পৌঁছে; যেমন-বাচ্চার মুখে দুধের কোঁচা পড়া অথবা পাত্র ইত্যাদির মাধ্যমে খাওয়ানো; তাহলেও তা দুধপান করার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে এটা কমপক্ষে ৫ বার হতে হবে।

২. দুধপানের কারণে আত্মীয়তার ক্ষেত্রে সাব্যস্ত বিষয়াবলি:

এই ব্যাপারে ২টি বিধান সাব্যস্ত হয়-

১. এমন বিধান যা হারামের সাথে সম্পৃক্ত;

২. এমন বিধান যা সম্পর্ক হালাল হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত।

হারামের সাথে সম্পৃক্ত:

বংশগত আত্মীয়তার মাধ্যমে যেভাবে বিবাহ হারাম হয়, তেমনিভাবে দুধপান করানোর মাধ্যমেও বিবাহ হারাম হয়। যেমন- দুধ মা, নানী এবং তারও উপরে, মেয়ে অথবা তারও নীচে, আপন বোন অথবা বৈমাত্রেয় কিংবা বৈপিত্রেয় বোন; তারা দুধপানের সম্পর্কের জন্য হারাম সাব্যস্ত হবে।

যা হালালের সাথে সম্পৃক্ত:

এমন কিছু বিষয় যা আপনি এবং আপনার আত্মীয়তার মাঝে বংশগতভাবে হালাল সাব্যস্ত হয়। ঠিক দুধপানের কারণেও হালাল সাব্যস্ত হয়। যেমন- মা-মেয়ে। এই দুধপান করা পরম্পরার দিকে তাকানো এবং নির্জনে গমনের বৈধতা দেয়। আয়িশাহ رض এর হাদীস। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

إِنَّ الرَّصَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحِرِّمُ الْوِلَادَةُ

“জন্মসূত্রে যা হারাম, দুধপান সূত্রও তাকে হারাম করে।”^{৮৪৯}

^{৮৪৮} সঙ্গীহ মুসলিম, হা. ফুআ, ১৪৫২।

^{৮৪৯} মুক্তাফাকুন আলাইহি: সঙ্গীহল বুখারী, হা. ২৬৪৬; সঙ্গীহ মুসলিম, হা. ফুআ, ১৪৪৪।

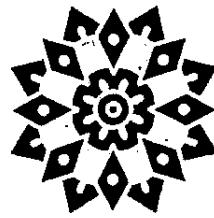
المسألة الثالثة: إثبات الرضاع তৃতীয় মাসআলা: দুধপান সাব্যস্তকরণ

সত্যবাদী হিসেবে পরিচিত একজন দুধপানকারিনী মহিলার সাক্ষ্য দানের মাধ্যমে দুধপান করা সাব্যস্ত হবে। সে নিজের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিক অথবা অন্যের ব্যাপারে। সে এভাবে সাক্ষ্য দিবে যে, সে কোনো শিষ্টকে ২ বছরের মধ্যে পাঁচ চোষণ দুধপান করিয়েছে। উক্তবাহ ইবনুল হারিস
এর হাদীস। তিনি বলেন,

تَرَوْجَحَتْ امْرَأَةٌ، فَجَاءَتْ امْرَأَةً فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَزْصَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ، دَعْهَا عَنْكَ» أَوْ تَحْوِهُ^{৮৫০}

“এক নারীকে আমি বিয়ে করলাম। কিন্তু আরেক নারী এসে বলল, আমি তো তোমাদের দুই জনকে দুধপান করিয়েছি। তখন আমি নারী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট গিয়ে বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, এমন কথা বলা হয়েছে তখন বিয়ে কীভাবে সম্ভব? তাকে তুমি ত্যাগ করো। অথবা তিনি সে রকম কিছু বললেন।”^{৮৫০}

যেহেতু এটি লজ্জাস্থান বিষয়ক সাক্ষ্য, সেহেতু এতে নারীর সাক্ষ্যকে পুরুষের সাক্ষ্য ব্যতীতই গ্রহণ করা হবে প্রস্বের সাক্ষ্যর মতো।



الباب العاشر: في الحضانة، وأحكامها

দশম অনুচ্ছেদ: লালনপালন এবং তার বিধিবিধান

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المُسَأْلَةُ الْأُولَى: فِي تَعْرِيفِ الْحُضَانَةِ، وَحُكْمَهَا، وَمَنْ تَكُونُ؟

প্রথম মাসআলা: হান্দ এর সংজ্ঞা, তার ভুক্ত এবং এটা কার জন্য?

ক. حضانة এর পরিচয়:

শাব্দিক অর্থ: (تربية الصغير ورعايته) ছোটো শিশুকে লালন-পালন ও তার দেখাশোনা করা। এটা শব্দ থেকে নির্গত। যার অর্থ হলো পার্শ্ব। কারণ লালন-পালনকারী ব্যক্তি এবং দায়িত্বান্বিত শিশুকে তার পার্শ্বে রেখেই লালন-পালন করে থাকে।

الْحَاضِنُ وَالْحَاضِنَةُ : شিশুর ব্যপারে নিযুক্ত ২ জন ব্যক্তি যারা তাকে সংরক্ষণ করে এবং দেখাশোনা করে।

هي القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره، وتربيته بما يصلحه بدنياً ومعنوياً، ووقياته عما يؤذيه.

পারিভাষিক অর্থ: এমন ব্যক্তির শারীরিক ও আভ্যন্তরীণ দায়িত্ব নেওয়া যার ভালো-মন্দের পার্থক্যের জ্ঞান নেই এবং স্বনিয়ন্ত্রিত নয়। সাথে সাথে তাকে রক্ষা করা এমন বিষয় থেকে যা তাকে কষ্ট দেয়।

খ. বিধান: যখন অন্য কাউকে পাওয়া যাবে না অথবা অন্য কাউকে পাওয়া যাবে কিন্তু শিশু তাকে গ্রহণ করবে না, তখন উপযুক্ত লালনপালনকারীর উপর ওয়াজিব। কারণ অন্যথায় সে মারা যেতে পারে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করা ওয়াজিব। আর একাধিক লালনপালনকারী থাকলে সমতা অপরিহার্য।

গ. কার জন্য হান্দ বা লালনপালন সাব্যস্ত হবে?

লালন-পালনের দায়িত্ব উপযুক্ত মহিলা ও পুরুষের উপর। তবে লালন-পালনের ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষদের থেকে অগ্রাধিকার পাবে, কারণ তারা শিশুদের প্রতি যত্নশীল ও দয়াবান। আর যদি তারা একেত্রে সক্ষম না থাকে, তাহলে এটা পুরুষের নিকট স্থানান্তরিত হবে। কারণ তারা সুরক্ষা, দেখাশোনা ও ছোটোদের কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় সামর্থ্য রাখে।

সন্তানের লালনপালন করা তার পিতা-মাতার জন্য যখন তাদের মাঝে বিবাহ বঙ্গন থাকে। আর যদি তার পৃথক হয় তাহলে মা অগ্রধিকার পাবে, যতক্ষণ না মা অন্য কারো কাছে বিবাহ বঙ্গনে আবন্ধ হয়। কারণ নাবী  এক মহিলাকে বলেছিলেন, যার স্বামী তাকে তালাক দিয়েছিল এবং সে তার সন্তানকে দুরে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল।

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

“যতক্ষণ না তুমি বিবাহ করো, তুমিই অগ্রাধিকার পাবে।”^{৮৫১}

যথাযথ লালনপালনের অর্থ: তাকে তত্ত্বাবধান করা, ক্ষতিকর জিনিস থেকে রক্ষা করা, বড়ো হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন করা এবং তার জন্য কল্যাণকর সবকিছুই করা: তাকে খাবার খাওয়ানো, গোসল করিয়ে দেওয়া, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্যভাবে পরিষ্কার করা, ঘুমা পাঢ়ানো ও জাগানো এবং সর্বপ্রকার প্রয়োজন মেটানো।

المسألة الثانية: في شروط الحاضن، وموانع الحضانة

দ্বিতীয় মাসআলা: এর শর্ত ও লালন পালনের প্রতিবন্ধিক তাসমূহ

১. মুসলিম হতে হবে: সুতরাং কোনো মুসলিমের দায়িত্ব কোনো কাফেরকে দেওয়া বৈধ না। কাফেরের জন্য মুসলিমের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করা জায়েয় নেই। কারণ এতে এই ভয় আছে যে, সে তার দ্বিনে ফিতনা সৃষ্টি করবে এবং তাকে মুসলিম থেকে কাফের বানিয়ে ফেলবে।
 ২. প্রাণ্বয়স্ক ও বিবেকবান হতে হবে: ছেটো, পাগল ও জ্ঞানহীন ব্যক্তি এই দায়িত্ব নিতে পারবে না। কেননা তারা এই দায়িত্ব পালনে অক্ষম এবং লালন-পালন করার ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম।
 ৩. দ্বীনদারিতা ও পবিত্রতার ক্ষেত্রে আমানত রক্ষা করা: খিয়ানতকারী ও পাপাচারী ব্যক্তির লালনপালনের কোনো অধিকার নেই। কেননা এরা আমানতদার নয়। এছাড়াও শিশু তাদের কাছে থাকলে নিজের এবং তার সম্পদ এর ক্ষতি হওয়ার স্থাবনা রয়েছে।
 ৪. শিশুর সকল দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আর্থিক ও শারীরিকভাবে সক্ষম থাকতে হবে: সুতরাং বৃক্ষ, বোবা ও বধির-এর দায়িত্ব নেওয়া সঠিক নয়। অনুরূপভাবে হতদরিদ্র, নিঃস্ব কিংবা একাধিক কাজে ব্যস্ত এমন ব্যক্তিও দায়িত্ব নিতে পারবে না। কারণ এর ফলে তার অধীন শিশুটির সমস্যা হতে পারে।

¹⁰³ আহমাদ ২/১৮২; দ, হা, ২২৭৬; হাকিম ২/২০৭ এবং তিনি সঙ্গে বলেছেন; ইমাম যাহাবী একমত্য পোষণ করেছেন; ইমাম জালিয়ানী যাসান বলেছেন, ইরওয়া, নং ২১৮৭

৫. লালনপালনকারী পাকস্থলীর রোগ থেকে মুক্ত থাকবে: যেমন- কৌষ্ঠরোগ ও অন্যান্য।

৬. সুবোধ সম্পন্ন হতে হবে: নির্বাধ প্রকৃতির লোকদের জন্য লালনপালনের দায়িত্ব নেই; যেন সে ঐ পালনকৃত শিশুর সম্পদ নষ্ট না করতে পারে।

৭. লালনপালনকারী ব্যক্তি স্বাধীন হবে: সুতরাং দাস কর্তৃক দায়িত্ব গ্রহণ ঠিক নয়। কেননা লালনপালন একটি অভিভাবকত্ব মূলক কাজ, আর দাস অভিভাবকদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

এ শর্তসমূহ পূরুষ ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর মহিলার জন্য আরেকটি শর্ত বেশি রয়েছে: সে ঐ শিশুটিসহ অন্য কোনো অপরিচিত ব্যক্তির কাছে বিবাহিত থাকবে না। কেননা সে তখন তার স্বামীর অধিকার আদায়ে ব্যস্ত থাকবে। রসূল ﷺ বলেন:

أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَكُنْ حِيٌ

“যতক্ষণ না তুমি বিবাহ করো, তুমই অগ্রাধিকার পাবে।”^{১১২}

আর এই লালনপালনের দায়িত্বটা বাতিল হয়ে যাবে যদি উল্লিখিত কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে অথবা উল্লিখিত শর্তের কোনো একটি না থাকে।

المسألة الثالثة: من الأحكام المتعلقة بالحضانة

তৃতীয় মাসআলা: حضانة سাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ

১. যদি শিশুর পিতা-মাতার কেউ লম্বা সফর করে, এতে যদি শিশুর ক্ষতির উদ্দেশ্য না হয়, আর পথ যদি নিরাপদ হয়, তখন পিতা লালনপালনের অতি বেশি হকদার। চাই সে মুসাফির হোক বা মুকীম হোক। কারণ সে ছেলের আদব শেখাতে ও তাকে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে থাকে। অতএব যখন সে দূরে থাকে তখন তার সন্তান নষ্ট হয়ে যায়।

২. আর সফর যদি কাছাকাছি স্থানে হয় দুরত্ব না হয়ে, তখন দায়িত্ব মা পাবে। চাই সে মুসাফির হোক বা মুকীম হোক। কারণ সে অতি স্নেহময়। তার পিতার জন্য উচিত তাকে দেখাশোনা করা ও তার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা।

আর যদি সফরটি প্রয়োজনে অতি দীর্ঘ হয় এবং পথ নিরাপদ না হয়। উভয়ের মাঝে যে মুকীম সে লালনপালন করবে।

৩. এই লালনপালন ৭ বৎসর পর্যন্ত থাকবে। যখন ৭ বৎসর শেষ হবে তখন পিতামাতার মাঝে আলোচনা সাপেক্ষে ও তার যাকে ভালো লাগে সেই বিষয়টি বিবেচনা করে নির্ধারিত হবে। নাবী ﷺ এর বাণীর ভিত্তিতে।

^{১১২} আহমাদ ২/১৮২; স, হা. ২২৭৬; হাকিম ২/২০৭ এবং তিনি সহীহ বলেছেন; ইমাম যাহাবী ঐকমত্য পোষণ করেছেন; ইমাম আলবানী হাসান বলেছেন, ইরওয়া, নং ২১৮৭

هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أُمِّهَا شِشْتَ، فَأَخْذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ

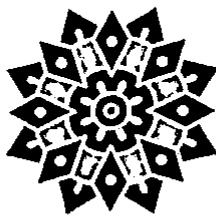
“ଏହି ତୋମାର ବାବା ଏବଂ ଏହି ତୋମାର ମା । ସୁତରାଂ ତୁମି ଏଦେର ଯାକେ ଖୁଶି ଗ୍ରହଣ କରୋ । ସେ ତାର ମାୟେର ହାତ ଧରେ । ଫଳେ ସେ (ମହିଳାଟି) ତାକେ ନିଯେ ଚଲେ ଗେଲ ।”^{୮୩}

ଏମନିଭାବେ ଉମାର ଓ ଆଲୀ ଇଚ୍ଛାର ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିଯେ ଫୟାସାଲା କରେଛେ । ଆର ଏହି ଇଚ୍ଛାଧିକାର ଥାକବେ ବୋଧସମପନ୍ନ ହୋଇଯାର ପରେ ପିତାମାତା ଲାଲନପାଲନେର ଜନ୍ୟ ଉପ୍ୟୁକ୍ତ ହଲେ । ଇଚ୍ଛାଧିକାରକେ ସାତ ବହୁରେ ସାଥେ ଶର୍ତ୍ୟୁକ୍ତ କରା ହେଯେଛେ । କାରଣ ସଞ୍ଚମ ବହୁରୟୀ ହେଚ୍ଛେ ପ୍ରଥମ ବହୁରୟୀ ବହୁରୟୀ ଶର୍ତ୍ୟୀତପ୍ରଗେତା ସାଲତେର ଆଦେଶ କରେଛେ । ଯଦି ସନ୍ତାନ ତାର ପିତାକେ ନିର୍ବାଚନ କରେ ତାହଲେ ସେ ପିତାର କାହେ ଦିନରାତ ଥାକବେ ଯାତେ ପିତା ତାକେ ଆଦିବ ଶେଖାତେ ପାରେନ ଏବଂ ଲାଲନପାଲନ କରତେ ପାରେନ । ଆର ମାୟେର କାହେ ଯେତେ ତାକେ ବାଧା ପ୍ରଦାନ କରବେ ନା । ଯଦି ମାୟେର କାହେ ଥାକତେ ଚାଯ, ତାହଲେ ମାୟେର କାହେ ରାତେ ଏବଂ ପିତାର କାହେ ଦିନେ ଥାକବେ, ଯାତେ ପିତା ତାକେ ଲାଲନପାଲନ କରତେ ପାରେ ଓ ଆଦିବ ଶେଖାତେ ପାରେ । କାରଣ ଦିନ ହେଚ୍ଛେ ପ୍ର୍ୟୋଜନ ପୂରଣ ଏବଂ କାଜେର ସମୟ ।

ମେଯେ ଯଥନ ୭ ବହୁରୟୀ ପୌଛାବେ ତଥନ ସେ ତାର ପିତାର କାହେ ଥାକବେ । କାରଣ ସେ ଅନ୍ୟେର ତୁଳନାଯି ଅଧିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଲାଲନପାଲନେର ଅଧିକାରୀ । ଏସମୟେ ତାର ବିବାହେର ବୟସେର କାହାକାହି ହୟ । ଯେହେତୁ ପିତା ହଲୋ ଅଭିଭାବକ, ତାହିଁ ତାର କାହେ ବିବାହେର ପ୍ରଭାବ ଆସତେ ପାରେ । ପିତାଇ ଅନ୍ୟଦେର ଥେକେ ବିବାହେର ସମତାର ବ୍ୟାପାରେ ବେଶି ଜାନେନ । ଯଥନ କୋନୋ ଫିତନା-ଫାସାଦେର ଆଶ୍ରକ୍ଷା ନା ଥାକବେ, ତଥନ ତାର ମାୟେର ସାଥେ ସାକ୍ଷାତ କରତେ ବାଁଧା ଦିବେ ନା । କିନ୍ତୁ ପିତା ଯଦି ତାର ବ୍ୟକ୍ତତାର କାରଣେ ଅଥବା ବାର୍ଧକ୍ୟେର କାରଣେ କିଂବା ଅସୁହତାର କାରଣେ ବା ଦ୍ୱିନଦାରୀତାଯ ସ୍ଵଲ୍ଗତାର କାରଣେ ତାକେ ରଙ୍ଗା କରତେ ନା ପାରେ, ତାହଲେ ତାର ମା ଯଦି ତାକେ ରଙ୍ଗା କରତେ ସଙ୍କଷମ ହୟ, ସେ ବେଶି ହକଦାର ହବେ । ଅନୁରୂପ ପିତା ଯଦି ଅନ୍ୟ କାଉକେ ବିବାହ କରେ ଏବଂ ତାକେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀର କାହେ ରାଥେ ଆର ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକେ କଷ୍ଟ ଦେଯ ତାହଲେ ମା ବେଶି ହକଦାର ହବେ ।

୪. ଲାଲନପାଲନେର ଖରଚ: ଲାଲନପାଲନକାରୀ ମା ହୋକ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ହୋକ, ଯଦି ତାର ସମ୍ପଦ ଥାକେ ଖରଚ ଶିଶୁର ସମ୍ପଦ ଥେକେଇ ନେଓଯା ହବେ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାର ସମ୍ପଦ ନା ଥାକେ ତାହଲେ ତାର ଅଭିଭାବକେର ଥେକେ ନେଓଯା ହବେ ।

^{୮୩} ଆହ୍ୟାଦ ୨/୨୪୬; ଦ, ହା. ୨୨୭; ଡିରମିଯି, ହା. ୧୩୭୫ ଏବଂ ଡିନି ହାସାନ ସହିତ ବଲେଛେ; ହାକିମ ୪/୯୭ ଏବଂ ଡିନି ସହିତ ବଲେଛେ;
ଇମାମ ଯାହାବୀ ଟ୍ରିକମତ୍ୟ ପୋଷଣ କରେଛେ; ଇମାମ ଆଲବାନୀ ହାସାନ ବଲେଛେ, ଇରାଓ୍ୟା, ନଂ ୨୧୯୨ ।



الباب الحادي عشر: في النفقات একাদশ অনুচ্ছেদ: খোরপোশ বা খরচ করা

এই অনুচ্ছেদে দুটি মাসআলা আছে:

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: تَعْرِيفُ النَّفَقَةِ وَأَنْواعُهَا

প্রথম মাসআলা: নিচে এর সংজ্ঞা এবং তার প্রকারসমূহ

ক. نفقة এর পরিচয়:

নিচে শাস্তিকে নিচে শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে। এটা মূলত বের করা ও শেষ করার অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং নিচে শব্দকে কল্যাণকর বিষয় ছাড়া ব্যবহার করা হয় না।

وَشَرِيعًا: كَفَافٌ مِّنْ يَمُونٍ^{٨٤٨} بِالْمَعْرُوفِ قَوْتًا، وَكُسُوفًا، وَمَسْكَنًا، وَتَوَابِعًا

শারঙ্গ অর্থ: ব্যয় বা ভরণপোষণের অর্থ হলো ন্যায়সংগতভাবে অধীনদেরকে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদির সরবরাহ করা।

খ. نفقات-এর প্রকার:

১. মানুষ তার নিজের উপর খরচ করা;
২. মূল কর্তৃক শাখার উপর খরচ করা;
৩. শাখা কর্তৃক মূলের উপর খরচ করা;
৪. স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর উপর খরচ করা।

প্রথম: মানুষ তার নিজের উপর খরচ করা:

ব্যক্তির উপর আবশ্যিক হলো নিজের উপর খরচের মাধ্যমে শুরু করা, যদি এতে সক্ষম থাকে।
জাবির ^{رض} এর হাদীসের ভিত্তিতে।

^{٨٤٨} একজন মানুষ তার পরিবারকে জীবিকা সরবরাহ করে: তাদের জন্য পর্যাপ্ত ভরণপোষণ করে ও খরচ করে।

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبْرٍ إِلَى أَنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ: إِنَّمَا
يُنْهِسُكَ فَتَصَدِّقُ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَائِبِكَ،

“জাবির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বানু উয়ারাহ গোত্রের এক ব্যক্তি তার এক গোলামকে তার মৃত্যুর পর মুক্ত হওয়ার কথা দিলেন। ... নাবী তাতে বলেন: “এ অর্থ তুমি প্রথমে তোমার নিজের জন্য ব্যয় করো। তারপর কিছু বাকি থাকলে তোমার পরিবারের লোকদের জন্য তা ব্যয় করো, পরিবারের লোকদের জন্য ব্যয় করার পর কিছু থাকলে অতঃপর তোমার নিকটাত্ত্বায়দের জন্য ব্যয় করো।”^{৮৫৫}

দ্বিতীয়: মূল কর্তৃক শাখার উপর খরচ করা:

পিতা, দাদাদের উপর ওয়াজিব হলো ছেলে এবং তার অধস্তনদের উপর খরচ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَعَلَى الْمَوْلَدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

“পিতার কর্তব্য ভালোভাবে তাদের ভরণপোষণ করা।” [সূরা বাক্সারাহ : ২৩৩]

পিতার উপর আবশ্যক তার দুধ সন্তানের উপর খরচ করা। আয়িশাহ হতে বর্ণিত হাদীস।

قَالَتْ هِنْدُ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبَا سَفِيَّانَ رَجُلٌ شَحِيقٌ، فَهَلْ عَلَيْيِ جُنَاحٌ أَنْ أَخْذَ
مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَالَ: «خُذْنِي أَنْتِ وَبَيْنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ»

“মুআবিয়া এর মা হিন্দা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, আবু সুফিয়ান (রায়ে) একজন কৃপণ ব্যক্তি। এমতাবস্থায় আমি যদি তার সম্পদ থেকে গোপনে কিছু নিই, তাতে কি আমার গুনাহ হবে? তিনি বললেন: তুমি তোমার ও সন্তানদের প্রয়োজন অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গতভাবে নিতে পারো।”^{৮৫৬}

তৃতীয়: শাখা কর্তৃক মূলের উপর খরচ করা:

সন্তানের উপর আবশ্যক হলো তার পিতা মাতার উপর খরচ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَصَاحِبَّهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفُهُمَا﴾

“পৃথিবীতে তাদের সাথে সদভাবে বসবাস করো।” [সূরা মুকম্মান : ১৫]

^{৮৫৫} সহীহ মুসলিম, হা. ২২০৩, ফুআ. ৯৯।

^{৮৫৬} মুওাফাকুন আলাইহি: সহীহ বুখারী, হা. ২২১১; সহীহ মুসলিম, হা. ৪৩৬৯, ফুআ. ১৭১৪।

মহান আল্লাহ আরও বলেন: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا﴾

“পিতামাতার সাথে সুন্দর আচরণ করো।” [সূরা ইসরাঃ ২৩]

আর উভয়ের উপর খরচ করাটাই ইহসান বা দয়ার বহিঃপ্রকাশ। বরং এটা পিতামাতার উপর সবচেয়ে বড়ো ইহসানের অন্যতম। আয়িশাহ رض হতে বর্ণিত হাদীস।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَطِيبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ
الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ

“আয়িশাহ رض হতে বর্ণিত। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কোনো ব্যক্তির নিজ হাতের উপার্জিত খাদ্য সর্বোত্তম খাদ্য। তার সন্তানও তার উপার্জন বিশেষ।”^{৮৫৭}

উমার ইবনুল আস رض হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন:

أَنْتَ وَمَالِكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطِيبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُّوا مِنْ كَسْبِ أُولَادِكُمْ

“তুমি এবং তোমার সম্পদ উভয়ই তোমার পিতার। তোমাদের সন্তান তোমাদের জন্য সর্বোত্তম উপার্জন। সুতরাং তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন খাবে।”^{৮৫৮}

চতুর্থ: স্ত্রীর উপর খরচ করা:

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভরণপোষণ আবশ্যিক। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

الرِّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

“পুরুষরা নারীদের অভিভাবক। কারণ আল্লাহ তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং এজন্য যে, পুরুষ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে।” [সূরা নিসা : ৩৪]

জাবির رض থেকে বর্ণিত হাদীসে নাবী ﷺ এর বিদায় হাজের বাণী রয়েছে। তাতে বলেন:

وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“তাদের জন্য ন্যায়সঙ্গত খাদ্য ও পোশাকের ব্যবস্থা করা তোমাদের কর্তব্য।”^{৮৫৯}

ইতঃপূর্বে গত জাবির رض এর হাদীসে রয়েছে: فِإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلَا مِلْكَ لَكَ

“তারপর কিছু বাকি থাকলে তোমার পরিবারের লোকদের জন্য তা ব্যয় করো।”^{৮৬০}

^{৮৫৭} তিরিমী, ঘ. ১৩৮৫; সুনান আবু দাউদ, ঘ. ৩৫২৮; নাসাই, ঘ. ৪৪৫১; ইবনে মাজাহ, ঘ. ২১৩৮ ইআসহ, সহীহ নাসাই, ঘ. ৪১৪৪।

^{৮৫৮} সুনান আবু দাউদ, ঘ. ৩৫৩০; ইআসহ, ইরওয়া ঘ. ৮৩৮।

^{৮৫৯} সহীহ মুসলিম, ঘ. ২৮৪০, ফুআ, ১২১৮।

^{৮৬০} সহীহ মুসলিম, ঘ. ২২০৩, ফুআ, ৯৯৭।

ইটঃপুর্বে গত অয়িশাহ  হতে বর্ণিত হাদীস। তাতে নাবী  বাণী রয়েছে:

«خُدِّي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ»

“তুমি তোমার ও সন্তানদের প্রয়োজন অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গতভাবে নিতে পারো।”^{৮৬১}

ଏମନିଭାବେ ସ୍ଥାମୀ ଷ୍ଟ୍ରୀର ଧାରା, ବାସସ୍ଥାନ, ବନ୍ଦ ଏଣ୍ଟଲୋର ଖର୍ଚ ବହନ କରିବେ ।

ଆର ଏହି ଖରଚଟି ସ୍ତ୍ରୀକେ ଦେଓଯା ଆବଶ୍ୟକ । ରାଜୟୀ ତାଲାକପ୍ରାଣ୍ତ ନାରୀର କ୍ଷେତ୍ରେ ଇନ୍ଦତେ ଥାକାକାଳିନ ସମୟେ ଖରଚ ଦିତେ ହବେ । ଆର ତାଲାକେ ବାଯିନ ଏର କ୍ଷେତ୍ରେ ଖରଚ ଦେଓଯା ଓ ବାସନ୍ଧାନ ଆବଶ୍ୟକ ନା ତବେ ଯଦି ଗର୍ବବତୀ ହୁଁ ତାହଲେ ଖରଚ ଦେଓଯା ଆବଶ୍ୟକ । ମହାନ ଆଳ୍ପାହ ବଲେନ :

﴿وَإِنْ كُنْتُ أَوْلَئِكَ حَمْلٌ فَأَنْهِقُوكُمْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ﴾

“তারা গর্বিতী থাকলে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাদের জন্য খরচ করো।” [সুরা তালাক : ৬]

المسألة الثانية: نفقة المالك والبهائم

ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସଅଳା: ଦାସ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦ ଜନ୍ମର ଖରଚ

১. দাসের উপর খরচ করা:

দাসের উপর খরচ করার হৃকুম: মনিবের উপর দাসের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের খরচ উত্তমভাবে বহন করা আবশ্যিক। মহান আল্পাহ বলেন:

(فَقَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكُتْ أَيْتَاهُمْ فِيهِ)

“আমি তাদের স্তৰী এবং মালিকানাধীন দাসীগণ ব্যাপারে তাদের উপর যা নির্ধারিত করেছি তা
অবশ্যই জানি।” (সেন্ট আহয়াৰ : ৫০)

بِلِّمَمْلُوكٍ طَعَامُهُ وَكَسْوَتُهُ[ۖ] وَبَلَلَنْ: 

“কৃতদাসের জন্য খাওয়া ও পোশাক-পরিষ্ঠের ব্যবস্থা করা দায়িত্ব।”^{৮৬২}

তাদের সাথে নরম আচরণ করা এবং সক্ষমতার বাহিরে কোনো কিছু না চাপিয়ে দেওয়া
ওয়াজিব। নাৰী  বলেন:

وَلَا تَكْلُفُهُمْ مَا يَعْلَمُونَ، فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعْيُنُهُمْ

¹⁰³ युताकान आजाहिदः सदीहल बुधानी, शा. २२११; सदीह मुसलिम, शा. ४३६९, फुआ. १७१४।

१६६२ गदीष मुख्यमन्त्री, द्या, ४२०८, फुआ. १६६२।

“তোমরা তাদের উপর এমন কোনো কাজের ভার চাপিয়ে দিবে না, যা করতে তাদের বোঝা হয়ে যায়। যদি তোমরা তাদেরকে কোনো কষ্টকর কাজ দাও, তাহলে তাদেরকে সাহায্যও করো।”^{৮৬৩}

২. দাসের বিয়ে ও তাকে বিয়ে দেওয়া: যদি দাস বিবাহ করতে চায় তাহলে তার মালিক তাকে বিবাহ দিবে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَأَنِّي خُوا الْيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامِكُمْ﴾

“তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিতদের ও সৎকর্মশীল দাস দাসীদের বিবাহ দাও।”^{৮৬৪} সুরা নূর: ৩৬ কেননা যদি বিবাহ না দেয়, তাহলে তার ব্যভিচারে লিঙ্গ হওয়ার ভয় আছে। আর যখন দাসী বিবাহ করতে চাইবে তখন তার মালিকের বিবাহ দেওয়া ও সহবাস করার মাঝে স্বাধীনতা থাকবে। অথবা তার ক্ষতি দূর করতে বিক্রি করে দিবে।

তৃতীয়: চতুর্থ জন্মের খরচ:

মালিকের উপর পশুকে খাদ্য দেওয়া, পানি পান করানো এবং তার সকল বিষয় দেখাশোনা করা আবশ্যিক। নাবী ﷺ বলেন:

دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هَرَّةٍ رَّبَطَتْهَا، فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ حَشَاشِ الْأَرْضِ، حَتَّىٰ مَاتَتْ هَرَّلَا

“এক মহিলা একটি বিড়ালের কারণে জাহানামে যায়। সে তাকে মজবুত করে আটকে রাখে, তাকে খাবার দেয়নি, পানীয় দেয়নি এবং তাকে মুক্তি দেয়নি যে, জমিনের পোকা-মাকড় খেয়ে বাঁচতে পারে। পরিশেষে বিড়ালটি মারা যায়।”^{৮৬৫}

এর থেকে বুঝা যায় যে, প্রাণির উপর খরচ করা আবশ্যিক। কারণ মহিলার জাহানামে যাওয়ার কারণ প্রাণির উপর খরচ না করা। এমনিভাবে সমস্ত গৃহপালিত পশুর ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবে।

যদি মালিক তার উপর খরচ করার ব্যাপারে অক্ষম হয় তাহলে তা বিক্রি করবে অথবা ভাড়া দিবে। যদি খাওয়া যায় তাহলে তা যবেহ করে থাবে। কিন্তু যদি তাকে বাঁচিয়ে রাখা হয় এবং তার জন্য খরচ না করা হয় তাহলে অন্যায় ও অত্যাচার হবে। আর এই অন্যায় অবশ্যই দূর করতে হবে।

^{৮৬৩} সহীহ মুসলিম, ঘা. ৪২০৫, মুআ. ১৬৬১।

^{৮৬৪} সহীহ মুসলিম, ঘা. ৬৫৭৩, মুআ. ২৬১৯।



দশম অধ্যায়
অপরাধবিধি

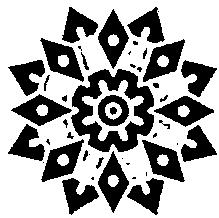
عَاشِرًا : كِتَابُ الْجَنَاحِيَاتِ

————— ♫ এতে ০৩টি অনুচ্ছেদ রয়েছে ♫ ———

প্রথম অনুচ্ছেদ: অপরাধবিধি

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: রক্তমূল্য বা হত্যাকারীর উপর ধার্য ক্ষতিপূরণ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: ক্লসামাহ



الباب الأول : في الجنایات প্রথম অনুচ্ছেদ: অপরাধবিধি

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المقالة الأولى: تعریف الجنایة وأقسامها

প্রথম মাসআলা: বা অপরাধ পরিচিতি ও প্রকারভেদ।

১. الجنایة - এর পরিচয়:

جنایات এর বহুবচন হলো:

আভিধানিক অর্থ: কোনো ব্যক্তির দেহ, মাল অথবা সম্মানের উপর অত্যাচার করা। ফর্কীহগণ অপরাধবিধির অধ্যায়কে শুধুমাত্র ব্যক্তির দেহের উপর অত্যাচার করার সাথেই নির্দিষ্ট করেছেন। দণ্ডবিধির অধ্যায়কে সম্মান, মালের ক্ষেত্রে যুলুম করার সাথে নির্দিষ্ট করেছেন।

পরিভাষায় জنাইয়া বা অপরাধবিধি:

التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً، أو ملاً، أو كفارة.

“কোনো ব্যক্তির দেহের উপর জুলুম করা যার কারণে ক্রিসাস বা সম্পদ প্রদান অথবা কাফ্ফারা আবশ্যিক হয়।”

২. অপরাধ এর প্রকারভেদ :

ক. تatha কোনো ব্যক্তির উপর নির্যাতন করা।

খ. تatha কোনো ব্যক্তি ছাড়া অন্য কিছুর উপর নির্যাতন করা।

المسألة الثانية: الجنابة على النفس দ্বিতীয় মাসআলা : ব্যক্তির উপর আঘাত করা

এমন কাজ যা মানুষের প্রাণনাশ ঘটায় অর্থাৎ, হত্যা। মুসলিমগণ একমত হয়েছেন অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা অবৈধ। আল্লাহ তা'আলা বাণী:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِيقِ﴾

“তোমরা উপযুক্ত কারণ ছাড়া এমন ব্যক্তিকে হত্যা করো না যা আল্লাহ তা'আলা অবৈধ ঘোষণা করেছেন।” [সূরা ইসরাঃ ৩৩]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ ذَمُّ امْرِي مُسْلِمٍ، يَشَهِّدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِخْدَى ثَلَاثَةِ: وَالثَّيْبُ الزَّانِي، النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلنَّجَاعَةِ

“আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رض থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম বলেছেন: ওই মুসলিম ব্যক্তির রক্ত বৈধ নয় যে সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল, তবে তিনটি কারণ ব্যতীত। বিবাহিত জিনাকারী, হত্যার বদলা হত্যা, ধর্মান্তরিত হওয়া।”^{৮৬৫}

সুতরাং অন্যায়ভাবে হত্যা করা অবৈধ তা কুরআন এবং সুন্নাহ ও সকলের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যাকারীর বিধান:

যখন কোনো ব্যক্তি ইচ্ছা করে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করবে, তার হকুম হলো সে ফাসেক। কারণ সে কাবীরা গুনাহসমূহের একটি কাবীরা গুনাহতে জড়িত। আল্লাহ তা'আলা হত্যাকারীর বিষয়টি কুরআনে মারাত্তক অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বাণী:

﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾

“যে ব্যক্তি অন্যায় ভাবে অথবা জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কাউকে হত্যা করবে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল।” [সূরা মায়দাহ : ৩২]

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِّنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصْبِطْ دَمًا حَرَامًا

^{৮৬৫} সহীফুল বুখারী, পাঁ. ৩৩৩৫, সহীহ মুসলিম, পাঁ. ফুআ. ১৬৭৭।

“মুমিন ব্যক্তি যেন সর্বক্ষণ তার দ্বীনের মধ্যে প্রশস্ততায় অবস্থান করে, যতক্ষণ অবৈধ রক্ত প্রবাহিত না করে।”^{৮৬৬}

আল্লাহ তা'আলা হত্যাকারীকে কঠিন ইঁশিয়ার করে বলছেন:

﴿وَمَنْ يَفْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَيِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ حَالِدًا فِيهَا﴾

“কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম; সেখানে সে চিরস্থায়ী হবে।”[সূরা নিসা : ৯৩]

হত্যাকারীর বিষয়টি আল্লাহর নিকট। তিনি চাইলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন চাইলে ক্ষমা করে দিতে পারেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

“যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না। তবে তিনি চাইলে যাকে ইচ্ছা অন্য কোনো অপরাধের কারণে ক্ষমা করতে পারেন।”[সূরা নিসা ৪৮]

সুতরাং সে ব্যক্তি আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে রয়েছে, কারণ তার অপরাধটা শিরকের তুলনায় নিম্ন। এই বিধানটি তখন প্রযোজ্য হবে যখন সে তাওবা করবে না। আর যদি সে তোওবা করে নেয় তাহলে তার তাওবা গ্রহণীয় হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَفْنِطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّّحِيمُ﴾

“তুমি বলো হে আমার বান্দারা যারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছো তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করবেন নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু।”[সূরা যুমার : ৫৩]

তবে হত্যাকারীর তাওবার কারণে আখিরাতে নিহিত ব্যক্তির হক রহিত হবে না।

المسألة الثالثة: أنواع القتل

তৃতীয় মাসআলা: হত্যার প্রকারভেদ

হত্যা তিন প্রকার : ইচ্ছাকৃত হত্যা, ইচ্ছা সাদৃশ্য হত্যা, ভুলবশত হত্যা।

ভুলবশত হত্যা এবং ইচ্ছাকৃত হত্যা: উভয়ের আলোচনা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

^{৮৬৬} সংহিতা বুখারী, খ. ৬৮৬২।

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطًّا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًّا فَتَخْرِيرُ رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيْنُ مُسْلِمَةٍ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدِّقُوا﴾

“কোনো মুমিনকে হত্যা করা কোনো মুমিনের কাজ নয়। তবে ভুলবশত করলে সেটা স্বতন্ত্র; কেউ কোনো মুমিনকে ভুলবশত হত্যা করলে একটি দাস মুক্ত করা এবং তার পরিজনবর্গকে রক্ষণ আদায় করা কর্তব্য, যদি না তারাক্ষমা করে।” [সূরা নিসা ৯২]

মহান আল্লাহ আরও বলেন:

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَذَابٌ وَلَعْنَةٌ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾

“কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহানাম; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন, তাকে লান্ত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।” [সূরা নিসা ৯৩]

ইচ্ছাকৃত হত্যার সাদৃশ্য: সহীহ সুন্নাহ হতে প্রমাণিত নাবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেছেন:

عَقْلُ شَبِيهِ الْعَمَدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمَدِ

“ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ হত্যার দিয়াত ইচ্ছাকৃত হত্যার মতো কঠোর হবে।”^{৮৬৭}

এই তিন প্রকারের বিধির বিস্তারিত আলোচনা:

প্রথম প্রকার: ইচ্ছাকৃত হত্যা:

এর প্রকৃতি: নিষ্পাপ ব্যক্তিকে হত্যাকারী এমন যন্ত্র ব্যবহার করে আঘাত করবে যা দিয়ে সাধারণত নিহত হয়।

ইচ্ছাকৃত হত্যাকারী শাস্তির যোগ্য হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত পূর্ণ হওয়া আবশ্যিক:

১. হত্যাকারীর পূর্ণ ইচ্ছা (হত্যা করার ইচ্ছা) বিদ্যমান থাকা।
২. এটা জানতে হবে যে, হত্যাকারী যাকে হত্যা করেছে তিনি নিষ্পাপ ছিলেন।
৩. যা দিয়ে হত্যা করা হয়েছে তা এমন হাতিয়ার হতে হবে যা দ্বারা হত্যা স্বাভাবিক নিয়মে হয়ে থাকে। চাই তা ধারালো হোক বা না হোক।

উপরে উল্লিখিত কোনো একটি শর্ত পূর্ণ না হলে তা ইচ্ছাকৃত হত্যা হিসেবে গণ্য হবে না।

^{৮৬৭} সুন্নাহ আবু দাউদ, খ. ৪৫৬৫; আহমাদ ২/১৮৩।

► ইচ্ছাকৃত হত্যার ধরণ:

১. এমন ধারালো হাতিয়ার দিয়ে হত্যা করা যা শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে এবং কেটে ফেলে। যেমন তলোয়ার, ছুরি, বর্ষা অথবা এজাতীয় কিছু।

২. বড়ো ভারী বস্তু দ্বারা হত্যা করা। যেমন বড়ো ধরনের পাথর হাতুড়ি এবং এ জাতীয় আরও কিছু। আনাস ؑ থেকে বর্ণিত হাদীস।

أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَذْ رُضْنٌ "بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَأَلُوهَا مَنْ صَنَعَ هَذَا بِكِ؟ فُلَانْ؟ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا، فَأَوْمَثْ بِرَأْسِهَا، فَأَخْدَى الْيَهُودِيُّ فَاقِرٌ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ

“এক দাসীকে পাওয়া গেল তার মাথা দুটি পাথরের মাঝখানে রেখে পিঘে দিয়েছিল। অতঃপর তারা তাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করল: কে তোমাকে এরূপ করেছে? অমুক ব্যক্তি, অমুক ব্যক্তি, অতঃপর যখন তারা ইহুদির নাম উল্লেখ করল। তখন দাসী তার মাতা দিয়ে হাঁ সুচক ইশারা করল। ইহুদিকে ধরে আনা হলো। অতঃপর সে অপরাধ স্বীকার করলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সম্পর্কে আদেশ দিলেন যে তার মাতা দুটি পাথরের মাঝখানে রেখে পিঘে দেওয়ার জন্য।”^{৮৬৯}

৩. শ্বাস আটকে রাখা। যেমন রশি বা রশি জাতীয় কিছু দিয়ে তার শ্বাসকুন্দ করা অথবা তার নাক অথবা মুখ বন্ধ করে দেওয়া।

৪. অজ্ঞানে তাকে বিষ পান করানো। অথবা প্রাণনাশকারী কোনোকিছু খাওয়ানো যার ফলে সে মারা যাবে।

৫. এমন জায়গায় ফেলে আসা যেখানে হিংস্র প্রাণির আধিক্য রয়েছে অথবা যেখানে বিন্দুমাত্র পানি নেই।

৬. এমন পানিতে ফেলে দেওয়া যেখানে সে ডুবে যাবে অথবা এমন আগ্নে নিষ্কেপ করা যেখানে সে পুড়ে যাবে, যা থেকে নিহত ব্যক্তির মুক্তির স্বত্ত্বান্বয় নেই।

৭. আটকে রাখা এবং দীর্ঘ সময় খাবার পানীয় থেকে বন্ধিত রাখা যার ফলে অধিকাংশ সময় মানুষ মারা যায়, অতঃপর যাতে করে সে ক্ষুদ্রা এবং পিপাসায় মৃত্যুবরণ করে।

৮. হিংস্র প্রাণির সামনে ফেলে দেওয়া; যেমন সিংহ অথবা বিষাক্ত সাপ, যার কারণে সে মারা যাবে।

^{৮৬৯} তাঙ্গা: চৰ্ণ-বিচৰ্ণ করা।

^{৮৭০} সহীল বুখারী, হা. ২৪১৩, সহীহ মুসলিম, হা. ১৬৭২।

৯. হত্যা করার জন্য এমন কারণ তৈরি করা যার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়। যেমন তাঁর সম্পর্কে এমন সাক্ষ্য দেওয়া যার ফলে হত্যা করা আবশ্যিক হয় (যিনি, ধর্মত্যাগ, অন্যায়ভাবে হত্যা) ফলে তাকে হত্যা করা হয়। অতঃপর নিহত ব্যক্তির বিপক্ষে সাক্ষ্যদাতারা তাদের সাক্ষ্য থেকে ফিরে এসে বলে: আমরা তার মৃত্যুর ইচ্ছা করেছিলাম ফলে তাকে তাঁরা সবাই মিলে হত্যা করল।

ইচ্ছাকৃত হত্যার বিধান:

ইচ্ছাকৃত হত্যার দুটি বিধান:

১. পরকালীন বিধান: হত্যা করা হারাম। আর এটা মারাত্মক অপরাধ। যদি তাওবা না চায় এবং আল্লাহ ক্ষমা না করেন, তাহলে হত্যাকারীর উপর রয়েছে যত্ননাদায়ক শাস্তি। আল্লাহ তাআলার বাণী:

(وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَبَحْرَأْوَهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ وَأَعْدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)

“କେଉ ଇଚ୍ଛାକୃତଭାବେ କୋନୋ ମୁମିଳକେ ହତ୍ୟା କରଲେ ତାର ଶାନ୍ତି ଜାହାନାମ; ସେଥାନେ ସେ ସ୍ଥାୟୀ ହେବେ
ଏବଂ ଆପ୍ନାହ ତାର ପ୍ରତି କ୍ରୁଦ୍ଧ ହବେନ, ତାକେ ଲାନ୍ତ କରବେନ ଏବଂ ତାର ଜନ୍ୟ ମହାଶାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ଯେତ
ରାଖବେନ ।” ସୁରା ନିଃସା : ୯୩

২. ইহকালীন বিধান: যদি নিহত ব্যক্তির অভিভাবক ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীকে ক্ষমা না করেন তাহলে তার (ইচ্ছাকৃত হত্যাকারী) থেকে প্রতিশোধ নেওয়া হবে। আল্লাহ তাআলার বাণী:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى إِلَّا لِحَرَثٍ وَالْعَبْدُ إِلَّا عَبْدٌ وَالْأُنْثَى إِلَّا أُنْثَى فَمَنْ شَفِعَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَفَاعَةً فَإِنَّمَا تَعْلَمُ بِالْمَغْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾

“হে মুমিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর কিসাসের বিধান লিখে দেওয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস, নারীর বদলে নারী। তবে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কোনো ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার রক্ত-বিনিময় আদায় করা কর্তব্য। এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে শিথিলতা ও অনুগ্রহ। সুতরাং এরপরও যে সীমালঙ্ঘন করে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।” [সুরা বাকুরাহ : ১৭৮]

ଆବ୍ହାୟରା ଶ୍ରୀ ଏର ହାଦୀସ । ତିନି ବଲେନ, ଆମ୍ବାହର ରସୁଲ ଶ୍ରୀ ବରେଛେନ୍:

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتْلٌ فَهُوَ بَخْرُ النَّظَرِينِ: إِمَّا أَنْ يَقْتَلَ، وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى. وَفِي رِوَايَةٍ: إِمَّا أَنْ يُقَاتَدَ وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى

“যার কোনো আত্মীয় নিহত হয়েছে তার দুটি ব্যবস্থার যে-কোনো একটি গ্রহণের অধিকার রয়েছে। হয় রক্তপণ গ্রহণ করবে নতুবা কিসাস স্বরূপ হত্যাকারী কে হত্যা করতে হবে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে: হয় রক্তপণ নিবে নতুবা ক্ষমা করে দিবে।^{৮৭০}

সুতরাং রক্তের মালিক ইচ্ছাধীনের মধ্যে রয়েছে; হয়তো কিসাস গ্রহণ করবে অথবা বিনিময় ছাড়াই ক্ষমা করে দিবে। অথবা কিসাস গ্রহণের পরিবর্তে দিয়াত গ্রহণ করবে। দিয়াতের পরও তার জন্য সঞ্চি করার সুযোগ রয়েছে।

আল্লামা আল-মুওয়াফাক (যার বলেন, উভয়ের মাঝে সঞ্চি করে নেওয়ার বিষয়ে কোনো মতানৈক্য আছে কিনা আমার জানা নেই। হাদীসে এসেছে আমার বিন শুয়াইব তিনি তাঁর পিতা তার পিতা তার দাদা হতে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন:

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أُولَئِكَ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخْذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ تَلَاقُونَ حَقَّهُ،
وَتَلَاقُونَ جَدَّعَهُ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَهُ، وَمَا صَاحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ

“যে ব্যক্তি কাউকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করবে তাকে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের নিকট সোপর্দ করা হবে। যদি তারা চায় তাহলে তাকে হত্যা করবে আর যদি চায় তাহলে দিয়াত নিবে। আর দিয়াত হলো ৩০ টি চার বছরের উট (হিক্কা), ৩০ টি পাঁচ বছরের উট (জায়আ), ৪০ টি গর্ভধারী উট (খলিফাহ) এবং তারা যদি হত্যাকারীর সাথে সঞ্চি চুক্তি করে তাহলে এটা তাদের জন্য বৈধ রয়েছে। আর এটাই হচ্ছে কঠোর দিয়াত।”^{৮৭১}

কোনো কিছু গ্রহণ না করে ক্ষমা করে দেওয়া হচ্ছে অধিক উত্তম। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَإِنْ تَغْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾

“ক্ষমা করাই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।” [সূরা বাকুরাহ : ২৩৭]

► ব্যক্তির উপর কিসাস গ্রহণের শর্ত:

নিহত ব্যক্তির অভিভাবক চারটি শর্তে কিসাস গ্রহণ করতে পারে:

১. নিহত ব্যক্তি শারঙ্গ দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে: আর তা হলো নিহত ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক এবং বিবেকবান ইওয়া। কেননা ছোটো বাচ্চা, পাগল, জ্বানহীন, ঘুমন্তদের থেকে কিসাস গ্রহণ করা যায় না। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

(رُفِعَ الْقَلْمَنْ عَنْ تَلَاثَةِ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَقِطَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَنْلُغَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يُفْسَقَ)

^{৮৭০} মুসাফির আলাইহি: সহীল বুখারী, হা. ৪২৯৫ ও সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৩৫৪।

^{৮৭১} ইবনু মাজাহ, হা. ২৬২৬ এবং অন্যান্যরা হাসান সানাদে বর্ণনা করেছেন। দেখুন, ইরওয়াউল গালীল ৭/২৫৯ এবং সহীহ ইবনে মাজাহ, হা. ২১২৫।

“তিনি প্রকার লোকের উপর থেকে কলম তুলে রাখা হয়েছে। ১. নিদিত ব্যক্তি, যতক্ষণ না জগত হয়; ২. নাবালেগ শিশু, যতক্ষণ না প্রাণবয়স্ক হয়; ৩. নির্বোধ পাগল, যতক্ষণ না সুস্থ হয়।”^{৮৭২}

কেননা তাদের কোনো সুস্থ বুঝ নেই অথবা তাদের মধ্যে সুস্থ বুঝ না পাওয়া।

২. নিহত ব্যক্তির রক্ত নিষ্পাপ হওয়া: কিসাসকে শরীয়ত সম্মত করা হয়েছে অন্যায়ভাবে রক্তপাতের বদলাস্বরূপ। আর যার রক্ত নির্বর্থক (বৈধ) করা হয়েছে সে মাজলুম (অন্যায় রক্তের) অন্তর্ভুক্ত হবে না। সুতরাং কোনো মুসলিম ব্যক্তি যদি কোনো কাফের সৈনিক বা তাওবা করার আগে কোনো মুরতাদ অথবা বিবাহিত জিনাকারীকে হত্যা করে তাহলে ঐ মুসলিমের উপর কিসাস, দিয়াত গ্রহণ করা হবে না। তবে শাসকের উপর কর্তব্য হলো হত্যাকারী কে তিরস্কার করা।

৩. হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তির মধ্যে সমতা থাকা: তাঁরা উভয়েই স্বাধীন, দ্বীন, দাসত্ব এর ক্ষেত্রে সমান হবে। কেননা কোনো মুসলিম ব্যক্তিকে কাফেরের বদলা স্বরূপ হত্যা করা যাবে না। যদিও মুসলিম ব্যক্তি দাস আর কাফের স্বাধীন হোক না কেন। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: **لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ**

“কাফের বদলা স্বরূপ কোনো মুসলিমকে হত্যা করা হবে না।”^{৮৭৩}

আর কোনো দাসের বদলায় স্বাধীনকে হত্যা করা যাবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾

“স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি এবং দাসের বদলে দাস।”[সূরা বাকুরাহ : ১৭৮]

এটা ব্যতীত অন্যক্ষেত্রে কমবেশি হলে কিসাস গ্রহণে কোনো প্রভাব পড়বে না। কেননা সম্মানিত ব্যক্তিকেও নিম্নমানের ব্যক্তির বদলায় হত্যা করা হবে, নারীর বদলায় পুরুষকেও হত্যা করা হবে এবং পাগল কিংবা নির্বোধের বদলায় সুস্থ ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন: **وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ الْفَقْسَ بِالْتَّفْسِ**

“আমি তাদের উপর তাতে প্রাণের বদলে প্রাণ অত্যাবশ্যক করে দিয়েছিলাম।”[সূরা মায়দাহ : ৪৫]

৪. জন্মসূত্র না হওয়া: নিহত ব্যক্তি যেন হত্যাকারীর সন্তান কিংবা তার নিম্নস্তরের কেউ না হয়। সুতরাং এই কারণে পিতা-মাতার কাউকে হত্যা করা হবে না। যদিও তারা জন্মদানের কারণে উপরের স্তরের হোক বা নিচের স্তরের হোক। কারণ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম বলেছেন:

لَا يُقْتَلُ وَالدُّ بِوَلِدِهِ

“সন্তানের বদলায় পিতাকে হত্যা করা হবে না।”^{৮৭৪}

^{৮৭২} সুন্দর আবু দাউদ, ঘ. ৪৪০১; ইবনু মাজাহ, ঘ. ২০৪১।

^{৮৭৩} সংজ্ঞান বৃদ্ধারী, ঘ. ৬৯১৫।

তবে সন্তানকে পিতা-মাতার বদলা স্বরূপ হত্যা করা হবে। সার্বজনীনভাবে মহান আল্লাহ বলেন:

كِتَبْ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْفَتْنَىٰ

“নিঃতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর কিসাসের বিধিবন্ধ করা হলো।” [সূরা বাকুরাহ : ১৭৮]

► ইসলামী শরীয়তে কিসাস গ্রহণের হিকমাহ:

আল্লাহ তাআলা কিসাসকে শরীয়ত সম্মত করেছেন, জনসাধারণের প্রতি রহমত স্বরূপ; জনগণের রক্তের নিরাপত্তা প্রদান; পরম্পর শত্রুতার ধর্মকস্তুরূপ; অন্য ব্যক্তির প্রতি যুলম করার বিনিময়ে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া, যার ফলে মাজলুমের অভিভাবকদের অন্তর থেকে রাগ দমন হয় অন্যের প্রাণ রক্ষা পায়; আর মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولَئِكُمْ

“হে জনবান ব্যক্তি! কিসাসের বিধানে তোমাদের হায়াত (জীবন) নিশ্চিত হয়েছে।” [সূরা বাকুরাহ : ১৭৯]

► কিসাস গ্রহণের শর্তসমূহ:

কিসাস প্রয়োগের উপযুক্ত হওয়ার শর্তসমূহ যদি পূরণ হয় তবে তিনটি শর্তসাপেক্ষে অপরাধীর উপর তা প্রয়োগ করা যাবে:

১. কিসাস গ্রহণকারী (যিনি দাবিদার) দায়িত্ববান হওয়া (প্রাপ্তবয়স্ক এবং বিবেকবান)। কারণ যদি কিসাসের দাবিদার (অথবা তাদের কেউ) ছোটো অথবা পাগল হয়ে থাকে এবং কিসাস গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের স্থলাভিষিক্ত কেউ না হয়, তাহলে অপরাধীকে শিশুর প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত এবং পাগলের জ্ঞান ফিরে আসা পর্যন্ত আটকে রাখা হবে।

মুয়াবিয়া এটাই করেছেন এবং সম্মানিত সাহাবীগণ তার প্রতি সম্মতি দিয়েছেন। সুতরাং এটা যেন তাদের পক্ষ থেকে সকলের ঐকমত্য।

২. কিসাস দাবিদারের অভিভাবকগণ সকলের কিসাস গ্রহণের উপর একমত হতে হবে। কেউ যেন এই ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ না করে। ফলে যেন অধিকারীর অনুমতি ছাড়াই অধিকার দাবি করা না হয়। বরং কেউ অনুপস্থিত থাকলে তাঁর আগমনের অপেক্ষা করতে হবে, শিশুর প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত, পাগলের জ্ঞান ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর কিসাস দাবিকারীর কেউ মারা গেলে, তাঁর উত্তরাধিকারী তাঁর দায়িত্ব পালন করবে। যদি কিসাস দাবিদারের কেউ ক্ষমা করে দেয় তাহলে কিসাস বাদ হয়ে যাবে।

*^১ দুনানুষ্ঠ তিরমিয়ি, হা. ১৪৩৩, ১৪৩৪; ইবনু মাজাহ, হা. ২৬৬১, ২৬৬২; শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহ ইবনে মাজাহ, হা. ১১৫৬।

۳. اپریلی ہجتیت انہیں پرتو سیماں جھن کرنا ہتے نیراپد ہتے ہوئے । آللہ تا'الا
و بنیان: ﴿فَلَا يُشْرِفُ فِي الْقَتْلِ﴾

“অতঃপর প্রতিশোধের ক্ষেত্রে যেন বাড়াবাড়ি না হয়ে যায়।” [সুরা ইসরাঃ ৩৩]

সুতরাং যদি কখনো গর্ভবতী মহিলার উপর কিসাস প্রয়োজন হয়, তাহলে তার প্রসবের আগ পর্যন্ত তাকে হত্যা করা হবে না। কেননা তাকে হত্যা করার ফলে তার ভূমের উপর সীমালঙ্ঘন করা হবে। তবে যদি তিনি প্রসব করেন এবং সন্তান পালনের দায়িত্ব অন্য কেউ নেন, তাহলে সেই মহিলার ওপর হন্দ কায়েম করা হবে। আর যদি এমন কেউ না পাওয়া যায় তাহলে দুই বছর দুধ পান করানো পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেওয়া হবে। কারণ নাবী  গামিদি নামক এক মহিলার ক্ষেত্রে বলেন:

إِذَا لَا تَرْجُهَا وَنَدَعْ وَلَدَهَا صَغِيرًا كَيْسَ لَهُ مَنْ يُرِضِّعُهُ»، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: إِلَيْ رَضَاعَهُ يَا أَبَيَ اللَّهِ، قَالَ: فَرِجِّعْهَا

“এমন অবস্থায় তার শিশু সন্তানকে রেখে আমি তাকে ‘রজম’ করতে পারি না। কেননা তার শিশু সন্তানকে দুধ পান করানোর মতো কেউ নেই। তখন এক আনসারী সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন: হে আল্লাহর রসূল! আমি তার দুধ পান করানোর দায়িত্ব নিলাম। তখন ওই মহিলাকে পাথর নিষ্কেপ করে হত্যা করার আদেশ করলেন।”^{৮৭৫}

► কিসাসের বিধিমালা:

১. শাসক অথবা তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে কিসাসের বিধান বাস্তবায়ন করা: বিশৃঙ্খলা, নাশকতা, ফিতনা-ফাসাদ প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে শাসক অথবা তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে কিসাসের বিধান বাস্তবায়ন করা হবে। স্বয়ং তিনিই এটি বাস্তবায়ন করবেন এবং অনুমতি দিবেন যাতে করে (কিসাস গ্রহণের ক্ষেত্রে) বাড়াবাড়ি বা নিপীড়ন না হয়ে যায় এবং যাতে করে বিধানটি ইসলামী শরীয়া ভিত্তিক বাস্তবায়ন হয়।

۲. মূল বিষয় অপরাধীদের সাথে অপরাধের শিকার ব্যক্তির সমআচরণ করাঃ কারণ আল্লাহ
তা'আলা বলেন: ﴿وَإِنْ عَاقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَوَّقْبَتُمْ بِهِ﴾

“যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করো, তাহলে ঠিক ততটুকু করবে যতটুকু অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে।” [সুরা নাহল : ১২৬]

४७२ अस्थीट मुसलिम, श. १६९५ ।

নাবী সাল্লাম্বাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ইহুদি ব্যক্তির মাথাকে খেতলিয়ে দিয়েছিলেন যে ইহুদি এক দাসীর মাথাকে দুই পাথরের মাঝখানে রেখে হত্যা করেছিল। যেমনটা দাসীর সাথে করা হয়েছে। অনুরূপভাবে যদি কেউ কোনো ব্যক্তির দুই হাত কেটে হত্যা করে অনুরূপভাবে হত্যাকারীর সাথে তেমনই আচরণ করা হবে।

৩. ধারালো অস্ত্র দ্বারা কিসাস বাস্তবায়ন করাঃ যেমন ছুরি বা তরবারি এবং এই জাতীয় কিছু।
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম বলেছেন:

فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَخْسِنُوا الْقِتْلَةَ

“যদি তোমরা কাউকে হত্যা করো তাহলে উক্ত পদ্ধতিতে হত্যা করো।”^{৮৭৬}

৪. নিহত ব্যক্তির অভিভাবক যদি শারঙ্গ পদ্ধতি অনুসারে উত্তমভাবে কিসাস গ্রহণের স্ফূর্তা রাখেন তাহলে শাসক এক্ষেত্রে তাকে দায়িত্ব দিবেন: আর তা না হলে শাসক তাকে এমন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করতে আদেশ করবেন যিনি উত্তমভাবে কিসাস গ্রহণের সক্ষমতা রাখেন।

দ্বিতীয় প্রকার: ইচ্ছাকৃত হত্যার সাদৃশ্য হত্যা

এমন অস্ত্র দিয়ে কোনো ব্যক্তির উপর আক্রমণ করার ইচ্ছা করা যা দিয়ে অধিকাংশ সময় মানুষ নিহত হয় না, কিন্তু এক্ষেত্রে কেউ মারা গেল। এ ধরনের হত্যাকে আখ্যায়িত করা হয় ইচ্ছাকৃত ভূল হিসেবে। কারণ এ ধরনের হত্যা প্রহার বা আহত করার দিক দিয়ে ইচ্ছাকৃত হত্যার সাথে সাদৃশ্য রাখে এবং আহত করার দিক দিয়ে তা ভুলের সাথেও সাদৃশ্য রাখে। একারণেই ইচ্ছা সাদৃশ্য হত্যার লকুমটি ইচ্ছা এবং ভূলবশত এর মাঝামাঝি। যদিও এক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তিকে শিক্ষা দেওয়া অথবা তাকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

► ইচ্ছা সাদৃশ্য হত্যার ধরন এবং উদাহরণ:

১. (নিহত ব্যক্তিকে) সাধারণত মারা যায় না এমন চাবুক বা সামন্য ছেটো পাথর অথবা ছেটো লাঠি দিয়ে আঘাত করা। অথবা তাকে ঘূষি মারা বা কিল দেওয়া, যাতে সাধারণত মারা যায় না কিন্তু এক্ষেত্রে সে মারা গেল।

କୁଳ ତଥା ହାତେର ଆଙ୍ଗଳ ଏକତ୍ର କରେ ଆଘାତ କରା ।

ক্ষেত্র তথা হাতের আঙ্গুল একত্র করে বুকে আঘাত করা।

४८ नवीन गुप्तलिम, श. ४९४९, फुआ. १९५५।

২. তাকে পানির এমন দিকে বেঁধে ফেলে দেওয়া যেখানে পানি কখনো বাঢ়ে আবার কখনো কমে। কিন্তু তার ক্ষেত্রে হঠাতে পানি বেশি হওয়ায় সে তাতে মারা যায়। অনুরূপভাবে যদি তাকে এমন কম পানি ফেলে দিল যেখানে সাধারণত কেউ ডুবে যায় না কিন্তু সে ডুবে গিয়ে মারা গেল।

৩. বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির পাশে তাঁর অন্যমন্ত্রণা অবস্থায় হঠাতে চিন্তার করার ফলে সে মারা গেল। অথবা বাড়ির ছাদের উপর কোনো শিশু বা জ্ঞানহীন ব্যক্তির কাছে হঠাতে চিন্তার করার কারণে সে ছাদের উপর থেকে পড়ে মারা গেল।

► ইচ্ছা সাদৃশ্য হত্যার বিধান:

১. পরকালীন বিধান: পরকালে হত্যাকারীর জন্য রয়েছে বঞ্চনা, লাঞ্চনা ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। কারণ সে তার কৃতকর্মের দ্বারা নিষ্পাপ ব্যক্তির নিহতের কারণ হয়েছে। তবে তাঁর শাস্তি ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তির তুলনায় কম।

২. ইহকালীন বিধান: হত্যা করার শাস্তিস্বরূপ তাঁর উপর কঠোর রক্ষণাবেক্ষণের বিধান বাস্তবায়ন করা হবে। ইচ্ছাকৃত হত্যার বদলাস্বরূপ তার উপর কিসাস বাস্তবায়ন হবে না। যদিও নিহত ব্যক্তির অভিভাবক তার কিসাস দাবি করে। অপরাধীর সম্পত্তি থেকে কাফফারা আবশ্যিক হবে। আর তা হলো একটি গোলাম আজাদ করা। আর যদি তার সম্মতা না থাকে তাহলে সে ধারাবাহিক দুই মাস সিয়াম পালন করবে। পরিশেৱাধোগ্য তিনি বছর সময়ে হত্যাকারীর উত্তরাধিকারীর উপর নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের জন্য দিয়াত প্রদান নিশ্চিত করা হবে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রযিয়াল্লাহ আনহর হাদীসে রয়েছে, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

عَقْلُ شَيْبِهِ الْعَمَدٍ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمَدِ، وَلَا يُفْتَنُ صَاحِبُهُ

“ইচ্ছা সাদৃশ্য হত্যার ক্ষতিপূরণ যেন ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াতের মতোই কঠোর। কিন্তু এখানে ঘাতককে হত্যা করা যাবে না।”^{৮৭৭}

মুগীরা বিন শুবাহ  এর হাদীস। তিনি বলেন,

ضَرَبَتْ امْرَأَةٌ صَرَّهَا بِعَمُودٍ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى، فَقَتَلَتْهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمُفْتَوَلَةِ
عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ

“এক মহিলা তার সতীনকে ঘরের খুঁটি দ্বারা আঘাত করল। সে ছিল গর্ভবতী মহিলা। (আঘাতকারী মহিলা আঘাত দিয়ে) তাকে মেরে ফেলল। আল্লাহর রসূল  হত্যাকারী মহিলার ওয়ারিশদের উপর নিহত মহিলার হত্যার (দিয়াত) ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ করলেন।”^{৮৭৮}

তৃতীয় প্রকার: ভুলবশত হত্যা:

এমন কাজ করা যা সম্পাদন করা জায়েয়, কিন্তু কাজটি করার ফলে কোনো নিষ্পাপ ব্যক্তি মারা গেল, অথচ ভুলবশত হত্যাকারী ব্যক্তির সেরকম কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।

► ভুলবশত হত্যার প্রকারভেদ:

১. কাজের মাঝে ভুল করা: ঘাতকের জন্য বৈধ এমন কিছু করা ফলে যা নিষ্পাপ ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যেটা তার (ঘাতকের) ইচ্ছা ছিল না। যেমন ঘাতক কোনো শিকারিকে উদ্দেশ্য করে কিছু নিষ্কেপ করল, কিন্তু তা কোনো ব্যক্তিকে আঘাত করল, ফলে সে মারা গেল। অথবা ঘাতক ঘুমন্ত অবস্থায় পার্শ্ব পরিবর্তন করতে গিয়ে অন্য মানুষের উপর পড়ে গেল, ফলে সে মারা গেল।
২. উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে ভুল করা: ধারণা করে বৈধ কিছুকে উদ্দেশ্য করে নিষ্কেপ করা পরবর্তীতে স্পষ্ট হলো যে এটা মানুষ। যেমন যদি সে কোনো কিছুকে নিষ্কেপ করে শিকারি বন্ধু মনে করে, কিন্তু পরবর্তীতে স্পষ্ট হলো যে এটা নিষ্পাপ মানুষ।
৩. হত্যাকারী ছোটো বা পাগল হিসেবে বিবেচিত হওয়া: আর ছোটো বা পাগলের ইচ্ছাটা ভুল হিসেবেই গণ্য হবে। কেননা তাদের কোনো উদ্দেশ্য নেই।

ভুলবশত হত্যার ধরণ হতে পারে: কারণজড়িত মৃত্যু; যেমন কৃপ খনন বা রাস্তায় গর্ত করা, যার কারণে একজন ব্যক্তির প্রাণনাশ হলো।

► ভুলবশত হত্যার বিধান:

১. পরকালীন বিধান: (ঘাতকের উপর) কোনো প্রকার শাস্তি বা গুনাহ নেই। আরাস ৪৩৯ হতে বর্ণিত হাদীসে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْأَرُ عَنْ أُمَّيَّيِّ احْطَأَ، وَالنَّسْيَانَ، وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِ

“আল্লাহ আমার উপরের ভুল, বিস্মৃতি ও বলপূর্বক যা করে নেওয়া হয়, তা ক্ষমা করে দিয়েছেন।”^{৪৩৯}

২. দুনিয়ার বিধান: তিনি বছরের মেয়াদে ঘাতকের উত্তরাধিকার এর উপর (দিয়াত) ক্ষতিপূরণ দেওয়া আবশ্যিক এবং উটের প্রতি শ্রেণি হতে ৫ টি উট কম দেওয়া।

^{৪৩৯} সহীহ মুসলিম, হ্য. ৪২৮৫, ফুআ. ১৬৮২।

^{৪৪০} ইবনু মাজাহ, হ্য. ২০৪৩; বায়হাকী এবং তিনি সহীহ বলেছেন। শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, ইরওয়া, নং ৮২।

আল্লাহ তাআলার বাণী:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطًّا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًّا فَتَحْرِيرُ رَقْبَةِ مُؤْمِنٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصْدِّقُوا﴾

“আর কোনো মুমিন ব্যক্তির জন্য উচিত নয়, সে অন্য কোনো মুমিনকে ভুলবশত ছাড়া অন্য কারণে তাকে হত্যা করবে। আর যে ব্যক্তি ভুলবশত কোনো মুমিনকে হত্যা করে তবে তাকে একটি মুসলমান গোলাম বা দাসী আজাদ করতে হবে এবং নিহত ব্যক্তির বৎসরদের নিকট (দিয়াত) ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তবে যদি তারা ক্ষমা করে দেয়।” [সূরা নিসা : ৯২]

আবু হুরায়রা رض হতে বর্ণিত তিনি বলেন:

فَقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي هَيْثَانَ سَقَطَ مَيْتًا بِغَرْرَةٍ، عَبْدٌ أَوْ أُمَّةٌ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي فَقَى لَهَا بِالْغَرْرَةِ تُوقِنُتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِيَتَّسِعَهَا وَزَوْجَهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا

“বানী লিহয়ান গোত্রের এক মহিলার মৃত অবস্থায় ঝঁপের গর্ভপাত হয়েছিল। আল্লাহর রসূল ﷺ একটি গোলাম বা দাসী প্রদানের ফয়সালা দিলেন। এরপর তিনি যে মহিলাটিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সে মারা গেল। তখন আল্লাহর রসূল ﷺ ফয়সালা দিলেন, তার রেখে যাওয়া সম্পদ তার পুত্রগণ এবং স্বামীর জন্য। আর দিয়াত পাবে তার নিকটতম আতীয়গণ।”^{৮৮০}

► ভুলবশত হত্যাকারীর উপর ক্ষতিপূরণ প্রদানের সাথে কাফ্ফারা আবশ্যিক। নিম্নে উল্লেখ হলো:

১. মুমিন দাসী আজাদ করা: এটা তখন কার্যকর হবে যদি সে আজাদ করার সক্ষমতা রাখে আর শর্ত হলো, আজাদের ক্ষেত্রে দাস বা দাসী ঝটিমুক্ত হতে হবে। আল্লাহর বাণী:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطًّا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًّا فَتَحْرِيرُ رَقْبَةِ مُؤْمِنٍ﴾

“আর কোনো মুমিন ব্যক্তির জন্য উচিত নয়, সে অন্য কোনো মুমিনকে ভুলবশত ছাড়া অন্য কারণে তাকে হত্যা করবে। আর যে ব্যক্তি ভুলবশত কোনো মুমিনকে হত্যা করে তবে তাকে একটি মুসলমান গোলাম বা দাসী আজাদ করতে হবে।” [সূরা নিসা : ৯২]

আর যদি ঘাতক দারিদ্র্য অথবা দাস না পাওয়া যাওয়ার কারণে আজাদ করার সক্ষম না হয় তাহলে সে নিম্নের কাজ করবে।

^{৮৮০} মুত্তাফাকুল আলাইহি: সহীল বুখারী, হা. ৬৭৪০; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৬৮১

২. সক্ষম হলে ধারাবাহিকভাবে দুই মাস সিয়াম পালন করবে: আল্লাহ তাআলার বাণী:

﴿فَمَنْ لَمْ يَجْدُ فَصِيَامُ شَهْرٍ إِنْ مُتَّبِعِينَ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾

“যদি সে (দাস) না পায়, তাহলে ধারাবাহিক ভাবে দুই মাস সিয়াম পালন করবে, যা আল্লাহর পক্ষ হতে তাওবা হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে...।” [সূরা নিসা : ৯২]

অসুস্থ বা বার্ষিকজনিত কারণে সিয়াম পালন করতে অক্ষম হলে তার জিম্মায় কাফ্ফারা অবশিষ্ট থাকবে। এর পরিবর্তে খাবার খাওয়ানো বৈধ হবে না। কেননা আল্লাহ তাআলা তা উল্লেখ করেননি। কাফ্ফারা সংক্রান্ত বিষয়দ দলীলের উপর নির্ভরশীল, কিয়াস এর উপর নয়।

المسألة الرابعة: الجنابة على ما دون النفس

চতুর্থ মাসআলা : কোনো ব্যক্তি প্রাণনাশ ছাড়া অন্য কিছুর উপর নির্যাতন করা তা হলো, ব্যক্তির উপর এমন প্রত্যক আঘাত করা যার ফলে ব্যক্তির প্রাণনাশ হয় না। যেমন যেকোনো ধরনের আঘাত, অঙহানি ইত্যাদি। এই ধরনের অপরাধে কিসাস বাস্তবায়ন করতে হলে কুরআন, হাদীস, ইজমার দলীল আবশ্যিক।

কুরআন থেকে দলীল: আল্লাহ তাআলার বাণী:

﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ السَّقْسَقَ بِالثَّقْسَقِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأنفُ بِالأنفِ وَالْأَذْنُ بِالْأَذْنِ وَالسَّيْنَ بِالسَّيْنِ وَالْجَرْحُ قِصَاصٌ﴾

“নিচয়ই আর আমি তাদের প্রতি রাতে ফরয করেছিলাম যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময় চোখ, নাকের বিনিময় নাক, কানের বিনিময় কান, দাঁতের বিনিময় দাত, (অদ্রপ অন্যান্য) বিশেষ জখমেরও বিনিময় রয়েছে।” [সূরা মায়দাহ : ৪৫]

হাদীস থেকে দলীল: রুবাইয়্যা ^{৮৬৩} কর্তৃক এক দাসীর “সানিয়া” দাঁত ভেঙ্গে দেওয়ার ঘটনায় আল্লাহর রসূল ^{৮৬৪} বলেন: “**كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ**” কুরআনের বিধান হলো কিসাস।”

যদি স্তব হয় তাহলে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটনা ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে আলেমগণ কিসাস আবশ্যিক এর উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

এর তিনি প্রকার:

১. আঘাতজনিত অপরাধ।

^{৮৬৩} মুঢ়ফাকুন আলাইহি: সহীল বুখারী, হা. ৬৮৯৪; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৬৭৫।

২. অঙ্গহনি জনিত অপরাধ।

৩. কোনো অঙ্গের কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দেওয়া।

প্রথম প্রকার: আঘাতজনিত অপরাধ: এটা দুইভাগে বিভক্ত:

প্রথম: মাথা বা চেহারায় আঘাত করা। যেটাকে বলা হয় **الشِّجَاج** তথা ফাটল বা ক্ষত, **شُبْح** এর বহুবচন। মাথায় এক প্রকার ক্ষত।

দ্বিতীয়: সম্পূর্ণ শরীরে আঘাত যেটাকে বলা হয় **حَرْجَلًا** তথা জখম; যা **شُبْح** নয়।

প্রথম ভাগ: মাথা বা চেহারায় আঘাতসমূহ। এটা দশ প্রকার:

১. **الْعَارِصَة** তথা এমন আঘাত যা চামড়াকে ঝলসে দেয়। অর্থাৎ যে আঘাত সামান্য বিদীর্ণ করে, রক্তাঙ্ক করে না। যেমন আঁচড় বা খামচির দাগ। যাকে বলা হয়: **الْقَاشِرَة** এবং **الْمَلِطَاء** তথা আঁচড় কাটা।

২. **الْأَدَمِيَّة** তথা এমন আঘাত যার ফলে আক্রান্ত জায়গাটা রক্তাঙ্ক হয়। ফলে সেখান থেকে হালকা রক্ত বের হয়। তাকে বলা হয় **هَبْزَلًا** এবং **فَعْلَمَة**। এটা চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

৩. **الْبَاضِعَة** তথা এমন আঘাত যা চামড়ার নীচের মাংসকে বিদীর্ণ করে কিন্তু তা হাড় পর্যন্ত পৌঁছায় না। অর্থাৎ অত্যন্ত সূক্ষ্ম আঘাত।

৪. **الْحَلَقَة** তথা এমন আঘাত যা মাংসকে বিদীর্ণ করে, কিন্তু মাংস এবং হাড়ের মাঝখানে যে চামড়া আছে সে পর্যন্ত পৌঁছায় না।

৫. **الْسَّمَاعِقَة** তথা এমন আঘাত যেটা মাথার গোশত ও হাড়ের মাঝের পাতলা চামড়া (অস্থি আবরক ঝিল্লি) পর্যন্ত পৌঁছায়। এই নামেই উক্ত আঘাতের নামকরণ করা হয়েছে।

আর এই পাঁচ প্রকারে কোনো কিসাস অথবা দিয়াত নেই। বরং এক্ষেত্রে হকুমাহ বা সালিমি বৈঠকের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। আর হকুমার পদ্ধতি: অপরাধের শিকার ঝুঁকিকে দাস গণ্য করে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বাবস্থা অনুযায়ী তার একটি মূল্য নির্ধারণ করা, অতঃপর অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পরের অবস্থানুযায়ী একটি মূল্য নির্ধারণ করা। এরপর মূল্য হ্যাসের অনুপাত অনুযায়ী তার উপর একটি দিয়াত ধার্য করতে হবে।

৬. **الْمُوْضِعَة** তথা এমন আঘাত যা অস্থি আবরক ঝিল্লিকে বিদীর্ণ করে হাড়কে বের করে দেয়। এর ক্ষতিপূরণ পাঁচটি উট অর্থাৎ দিয়াতের দশভাগের এক ভাগের অর্ধেক।

৭. **الْمُشَدَّدَة** তথা এমন আঘাত যার ফলে হাড় বের হয়ে যায় এবং ভেঙে যায়। এর ক্ষতিপূরণ দশটি উট।

৮. **فِيْهِنْدِنْ**। তথা এমন আঘাত যার ফলে হাড় একটি স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়। চাই হাড় ভেঙে যাক বা বের হয়ে যাক অথবা কোনোটিই না হয়। এর ক্ষতিপূরণ ১৫টি উট।

৯. **فِيْمُونْتِ**। তথা এমন আঘাত যা সরাসরি মাথার মগজকে বিদীর্ণ করে। অর্থাৎ মস্তিষ্কের পর্দায় আঘাত করে। এটাকে **فَرْسَنْ** বলা হয়। এ অপরাধের ক্ষতিপূরণ হলো পূর্ণ দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ।

১০. **فِيْدَادِمْ**। তথা এমন আঘাত যা মগজের পর্দা বিদীর্ণ করে মস্তিষ্কে পৌঁছে যায়। এর ক্ষতিপূরণ পূর্ণ দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ।

এর সাথে আরও একটি প্রকার সম্পৃক্ত করা যায়, **الجَانِفَة**। তথা এমন আঘাত যা পেটের অভ্যন্তরে পৌঁছে যায়। যা সাধারণত দেখা যায় না। যেমন পেটের, পিঠের, বুকের, কঠনালীতে, মূখ্যথলির ভিতরে আঘাতসমূহ। তবে এধরনের আঘাতকে **الشَّجَاج** বলা হবে না, কেননা তা চেহারা বা মাথায় আঘাত নয়। তারা (ফকীহগণ) এই প্রকারকে এখানে উল্লেখ করেছেন উল্লিখিত প্রকারসমূহের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়। এতে ক্ষতিপূরণ হলো, (বৈধ ব্যক্তি হত্যার পূর্ণ) দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ।

► এসকল আঘাতের দলীলসমূহ:

১. আবু বকর বিন মোহাম্মদ বিন আমর বিন হায়ম, তিনি তার পিতা হতে, তার পিতা তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন। রসূল ﷺ ইয়ামানবাসীর উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখেন, যাতে উল্লেখ ছিল-

وَفِي الْجَانِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسَ عَشَرَةً مِنَ الْإِبْلِ، وَفِي كُلِّ أَصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْكِدْ وَالرَّجْلِ عَشْرَ مِنَ الْإِبْلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبْلِ، وَفِي الْمُوْضِخَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبْلِ

“যে জখম পেটের ভিতর পর্যন্ত পৌঁছে দেয় তাতে রয়েছে এক তৃতীয়াংশ ক্ষতিপূরণ। আর যে জখমে হাড় স্থানচ্যুত হয় তাতে ১৫ টি উট। হাত পায়ের আঙুলে দশটি করে উট। এক দাঁতে পাঁচ উট। আর যে জখমে হাড় দেখা যায় তাতে পাঁচটি উট।”^{৮৮২}

২. যে জখমে হাড় স্থানচ্যুত হয় তাতে ১৫ টি উট ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত হয়েছেন।

৩. যে জখম পেটের ভিতর পর্যন্ত পৌঁছে যায়; তাতে রয়েছে এক তৃতীয়াংশ ক্ষতিপূরণ। এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত হয়েছেন। আমর বিন হাসান এর হাদীসে উল্লিখিত রয়েছে:

^{৮৮২} সুনান নামান্দ ২/২৫২ হ্য. ৪৮৫৩; হাকিম ৩৯৭; বাযহকী ৮/৭৩ এবং এটা সহীহ। দেখুন, ইরওয়াউল গালীল ৭/৩২৬।

وَفِي الْجَاهِنَّمِ تُلْكُ الدَّيْنُ

“যে জখম পেটের ভিতর পর্যন্ত পৌছে যায় তাতে রয়েছে এক তৃতীয়াংশ দিয়াত।”^{৮৮৩}

৪. যায়েদ বিন সাবিত ~~الْأَبْلِ~~ আছারে এসেছে,

أَنَّهُ قُضِيَ فِي الْهَاشِمَةِ عَشْرُ مِنَ الْأَبْلِ، وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَخَالِفٌ

“যে জখমে হাড় ভেঙ্গে যায় তাতে তিনি ১০ টি উট দিয়াত হিসেবে ফয়সালা করেছেন।”^{৮৮৪} কিন্তু কেউ তার বিরোধিতা করেছেন বলে জানা যায়নি।

৫. উপর্যুক্ত আমর বিন হায়মের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে **مُمْوَمْأَتٍ**। তে এক-তৃতীয়াংশ ক্ষতিপূরণ। আর **الْأَمْفَغ** বা মণ্ডিকের পর্দায় আঘাত হলো এমন জখম যা **مُمْوَمْأَتٍ** বা মাথায় আঘাতের থেকে বেশি ক্ষত। তাহলে সেটার দিয়াত হবে **مُمْوَمْأَتٍ**। এর থেকে অধিক তাহলে **الْأَمْفَغ** এর দিয়াত হলো এক-তৃতীয়াংশ।

উল্লিখিত আঘাতসমূহের ক্ষেত্র শুধুমাত্রে **الموضحة** আঘাত ছাড়া অন্য কোনো প্রকার আঘাতে কিসাস আবশ্যিক হবে না। কারণ এই আঘাতের ধরন এবং অনুরূপ বদলা গ্রহণ সহজ হয় বলে। আর এ ছাড়া অন্য আঘাতসমূহের ক্ষেত্রে আঘাত কম বা বেশি নির্ণয় করা এবং এক্ষেত্রে অনুরূপ বদলা নেওয়া কঠিন।

দ্বিতীয় ভাগ : সম্পূর্ণ শরীরে আঘাত:

এধরনের আঘাত বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। মাথা কিংবা চেহারার যে সকল আঘাতে কিসাস নেই, ঠিক একইভাবে শরীরেও একই ধরনের আঘাতে কিসাস নেই। তবে **الموضحة** তথা যে আঘাতে শরীরের কোনো অংশ কেটে যায়; যেমন বুক অথবা ঘাড়, এসবের ক্ষেত্রে কিসাস প্রযোজ্য হবে।

দ্বিতীয় প্রকার: অঙ্গহানি করা:

এ ধরনের অপরাধ তিনভাগে বিভক্ত:

১. ইচ্ছাকৃত ২. ইচ্ছা সাদৃশ্য ৩. ভুলবশত।

ইচ্ছা সাদৃশ্য এবং ভুলবশত অপরাধের ক্ষেত্রে কিসাস আবশ্যিক হবে না। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে অপরাধ করলে (যেমন হত্যা করা) তাহলে তিনটি শর্তে কিসাস আবশ্যিক হবে:

^{৮৮৩} সুনান নাসাই ২/২৫২ হ্য, ৪৮৫৩; হাকিম ৩৯৭; বায়হাকী ৮/৭৩ এবং এটা সহীহ। দেখুন, ইরওয়াউল গালীল ৭/৩২৬।

^{৮৮৪} আব্দুর রাজ্জাক তার কিতাবের: ১/৩১৪; বায়হাকী: ৮/৭২।

১. কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি ব্যতীত বদলা নেওয়া স্তব হওয়া। শরীরের কোনো জোড়ায় কেটে যাওয়া অথবা এমনভাবে কেটে যাওয়া যার সীমা জোড়া পর্যন্ত পৌঁছায়; যেমন আংগুল, কঞ্চির হাড়, কনুই ইত্যাদি। সুতরাং এমন আঘাত সমূহের কিসাস নেই যার কোনো শেষ সীমা নেই। যেমন ঝঁঝঁজ্বা। তথা পেটে আঘাত এবং দাঁত ছাড়া কোনো হাড় (যেমন, উরু, বাহু, পায়ের নলা) ভেঙ্গে যাওয়াতে কিসাস নেই।

২. নাম এবং স্থানের দিক দিয়ে অপরাধী এবং অপরাধের শিকার উভয়ের অঙ্গের মাঝে সমতা হওয়া। সুতরাং ডান হাতের বদলায় বাম হাত, কনিষ্ঠার বদলায় অনামিকা গ্রহণ করা হবে না এবং মূল অঙ্গের বদলায় বর্ধিত অঙ্গও কিসাস হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না।

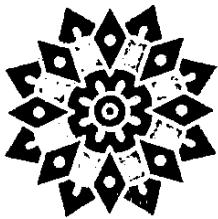
৩. পূর্ণতা এবং সুস্থতার দিক দিয়ে অপরাধী এবং অপরাধের শিকার উভয়ের অঙ্গ সমান হওয়া। সুস্থ অঙ্গের বদলায় অবশ বা অসাড় এবং অর্ধেক আঙুলের বদলায় পূর্ণ আঙুল কিসাস হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না।

তৃতীয় প্রকার: কোনো অঙ্গ অকেজো করে দেওয়া

ঘাতক যদি কোনো অঙ্গকে অবশ করে দেয় তাহলে আঘাতের উপর কিসাস আবশ্যিক হবে না। এর কারণ হলো যুলমের স্তৱাবনা ছাড়া তার উপর বদলা নেওয়া অস্তব। এক্ষেত্রে ঘাতকের উপর পূর্ণ দিয়াত আব্যশিক। আর যদি আঘাতের ফলে অঙ্গের কার্যক্ষমতা কমে যায় (পুরোপুরি নষ্ট না হয়ে) এবং যদি ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা স্তব হয় তবে যতটুকু কার্যক্ষমতা হারিয়েছে ততটুকু দিয়াত ওয়াজিব; যেমন - নষ্টের পরিমাণ যদি অর্ধেক কিংবা এক-চতুর্থাংশ হয় তবে অর্ধ দিয়াত অথবা পূর্ণ দিয়াতের এক-চতুর্থাংশ দিতে হবে। এভাবেই হিসাব করা হবে। তবে যদি কার্যক্ষমতা হ্রাসের পরিমাণ নির্ণয় করা স্তব না হয়, তখন সালিসি বৈঠকের মাধ্যমে শাসক ইজতিহাদ করে দিয়াত নির্ধারণ করবেন, এটাই ওয়াজিব।

মানবদেহের কার্যক্ষমতা হারিয়ে যাওয়ার কিছু উল্লেখযোগ্য উদাহরণ নিম্নরূপ:

বুদ্ধি লোপ পাওয়া, শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যাওয়া, স্বাণশক্তি চলে যাওয়া, বাকশক্তি, কঠস্বর ও মুখের স্বাদ হারিয়ে যাওয়া, চর্বণশক্তি ও বীর্যপাতের হ্রাস ঘটা, প্রজনন ক্ষমতা বিলুপ্ত হওয়া ইত্যাদি।



الباب الثاني: في الديات

د্বিতীয় অনুচ্ছেদ: রক্তমূল্য বা হত্যাকারীর উপর ধার্য ক্ষতিপূরণ

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: تَعْرِيفُهَا প্রথম মাসআলা: তার পরিচয়

শান্তিক অর্থ: شَكْرٌ أَوْ دِيَّةٌ دِيَّةُ الدِّيَّةِ: শব্দটি আরবী বাক্যরীতি থেকে গৃহীত। কেউ যখন দিয়াত আদায় করে তখন এই কথাটি ব্যবহার করা হয়। دِيَّاتُ الدِّيَّةِ: শব্দটির বহুবচন।

পরিভাষায়:

هي المال المؤدى للمجنى عليه أو لوليه بسبب الجناية.
“অপরাধের শিকার ব্যক্তি বা তার পরিবারকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রদানকৃত সম্পদকে দিয়াত বলে।”

عقل - عقل - বা 'বন্ধন' নামকরণ: যেহেতু হত্যাকারী তার অপরাধের শান্তি স্বরূপ নির্ধারিত সংখ্যক উট সংগ্রহ করে সেগুলো নিহত ব্যক্তির পরিবারের বাড়ির আঙিনায় বেঁধে রেখে আসে, একারণে দিয়াতকে উট - বা বন্ধনও বলে।

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: مَشْرُوعِيهَا، وَدَلِيلُ ذَلِكَ، وَالْحِكْمَةُ مِنْهَا

দ্বিতীয় মাসআলা: দিয়াত শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল এবং হিকমাহ

১. শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল: কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা' দ্বারা দিয়াত প্রমাণিত।

কুরআন থেকে দলীল: মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا حَطَّاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾

“আর যে ব্যক্তি ভুলবশত কোনো মুমিনকে হত্যা করবে, সে একটি মুমিন দাস মুক্ত করবে এবং মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিবে।” [সুরা নিসা : ৯২]

সুন্নাহ থেকে দলীল: পূর্বেক্ষ আবু হুরায়রা رض এর হাদীসে রয়েছে,

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتْلٌ فَهُوَ بَخْرُ النَّظَرِينِ: إِمَّا أَنْ يُقْتَلُ، وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى

”যার কোনো আত্মীয় নিহত হয়েছে তার দুটি ব্যবস্থার যে-কোনো একটি গ্রহণের অধিকার রয়েছে। হয় রক্তপণ গ্রহণ করবে নতুনা কিসাস স্বরূপ হত্যাকারীকে হত্যা করতে হবে।”^{৮৫}

নাবী ﷺ-কর্তৃক আমর বিন হাযমের কাছে প্রেরিত চিঠিতেও একই কথা রয়েছে। সেখানে দিয়াতের পরিমাণ বলে দেওয়া আছে।

সকল আলেম দিয়াত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একমত।

২. দিয়াত শরীয়ত-সন্নত হওয়ার হিকমাহ: ব্যক্তিসন্তাকে রক্ষা করা, নির্দোষ ব্যক্তির রক্ত প্রবাহে বাধা দেওয়া, মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা থেকে সতর্ক করা।

الْمَسْأَلَةُ التَّالِيَةُ: عَلَى مَنْ تَجْبُ الدِّيَةُ؟ وَمَنْ يَتَحْمِلُهَا؟

তৃতীয় মাসআলা: কাদের উপর দিয়াত ওয়াজিব এবং কে এর দায়ভার গ্রহণ করবে?

হত্যাকারী বা শারীরিক ক্ষতি সাধনকারী ব্যক্তি দুটি বিষয়ের যে-কোনো একটি থেকে মুক্ত নয়:

১. যদি সে অপরাধটি স্বেচ্ছায় সম্পাদন করে থাকে এবং এর কারণে যদি কেউ মারা যায়, অতঃপর যদি নিহত ব্যক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং কিসাস রহিত হয়ে যায়, তবে দিয়াত বা রক্তমূল্য বা ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ পরিশোধের ক্ষেত্রে স্বয়ং সে-ই দায়বদ্ধ থাকবে, অন্য কেউ নয়। কেননা ক্ষতির বদলা তার কর্তার উপরই বর্তাবে। আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَا تَزِرُّ وَازِرٌ وِزْرًاٰ خَرَىٰ﴾

”কোনো বোকা বহনকারী অন্যের বোকা বহন করবে না।” [সূরা আন'আম: ১৬৪]

২. পক্ষান্তরে, যদি সে ভুলবশত অথবা ইচ্ছাকৃত ও ভূলের মাঝামাঝি অবস্থায় অপরাধ সংঘটিত করে, তবে তার দিয়াতের দায়ভার তার নিকট আত্মায়ের উপর বর্তাবে। আবু হুরায়রা رض থেকে বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে। তিনি বলেন,

فَصَّرَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِّنْ بَنِي لَهْيَانَ سَقَطَ مَيْتًا بِغُرْرَةٍ، عَنْدَهُ أُوْمَةٌ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي فَصَّرَّفَهَا بِالْغُرْرَةِ ثُوُقِيَّتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِيَتَبَعَّهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَيْهَا

^{৮৫} মুতাফাকুন আলাইহি: সহীত বুখারী, হা. ৪২৯৫ ও সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৩৫৪।

“বানী লিহয়ান গোত্রের এক মহিলার গর্ভের সন্তান মৃত অবস্থায় পতিত হয়েছিল। আল্লাহর রসূল ﷺ একটি গোলাম বা দাসী প্রদানের ফয়সালা দিলেন। এরপর তিনি যে মহিলাটিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সে মারা গেল। তখন আল্লাহর রসূল ﷺ ফয়সালা দিলেন, তার রেখে যাওয়া সম্পদ তার পুত্রগণ এবং স্বামীর জন্য। আর দিয়াত পাবে তার নিকটতম আত্মীয়গণ।”^{৮৮৬}

অতএব, তার দিয়াত মূলত তার আত্মীয়দের উপর বর্তাবে। কারণ ভুলবশত অপরাধগুলোর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অপরাধীর কিছুই করার থাকে না। সুতরাং এধরনের অপরাধীদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাদের বোকা হালকা করা একান্ত কর্তব্য। তবে ইচ্ছাকৃত অপরাধীর বিষয়টি ভিন্ন। সে এক্ষেত্রে নিজের অপরাধের মুক্তিপথ হিসেবে নিজেই দিয়াত পরিশোধ করবে। কারণ ইতৎপূর্বে সে কিসাসের উপযুক্ত ছিল। মাজলুম পরিবারের পক্ষ থেকে ক্ষমা পাওয়ার পর তাকে দিয়াতের ভার বহন করতে হচ্ছে।

المسألة الرابعة: أنواع الديات ومقاديرها চতুর্থ মাসআলা: দিয়াতের প্রকারভেদ ও পরিমাণ

১. দিয়াতের প্রকারসমূহ:

ক্ষতিপূরণ পরিশোধের ক্ষেত্রে মূল প্রাণী হলো উট। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

فِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةُ إِلَيْلٍ ...

“একটি মুমিন প্রাণের বিনিময়ে ১০০টি উট দিয়াত দিতে হবে...।”^{৮৮৭}

অন্য হাদীসে নাবী ﷺ বলেছেন:

أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَلِ شَبِيهُ الْعَمِدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطَرِ وَالْعَصَمِ، مِائَةُ إِلَيْلٍ

“মনে রাখবে, যে ব্যক্তি ভুলবশত হত্যার শিকার হবে যা ইচ্ছাকৃত হত্যার মতো হত্যা; ছড়ি বা লাঠির আঘাতে হত্যা-এরাপ হত্যার জন্য দিয়াত একশত উট।”^{৮৮৮}

আমর বিন শুয়াইব তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَهَانَ مِائَةُ دِينَارٍ أَوْ تَهَانَةً لِآلَافِ دِرْهَمٍ... فَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمُرُ، فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: أَلَا إِنَّ الْإِلَيْلَ قَدْ غَلَّتْ، قَالَ: فَقَرَضَهَا عُمُرُ عَلَى أَهْلِ

^{৮৮৬} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৬৭৪০; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৬৮১।

^{৮৮৭} নাসাই, হা. ৪৮৫৭; শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহহন নাসাই, হা. ৪৫১৩।

^{৮৮৮} নাসাই, হা. ৪৭৯১; শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহহন নাসাই, হা. ৪৪৬০।

وَعَلَى أَقْلَى الْخُلُلِ مِائَتِي حُلَةٌ

“ରୁଷଗୁରୁଙ୍କ-ଏର ଯୁଗେ ମୁଦ୍ରାର ଦିଯାତ ଛିଲ ଆଟଶୋ ଦିନାର ଅଥବା ଆଟ ହାଜାର ଦିରହାମ..... । ଦିଯାତେର ଏ ପରିମାଣ ‘ଉମାର ଅନନ୍ତ’-ଏର ଖଲୀଫାହ ନିର୍ବଚିତ ହେଁଯାର ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର ଛିଲ । ଖଲୀଫାହ ହେଁସ ତିନି ଭାଷଣଦାନକାଳେ ବଲେନ, ଉଟେର ଦାମ ବେଡ଼େଛେ । ବର୍ଣନାକାରୀ ବଲେନ, ଅତଃପର ଉମାର ଅନନ୍ତ ଦିଯାତେର ପରିମାଣ ନିର୍ଧାରଣ କରଲେନ: ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣର ମାଲିକଦେର ଜନ୍ୟ ଏକ ହାଜାର ଦିନାର, ରୌପ୍ୟେର ମାଲିକଦେର ଜନ୍ୟ ବାରୋ ହାଜାର ଦିରହାମ, ଗାଭୀର ମାଲିକଦେର ଜନ୍ୟ ଦୁଇଶୋ ଗାଭୀ, ଛାଗଲେର ମାଲିକଦେର ଜନ୍ୟ ଦୁଇ ହାଜାର ଛାଗଲ ଓ କାପଡ଼େର ମାଲିକ ବା ବ୍ୟବସାୟୀଦେର ଜନ୍ୟ ଦୁଇଶୋ ଜୋଡ଼ା କାପଡ଼ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରଲେନ ।”^{୮୮୯}

এর মাধ্যমে দিয়াতের আসল উটের বিষয়টি প্রমাণিত হলো। এছাড়া অন্যান্য যা কিছু উল্লেখ করা হলো তা বস্তুর মূল্যমান হিসেবে বিবেচনা করা হবে। অসংখ্য সাহাবীর উপস্থিতিতে উমার সাল্লাল্লাহু আলেক্সান্দ্রো এমনটি করেছিলেন; কেউ তার বিরোধিতা করেছেন বলেও কোনো প্রমাণ নেই। অতএব, ‘মূল্য দ্বারা দিয়াত পরিশোধের’ বিষয়টির ওপর ‘ইজমা সংঘটিত হলো। সুতরাং উট অথবা উল্লিখিত বস্তুগুলোর সমমূল্য দিয়ে দিয়াত পরিশোধ করা যাবে।

২. দিয়াতের পরিমাণ:

➤ স্বাধীন মুসলিমের দিয়াত: ১০০টি উট। এক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত ও ইচ্ছাকৃত হত্যার সদৃশ হত্যার ক্ষেত্রে বিষয়টিকে শরীয়ত-কর্তৃক কঠিন করা হয়েছে। ফলে, ১০০টি উট প্রদান করতে হবে; তন্মধ্যে ৪০টি উটের পেটে বাচ্চা থাকতে হবে। উপরিউক্ত আমর বিন শুয়াইব তার পিতা থেকে, তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনাকৃত হাদীসের আলোচনা গত হয়েছে। তাতে রয়েছে: وَأَرْبَعُونَ حَلْفَةً বা চল্লিশটি গর্ভবতী উটনী।

➤ স্বাধীন আহলে কিতাবের দিয়াত: স্বাধীন মুসলিমের অর্ধেক; চাই সে যিন্নী হোক বা না হোক। এব্যাপারে আমর বিন শুয়াইব তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন: **عَقْلُ أَهْلِ الدِّيْنِ نِصْفٌ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ**

“যিন্হিদের দিয়াত মুসলিমের দিয়াতের অর্ধেক।”^{৮৫০}

دِيَةُ الْمُعَاہِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ: অন্য শব্দেও এসেছে:

“যিন্হিদের দিয়াত মুসলিমের দিয়াতের অর্ধেক।”^{৬১১}

८६२ शुनान आबू दाउद, ह्य. ४५४२; शाईथ आलवानी हासान वलेहेन, इराओया २२४७।

ନାସାଙ୍ଗ, ହୀ, ୪୮୦୬; ଇମାମ ଆଲବାନୀ ହାସାନ ବଲେଛେନ, ଇରାଓୟାଉ୍ଲ ଗାଲିଲ, ନଂ ୨୨୫୧।

➤ মহিলার দিয়াত: স্বাধীন পুরুষের দিয়াতের অর্ধেক। এ বিষয়ে আমর বিন হায়ম এর কাছে পাঠানো চিঠিতে রয়েছে,

“মহিলার দিয়াত পুরুষের দিয়াতের অর্ধেক।”

ইবনু আব্দুল বার এবং ইবনুল মুনয়ির এব্যাপারে আলেমদের ঐকমত্য হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন।

➤ মাজুসী বা অগ্নিপুজকদের দিয়াত: স্বাধীন মাজুসী ব্যক্তি যিন্হী, চুক্তিভুক্ত কিংবা ইত্যাদি যে-কোনো পর্যায়েরই হোক না কেন, তাকে ৮০০ দিরহাম সমপরিমাণ দিয়াত শুনতে হবে। মৃত্তিপুজকদের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে উকবা বিন আমির رض কর্তৃক একটি মারফু হাদীসে রয়েছে:

“অগ্নিপুজারী ব্যক্তির দিয়াত ৮০০ দিরহাম।”

➤ অগ্নি-পূজারিগী, আহলে কিতাবের স্ত্রী এবং মৃত্তি-পূজারিগীর দিয়াত: মুসলিম রমণীদের দিয়াত যেভাবে তাদের পুরুষের অর্ধেক, তেমনিভাবে এ ধরনের নারীদের দিয়াতও তাদের পুরুষের অর্ধেক। এর স্বপক্ষে আমর বিন শুয়াইব رض এর হাদীস চলে গেছে;

عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ

“আহলে কিতাবদের দিয়াত মুসলমানদের দিয়াতের অর্ধেক।”

➤ ভূগের দিয়াত: মাকে কষ্ট দেওয়ার কারণে (ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়) যদি ভূগটি মৃত অবস্থায় পড়ে যায় তবে তার দিয়াত হলো একজন দাস অথবা দাসী আজাদ করা। আবু হুরায়রা رض থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

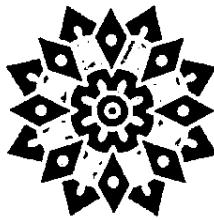
قصَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرأَةٍ مِّنْ بَنِي حَيَّانَ سَقَطَ مِنْتَاهِي بُرْغَةٍ، عَبْدٌ أَوْ أَمْرَأٌ.

“বানী লিহয়ান গোত্রের এক মহিলার গর্ভপাত হয়েছিল মৃত অবস্থায়। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম একটি গোলাম বা দাসী প্রদানের ফয়সালা দিলেন।”^{১১২}

আর এক্ষেত্রে তার দিয়াতের পরিমাণ মায়ের দিয়াতের পরিমাণের দশ ভাগের একভাগ; অর্থাৎ পাঁচটি উট। এক্ষেত্রে মা উক্ত দাসটিকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করবে; বিষয়টি এমন যেন সে (সন্তানটি) জীবিত অবস্থায় পড়েছে।

^{১১১} মুসলিম আওসাত, হ্য. ৭৫৮২।

^{১১২} মুসলিম আওসাত: সহীহল বুখারী, হ্য. ৬৭৪০; সহীহ মুসলিম, হ্য. ফুআ. ১৬৮১।



الباب الثالث: في القسامه

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المقالة الأولى: تعريفها، وحكمها، وحكمتها

প্রথম মাসআলা: مسلمان এর পরিচয়, হৃকুম ও তা প্রণয়নের তাৎপর্য

১. القسامة এর পরিচয়:

শান্দিক অর্থ: আরবদের কথা **إِقْسَامٌ** وقسماً একসম যুক্তি থেকে নেওয়া হয়েছে। অর্থ সে সদচতুর্ভাবে কসম করেছে।

هي الأيمان المكررة في دعوى القتيل المعصوم:

“ନିର୍ବିପର୍ଯ୍ୟାଧ ସାଙ୍ଗିକେ ହତୋ କରାଯି ଦାବିର କ୍ଷେତ୍ରେ ପନ୍ଥାବତ୍ତି ଶପଥ କରା ।”

মাসমাহ) নামে নামকরণ: শপথগুলো মৃত ব্যক্তির অভিভাবকদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হয়। ফলে তারা পঞ্চাশবার শপথ করে বলে যে, দাবিকত বাস্তিই তাদের লোককে হত্যা করেছে।

এটার পদ্ধতি: একজন নিহত ব্যক্তিকে পাওয়া গেল, কিন্তু তাকে কে হত্যা করেছে সেটা জানা গেল না। তখন একদল লোক কসম করবে ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে যে ব্যক্তি/যারা তাকে হত্যা করার স্বত্ত্বাবনা রাখে। এটা তখন হবে যখন আগত শর্তগুলো পূর্ণ হবে।

২. কুসামার বৈধতা: میس (কুসামাহ) শরীয়তসম্মত। এর মাধ্যমে কুসাস ও দিয়াত সাব্যস্ত হবে। যখন দাবির স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ ও স্বীকৃত পাওয়া না যাবে। সেই সাথে যখন اللوث (লাউছ) পাওয়া যাবে। অর্থাৎ হত্যাকৃত ব্যক্তি ও যাকে হত্যাকারী সব্যেষ্ট করা হচ্ছে তাদের মাঝে যখন প্রকাশ্য শক্তি থাকবে। যেমন কোনো গোত্র অন্য কোনো গোত্রের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাচ্ছে। তবে এটাও বলা হয়েছে যে, এটা শুধুমাত্র এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নয়, বরং দাবির স্বপক্ষে সত্ত্ববনাময় যতগুলো প্রমাণ পাওয়া যাবে। সবগুলোই এটার অন্তর্ভুক্ত হবে।

শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল: সাহল বিন আবী হাত্মাহ رض-এর হাদীস।

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحِيَّصَةً خَرَجَا إِلَى خَيْرٍ مِنْ جَهَدِ أَصَابُوهُمْ فَأَتَى مُحِيَّصَةً فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهُ قَاتِلُتُمُوهُ، قَالُوا: وَاللَّهِ مَا قَاتَلْنَاهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدَمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخْوَهُ حُوَيْصَةً - وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ - وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ. ... فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِحُوَيْصَةَ وَمُحِيَّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَتَخْلِفُونَ وَتَسْتَحْقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟

রবি روایة: تأثونَ بِالْبَيْتَةِ. قَالُوا: مَا لَنَا بِيَتْتَهُ. قَالَ: أَتَخْلِفُونَ؟ قَالُوا: وَكَيْفَ تَخْلِفُ وَلَمْ تَشَهِّدْ وَلَمْ تَرِ؟ قَالَ: فَتَخْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟ قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ، فَوَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ نَاقَةً حَتَّى أُذْخِلَتْ عَلَيْهِمِ الدَّارَ، قَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضْتَنِي مِنْهَا نَاقَةً حَمَراءً.

“আব্দুল্লাহ বিন সাহল ও মুহাইস্বাহ বিন মাসউদ رض দুর্ভিক্ষে খায়বারে যান। অতঃপর মুহাইয়াসা তাদের নিকট ফিরে এসে সংবাদ দিলো যে, আব্দুল্লাহ ইবনু সাহল رض-কে হত্যা করে গর্তে বা কৃপে নিষ্কেপ করা হয়েছে। তখন তিনি ইহুদিদের কাছে এসে বললেন যে, আল্লাহর শপথ! তোমরাই তাকে হত্যা করেছ। তখন তারা বলল: আল্লাহর শপথ, আমরা তাকে হত্যা করিনি। এরপর নিজের গোত্রের নিকট এসে সে ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। পরিশেষে তিনি ও তার বড়ো ভাই হ্যাইসাহ ও আব্দুর রহমান ইবনে সাহল নাবী رض এর নিকট আগমন করলেন।.... অতঃপর আল্লাহর রসূল صلی الله علیه و آله و سلم হ্যাইসাহ, মুহাইসাহ ও আব্দুর রহমানকে লক্ষ্য করে বললেন: তোমরা কি শপথ করবে এবং তোমাদের সাথীর রক্তপণ আদায়ের হকদার হবে?

অন্য বর্ণনায় রয়েছে: তোমরা প্রমাণ নিয়ে আসো। তারা বললেন: আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই। তিনি বললেন: তবে কি তোমরা শপথ করবে? তখন তারা বলল: আমরা কীভাবে শপথ করব? অথচ আমরা উপস্থিত ছিলাম না এবং প্রত্যক্ষও করিনি? তিনি বললেন: তবে ইহুদিরা তোমাদের বিকৃক্তে শপথ করবে? তখন তারা বলল: তারা তো মুসলিম নয়। তখন আল্লাহর রসূল صلی الله علیه و آله و سلم তার নিজের পক্ষ থেকে রক্তপণ আদায় করে দিলেন। রাসূল صلی الله علیه و آله و سلم তাদের একশত উটনী প্রদান করেন এবং ঐগুলো তাদের বাড়িতে পৌছিয়ে দেওয়া হয়। সাহল বলেন: ঐগুলোর মধ্য হতে একটি লাল উটনী আমাকে পদাঘাত করেছিল।”^{৮৯৩}

অত হাদীসটি কুসামাহ (الْفَسَادُ) শরীয়ত সম্মত হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করে। আর এটা ইসলামের মূলনীতিগুলোর অন্যতম একটি স্বতন্ত্র মূলনীতি।

^{৮৯৩} মুত্তাফিকুন আলাইহি: সংযুক্ত বুখারী, হা. ৬৮৯৮, ৬৮৯৯, ৭১৯২; সহীহ মুসলিম, হা. ৪২৩৪-৪২৪১, ফুআ. ১৬৬৯।

৩. কুসামার হিকমাহ বা তাৎপর্য:

ରଙ୍ଗ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ରଙ୍ଗମୂଲ୍ୟ ଯାତେ ବୃଥା ନା ଯାଇ ଦେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୁଳାମାର ବିଧାନ ପ୍ରଗଟନ କରା ହେବେ । କାରଣ ଇସଲାମୀ ଶରୀଯତ ମାନବଜୀବନ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଅବୈଧ ରଙ୍ଗପାତ ବନ୍ଦେର ପ୍ରତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରେଛେ । ଯଥନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଅଧିକହାରେ ସଂଘଟିତ ହେଯ, ତଥନ ସାକ୍ଷୀର ସଂଖ୍ୟା ଶ୍ଵାଭାବିକଭାବେ ଖୁବ କମ ଥାକେ । କାରଣ ହତ୍ୟାକାରୀ ସର୍ବଦା ନିର୍ଜନତାନେ ହତ୍ୟା କରାର ସୁଯୋଗ ଖେଁଜେ । ଆର ଏ କାରଣେଇ କୁଳାମାର ବିଧାନ ପ୍ରଗଟନ କରା ହେବେ, ଯାତେ କରେ ରଙ୍ଗ ସଂରକ୍ଷଣ କରା ଯାଇ ।

المُسَأَّلَةُ الثَّانِيَّةُ: شُرُوطُ الْقِسَامَةِ

দ্বিতীয় মাসআলা: কৃসামার শর্তসমূহ

১. এ ক্ষেত্রে লুট বিদ্যামান থাকতে হবে অর্থাৎ নিহত ব্যক্তি ও হত্যায় অভিযুক্ত উভয় ব্যক্তির মাঝে প্রকাশ্য শক্তি থাকতে হবে। পূর্বে এর অর্থ আলোচনা হয়েছে।
 ২. হত্যায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শরীয়ত কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত হতে হবে। অতএব শিশু ও পাগলকে হত্যার অভিযুক্ত করা সঠিক হবে না।
 ৩. তেমনিভাবে অভিযুক্তকারী ব্যক্তিকেও শরীয়ত কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত হতে হবে। অতএব শিশু ও পাগলেল অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে না।
 ৪. হত্যায় অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দিষ্ট থাকবে হবে। অতএব, অনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না।
 ৫. হত্যায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করার সক্ষমতা থাকতে হবে। অতএব ব্যক্তি যদি ঘটনার স্থান হতে দূরে থাকার কারণে তাকে হত্যা করা সম্ভব না হয়, তবে এ দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না।
 ৬. অভিযোগকারী ব্যক্তির দাবি পরম্পর বিরোধী হবে না।
 ৭. কুসামার দাবি পুর্খানুপূর্খ ও বিস্তারিত হতে হবে। সুতরাং এভাবে বলতে হবে যে, এ ব্যক্তি আমার অভিভাবক/আত্মীয়-স্বজন অমুক বিন অমুককে ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বা ভুল করে হত্যা করেছে এবং হত্যা করার পদ্ধতি সে বর্ণনা করবে।

المسألة الثالثة: صفة القسام তৃতীয় মাসআলা: ক্ষাসামার পদ্ধতি

যখন কুসামার শর্তগুলো পূরণ হয়ে যাবে তখন প্রথমে হত্যার অভিযোগকারীদেরকে ডাকা হবে, পঞ্চাশ বার শপথ করতে বলা হবে। নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারের স্তর অনুযায়ী তাদের মাঝে এই ৫০টি শপথ বষ্টন করে দেওয়া হবে। শপথ করে বলবে যে, উমুক ব্যক্তিই তাকে হত্যা

করেছে। আর এটা হবে হত্যার অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে। পূর্ববর্তী ইবনু আবী হাচমার হাদীসে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন: أَفْتَسْتَحْقُونَ الدِّيَةِ بِأَنَّكُمْ

“তোমরা পঞ্চাশ বার শপথ করে রক্তপণ আদায়ের হকদার হবে কী?”^{৮৯৪}

মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসরা যদি শপথ করতে অথবা পঞ্চাশ বার শপথ পূর্ণ করতে অস্থীকৃতি জানায়, তবে হত্যায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পঞ্চাশ বার শপথ করতে বলা হবে; যদি অভিযুক্তকারীরা এতে সন্তুষ্ট থাকে। পূর্ববর্তী হাদীসে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

فَتَخْلِفُ لَكُمْ يَوْمَ قَاتُلُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ

“তবে ইহুদিরা তোমাদের বিরুদ্ধে শপথ করবে কী? তারা বলল: তারা তো মুসলিম নয়।”^{৮৯৫}

তারা তাদের শপথে সন্তুষ্ট ছিল না। তবে তারা যদি শপথ করে তবে তারা মুক্তপণ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি অভিযুক্তকারীরা শপথে সন্তুষ্ট না থাকে তবে রাষ্ট্রের নেতা বায়তুল মাল হতে তার রক্তপণ পরিশোধ করবেন যেমনটি আল্লাহর রসূল ﷺ করেছেন। আনসারীরা ইহুদিদের শপথ গ্রহণ করতে অস্থীকৃতি জানালে তিনি রায়তুল মাল থেকে রক্তপণ আদায় করে ছিলেন। কেননা অভিযোগকারীদের থেকে রক্তপণ আদায়ের কোনো পথই আর থাকে না। সুতরাং, বায়তুল মাল থেকে রক্তপণ আদায় করা আবশ্যিক, যাতে করে নিরাপরাধ ব্যক্তির রক্ত মূল্যহীন হয়ে না যায়।

আর যে ব্যক্তি মানুষের ভীড়ের মাঝে মারা যাবে, তার দিয়াত/মুক্তিপণ বায়তুল মাল হতে আদায় করা হবে। এ ব্যাপারে আলী رضي الله عنه হতে একটি আসার বর্ণিত রয়েছে।

أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِجْلِ قَتْلٍ فِي زَحَامِ النَّاسِ بِعْرَفَةَ: (إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُطْلِلُ دَمًّا إِنْ رَأَى مُسْلِمًا، إِنَّ

علمَتْ قاتِلَهُ، وَإِلَّا فَأَعْطِ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ)

“একজন ব্যক্তি আরাফার ভীড়ে মারা গেলে তিনি উমার رضي الله عنه কে বলেন: হে আমীরুল মুমীনিন, মুসলিমের রক্ত অনর্থক বৃথা যাওয়ার নয়। যদি পারেন তবে তার হত্যাকারীকে আপনি খুঁজে বের করুন, নয়তো বায়তুল মাল হতে তার মুক্তিপণ আদায় করে দিন।”^{৮৯৬}

^{৮৯৪} সহীহল বুখারী, হা. ৬৮৯।

^{৮৯৫} মুস্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৬৮৯; সহীহ মুসলিম, হা. ৪২৩৪-৪২৪১, ফুআ. ১৬৬।

^{৮৯৬} আবদুর রায়ধাক তার মুসান্নাকে বর্ণনা করেন ১০/৫১; ইবনে আবি শায়বাহ ৯/৩৯৫।



একাদশ অধ্যায় দণ্ডবিধি

حادي عشر: كتاب العدود

এতে ০৮ টি অনুচ্ছেদ রয়েছে

প্রথম অনুচ্ছেদ: শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তির পরিচয়, বৈধতা, হিকমাহ এবং অন্যান্য
মাসআলাসমূহ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: ব্যভিচারের শাস্তি

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : অপবাদের শাস্তি

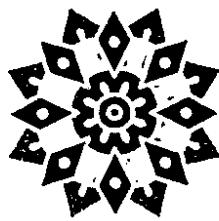
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : মদ্যপায়ীর নির্ধারিত শাস্তি

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : চুরির নির্ধারিত শাস্তি

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : শিক্ষামূলক শাস্তি (তাফীর)

সপ্তম অনুচ্ছেদ : লুটতরাজের নির্ধারিত শাস্তি

অষ্টম অনুচ্ছেদ : মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী



الباب الأول: في تعريف الحدود، ومشروعيتها، والحكمة منها، وسائل أخرى প্রথম অনুচ্ছেদ: শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তির পরিচয়, বৈধতা, হিকমাহ এবং অন্যান্য মাসআলাসমূহ

১. শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তির পরিচয়:

الحدود এর শাব্দিক অর্থ: المَنْعُ তথা কোনো কিছু থেকে বাধা দেওয়া। حدود الله آللّاه‌র নির্দিষ্ট সীমারেখা। অর্থাৎ যে নিষিদ্ধ বিষয়গুলোতে জড়িয়ে পড়তে আল্লাহ নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿يَنْلِكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرِبُوهَا﴾

“ঐটা আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং তোমরা তা অতিক্রম করো না।” [সূরা বাকারাহ : ১৮৭]

পরিভাষায়:

عقوبة مقدرة في الشرع؛ لأجل حق الله تعالى. وقيل: عقوبة مقدرة شرعاً في معصية؛ لمنع من ال الوقوع في مثلها أو في مثل الذنب الذي شرع له العقاب.

আল্লাহ তা'আলার হক বা অধিকার লজ্জণের কারণে ইসলামী শরীয়তে নির্ধারিত শাস্তিকে হন্দ বলে। অথবা বলা হয়ে থাকে: অপরাধের জন্য কিছু নির্ধারিত শাস্তিকে হন্দ বলে। যা অনুরূপ অপরাধ অথবা যে-কোনো শাস্তিযোগ্য অপরাধে পতিত হওয়া থেকে বাধা প্রদান করে।

২. শরীয়ত সম্মত হওয়ার ব্যাপারে দলীল:

الحدود বা নির্ধারিত শাস্তিসমূহ। শরীয়ত সম্মত হওয়ার ব্যাপারে মূল হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, سُنْنَة, আলেমগণের ইজমা বা ঐকমত্য। কুরআন ও সুন্নাহ নির্ধারিত কিছু অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তির বিধান করেছে; যেমন ব্যভিচার, চুরি, মদপান এ ছাড়া আরও কিছু বিষয়ের জন্য শাস্তি নির্ধারন করা হয়েছে যা আল্লাহ চাহে তো সামনের অনুচ্ছেদ গুলোতে তার প্রত্যেকটি দলীল সহ বিস্তারিত আলোচনা অচিরেই আসবে।

৩. الحدود। বা নির্ধারিত শাস্তিসমূহ শরীয়ত সম্মত হওয়ার হিকমাহ:

শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি শরীয়ত সম্মত করা হয়েছে মানুষকে সতর্ক বা ধর্মক স্বরূপ, যাতে অন্যায় কাজ করা এবং আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সীমাকে লংঘন না করা হয়। ফলে সমাজে প্রশাস্তি বিরাজ করবে, জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে, স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে এবং জীবন সুখময় হবে। অনুরূপভাবে দুনিয়াতে শরীয়ত কর্তৃক এই নির্ধারিত শাস্তি বান্দাকে পরিশুল্ক করার একটি মাধ্যম। ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মারফু সূত্রে বর্ণিত উবাদাহ ইবনে সামিত খ্রিস্ট এর হাদীস।

وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقَبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارٌ^{৮৯৭}

“কোনো ব্যক্তি এ সমস্ত কাজের কোনো একটি কাজ করে শাস্তি পেলো। এ শাস্তি তার জন্য কাফফারা স্বরূপ।”^{৮৯৭}

অনুরূপভাবে খুজাইমাহ ইবনে সাবিত থেকে মানচিত্রে হাদীস বর্ণনা হয়েছে যে,

مَنْ أَصَابَ حَدًّا أَقِيمْ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْحَدُّ فَهُوَ كَفَّارٌ^{৮৯৮}

“যে ব্যক্তি শাস্তিমূলক অপরাধ করল অতঃপর তার ওপর শাস্তি প্রয়োগ করা হলো, সেটা তার পাপের জন্য কাফফারা স্বরূপ।”^{৮৯৮}

সুতরাং শরীয়তে নির্ধারিত এই সমস্ত শাস্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে বান্দার কল্যাণ বাস্তবায়ন হয়। যার সম্পূর্ণটাই ন্যায়পরায়নতা ও ইনসাফ। বরং এটাই সর্বোচ্চ ইনসাফ।

৪. নির্ধারিত শাস্তি প্রতিষ্ঠার আবশ্যিকতা এবং এই ব্যাপারে সুপারিশ করা হারাম:

অপরাধীদের ভীতি প্রদর্শন এবং অন্যায় কাজ থেকে বাধা প্রদানের জন্য মানুষের মাঝে হৃদ প্রতিষ্ঠা করা ওয়াজিব। হৃদ প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে নাবী ﷺ বলেন:

إِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، حَتَّىٰ مِنْ مَطْرِ أَزْبَعِينَ لَيْلَةً فِي بِلَادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তিসমূহের মধ্য থেকে কোনো একটিকে কার্যকর করা ৪০ রাত মহান আল্লাহর কোনো জনপদে বৃষ্টিপাত হওয়ার চেয়ে উত্তম।”^{৮৯৯}

আর যখন শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তির বিষয় ইমামের নিকট পৌছাবে এবং তা তাঁর নিকট প্রমাণিত হবে তখন তা গঠিয়ে নেওয়া বা প্রতিষ্ঠা না করার ব্যাপারে সুপারিশ করা হারাম। অনুরূপভাবে শাসকের ওপর ওই ব্যাপারে সুপারিশ গ্রহণ করা হারাম। নাবী ﷺ বলেন:

^{৮৯৭} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীল্ল বুখারী, হা. ৬৭৪৪; সহীহ মুসলিম, হা. ১৭০৯।

^{৮৯৮} আহমাদ ৫/২১৪, দারাকুতনী ৩৯৭।

^{৮৯৯} ইবনু মাজাহ, হা. ২৫৩৭; আহমাদ ২/৪০২; বর্ণনা ইমাম ইবনে মাজাহের। ইমাম আলবানী হাসান বলেছেন, সহীহ ইবনে মাজাহ, হা. ২০৫৬-২০৫৭; দেখুন, সিলসিলাতুস সহীহহ, নং ২৩।

مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدًّ مِنْ حُدُودِ اللهِ، فَقَدْ خَصَّ اللَّهُ أَمْرًا

“যার সুপারিশ আল্লাহর নির্ধারিত কোনো হন্দ বাস্তবায়িত করার পথে বাধা সৃষ্টি করে সে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।”^{৯০০}

এমনকি নাবী ﷺ মাথ্যুমী গোত্রের এক নারীর (চুরির দায়) ব্যাপারে উসামা বিন যায়েদের সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং নাবী ﷺ কে এই বিষয়টি রাগান্বিত করেছিল। ফলে নাবী ﷺ বলেছিলেন:

وَإِنْمِنْ اللَّهُ لَوْ أَنْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقْطَعَتْ يَدَهَا

“আল্লাহর কসম! ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদও যদি চুরি করে, অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিবো।”^{৯০১}

অতঃপর হন্দ এর বিষয় ইমামের নিকট পৌছার পূর্বেই ক্ষমা করা জারৈয়ে। কারণ একজন ব্যক্তির চাদর চুরি করা হয়েছিল, অতঃপর ঐ ব্যক্তি ঢোরকে ক্ষমা করার ইচ্ছা করলে নাবী ﷺ তাকে বললেন: **فَهَلْ قَبْلَ أَنْ تَكْسِيَ يَهُورَكَ**

“তাকে আমার নিকট নিয়ে আসার পূর্বেই কেন ক্ষমা করলে না?”^{৯০২}

৫. হন্দ কোথায় এবং কে কার্যকর করবে?

যিনি হন্দ কার্যকর করবেন তিনি হচ্ছেন বিচারক বা তার স্থলাভিষিক্ত। নাবী ﷺ তাঁর জীবদ্ধায় হন্দ কার্যকর করেছিলেন। অতঃপর তাঁর মৃত্যুর পর খলীফাগণ হন্দ কার্যকর করেছেন। আবার কখনও কখনও নাবী ﷺ তার স্থলাভিষিক্ত অন্য কাউকে হন্দ কার্যকর করার দায়িত্ব অর্পণ করতেন। নাবী ﷺ বলেন:

وَاغْدُ يَا أُنْيَسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ أَعْرَفْتَ فَازْجِنْهَا

“উনাইস! তুমি সকালে ঐ মহিলার কাছে যাও। যদি সে জিনার স্বীকৃতি দেয় তাহলে তাকে পাথর মেরে রজম বা হত্যা করো।”^{৯০৩}

^{৯০০} সুনান আবু দাউদ, হ্য. ৩৫৯৭; আহমাদ ২/৭০; হাকিম ২/২৭ সহীহ সানাদে এবং ইমাম যাহাবী ঐকমত্য পোষণ করেছেন; শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহাহ নং ৪৩৭।

^{৯০১} মুস্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হ্য. ৬৭৮৮; সহীহ মুসলিম, হ্য. ১৬৮৮।

^{৯০২} সুনান আবু দাউদ, হ্য. ৪৩৯৪; হাকিম ৪/৩৮০ এবং তিনি সহীহ বলেছেন; ইমাম যাহাবী ঐকমত্য পোষণ করেছেন; শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, ইরওয়া নং ২৩১৭।

^{৯০৩} মুস্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হ্য. ৬৮৩৫, ৬৮৩৬, সহীহ মুসলিম, হ্য. ফুআ. ১৬৯৭, ১৬৯৮।

সুতরাং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং জুলুম প্রতিহত করার লক্ষ্যে হদ্দ কার্যকর করা ইমামের উপর ওয়াজিব।

মসজিদ ছাড়া যে-কোনো স্থানে হদ্দ প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

نَبِيٌّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَقَادُ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُشَدَّ فِيهِ الْأَشْعَاعُ، وَأَنْ تَقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ

“নাবী  মসজিদে বিচার ফয়সালা, কবিতা আবৃত্তি এবং হদ্দ কার্যকর করতে নিষেধ করেছেন।”^{১০৪}

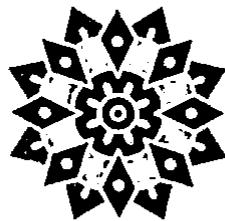
আর এটা মসজিদকে হট্টগোল বা এর অনুরূপ কিছু থেকে সংরক্ষণ করার জন্য। মাসীজকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করার ঘটনাটি কিছু বর্ণনাতে এভাবে এসেছে

فَأَخْرَجَ إِلَى الْحَرَّةِ فَرِّجَمَ

“অতঃপর তাকে হাররার প্রান্তরে নেওয়া হলো এবং রজম বা পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হলো।”^{১০৫}

^{১০৪} সুনান আবু দাউদ, খ. ৪৪৯০; আহমাদ ৩/৪৩৪; ইমাম আলবানী হাসান বলেছেন, ইরওয়া নং ২৩২৭।

^{১০৫} সুনানুত্ত তিরমিয়ী, খ. ১৪২৮ এবং তিনি বলেন, হাদীস হাসান; শাইখ আলবানী বলেন, হাসান সহীহ। সহীহত তিরমিয়ী, খ. ১১৫৪



الباب الثاني : في حد الزنى দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: ব্যভিচারের শাস্তি

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: تَعْرِيفُ الزَّنْيِ وَحُكْمُهِ وَخَطُورَتِهِ

প্রথম মাসআলা: জিনা ব্যভিচারের পরিচয়, তার হুকুম এবং
তার ক্ষতিকারক দিকসমূহ

১. জিনা-ব্যভিচারের পরিচয়:

الزنى شدّهُ الرّجُلُ مُشَهَّدًا لِغَيْرِ الْمَلِكِ وَشَهِيْدًا. أَوْ: هُوَ فِعْلُ الْفَاحِشَةِ فِي قَبْلٍ أَوْ دِبْرٍ.
অর্থাৎ: জিনা শব্দটি ব্যবহার করা হয় শরীয়তের পদ্ধতিতে কোনো বক্রন বা চুক্তি ছাড়াই কোনো মহিলার সাথে সহবাস করা অথবা জিনা শব্দটি কোনো অপরিচিত মহিলার সাথে মেলামেশা করার অর্থে ।

شرعًا: وطء الرجل المرأة في القبل من غير الملك وشهيته. أو: هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر.

পরিভাষায়: একজন পুরুষ কোনো প্রকার মালিকানা এবং সন্দেহ ছাড়াই মহিলার সম্মুখ দিয়ে সহবাস করা । অথবা একজন মহিলার অগ্রভাগ বা মলম্বার দিয়ে করা হয়ে থাকে অশ্লীল কর্ম সম্পাদন করা ।

২. জিনা-ব্যভিচারের বিধান:

জিনা-ব্যভিচার একটি হারাম কাজ এবং সেটি কাবীরা গুনাহ এর অন্তর্ভুক্ত । কারণ মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَلَا تُفْرِبُوا الزَّنِي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَيِّلًا﴾

“তোমরা জিনা-ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না । নিশ্চয়ই সেটা অশ্লীল কাজ ও নিকৃষ্ট পত্রা ।” সূরা ইসরাঃ ৩৫

ইবনু মাসউদ رض এর হাদীস তিনি বলেন:

سَأَلَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الدَّنْبٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ اللَّهَ نِدًا وَهُوَ خَلْقَكَ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيْ؟ قَالَ: «أَنْ تَقْتَلَ وَلَدَكَ حَسْنَيَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعْكَ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيْ؟ قَالَ: «أَنْ تُزَرِّي بِحَلِيلَةِ جَارِكَ»^{১০৫}

“আমি নাবী ﷺ কে সবচেয়ে বড়ো পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি ﷺ বললেন: তুমি আল্লাহর জন্য সমকক্ষ বানাবে অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, তারপর কোন পাপ (সবচেয়ে বড়ো)? তিনি ﷺ বললেন, তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করা যে, সে তোমার সাথে থাবে। আবার আমি বললাম, এরপর কোন পাপ সবচেয়ে বড়ো? তিনি ﷺ বললেন: তোমার প্রতিবেশীর কোনো মেয়ের সাথে ব্যভিচার করা।”^{১০৬}

আলেমগণ জিনা-ব্যভিচার হারাম হওয়ার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

৩. জিনা ব্যভিচারের মতো অন্যায়মূলক কাজের ক্ষতিকারক দিকসমূহ:

জিনা-ব্যভিচার অন্যতম বড়ো পাপ ও নিকৃষ্টতম কাজ। এর ক্ষতি ব্যক্তি এবং সমাজের উপর অনেক বেশি। এর কারণে বৎশে সংমিশ্রণ ঘটে, যা উত্তরাধিকারের সম্পদ বণ্টন করার সময় অধিকার নষ্ট করে এবং পারম্পরিক পরিচয় ও একে অপরকে সহযোগিতামূলক কাজকে বিনষ্ট করে। জিনা-ব্যভিচার পরিবার ভেঙ্গে যাওয়া, সন্তান নষ্ট হওয়া, শিশুর মন্দ প্রতিপালন ও চরিত্র ধ্বংসের কারণ। এর মাধ্যমে স্বামীকে ধোঁকা দেওয়া হয়। কারণ যখন এই ব্যভিচারের কারণে নবজাতক জন্ম নেয় তখন একজন স্বামী না জেনে অন্যের সন্তানকে লালন-পালন করে থাকে। সুতরাং এর ক্ষতিকারক দিক অনেক। যেমন বিচ্ছিন্নতা, অধিকার নষ্ট, বিশৃঙ্খলার মতো নেতৃত্বাচক প্রভাব, যা ব্যক্তি ও সমাজের কাছে গোপন নেই।

একারণেই ইসলাম এরকম কর্ম থেকে কঠিনভাবে সতর্ক করেছে এবং এমন কাজ সম্পাদনের জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করেছে যার বর্ণনা অচিরেই আসছে।

المَسَأَةُ الثَّانِيَةُ: حَدُّ الْزَّنِي

দ্বিতীয় মাসআলা : ব্যভিচারের নির্ধারিত শাস্তি

ব্যভিচারকারী ব্যক্তি দুটি বিষয় থেকে মুক্ত নয়:

১. হয় সে বিবাহিত হবে।
২. অথবা অবিবাহিত হবে।

^{১০৫} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৬৮৬১, সহীহ মুসলিম, হা. ৮৬।

প্রথমতঃ ব্যভিচারকারী বিবাহিত হবে: বিবাহিত ব্যক্তির জন্য হন্দ আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণিত শর্তসমূহ প্রয়োজন হবে:

ক. ইতঃপূর্বে বৈধ পত্নায় সহবাস সাব্যস্ত হবে। ব্যভিচারী পুরুষ এবং ব্যভিচারিণী নারীর সামনের রাস্তা দিয়ে সহবাস করেছে এমন হবে।

খ. বিশুদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে সহবাস সাব্যস্ত হবে।

গ. স্বামী-স্ত্রীর উভয়ে স্বাধীন ও জ্ঞানবান থাকা অবস্থায় ঘোনাঙ্গে সহবাস হতে হবে।

বিবাহিত ব্যক্তি: তাকেই বিবাহিত ব্যক্তি বলা হবে যে, সঠিক বিবাহের মাধ্যমে তার স্ত্রীর সামনের রাস্তায় উভেজনার সাথে সহবাস করে উভয়েই স্বাধীন, জ্ঞানবান ও বোধশক্তি সম্পন্ন অবস্থায়।

শাস্তিযোগ্য ব্যক্তিকে বিবাহিত হিসেবে সাব্যস্ত করতে এই পাঁচটি শর্ত অবশ্যই প্রয়োজন। সেই পাঁচটি শর্ত হচ্ছে- প্রাণবয়স্ক হওয়া, জ্ঞানবান হওয়া, স্বাধীন হওয়া, লজ্জাস্থান দিয়ে সহবাস সাব্যস্ত হওয়া এবং বিশুদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে সহবাস সাব্যস্ত হওয়া।

বিবাহিত ব্যক্তির শাস্তি: যখন একজন বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হবে তখন তার শাস্তি হচ্ছে, মৃত্যু পর্যন্ত পাথর ছুড়ে রজম করা। চাই সে ব্যক্তি পুরুষ হোক অথবা মহিলা। আর পাথর ছুড়ে হত্যা করার বিষয়টি নাবী ﷺ এর কথা ও কাজ থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে প্রমাণিত। এক সময় পাথর ছুড়ে হত্যা করার বিষয়টি কুরআনুল কারীমে উল্লেখ ছিল। পরবর্তীতে তার শব্দ রহিত হয়েছে কিন্তু বিধান অবশিষ্ট রয়েছে। আর সেই রহিত শব্দ আল্লাহর এই বাণী- (الشيخ بـ“بـ” والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نـكـلاًـ من الله والله عـزـيزـ حـكـيمـ) ব্যভিচার করবে তখন উভয়কে পাথর ছুড়ে হত্যা করা ওয়াজিব। আর এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। আল্লাহ তা'আলা মহান পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।”

উমার খন্দক হতে বর্ণিত। তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন (খুতবায় বললেন),

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيهَا أُنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقْلَنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضْلُّوا بِتَرْكِ فِرِيضَةِ أُنْزَلَهَا اللَّهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَخْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيْتُ، أَوْ كَانَ الْخُبْلُ، أَوِ الْإِغْرِافُ

“আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ﷺ কে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন এবং তার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তিনি যা অবতীর্ণ করেছেন তার মধ্যে পাথর ছুড়ে হত্যা করার আয়াতটি ছিল সেই আয়াত আমরা পড়েছি, মুখ্যত করেছি এবং ভালোভাবে বুঝেছি। নাবী ﷺ পাথর ছুড়ে হত্যা

করেছেন, তার পর আমরাও এমনভাবে পাথর ছুড়ে হত্যা করেছি। যখন মানুষের মাঝে এক দীর্ঘ সময় অতিক্রম হলো, তখন আমি আশংকা করেছিলাম যে, কেউ বলবে আল্লাহর কিতাব আল কুরআনের মধ্যে রজম অর্থাৎ পাথর ছুড়ে হত্যা করার আয়াত খুঁজে পাইনি। এর ফলে তারা আল্লাহ যে ফরজ অবতীর্ণ করেছেন, তা পরিত্যাগ করার মাধ্যমে পথভঙ্গ হয়ে যাবে। সুতরাং আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ওই ব্যক্তিকে পাথর মেরে হত্যা করা অবধারিত যে বিবাহিত হওয়ার পর ব্যভিচার করবে। চাই সে পুরুষ হোক বা নারী হোক। এটি তখন যখন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে অথবা গর্ভবতী হবে বা স্বীকারোক্তি পাওয়া যাবে।”^{১০৭}

আবু হুরায়রা رض এর হাদীস। তিনি বলেন,

أَتَيْ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَيَّتُ، فَأَعْرَضْ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَيَّتُ، فَأَعْرَضْ عَنْهُ، حَتَّى شَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَبِكْ جُنُونٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ أَخْحَصْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذْهَبُوا بِهِ فَازْجُومُهُ»

“নাবী ﷺ মসজিদের ভিতরে থাকা অবস্থায় মুসলিমদের মধ্য হতে একজন আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট আসলেন। সে এসে তাঁকে ডেকে বলল: হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আমি জিনা করেছি। তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অতঃপর তিনি চেহারা ঘুরিয়ে নিলেন। লোকটি অন্যদিক দিয়ে সামনে এসে আবার বলল: হে আল্লাহর রসূল, আমি জিনা করেছি। তিনি আবার মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি উক্ত কথাটি চার বার পুনরাবৃত্তি করলেন। যখন সে তার নিজের ব্যাপারে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করল, তখন নাবী ﷺ তাকে ডাক দিয়ে বললেন, তোমার মধ্যে কী পাগলামির দোষ আছে? সে বলল, না। তিনি বললেন, তাহলে তুমি কি বিবাহিত? সে বলল, হ্যাঁ। তখন নাবী ﷺ বললেন, তোমরা তাকে নিয়ে যাও এবং পাথর মেরে হত্যা করো।”^{১০৮}

সকল আলেম একমত: বিবাহিত অবস্থায় কেউ ব্যভিচার করলে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত পাথর মেরে হত্যা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত: ব্যভিচারকারী অবিবাহিত হলে:

বিবাহিত ব্যভিচারকারীর ক্ষেত্রে পূর্বে উল্লিখিত শর্তসমূহ যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে পূর্ণ হবে না, সেই হচ্ছে অবিবাহিত ব্যভিচারকারী।

^{১০৭} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৩৮৭২, সহীহ মুসলিম, হা. ৪৩১০, ফুআ. ১৬৯১।

^{১০৮} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৬৮২৫, সহীহ মুসলিম, হা. ৪৩১২, ফুআ. ১৬৯১।

এমন ব্যক্তির শাস্তি: অবিবাহিত ব্যক্তি যখন ব্যভিচার করবে তখন তারজন্য শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি হচ্ছে ১০০ বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য দেশান্তর। তবে মহিলাকে দেশান্তর করার ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, তার সাথে মুহরিম ব্যক্তি থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿الرَّازِيَةُ وَالرَّازِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّهُمَّا مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدًا﴾

“ব্যভিচারিগী মহিলা ও ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের দুইজনের প্রত্যেকের জন্য ১০০ করে বেত্রাঘাত করো।” [সূরা নূর : ২]

উবাদাহ ইবনে সামিত رض এর হাদীস। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَيِّلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَنَفْيٌ سَبْطٌ

“তোমরা আমার থেকে (ব্যভিচারের বিধান) গ্রহণ করো। তোমরা আমার থেকে (ব্যভিচারের বিধান) গ্রহণ করো। কারণ আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য পথ নির্ধারণ করেছে। তা হচ্ছে অবিবাহিত ছেলে ও মেয়ের জন্য ১০০ বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য দেশান্তর।”^{১০১}

অর্থ হচ্ছে- ব্যভিচারকারীকে নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত করা ও দূরে পাঠানো।

যদি দাস জিনা করে; চাই সে বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হক, পুরুষ দাস হোক বা মহিলা দাসী হোক, এর জন্য শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি হচ্ছে পঞ্চাশটি বেত্রাঘাত। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾

“অতঃপর (তারা বিবাহিত হয়ে যদি ব্যভিচারে লিঙ্গ হয় তাহলে) তাদের ওপর স্বাধীন নারীর অর্ধেক শাস্তি হবে।” [সূরা নিসা : ২৫]

উক্ত আয়াতে যে উল্লিখিত শাস্তির কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে ১০০টি বেত্রাঘাত। অতএব রজমের শাস্তির অর্ধেকের প্রত্যাবর্তন হচ্ছে বেত্রাঘাতের দিকে। কেননা রজম বা পাথর ছুড়ে হত্যা করার ক্ষেত্রে তার অর্ধেক করা সম্ভব না।

দাসকে দেশান্তর করা যাবে না। কেননা যখন দাস ব্যভিচারে লিঙ্গ হবে তখন তাকে দেশান্তর করার ব্যাপারে হাদীসে এর বর্ণনা আসেনি। আর তাকে দেশান্তর করলে তার মনিবের জন্য ক্ষতি রয়েছে। আর মুহরিম ব্যতীত ব্যভিচারিগীর জন্য দেশান্তর নেই যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

^{১০১} সহীহ মুসলিম, হ্য. ৪৩০৬, ফুআ. ১৬৯০।

الْمَسَأَةُ الْثَالِثَةُ: بِمَ يُثْبِتُ الزَّنْيُ؟

তৃতীয় মাসআলা: কীসের মাধ্যমে জিনা সাব্যস্ত হবে?

জিনার শাস্তি কার্যকর করার জন্য জিনা সংঘটিত হওয়া আবশ্যিক। দুটি বিষয়ের কোনো একটির মাধ্যমে জিনা সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হবে:

প্রথম বিষয়: জিনাকারী নিজেই চারবার স্বীকৃতি প্রদান করবে, যদিও তা ভিন্ন বৈঠকে হয়। কারণ নাবী ﷺ মায়েজ এবং গামেদীয়াহ এর স্বীকৃতি গ্রহণ করেছেন। আর চারবার স্বীকৃতি শর্ত করা হয়েছে এই কারণে যে, নাবী ﷺ এর নিকট মায়েজ নিজের পক্ষ থেকে তিনবার স্বীকৃতি দেন। অতঃপর যখন চতুর্থবার স্বীকৃতি দেন তখন তার ওপর শাস্তি কার্যকর করা হয়।

আর স্বীকৃতির মধ্যে স্পষ্টভাবে জিনা ও সহবাসের বাস্তবতা পরিকার হতে হবে। কেননা এমন স্তবনা থাকতে পারে যে, জিনা করার উদ্দেশ্য ছাড়া এমন কিছু উপভোগ করতে চেয়েছে যার কারণে শাস্তি হওয়া আবশ্যিক হয় না। নাবী ﷺ এর নিকট যখন মায়েজ স্বীকৃতি প্রদান করেছিল তখন নাবী ﷺ তাকে বলেছিলেন: **لَعْلَكَ قَبِيلْتَ، أَوْ عَمَّزْتَ، قَالَ: لَا**

“স্তবত তুমি চুমু খেয়েছে? অথবা একটু শ্রম করেছ? সে, বলল না।”^{১১০} বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়ার জন্য কয়েকবার তার সাথে পুনরাবৃত্তি করলেন যতক্ষণ না স্তবনা দূর হলো।

হ্যাঁ এর শাস্তি ক্লার্যকর করা পর্যন্ত তাকে তার স্বীকৃতির উপর অটল থাকতে হবে। সেখান থেকে ফিরে যাবে না। কেননা নাবী ﷺ মায়েজের নিকট থেকে কয়েকবার স্বীকৃতি নিয়েছেন। স্তবত সে তার স্বীকৃতি থেকে ফিরে আসতেও পারে। অতঃপর মায়েজকে যখন পাথর মারা হচ্ছিল এবং সে পালায়ন করতে চাচ্ছিল। তখন নাবী ﷺ বললেন: **هَلْأَلَّا تَرْكُّمُوهُ**

“তোমরা কেন তাকে ছেড়ে দিলে না?”^{১১১}

দ্বিতীয় বিষয়: জিনাকারীর উপর চারজন সাক্ষী জিনার সাক্ষ্য দিবে। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ﴾

“তারা চার জন সাক্ষী উপস্থিত করল না কেন?” [সূরা নূর : ১৩]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةَ مِنْكُمْ﴾

“অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে তাদের জন্য চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে।” [সূরা নিসা : ১৫]

^{১১০} সহীল বুখারী, ঘ. ৬৮২৪।

^{১১১} তিরমিয়ী, ঘ. ১৪২৮; ইবনু মাজাহ, ঘ. ২৫৫৪ এবং ইমাম তিরমিয়ী হাসান বলেছেন। শাহীখ আলবানী বলেন, হাসান সহীহ সন্দৰ্ভে তিরমিয়ী, ঘ. ১১৫৪।

জিনাকারীর উপর সাক্ষীগণের সাক্ষ্য বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত করা হয়েছে:

୧. ପୂର୍ବେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଆୟାତଗୁଲୋର ମଧ୍ୟମେ ବୋକା ଯାଯ ସାକ୍ଷୀ ଚାରଜନ ହତେ ହବେ । ସୁତରାଂ ଯଦି ଚାରଜନେର କମ ହ୍ୟ ତାହଲେ ଗ୍ରହଣ କରା ହବେ ନା ।

২. সাক্ষীগণ মুকাব্লাফ ব্যক্তি (অর্থাৎ শরীয়ত কর্তৃক বিধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি) ও জ্ঞানবান হতে হবে। সুতরাং নাবালগ বা পাগলদের সাক্ষী গ্রহণ করা হবে না।

৩. ন্যায়পরায়ণ পুরুষ হতে হবে। সুতরাং জিনার শাস্তির ক্ষেত্রে মহিলার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে না। এটা তাদের জন্য সতর্কতা ও সম্মানের কারণ। কেননা ব্যভিচার একটি নিকৃষ্ট কাজ। অনুরূপভাবে ফাসেক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَذْلٍ مِّنْهُمْ﴾

“তোমাদের মধ্যে যারা ন্যায়পরায়ণ তাদেরকে সাক্ষী রাখো !” [সুরা তালাক : ২]

ଆମ୍ବାହ ତା'ଆଲା ବଲେନ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبِيٍّ فَتَبَيَّنُوا﴾

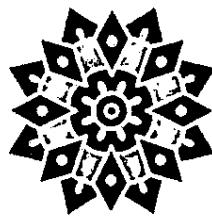
“হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমাদের কাছে ফাসেক ব্যক্তি কোনো বিষয়ে সংবাদ নিয়ে আসে, তোমরা তা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করবে।” [সুরা হজুরাত : ৬]

৪. সাক্ষীগণ স্বচক্ষে জিনা সংঘটিত হওয়া দেখবে এবং এটি তারা এমন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে যাতে জিনা ছাড়া অন্যান্য হারাম উপভোগের ইচ্ছামূলক সমস্ত স্থাবনার বিষয়গুলো দূর হয়ে যায়। সুতরাং তারা বলবে: আমরা তার পুরুষাঙ্গ মহিলার লজ্জাস্থানে গ্রিভাবে দেখেছি যেমনভাবে কাঠি সুরমাদানিতে দেখা যায়। প্রয়োজনে একে কিছু দেখা বৈধ আছে।

৫. সাক্ষীগণ মুসলিম হওয়া। সুতরাং কাফের ব্যক্তির ন্যায়পরায়ণতা সাব্যস্ত না হওয়ার কারণে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

৬. একই বৈঠকে তারা তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে। চাই তারা স্বয়ং ঐ বৈঠকে একত্রে আসবে বা পৃথক হয়ে আসবে।

সুতরাং শর্তসমূহের কোনো একটি ভ্রষ্টিপূর্ণ হলে সমস্ত সান্ধীদের উপর অপবাদের শাস্তি আবশ্যিক হয়ে যাবে। কারণ তারা অপবাদদাতা।



الباب الثالث: في حد القذف তৃতীয় অনুচ্ছেদ : অপবাদের শাস্তি

এই অনুচ্ছেদে বেশ কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المَسْأَلَةُ أُولَى: مَعْنَى الْقَذْفِ وَحِكْمَتُهُ

প্রথম মাসআলা: শব্দের অর্থ এবং তার বিধান

১. অপবাদের পরিচয়:

الْقَذْفُ شব্দের শাস্তিক অর্থ: নিক্ষেপ করা। আর এখান থেকে বলা হয় পাথর বা পাথর ছাড়া অন্য কিছু নিক্ষেপ করা।

এই শব্দটি অপচন্দনীয় কাজের অপবাদ দেওয়ার জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন: জিনা, সমকামিতা বা অনুরূপ কিছু। কারণ উভয়ের মাঝে সাদৃশ্য রয়েছে, আর সেই সাদৃশ্যটা হচ্ছে কষ্ট।

পারিভাষিক অর্থ:

الرَّمِيُّ بِزَنِيْ أَوْ لَوَاطٍ، أَوْ شَهَادَةً بِأَحَدِهِمَا وَلَمْ تَكُمِّلِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ نَفِيْ نَسْبٍ مُوجِبٍ لِلْحَدِّ فِيهِمَا.

“জিনা অথবা সমকামিতার অপবাদ দেওয়া অথবা এই দুই বিষয়ের সাক্ষ্য দেওয়া তবে প্রমাণ পরিপূর্ণ হয় না অথবা বৎস অস্বীকার করা, যা হল আবশ্যিক করে।”

২. অপবাদের বিধান:

অপবাদের মূল হচ্ছে হারাম। যা কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত। এটা কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং অশ্লীল কাজের অপবাদ দেওয়া হারাম। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ لَعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

“যারা সচরিত্রা সরলমনা মুমিনা নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত আর তাদের জন্য রয়েছে মহা শান্তি।” [সূরা নূর : ২৩]

আবু হুরায়রা ﷺ এর হাদীসে নাবী ﷺ বলেছেন:

اجتَنَبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ. وَذَكْرُ مِنْهَا: وَقْدُفُ الْمُخْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

“তোমরা সাতটি ধূংসাত্তুক জিনিস থেকে বেঁচে থাকো। এগুলোর মধ্যে উল্লেখ রয়েছে: সচরিত্রা সরলমনা মুমিন নারীর প্রতি অপবাদ দেওয়া।”^{১১২}

সকল মুসলিম অপবাদ দেওয়া হারাম হওয়ার উপর একমত এবং তারা তাকে কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য করেন।

যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে জিনা করতে দেখে, অতঃপর স্ত্রী সন্তান প্রসব করে, যা তার ধারণাকে আরও শক্তিশালী করে যে, ঐ সন্তান জিনাকারীর সন্তান; তার পক্ষ থেকে অপবাদ দেওয়া ওয়াজিব। যাতে সন্তানকে তার সাথে সম্পৃক্ত না করা হয় এবং তাকে (সন্তানকে) এমন বংশের প্রতি সম্মোধন করা না হয়, সে যে বংশের অন্তর্ভুক্তই নয়। এছাড়াও ঐ ব্যক্তির জন্য অপবাদ দেওয়া বৈধ, যে তার স্ত্রীকে জিনা করতে দেখেছে কিন্তু ঐ জিনার কারণে সন্তান জন্ম নেয়নি।

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: حَدُّ الْقَذْفِ، وَالْحُكْمَةُ مِنْهُ

দ্বিতীয় মাসআলা: অপবাদ দেওয়ার শান্তি এবং এর হিকমাহ

১. অপবাদ দেওয়ার শান্তি: যদি কোনো ব্যক্তি অপর কোনো মুসলিম ব্যক্তিকে জিনার অপবাদ দিয়ে কিন্তু সে যে বিষয় অপবাদ দিয়েছে তার সত্যতার ব্যাপারে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে না পারে; এমন ব্যক্তি যদি স্বাধীন হয়ে থাকে, তবে শরীয়তে তার জন্য ৮০ বেত্রাঘাত নির্ধারণ করা হয়েছে। আর যদি সে দাস হয়ে থাকে তাহলে চল্লিশ বেত্রাঘাত; চাই সে পুরুষ হোক কিংবা মহিলা হোক। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءٍ فَاجْلِدُوهُنْ مَثَانِيَنَ جَلْدٌ﴾

“যারা সতী-সাধী নারীর উপর অপবাদ দেয় কিন্তু এরপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে ৮০ টি করে বেত্রাঘাত করো।” [সূরা নূর : ৪]

^{১১২} মুফাফাকুন আলাইহি: সঙ্গীত বুখারী, খ. ২৭৬৬; সঙ্গীহ মুসলিম, খ. ৮৯।

অতঃপর অপবাদদাতাকে তার অপবাদের শাস্তি দেওয়ার সাথে সাথে আরও অতিরিক্ত কিছু শাস্তি দেওয়া আবশ্যিক। আর তা হচ্ছে তার সাক্ষ্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং তাকে ফাসেক বলে হকুম জারি করা। আল্লাহ তায়ার বাণী:

﴿وَلَا تَقْبِلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَدْبَأْتُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

“তোমরা তাদের সাক্ষ্য কখনোই গ্রহণ করো না এবং তারা হচ্ছে পাপীষ্ট।” [সূরা নূর : ৪]

অপবাদদাতা যদি তাওবা করে তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। তার তাওবার ধরণ হচ্ছে যে, অন্যকে যে বিষয়ে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল সেই ব্যাপারে নিজেকে মিথ্যা প্রতিপন্থ করবে, সাথে সাথে অনুত্পন্ন হবে এবং তার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা চাইবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فِي إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

“তবে যারা এমন ঘটনার পর তাওবা করে এবং সংশোধন হয়ে যায় তারা ব্যতীত। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।” [সূরা নূর : ৫]

২. অপবাদের শাস্তির হিকমাহ বা তাৎপর্য:

মিথ্যা অপবাদের জন্য শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তির ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামের লক্ষ্য হলো: সমাজ রক্ষা, মানুষের সম্মান অক্ষুণ্ন রাখা, মুখের খারাপ ব্যবহার রোধ করা এবং মুমিনদের মাঝে অশ্রীলতার বিশ্বার রোধ করা।

الثالثة: شروط إيجاب حد القذف

তৃতীয় মাসআলা: অপবাদের শাস্তি আবশ্যিক হওয়ার জন্য শর্তসমূহ

অপবাদদাতা এবং অপবাদকৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে কিছু শর্ত পূর্ণ হলেই কেবল অপবাদের শাস্তি আবশ্যিক হবে। এমনকি সেটা এমন অপরাধে পরিণত হতে হবে যা বেআঘাতের উপযুক্ত।

প্রথমত: অপবাদদাতার ক্ষেত্রে শর্তসমূহ; আর তা হচ্ছে ৫ টি:

১. প্রাণবয়ক হতে হবে, নাবালকের উপর কোনো শাস্তি নেই।

২. জ্ঞানবান হতে হবে, পাগল বা অর্ধপাগলের উপর কোনো শাস্তি নেই।

৩. অপবাদকৃত ব্যক্তির আসল (উর্ধ্বতন) হওয়া যাবে না; যেমন বাবা, দাদা, মা, দাদী। সুতরাং যদি পিতা মাতা তাদের সন্তানকে (ছেলে, মেয়ে বা এর থেকে নিচের দিকের সন্তানের) অপবাদ দেয়, তাহলে তাদের উপর কোনো প্রকার শাস্তি নেই।

৪. স্বেচ্ছায় অপবাদ দিতে হবে। সুতরাং ঘুমন্ত বা বাধ্য হয়ে অপবাদ দেওয়ার উপর কোনো শাস্তি নেই।

৫. অপবাদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে অবগত হতে হবে। সুতরাং যে জানে না তার উপর কোনো হন্দ নেই।

ছিতীয়ত: অপবাদকৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে কিছু শর্ত; এগুলোও পাঁচটি:

১. মুসলিম হতে হবে, যে কাফেরকে অপবাদ দেয় তার উপর কোনো প্রকার হন্দ নেই।

২. বোধশক্তি সম্পন্ন হতে হবে, যে পাগলকে অপবাদ দিবে তার উপর কোনো প্রকার শাস্তি নেই।

৩. প্রাণ্তবয়স্ক হতে হবে। অথবা সহবাসে সক্ষম হতে হবে বা উপযুক্ত হবে। সে দশ বছরের ছেলে বা নয় বছরের মেয়ে (অথবা এর বেশি হবে)।

৪. প্রকাশ্যভাবে জিনাথেকে পরিত্র হতে হবে। সুতরাং তার উপর শাস্তি নেই যে পাপী ব্যক্তিকে অপবাদ দেয়।

৫. স্বাধীন হতে হবে। সুতরাং সেই ব্যক্তির উপর শাস্তি নেই যে দাসকে অপবাদ দেয়। নাবী ﷺ বলেন: مَنْ قَدَّفَ مَلُوكَهُ بِالرُّزْنَا، يُقَاتُمُ عَلَيْهِ الْحُدُّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَعَالٍ

“যে ব্যক্তি তার দাসকে জিনার অপবাদ দেয়, কিয়ামতের দিনে তার ওপর হন্দ কার্যকর করা হবে। তবে যা সে বলেছে তা যদি সঠিক হয়, তাহলে ভিন্ন কথা।”^{১১৩}

ইমাম নাববী ﷺ বলেন, এখানে একটি বিষয়ে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, দুনিয়াতে কোনো দাসের অপবাদদাতার উপর কোনো প্রকার হন্দ নেই। এ বিষয়ের উপর সবাই ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে দাসের অপবাদদাতাকে নিন্দামূলক শাস্তি দেওয়া হবে। কারণ দাস বিবাহিত নয়।^{১১৪}

ইতঃপূর্বে যা কিছু অবিবাহিত হলো তা থেকে স্পষ্ট হলো যে, অপবাদদাতার উপর হন্দ কার্যকর করার জন্য অপবাদকৃত ব্যক্তি মুহসিন হতে হবে। আর মহসিন হলো সে মুসলিম, জ্ঞানবান, স্বাধীন, জিনাথেকে পরিত্র, প্রাণ্তবয়স্ক অথবা সহবাসের জন্য উপযুক্ত বয়স হতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহর বাণী: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْسَنَاتِ

“যারা সতী-সার্কী নারীদের মিথ্যা অপবাদ দেয়...” [সুরা নূর : ৪]

এ থেকে বুঝা যাচ্ছে: ঐ ব্যক্তির উপর বেত্রাঘাত করা যাবে না, যে মুহসিন নয় এমর ব্যক্তির উপর অপবাদ দেয়।

^{১১৩} সহীহ মুসলিম, হা. ৪২০৩, ফুআ. ১৬৬০।

^{১১৪} শারহ সহীহ মুসলিম ১১/১৩১-১৩২।

المسألة الرابعة: شروط إقامة حد القذف

চতুর্থ মাসআলা: অপবাদের নির্বারিত শাস্তির জন্য কিছু শর্তসমূহ

অপবাদের শাস্তি ওয়াজিব হলে বাস্তবায়নের জন্য চারটি শর্ত পূরণ হওয়া আবশ্যিক। তা হলো:

১. অপবাদকৃত ব্যক্তি অপবাদদাতার শাস্তির আবেদন করবে। হন্দ কার্যকর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার এই আবেদন অব্যাহত থাকবে। কারণ অপবাদের শাস্তি অপবাদকৃত ব্যক্তির অধীনে। সুতরাং হন্দ বাস্তবায়িত হবে তার দাবি অনুপাতে। অথবা তার ক্ষমার কারণে হন্দ রাহিত হয়ে যাবে। যদি সে অপবাদদাতাকে ক্ষমা করে তাহলে তার উপর থেকে হন্দ রাহিত হবে। তবে ক্ষমা করে দিলেও তাকে শিক্ষামূলক শাস্তি দেওয়া হবে এজন্য যে, যাতে সে পরবর্তীতে এরকম হারাম অপবাদে না জড়ায়।

২. অপবাদদাতা যে বিষয়ে অপবাদ দিয়েছে তা সাব্যস্ত করার জন্য কোনো প্রমাণ নিয়ে আসবে না। আর সেই প্রমাণ হচ্ছে চারজন সাক্ষী। আল্লাহ তা'আলার বাদী:

﴿لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ﴾

“তারা যদি চার জন সাক্ষ্য না নিয়ে আসে, তোমরা তাদেরকে বেত্রাঘাত করো।” [সূরা নূর : ৪]

৩. অপবাদকৃত ব্যক্তিকে যে বিষয়ে তাকে অপবাদ দেওয়া হয়েছে, সেই বিষয়ে অপবাদদাতাকে সত্যায়িত করবে না এবং সেই বিষয়ে স্বীকারোক্তি দিবে না। যদি অপবাদকৃত ব্যক্তি স্বীকারোক্তি দেয় এবং অপবাদদাতাকে সত্যায়িত করে, তাহলে কোনো প্রকার শাস্তি নেই। কেননা তার স্বীকারোক্তি অপরাধ সাব্যস্তের প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট।

৪. অপবাদদাতা ও অপবাদকৃত উভয়ই পরস্পর লিআন করবে না। অপবাদদাতা যদি স্বামী হয় আর স্ত্রীর সাথে লিআন করে তাহলে হন্দ বাতিল হবে। যেমনটি লিআনের অধ্যায়ে অতিবাহিত হয়েছে।



الباب الرابع: في حد شارب الخمر চতুর্থ অনুচ্ছেদ: মদ্যপায়ীর নির্ধারিত শাস্তি

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المَسَأَةُ الْأُولَى: تَعْرِيفُ الْخَمْرِ وَحُكْمُهِ وَحُكْمَةُ تَحْرِيمِهِ

প্রথম মাসআলা: মদের পরিচয়, তার বিধান এবং তা হারাম হওয়ার হিকমাহ

الخمر বা মদ-এর পরিচয়:

এর শাব্দিক অর্থ: প্রত্যেক ঐ সকল জিনিস যা আকল, জ্ঞান ও বুদ্ধিতে প্রভাব ফেলে, সেটা যে-কোনো বস্তু হোক না কেন।

পারিভাষিক অর্থ:

كل ما أسكر سواء كان عصيراً أو نقيعاً من العنب أو غيره، أو مطبوخاً أو غير مطبوخ.

“প্রত্যেক ঐ জিনিস যা নেশাগ্রস্ত করে, চাই তা কোনো প্রকার জুস হোক অথবা আঙুর ফলের রস হোক বা অন্যান্য কিছু হোক; রান্না করা হোক বা না হোক।”

স্করা হচ্ছে বুদ্ধি-বিবেক বিকৃতি ঘটা।

স্করা হচ্ছে এমন পানি জাতীয় বস্তু যা তার পানকারীকে পাগল, বিবেকহীন ও মাতাল বানায়।

আর স্করান হচ্ছে বিবেকবান ব্যক্তির বিপরীত।

২. بِيَدِن: মদ পান করা হারাম। অনুরূপভবে যে পানি জাতীয় বস্তু বিবেককে বিকৃত করে তা হারাম। আর প্রত্যেক বিবেক বিকৃতকারী বস্তুই মদ। সুতরাং মদ পান করা জায়েয নেই। চাই কম হোক বা বেশি হোক। মদ পান করা কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। কুরআন-সুন্নাহ এবং ওলামাদের ঐকমত্যে মদ হারাম জিনিসের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর বাণী:

﴿فَإِنَّمَا يُؤْمِنُوا إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَإِنْ جَنَاحَنُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

“হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মুর্তিপূজার দেবী ও ভাগ্য নির্ণয় করার তীর; এসব ঘৃণার বন্ধ, শয়তানের কাজ। কাজেই তোমরা সেগুলোকে বর্জন করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।” [সূরা মায়িদাহ : ৯০]

এখানে বিরত থাকার প্রতি নির্দেশটি হারামের উপর প্রমাণ করে।

আয়িশাহ رض হতে বর্ণিত হাদীস। নাবী ﷺ বলেন:

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرْ فَهُوَ حَرَامٌ

“প্রত্যক ঐ সকল পানীয় দ্রব্য যা জ্ঞানকে বিকৃত করে, তাই হারাম।”^{১১৫}

ইবনে উমার رض থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে,

كُلُّ مُشْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ

“প্রত্যেক নেশাদার দ্রব্য মদ, আর প্রত্যক মদ হারাম।”^{১১৬}

মদ হারাম এবং তা থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে হাদীস এত বেশি যে তা মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌছে গিয়েছে। আর মদ হারাম হওয়ার উপর সকল উন্নত ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

৩. মদ হারাম হওয়ার পিছনে হিকমাহ:

আল্লাহ তা'আলা অনেক নিয়ামত দ্বারা মানুষরের উপর অনুগ্রহ করেছেন। তার মধ্যে একটি অনুগ্রহ হচ্ছে বিবেক বা জ্ঞান। যার মাধ্যমে অন্যান্য সমস্ত সৃষ্টি থেকে মানুষকে আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। কিন্তু প্রত্যেক বিবেক বিকৃতকারী বন্ধ এমন যে, যার মাধ্যমে মানুষে বিবেক নামক অনুগ্রহ হারিয়ে ফেলে, মুমিনদের মাঝে শক্রতা ও হিংবা বিব্রেষ ছড়িয়ে যায় এবং যা (মানুষকে) সলাত, আল্লাহর স্মরণ থেকে বাধা প্রদান করে। আল্লাহ এটা হারাম করেছেন। কারণ এই মন্দের ক্ষতি অনেক বড়ো এবং তার অনিষ্ট অনেক বেশি। শুধু তাই নয় এটি শয়তানের বাহন, সে মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের জন্য এর উপর আরোহন করে বেড়ায়।

আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ فِي الْحُنْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصْدِقُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾

“শয়তান চায়, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শক্রতা ও বিব্রেষ ঘটাতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরনে ও সলাতে বাঁধা দিতে। তবে কি তোমরা বিরত হবে না?” [সূরা মায়িদাহ : ১১]

^{১১৫} মুতাওয়াতুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, খ. ৫৫৮৫; সহীহ মুসলিম, খ. ফুআ, ২০০১।

^{১১৬} সহীহ মুসলিম, খ. ৫১১৩, ফুআ, ২০০৩-(৭৫)।

المسألة الثانية: حد شارب الخمر، وشروطه، ومتى يثبت؟

**দ্বিতীয় মাসআলা: মদ পানকারীর জন্য নির্ধারিত শাস্তি, এর শর্তসমূহ এবং
কোন বিষয়ের মাধ্যমে শাস্তি সাব্যস্ত হবে?**

১. মদ পানকারীর জন্য শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি:

মদ পানকারীর জন্য শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি বেত্রাঘাত, যের পরিমাণ হচ্ছে ৪০টি। তবে ৮০ বেত্রাঘাত করা জায়েয় আছে, যা কার্যকর হবে বিচারকের ইজতেহাদের উপর। আর এটা তখন যখন মানুষ মদপানে মগ্ন হয়ে যাবে। তখন বিচারক এই বিষয়ে প্রয়োজন অনুসারে অতিরিক্ত বেত্রাঘাত করতে পারে। কেননা চল্লিশটি সীমাবদ্ধ করা হয়নি। ওয়ালিদ ইবনে উকবাহ আল-কান্দু এর থেকে হাদীস রয়েছে-

جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَيْنَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعَيْنَ، وَعُمَرُ تَمَانِينَ، وَكُلُّ سُنَّةٍ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ

“নাবী  চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন। আবু বকর  চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন এবং উমার  আশিটি বেত্রাঘাত করেছেন। এই সবগুলোই সুন্নাত এবং এটাই আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়।”^{১১৭}

আনাস কেবল থেকে বর্ণিত।

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْحَمْرِ بِالنَّعَالِ وَاجْتَرِيدُ أَزْبَعِينَ

“ନାବି ମଦ ପାନ କରାର କ୍ଷେତ୍ରେ ଜୁତା ଏବଂ ଖେଜୁରେର ଡାଲ ଦିଯେ ୪୦ ଟି ପ୍ରହାର କରେଛେ ।”^{୧୮}

২. মদ পানের শাস্তি কার্যকর করার ফেত্তে শর্তসমূহ:

মাতাল ব্যক্তির ওপর হন্দ কার্যকর করার জন্য কিছু শর্ত করা হয়েছে:

- মুসলিম হতে হবে। সুতরাং কাফেরের উপর কোনো প্রকার হন্দ নেই।
 - প্রাণবয়স্ক হতে হবে। সুতরাং নাবালকের উপর কোনো প্রকার হন্দ নেই।
 - জ্ঞানবান হতে হবে। সুতরাং পাগল বা অর্ধ পাগলের উপর কোনো প্রকার হন্দ নেই।
 - ইচ্ছাকৃতভাবে পান করতে হবে। সুতরাং বাধ্য বা ভুলঝর্মে অথবা অনুরূপ কিছুর কারণে পানকারীর উপর কোনো প্রকার হন্দ নেই। নাবী ﷺ এর বক্তব্য এই তিনটি শর্ত উপর প্রমাণ বহন করে। তা হচ্ছে,

إِنَّ اللَّهَ يَمْجَدُ أَلْمَتَى الْحَطَّاً، وَالنُّسْبَيَانَ، وَمَا اشْتَكَرُهُوا عَلَيْهِ

११७ सदीक मसलिम, हा. ४३४९, फुआ. १७०७।

^{***} সংষ্ঠীদ মন্দির, হা. ৪৩৪৪, ফুআ. ১৭০৬।

“নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমার উক্ততের ভুল, ভুলে যাওয়া বিষয়গুলো এবং তাদের ওপর যা চাপিয়ে দেওয়া হয় তা ক্ষমা করে দিবেন।”

আল্লাহর রসূল ﷺ আরও বলেন: ... رُفِعَ الْقَلْمَنْ عَنْ تَلَانَةٍ ...

“তিনি ধরনের লোকের উপর থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে....।”^{৯১৯} পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

➤ মদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে অবগত থাকবে। সুতরাং অজ্ঞ, মূর্খ ব্যক্তির উপর কোনো প্রকার হন্দ নেই।

➤ এই পানীয় দ্রব্য মদ হওয়ার ব্যাপারে অবগত হতে হবে। সুতরাং যদি হালাল পানি মনে করে পান করে তাহলে কোনো হন্দ নেই।

৩. যে জিনিস এর মাধ্যমে মদ পানের নির্ধারিত শাস্তি সাব্যস্ত হবে:

নিম্নের দুটির কোনে একটির মাধ্যমে মদপানের নির্ধারিত শাস্তি সাব্যস্ত হবে:

ক. পান করার ব্যাপারে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে। যেমন সে স্বীকার করবে যে সে ইচ্ছাকৃতভাবে পান করেছে।

খ. সুস্পষ্ট প্রমাণ এর মাধ্যমে। আর তা হচ্ছে দুইজন মুসলিম ও ন্যায়পরায়ন পুরুষ ব্যক্তির সাক্ষ দেওয়া।

الْمَسْأَلَةُ الْثَّالِثَةُ: حُكْمُ الْمَخْدِرَاتِ وَالْتِجَارَبِ

তৃতীয় মাসআলা: সমসাময়িক ক্ষতিকারক দ্রব্য বা সিগারেট এবং তা দ্বারা ব্যবসার বিধান

১. মদ ছাড়াও সমসাময়িক ক্ষতিকর দ্রব্য:

এখানে ক্ষতিকারক বস্তু দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সকল জিনিস যা বুদ্ধি, বিবেক, জ্ঞানকে আবৃত করে নেয়। যে এগুলো গ্রহণ করে তাকে অলসতা, শরীর ভারী ভারী মনে হওয়া, শৈথিল্য ভাব পেয়ে বসে। যেমন- এনেস্টেটিক, আফিম, একগ্রকার পাতা জাতীয় উপাদান বিশেষ ইত্যাদি। সুতরাং এতে যে ব্যক্তি অভ্যস্ত হোক না কেন, তা হারাম। আয়িশাহ رض এর হাদীসে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

كُلْ شَرَابٌ أَسْكَرٌ فَهُوَ حَرَامٌ

“প্রত্যেক পানীয় দ্রব্য যা বিবেককে বিকৃত করে সেটাই হারাম।”^{৯২০}

^{৯১৯} সুনান আবু দাউদ, হা. ৪৩৯৯; ৪৪০১; ৪৪০২।

^{৯২০} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৫৫৮৫; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ২০০১।

উমার এর আরেকটি হাদীস নাবী বলেন:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ

“প্রত্যেক নেশাদার দ্রব্য মদ, আর প্রত্যেক মদ হারাম” ।”^{১২১}

এ সমস্ত ক্ষতিকারক দ্রব্য (সিগারেট) এর ক্ষতি অনেক জটিল ও কঠিন। এমনকি এর মাধ্যমে ব্যাপক গোলযোগ, উচ্চতের যুবকদের ধূৎস, তাদের প্রতিপালকের আনুগত্য থেকে এবং তাদের শক্রদের সাথে জিহাদ করা থেকে অন্যমনষ্ট হওয়া সহ দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে অনেক বড়ো ক্ষতি বয়ে নিয়ে আসে।

২. এই সমস্ত ক্ষতিকারক দ্রব্যের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য করার বিধান:

إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ بَيْعَ الْحُمْرِ وَالْمِيَّتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَضْنَامَ

“ଆଜ୍ଞାହ ତା‘ଆଲା ମଦ, ମୃତ ଜାନୋଯାର ଏବଂ ପ୍ରତିମା ହାରାମ କରେଛେ ।” ୧୨୨

ନାବୀ ଆରାମ୍ଭ ବଲେନ୍:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَمَ شَيْئًا حَرَمَ ثُمَّهُ

“ଆଲାହୁ ଯଥନ କୋନୋ କିଛୁ ହାରାମ କରେନ, ତଥନ ତାର ମୂଲ୍ୟରେ ହାରାମ କରେନ ।” ୧୯୨୩

ଏ କାରଣେ ଆଲେମଗଣ ବଲେନ, ଆଜ୍ଞାହ ତା'ଆଲା ଯେ ଜିନିସେର ମାଧ୍ୟମେ ଉପକାର ଲାଭ କରା ହାରାମ କରେଛେ, ତା କ୍ର୍ୟ-ବିକ୍ର୍ୟ କରା ଏବଂ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଖାଓୟା ହାରାମ । ତାଇ ମଦେର କ୍ର୍ୟ-ବିକ୍ର୍ୟ ଥିକେ ନିଷେଧ କରେ ଶରୀଯତେର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥିକେ ଏକେ କ୍ଷତିକାରକ ଦ୍ରବ୍ୟମୁହେର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେଛେ । ସୁତରାଂ ଏଗୁଲୋ କ୍ର୍ୟ-ବିକ୍ର୍ୟ କରା ଜାଯେଯ ନେଇ ଏବଂ ଏର ମାଧ୍ୟମେ ବ୍ୟବସା-ବାଣିଜ୍ୟ କରାର ମାଧ୍ୟମେ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପଦଓ ହାରାମ ହବେ ।

୧୯ ମହିନେ ମୁସଲିମ, ହୀ. ୫୧୧୩, ଫୁଆ. ୨୦୦୩।

^{২২} সহীহ মুসলিম, হা. ৩৯৪০, ফুআ. ১৫৮।

^{২৪০} সুনাম আব দাউদ, হ্য. ৩৪৮৮; আহমদ ১/২৪২।



الباب الخامس: في حد السرقة পঞ্চম অনুচ্ছেদ : চুরির নির্ধারিত শাস্তি

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المسألة الأولى: تعريف السرقة، وحكمها، وحد فاعلها، والحكمة من إقامة الحد فيها

প্রথম মাসআলা: চুরি করার পরিচয়, তার বিধান, শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি
এবং তা কার্যকর করার পেছনে হিকমাহ

১. চুরির পরিচয়:

এর শাব্দিক অর্থ: **السرقة** অর্থাৎ খুঁজে নেওয়া।

পরিভাষায়:

أخذ مال الغير خفية ظلماً من حرز مثله بشروط معينة

“নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে সংরক্ষিত স্থান বা অনুরূপ কোনো জায়গা থেকে অন্যায়ভাবে গোপনে অন্যের সম্পদ গ্রহণ করা।”

এর বর্ণনা অচিরেই আসছে ইনশাআল্লাহ।

২. চুরির বিধান:

চুরি করা হারাম। কারণ এর মাধ্যমে অন্যের অধিকারে হ্রস্ফেপ করতঃ সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রহণ করা হয়। কুরআন-সুন্নাহ, আলেমদের ঐকমত্যে তা হারাম হওয়ার উপর প্রমাণ করে। এটি কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাঁ'আলা এরকম কাজের কর্তাকে অভিশপ্ত করেছেন। যেমন

আবু হুরায়রা رض এর হাদীস যা আল্লাহর রসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

لَعْنَ اللَّهُ السَّارِقُ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتَقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتَقْطَعُ يَدُهُ

“আল্লাহ তা‘আলা চোরের উপর অভিশাপ দিয়েছেন। যখন সে ডিম চুরি করে অতঃপর এর জন্য তার হাত কাটা হয় এবং চোর যখন রশি চুরি করে যার জন্য তার হাত কাটা হয়।”^{১২৪}
এ ছাড়াও চুরি করা এবং তা থেকে ফিরে আসার ব্যাপারে অনেক হাদীস রয়েছে।

৩. চুরির জন্য শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি :

চোরের উপর নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর করা আবশ্যিক। আর তা হচ্ছে তার হাত কর্তৃ করা; চাই সে পুরুষ হোক বা মহিলা। আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوا أَيْدِيهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبُوا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“পুরুষ চোর ও নারী চোর, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও। তাদের কৃতকর্মের ফল ও আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা মায়দাহ : ৩৮]

আয়িশাহ رض এর হাদীস তিনি বলেন:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

“আল্লাহর রসূল ﷺ এক দিনারের চারভাগের একভাগ বা এর চেয়ে বেশি দিনারের ক্ষেত্রে চোরের হাত কেটেছেন।”^{১২৫}

অনুরূপভাবে আয়িশাহ رض এর থেকে আরেকটি হাদীস। তিনি বলেন, “কুরাইশদেরকে মাখজুম গোত্রের এক মহিলার সম্মান উদ্বিগ্ন করে তুলল, যে চুরি করেছিল। এই ক্ষেত্রে নাবী ﷺ বলেছেন:

وَإِنْمَّا اللَّهُ لَوْلَأْنَ فَاطِمَةَ بْنَتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقْطَعَتْ يَدَهَا

“আল্লাহর কসম মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করে, অবশ্যই আমি তার হাত কাটবো।”^{১২৬} অতঃপর ঐ মহিলা যে চুরি করেছিল তার ব্যাপারে হাত কাটার নির্দেশ দিলে তার হাত কাটা হলো।

^{১২৪} মুজ্ফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৬৭৮৩; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৬৮৭।

^{১২৫} মুজ্ফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৬৭৯০; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৬৮৩।

^{১২৬} মুজ্ফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৩৪৭৫; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৬৮৮।

মুসলিমগণ একবাকে চুরি করা হারাম হওয়া এবং চোরের হাত কর্তন করার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

৪. চুরির শাস্তি কার্যকর করার পিছনে হিকমাহ:

ইসলাম সম্পদের মর্যাদা দিয়েছে এবং ব্যক্তির অধীনস্থ অধিকারের মর্যাদা দিয়েছে। সুতরাং চুরি, ছিনতাই, ধোকা, খিয়ানত, সুদ, ঘৃষ; এ ছাড়াও অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ খাওয়ার সমস্ত পদ্ধতির মাধ্যমে এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হারাম করেছে।

আর যেহেতু চোর সমাজের নিকৃষ্টতম অংশ এবং যদি তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে অবশ্যই তার ক্ষতি ও অনিষ্টতা ছড়িয়ে পড়বে। তাই ইসলাম এই হাত কেটে ফেলার বিধান অন্যায় কাজের শাস্তি, অন্যকে এমন অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখা এবং মানুষের সম্পদ ও অধিকার রক্ষা করার উদ্দেশ্যে করেছে।

المسألة الثانية: شروط وجوب حد السرقة

দ্বিতীয় মাসআলা: চুরির শাস্তি ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্তসমূহ

চুরি করার শাস্তি কার্যকর করা এবং চোরের হাত কাটার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তগুলো প্রযোজ্য:

১. গোপনে সম্পদ নিতে হবে। সুতরাং যদি এমনভাবে না নেয় তাহলে হাত কাটা হবে না। তাই জোরপূর্বক লুটকারী, ছিনতাইকারী ও ডাকাতের হাত কাটা হবে না। নাবী ﷺ বলেছেন:

لَيْسَ عَلَىٰ خَاتِئِنَ، وَلَا مُسْتَهْبِ، وَلَا مُخْتَلِسِ قَطْعُ

“খিয়ানতকারী, ছিনতাইকারী এবং ডাকাতের হাত কাটা হবে না।”^{১২৭}

২. চোরকে মুকাল্লাফ তথা শরীয়তের বিধিনিষেধের দায়িত্বপ্রাপ্ত (জ্ঞানবান এবং প্রাপ্তবয়স্ক) হতে হবে। সুতরাং নাবালক বা পাগলের উপর হাত কাটার কোনো বিধান নেই। কেননা এই দুই শ্রেণির মানুষের উপর থেকে শরীয়তের দায়িত্ব উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। যেমন উক্ত বিষয়ের আলোচনা পূর্বেই গত হয়েছে। তবে ছোটো বাচ্চা যখন চুরি করবে তখন তাকে শিষ্টাচার স্বরূপ হালকা প্রহার করা যাবে।

৩. ইচ্ছাকৃতভাবে চুরি করবে। বাধ্য হয়ে চুরি করলে হাত কাটা হবে না। কেননা সে বাধ্য।
নাবী ﷺ এর বাণী: رفع عنْ أَمْتَيِ الْحَطَّا، وَالنُّشْيَانَ، وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِ:

^{১২৭} তিরমিয়ী, ঘ. ১৪৮৮; ইবনু মাজাহ, ঘ. ২৫৯১; বর্ণনা তিরমিয়ীর এবং তিনি হাসান সহীহ বলেছেন। ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহত তিরমিয়ী, ঘ. ১১৭২।

“আমার উপর থেকে তাদের ভুল, ভুলে যাওয়া বিষয় এবং তাদের উপরে বাধ্য করে চাপিয়ে দেওয়া হয় তা ক্ষমা করে দাওয়া হয়েছে।”^{১২৮}

৪. চুরি করা হারাম হওয়া সম্পর্কে অবগত হতে হবে। সুতরাং চুরি করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে অজ্ঞ ব্যক্তির উপর হাত কাটার বিধান নেই।

৫. চুরির জিনিস অবশ্যই সম্মানজনক হবে। তাই সে জিনিস সম্পদ নয়, যার সম্মান নেই। যেমন চিত্তবিনোদনের সরঞ্জাম, মদ, শুকর এবং মৃত প্রাণী। এমনিভাবে সম্পদ হিসেবে গণ্য তবে তার কোনো মর্যাদা নেই। যেমন যুদ্ধরত কাফেরের সম্পদ (কারণ কাফের এর জান-মাল বৈধ), এতে হাত কাটা হবে না।

৬. চুরিকৃত সম্পদ শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণে পৌছাতে হবে। অর্থাৎ এক দিনার স্বর্ণের চার ভাগের এক ভাগ বা এর চেয়ে বেশি হতে হবে। আর রূপার ক্ষেত্রে ৩ দিরহাম পরিমাণ অথবা এই দুটির সমপরিমাণ অন্যান্য অর্থ-সম্পদ হবে। এর কম হলে হাত টাকা হবে না। নাবী

বলেন:

لَا تُنْقَطِعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

“স্বর্ণ মুদ্রার চারভাগের একভাগ বা এর চেয়ে বেশি হলে চোরের হাত কাটা হবে।”^{১২৯}

৭. চুরিকৃত সম্পদ সংরক্ষণের স্থান থেকে চুরি হবে। আর তা হলো এমন স্থান যেখানে সচারাচর সম্পদ হেফাজতে রাখা হয়। সম্পদ ও দেশভেদে যা বিভিন্ন রূক্ম হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে তা প্রচলিত রীতিনীতির অনুযায়ী হবে। যদি কেউ সংরক্ষণের স্থান ছাড়া অন্য স্থান থেকে নেয়, যেমন সে দরজা খোলা পায় অথবা সংরক্ষণের স্থান ভাঙ্গা অবস্থায় পায়, তাহলে হাত কাটা হবে না।

৮. চোরের ব্যাপারে সন্দেহমুক্ত হওয়া। সে চুরি করেছে, এই ব্যাপারে যদি কোনো প্রকার সন্দেহ থাকে, তাহলে তার হাত কাটা হবে না। কেননা শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তিসমূহ সন্দেহ থাকলে কার্যকর হয় না। সুতরাং কেউ তার পিতার সম্পদ চুরি করলে তার হাত কাটা হবে না। অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি তার ছেলের সম্পদ চুরি করলেও হাত কাটা হবে না। কেননা তাদের উভয়ের একজন অন্যজনের জন্য ব্যয় করা আবশ্যিক। কেউ যদি তার অংশীদারের সম্পদ থেকে এমন সম্পদ চুরি করে, যাতে তার অংশ রয়েছে, তাহলে এই চুরির জন্য তার হাত কাটা হবে না। অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি তার অধিকারভুক্ত সম্পদ থেকে কিছু গ্রহণ করলে তার হাত কাটা হবে না। তবে তাকে শিক্ষামূলক শাস্তি দিতে হবে এবং সে যা গ্রহণ করেছেন তা ফেরত দিবে।

^{১২৮} ইবনু মাজাহ, ঘ. ২০৪৩; বায়হাকী এবং তিনি সহীহ বলেছেন। শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, ইরওয়া, নং ৮২।

^{১২৯} সহীহ মুসলিম, ঘ. ৪২৯০, ফুআ. ১৬৮৪-(২)।

৯. বিচারকের নিকট চুরির বিষয়টি প্রমাণিত হতে হবে। সেটি হতে পারে দুইজন ন্যায়পরায়ন ব্যক্তির সাক্ষ্য বা চোরের স্বীকৃতি প্রদান। মহান আল্লাহর ব্যাপক অর্থবোধক বাণীর কারণে:

﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾

“তোমাদের পুরুষদের মধ্যে হতে দুইজন সাক্ষী রাখো।” [সূরা বাকুরাহ : ২৮২]

আর স্বীকৃতিকে প্রমাণ করার কারণ হচ্ছে, মানুষ নিজের বিপক্ষে মিথ্যা স্বীকৃতি দিবে না, যাতে সে ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

১০. যার থেকে চুরি করা হয়েছে তাকে তার সম্পদের দাবি করতে হবে। কারণ সম্পদ ব্যবহারে বৈধতা দেওয়া যায়। সুতরাং এই স্তুতিনা থাকে যে, ব্যক্তি হয়তো তার কোনো সাথীকে তার সম্পদ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে অথবা তার সংরক্ষিত স্থানে প্রবেশের অধিকার দিয়েছে অথবা এমন কিছু করেছে, যার ফলে হৃদ রহিত হয়ে যায়।

المسألة الثالثة في حد السرقة، وهبة المسروق للسارق

তৃতীয় মাসআলা: চুরির শাস্তির ক্ষেত্রে সুপারিশ এবং চোরকে চুরিকৃত সম্পদ দিয়ে দেওয়া

১. চুরির শাস্তির ব্যাপারে সুপারিশ করা: বিচারকের নিকট চুরির বিষয়টি প্রমাণিত হওয়া বা তার নিকট পৌছার পর চুরির শাস্তির ব্যাপারে সুপারিশ করা জায়েয় নেই। এমনকি অন্যান্য শাস্তির ব্যাপারেও না। কারণ মাখজুম গোত্রের একজন মহিলা যে চুরি করেছিল, তার ব্যাপারে উসামা বিন যায়েদ رض যখন সুপারিশ করার ইচ্ছা করলেন, তখন নাবী رض বললেন:

أَنْشَفْتُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

তুমি কি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে সুপারিশ করছো? ^{১৩০}

এই ব্যাপারে হৃদুদ অধ্যায়ের প্রথম দিকে অনেক কথা অতিক্রম হয়েছে।

২. চোরকে চুরিকৃত সম্পদ দান করে দেওয়া: চোরকে চুরিকৃত সম্পদের কিছু অংশ হেবা বা দান করে দেওয়া এবং উক্ত বিষয়টি বিচারকের নিকট উপস্থাপন এর পূর্বেই যার সম্পদ চুরি করা হয়েছে, চোরকে তার পক্ষ থেকে ক্ষমা করা জায়েয়। পক্ষান্তরে বিষয়টি বিচারকের নিকট পৌছে গেলে আর জায়েয় হবে না। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া رض এর হাদীস ঐ চোরের

^{১৩০} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৩৪৭৫; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৬৮৮।

ব্যাপারে যে তার মাথার নিচ থেকে চাদর চুরি করেছিল। অতঃপর ঘখন সে উক্ত বিষয়টি নাবী
এর নিকট উপস্থাপন করল, তখন নাবী
তাঁর হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। সাফওয়ান
বললেন, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হে আল্লাহর রসূল! চুরিকৃত
চাদরটি তাকে দিয়ে দিলাম। একথা শুনে নাবী
বললেন:

هَلْ لَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ

“ଆମାର କାହେ ତାକେ ନିଯେ ଆସାର ପରେ କେନ ତା କରଲେ ନା?” ୧୩

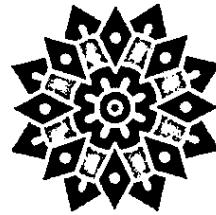
المسألة الرابعة: كيفية القطع وموضعه

চতুর্থ মাসআলা: হাত কাটার পদ্ধতি এবং হাতের কেন স্থান কাটা হবে?

পূর্বে উল্লিখিত শর্তসমূহ যখন পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন হাত কাটা ওয়াজিব। চোরের ডান হাতের তালুর জোড়া (কবজি) পর্যন্ত কেটে দেওয়া হবে। হাত কেটে দেওয়ার পরপরই চোরের হাতে আগনের ছেক বা তেলে চুবিয়ে দেওয়া হবে অথবা এগুলো ছাড়া এমন মাধ্যম বা উপকরণ ব্যবহার করবে, যা রঞ্জ বন্ধ করে দেয়। যার ফলে এর ক্ষতস্থান শুকিয়ে যাবে এবং যার হাত কাটা হবে সে মৃত্য বা ক্ষতির সম্ভাবনা না হয়।

চোর দ্বিতীয়বার আবার ঢরি করলে, তার বাম পা কেটে নেওয়া হবে।

^{১০৩} নামাঞ্জি, ঘ. ৪৮৮৪; আহমদ ৬/৪৬৬ সহীহ বর্ণনা। শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, ইরওয়া নং ২৩১৭।



الباب السادس: في التعزير ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : শিক্ষামূলক শাস্তি (তৈরি)

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المسألة الأولى: تعريف التعزير، وحكمه، والحكمة منه

প্রথম মাসআলা: শিক্ষামূলক শাস্তির পরিচয়, তার বিধান এবং এর উপকারিতা

১. শিক্ষামূলক শাস্তির পরিচয় :

এর শাব্দিক অর্থ: المنع والرد بـ **التعزير** বা নিষেধ করা, বাধা দেওয়া। এবং তা সম্মানের সাথে সাহায্য করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿وَتُعَزِّرُوهُ وَتُؤْقِرُوهُ﴾
“তোমরা তাকে সাহায্য সম্মান করো।” [সূরা ফাতহ : ৯]

এই বিষয়টি শক্তিকে অনিষ্ট থেকে বাঁধা প্রদান করে।

কখনো কখনো **শব্দটি** তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়ে থাকে عزره যার অর্থ হচ্ছে, তাকে পাপ কাজে পতিত হওয়ার কারণে শিক্ষামূলক শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এ অর্থে এটি আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী دادصْحَا বা একই মৌলের বিপরীত অর্থবোধক শব্দ হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু এই মৌলের মূল অর্থ বাধা দেওয়া।

পারিভাষিক অর্থ:

التأديب في كل معصية لا حد لها ولا كفارة
“ঐ সমস্ত অপরাধের জন্য শিক্ষামূলক শাস্তি দেওয়া যে অপরাধে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত কোনো শাস্তি এবং কাফফারা নেই।”

২. শিক্ষামূলক শাস্তির বিধান: ইমাম প্রয়োজন মনে করলে, শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত কোনো শাস্তি ও কাফফারা নেই, এমন পাপ কাজে জড়িত ব্যক্তিকে শিক্ষামূলক শাস্তি দেওয়া আবশ্যিক; যাতে হারাম কাজ করা হয় ও ওয়াজিব বর্জন করা হয়। আবু বুরদাহ ইবনে নাইয়ার رضي الله عنه হতে বর্ণিত হাদীস। নাবী ﷺ বলেন:

لَا يُجَلِّدُ قَوْمٌ عَشْرَ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

“আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত শাস্তিসমূহ ছাড়া অন্য কোনো অপরাধের শাস্তি ১০ বেত্রাঘাত এর বেশি নেই।”^{১০২}

নাবী ﷺ অনুমানের ভিত্তিতে আটক করেছিলেন।^{১০৩}

উমার رض দেশান্তর, মাথা মুগ্ন বা এরকম কিছুর মাধ্যমে শিক্ষামূলক শাস্তি দিতেন। এই শিক্ষামূলক শাস্তির বিষয়টি বিচারক বা তার স্থলাভিষিক্ত যে থাকবে তার অধীন হবে। যখন শিক্ষামূলক শাস্তি দেওয়ার মধ্যে উপকার দেখবে, তখন শাস্তি দিবে। আর তা পরিত্যাগ করার মধ্যে উপকার দেখলে, পরিত্যাগ করবে।

৩. শিক্ষামূলক শাস্তি শরীয়ত সম্মত হওয়ার পেছনে ইকমাহ:

সমাজকে অন্যায়, বিশৃঙ্খলাশূলক কাজ থেকে রক্ষা, অন্যায়কে প্রতিহত করা, অপরাধীদের ধর্মক ও শিষ্টাচার শিক্ষা স্বরূপ শিক্ষামূলক শাস্তি শরীয়ত সম্মত করা হয়েছে।

الْمَسَأَةُ الثَّانِيَةُ: أَنواعُ الْمَعَاصِي الَّتِي تُوجِبُ التَّعْزِيرَ

দ্বিতীয় মাসতালা: এই সমস্ত অপরাধের প্রকারসমূহ যার ব্যাপারে শিক্ষামূলক শাস্তি দেওয়া আবশ্যিক হয়

যে সমস্ত অপরাধের জন্য শিক্ষামূলক শাস্তি আবশ্যিক তা দুই প্রকার:

১. শরীয়ত কর্তৃক ওয়াজিব কাজ বাস্তবায়নে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ছেড়ে দেওয়া। যেমন ঝণ পরিশোধ করা, আমানত রক্ষা করা ও ইয়াতীমদের মাল বুঝিয়ে দেওয়া। সুতরাং এই সমস্ত বিষয় বা অনুরূপ কিছু বিষয় যা পূর্ণভাবে আদায় না করলে তাকে শাস্তি দিতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আদায় করবে। আবু হুরায়রা رض থেকে বর্ণিত হাদীসে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

“ধনী ব্যক্তির (ঝণ পরিশোধে) তালবাহানা করা অন্যায়।”^{১০৪}

অন্য বর্ণনায় এসেছে, **لِلْوَاجِدِ مُحِلٍّ عِرْضَةً، وَعَقْوَبَتُهُ**

“যে সচ্ছল ব্যক্তি দেনা পরিশোধ করতে গড়িমসি করে, তাকে অপমান ও শাস্তি দেওয়া উভয়ই আমার জন্য হালাল।”^{১০৫}

^{১০২} মুত্তাফাকুন আলাইহি; সহীল বুখারী, হা. ৬৮৪৮, ৬৮৪৯; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৭০৮।

^{১০৩} তিরমিয়ী হা. ১৪৫০; সুনান আবু দাউদ, হা. ৩৬৩০; ইমাম আলবানী হাসান বলেছেন, সহীহত তিরমিয়ী নং ১১৪৫।

^{১০৪} মুত্তাফাকুন আলাইহি; সহীল বুখারী, হা. ২৪০০; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৫৬৩।

২. হারাম কাজ করা। যেমন একজন ছেলে অপরিচিত একজন মহিলার সাথে নির্জনে অবস্থান করা বা লজ্জাস্থান ছাড়া তার সাথে অন্যভাবে মেলামেশা করা, চুম্বন করা অথবা তার সাথে মজা করা। আবার এমনও হতে পারে যে, মহিলা-মহিলা সমকামিতা করা। সুতরাং এরকম বা অনুরূপ কাজের জন্য শিক্ষামূলক শাস্তি রয়েছে। কারণ এসকল বিষয়কে কেন্দ্র করে শরীয়তে কোনো নির্ধারিত শাস্তির বিধান আসেনি।

المسألة الثالثة: مقدار التعزير

তৃতীয় মাসআলা : তা'বীর বা শিক্ষামূলক শাস্তির পরিমাণ

শিক্ষামূলক শাস্তির পরিমাণের ক্ষেত্রে শরীয়তে কোনো নির্ধারিত সীমা নেই। বিচারকের পর্যালোচনা ও তার দৃষ্টিতে কাজটির জন্য উপযুক্ত শাস্তিবিধি-ই সে অপরাধের শিক্ষামূলক শাস্তি। এমনকি কোনো কোনো আলেম মনে করেন যে, মাসলাহাত বা কল্যাণকর দিক লক্ষ্য করে, কখনো কখনো মৃত্যুদণ্ডের মাধ্যমে তা'বীর বাস্তবায়ন করা হবে। যেমন- মুসলিম গুপ্তচর, মুসলিম সমাজের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টিকারী কিংবা এই ধরনের মানুষদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া, যাদের অনিষ্ট থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার একমাত্র পথই এটি।

المسألة الرابعة: أنواع العقوبات التعزيرية

চতুর্থ মাসআলা : শিক্ষামূলক শাস্তির প্রকারসমূহ

শিক্ষামূলক শাস্তি-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করে একে কয়েক ভাগে বিভক্ত করা যায়:

১. দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়: যেমন বেত্রাঘাত ও মৃত্যুদণ্ড।
২. সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়: যেমন- কোনো কিছু নষ্ট করে ফেলা, জরিমানা আদায় করা। উদাহরণ: মৃত্তি, অনর্থক বস্তু, বাদ্যযন্ত্র, মদের পাত্র ভেঙ্গে ফেলা।
৩. দেহ ও সম্পদ উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়: যেমন- চোর যদি কোনো অরক্ষিত স্থান থেকে চুরি করে, তবে বেত্রাঘাতের পাশাপাশি তাকে দ্বিগুণ জরিমানা করা হবে। গাছের ফল চাতালে নেওয়ার পুরোই চুরি করেছিল, এমন এক চোরের ব্যাপারে নাবী ﷺ ফয়সালা দিয়েছিলেন: তার উপর হন্দ প্রয়োগ করা হবে এবং সে দ্বিগুণ জরিমানা প্রদান করবে। অর্থ: খেজুর শুকানোর স্থান।
৪. সীমাবদ্ধতার সাথে সম্পৃক্ত: যেমন- কারাবন্দী ও নির্বাসন।
৫. মানসিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত: যেমন- তিরস্কার ও ধর্মক দেওয়ার মাধ্যমে ব্যক্তিকে মানসিক কষ্টে ফেলা।

^{৩০} সুনান আবু দাউদ, হা. ৩৬২৮; নাসাই ৭/৩১৬; ইবনু মাজাহ, হা. ২৪২৭; ইয়াম আলবানী হাসান বলেছেন, দেখুন, সহীহ সুনান
নাসাই, নং ৪৩৭২, ৪৩৭৩। ফু- গড়িমসি করা।



الباب السابع: في حد الحرابة সপ্তম অনুচ্ছেদ : লুটতরাজের নির্ধারিত শাস্তি

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: تَعْرِيفُ الْحَرَابَةِ، وَحِدَّةُ الْمَحَارِبِينَ

প্রথম মাসআলা: লুটতরাজের পরিচয় ও লুটপাটকারীদের শাস্তি

শব্দের শাব্দিক অর্থ: حَرَابَةٌ شَبَدَتِ الْحَرَابَةُ শব্দটি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ সে তার সমস্ত সম্পদ লুট করেছে।

পারিভাষিক অর্থ:

البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب، مكابرة، اعتماداً على الشوكة، مع البعد عن مسافة الغوث، من كل مكلف ملتزم للأحكام، ولو كان ذميأً أو مرتدًا

“সাহায্যের অবকাশহীন দূরবর্তী স্থানে (শহর বা এলাকার বাইরে), বল প্রয়োগপূর্বক সম্পদ ছিলতাই অথবা হত্যা অথবা ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য বিধিনিষেধের দায়বদ্ধ ব্যক্তি কর্তৃক দাঙ্কিতার সাথে, প্রকাশ্যে বের হওয়াকে হারাব বলা হয়। যদিও সে জিঞ্চি বা ধর্মত্যাগী হয়।”

টাকে ডাকাতি-ও বলা হয়।

লুটতরাজের নির্ধারিত শাস্তি এবং লুটপাটকারীদের জন্য শাস্তি:

লুটপাট বা যারা ডাকাতি করে ত্রাস সৃষ্টিকারী, তাদের জন্য শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর করার ক্ষেত্রে দলীল মহান আল্লাহর বানী:

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُخَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصْلَبُوا أَوْ تُفَطَّلَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلَافٍ أَوْ يُنْفَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾

“যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং জমিনে বিশৃঙ্খলা করে বেড়ায়, তাদের আয়াব এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শুলে চড়ানো হবে কিংবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশান্তর করা হবে।” [সূরা মায়দাহ : ৩৩]

লুটরাজ কর্মের শাস্তি এবং লুটপাটকারীদের শাস্তি অন্যায়ের ভিন্নতা অনুপাতে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যার বর্ণনা নিম্নে আসছে:

- যে তাদের মধ্য থেকে কাউকে হত্যা করে এবং সম্পদ ছিনিয়ে নেয়, তাকে হত্যা করা হবে এবং শুলে চড়ানো হবে, যাতে তার বিষয়টি প্রচার-প্রসার লাভ করে। ওলামাদের ঐকমত্যে তাকে ক্ষমা করা বৈধ না।
- যে তাদের মধ্য থেকে কাউকে হত্যা করে কিন্তু সম্পদ নেয় না, তাকে হত্যা করা হবে, তবে শুলে চড়ানো হবে না।
- যে সম্পদ ছিনিয়ে নিবে কিন্তু হত্যা করবে না, এই ব্যক্তির একইসাথে বিপরীত দিক থেকে হাত ও পা কেটে ফেলা হবে।
- যে শুধুমাত্র মানুষকে ভয় দেখায় এবং রান্তায় বাধা দেয় কিন্তু হত্যা করে না, সম্পদও ছিনিয়ে নেয় না, তাকে দেশান্তর করতে হবে, বিতারিত করতে হবে। সুতরাং তাকে দেশে অবস্থান করতে দেওয়া হবে না।

আর এসব তাদের শাস্তির বিস্তারিত বর্ণনা, যা উপরিউক্ত আয়াতে উল্লিখিত (১) শব্দে শাস্তির প্রকার এবং ধারাবহিকতা বুকানো এবং ঐচ্ছিক স্বাধীনতা না থাকা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এটি ইবনু আবুস ফেরে থেকে বর্ণিত হয়েছে।^{১০৩৬}

المسألة الثانية: شروط وجوب الحد على المحاربين

বিতীয় মাসআলা: সন্ত্রাসীদের উপর শাস্তি ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্তসমূহ

সন্ত্রাসীদের উপর শাস্তি কার্যকর করার জন্য কিছু শর্ত করা হয়েছে। তার মধ্যে হতে অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু শর্ত নিম্নরূপ:-

১. শারঙ্গ দায়িত্বপ্রাপ্ত হতে হবে। অতএব জ্ঞানবান ও প্রাণবয়স্ক হওয়া আবশ্যিক, যাতে করে ঐ ব্যক্তিকে লুটপাটকারী হিসেবে গণ্য করা যায় এবং তার উপর শাস্তি কার্যকর করা যায়।

তাই নাবালক এবং পাগলকে লুটকারী বলে গণ্য করা হবে না। শরীয়তে তাদের কেউ দায়িত্বপ্রাপ্ত না হওয়ার কারণে তাদেরকে কোনো প্রকার শাস্তি দেওয়া হবে না।

^{১০৩৬} ইমাম শাফিয়ী তার মুসলাদে বর্ণনা করেন, নং ২৮২।

২. তারা প্রকাশ্যভাবে আক্রমণ করতে আসবে এবং জোরপূর্বক সম্পদ নিয়ে নিবে। যদি তারা গোপনীয়তার সাথে সম্পদ গ্রহণ করে, তাহলে তারা চোর। আর যদি তারা ছিনিয়ে নেয় এবং পালায়, তাহলে তারা ছিনতাইকারী, এমন হলে হাত কাটা হবে না।

৩. তারা লুটপাটকারী সাব্যস্ত হতে হবে; চাই তা তাদের স্বীকৃতির মাধ্যমে বা দুইজন ন্যায়পরায়ন ব্যক্তির সাক্ষ্য দানের মাধ্যমে হোক। যেমনভাবে চুরির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

৪. সম্পদটি সংরক্ষিত স্থান থেকে নিয়েছে বলে প্রমাণিত হতে হবে। অর্থাৎ তা তার মালিক থেকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিবে। যদি সম্পদ কারো হাতে না থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকে, তবে তা গ্রহণকারী তখন লুটকারী হিসেবে গণ্য হবে না।

المسألة الثالثة: سقوط الحد عن المحاربين

তৃতীয় মাসআলা: লুটকারীর উপর থেকে শাস্তি বাতিল হওয়া

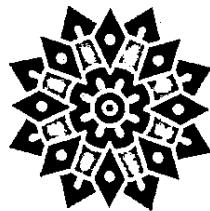
গ্রেফতার হওয়ার পূর্বেই যদি লুটকারী তাওবা করে, তবে হন্দ বাতিল হয়ে যাবে। যেমন সে প্লায়ন করে বা নিজেকে গোপন করে তাওবা করবে। যেমন আল্লাহ বলেন:

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَأْبُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرِئُوا عَلَيْهِمْ فَإَعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَّحِيمٌ﴾

“তবে যারা ধরা খাওয়ার পূর্বেই তাওবা করবে, তাদের কথা ভিন্ন। আর জেনে রাখো, আল্লাহ ত‘আলা ক্ষমাশীল এবং রহমকারী।” [সূরা মায়দাহ : ৩৪]

এর ফলে আল্লাহর জন্য যেগুলো ওয়াজিব অথবা আল্লাহর হক-সংক্রান্ত বিষয়গুলো রহিত হয়ে যাবে ঠিকই; যেমন - দেশোন্তর, হাত-পা কাটা এবং হত্যা করা। কিন্তু মানবীয় হক (ব্যক্তিগত, পাক্ষিক অথবা সম্পদের অধিকার) খণ্ডের ন্যায়, যতক্ষণ না দাবিদার ব্যক্তি তা ক্ষমা করে দেয়, তার সাথে ঝুলন্ত থাকবে।

ধরা পরার পর বা বিচারকের নিকট উপস্থিত করার পর যদি তাওবা করে, তাহলে তার উপর থেকে শাস্তি বাতিল হবে না, যদিও সে তার তাওবার ব্যাপারে সত্যবাদী হয়ে থাকে।



الباب الثامن: في الردة

অষ্টম অনুচ্ছেদ : মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المُسَأْلَةُ الْأُولَى: تعرِيفُهَا، وشُرُوطُهَا، وحُكْمُ الْمُرْتَدِ

প্রথম মাসআলা: এর পরিচয়, তার শর্তসমূহ এবং ধর্মত্যাগীর বিধান

১. الردة বা ধর্মত্যাগের পরিচয়:

الردة এর শাব্দিক অর্থ: কোনো কিছু থেকে ফিরে আসা। এ থেকেই ইসলাম গ্রহণের পর ফিরে যাওয়া অর্থ নেওয়া হয়েছে।

الكافر بعد الإسلام طوعاً بنطق، أو اعتقاد، أو شك، أو فعل:

ইসলাম গ্রহণের পর স্বেচ্ছায় কোনো কথা, বিশ্বাস, সন্দেহ অথবা কর্মের মাধ্যমে কুফরী করা (কাফের হওয়া)।

২. তার শর্তসমূহ: জ্ঞানবান হওয়া, ভালোমন্দ পার্থক্য করতে সক্ষম হওয়া এবং ইচ্ছাকৃতভাবে কাজটি করা।

সুতরাং পাগল, নাবালক যে ভালো মন্দ পার্থক্য করতে পারে না অথবা ধর্মত্যাগ বাধ্য করা হয়েছে এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে যদি কাজটি ঘটে থাকে, তবে তাদের উপর কোনো প্রকার শান্তি নেই।

৩. মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীর বিধান: দুনিয়াতে ধর্মত্যাগীর বিধান হচ্ছে তাদেরকে হত্যা করতে হবে। নাবী ﷺ বলেন: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

“যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করবে, তাকে তোমরা হত্যা করো।”^{১৩৭}

তবে এক্ষেত্রে উচিত হচ্ছে, হত্যা করার পূর্বে তাকে তাওবা করতে বলা, ইসলামের দিকে ফিরে আসার আহ্বান করতে বয়কট করা এবং তিন দিন বন্দী করে রাখা। যদি তাওবা করে, তাহলে কোনো শাস্তি নেই, আর না করলে হত্যা করতে হবে।

একজন ইহুদি ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হয়েছিল। তার ব্যপারে হাদীসে আছে যে, আবু মুসা অস্বীকার কে মুয়াজ অস্বীকার করে বলেন,

لَا أَنْزِلْ عَنْ دَائِبِي حَتَّى يُفْكَلَ، فَقُتِّلَ

“তুমি তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি বাহন থেকে নামব না। অতঃপর তাকে হত্যা করা হয়।”^{১৩৮}

وَفِي رَوَايَةِ: وَكَانَ قَدْ اسْتَعْتَبَ قَبْلَ ذَلِكَ

অন্য বর্ণনায় রয়েছে: “হত্যা করার পূর্বে তাকে তাওবা করতে বলা হয়েছিল।”^{১৩৯}

একজন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হয়েছিল। অতঃপর তাকে তাওবা চাওয়ার পূর্বেই তার গর্দান কর্তন করা হয়েছিল। উক্ত সংবাদ উমার অস্বীকার নিকট পৌছালে তিনি বলেন:

فَهَلَا حَبَسْتُمُوهُ تَلَاثًا، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا، وَاسْتَبَّتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَخْضُرْ، وَلَمْ أَرْضِ إِذْ بَلَغَنِي

“কেন তোমরা তাকে তিন দিন বন্দী করে রাখলে না? তোমরা তাকে প্রতিদিন পাতলা রুটি খেতে দিতে এবং তোমরা তাওবা করতে বলতে, হয়তো সে তাওবা করে আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসত! ‘হে আল্লাহ আমি আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না আর আমার কাছে সংবাদ আসার পর আমি খুশীও হইনি।’”^{১৪০}

তার হত্যার বিষয়টি বিচারক অথবা তার স্থলাভিষিক্ত কেউ বাস্তবায়ন করবেন। কারণ এটি আল্লাহর অধিকার। সুতরাং তা বিচারকের নিকট সমর্পণ করতে হবে।

ভালো মন্দ পার্থক্য করতে সক্ষম শিশুকে হত্যা করা যাবে না, যদিও তার ধর্মত্যাগের বিষয়টি সঠিক হয়ে থাকে, যতক্ষণ না সে প্রাণবন্ধন হবে।

^{১৩৭} সহীহুল বুখারী, হা. ৬৫২৪।

^{১৩৮} সুনান আবু দাউদ, হা. ৪৩৫৫; ইবনে হাজার শাক্তিশালী বলেছেন, ফাতহুল বারী ১২/২৮৭।

^{১৩৯} সুনান আবু দাউদ, হা. ৪৩৫৫; ইবনে হাজার শাক্তিশালী বলেছেন, ফাতহুল বারী ১২/২৮৭।

^{১৪০} মুয়াত্তা মালেক ২/৭৩৭, নং ১৬।

আখিরাতে ধর্মত্যাগের বিধান:

আল্লাহ তা'আলা এই বিষয় বর্ণনা করে বলেন:

﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنِ دِينِهِ فَيَمْتُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حِيطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَضْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

“আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজের ধর্ম (ইসলাম) ত্যাগ করে ফিরে যাবে (বের হয়ে যাবে) এবং কাফের অবস্থায় মারা যাবে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের আমলসমূহ বৃথা হয়ে যাবে। আর এরাই জাহানামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরস্থায়ী থাকবে।” [সূরা বাক্সারাহ : ২১৭]

الْمَسَأَةُ الثَّانِيَةُ: أَمْوَالُ الَّتِي تَحْصُلُ بِهَا الرَّدَاءُ

দ্বিতীয় মাসআলা: ধর্মত্যাগ সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়সমূহ

ভাবগতীর্থ অথবা রসিকতা অথবা বিক্রিপের ছলে ধর্মত্যাগ সাব্যস্ত হয় এমন কোনো কাজ করলে ধর্মত্যাগ সাব্যস্ত হবে। সকল ধরনের শিরকী কাজে জড়িয়ে যাওয়া, সলাত অথবা ইসলামের অন্যান্য রূপকল অস্থীকার করা, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলকে গালি দেওয়া, সম্পূর্ণ কুরআন অথবা তার কিয়দ্বার্ষ অস্থীকার করা, সীমালংঘনকারী সূফীদের ন্যায় এই বিশ্঵াস করা যে, কিছু কিছু মানুষের জন্য মুহাম্মাদ ﷺ এর শরীয়ত থেকে বের হওয়া জায়েব। অনুরূপ মুশরিকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করা। এ ছাড়াও মুরতাদ হওয়ার আরও অনেক বিষয় রয়েছে, যা ইসলাম ভঙ্গের কারণসমূহের কোনো একটি কারণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়। তার মধ্য হতে: ইসলামী শরীয়ত যা নিয়ে এসেছে তার থেকে দুনিয়ার বিচার-ফয়সালাকে অধিক উপযুক্ত মনে করা বা এর সমান মনে করে বিচারকার্য পরিচালনা করা।

এর উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, যে সমস্ত কাজের মাধ্যমে মানুষ মুরতাদ হয়ে যায় তা কয়েকটি জিনিসের মাঝে সীমাবদ্ধ। সেগুলো হলো:

১. কথার মাধ্যমে: যেমন আল্লাহ তা'আলা, তার রসূল বা তার ফেরেশতাগণকে গালি দেওয়া অথবা নবুয়ত বা অদৃশ্যের জ্ঞানের দাবি করে। তেমনিভাবে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করা।

২. কাজের মাধ্যমে: যেমন মূর্তি বা কবরকে সাজাহ করা। অথবা কুরআন ছুড়ে ফেলা বা ইচ্ছা করে কুরআনকে অপমান করা। অথবা মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য করা ইত্যাদি।

৩. বিশ্বাসের মাধ্যমে: যেমন আল্লাহর সাথে অন্য কেউ শরীক আছে, অথবা তার স্তু-সন্তান আছে এমন বিশ্বাস করা। অথবা ব্যভিচার করা বা মদ খাওয়া বৈধ, বা নাবী ﷺ ছাড়া অন্য কারো পদশ্রিত জীবনব্যবস্থা অধিক বেশি পরিপূর্ণ এমন বিশ্বাস রাখা।

৪. সন্দেহের মাধ্যমে: যেমন যে বিষয়টি হালাল হিসেবে সকলে ঐকমত্য পোষণ করেন সেটাকে হারাম বলে সন্দেহ করা। বা যে বিষয়টি হারাম হিসেবে সকলে ঐকমত্য পোষণ করেন সেটাকে হালাল হিসেবে সন্দেহ করা। এ উদাহরণটি ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি মুসলিমদের মাঝে বেড়ে উঠেছে, ফলে তার সে বিষয়টি অজানা নয়।

الْمَسْأَلَةُ التَّالِيَةُ: الْحُكُمُ الْمُتَعْلِقَةُ بِالرَّدَاءِ

তৃতীয় মাসআলা: ধর্মত্যাগী হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত বিধিবিধান

১. যে ব্যক্তি বাধ্য হয়ে মুরতাদ হওয়ার শব্দ উচ্চারণ করে, তাকে মুরতাদ বলে হকুম দেওয়া যাবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَا مَنْ أَكْثَرَهُ وَقْلُبُهُ مُظْمِنٌ بِإِلَٰيْمَانِ﴾

“তবে যে ব্যক্তিকে বাধ্য করা হয়েছে, অথচ তার অন্তর ইমানের উপর স্থির থাকে।” [সূরা নাহল: ১০৬]

২. মুরতাদকে তিন দিন তাওবা করার সুযোগ দেওয়া হবে। সে তাওবা করলে ভালো, নয়তো তাকে হত্যা করতে হবে। আর তাকে হত্যা করার বিষয়টি রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল বা স্থলাভিষিঞ্জ ব্যক্তির উপর বর্তাবে।

৩. মুরতাদকে তার মাল লেনদেন করা থেকে বাধা প্রদান করা হবে। অতঃপর যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তার সম্পদ তাকে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে। আর সে যদি মুরতাদ অবস্থায় মারা যায় বা তাকে শাস্তি স্঵রূপ হত্যা করা হয়, তাহলে তার সম্পদ মুসলিমদের বায়তুল মালে (কোষাগারে) মালে ফায় হিসেবে জমা হবে। কেননা তার কোনো ওয়ারিস নেই। কারণ মুসলিম ব্যক্তি কাফেরের ওয়ারিস হবে না এবং কাফের ব্যক্তি মুমিনের ওয়ারিস হতে পারবে না। কেননা মুরতাদ অবস্থায় তাকে (সম্পদ ব্যবহারের) অনুমতি দেওয়া হয় না।

৪. মুরতাদকে গোসল দেওয়া হবে না, তার জানায়ার সলাত আদায় করা হবে না এবং তাকে মুসলিমদের কবরস্থানেও দাফন করা যাবে না, যদি তাকে ধর্মত্যাগের কারণে হত্যা করা হয়।

৫. দুই শাহদাত পাঠের মাধ্যমে মুরতাদ ব্যক্তির তাওবা গ্রহণ করা হবে। কারণ আল্লাহর রসূল ﷺ হাদীসে বলেন:

أَمْرُتُ أَنْ أَقْاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَاتَلُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا

“আমি মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা বলে: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাবুদ নেই)। অতএব তারা যখন এটা বলবে, তখন তারা তাদের রক্ত ও সম্পদকে আমার থেকে বাঁচিয়ে নিবে। তবে তার (কালিমার) হক বাকি থাকবে।”^{৯৪১}

আর যে ব্যক্তি দ্বীনের কোনো বিষয়কে অস্বীকার করার কারণে মুরতাদ হয়ে যাবে, তার তাওবার জন্য শাহাদাতের সাথে দুটি বিষয় স্বীকৃতি দিতে হবে। প্রথমতঃ দ্বীনের যে বিষয়টি অস্বীকার করেছিল, তার স্বীকৃতি দিবে। দ্বিতীয়তঃ সে যা কুফরী করেছিল, তা থেকে ফিরে আসবে।

^{৯৪১} মুসাফাকুন আলাইহি: সহীলুন বুখারী, হা. ২৫; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ২১।



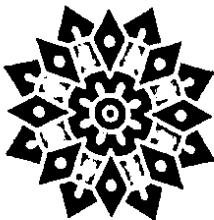
দ্বাদশ অধ্যায়
শপথ ও মানত

ثاني عشر: كتاب الأيمان والنذور

————— ♡ এতে ০২টি অনুচ্ছেদ রয়েছে ♡ ———

প্রথম অনুচ্ছেদ: শপথসমূহ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: মানতসমূহ



الباب الأول: الأيمان

প্রথম অনুচ্ছেদ : শপথমূহ

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المسألة الأولى: في تعريف الأيمان

প্রথম মাসআলা: আইমান বা শপথ পরিচিতি

আভিধানিক অর্থ: **أيمان** শব্দটি **يمين** শব্দের বহুবচন। অর্থ: প্রতিজ্ঞা বা কুসম। আর কুসমকে **يمين** বা ডান হাত বলা হয় এজন্য যে, আরবরা যখন কোনো বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করত, তখন তারা একে অপরের ডান হাতে আঘাত (স্পর্শ) করত।

شرعًا: توکید الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله، أو صفة من صفاته.

শরীয়তের পরিভাষায় শপথ: আল্লাহ তা'আলার নাম বা তাঁর কোনো গুণবাচক শব্দ উল্লেখ করে শপথকৃত বিষয়কে দৃঢ়তা প্রদান করা।

المسألة الثانية: أقسام اليمين

দ্বিতীয় মাসআলা: শপথের প্রকারভেদ

শপথ সংঘটিত হওয়া বা না হওয়ার দিক থেকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়:

১. **اليمين اللغو** বা অনর্থক শপথ: শপথ করার ইচ্ছা ছাড়াই শপথসূচক কথা বলা। যেমন-কোনো ব্যক্তি বলবে, আল্লাহর শপথ! না, এমনটি নয়। আল্লাহর শপথ! হ্যা, এমনটিই। এর দ্বারা

সে শপথ উদ্দেশ্য করে না এবং কুসমও না। এ জাতীয় শপথকে বাল্মীয় শপথ হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللُّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ﴾

“আল্লাহ তোমাদেরকে অনর্থক শপথের জন্য পাকড়াও করবেন না।” [সূরা মাযিদাহ : ৯]

আয়িশাহ رض বলেন:

﴿أَنْزَلْتَ هَذِهِ الْآيَةَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللُّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لَا وَاللَّهِ وَبِلَّ وَاللَّهِ وَكَلَا وَاللَّهِ .﴾

“আল্লাহ তা'আলার বাণী: “**لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللُّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ**” এই আয়াতটি ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যে বলে: আল্লাহর শপথ! না, এমনটি নয়। আল্লাহর শপথ! হ্যাঁ, এমনটিই। আল্লাহর শপথ! কঙ্কনোই না।”^{১৪২}

এ জাতীয় শপথের কোনো কাফফারা নেই। এর জন্য পরকালে পাকড়াও করা হবে না এবং শপথকারীর উপর কোনো পাপ বর্তাবে না।

২. বা سِنْغَاتِيْتِ شَفَاهَ:

শপথ করার ইচ্ছে করে দৃঢ়চিত্তে মুখে শপথসূচক কথা বললে তাকে সংঘটিত শপথ বলে। এই শপথটা হতে পারে ভবিষ্যতের কোনো কাজ কিংবা স্তুত্য কোনো বিষয়ে। এ জাতীয় শপথ ভঙ্গ করলে কাফফারা আবশ্যিক হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللُّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقْدَتُمُ الْأَيْمَانَ﴾

“আল্লাহ তোমাদেরকে অনর্থক শপথের জন্য পাকড়াও করবেন না, কিন্তু তোমরা দৃঢ়চিত্তে করেছ, এমন শপথের জন্য তিনি তোমাদের পাকড়াও করবেন।” [সূরা মাযিদাহ : ৮৯]

৩. বা مِثْيَا شَفَاهَ:

এ প্রকারের শপথ হচ্ছে, এমন মিথ্যা শপথ যার মাধ্যমে অধিকারসমূহ খর্ব করা হয় অথবা এর দ্বারা ধোকা ও খিয়ানত উদ্দেশ্য। অতএব এক্ষেত্রে শপথকারী জেনে-শুনে মিথ্যার উপর শপথ করে। এটি কাবীরা গুণাহসমূহের অন্যতম। এ শপথ কার্যকর হবে না এবং এর কোনো কাফফারা নেই। কেননা এটি কাফফারা দিয়ে (ক্ষমা পাওয়ার) চেয়েও মারাত্মক, কারণ এটি সংঘটিত শপথ নয়। অতএব বা অনর্থক শপথের মতো এতে কোনো কাফফারা নেই। এরপ শপথ থেকে তাওবা করা এবং এর দ্বারা যদি কারো হক নষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে হকদারের হক তার

কাছে ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। এ জাতীয় শপথকে গমুস বা ডুবন্ত বলা হয় এ কারণে যে, এর মাধ্যমে শপথকারী পাপে, অতঃপর জাহানামের আগনে ডুবে যায়। আমরা আল্লাহর কছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে দলীল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَلَا تَتَخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَرِّلُ قَدْمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذَوَّقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَّدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

“পরম্পরকে ধোকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তোমরা শপথকে ব্যবহার করো না। তাহলে তোমাদের পা স্থির থাকার পর টলে যাবে। আল্লাহর পথ হতে বাঁধা প্রদানের কারণে কঠিন শাস্তি ভোগ করবে এবং তোমাদের জন্য থাকবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।” [সূরা নাহল : ৯৪]

এ ব্যাপারে ইবনু উমার رض থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

الكُبَارُ: إِلَّا شَرِكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ

“কবীরাণনাহগুলো হলো: আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কোনো (নিরাপরাধ) ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং মিথ্যা শপথ করা।”^{১৪৩}

আবু হুরায়রা رض হতে অপর বর্ণনায় আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

خَمْسٌ لَيْسَ هُنَّ كُفَّارًا: الشَّرِكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَبَهْتُ مُؤْمِنٍ وَفِرَارُ يَوْمَ الرَّحْفِ وَيَمِينُ صَابِرَةٍ
“يَقْتَطِعُ بِهَا مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ

“পাঁচটি বিষয়ে কোনো কাফ্ফারা নেই। আল্লাহর সাথে শরীক করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, মুমিন ব্যক্তির উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া এবং মিথ্যা ক্রসম করা, যার দ্বারা অন্যায়ভাবে মাল আত্মাসাং করা হয়।”^{১৪৪}

المسألة الثالثة: كفارة اليمين وشروط وجودها

তৃতীয় মাসআলা: শপথের কাফ্ফারা এবং তা ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ

১. শপথের কাফ্ফারা: আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারার বিধান দিয়েছেন, যার মাধ্যমে তারা শপথ হতে মুক্ত হতে পারে এবং তা ভঙ্গ করতে পারে। আর এটা বান্দাদের প্রতি তাঁর দয়াস্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

^{১৪৩} সহীল বুখারী, হ্য. ৬৬৭৫।

^{১৪৪} এটা মিথ্যা শপথ। এই নামে নামকরণ করার উদ্দেশ্য: الصَّبَرَةُ شব্দটি চাবৰা থেকে গৃহীত হয়েছে। যার অর্থ বন্দীত্ব ও বাধাবাধকতা। কেবল এই শপথকারী নিজেকে এর উপর সীমাবদ্ধ করে এবং বন্দী করে নেয়। হকুমের দিক থেকে এটি তারজন্য সহজাত।

^{১৪৫} আহমাদ ২/৩৬২, শাইখ আলবানী হাদীসটিকে ‘হাসান’ বলেছেন, ইরাওয়া নং ২৫৬৪।

﴿فَذُقْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةً أَيْمَانِكُمْ﴾

“আল্লাহ তোমাদের জন্য শপথ ভঙ্গের কাফফারা আবশ্যক করে দিয়েছেন।” [সূরা তাহরীম: ২]
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينٍ، فَرَأَىٰ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلِيَأْتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ

“যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে শপথ করে অতঃপর দেখে যে, অন্যটি এর চেয়ে উত্তম, তাহলে সে যেন উত্তমটিই বাস্তবায়ন করে এবং তার শপথের কাফফারা প্রদান করে।”^{১৪৬}

আর এই কাফফারা ঐ ব্যক্তির উপর আবশ্যক হবে, যখন সে শপথ ভঙ্গ করবে এবং যে বিষয়ে শপথ করেছিল তা বাস্তবায়ন না করবে।

শপথের কাফফারা আদায়ের ক্ষেত্রে (নির্ধারিত কাফফারা’র যে-কোনো একটি আদায় করার) ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে ও ধারাবাহিকতা রক্ষার বিধানও আছে। অতএব যার উপর শপথের কাফফারা আবশ্যক তার জন্য স্বাধীনতা রয়েছে যে, সে দশজন মিসকিনকে অর্ধ সা’ করে খাবার খাওয়াবে, অথবা দশজন মিসকিনকে কাপড় পরিধান করবে, যা তাদের সালাত আদায়ের জন্য যথেষ্ট হবে। অথবা দোষ-ক্রটিমুক্ত একজন মুমিন দাসী আজাদ করবে। আর যে ব্যক্তি উল্লিখিত তিনটি পদ্ধতির কোনোটিতেই সক্ষম নয়, সে তিনদিন সিয়াম পালন করবে। আল্লাহ তা’আলা বলেন:

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسِطِ مَا نُطْعِمُونَ أَهْلِيَّتُمْ أَوْ كَسُوتُهُمْ أَوْ تَخْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصَيَّامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾

“অনর্থক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। কিন্তু তোমরা দৃঢ়ভাবে যে সমস্ত শপথ করো, সেগুলো ভঙ্গ করার কারণে তিনি তোমাদেরকে পাঁকড়াও করবেন। অতএব, তার কাফফারা হলো, দশজন মিসকিনকে মধ্যম মানের খাবার খাওয়ানো, যা তোমরা তোমাদের পরিবারকে খাইয়ে থাকো। অথবা তাদেরকে কাপড় পরিধান করানো। অথবা একজন মুমীন দাসী আজাদ করা। যে ব্যক্তি এগুলোতে সক্ষম নয়, সে (একাধারে) তিনদিন সিয়াম পালন করবে।” [সূরা মায়দাহ: ৮৯]

এখানে শপথের কাফফারা দেওয়াকে ইচ্ছার স্বাধীনতা ও ধারাবাহিকতার সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যক্তির স্বাধীনতা রয়েছে খাদ্য খাওয়ানো, পোষাক পরানো অথবা দাসী আজাদ করার ক্ষেত্রে এবং এ তিনটি বিষয় অক্ষম হলে ধারাবাহিকভাবে সিয়াম রাখার বিধান করা হয়েছে।

^{১৪৬} মুস্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, ঘ. ৬৭২২; সহীহ মুসলিম, ঘ. ফুআ. ১৬৫০।

২. শপথের কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ:

যখন কোনো ব্যক্তি শপথ ভঙ্গ করবে এবং তা আদায় করবে না, তখন তিনটি শর্ত ছাড়া তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না। আর সেগুলো হলো:

প্রথম শর্ত: শপথটি বাস্তবায়নযোগ্য হতে হবে। তা এভাবে যে, শপথকারী তা ভবিষ্যতে বাস্তবায়নের দৃঢ় সংকল্প করবে। যেমনটি বর্ণনা আগে অতিবাহিত হয়েছে। আর আল্লাহর সভাগত নাম, অথবা তাঁর গুণবাচক নামসমূহের কোনো একটি নাম কিংবা সিফাতসমূহের কোনো একটি সিফাতের নামে শপথ না হলে, সেটি শপথ বলে গণ্য হবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالْغُرْفِ أَيْمَانُكُمْ وَلَكُنْ يُؤاخِذُكُمْ بِمَا عَفَدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾

“অনর্থক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। কিন্তু তোমরা দৃঢ়ভাবে যে সমস্ত শপথ করো, সেগুলো ভঙ্গ করার কারণে তিনি তোমাদেরকে পাঁকড়াও করবেন।”

[সূরা মায়দা: ৮৯]

অত্র আয়াত প্রমাণ করে যে, সংঘটিত শপথ হলেই কেবল কাফফারা আবশ্যিক হবে। পক্ষান্তরে যার যবান দ্বারা উদ্দেশ্যবিহীন শপথ উচ্চারিত হবে, তা শপথ বলে গণ্য হবে না। আর এরূপ শপথের কোনো কাফফারা নেই।

তৃতীয় শর্ত: শপথকারী স্বেচ্ছায় শপথ করবে। অতএব, যে ব্যক্তি বাধ্য হয়ে শপথ করে, তার শপথটি সংঘটিত শপথ হিসেবে গণ্য হবে না এবং তাতে তার উপর কোনো কাফফারা নেই। কেননা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

رُفِعَ عَنْ أَمْتَيِ الْخَطَا وَالنُّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ.

“আমার উন্নত হতে ভুল, ভুলে যাওয়া এবং যে জিনিসে বাধ্য করা হয়, তা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।”^{১৪৭} (অর্থাৎ এ তিনি অবস্থায় কোনো ভুল হলে তার জন্য কোনো শাস্তির বিধান নেই।)

তৃতীয় শর্ত: শপথ ভঙ্গ করবে এমন কাজ করার মাধ্যমে, যা সে পরিত্যাগ করার ব্যাপারে শপথ করেছিল। অথবা এমন কাজ না করার মাধ্যমে, যা করার ব্যাপারে শপথ করেছিল। আর এ সময় শপথের করা তার স্মরণে থাকতে হবে এবং নিজ ইচ্ছায় শপথ ভাঙ্গতে হবে। পক্ষান্তরে ভুলে শপথ ভেঙ্গে ফেললে কিংবা তাকে শপথ ভাঙ্গতে বাধ্য করা হলে, উপর্যুক্ত হাদীসের আলোকে তার উপর কোনো কাফফারা নেই।

^{১৪৭} শুনান ইবনে মাজাহ, হ্য. ২০৪৫; শান্তিক পার্থক্য রয়েছে।

শপথে ইন-শা-আল্লাহ বলা:

যে ব্যক্তি শপথ করার সময় ﷺ ন অর্থাৎ আল্লাহ যদি চান বলবে, অতঃপর যদি সে শপথ ভঙ্গ করেও, তাহলে তার উপর শপথ ভঙ্গের বিধান নেই এবং কাফফারাও নেই। কেননা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

من حلف فقال : إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَجْعَلْ

“যে ব্যক্তি শপথ করার সময় বলবে: ﷺ ন (যদি আল্লাহ চান!) তাহলে তার শপথ ভঙ্গ হবে না।”^{১৪৪}

শপথ ভঙ্গ করা ও তাতে আবশ্যকীয় বিষয় পূর্ণ না করা:

শপথকারী তার শপথকে পূর্ণ করবে, এটাই মূল কথা। কিন্তু কখনো কোনো বিশেষ কারণে অথবা প্রয়োজনে শপথ ভঙ্গ করলে কাফফারা আদায়ের বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে, যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। শপথকৃত বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করে শপথ ভঙ্গ করাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলো হলো:

১. যে শপথ ভঙ্গ করা আবশ্যিক:

যখন কোনো ব্যক্তি ওয়াজিব কাজ পরিত্যাগ করার উপর শপথ করবে। যেমন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল করার ব্যাপারে শপথ করা অথবা কোনো হারাম কাজ করবে বলে শপথ করা। উদাহরণস্বরূপ কোনো ব্যক্তি শপথ করল যে, সে অবশ্যই মদ পান করবে। এই অবস্থায় শপথ ভঙ্গ করা তার উপর ওয়াজিব। আর তার উপর কাফফারা প্রদান করা আবশ্যিক। কারণ সে পাপকাজের শপথ করেছিল।

২. যে শপথ ভঙ্গ করা হারাম:

যদি কোনো ব্যক্তি কোনো ওয়াজিব কাজ করার ব্যাপারে কিংবা কোনো হারাম কাজ পরিত্যাগের ব্যাপারে শপথ করে, তবে তার জন্য শপথ পূর্ণ করা আবশ্যিক এবং শপথ ভঙ্গ করা তারজন্য হারাম। এ কারণে যে, তার শপথ ছিল আল্লাহ যা তার উপর আবশ্যিক করেছেন, তা আদায়ে দৃঢ়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে।

৩. যে শপথ ভঙ্গ করা বৈধ:

সাধারণ কোনো বৈধ কাজ করা বা ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে শপথ করবে।

^{১৪৪} তিরমিয়ী, খ. ১৫৩২; আহমাদ ২/৩০৯; ইমাম আলবানী ‘সহীহ’ বলেছেন, সহীহত তিরমিয়ী।

المسألة الرابعة: صور لبعض الأيمان الجائزة والممنوعة

চতুর্থ মাসআলা: কিছু বৈধ ও নিষিদ্ধ শপথের স্বরূপ

বৈধ শপথ হলো, যেখানে আল্লাহর নাম বা তাঁর সিফাতসমূহের কোনো একটি সিফাত দ্বারা শপথ করা হয়। যেমন সে বলবে: আল্লাহর শপথ অথবা আল্লাহর মুখ্যমণ্ডলের শপথ অথবা আল্লাহর বড়তু ও মহান্তের শপথ ইত্যাদি। ইবনু উমার رض-এর হাদীসে এসেছে-

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ، يَخْلِفُ بِأَيْمَهِ، فَقَالَ: «أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَئِنَّهَا كُمْ أَنْ تَخْلِفُوا بِأَيْمَانِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالَفًا فَلَيَخْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لَيَضْمُنْ»

“ରୁସ୍ଲାନ୍‌ଦେଶ ମହାନ୍ତିର ଆଜିର ପ୍ରକଟିକାରୀ ଏକବାର ଉମାର ଫ୍ରାଙ୍କିଷ୍ଟିନ୍ କେ ଏମନ ଅବସ୍ଥାଯ ପେଲେନ ଯେ, ତିନି ଆରୋହୀତେ ଚଲନ୍ତ ଅବସ୍ଥାଯ ରଯେଛେ ଏବଂ ତାର ପିତାର ନାମେ ଶପଥ କରିଛେ, ତଥାବେ ତିନି ଫ୍ରାଙ୍କିଷ୍ଟିନ୍ ବଳଲେନ: ଜେନେ ରେଖୋ! ଆଜାହ ତୋମାଦେରକେ ତୋମାଦେର ପିତୃ-ପୁରୁଷେର ନାମେ ଶପଥ କରିବେ ନିଷେଧ କରେଛେ । ସୁତରାଂ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶପଥ କରିବେ, ସେ ଯେଣ ଆଜାହର ନାମେ ଶପଥ କରିବେ ଅଥବା ଚାପ ଥାକେ ।”^{୧୫୯}

ইবনু উমার -এর অপর হাদীসে এসেছে। তিনি বলেন,

كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَمُقْلَبُ الْقُلُوبِ

“রাসুল ﷺ এর শপথ এরূপ ছিল (لَوْمَقْبَلَ الْقُلُوبَ) অর্থাৎ অন্তর পরিবর্তনকারীর শপথ! না কক্ষনোই নয়।”^{১৫০}

অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি যদি বলে, ‘আল্লাহর নামে শপথ করছি যে আমি অবশ্যই এ কাজটি করব।’ সে যদি এর দ্বারা শপথ উদ্দেশ্য করে থাকে, তাহলে তা শপথ হিসেবে গণ্য হবে।
 آللّٰهُ تَعَالٰى ‘আলা বলেন: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾

“ଆର ତାରା ଆଲ୍ଲାହର ନାମେ ଦଟ ଶପଥ କରେ ।” | ସଙ୍ଗ ଆନନ୍ଦାମ : ୧୦୯|

କତିପୟ ନିଷିଦ୍ଧ ଶପଥः

১. আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা। যেমন এমনটি বলা যে, তোমার জীবনের শপথ! আমানতের শপথ ইত্যাদি। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার رض-এর হাদীসে এসেছে, নাবী ﷺ বলেন:

^{२५} मुख्यमानकन आलाइटि: सहीसुल बुखारी, हा. ६२७०; सहीह मसलिम, हा. फुआ, १६४६।

২০০ পশ্চিম বাখারী-আ. ৬৬২৪।

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِإِلَهٍ أُوْلَئِكُمْ

“যে ব্যক্তি শপথ করতে চায়, সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে অথবা চুপ থাকে।”^{১৫১}

২. এই শপথ করাযে, সে ইহুদি অথবা খৃষ্টান অথবা সে আল্লাহ থেকে মুক্ত অথবা সে আল্লাহর
রসূল থেকে মুক্তঃ যদি সে এমন করে, তাহলে তার কথাই বাস্তবায়ন হবে। বুরায়দা রাঃ তাঁর
পিতা হতে বর্ণনা করেন। নাবী  বলেন:

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِّنَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ: وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَلَّمًا

“যে ব্যক্তি শপথ করে বলে যে, আমি ইসলাম থেকে মুক্ত। সে যদি এ শপথে মিথ্যা বলে, তাহলে সে যেভাবে বলেছে সেভাবেই গণ্য হবে। আর সে যদি শপথে সত্যবাদী হয়, তাহলে সে কক্ষনো নিরাপদে ইসলামে ফিরে আসতে পারবে না।”^{১৫২}

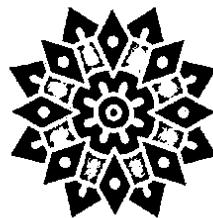
৩. বাপ-দাদা ও তাঁর নামে শপথ করা। আব্দুর রহমান বিন সামুরাহ رض-এর হাদীস। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: لَا تَحْلِفُوا بِالظَّوَاغِي، وَلَا بِبَارِكَمْ

“তোমরা তাণ্টসমূহ ও বাপ-দাদা’র নামে শপথ করো না।”^{১৫৩}

^{२०३} मुख्याकादून आलाइहि: सशीदल बुधाङी, श. ६२७०; सशीह मुसलिम, श. फुआ. १६४६।

²²² সুনান আবু দাউদ, শি. ৩২৫৮; নাসাই ৬/৭; ইমাম আলবানী ‘সহীহ’ বলেছেন, সহীহ সুনানুন নাসাই, নং ৩৫৩২।

२५० नवीन मुसलिम, श. ४१५४, फुआ. १६४८।



الباب الثاني: النذر দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: মানতসমূহ

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রাখেছে।

المقالة الأولى: تعريف النذر، ومشروعيته، وحكمه

প্রথম মাসআলা: (নذر) মানত করা এর সংজ্ঞা, তার বৈধতা ও হুকুম

১. এর সংজ্ঞা:

আভিধানিক অর্থ: আবশ্যক করে নেওয়া (إيجاب)। বলা হয় অর্থাৎ আমি এটা মানত করলাম, এই কথার মাধ্যমে নিজের উপর আবশ্যক করে নেওয়া।

পরিভাষায়: কোনো মুকাল্লাফ ব্যক্তির (শরীয়তের দায়িত্বপ্রাপ্ত) আল্লাহর তা'আলার জন্য স্বেচ্ছায় কোনো বিষয় নিজের উপর আবশ্যক করে নেওয়াকে নذر বা মানত বলে।

২. (নذر) এর বৈধতা ও হুকুম:

কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা নذر বা মানত করা শরীয়ত সম্মত বলে প্রমাণিত। দলীল-প্রমাণসহ বিবরণ আসছে।

প্রাথমিকভাবে মানত করার হুকুম হচ্ছে 'মাকরাহ'; মুস্তাহাব নয়। কেননা ইবনু উমারের -এর হাদীসে এসেছে, রসূলুল্লাহ মানত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও বলেন:

إِنَّمَا لَا يُرْدُ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرُجُ بِهِ مِنَ السُّجْيَحِ

“নিশ্চয়ই এটা (মানত) কোনো কিছুই (বিপদ-আপদ) প্রতিরোধ করতে পারে না। আর এর দ্বারা তো কৃপনের ধন-সম্পদ হতে কিছু সম্পদ বের করা হয় মাত্র।”^{১৫৪}

মানতকারী নিজের উপর এমন বিষয় আবশ্যক করে নেয়, যা মূলত শরীয়ত আবশ্যক করেনি। ফলে সে নিজেকে সংকটে ফেলে দেয় এবং সেটা পালন করা তার উপর কষ্টসাধ্য হয়। মুসলিম ব্যক্তির কাম্য হচ্ছে, সে কোনোরূপ মানত ছাড়াই ভালো কাজ করবে। তবে কেউ যদি আল্লাহর আনুগত্যে কোনো কাজ করার মানত করে, তাহলে তার উপর তা পূর্ণ করা আবশ্যক হবে। কারণ আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أُرْزَقْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فِإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ﴾

“তোমরা যা কিছু (আল্লাহর পথে) ব্যয় করো না কেন এবং যা কিছু মানত করো না কেন, আল্লাহ তা অবগত আছেন।” [সূরা বাকারা : ২৭০]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿يُوْقُونَ بِالْغَدَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾

“তারা মানত পূর্ণ করে এবং তারা এমন দিনকে ভয় করে, যার অনিষ্টতা ভয়াবহ।” [সূরা ইনসান : ৭]

আয়িশাহ رض এর হাদীসে এসেছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

﴿مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِيعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي اللَّهَ فَلَا يَعْصِيهِ﴾

“যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের বিষয়ে মানত করে, সে যেন তাঁর আনুগত্য করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতার মানত করে, সে যেন তাঁর অবাধ্যতা না করে।”^{১৫৫}

যারা মানত পূর্ণ করে আল্লাহ তা‘আলা তাদের প্রশংসা করেছেন এবং গুণ বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ ﷺ মানত পূর্ণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, এটা প্রমাণ বহন করে যে, পূর্বের নিষেধাজ্ঞা ছিল ‘মাকরহ’ বুঝাতে; হারাম সাব্যস্ত করতে নয়। মানত করা মূলত নিষিদ্ধ ও মাকরহ। কিন্তু যে নিজের উপর তা আবশ্যক করে নিবে, তার উপর তা পূরণ করা আবশ্যক এবং এক প্রকার আনুগত্যমূলক কাজ। অতএব আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য মানত করা বৈধ নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো কবর, ওলী বা অনুরূপ কারো নামে মানত করল, সে আল্লাহর সাথে বড়ো শিক্ষ করল। আমরা আল্লাহর নিকট তা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

^{১৫৪} মুতাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৬৬৯২; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৬৩৯।

^{১৫৫} সহীহল বুখারী, হা. ৬৬৯৬।

المُسَأَلَةُ الثَّانِيَةُ: شُرُوطُ النَّذْرِ، وَالْفَاظُونَ

দ্বিতীয় মাসজালা: মানতের শর্তসমূহ ও তার শব্দাবলী

১. মানতের শর্তসমূহ: প্রাণবয়স্ক, বুদ্ধি সম্পন্ন ও স্বেচ্ছাধীন ব্যক্তি ছাড়া মানত করা বিশুদ্ধ হবে না। কাজেই শিশু, পাগল, জ্ঞানহীন ও বাধ্যকৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে মানত করা বিশুদ্ধ হবে না। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: رفع القلم عن ...) ... أَرْثَاءً تِينَ بَلْ ... অর্থাৎ তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে...। অন্য হাদীসে তিনি ﷺ আরও বলেন: إِنَّ اللَّهَ تَحَاوَزُ لِمَمْتَيٍ عَنِ الْخَطْبِ“ নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উপরের ভুলগুলো এড়িয়ে গেছেন....।” এ দুটি হাদীস একাধিবার আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. মানতের শব্দবলী:

মানতের বাক্যরূপ ও শব্দাবলির অন্যতম হচ্ছে কোনো ব্যক্তি বলবে- আল্লাহর শপথ! আমার উপর এ কাজটি করা আবশ্যিক। অথবা আমি এরূপ মানত আবশ্যিক করলাম। এ জাতীয় আরও বিভিন্ন শব্দাবলী, যাতে মানতের কথাটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে।

المُسَأَّلَةُ التَّالِيَّةُ: أَقْسَامُ النَّذْرِ

তৃতীয় মাসআলা: মানতের প্রকারভেদ

୧. ବିଶ୍ୱକ୍ଷ ମାନତ ଏବଂ ଅଶ୍ୱକ୍ଷ ମାନତ:

মানত বিশুদ্ধ হওয়া বা না হওয়ার দিক থেকে দুই প্রকার: বিশুদ্ধ মানত, অশুদ্ধ মানত। অথবা জায়েয মানত ও নিষিদ্ধ মানত। অথবা সংঘটিত মানত ও অসংঘটিত মানত।

অতএব, মানতটি তখন বিশুদ্ধ, সংঘটিত ও পূর্ণ করা আবশ্যিক হবে, যখন তা আল্লাহর আনুগত্য ও নৈকট্যের ক্ষেত্রে হবে, যার মাধ্যমে মানতকারী আল্লাহর নৈকট্য অর্জন উদ্দেশ্য করবে। আবার মানতটি অশুদ্ধ, অসংঘটিত ও পূর্ণ করা আনাবশ্যিক হবে, যদি তা আল্লাহর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে হয়। যেমন, কোনো ব্যক্তি কবর, ওলী-আউলিয়া বা নাবীগণের নামে মানত করল, অথবা কাউকে হত্যা করা, মদ পান করা বা এ জাতীয় অন্য পাপকাজের মানত করল, তাহলে এ মানত সংঘটিত হবে না। আর তা পূর্ণ করা হারাম হবে।

٢. شرط مُوكِّد و شرط يُوكِّد مانع:

ছাড়াই। যেমন কোনো ব্যক্তি বলবে, ‘আমি অবশ্যই আল্লাহর উদ্দেশ্যে এত রাকাআত সালাত আদায় করব বা এতদিন সিয়াম পালন করব।’ সুতরাং এটা পূর্ণ করা তার উপর ওয়াজিব।

খ. **النذر المطلق** বা **شَرْطُّ يُكْلِفُ مَانَةً**: যা নির্দিষ্ট কোনো শর্ত বা কোনো কিছু অর্জন করার সাথে শর্তযুক্ত। যেমন কোনো ব্যক্তি বলল, যদি আল্লাহ আমাকে সুস্থ করে দেন অথবা আমার নিরুদ্দেশ ছেলে/মেয়ে/স্বজন যদি ফিরে আসে, তাহলে আমি এটা করব। এরূপ মানতের শর্ত পূর্ণ হলে এবং উদ্দিষ্ট বস্তু পেয়ে গেলে সেই মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব।

المسألة الرابعة: أنواع النذر وأحكامه

চতুর্থ মাসআলা: মানতের শ্রেণিভেদ ও তার হকুমসমূহ

হকুম কার্যকর হওয়া এবং পূর্ণ করা বা না কার দিকে থেকে মানত পাঁচ ভাগে বিভক্ত:

১. **النذر المطلق** বা **شَرْطُّ يُكْلِفُ مَانَةً**: যেমন কোনো ব্যক্তি বলবে: আমি মানত করলাম। কিন্তু সে নির্দিষ্ট কোনো কাজের কথা বলল না, তাহলে তার জন্য শপথের কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব। চাই সে মানতটি শর্তযুক্ত হোক বা শর্তমুক্ত হোক। **উকুবাহ** বিন আমের **রাসূল** এর হাদীসে। তিনি বলেন, **রাসূলুল্লাহ** সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

كَفَارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسْمَمْ كَفَارَةُ يَمِينٍ

“নির্দিষ্ট কাজের কথা না বলে মানত করলেও তার উপর শপথ ভঙ্গের কাফফারা বর্তাবে।”^{৯৫৬}

২. **النذر للحاج والغضب** বা **شَرْطُّ الْحَاجَةِ وَالْغَضَبِ**: এ মানতটি সংযুক্ত থাকবে একটি শর্তের সাথে, যে শর্তটি দ্বারা কোনো কাজ হতে বাধা প্রদান করা বা কাজটি করার উপর উৎসাহিত করা বা কোনো বিষয়কে সত্যায়িত বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য হবে। যেমন কোনো ব্যক্তি বলল: আমি যদি তোমার সাথে কথা বলি, অথবা তোমাকে সংবাদ না জানাই, অথবা এ সংবাদটি যদি সঠিক না হয় অথবা যদি মিথ্যা হয়, তাহলে আমি হাজ্জ পালন করব বা দাস মুক্ত করব। এই মানত অন্যকে কোনো কাজ করতে উৎসাহ প্রদান করা অথবা নিষেধ করার ক্ষেত্রে শপথের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। এর দ্বারা মানত বা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্য নেওয়া হয়নি। সুতরাং, এ ক্ষেত্রে এ লোকটির এখতিয়ার বা স্বাধীনতা রয়েছে, সে যা মানত করেছে, তা করবে অথবা শপথ ভঙ্গে কাফফারা দিয়ে দিবে। **রাসূলুল্লাহ** **রাসূল** বলেন:

كَفَارَةُ النَّذْرِ كَفَارَةُ الْيَمِينِ “মানতের কাফফারা শপথ ভঙ্গের কাফফারার মতোই।”^{৯৫৭}

^{৯৫৬} তিরমিয়ী, হ্য. ১৫১৮ এবং তিনি হাসান সহীহ গৌরীর বলেছেন; অন্যান্যেরা যঙ্গে বলেছেন। তবে সুনান আবু দাউদে ইবনু আকাস রা: থেকে বর্ণিত হাদীস একে শক্তিশালী করে, হ্য. ৩৩২২; ইমামগণ একেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং একে মাওকুফ বলেছেন। দেবুন, সুবুলুস সালাম ৮/৪২।

٣. **وَ الْمُبَارَكَةُ بِهِ مَانَاتُ**: এটা হলো কোনো বৈধ কাজ করার মানত করা। যেমন কোনো একটি কাপড় পরিধানের বা প্রাণির উপর আরোহণ ইত্যাদি কাজ করার মানত করা। শাহখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ[ؓ] এর মতে, এই প্রকার মানতকারীর উপর মানত পূর্ণ করা বা কাফফারা আদায় করা কোনোটিই আবশ্যিক নয়। কেননা এ ব্যাপারে ইবনু আরাস[ؓ] এর হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন ভাষণ দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় দেখলেন যে, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। তখন তিনি তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবীগণ[ؓ] বললেন: এ হলো আবু ইসরাইল। সে সুর্যের আলোতে দাঁড়িয়ে থাকবে, ছায়া গ্রহণ করবে না, কারো সাথে কথা বলবে না এবং সিয়াম পালন করবে মর্মে মানত করেছে। তখন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন:

مُرْمَةٌ فَلِيَكُلِّمْ وَلِيُسْتَظِلْ وَلِيُسْتَعِدْ صَوْمَةٌ

“তুমি তাকে আদেশ দাও! সে যেন কথা বলে, ছায়া গ্রহণ করে, বসে এবং তার সওমকে পূর্ণ করে।”^{১৫৮}

৪. **وَ الْمَأْمَنَةُ بِهِ مَانَاتُ**

তা হলো কোনো পাপ কাজের মানত করা। যেমন মদপানের মানত করা, কবরের উদ্দেশ্যে মানত করা, কবরে শায়িত মৃত ব্যক্তিদের জন্য মানত করা, হায়েয়ের দিনগুলোতে সিয়াম পালন করা বা কুরবানির দিন সিয়াম রাখার মানত করা। এ জাতীয় মানত কার্যকর হবে না। ফলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে না। আয়িশাহ[ؓ]-এর হাদীস। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَغْصِيَ اللَّهُ فَلَا يَغْصِبُهُ

“যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করার মানত করবে, সে যেন তার নাফরমানী না করে।”^{১৫৯}

কেননা আল্লাহর নাফরমানী করা কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয় এবং তার জন্য কোনো কাফফারা আবশ্যিক হবে না।

৫. **وَ الْمَأْمَنَةُ بِهِ مَانَاتُ**

তা হলো আল্লাহর আনুগত্যের বিষয়ে মানত করা। যেমন সালাত, সিয়াম বা হজ্জ পালনের মানত করা। চাই তা শর্তবিহীন হোক বা কোনো কিছু অর্জিত হওয়ার সাথে শর্তযুক্ত হোক। যদি তা শর্তবিহীন হয়, তবে তা পূর্ণ করা আবশ্যিক। আর যদি শর্তযুক্ত হয়, তবে শর্ত পূর্ণ হলে তা পূর্ণ করা আবশ্যিক। কারণ আয়িশাহ[ؓ] এর হাদীসে এসেছে, নাবী[ؓ] বলেন:

^{১৫৮} সহীহ মুসলিম, হ্য. ফুআ. ১৬৪৫।

^{১৫৯} সহীহ বুখারী, হ্য. ৬৭০৪।

^{১৬০} সহীহ বুখারী, হ্য. ৩৯২।

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلَيُطِعْنَهُ

“যে ব্যক্তি মানত করে যে, সে আল্লাহর আনুগত্য করবে, সে যেন তার আনুগত্য করে।”^{১৬০}

الْمُسَأَّلَةُ الْخَامِسَةُ: صُورٌ مِّنَ النَّذْرِ الَّذِي لَا يَجُوزُ الْوَفَاءُ بِهِ পঞ্চম মাসআলা: যেসব মানত পূর্ণ করা বৈধ নয় তার স্বরূপ

যে মানত পূর্ণ করা জায়েয নয়, তা হলো পাপকাজের মানত করা। এর বিভিন্ন রূপ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো:

১. মদপান করা বা হায়েযের দিনগুলোতে সিয়াম রাখার মানত করা। কারণ আয়িশাহ رض এর হাদীসে এসেছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

مَنْ نَذَرَ أَنْ يَغْصِبَ اللَّهَ فَلَا يَغْصِبُهُ

“যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করার মানত করে, সে যেন তার নাফরমানী না করে।”^{১৬১}

২. মৃত ব্যক্তিদের নৈকট্য লাভের জন্য যে মানত করা হয়। যেমন কোনো ব্যক্তির কথা: হে অমুক সায়িদ বা ওলী! যদি আমার হারানো বস্তু ফিরে পাই, অথবা আমার রোগ ভালো হয় অথবা আমার প্রয়োজন মিটে যায়, তাহলে আপানার জন্য এত টাকা বা খাবার বা মোমবাতি অথবা এত কেজি তেল দেব ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং এরূপ মানত বাস্তিল; বরং এটা বড়ো শিক্ষ। আমরা তা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। এটা এ করণে যে, সে তো সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মানত করেছে। আর তা বৈধ নয়। কেননা মানত করা একটি ইবাদাত। আর এটা আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে বৈধ নয়।

৩. যদি কোনো ব্যক্তি কোনো কবর অথবা গাছে বাতি ঝালানোর মানত করে, তার জন্য এ মানত পূর্ণ করা জায়েয নয়; বরং সে সেটার মূল্য অন্য কোনো কল্যাণকর কাজে ব্যয় করবে। কারণ সেটা (কবর বা গাছে বাতি ঝালানো) পাপকাজ। আর পাপকাজে কোনো মানত করা যাবে না। যেমনটি পূর্ববর্তী হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে।

^{১৬০} সহীল বুখারী, হা. ৬৬৯৬।

^{১৬১} সহীল বুখারী, হা. ৬৬৯৬।



চতুর্দশ অধ্যায়
বিচার-ফয়সালা ও
সাক্ষ্য প্রদান

كتاب الأطعمة، والذبائح، والصيام

— ♫ এতে ০২টি অনুচ্ছেদ রয়েছে ♫ —

প্রথম অনুচ্ছেদ: বিচার-ফয়সালা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: সাক্ষ্য প্রদান



الباب الأول: في الأطعمة

প্রথম অনুচ্ছেদ: পানোহার করা

এবং তাতে একাধিক মাসআলা আছে।

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: تَعْرِيفُهَا وَالْأُصْلُ فِيهَا

প্রথম মাসআলা: আল্লাহ-এর সংজ্ঞা এবং তার মূলনীতি

১. আল্লাহ এর সংজ্ঞা:

আল্লাহ শব্দটি খেল এর বহুবচন। আর তা হলো- মানুষ যেসব খাদ্য খায় এবং গ্রহণের মাধ্যমে পুষ্টি লাভ করে অথবা যা পান করে।

২. তার মূলনীতি: কোন প্রকার খাবার ও পানীয় হালাল এবং কোন প্রকার হারাম, সে বিষয় মূল দলীল আল্লাহ তা'আলা বাণী:

﴿فَقُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُورِيَ إِلَّا مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاغِيْرِ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمًا حِنْزِيرٍ
فِإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلٌ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا غَادِ قَبْلَ رَبِّكَ عَفْوُرُ رَجِيمٌ﴾

“হে মুহাম্মাদ! আপনি বলে দিন, অহীর মাধ্যমে আমার কাছে যে বিধান পাঠানো হয়েছে, তাতে কোনো আহারকারীর জন্য কোনো হারামকৃত বস্তু পাইনি; তবে মৃত জঙ্গি প্রবাহিত রক্ত, শুকুরের মাংস এবং যা আল্লাহর নামে যবেহ করা হয়নি, তা হারাম করা হয়েছে। কারণ ওটা নাপাক ও গর্হিত বস্তু। কিন্তু যদি কোনো লোক স্বাদ গ্রহণ ও সীমালংঘনের উদ্দেশ্য ব্যক্তিত নিরূপায় হয়ে খায়, তবে তার জন্য ওটা খাওয়া বৈধ। কারণ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহশীল।” [সূরা আনআম : ১৪৫]

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন:

﴿وَرَحِيلُ لَهُمُ الطَّيْبَاتِ وَبَحِيرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَابِتِ﴾

“তিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ বৈধ করেন এবং অপবিত্র ও নিকৃষ্ট বস্তুসমূহ তাদের জন্য হারাম করেন।” [সূরা আরাফ : ১৫৭]

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন:

﴿فَلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالظَّبَابَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾

“আপনি জিজ্ঞেস করুন: আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য যে সব শোভনীয় বস্ত্র ও পরিধে জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে নিষিদ্ধ করেছে?” [সূরা আরাফ : ৩২]

الطيبات দ্বারা উদ্দেশ্য: অন্তর যেটাকে উত্তম মনে করে এবং খেতে আগ্রহী হয়। কারণ মানুষ যখন কোনো খাবার খায়, তখন তার প্রভাব চরিত্রের উপর পড়ে। অতএব, ভালো খাবারের ভালো প্রভাব পড়ে, আর খারাপ খাবারের খারাপ প্রভাব পড়ে। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা পরিধে ও ভালো খাবারগুলো বৈধ করেছেন এবং অপবিত্র ও খারাপ খাবারগুলো হারাম করেছেন।

খাবারের ব্যাপারে মূলনীতি হলো: প্রজ্ঞাময় শরীয়ত প্রণেতা (আল্লাহ তায়ালা) যা হারাম করেছেন, তা ব্যতীত সমস্ত খাবার হালাল। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطَرَرْتُمْ إِلَيْهِ﴾

“তিনি তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন তা তিনি বিশদভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। তবে তোমরা যদি (হারাম ভঙ্গ করতে) বাধ্য হও তবে তা ভিন্ন কথা।” [সূরা আনআম : ১১৯]

এ বিশদ বর্ণনাটি তিনটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে:

১. বৈধতার দলীল।

২. হারাম হওয়ার দলীল।

৩. শরীয়ত প্রণেতা যা বর্ণনা করা থেকে বিরত থেকেছেন।

নাবী ﷺ তা স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। তিনি ﷺ বলেন:

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضِيغُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَمَ أَشْيَاءً فَلَا تَتَهْكُوها، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءً - رَحْمَةً لَكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا

“নিশ্চয়ই আল্লাহ বেশ কিছু বিষয় তোমাদের উপর ফরজ করেছেন, তোমরা তা বিনষ্ট করো না। আর তিনি বেশ কিছু সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তোমরা তা অতিক্রম করো না। তিনি বেশকিছু বিষয় হারাম করেছেন, তোমরা তা লঙ্ঘন করো না। আর তোমাদের প্রতি রহমত স্বরূপ বেশকিছু বিষয়ের বর্ণনা থেকে তিনি বিরত থেকেছেন; ভুলে গিয়ে নয়। কাজেই তোমরা সেগুলোর অনুসন্ধান করো না।”^{১৬২}

^{১৬২} ইমাম দারাকুঢ়ী তার সুনামে বর্ণনা করেন ৪/১৮৪; বায়হাকী ১০/১২; ইমাম নাবী হাসান বলেছেন, যেভাবে শাইখ ফাওয়ান তাঁর আল-মুলাখাসুল ফিকুহিতে উল্লেখ করেছেন ২/৪৬০।

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: مَا نَصُ الشَّارِعِ عَلَىٰ حَلِهِ، وَإِبْاحَتِهِ

মিতীয় মাসআলা: যে সমস্ত খাবারকে শরীয়ত প্রণেতা হালাল ও বৈধ হিসেবে উল্লেখ করেছেন

এর মূলনীতি ও সূত্র হলো: যে সমস্ত খাবার পবিত্র এবং কোনো প্রকার ক্ষতির আশংকা নেই, তা খাওয়া ও পান করা বৈধ। আর বৈধ খাবার-পানীয় দুই প্রকার: প্রাণী জাতীয় ও উভিদ জাতীয়। উভিদ জাতীয় খাবার যেমন শস্যের দানা বা বিচি ও ফল-ফলাদি। আর প্রাণী জাতীয় খাবারও দুই প্রকার: স্থলজ ও সামুদ্রিক।

প্রথমত: সামুদ্রিক প্রাণী: তা হলো ঐ সমস্ত প্রাণী, যা শুধুমাত্র সমুদ্রেই বসবাস করে থাকে। যেমন বিভিন্ন প্রকার মাছ এবং এ জাতীয় অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী। তবে যেগুলো বিষাক্ত প্রাণী সেগুলো ক্ষতিকর হওয়ার কারণে হারাম। ঠিক তেমনিভাবে যে সমস্ত সামুদ্রিক প্রাণী নাপাক বস্তু ও ময়লা-আবর্জনা খায়, সেগুলোও হারাম। যেমন ব্যাঙ ও তৎসঙ্গে এটি হত্যা করাও নিষেধ। ঠিক তেমনিভাবে কুমিরও হারাম। কেননা তা নোংরা এবং তার বড়ো বড়ো শিকারী দাঁত রয়েছে, যার দ্বারা সে আক্রমণ করে। আর এগুলো হারাম হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার বাণী রয়েছে:

﴿وَرُبَّ حَرَمٍ عَلَيْهِمُ الْجُنَاحُ﴾

“আর তিনি নিকৃষ্ট ও অপবিত্র প্রাণীগুলিকে তাদের জন্য হারাম করেন।” [সূরা আরাফ : ১৫৭]

আর সামুদ্রিক প্রাণী খাওয়া বৈধ। চাই মুসলিম ব্যক্তি শিকার করুক বা অন্য কেউ। আর তা স্থলের বৈধ বা অবৈধ প্রাণির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হোক বা না হোক। সামুদ্রিক প্রাণী যবেহ করারও কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿أَحِلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلْسَّيَارَةِ﴾

“সমুদ্রের শিকার ও খাদ্য তোমাদের জন্য বৈধ করে দেওয়া হয়েছে, তোমাদের জন্য ও সমুদ্র ভ্রমণকারীদের ভোগবিলাসের উপকরণ স্বরূপ।” [সূরা মায়দাহ : ৯৬]

ইবনু আবু আব্দুল্লাহ বলেন: “জেনে রেখো, সমুদ্রের শিকার সেটাই যা সমুদ্র হতে শিকার করা হয়। আর সমুদ্রের খাবার হলো, যা সমুদ্র নিষ্কেপ করে।”^{১৬৩}

আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন:

سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعْنَى الْقَلِيلِ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطَيْشْنَا، أَفَتَوَضَّأْنَا بِبَأْءَ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلُّ مَيْتَةٌ

^{১৬৩} মায়দাহুরু ৪/২৭০; বায়হুকী ১০/১১; দেখুন, তাফসীর ইবনে কাসীর ৩/১৮৯, উক্ত আয়াতের তাফসীর।

“একজন ব্যক্তি রসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আমরা সমুদ্রে ভ্রমণ করি। আর আমাদের কাছে (সুপেয়) পানি অল্প পরিমাণে থাকে। তা দ্বারা যদি ওয়ু করি, তবে আমরা ত্রুষ্ণার্ত হয়ে পড়ব। তাহলে কি আমরা সমুদ্রের পানি দ্বারা ওয়ু করতে পারি? তখন জবাবে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন: তার পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণিও খাওয়া বৈধ।”^{১৬৪}

দ্বিতীয়ত: স্থলজ প্রাণী:

স্থল ভাগের যে সমস্ত প্রাণির বৈধতার দলীল এসেছে, সেগুলোকে নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো:

ক. نَعَمْ বা চতুর্ষদ জন্তুসমূহ: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾

“তিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য চতুর্ষদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন: তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে উষ্ণতা, বিভিন্ন উপকারিতা এবং তা হতে তোমরা (গোশত) খেয়ে থাকো।” [সূরা নাহল : ৫]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ أَحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْهَى عَلَيْكُمْ﴾

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর। তোমাদের জন্য চতুর্ষদ জন্তুসমূহ হালাল করে দেওয়া হয়েছে। তবে যা হারাম হিসেবে পাঠ করা হয়, তা ব্যক্তীত।” [সূরা মায়দাহ : ১]

এখানে চতুর্ষদ জন্তু দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: উট, গরু ও ছাগল।

খ. بَلَى وَبِالْغَيْلِ: জাবির বিন আব্দুল্লাহ رض-এর হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন,

تَسْأَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حَبْرِيرَ عَنْ حُجُومِ الْحُمْرِ، وَرَأَخْصَ فِي حُجُومِ الْحَيْلِ

“নাবী ﷺ খায়বার যুদ্ধের দিন গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।”^{১৬৫}

গ. بَلَى وَبِالْগুইসাপ: ইবনু আবু রাবাস رض হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَكِلَ الصَّبْبُ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“রসূলের ﷺ দস্তরখানায় গুইসাপ খাওয়া হয়েছে।”^{১৬৬} অন্য হাদীসে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

^{১৬৪} সুনান আবু দাউদ, হা. ৮৩; সুনানুন নাসাই, হা. ৫৯; ইবনু মাজাহ, হা. ৩৮৬; তিরমিয়ী, হা. ৬৯ এবং তিনি হাসান সহীহ বলেছেন; ইযাম মাসেক তার মুয়াত্তার ২০ পৃষ্ঠায়; ইযাম হাকিম তার মুস্তাদরাকে ১/১৪৭০ এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। ইযাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহ সুনানুন নাসাই, নং ৫৮।

^{১৬৫} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৫৫২০; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৯৪১।

^{১৬৬} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৫২১৭; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৯৪৫।

كُلُّوا فِإِنَّهُ حَلَالٌ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي

“তোমরা খাও! নিশ্চয়ই তা হালাল। কিন্তু এটা আমার পছন্দনীয় খাবার নয়।”^{৯৬৭}

য. **الْحَمَارُ الْوَحْشِيُّ**: বা বন্য গাঁধা: এটা গৃহপালিত নয়, তাই খাওয়া বৈধ। আবু কাতাদা رض এর হাদীসে এসেছে। তিনি একটি বন্য গাঁধা দেখতে পান এবং তা যবেহ করেন। অতঃপর নাবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন:

قَالَ: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟» ، قَالَ: مَعَنَا رِجْلُهُ، فَأَخْذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَهَا

“তিনি ﷺ বলেন: তোমাদের কাছে কি তার কোনো গোস্ত অবশিষ্ট আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, পা আছে। তখন তিনি গ্রহণ করলেন ও খেলেন।”^{৯৬৮}

৫. أَرْنَبٌ বা খরগোশ: আনাস رض থেকে বর্ণিত আছে।

أَنَّهُ أَخْذَ أَرْنَبًا فَلَدَبَحَهَا أَبُو طَلْحَةَ وَبَعْثَ بُورِكَاهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَلَهُ

“তিনি একটি খরগোশ শিকার করেছিলেন। অতঃপর আবু তালহা رض তা যবেহ করেন এবং তার রান নাবী ﷺ এর নিকট প্রেরণ করলে তিনি তা গ্রহণ করেন।”^{৯৬৯}

চ. جَاج বা হায়েনা: জাবির رض থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنِ الْضَّبْعِ، فَقَالَ: هُوَ صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ

“আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে হায়েনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি উভয়ে বললেন: সেটি একটি শিকারযোগ্য প্রাণী। তবে কেউ যদি তা ইহরাম অবস্থায় শিকার করে, তবে তাকে কাফফারা স্বরূপ একটি মেষ যবেহ করতে হবে।”^{৯৭০}

[অর্থাৎ ইহরাম অবস্থায় প্রাণী শিকার করা নিষিদ্ধ। সুতরাং, কেউ এ অবস্থায় হায়েনা শিকার করলে ফিদ্হিয়া হিসেবে একটি মেষ যবেহ করে মক্কার গরীব-মিসকিনদেরকে দিয়ে দেবে।—সম্পাদক]

ইবনে হাজার আসকালানী রহিমান্নাহ বলেন, হায়েনা খাওয়া হালাল হওয়ার ব্যাপারে অনেকগুলো হাদীস রয়েছে। সে হাদীসগুলো গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনো অসুবিধা নেই।^{৯৭১}

ছ. مোরগ-মুরগী: আবু মুসা আশআরী رض বলেন:

^{৯৬৭} مুওাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৭২৬৭; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৯৪৪।

^{৯৬৮} مুওাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ২৮৫৪; সহীহ মুসলিম, হা. ২৭৪৮, ফুআ. ১১৯৬।

^{৯৬৯} مুওাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ২৫৭২; সহীহ মুসলিম, হা. ৪৯৪২, ফুআ. ১৯৫৩; অর্থগত বর্ণনা।

^{৯৭০} সুনান আবু দাউদ, হা. ৩৮০১; তিরমিয়ী, হা. ৮৫১; এবং তিনি হাসান সহীহ বলেছেন; নাসাই, হা. ৪৩২৩; ইবনু মাজাহ, হা. ৩০৮৫; শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহ সুনানুবন্ন মাজাহ, হা. ২৫২২।

^{৯৭১} কাতুল বারী ৯/৫৭৪।

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ

“আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে মোরগের গোশত খেতে দেখেছি।”^{৯৭২}

আর মোরগ-মুরগীর সাথে রাঁজহাস ও পাঁতিহাসকেও সংযুক্ত করা হয়। কারণ উভয়টি পবিত্র প্রাণির অন্তর্ভুক্ত। ফলে তা আল্লাহর এই বাণির আওতাভুক্ত হবে:

﴿أَحَلَّ لَكُمُ الظَّبَابُ﴾

“তোমাদের জন্য পবিত্র বস্ত্রসমূহ হালাল করে দেওয়া হয়েছে।” [সূরা মায়দাহ : ৪]

জ. বা টিভি: আব্দুল্লাহ বিন আবী আওফা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ سِتَّاً، كُنَّا نَأْكُلُ مَعْهُ الْجَرَادَ

“আমরা নাবী ﷺ এর সাথে সাতটি বা ছয়টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তাতে আমরা তার সাথে টিভি খেতাম।”^{৯৭৩}

المسألة الثالثة: ما نص الشارع على تحريره

তৃতীয় মাসআলা: শরীয়ত প্রণেতা যেসব খাবার হারাম করেছেন

হারাম খাদ্যসমূহের মূলনীতি হলো: যেসব খাবার অপবিত্র, নোংরা ও ক্ষতিকর, তা খাওয়া জায়েয নেই। আর তা নিম্নরূপ:

১. আল্লাহর কিতাব আল-কুরআনে উল্লিখিত হারাম খাদ্যসমূহ ১০টির মাঝে সীমাবদ্ধ। আল্লাহ তা'য়ালার বাণীতে উল্লিখিত হয়েছে:

﴿خُرِمَثْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخِنَقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَرْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾

“তোমাদের জন্য মৃত প্রাণী, রক্ত, শুকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অপরের নামে উৎসর্গকৃত পণ্ড, কঠরোধে মারা যাওয়া পণ্ড, আঘাত লেগে মারা যাওয়া পণ্ড, পতনের ফলে মৃত পণ্ড, শিংয়ের আঘাতে মৃত পণ্ড এবং হিংস্র প্রাণির আক্রমণে মারা যাওয়া পণ্ড হারাম। তবে তোমরা মারা যাওয়ার আগেই যা যবেহ করতে পারবে, তা হালাল। যে সমস্ত পণ্ডকে পূজার বেদিতে বলি দেওয়া হয়েছে সেটাও হারাম।” [সূরা মায়দাহ : ৩]

➤ অন্তু বা মৃত প্রাণী হলো: যার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে এবং শারঙ্গ পক্ষতিতে যবেহ করা ছাড়াই মারা যায়। এটা রক্ত জমাট হওয়া ও খারাপ খাবার হওয়ার কারণে ক্ষতিকর হওয়ায় হারাম করা

^{৯৭২} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৫৫১৭; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৬৪৯; শব্দ ইমাম তিরমিয়ীর।

^{৯৭৩} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৫৪৯৫; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৯৫২।

হয়েছে। তবে একান্ত বাধ্য হলে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু খাওয়া বৈধ। আর মৃত প্রাণির মধ্য থেকে মাছ ও টিভিকে আলাদা করা হয়েছে। কারণ এগুলো মৃত অবস্থাতেও খাওয়া বৈধ।

► مَنْ يَأْكُلْ দ্রাঘِيْرَ الْعَدْدَىْ لِهِ مَنْ يَأْكُلْ رِجْسَىْ وَمَنْ يَأْكُلْ خَنْزِيرَ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا ۝ “অথবা প্রবাহিত রক্ত (খাওয়া হারাম)।” [সূরা আনআম: ১৪৫]

তবে যবেহ করার পর যে সমস্ত রক্ত রগের ভিতর বা গোশতের ভিতর অবশিষ্ট থাকে, তা খাওয়া বৈধ। কলিজা ও পিল্হা খাওয়া হালাল।

► لَحْمُ الْحَنْدِيرِ ۝ বা শুকরের গোশত: এটা নোংরা প্রাণী। আর এটা নোংরা খাবারসমূহ থেয়ে পুষ্টি লাভ করে, যা খুবই মারাত্মক। এজন্য আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াতে (ক্ষতিকর) এ তিনটি বিষয় একত্রে উল্লেখ করেছেন:

﴿ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا ۝

“তবে মৃত প্রাণী, প্রবাহিত রক্ত এবং শুকরের গোশ হারাম। কারণ তা অপবিত্র এবং ঘৃণিত। ঠিক তেমনই আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে যা উৎসর্গ করা হয়েছে, তাও হারাম।” [সূরা আনআম : ১৪৫]

► مَا مَأْهُلٌ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۝ বা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ঐ প্রাণী যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা হয়েছে। আর তাওহীদ পরিপন্থী শিরকী কাজ হওয়ায় এটা খাওয়া হারাম। কারণ প্রাণী যবেহ করা ইবাদাত। আর তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা জায়েয নয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحِرْ ۝ “অতএব, আপনি আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কুরবানি করুন।” [সূরা কাওসার : ২]

► مَنْ يَنْخِنْقَ ۝ হলো: ঐ প্রাণী যা শ্বাসরোধে মারা যায়; স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়।

► مَنْ يَمْوَذِدْ ۝ হলো: ঐ প্রাণী যা লাঠি বা ভারি কিছুর আঘাতে মারা যায়।

► مَنْ يَتْرَدِيْ ۝ হলো: ঐ প্রাণী যা উঁচু স্থান থেকে পড়ে মারা যায়।

► مَنْ يَنْطَبِحْ ۝ হলো: ঐ প্রাণী যা অন্য কোনো পশুর শিংয়ের আঘাতে মারা যায়।

► مَنْ يَكْلِمْ السَّبْعَ ۝ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ঐ প্রাণী যা কোনো সিংহ, চিতাবাঘ, নেকড়ে বাঘ বা কুকুর কামড় দিয়ে যার কিছু গোশত থেয়ে ফেলেছে আর এ কারণে প্রাণিটি মারা গেছে। শেষে উল্লিখিত এ পাঁচ প্রকারের প্রাণী যদি জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং যবেহ করা হয়, তাহলে তা খাওয়া বৈধ। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেন: ﴿ لَا مَنْ يَكْلِمْ سِبْعَ مَرَّاتٍ ۝ “তোমরা যা যবেহ করেছ তা ব্যতীত।” [সূরা মায়দাহ : ৩] অর্থাৎ যবেহ-এর মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত করলে সে প্রাণী খাওয়া হালাল।

► **وَمَا ذُبْحَ عَلَى النَّصْبِ** এখানে নصب বেদি হলো এমন পাথর, যা কা'বার পাশে প্রোথিত ছিল। জাহেলী যুগে লোকেরা এর নিকট যবেহ করত। এ যবেহকৃত প্রাণী খাওয়া জায়েয নয়। কেননা এটা শিরুক, যা আল্লাহ হারাম করেছেন। যেমনটি **مَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ** বা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত দ্বারা ‘উদ্দেশ্য’ অংশে আলোচনা গত হয়েছে।

অনুরূপভাবে আরও কিছু প্রাণী আছে, যা খাওয়া হারাম।

২. যেগুলো খাওয়াতে ক্ষতি রয়েছে: যেমন বিষ, মদ, ঘাবতীয় নেশাজাত দ্রব্য এবং যা শরীর ভঙ্গুর করে দেয়। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيهِنَّ إِلَى الشَّهْلَكَةِ ﴾

“তোমরা নিজেদেরকে ধৰ্মসের দিকে ঠেলে দিও না।” [সূরা বাক্সারাহ : ১৯]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

“**وَلَا تَنْفَثُوا أَنفَسَكُمْ**” “তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না।” [সূরা নিসা : ২৯]

৩. জীবিত প্রাণী থেকে যে অংশটুকু কাটা হয়: কারণ আবু ওয়াকীদ আল-লাইছীর হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

“**مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ**

“জীবিত প্রাণী থেকে যে অংশটুকু কাটা হবে, তার হৃকুম মৃত প্রাণির মতোই।”^{১৭৪}

অর্থাৎ মৃত প্রাণী যেমন খাওয়া হারাম, ঠিক তেমনি জীবিত প্রাণির কোনো অংশ কেটে খাওয়াও হারাম।

৪. হিংস চতুর্পদ প্রাণী: তা হচ্ছে ঐ সমস্ত স্থলভাগের প্রাণী, যেগুলো ধারালো দাঁত দ্বারা প্রাণী শিকার করে। যেমন: সিংহ, চিতাবাঘ, নেকড়েবাঘ ও কুকুর। আবু ছালাবা আল-খুশানী এর হাদীসে এসেছে। তিনি বলেন:

“**هَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابِ مِنَ السَّبَاعِ**

“রসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক ধারালো দাঁতবিশিষ্ট হিংস্য জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন।”^{১৭৫}

অন্য হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

“**كُلُّ ذِي نَابِ مِنَ السَّبَاعِ، فَأَكْلَهُ حَرَامٌ**

“ প্রত্যেক ধারালো দাঁত বিশিষ্ট হিংস্যপ্রাণী খাওয়া হারাম।”^{১৭৬}

^{১৭৪} ইমাম আহমাদ তা মুসনাদে বর্ণনা করেন ৫/২১৮; সুনান আবু দাউদ, হা. ২৮৫৮; তিরমিয়ী, হা. ১৪৮০ এবং তিনি হসান বলেছেন; শাঈখ আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহত তিরমিয়ী, হা. ১১৯৭।

^{১৭৫} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৫৫৩০; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৯৩২।

^{১৭৬} সহীহ মুসলিম, হা. ৪৮৮৬, ফুআ. ১৯৩৩।

৫. হিংস্র পাখি: ঐ সমস্ত পাখি, যেগুলো ধারালো নখ দ্বারা শিকার করে থাকে। যেমন- ঈগল, বাজ, চিল, পেঁচা এবং এজাতীয় অন্যান্য পাখি। ইবনু আবাস رض এর হাদীসে এসেছে তিনি বলেন:

نَبَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السُّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي خِلْبٍ مِّنَ الطَّيْرِ.

“রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ধারালো দাঁতবিশিষ্ট হিংস্রপ্রাণী এবং ধারালো নখবিশিষ্ট পাখি খেতে নিষেধ করেছেন।”^{১৭৭}

৬. পঁচা খাবার খাওয়া পাখি: যে সমস্ত পাখি মরা-পঁচা প্রাণী খায়, সেগুলো খাওয়াও হারাম। যেমন- শকুন, বহু পালক বিশিষ্ট মারবেল পাখি ও কাক। কারণ এগুলো অপবিত্র ও ক্ষতিকর বস্তু খায়।

৭. যে সমস্ত প্রাণীক হত্যা করার বৈধতা দেওয়া হয়েছে: যেমন- সাপ, বিচু, ইঁদুর ও চিল। কারণ আয়িশাহ رض-এর হাদীসে এসেছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

خَمْسٌ مِّنَ الدَّوَابِ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ: الْغَرَابُ، وَالْجِدَاءُ، وَالْعَفْرَبُ، وَالْفَارَّةُ، وَالْكَلْبُ الْعَمُورُ.

“পাঁচ প্রকার প্রাণী, সবগুলোই ক্ষতিকর। এ গুলোকে হারাম সীমানাতেও হত্যা করা যাবে। সেগুলো হলো: কাক, চিল, বিচু, ইঁদুর এবং পাগলা কুকুর।”^{১৭৮} কারণ এগুলো অপবিত্র ও নোংরা।

৮. গৃহপালিত গাধা: জাবির رض বর্ণনা করেন।

نَبَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ غَزَوةَ خَيْرَةَ عَنْ حُمُرِ الْأَهْلَةِ

“নাবী ﷺ খায়বার যুদ্ধের দিন গৃহপালিত গাধার গোষ্ঠ খেতে নিষেধ করেছেন।”^{১৭৯}

৯. নোংরা খাবার গ্রহণকারী প্রাণী: যে সমস্ত প্রাণী অপবিত্র ও নোংরা খাবার খায়। যেমন: ইঁদুর, সাপ, মাছি, ভীমরুল ও মৌমাছি। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

وَبَحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَايِثُ

“আর তিনি তাদের জন্য অপবিত্র বস্তু হারাম করেছেন।” [সূরা আরাফ : ১৫৭]

১০. জাল্লালাহ: তা হচ্ছে ঐ সমস্ত প্রাণী, যেগুলোর বেশিরভাগ নোংরা খাবার খায়। ইবনু উমার رض হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

نَبَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَالِ

“রসূলুল্লাহ ﷺ জাল্লালাহ (অধিক পরিমাণে নাজাসাত খায় এমন প্রাণী) খেতে নিষেধ করেছেন।”^{১৮০}

^{১৭৭} সহীহ মুসলিম, হা. ৪৮৮৮, ফুআ. ১৯৩৪।

^{১৭৮} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ১৮২৯; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১১১৮।

^{১৭৯} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৫৫৩০; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৯৩২।

^{১৮০} সুনান আবু দাউদ, হা. ৩৭৮৫; ইবনু মাজাহ, হা. ৩১৮৯; সহীহ, দেখুন, ইরওয়াউল গালীল ৮/১৪৯।

চাই তা উট, গরু, ছাগল, মুরগী বা এ জাতীয় অন্যান্য যে-কোনো প্রাণীই হোক না কেন। তবে এগুলোকে যদি বেঁধে রেখে দীর্ঘদিন পেটের নোংরা খাবার থেকে দূরে রাখা হয় এবং পরিত্র খাবার খাওয়ানো হয়, তাহলে তা খাওয়া বৈধ। ইবনু উমার رض এ জাতীয় কোনো প্রাণী থেতে চাইলে সেটি ও দিন বেঁধে রাখতেন। কেউ কেউ বলেছেন: ও দিনেরও বেশি সময় বেঁধে রাখতে হবে।

المسألة الرابعة: ما سكت عنه الشارع

চতুর্থ মাসআলা: শরীয়ত প্রণেতা যা বর্ণনা করা থেকে বিরত থেকেছেন

যেসব প্রাণির ব্যাপারে শরীয়ত প্রণেতা চুপ থেকেছেন এবং যে ব্যাপারে কোনো নিষেধের দলীল নেই, সেসব প্রাণির ব্যাপারে মূলনীতি হলো: সাধারণ বৈধতা। কারণ কোনো জিনিসের মূল হচ্ছে বৈধ। এ বিষয়ে দলীল হলো আল্লাহ তায়ালার এই বাণী:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾

“তিনিই (আল্লাহ) যিনি তোমাদের জন্য জমিনের সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন।” [সূরা বাকুরাহ : ২৯]

ঠিক তেমনিভাবে আবু দারদা رض এর হাদীসে এসেছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، فَاقْبِلُوا مِنَ اللَّهِ الْعَافِيَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُكِنْ لِيْسَنِي شَيْئًا» وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّاً

“আল্লাহ তার কিতাবে যা হালাল করেছেন তা হালাল। আর যা হারাম ঘোষণা করেছেন তা হারাম। আর যা থেকে বিরত থেকেছেন, তা তোমাদের জন্য বৈধ। অতএব, তোমরা আল্লাহর সাধারণ বৈধতাকে গ্রহণ করো। কেননা আল্লাহ তায়ালা কোনো কিছুই ভুলে যান না। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন: “আপনার প্রতিপালক কোনো কিছুই ভুলে যান না।” [সূরা মারইয়াম : ৬৪]^{১৮}

المسألة الخامسة: ما يكره أكله

পঞ্চম মাসআলা: যে সকল খাবার খাওয়া মাকরুহ

পেঁয়াজ ও রসুন এবং এ জাতীয় দুর্গন্ধিযুক্ত বস্তু, যেমন মূলা ও কাঁকুড় (পেঁয়াজ জাতীয় এক প্রকার সজিবিশেষ) এগুলো খাওয়া মাকরুহ। বিশেষ করে মসজিদে ও অন্যান্য দীনি বৈঠকগুলোতে উপস্থিত হওয়ার সময়। কারণ জাবির رض হাদীসে আছে, নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

^{১৮} হাকিম ২/৩৭৫ এবং তিনি সহীহ বলেছেন; ইমাম যাহাবী ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

“যে ব্যক্তি এ দুর্গন্ধযুক্ত গাছ থেকে কিছু খাবে, সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়।
নিশ্চয়ই মানুষ যে জিনিসে কষ্ট পায়, ফেরেশতারাও সেই জিনিসে কষ্ট পায়।”^{১৮২}

“يَتَكَبَّرُ الْمُنْتَبِهُونَ”
অর্থ রসুন গাছ। অন্য বর্ণনায় রয়েছে: “যতক্ষণ না তার দুর্গন্ধ
চলে যায়, (ততক্ষণ মসজিদে যাবে না)।”

তবে এ সবজি দুটিকে (পিয়াজ-রসূন) যখন রান্না করা হবে এবং গন্ধও চলে যাবে, তখন তা খেতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা উমার  বলেছেন:

فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلَيُمْتَهِنَّا طَبَخًا

“ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ସବଜି ଦୁଟିକେ ଖାବେ, ସେ ଯେଣ ରାନ୍ନା କରେ ଏର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଧର୍ମ କରେ ଦେୟ ।” ୧୮୩

জাবির  হতে অন্য বর্ণনায় রয়েছে: مَا أَرَأْتُمْ لَا نَعْلَمْ

“আমি মনে করি, এ নিষেধাজ্ঞাটা শুধুমাত্র কঁচা অবস্থায় খাওয়ার ক্ষেত্রে।” ১৮

المقالة السادسة: أداب الأكل

খাওয়ার কিছু আদব আছে, যার প্রতি যত্নশীল হওয়া উচিত। আর সেগুলো হলো:

১. খাওয়ার খাওয়ার শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’ বলাঃ এ ব্যাপারে উমার বিন আবি সালামার  এর হাদীস রয়েছে। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ  এর কোলে বসা ছোটো বালক ছিলাম। আমার হাত খাওয়ার সময় পাত্রের এদিক ওদিক চলে যেত। তখন আল্লাহর রসূল  আমাকে বললেন:

يَا عَلَّامُ، سَمِّ اللَّهَ، وَكُلُّ يَمِينِكَ، وَكُلُّ مَا يَلِيكَ

“হে বালক! ‘বিসমিল্লাহ’ বলো, ডান হাতে খাও এবং তোমার কাছ থেকে খাও!” পরবর্তীতে এটাই ছিল আমার খাওয়ার পদ্ধতি।”^{৯৮৫}

২. ডান হাতে খাওয়া: এটি পূর্বে উল্লিখিত হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে।

^{১৮২} মুসলিমকুন আলাইডি: সহীল বুখারী, শ. ৫৪৫২; সহীহ মুসলিম, শ. ফুআ, ৫৬৪।

^{১৮০} নথীয় মসজিদ, ঘ. ১১৪৫, ফআ, ৫৬৭।

ପ୍ରକାଶନ, ପୃ. ୫୫୫

^{२५७} मध्यसाहस्र आलाटेट्रिः सतीश्वर बधायी श्रा ५३७६। सतीइ मसलिय श्रा यजा २०२१।

৩. বাসনের যে অংশ ব্যক্তির কাছে রয়েছে সেখান থেকে খাওয়া: এর আলোচনা পূর্ববর্তী হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে। তবে যখন জানতে পারবে যে, পাত্রের বিভিন্ন জায়গা থেকে খাবার খাওয়াতে তার সঙ্গী কষ্টবোধ করবে না এবং তা অপছন্দও করবে না, তখন কোনো সমস্যা নেই। কেননা এ বিষয়ে আনাস رض থেকে একজন দর্জির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যে রসূলুল্লাহ ص কে খাবারের দাওয়াত দিয়েছিল। আনাস رض বলেন:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَسَبَّبُ الدُّبَابَ مِنْ حَوَالِيِ الْقَصْبَةِ

“আমি নাবী ص কে দেখলাম যে তিনি প্লেটের চারপাশ থেকে লাউ খুঁজছেন।”^{১৮৬}

অথবা যদি লোকটি একাকী একটি প্লেটে খায়, তার সাথে আর কেউ নেই অথবা খাবারের (প্লেট) বিভিন্ন প্রকারে খাবার আছে, তখন অপর সাথীকে কষ্ট না দিয়ে নিজের সামনে খাবার না থাকলে প্লেটের অন্যান্য জায়গা থেকেও খাবার খাওয়া জায়েয়।

৪. খাবার শেষে ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ বলা: আবু উমামা رض এর হাদীসে এসেছে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ص এর সামনে থেকে যখন দন্তরখানা উঠিয়ে নেওয়া হতো, তখন তিনি বলতেন:

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرُ مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبِّنَا

“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। অনেক অনেক প্রশংসা, যা পবিত্র ও কল্যাণময়। হে আমাদের রব! যে খাবার ছাড়া যায় না এবং তা থেকে অমুখাপেক্ষণ্যও থাকা যায় না।”^{১৮৭}

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন:

إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَخْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَخْمَدَهُ عَلَيْهَا

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ ব্যক্তির উপর সন্তুষ্ট হন, যে খাবার খেয়ে অথবা পান করে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।”^{১৮৮}

৫. দন্তরখানায় খাওয়া: আনাস বিন মালেক رض এর হাদীসে এসেছে। তিনি বলেন:

مَا أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَوَانِ، وَلَا فِي شُكْرُجَةِ، وَلَا خُبْزَ لَهُ مُرْقَقٌ. قُلْتُ لِقَنَادَةَ: عَلَامَ يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: عَلَى السَّفَرِ

“নাবী ص কখনো টেবিলের উপর খাবার খাননি, কখনো তিনি সুকুররজাহ তথা ছোটো ছোটো (বিশেষ) পাত্রে আহার করেননি এবং তার জন্য কখনো মিহি আটার রুটি তৈরী করা হয়নি।”

^{১৮৬} সহীহ বুখারী, হা. ৫৩৭৯।

^{১৮৭} সুনানুত তিরমিয়ী, হা. ৩৪৫৬ এবং তিনি হাসান সহীহ বলেছেন। [মূল বইতে তাখরীজ ভুল রয়েছে-সম্পাদক]

^{১৮৮} সহীহ মুসলিম, হা. ৬৮২৫, ফুআ. ২৭৩৪।

○ ﷺ অয়োদশ অধ্যায় : পানাহার করা, পণ্ড যবেহ ও শিকার করা ﷺ ○ ৬২৫

বর্ণনাকারী বলেন: আমি কাতাদাকে জিজ্ঞেস করলাম: তাহলে তারা কীসের উপর খাবার খেতেন? তিনি বললেন: এ দণ্ডরখানার উপরে।”^{১৮৯}

৬. হেলান দিয়ে খাবার খাওয়া মাকরহ: আয়িশাহ رض-এর হাদীস। তিনি বলেন, আমি বললাম,
 يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُلْ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ، مُسْكِنًا، فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكَ، فَأَضْغَى بِرَأْسِهِ حَتَّىٰ كَادَ أَنْ تُصِيبَ جَبَهَتَهُ
 الأرض، قَالَ: «لَا، بَلْ أَكُلُّ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ، وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ»

“হে আল্লাহর রসূল! আপনি হেলান দিয়ে খান (আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করে দিন), নিশ্চয়ই এটা আপনার জন্য অধিক সহজ। তখন তিনি তার মাথা নিচু করলেন এমনকি তা জমিনে ঠেকে যাওয়ার উপক্রম হলো। আর তিনি বললেন: না, বরং দাস যেভাবে আহার করে আমি সেভাবে আহার করব এবং গোলাম/দাস যেভাবে বসে আমি সেভাবেই বসব।”^{১৯০}

আবু জুহাইফাহ رض এর হাদীসে এসেছে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: لَا أَكُلُّ مُسْكِنًا
 “আমি হেলান দিয়ে খাবার খাই না।”^{১৯১}

৭. খাবার খেতে মন না চাইলে তার দোষ না ধরা: আবু হৱায়রা رض হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,
 مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ، إِنْ اشْتَهَاهُ أَكْلُهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ

“রসূলুল্লাহ ﷺ কখনো খাবারের দোষ ধরতেন না। ইচ্ছা হলে খেতেন, আর না হলে ছেড়ে দিতেন।”^{১৯২}

৮. প্লেটের একপাশে থেকে খাওয়া; মাঝখান থেকে খাওয়া মাকরহ:

ইবনু আবাস رض নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট একটি পাত্রে ছারীদ (গোশতের ঘোলমিশ্রিত রুটি) নিয়ে আসা হলো। তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

كُلُوا مِنْ جَوَانِيهَا، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسْطِهَا؛ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسْطِهَا

^{১৮৯} সহীহল বুখারী, হা. ৫৪১৫। -الخوان-যার উপর খাওয়া হয়। অর্থাৎ দণ্ডরখান, এটা মূরাব শব্দ। এই নামে নামকরণের কারণ হলো, যখন এর উপর খাওয়া হয় তখন একে বিছিয়ে দেওয়া হয়। -السفرة-এমন ছেটে পাত্র যার মধ্যে অল্প পরিমাণ তরকারি রেখে খাওয়া হয়। এটা ফারসি শব্দ।

^{১৯০} ইমাম বাগবতীর শারহস সুন্নাহতে ১১/২৮৬-২৮৭; ইমাম আহমাদ তার যুহদের ৫ ও ৬ পৃষ্ঠায়। শাইখ আরনাউত মুরসাল শাহেস থাকার কারণে এটাকে সহীহ বলেছেন, হশিয়া শারহস সুন্নাহ।

^{১৯১} আহমাদ ১/২৭০; তিরমিয়ী, হা. ১৮০৫ এবং তিনি হাসান সহীহ বলেছেন। সুন্নান আবু দাউদ, হা. ৩৭৭২; ইবনু মাজাহ, হা. ৩২৭৭; ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহ সুনানুবনু মাজাহ, হা. ২৬৫০।

^{১৯২} মুত্তাফাকুন আলাইহিঃ সহীহল বুখারী, হা. ৩৫৬৩, ৫৪০৯; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ২০৬৪।

“তোমার প্লেটের পাশ থেকে খাও! মাবখান থেকে খেয়ো না। কেননা প্লেটের মাবখানে
রবকত নেমে আসে।”^{১৯৩}

৯. তিন আঙুলে খাওয়া এবং খাওয়ার পর আঙুল চেঁটে খাওয়া: কা'ব বিন মালেক ছিল হতে
বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِثَلَاثٍ أَصَابِعَ، وَلَا يَمْسَحُ بَدْهَ حَتَّى يَلْعَقَهَا

“রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন আঙুলে খেতেন এবং আঙুল চেঁটে না খাওয়া
পর্যন্ত হাত মুছতেন না।”^{১৯৪}

১০. খাওয়ার সময় পড়ে যাওয়া ও বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়া খাবার উঠিয়ে খাওয়া: এ প্রসঙ্গে
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةٌ أَحَدِكُمْ فَلْيُمْطِعْ عَنْهَا الْأَذْيَ وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ

“যখন তোমাদের কারো খাবার লুকমা পড়ে যায়, তাহলে সে যেন এর ময়লা দূর করে খেয়ে
নেয়। শয়তানের জন্য যেন ছেড়ে না দেয়।”^{১৯৫}

১১. খাবারের পাত্র মুছে খাওয়া এবং চেঁটে খাওয়া:

এই প্রসঙ্গে পূর্বে উল্লিখিত আনাস ছিল এর বক্তব্য:

وَأَمْرَنَا أَنْ تَسْلُطَ الْفَضْعَةَ

“নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে খাবার পাত্র মুছে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।”

অন্য বর্ণনায় এসেছে:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّخْفَةِ، وَقَالَ: إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيْمَانِ الْبَرِّ كُلَّهُ

নাবী  আঙুলসমূহ ও প্লেট চেঁটে খেতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন: “তোমরা জানো না,
তোমাদের খাবারের কোন অংশে বরকত আছে।”^{১৯৬}

^{১৯৩} আহমদ ১/২৭০; তিরিমিয়ী, হা. ১৮০৫ এবং তিনি হাসান সহীহ বলেছেন; সুনান আবু দাউদ, হা. ৩৭৭২; ইবনু মাজাহ, হা. ৩২৭৭;
শাহীথ আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহ সুনানুবন্ন মাজাহ, হা. ২৬৫০

^{১৯৪} সহীহ মুসলিম, হা. ৫১৯১, ফুআ. ২০৩২।

^{১৯৫} সহীহ মুসলিম, হা. ৫২০১, ফুআ. ২০৩৪।

^{১৯৬} সহীহ মুসলিম, হা. ৫১৯৫, ফুআ. ২০৩৩।



الباب الثاني: أحكام الذبائح

د্বিতীয় অনুচ্ছেদ : পশু যবেহ সংক্রান্ত বিধিবিধান

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المسألة الأولى: معناها، وأنواع التذكية، وحكمها

প্রথম মাসআলা: যবেহ-এর অর্থ, শ্রেণিভেদ ও এর বিধান

১. যবেহ-এর সংজ্ঞা:

আভিধানিক অর্থ: **ذبحة** শব্দটি যবেহ এর বহুবচন। এটি জবাইকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

পরিভাষায়: ঐ প্রাণীকে বলে, যা শরীয়ত সম্মতভাবে যবেহ করা হয়।

তাকে হচ্ছে স্থলভাগের ভক্ষণযোগ্য অধীনস্থ প্রাণির কঠনালী ও খাদ্যনালী কর্তন করার মাধ্যমে যবেহ করা। আর ধরতে পারা যায় না এমন প্রাণীকে আযাত করার মাধ্যমে যবেহ বা নহর করা।

২. যবেহ-এর ধরনসমূহ: জবাই দ্বারা ঐ সকল প্রাণী উদ্দেশ্য, যেগুলো শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে যবেহ সম্পন্ন করা হয়েছে। যেসকল প্রাণী খাওয়া বৈধ সেগুলো জবাই করার বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। তা তিন প্রকার, যা পূর্বে উল্লিখিত যবেহ করার পদ্ধতিতেই সুস্পষ্ট।

প্রথম: **قُبْلَى** বা যবেহ: কয়েকটি শর্ত মেনে প্রাণির কঠনালী কর্তন করা।

দ্বিতীয়: **بَعْدَ النَّحْر**: প্রাণির গলা কর্তন করা। আর সেটি হচ্ছে ঘাড়ের নিচের অংশ। আর এটাই উট যবেহ করার সুন্নাতী পদ্ধতি। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَلَا حَنْجَر﴾

“তুমি তোমার রবের জন্য সলাত আদায় করো এবং কুরবানি করো।” [সূরা কাওসার : ২]

তৃতীয়: বা ক্ষত করা: অধীন নয় এমন প্রাণী বা চতুষ্পদ জন্মের কঠনালী ও গলা না কেটে শরীরের কোনো অংশে ক্ষত বা আঘাত করে মেরে ফেলা। রাফি^১ এর হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, একটি উট পালিয়ে গেল। অতঃপর একজন লোক উটটিকে লক্ষ্য করে একটি তীর ছুড়ে মেরে সেটিকে আটকে ফেলল। তখন নাবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন:

مَنْدَ عَلَيْكُمْ، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا

“তোমাদের কোনো প্রাণী পালিয়ে গেলে তার ক্ষেত্রে এমন পছা অবলম্বন করো।”^{১৯৭}

৩. **তৃতীয়** বা যবেহ-এর ছকুম: অধীনস্থ প্রাণী অবশ্যই যবেহ করতে হবে। উল্লিখিত কোনো প্রাণী যবেহ ছাড়া (খাওয়া) বৈধ নয়। এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই। আল্লাহ তায়ালার বাণী:

﴿ حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمِيَةُ ﴾

“মৃতপ্রাণীকে তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে।” [সূরা মায়দাহ : ৩]

আর যবেহ ছাড়া প্রাণী মৃত প্রাণির মতো হারাম। তবে মাছ, পঙ্গপাল ও পানিতে যেসব প্রাণী বসবাস করে সেগুলো যবেহ ছাড়াই বৈধ, যা খাদ্য সংক্রান্ত অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

المسألة الثانية: شروط صحة الذبح

দ্বিতীয় মাসআলা: যবেহ বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ

এ শর্তগুলো তিন ভাগে বিভক্ত:

- ক. জবাইকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তসমূহ।
- খ. জবাইকৃত পশুর সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তসমূহ।
- গ. জবাই করার অন্তর্বর্তী সংশ্লিষ্ট শর্তসমূহ।

প্রথমতঃ জবাইকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তসমূহ:

১. জবাইকারীর যোগ্যতা থাকা: জবাইকারী বুদ্ধিমান ও ভালো-মন্দ পার্থক্য করার মতো ক্ষমতা সম্পন্ন হতে হবে। সে পুরুষ অথবা মহিলা হোক, মুসলিম বা আহলে কিতাব হোক। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

^{১৯৭} মুস্তফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৩০৭৫, ৫৫০৯; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৯৬৮।

إِلَّا مَا ذُكِّرَشْ “তোমরা যা যবাই করেছ তা ব্যতীত।” [সূরা মায়িদাহ : ৩]

এই আয়াত একজন মুসলিমের যবেহ সংক্রান্ত। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌ لَّكُمْ

“যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল।” [সূরা মায়িদাহ : ৫]

ইবনু আবুস বলেন: এখানে “তাদের খাদ্য” দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে “তাদের যবেহ করা খাদ্যসমূহ”।^{১৯৮} পক্ষান্তরে আহলে কিতাব ব্যতীত অন্যান্য কাফের, পাগল, মাতাল ও ভালো-মন্দ পার্থক্য করতে পারে না এমন শিশুর যবেহ বৈধ হবে না।

২. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে বা অন্য কারো নামে জবাই করবে না: যদি কোনো মৃতি, কোনো মুসলিম বা কোনো নাবীর নামে যবেহ করে, তাহলে বৈধ হবে না। আল্লাহ তা'আলা হারাম খাবারের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন:

وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِعِبَادَةٍ “আর যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে উৎসর্গ করা হয়েছে।”

[সূরা মায়িদাহ : ৩]

সুতরাং জবাইকারীর মধ্যে যদি এ দুটি শর্ত পাওয়া যায়, তাহলে তার যবেহ করা পণ্ড হালাল। এ ক্ষেত্রে জবাইকারী পুরুষ, নারী, বড়ো, ছোটো, স্বাধীন বা দাসের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

দ্বিতীয়ত: জবাইকৃত প্রাণির সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তসমূহ:

১. প্রাণির কষ্টনালী, খাদ্যনালী ও কষ্টনালী বেষ্টনকারী দুটি রং কাটতে হবে। রাফে ইবনে খাদিজ হতে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

أَنْهِرِ الدَّمَ، وَذُكِّرِ اسْمُ اللَّهِ، فَكُلْ، لَيْسَ السُّنَّ، وَالظُّفَرُ

“যার রক্ত প্রবাহিত করা হয়েছে ও বলে যবেহ করার সময় ‘বিসমিল্লাহ’ বলা হয়েছে, তা খাও! তবে দাঁত বা নখ দ্বারা জবাইকৃত পণ্ড খাবে না।”^{১৯৯}

জবাই-এর ক্ষেত্রে রক্ত প্রবাহিত হওয়া এবং প্রাণির উল্লিখিত অঙ্গ কর্তন করাকে শর্ত করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন দ্রুত রক্ত প্রবাহ হয় ও রুহ সহজে বেরিয়ে যায়। এতে গোশত অধিক সুস্থাদু হয় এবং প্রাণির জন্য হালকা ও সহজ হয়। কোনো প্রাণী যদি শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার কারণে অথবা অধিক প্রহার, উপর থেকে পড়ে যাওয়া, অন্য প্রাণির শিং এর আঘাতে মৃত্যুর উপক্রম হয় বা হিংস্র জন্ম থেকে ফেলে, অনুরূপভাবে অসুস্থ প্রাণী, যে

^{১৯৮} ফাতহল বারী ৯/৫৫২-৫৫৩।

^{১৯৯} মুতাফাকুন আলাইহি: সহীহ বুখারী, ঘ. ৫৫০৩; সহীহ মুসলিম, ঘ. ফুআ. ১৯৬৮।

প্রাণী ফাঁদে পড়েছে বা যে প্রাণীকে মৃত্যু থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, এসকল প্রাণীকে যদি জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায়, যেমন হাত-পা নড়েছে বা চোখের পলক পড়েছে, তাহলে জবাই করলে সে প্রাণী খাওয়া হালাল। আল্লাহ তায়ালা বাণী:

مَلَّا إِنْتَمْ “তোমরা যা জবাই করেছ তা ব্যতীত।” [সূরা মাযিদাহ : ৩]

অর্থাৎ যা জবাই করেছ তা হারাম নয়।

উপরিউক্ত অবস্থায় যদি কোনো প্রাণী জবাই করা সম্ভব না হয়; যেমন শিকার, বন্য প্রাণী, কৃপে পড়ে যাওয়া প্রাণী ইত্যাদি। তার শরীরের যেকোনো অংশে আঘাত করলেই তা জবাই হয়ে যাবে। পালিয়ে যাওয়া উট সম্পর্কে পূর্বে উল্লিখিত রাফে ইবনে খাদিজের رض হাদীস এসেছে, তিনি বলেন, একটি উট পালিয়ে গেল। অতঃপর একজন লোক উটটিকে লক্ষ্য করে একটি তীর ছুঁড়ে মেরে সেটিকে আটকে ফেলল। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন:

مَا نَدَّ عَلَيْكُمْ، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا

“তোমাদের কোনো প্রাণী পালিয়ে গেলে তার সাথে এমন পছা অবলম্বন করো।”^{১০০০}

২. জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম নেওয়া। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

“আর (যে প্রাণী জবাইয়ের সময়) আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি, তা তোমরা খেয়ো না। আর নিশ্চয়ই তা পাপ।” [সূরা আনআম : ১২১]

আর ‘বিসমিল্লাহ’ বলার সাথে ‘আল্লাহ আকবার’ বলা সুন্নাহ। নাবী ص হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি কুরবানির পশ্চ যবাইয়ের সময় ‘বিসমিল্লাহ’ ও ‘আল্লাহ আকবার’ বলেছেন।^{১০১} অন্য বর্ণায় এসেছে: “তিনি যবেহ করার সময় বলতেন: বিসমিল্লাহি ও আল্লাহ আকবার।”^{১০২}

তৃতীয়: যবাই করার অন্ত্র সংক্রান্ত শর্তসমূহ:

যে অন্ত্র দ্বারা যবেহ করা হবে, তা যেন ধারালো হয়। চাই সেটি লোহা বা তামা বা পাথরের বা অনুরূপ যে কোনো অন্ত্র হোক, যা দিয়ে কঠিনালী কাটা যায় ও রক্ত প্রবাহিত করা যায়। তবে দাঁত ও নখ ব্যতীত। রাফে ইবনে খাদিজ رض হতে বর্ণিত হাদীস তিনি বলেন, নাবী ص বলেছেন:

مَا أَنْبَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ، وَالظُّفرُ

^{১০০০} মুগ্ধামাকুন আলাইহি: সহীলু বুখারী, হা. ৩০৭৫, ৫৫০৯; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৯৬৮।

^{১০১} সহীহ মুসলিম, হা. ৪৯৮১, ফুআ. ১৯৬৬।

^{১০২} সহীহ মুসলিম, হা. ৪৯৮৪, ফুআ. ১৯৬৬-(১৮)।

“যার রক্ত প্রবাহিত করা হয়েছে ও যবেহ করার সময় ‘বিসমিল্লাহ’ বলা হয়েছে, তা খাও! তবে দাঁত বা নখ দ্বারা জবাইকৃত পশ্চ খাবে না।”^{১০০৩}

সব ধরনের হাড় দ্বারা যবেহ করা দাঁত ও নখ দ্বারা ক্ষত করে যবেহ করা নিষিদ্ধ হ্রকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। সেটা মানুষ বা অন্য কিছুর হাড় দিয়ে হোক না কেন।

এই নিষেধের কারণ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ হাদীসের পূর্ণাঙ্গ অংশ

وَسَأَحْذِنُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَا السُّنْنُ فَعَظِيمٌ، وَأَمَا الطُّفْرُ فَمُدَى الْجَبَشَةِ

“আমি তোমাদেরকে এর কারণ বর্ণনা করছি: দাঁত হাজ্বির মতো এবং নখ হাবশীদের ছুরি।”^{১০০৪}

অর্থাৎ ক্ষেত্রে জাতীয় এক প্রকার অস্ত্র, যা দিয়ে কোনো প্রাণী যবেহ করলে স্থলিত বেগে রক্ত বের হয় না। ফলে এটি খাওয়া হারাম।-সম্পাদক।

আর হাজ্বি দ্বারা যবাই করা নিষেধের কারণ হচ্ছে, তা রক্তের দ্বারা আপবিত্র হয়ে যায়। আর নাবী ﷺ হাজ্বি অপবিত্র করতে নিষেধ করেছেন; কারণ তা আমাদের ভাই জীনদের খাবার।

আর কাফেরদের সাথে সাদৃশ্য হওয়ার কারণে নখ দ্বারা যবাই করতে নিষেধ করা হয়েছে।

المسألة الثالثة: آداب الذبح

তৃতীয় মাসআলা: যবেহ-এর আদব বা নিয়মসমূহ

যবেহ করার কিছু আদব বা নিয়ম আছে, যেগুলো যবেহকারীর জন্য মেনে চলা উচিত। আর সেগুলো হলো:

১. যবেহকারী তার ছুরি ধারালো করে নিবে: শাদাদ ইবনু আউস رض এর হাদীস। নিচয়ই আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِخْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَخْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَخْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفَرَةً، فَلْيُرِخْ ذَبِيْحَتَهُ .

“নিচয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে ইহসান তথা দয়া অত্যাবশ্যক করে দিয়েছেন। অতএব, যখন তোমরা হত্যা করবে উত্তমভাবে হত্যা কর। আর যখন যবেহ করবে উত্তম ভাবে যবেহ করবে। আর তোমাদের কেউ যেন ছুরি ধারালো করে নেয় এবং যবেহকৃত পশ্চকে স্বত্তি দেয়।”^{১০০৫}

^{১০০৩} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৫৫০৩; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৯৬৮।

^{১০০৪} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ২৪৮৮; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৯৬৮।

^{১০০৫} সহীহ মুসলিম, হা. ৪৯৪৯, ফুআ. ১৯৫৫।

২. প্রাণীকে বাম কাত করে শোয়াবে , ডান পা ছেড়ে দিবে, যাতে যবেহ করার পর তা নড়াচড়া করে স্বত্তি লাভ করতে পারে। যা একটু আগে শান্দাদ ইবনে আউসের رض হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। আবুল খায়ের رض এর হাদীসে এসেছে: আনসারগণের رض একজন ব্যক্তি তার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেন:

أَنَّهُ أَضْجَعَ أَضْحِيَتْهُ لَيْذَبْحُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ: أَعْنِي عَلَى أَضْحِيَتِي. فَأَعْنَاهُ.

“আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানির পশ যবেহ করার জন্য শোয়ালেন এবং লোকটিকে বললেন: “তুমি আমাকে আমার কুরবানি করতে সহায়তা করো! অতঃপর লোকটি তাঁকে ﷺ সহায়তা করল।”¹⁰⁰⁶

৩. উট বাম হাটু বেধে দাঁড়ানো অবস্থায় নহর করতে হবে: আর নহর হলো- ধারালো অন্ত দ্বারা গলায় আঘাত করা। আর তা ঘাড় ও বুকের মাঝামাঝি জায়গায়। আল্লাহ তায়ালার বাণী:

فَإِذْ كُرُوا أَنْسَمْ اللَّهُ عَلَيْهَا صَوَافِقٌ

“পায়ের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় সেগুলোর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো।” [সূরা হাজ্জ: ৩৬]

আর অর্থ তিন পায়ের উপর দাঁড়ানো অবস্থায় উট নহর করা।¹⁰⁰⁷

ইবনু উমার رض একজন লোকের পাশ দিয়ে গমন করলেন এবং দেখতে পেলেন একজন লোক নহর করার জন্য তার উটটিকে বসিয়ে দিয়েছে। তিনি লোকটিকে বললেন,

ابْعَثُهَا قِيَامًا مُقْبَدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“তাকে (নহর করতে গিয়ে) ওঠিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় বেঁধে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত অনুসরণ করে নহর করো!”¹⁰⁰⁸

৪. উট ছাড়া বাকি সকল প্রাণী যবেহ করতে হবে: এ মর্মে আল্লাহ তায়ালার বাণী:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقْرَةً

“নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে গাভী যবেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন।” [সূরা বাক্সারাহ: ৬৭]

আনাস বিন মালিক رض এর হাদীসে এসেছে:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَضْجَعَ الْكَبْشَيْنِ اللَّذِينِ ضَحَى بِهِ

“নিশ্চয়ই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দুটি মেষ কুরবানি করেছিলেন তা জবাই করেছিলেন।”¹⁰⁰⁹

¹⁰⁰⁶

¹⁰⁰⁷ যাদুল মুয়াসসাৱ ৫/৪৩২

¹⁰⁰⁸ মুতাফাকুন আপাইহি: সহীহ বুখারী, হা. ১৭১৩; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৩২০।

المسألة الرابعة: مكرهات الذبح

চতুর্থ মাসআলা: যবেহ-এর মাকরাহ বিষয়সমূহ

১. ভেঁতা অন্তর দ্বারা যবেহ করা মাকরাহ: এটা এ কারণে যে, এতে প্রাণির কষ্ট হয়। শান্দাদ ইবনে আউসের র হাদিসে পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। আর তাতে রয়েছে-

وَلِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفَرَتَهُ، فَلَمْ يُرِخْ ذَيْبَحَتَهُ.

“আর তোমাদেও কেউ যেন ছুরি ধারালো করে নেয় এবং যবেহকত জন্মকে স্বষ্টি দেয়।”^{১০১০}

ইবনু উমার  এর হাদীসে এসেছে-

أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَحْمِدَ الشَّفَاعَةِ، وَأَنْ تُوَارِي عَنِ الْبَهَائِمِ.

“ଆଲାହର ରସୂଲ ସାନ୍ନାଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ନାମ ଛୁରିଣ୍ଗଲୋ ଧାରାଲୋ କରାର ଆଦେଶ ଦିଯେଛେନ ଏବଂ ତା ପ୍ରାଣୀସମୃଦ୍ଧି ଆଡ଼ାଲେ କରତେ ବଲେଛେନ ।”¹⁰¹¹

২. প্রণীর ঘাড় মটকে দেওয়া ও রাহ বেরিয়ে যাওয়ার পূর্বেই চামড়া ছাড়ানো মাকরাহ: শান্তিদাহ ইবনে আউসের  হাদীস। রসুলুল্লাহ  বলেন:

وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَخْسِنُوا الظَّبْعَ

“ଆର ଯখନ ତୋମରା ଯବେହ କରବେ, ତଥନ ଉତ୍ତମରୂପେ ଯବେହ କରୋ ।” ୧୦୧

وَلَا تَعْجِلُوا إِلَيْنَا أَنفُسَكُمْ أَنْ تُنْزَهُوْنَ, বলেন,

“ପ୍ରାଣିର କୁହ ବେଳିଯେ ଯାଓଯାଇ ଆଗେ (ଚାମଡ଼ା ଛାଡ଼ାନୋର ବ୍ୟାପାରେ) ତାଡ଼ାହଡୋ କରୋ ନା ।” ୧୦୧୩

৩. প্রাণী দেখছে এমতাবস্থায় তার সামনে ছুরি ধারালো করা মাকরহ: পূর্বে উল্লিখিত ইবনু উমার
এর হাদিসে এসেছে। “যেন প্রাণির আড়ালে করা হয়।”^{১০১৪}

^{১০০} মুক্তাফাকুন আলাইহি: সহীল বুখারী, হা. ৫৫৫৪; সহীল মসলিম, হা. ফুআ. ১৯৬৬।

୧୦୧୦ ସତ୍ୟିହ ମସଲିମ, ଡା. ୪୯୪୯, ଫର୍ମା- ୧୯୫୫ ।

^{১০১১} আহমদ ২/১০৮; ইবনু মাজাহ, হা. ৩১৭২; শাইখ আলবানী যঙ্গেক বলেছেন, যঙ্গেক সুনানুবন্ধ মাজাহ, হা. ৬৮১; তবে এর সাক্ষ্য হানীস রয়েছে।

२०१२ सतीश असलिय, डा. ४५४९, फुआ, २५५५।

^{१०१४} बायप्राक्टी २/२७८; शाईथ आलबानी वर्गेन, एटि सानाद उद्घमात्वावे वर्णित हयोच इवंग्याउल गालीन ८/२७६

^{১০৪} আইডাম ২/১০৮; ইবনু মাজাহ, হা. ৩১৭২; শাইখ আলবানী যঙ্গিফ বলেছেন, যঙ্গিফ সুনানুবন্ধ মাজাহ, হা. ৬৮১; তবে এর সাক্ষ্য দালিস রয়েছে।

المسألة الخامسة: حكم ذبائح أهل الكتاب

পঞ্চম মাসআলা: আহলে কিতাবদের যবেহকৃত পশুর বিধান

আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদী ও নাসারাদের যবেহকৃত জন্ত খাওয়া বৈধ। আল্লাহ তা'আলার বানী:

﴿وَعَامِرُ الْذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّهُمْ﴾

“যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের খাবার তোমাদের জন্য হালাল।” [সূরা মায়দাহ : ৫]

অর্থাৎ হে মুসলিমগণ, আহলে কিতাব তথা ইহুদি ও নাসারাদের যবেহকৃত জন্ত খাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ। ইবনু আরাম رض বলেছেন: এখাচে طعامهم বা খাদ্য দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে بـ বা তাদের যবেহ।^{১০১৫}

সুতরাং আহলে কিতাব তথা ইহুদি ও নাসারাদের যবেহকৃত জন্ত মুসলিমগণের ঐকমত্যে বৈধ। কারণ তারা বিশ্বাস করে- আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে যবেহকৃত প্রাণী এবং মৃত প্রাণী খাওয়া হ্যারাম। তাদের এ বিশ্বাস অন্যান্য মুর্তিপূজারী, বে-ঈন, মুরতাদ ও অগ্নিপূজারী কাফেরদের বিপরীত। কাজেই এসব কাফেরদের যবেহকৃত প্রাণী বৈধ নয়। অনুরপভাবে বড়ো শিরুক্করারীদের যবেহ- যেমন কবর পূজারী ও মাজার পূজারী ও অন্যদের যবেহকৃত প্রাণিও বৈধ নয়।



الباب الثالث : أحكام الصيد তৃতীয় অনুচ্ছেদ: শিকারের বিধিবিধান

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المسألة الأولى: في تعريف الصيد، وحكمه، ودليل مشروعيته

প্রথম মাসআলা: শিকারের পরিচয়, হকুম ও শরীয়ত সম্বত হওয়ার দلলীল

১. শিকারের পরিচয়: চিদ বা শিকার শব্দটি صيد، يصيده، صيد। ক্রিয়ামূল হতে গৃহীত।
অর্থ: গোপনে ও কৌশলে পাকড়াও করা। তাই সেটি ভক্ষণযোগ্য হোক বা ভক্ষণযোগ্য না
হোক। আর চিদ শব্দটি ক্রিয়া বিশেষ নামে কর্মবাচক বিশেষ অর্থে শিকারকৃত পশুকে
বুঝাবে। তাই শিকারকৃত পশুকে চিদ বা শিকার বলা হয়।

পরিভাষায়: হালাল, স্বভাবগতভাবে বন্য, কারো মালিকানাধীন নয় ও নিয়ন্ত্রণহীন প্রাণী শিকার
করা।

আর বন্যপ্রাণী হলো: গৃহপালিত স্থলজ প্রাণী নয় এমন সব প্রাণীই বন্য প্রাণী।

২. শিকার করার শারঙ্গ হকুম:

শিকার শরীয়ত সম্বত ও বৈধ। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿أَجْلَتْ لَكُمْ بِهِمْ أَلْأَنْعَمْ إِلَّا مَا يُنْهَى عَلَيْكُمْ عَبْرَ مَحِيلِ الْصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾

“তোমাদের জন্য গৃহপালিত চতুর্পদ জন্তু হালাল করা হলো- সেগুলো ছাড়া, যেগুলোর বিবরণ
তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। আর ইহরাম অবস্থায় শিকার করা অবৈধ।” [সূরা মায়দাহ : ১]

আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَإِذَا حَلَّتْ قَاضِطَانُهُ﴾

“আর যখন তোমরা ইহরাম থেকে হালাল হবে তখন শিকার করতে পারো।” (সূরা মায়িদাহ : ২)

আদী ইবনে হাতিম رض হতে বর্ণিত। নাবী ص বলেন:

﴿إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ الْعَلَمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ﴾

“যখন তুমি তোমার প্রশিক্ষিত কুকুর প্রেরণ করবে এবং ‘বিসমিল্লাহ’ বলবে, তাহলে তখন খাও!”^{১০১৬}

মানুষের যদি শিকার করার প্রয়োজন হয়, তাহলে এই হ্রকুম। আর যদি শুধুমাত্র খেল-তামাশার জন্য শিকার হয়, তাহলে সেটা নিন্দনীয়। কারণ তা অনর্থক কাজ এবং আল্লাহর রসূল ﷺ পশু-পাখিকে তীর নিক্ষেপের লক্ষ্যবস্তু বানাতে নিষেধ করেছেন।^{১০১৭}

المسألة الثانية: الصيد المباح وغير المباح দ্বিতীয় মাসআলা: বৈধ ও অবৈধ শিকার

জলজ ও স্থলজ, সকল প্রকারের প্রাণী শিকার করা বৈধ, তবে কিছু ক্ষেত্র ব্যতীত:

প্রথম অবস্থা: হারাম এলাকায় শিকার করা মুহরিম (হাজ ও উমরাকারী) ও অন্যান্যদের জন্য সকলের ঐকমত্যে হারাম। নাবী ص মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন:

إنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ... لَا يَعْصُدُ شَوْكَهُ، وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهُ

“নিশ্চয় আল্লাহ যেদিন থেকে আসমান জমিন সৃষ্টির করেছেন, সেদিন থেকে এ শহরকে আল্লাহ হারাম (সম্মানি) করেছেন...এর কাঁটা কাটা যাবে না, এতে বিচরণকারী শিকারকে তাড়া করা যাবে না।”^{১০১৮}

হাফেয ইবনে হাজার বলেন: বলা হয়, এর দ্বারা শিকার করাকে বোঝানো হয়েছে। আলেমগণ বলেন: ‘শিকার তাড়া করা নিষেধ’ এ কথা দ্বারা বোঝা যায় যে, শিকার হত্যা করা হারাম হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত।^{১০১৯}

^{১০১৬} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৫৪৮৩; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৯২৯।

^{১০১৭} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৫১১৩; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৯৫৬।

^{১০১৮} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৩১৮৯; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৩৫৩।

^{১০১৯} ফাতেহস বারী ৪/৫৫-৫৬।

○ ﴿ أَتَيْوْدَشُ الْحِكْمَةَ ○ أَتَيْوْدَشُ الْحِكْمَةَ ○ ٦٣٧ ○ أَتَيْوْدَشُ الْحِكْمَةَ ○

তৃতীয় অবস্থা: মুহরিমের উপর স্থলভাগের কোনো কিছু শিকার করা, শিকার করতে চাওয়া অথবা ইশারা-ইঙ্গিত দিয়ে কাউকে শিকার করতে সাহায্য করা হারাম। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾

“হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা মুহরিম অবস্থায় শিকারকে হত্যা করো না।” [সূরা মায়দাহ : ৯৫]

অনুরূপভাবে সে যা শিকার করেছে অথবা তার উদ্দেশ্যে যা শিকার করা হয়েছে অথবা সে যা শিকার করতে সহযোগিতা করেছে, সবকিছু খাওয়া তার উপর হারাম। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿ وَحُرُمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾

“যতক্ষণ তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাকবে ততক্ষণ তোমাদের জন্য স্থলের শিকার হারাম।”

[সূরা মায়দাহ : ৯৬]

আর সাঁ’ব ইবনে জাসসামাহ رض বন্য গাঁধা নাবী رض কে হাদীয়া দিলে তিনি তা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন: إِنَّمَا مُنْتَزِهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنْتَ حُرُمٌ

“আমরা ইহরাম অবস্থায় না থাকলে তোমার হাদীয়া ফিরিয়ে দিতাম না।”^{১০২০} অর্থাৎ আমরা ইহরাম অবস্থায় আছি বলে ফিরিয়ে দিলাম।

المسألة الثالثة: شروط إباحة الصيد

তৃতীয় মাসআলা: শিকার বৈধ হওয়ার শর্তসমূহ

শিকার হালাল ও বৈধ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। তা শিকারী ও শিকারের অন্ত্রে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

প্রথমতঃ শিকারীর জন্য শর্তসমূহ:

যে শিকারীর শিকার ভক্ষণ করা বৈধ হবে, তার ক্ষেত্রে সেটাই শর্ত যা যবেহকারীর জন্য শর্ত। যেমন মুসলিম হওয়া অথবা আহলে কিতাব হওয়া ও ভালো-মন্দ বুৰো। অতএব পাগল, মাতাল এবং শিকার করতে অযোগ্য ব্যক্তির শিকার খাওয়া বৈধ হবে না। অনুরূপভাবে মুর্তিপূজারী, অগ্নিপূজক বা মুরতাদ যা শিকার করবে সেটাও খাওয়া বৈধ হবে না। আর মাছ বা পঙ্গপালের মতো প্রাণী, যা যবেহ এর প্রয়োজন হয় না, তা যদি এমন কেউ শিকার করে যার যবেহকৃত জন্তু খাওয়া বৈধ নয়, তবুও তার শিকার বৈধ হবে।

^{১০২০} سہیل بن عکبر، ح. ১৮২৫।

শিকারের জন্য আরেকটি শর্ত: শিকারীর অবশ্যই শিকার করার নিয়ত থাকতে হবে। কারণ অন্ত নিষ্কেপ করা ও প্রশিক্ষিত প্রাণী প্রেরণ করা যবেহ করার ন্যায়। সুতরাং এক্ষেত্রে নিয়ত করা শর্ত।

দ্বিতীয়তঃ শিকারের অন্তর শর্তসমূহ:

অন্ত দুই প্রকার:

১. এমন অন্ত দিয়ে আঘাত করা যার ধার আছে: যেমন তরবারী, ছুরি, তীর। এক্ষেত্রে যবেহ করার অন্ত্রের বেলায় যে শর্ত প্রযোজ্য, এই শিকার করার অন্তগুলোর ক্ষেত্রেও একই শর্ত প্রযোজ্য। আর তা হলো: রক্ত প্রবাহিত করা, দাঁত ও নখ দ্বারা না হওয়া, শিকারকে অন্ত্রের ভারী অংশ দিয়ে নয়; বরং ধারালো অংশ দ্বারা আঘাত করা। রাফে ইবনে খাদীজ رض হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، فَكُلُوهُ

“যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং যবেহ-এর সময় ‘বিসমিল্লাহ’ বলা হয়, তা খাও।”^{১০২১}

আল্লাহর রসূল ﷺ কে তীরের ফণ দ্বারা শিকার করা জন্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন:

مَا خَرَقَ فَكُلْ، وَمَا أَصَابَ بِعَزْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ

“তীরের ধারালো অংশ দ্বারা যেটি নিহত হয়েছে তা খাও। আর বাটের আঘাতে যেটি নিহত হয়েছে, তা খেও না।”^{১০২২} -

عِرَاضٌ | বা বাটের অন্তর্ভুক্ত: পাথর, লাঠি, ফাঁদ, লোহার টুকরা ও অনুরূপ ধারবিহীন অন্ত। তবে বর্তমানে বন্দুকের যে গুলি ব্যবহৃত হয় তা ভিন্ন। এরূপ বন্দুক দিয়ে শিকার করা বৈধ। কারণ, বন্দুকের গুলির একটা শক্তি আছে, যার তীব্র আঘাত প্রাণীকে ছিন্ন করে এবং রক্ত প্রবাহিত করে।

২. শিকারী পশু বা শিকারী পাখি হওয়া: যে চতুর্পদ প্রাণী দাঁত দিয়ে এবং যে পাখি নখ দিয়ে শিকার করে, সেসব প্রাণী দিয়ে শিকার করানো বৈধ। আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

فَوَمَا عَلِمْتُمْ مِنَ الْجِنَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعْلَمُونَهُنَّ مِنَ الْعَالَمِكُمْ أَلَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَأَذْكُرُوا أَسْمَهُ أَلَّهُ عَلَيْهِمْ

^{১০২১} মুওফাকুন আলাইহি: সহীল বুখারী, হা. ৫৫০৩; সহীহ মুসলিম, হা. ১৯৬৮।

^{১০২২} মুওফাকুন আলাইহি: সহীল বুখারী, হা. ৫১৬৮; সহীহ মুসলিম, হা. ১৯২৯।

عِرَاضٌ | এমন তীর যার পালক ও ফলা নেই, সীমানা ছাড়াই আঘাত করে।

○ ﴿ অযোদশ অধ্যায় : পানাহার করা, পশু যবেহ ও শিকার করা ﴾ ○ ৬৩৯

“আর শিকারী পশু-পাখি যাদেরকে তোমরা শিক্ষা দিয়েছ, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং তার তোমাদের জন্য যা ধরে আনে তা তোমরা ভক্ষণ করো আর তাতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো।” [সূরা মায়দাহ : ৪]

سباع الْبَاهِمَ سَبَعَ الْجَنَّاتِ الْمُدَحَّرَاتِ كُوْكُুৰُ وَبَاقِيَ الْبَاهِمَ

শিকারী পাখির উদাহরণ: চিল, ঈগল, ও বাজপাখি।

শিকারী প্রাণী ও পাখি দ্বারা শিকারের শর্তসমূহ:

শিকারী পশু-পাখি দ্বারা শিকার করার শর্ত হলো- প্রশিক্ষিত হতে হবে। অর্থাৎ, তাকে শিকার ধরার নিয়ম কানুন শিক্ষা দিতে হবে। আর প্রশিক্ষিত পশু-পাখিতে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে:

১. যে প্রাণীকে শিকারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হবে, সে তা-ই টার্গেট করবে; অন্যকোনো প্রাণী টার্গেট করবে না।

২. ধরক দিলে ভয় পাবে এবং মালিক থামতে বললে থেমে যাবে। এ দুটি শর্ত বিশেষ করে কুকুরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ চিতাবাঘ কখনো ডাকে সাড়া নাও দিতে পারে, যদিও তা প্রশিক্ষিত হয়। আর অনুরূপভাবে পাখির প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় লক্ষ্য করা হবে; তাকে ছেড়ে দিলে উড়ে যাবে এবং ডাক দিলে ফিরে আসবে।

৩. শিকার করা জন্ত মালিকের কাছে নিয়ে আসার আগে তা থেকে থাবে না। এই শর্তগুলোর ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿قُلْ أَجِلْ لَكُمُ الظِّبَابُ وَمَا عَلِمْتُمْ مِنْ أَجْوَارِ مُكْلِبِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلِمْتُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَخْتُ عَلَيْكُمْ﴾

“বলুন! তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করা হয়েছে আর শিকারী পশু-পাখি যাদেরকে তোমরা শিক্ষা দিয়েছ যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং তারা যা তোমাদের জন্য ধরে রাখে তা তোমরা ভক্ষণ কর।” [সূরা মায়দাহ : ৪]

আদী ইবনে হাতিম رض নাবী ص থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ص বলেছেন:

إِذَا أَرْسَلْتَ النَّكَلَبَ الْمُعْلَمَ وَسَمِّيَتْ فَأَمْسَكَ وَقْتَلَ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ

“যখন তুমি প্রশিক্ষিত কুকুর শিকারের জন্য পাঠাও এবং আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো, অতঃপর সে হত্যা করে আটকে রাখে, তাহলে তা থাও। আর যদি তা থেকে থায় (প্রাণী), তাহলে খেয়ো না। কেননা তা সে নিজের জন্যই শিকার করেছে।”^{১০২৩}

শিকার নিষ্কেপের সময় ‘বিসমিল্লাহ’ বলা:

শিকার করার আরেকটি শর্ত হলো: তীর নিষ্কেপ বা প্রশিক্ষিত পশুপাখি প্রেরণের সময় ‘বিসমিল্লাহ’ বলা। আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْنَكُمْ وَذَكِّرُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾

“সুতরাং তোমাদের জন্য যা আটকে রাখে তা খাও এবং তাতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো।”

[সুরা মায়দাহ : ৪]

আদী ইবনে হাতীম رض হতে মারফু হাদীস।

إِذَا أَزْسَلْتَ كَلْبَكَ فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ... وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ، فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

“যখন তুমি (শিকারের জন্য) কুকুর প্রেরণ করবে তখন আল্লাহ নাম উচ্চারণ করো...আর যদি তীর নিষ্কেপ করো, তাহলে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো।”^{১০২৪} অন্য শব্দে এসেছে:

إِذَا أَزْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ

“যখন তুমি তোমার প্রশিক্ষিত কুকুর প্রেরণ করবে এবং ‘বিসমিল্লাহ’ বলবে, তাহলে তখন খাও!”^{১০২৫}

তবে যদি ভুলে ‘বিসমিল্লাহ’ ছেড়ে দেয়, তবুও তা খাওয়া বৈধ। আল্লাহই অধিক ভালো জানেন।

শিকার জীবন্ত পেলে বিধান: শিকারী যদি শিকারকে জীবন্ত অবস্থায় পায়, তাহলে তা যবেহ করা ওয়াজিব। যবেহ ছাড়া হালাল হবে না। আর যদি জীবন্ত অবস্থায় না পায়, তাহলে জবাই ছাড়াই খাওয়া বৈধ হবে।

^{১০২৪} সহীহ মুসলিম, হা. ৪৮৭৫, ফুআ. ১৯২৯-৬।

^{১০২৫} সহীহ বুখারী, হা. ৫৪৮৪।



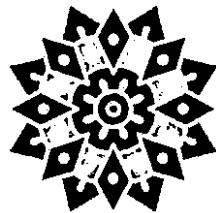
চতুর্দশ অধ্যায়
বিচার-ফয়সালা ও
সাক্ষ্য প্রদান

○ كتاب الأطعمة، والذبائح، والصيام ○

এতে ০২টি অনুচ্ছেদ রয়েছে

প্রথম অনুচ্ছেদ: বিচার-ফয়সালা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: সাক্ষ্য প্রদান



الباب الأول: في القضاء প্রথম অনুচ্ছেদ: বিচার-ফয়সালা

المُسَأْلَةُ الْأُولَى: فِي تَعْرِيفِ الْقَضَاءِ، وَحُكْمِهِ، وَأَدْلَةِ مَشْرُوعِيهِ

প্রথম মাসতালা: বিচার-ফয়সালার পরিচয়, বিধান ও শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল

১. পরিচয়: شাস্তি পরিচয়: **القضاء** বা **বিচার**, **الحكم** বা **রায়**। কোনো কিছুকে দৃঢ় করা ও সে ব্যাপারে নিষ্পত্তি ঘটানো। **قضى** বলা হয় যখন বিচার করা হয় এবং **সিদ্ধান্ত** বা **রায়** দেওয়া হয়।

في الاصطلاح: تبين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات، وقطع المنازعات
পারিভাষিক অর্থ: শরীয়তের হকুম স্পষ্ট করা ও আবশ্যিক করে দেওয়া এবং বগড়াবিবাদ নিষ্পত্তি ও মীমাংসা করা।

ফয়সালাকে (**القضاء**) হকুম নামকরণ করা হয়েছে। কারণ তার মাধ্যমে জুলুম থেকে বাধা প্রদান করা হয়। এটি **الحكمة** বা আল-হিকমাহ শব্দ থেকে গৃহীত যা লোনো জিনিসকে তার উপরুক্ত স্থানে রাখা আবশ্যিক করে।

২. বিচার-ফয়সালার হকুম ও হিকমাহ: এটা ফরযে কিফায়াহ। যদি যথেষ্ট পরিমাণ ব্যক্তি এর তত্ত্বাবধান করে তাহলে বাকিরা গুনাহমুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি সকল সৎ ব্যক্তি এ থেকে বিরত থাকে তাহলে সবাই গুনাহগার হবে। কেননা বিচার-ফয়সালা ছাড়া মানব সমাজের বিষয়াদি ঠিক থাকবে না। বিচার-ফয়সালা করা বড়ো নৈকট্যের কাজ। কারণ এর মাধ্যমে নির্যাতিতদের

সাহায্য করা, হন্দ প্রতিষ্ঠা, অধিকারীকে তার অধিকার প্রদান করা, মানুষের মাঝে সংশোধন করা
এবং ঝগড়া বিবাদ মীমাংসা করা হয়; যাতে নিরাপত্তার পথ সুগম হয় এবং অনিষ্টতা কমে যায়।

এ জন্যই ইমামের (শাসক) উপর আবশ্যক হলো, প্রয়োজন ও জনস্বার্থ অনুযায়ী বিচারক নিয়োগ
দেওয়া, যাতে হক নষ্ট না হয় ও অত্যাচার ছড়িয়ে না পড়ে। যে যোগ্য ব্যক্তি এ কাজে প্রবেশ
করবে এবং তা বাস্তবায়ন করবে, তার জন্য রয়েছে বিরাট ফয়লত। পক্ষান্তরে কোনো অযোগ্য
ব্যক্তি যদি তাতে প্রবেশ করে তার হক আদায় না করে তাবে তার জন্য রয়েছে বিরাট পাপ।

৩. বিচার-ফয়সালা শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল: তার দলীল হচ্ছে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা।

কুরআন থেকে বিচার-ফয়সালা শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿يَا دَوْدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِيقَةِ﴾

“হে দাউদ! নিশ্চয় আমরা তোমাকে জমিনে খলীফা বানিয়েছি। অতএব মানুষের মাঝে
ন্যায়বিচার করো।” [সূরা সা-দ : ২৬]

সুন্নাহ থেকে দলীল: নাবী ﷺ এর বাণী:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرٌ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

“কোনো বিচারক ইজতিহাদ তথা বিচার-বিশ্লেষণ করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছলে তার জন্য দুটি
সওয়াব রয়েছে। আর কোনো বিচারক ইজতিহাদ তথা বিচার-বিশ্লেষণে ভুল করলে তার জন্য
রয়েছে একটি সওয়াব।”^{১০২৬}

নাবী ﷺ নিজে বিচারকের দ্বায়িত্ব পালন করেছেন ও বিচারক নিয়োগ দিয়েছেন এবং
পরবর্তীতে সাহাবায়ে কিরাম ও সালাফে সালেহীনের অন্যতম দায়িত্ব ছিল এটি।

ইজমা থেকে দলীল: সকল মুসলমান বিচারকদের দ্বায়িত্ব পালন ও মানুষের মাঝে বিচার-
ফয়সালার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

^{১০২৬} মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, ঘ. ৭৩৫২; সহীহ মুসলিম, ঘ. ফুআ. ১৭১৬।

المُسَالَةُ الثَّانِيَةُ: شُرُوطُ الْقَاضِي

দ্বিতীয় মাসআলা: বিচারকের শর্ত

যে ব্যক্তি বিচারকের দায়িত্ব পালন করবে, তারজন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলি আরোপ করা হয়:

১. মুসলিম দেওয়া: ন্যায়বিচার করার জন্য ইসলাম শর্ত। পক্ষান্তরে কাফের ন্যায়পরায়ণ (আদেল) নয়। অনুরূপভাবে কাফেরকে বিচারকের দ্বায়িত্ব দেওয়া তার জন্য সম্মানের ব্যাপার অথচ কাম্য হচ্ছে তাকে হেয় করা।

২. দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়া: অর্থাৎ (বালেগ ও আকেল) প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান হওয়া। কেননা শিশু ও পাগল দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত নয় বরং তারা অন্যের অভিভাবকত্বে রয়েছে।

৩. স্বাধীন হওয়া: কেননা দাস তার মনীবের হক আদায়ে ব্যস্ত এবং তার কোনো কর্তৃত্ব নেই। সুতরাং সে মহিলার ন্যায় বিচার-ফয়সালার যোগ্য নয়।

8. ප්‍රුත්‍ර හෝයා: මහිලා ඩිචාර-ඡයසාලාර දායිතු නිතේ පාරවේ නා . කාරණ සේ කර්ත්‍රීයෙහි යොග්‍ර නය . නාඩි  බලෙහෙන: **لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ**

“এমন জাতি কখনো সফলতা হতে পারবে না যারা তাদের নেতৃত্বের দায়িত্ব মহিলাকে দিবে।”^{১০২৭}

৫. ন্যায়পরায়ণ হওয়া: কোনো ফাসেককে এ দায়িত্ব দেওয়া যাবে না। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿إِنَّمَا الَّذِينَ آتَيْنَا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٍ يُبَيِّنُوا﴾

“হে ঈমানদারগণ! যদি তোমাদের নিকট কোনো ফাসেক সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই-বাচাই করো।” [সূরা হজুরত : ৬]

যেহেতু তার সংবাদই গ্রহণ করা হয় না, সেহেতু তার বিচার গ্রহণ না করাটা আরও অধিক যুক্তিযুক্ত।

৬. দুরারোগ্য ব্যবি থেকে মুক্ত থাকা: যেমন: বধির, অঙ্গ এবং বোবা। কেননা এসব বিকলাঙ্গতার কারণে বিচারক বাগড়া-বিবাদের ফয়সালা করতে সক্ষম হবে না। আর চোখের ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে দেখতে পাওয়া।

৭. যে বিষয়ে ফয়সালার দ্বায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেসব বিষয়ে শরীয়তের ইকুম-আহকাম জানা থাকা: যদিও তা তার মায়হাবে সীমাবদ্ধ হয়। যে মায়হাবে সে ইমামাদের মধ্য থেকে কোনো একজন ইমামের তাক্বলীদ করে থাকে তবুও।

الْمَسَأَةُ الْثَّالِثَةُ: آدَابُ الْقَاضِيِّ وَأَخْلَاقُهُ، وَمَا يَنْبَغِي لَهُ وَمَا لَا يَنْبَغِي

তৃতীয় মাসআলা: বিচারকের শিষ্টাচার ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তারজন্য কী থাকা উচিত এবং কী উচিত নয়

১. বিচারকের উচিত অহংকার ও রুচ্ছাইন শক্তিশালী ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হওয়া: এমন কোমল হওয়া যা দুর্বলতা নয়, যেন শক্তিশালী ব্যক্তি তার বাতিল ফয়সালার প্রত্যাশী না হয় এবং দুর্বল ব্যক্তি তার ন্যায়পরায়নতা থেকে নিরাশ না হয়।
২. ধৈর্যশীল ও সতর্ক হওয়া: যেন বিবাদীদের কথায় রাগান্বিত না হয়। কারণ রাগান্বিত হলে ফয়সালা করতে পারবে না।
৩. বুদ্ধিমান ও সচেতন হওয়া: আমনোযোগী বা উদাসীন হয়ে বিচার করবে না।
৪. বিচারকের সচরিত্র ও তাকওয়াবান হওয়া: আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে থাকা।
৫. পরিতৃষ্ণ ও সত্যবাদী হওয়া: অভিমত ও পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত প্রদানকারী হওয়া। আলী رض বলেছেন:

لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَاضِيَ قَاضِيَا حَتَّى تَكُونَ فِيهِ خَمْسُ خَصَائِصٍ: عَفِيفٌ، حَلِيمٌ، عَالِمٌ بِمَا كَانَ قَبْلَهُ،
يَشْتَشِيرُ ذُوِي الْأَلْبَابِ، لَا يَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَا يُنْ

“বিচারকের পাঁচটি গুণাবলী না থাকলে বিচারক হওয়া উচিত নয়। ১.সচরিত্রবান, ধৈর্যশীল, পূর্ববর্তী ঘটনা সম্পর্কে অবগত, জ্ঞানীদের সাথে পরামর্শ করবে, আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে কোনো তিরক্ষারকারীর তিরক্ষারকে ডয় করবে না।”^{১০২৮}

৬. বিচারকের জন্য দুইজন বিবাদকারীর কারো সাথে গোপনে কথা বলা হারাম: কারো পক্ষপাতিত্ব করা, তাকে যুক্তি শিখিয়ে দেওয়া অথবা কীভাবে প্রমাণ উপস্থাপন করবে তা শিখিয়ে দেওয়া বিচারকের জন্য হারাম।

৭. বিচারকের জন্য কঠিন রাগের মুহূর্তে বিচার করা হারাম: নাবী صل এর হাদীস:

لَا يَقْضِي الْحَاكِمُ يَنْ إِنْاثَيْنِ وَهُوَ غَضِيبٌ

“বিচারক রাগান্বিত অবস্থায় দুইজন ব্যক্তির মাঝে ফয়সালা করবে না।”^{১০২৯}

^{১০২৮} দেখুন, ইমাম ইবনে কুদামার আল-মুগনী ১৪/১৭; উমার ইবনু আবদুল আয়ীয় থেকে অনুকূল বর্ণনা করেছেন ইমাম বায়হুকী ১০/১১০; দেখুন, ইরওয়াউল গালীলী/২৩৯।

^{১০২৯} মুস্তাফাকুন আলাইহি: সহীহল বুখারী, হা. ৭১৫৮; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৭১৭।

সমস্যা, উৎকর্থা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও অসুস্থতা ইত্যাদি যেসব বিষয় চিন্তাকে বিঘ্ন ঘটায়, সেগুলোকে রাগের উপর কিয়াস করা হয়।

৮. বিচারকের জন্য ঘূৰ গ্রহণ করা হারাম: আবু হুরায়রা  হতে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল  বলেছেন:

لَعْنَ اللَّهُ الرَّاشِيٌّ وَالْمُرْشِيٌّ فِي الْخَمْرِ

“আল্লাহ তা‘আলা বিচার-ফয়সালার ক্ষেত্রে ঘূৰদাতা ও গ্রহণকারীকে লানত করেছেন।”^{১০৩০}

ঘূৰ বিচারককে অধিকারীর পক্ষে ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করে অথবা বাতিলপন্থীর পক্ষে বাতিল ফয়সালা প্রদানে বাধ্য করে। এ দুটোই বিরাট অকল্যাণকর।

৯. দুই বিবাদকারীর পক্ষ থেকে অথবা যে-কোনো একজনের পক্ষ থেকে হাদীয়া গ্রহণ করা বিচারকের জন্য হারাম: তবে যদি বিচার কাজের পূর্ব থেকেই হাদীয়া গ্রহণের অভ্যাস থাকে তাহলে সেই হাদীয়া গ্রহণে সমস্যা নেই। এই শর্তে যে, বিচারক উক্ত হাদীয়া প্রদানকারীর পক্ষপাতী হয়ে তার পক্ষে রায় দিবেন না। যদি উল্লিখিত সবকিছু থেকে মুক্ত থাকতে পারে, তাহলে তা তার জন্য উত্তম। বিচার-ফয়সালা ও প্রসিদ্ধতায় প্রভাব ফেলে এমন সকল কাজ থেকে বিচারকের বেঁচে থাকা উচিত। এমনকি ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়ার ভয়ে পরিচিত কারো কাছ থেকে নিজে ক্রয়-বিক্রয় করাও উচিত নয়। কেননা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ভালোবাসা হাদীয়ার মতোই প্রভাব ফেলে। বরং বিচারক এমন প্রতিনিধির মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করবেন যাকে কেউ চিনবে না।

১০. বিচারকের জন্য নিজের ও আত্মীয়দের মাঝে বিচার ফয়সালা করা বৈধ নয়: যাদের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, তাদের বিচার ফয়সালা করাও জায়েয নয়। বিচারক তার শক্তির বিচার করবেন না। কারণ এসকল অবস্থায় অপবাদের সন্ধান রয়েছে।

১১. বিচারক নিজের ইলম অনুযায়ী বিচার করবেন না: তা তাকে অপবাদের দিকে ধাবিত করবে।

১২. বিচারকের জন্য একজন লেখক রাখা, যিনি ঘটনাসমূহ লিখে রাখবেন: এছাড়াও বিচারক তার প্রয়োজন অনুপাতে রক্ষী, যাকাত আদায়ের অফিসার, দোভাষী রাখতে পারেন, যারা তাকে সহযোগীতা করবে। কারণ বিচারক মানুষের বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তার সহযোগী প্রয়োজন।

১৩. বিচারকের উপর আল্লাহর কিতাব ও আল্লাহর রসূলের  সুন্নাহ মোতাবেক বিচার ফয়সালা করা আবশ্যিক: যদি কিতাব ও সুন্নাহ হতে কোনো ফয়সালা না পান, তাহলে ইজমা

^{১০৩০} তিরমিয়ী, হা ১৩৩৬ এবং তিনি হাসান সহীহ বলেছেন; ইবনু মাজাহ, হা. ২৩১৩; শাইখ আলবালী সহীহ বলেছেন, সহীহ সুনানত তিরমিয়ী, হা. ১০৭৩।

দ্বারা ফয়সালা করবেন। যদি ইজমাতে না পান আর বিচারক মুজতাহিদ হন তাহলে ইজতিহাদ করবেন আর যদি মুজতাহিদ না হন তাহলে তার উপর আবশ্যক হচ্ছে কোনো মুফতিকে ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করে সে অনুযায়ী ফয়সালা প্রদান করা।

১৪. সকল বিষয়ে দুইজন বিবাদীর মাঝে ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করা বিচারকের উপর ওয়াজিব: উমার ^{رض} আবু মুসা ^{رض} এর নিকট চিঠি লিখেন:

وَأَسِّيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَجْهِكَ وَجْهِكَ حَتَّى لَا يَنْسَ الصَّعِيفُ مِنْ عَدْلِكَ وَلَا يَطْمَعُ الشَّرِيفُ فِي حَقِّكَ
 “তুমি তোমার সামনে, তোমার মজলিসে এবং তোমার ন্যায়পরায়ণতায় মানুষের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করো। যাতে দুর্বল লোকেরা তোমার ন্যায়পরায়ণতা থেকে নিরাশ না হয় এবং স্ত্রান্ত লোকেরা তোমার অন্যায়ের আকাঙ্ক্ষা না করে।”^{১০৩১}

المسألة الرابعة: طريق الحكم وصفته

চতুর্থ মাসআলা: বিচার-ফয়সালার পদ্ধতি ও গুণাবলি

বিচারক তার নিকট আসা বিবাদে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে করতে হতে পারেন-

- দুইজন বিবাদকারী তার নিকট উপস্থিত হলে তাদেরকে সামনে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন: তোমাদের কে বাদী? অথবা চুপ থাকবেন যাতে বাদী কথা শুরু করে। অতঃপর তার অভিযোগ শুনবেন।
- সঠিক পদ্ধতিতে অভিযোগ আসলে বিচারক বিবাদীকে অভিযোগের প্রেক্ষিতে তার অবস্থান জিজ্ঞাসা করবেন। যদি স্বীকার করে তাহলে তার বিপক্ষে ফয়সালা প্রদান করবেন আর যদি অস্বীকার করে, তাহলে বাদীর কাছে প্রমাণ চাইবেন।
- বাদীর নিকট কোনো প্রমাণ থাকলে তা উপস্থিত করার আদেশ দিবেন, তার সাক্ষ্য শুনে শর্তানুযায়ী ফয়সালা প্রদান করবেন। নিজের ইলম অনুযায়ী ফয়সালা প্রদান করবেন না।
- বাদীর নিকট কোনো প্রমাণ না থাকলে বিচারক তাকে জানাবেন যে, এ বিবাদে তার প্রতিপক্ষের উপর কসম করার অধিকার রয়েছে। নাবী ^{رض} এর বাণী:

أَلَّكَ يَبْيَسْتَهُ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَكَ يَمْبِيْسْتَهُ

^{১০৩১} সুনানুদ্দ দারায়ুক্তিপুর্ণ, পৃ. ৪৪৭। সহীহ সানাদে। দেখুন, ইরওয়াউল গালীল ৮/২৪১।

“তোমার নিকটে কোনো প্রমাণ আছে? সে বলল, না। তিনি বললেন: তোমার জন্য কসম
রয়েছে।”^{১০৩২}

ନାବୀ ଆରଓ ବଲେନ:

البينة على المدعى، واليمين على المدعي عليه

“বাদীর দায়িত্ব সাক্ষী-প্রমাণ উপস্থিত করা এবং বিবাদীর দায়িত্ব শপথ করা।” ১০৩৩

› যদি বাদী বিবাদীর কসম গ্রহণ করে নেয় তাহলে বিচারক তাকে কসম করিয়ে ছেড়ে দিবেন।
কারণ মূল ইকুম হচ্ছে সে নির্দোষ।

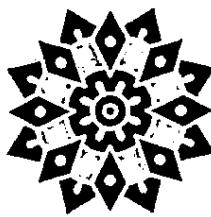
➤ বিবাদী যদি কসম করা থেকে বিরত থাকে এবং কসম করতে অস্থীকার করে, তাহলে বিচারক বিরত থাকার ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে ফয়সালা দিবেন। **النـكـول** বা বিরত থাকার অর্থ হলো তার কসম করা থেকে বিরত থাকা: বাদীর সত্যবাদীতার প্রমাণ করে এমন প্রকাশ্য ইঙ্গিত। উসমান **আলুই** ও একদল আলেম এ পছায় ফয়সালা দিয়েছেন।

অন্য একদল আলেম বলেছেন: বিবাদী কসম থেকে বিরত থাকলে কসম বাদীর কাছে ফিরে আসবে। অতঃপর সে কসম করবে ও ফয়সালার হকদার হবে। বিশেষ করে যদি তার দিকটি শক্তিশালী হয়।

➤ যদি বিবাদী কসম করে তাহলে বিচারক তাকে মুক্ত করে দিবেন। অতঃপর যদি বাদী পরবর্তীতে তার প্রমাণ পেশ করে তাহলে বিচারক সে অনুযায়ী ফয়সালা দিবেন। কারণ অস্থিকারীর কসম অধিকার নষ্ট করে না বরং তা কেবল ঝগড়া মিটিয়ে দেয়।

२०८२ नवीन भवनिय-आ. ३३५, फआ. १३९।

३००० डिसम्बर, शा. २७४१; सनातन दार्शकली, शा. ४३१।



الباب الثاني: في الشهادات د্বিতীয় অনুচ্ছেদ: সাক্ষ্য প্রদান

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المسألة الأولى: في تعريفها، وحكمها، وأدلتها

প্রথম মাসআলা: সাক্ষ্যের পরিচয়, হুকুম ও তার দলীল

১. পরিচয়: ﴿شَهَادَةُ إِنْ شَهَدَ﴾ এর আভিধানিক অর্থ: নিশ্চিত সংবাদ, এটি ﴿شَهَادَة﴾ বা স্বচক্ষে দেখা করা শব্দ হতে গৃহীত। কারণ সাক্ষী যা স্বচক্ষে দেখে ও প্রত্যক্ষ করে, সেই বিষয়েই সংবাদ দেয়।

ফকীহদের নিকট সাক্ষ্য দ্বারা উদ্দেশ্য: বিচার-ফসালার বৈঠকে একজনের পক্ষে অপরজনের বিপক্ষে সত্য সংবাদ দেওয়া। অথবা সাক্ষী যা জানে তা নির্দিষ্ট শব্দে সংবাদ দেওয়া; আর তা হচ্ছে: (أَشْهَدُ) আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, বা আমি সাক্ষ্য দিলাম বা অনুরূপ শব্দ।

২. বিধান: আল্লাহর হক ব্যতীত বান্দার হকের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য দেওয়া ফরযে কিফায়াহ। সাক্ষ্য দেওয়ার মতো ব্যক্তি পাওয়া গেলে, উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাওয়ার কারণে অন্যদের পক্ষ থেকে তা যথেষ্ট হবে। ক্ষান্তরে কাউকে না পাওয়া গেলে নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর আবশ্যক হবে। আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿وَلَا يَأْبَ الشَّهَادَةُ إِذَا مَا دُعُوا﴾

“আর সাক্ষীদের যখন ডাকা হবে তখন তারা যেন অস্বীকার না করে।” [সূরা বাকুরাহ : ১৮২]

আর বিচারকের নিকট সাক্ষ্য আদায় করা ও পেশ করা ফরযে আইন অর্থাৎ যারা দায়িত্ব নিয়েছে তাদেরকে আহ্বান করা হলে তাদের উপর সাক্ষ্য দেওয়া আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَلَا تَكُنُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُنْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾

“আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। আর যে গোপন করে তার অন্তর পাপী।” [সূরা বাকুরাহ : ১৮৩]

সুতরাং যে সাক্ষ্য গোপন করে এটি তার জন্য কঠিন সতর্কবার্তা। এটি প্রমাণ করে যে, যারা সাক্ষ্যের দায়িত্ব নিয়েছে, যখনই তাদের ডাকা হবে তখন সাক্ষ্য আদায় করা আবশ্যক।

সাক্ষ্য প্রদানের দ্বায়িত্ব নিয়ে সাক্ষী দেওয়া ও তা নির্দিষ্ট স্থানে আদায় করার শর্ত হলো- সাক্ষী বিপদমুক্ত হবে। তাই যদি সাক্ষ্য দেওয়ার ফলে তার সম্মান, সম্পদ, নিজ পরিবারের কোনো বিপদ দেখা দেয়, তাহলে তারজন্য সাক্ষ্য দেওয়া আবশ্যিক নয়। নাবী  এর বাণী:

لَا ضَرَّ وَلَا ضَرَّ اَزْ

“କ୍ଷତି କରା ଯାବେ ନା. କ୍ଷତିଗ୍ରହ ହୋଇବା ଯାବେ ନା ।” ୧୦୩୪

৩. সাক্ষ্য শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল: কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা সাক্ষ্য শরীয়ত সম্মত হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কুরআনের দলীলে আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾

“আর তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য প্রদান করবে।” [সুরা বাকুরাহ : ১৮-১]

যহুন আল্লাহ আরও বলেন:

﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ﴾

“তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষৰ দিও।” [সুরা তৃতীয় : ২]

মহান আল্লাহ আরও বলেন:

﴿وَلَا تَكُنُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُنْ شَهِيدًا فَإِنَّهُ آتَيْتَ قَلْبَهُ﴾

“ଆର ତୋମରା ସାକ୍ଷ୍ଯ ଗୋପନ କରୋ ନା । ଆର ଯେ ତା ଗୋପନ କରେ ଅବଶ୍ୟକ ତାର ଅନ୍ତର ପାପୀ ।”

[সুরা বাক্তারাহ : ২৮৩]

মহান আল্লাহ আরও বলেন:

﴿وَأَشْهُدُوا ذَوَنِ عَدْلٍ مِّنْكُمْ﴾

“তোমাদের মধ্য থেকে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে !” সুরা তালাক : ২

মহান আল্লাহ আরও বলেন:

(فَإِنْ شَهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنَّ لَمْ يَكُنْوَا رَجُلَيْنِ قَرْجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِنْ تَرْضُونَ مِنَ الشَّهَدَاءِ)

“তোমাদের মধ্যে দুইজন পুরুষ সাক্ষীকে সাক্ষী করবে; যদি দুইজন পুরুষ না পাওয়া যায়, তাহলে সাক্ষীগণের মধ্যে তোমরা একজন পুরুষ ও দুইজন নারী মনোনীত করবে।” (সূরা বাক্সারাহ : ২৮২)

সুন্নাহ থেকে দলীল: ইবনু মাসউদ رض থেকে বর্ণিত হাদীস। নাবী ﷺ বলেন:

୧୦୫୫ ଶ୍ରକିମ ୨/୫୭-୫୮ ଏବଂ ତିନି ସହିତ ବଲେଛେ; ଇମାମ ଯହାବୀ ଐକମତ୍ୟ ପୋଷଣ କରେଛେ; ବାୟହକୀ ୬/୬୯-୭୦; ଇମାମ ଆଲବାନୀ ସହିତ ବଲେଛେ, ସହିଥାହ ନଂ ୨୫୦।

شَاهِدًاكَ أُوْيَمِينَهُ

“তুমি দুইজন সাক্ষী পেশ করো নতুবা সে কসম করবে।”^{১০৩৫}

আল্লাহ ইবনে আবুস হতে বর্ণিত হাদিস। নাবী ﷺ বলেন:

الْبَيْنَةُ عَلَى الْمُدَعِّيِ وَالْمُبَيِّنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

“বাদী প্রমাণ পেশ করবে আর অঙ্গীকারকারী কসম করবে।”^{১০৩৬}

সকল আলেম একমত: অধিকার সাব্যস্তের জন্য সাক্ষ্য দেওয়া শরীয়ত সম্মত; কারণ প্রয়োজন এদিকেই আহ্বান করে।

الْمَسَأَةُ الثَّانِيَةُ: شُرُوطُ الشَّاهِدِ الَّذِي تَقْبِلُ شَهادَتُهِ

দ্বিতীয় মাসতালা: যে সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে তার শর্ত

১. ইসলাম: তাই কাফেরের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾

“তোমাদের মধ্য হতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে।” [সূরা তৃতীয় : ২]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন: **﴿مِنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ﴾**

“তোমরা যাদেরকে সাক্ষী হিসেবে পছন্দ করো।” [সূরা বাকুরাহ : ২৮২]

আর কাফের ন্যায়পরায়ণ ও পছন্দনীয় ব্যক্তি নয়।

তবে সফরে থাকা অবস্থায় প্রয়োজনীয় অসীয়ত করার ক্ষেত্রে অন্য কাউকে না পাওয়া গেলে, কাফেরদের মধ্য হতে আহলে কিতাবদের (ইয়াহুদী বা নাসারাদের) সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿فِيَا أُولَئِنَّا آتَيْنَا شَهَادَةً بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةُ أُثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ أَخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرِبُتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾

“হে মুমিনগণ! তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে অসীয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে অথবা অন্যদের (অমুসলিমদের) থেকে দুইজন সাক্ষী বাছাই করবে। যদিও তোমরা সফরে থাকো এবং তোমাদের মৃত্যু পেয়ে বসে।” [সূরা মায়দাহ : ১০৬]

^{১০৩৫} মুওফাকুন আলাইহি: সহীহ বুখারী, হ. ৬৬৭৬; সহীহ মুসলিম, হ. ফুআ. ১৩৮ (২২১) শব্দ মুসলিমের।

^{১০৩৬} তিরমিয়ী, হ. ১৩৪১; আমর ইবনু শআইব থেকে বর্ণনাকে ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহ সুনানুত তিরমিয়ী, হ. ১০৭৮।

ইবনু আবুস ও অনেক আলেমের মত আল্লাহর বাণী: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ عَيْرِ كُمْ﴾ উদ্দেশ্য ইচ্ছে-
অমুসলিম কেউ অর্থাৎ আহলে কিতাব।¹⁰³⁷

২. প্রান্তবয়ক্ত ও বুদ্ধিমান: ছোটোদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, যদিও সে ন্যায়পরায়ণ হয়। কেননা
সে পূর্ণ বুদ্ধিমান নয়, ফলে সে যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। তবে একে অপরকে আঘাত করে
আহত করার ক্ষেত্রে শিশুদের একে অপরের বিপক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। বিশেষভাবে তারা
বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে তাদের সবার কথা একই রকম হলে গ্রহণযোগ্য হবে।

অনুরূপভাবে পাগল, নির্বোধ ও মাতালের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা তাদের সাক্ষ্য এমন
দৃঢ় বিশ্বাসের জন্ম দেয় না যে অনুযায়ী ফয়সালা দেওয়া যেতে পারে।

৩. কথা বলতে পারা: সুতরাং বোবার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না, যদিও তার ইশারা বোবা যায়। তবে
প্রয়োজনে বিশেষ কোনো বিধানের ক্ষেত্রে তার ইশারা গ্রহণযোগ্য হবে। তবে যদি সে লিখে তার
সাক্ষ্য পেশ করতে পারে, তাহলে গ্রহণ হবে। কারণ লেখা মুখের ভাষার মতোই প্রকাশ করে।

৪. মুখস্থকরণ, সংরক্ষণ ও সচেতন হওয়া: সুতরাং অমনোয়েগী এবং অত্যধিক ভুল করা ও ভুলে
যাওয়ায় প্রসিদ্ধ, এমন কারো সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা তার কথায় আস্থা রাখা যায় না।
এমন স্তুতিবন্ধ থাকে সে ভুল সাক্ষ্য দিবে। তবে যার ভুল কম হয়, তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।
কারণ কেউই ভুলের উর্ধ্বে নয়।

৫. ন্যায়পরায়ণতা: সুতরাং ফাসেকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহ তা'আলা বাণী:

﴿وَأَشْهُدُوا ذَوَى عَذْلٍ مِنْكُمْ﴾

“তোমাদের মধ্যে যারা ন্যায়পরায়ণ তাদেরকে সাক্ষী রাখো।” [সূরা তালাক : ২]

ন্যায়পরায়ণ বলতে উদ্দেশ্য: যে ব্যক্তি তার দ্বীনের উপর অটল আছে, যার নিকট থেকে কোনো
সংশয় প্রকাশ পায়নি। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, ওয়াজিব ও মুন্তাহাব পালনকারী এবং হারাম ও মাকরাহ
বিষয়াবলি থেকে মুক্ত, সেই ন্যায়পরায়ণ।

الْمَسْأَلَةُ الْأُخْرَى: إِلَى أَحْكَامِ الْمُتَعْلِقَةِ بِالشَّهَادَةِ

তৃতীয় মাসআলা: সাক্ষ্য সংক্রান্ত কিছু বিধান

১. সাক্ষী যে ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছে সে ব্যাপারে তার জানা থাকা ওয়াজিব। তার অজ্ঞাত বিষয়ে
সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ নয়। মহামহিয়ান আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَا تَنْفُتْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾

“আর যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না ।” [সূরা ইসরাঃ ৩৬]

মহান আল্লাহ আরও বলেন:

﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

“তবে যারা সত্য উপলক্ষ্মি করে সাক্ষ্য দেয়, তারা ব্যতীত ।” [সূরা যুবরাফ : ৮৬]

অর্থাৎ যারা জেনেবুবো সাক্ষ্য দেয়। শোনা বা দেখার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জিত হয় অথবা প্রসিদ্ধতা ও ব্যাপকতা বা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যমেও জ্ঞান অর্জিত হয়। যেমন- বংশনামা ও মৃত্যু।

২. পুত্রের পক্ষে পিতা বা পিতার পক্ষে পুত্রের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না; কেননা এক্ষেত্রে অপবাদের স্তুতিবন্ধ থাকতে পারে। অনুরূপভাবে স্বামী স্ত্রীর একে অপরের পক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে তাদের একে অপরের বিপক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। তাই পিতা-পুত্র যদি একে অপরের বিপক্ষে বা স্বামী-স্ত্রী একে অপরের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা এতে অপবাদের কোনো আশংকা নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوئُنَا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءِ اللَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ وَالْأَقْرَبُونَ﴾

“হে ঈমানদারগণ! ন্যায়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ও আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে যায় ।” [সূরা নিসা : ১৩৫]

৩. শক্র বিপক্ষে শক্রের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না এবং যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেওয়ার মাধ্যমে নিজের কোনো উপকার বা নিজের কোনো ক্ষতি দূর করতে চায়, তার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে দ্বিনের ক্ষেত্রে ‘শক্রতা’ সাক্ষ্য গ্রহণে কোনো বাধা সৃষ্টি করবে না। অতএব, কাফেরের বিপক্ষে মুসলিমের এবং বিদআতির বিপক্ষে সুন্নাহর অনুসারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

৪. সাক্ষীর জন্য সত্য সাক্ষ্য দেওয়া আবশ্যিক, যদিও তা তার সবচেয়ে আপন মানুষের বিরুদ্ধে হয়। সাক্ষ্যতে পক্ষপাতিত্ব করা নাজারেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوئُنَا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءِ اللَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ وَالْأَقْرَبُونَ﴾

“হে ঈমানদারগণ! ন্যায়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ও আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে যায় ।” [সূরা নিসা : ১৩৫]

অর্থাৎ যদিও সাক্ষী দেওয়াটা তোমার পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যায়। তুমি এই ব্যাপারে তাদের প্রতি ইতস্তত করবে না। বরং সত্য সাক্ষ্য দিবে, যদিও এতে তাদের কোনো ক্ষতি হয়ে যায়।

៥. සාක්ෂීගේ ප්‍රතිනිධි හෝ සාක්ෂි දිලෙ තා ග්‍රහණයෝග්‍ය හැවෙ. කාරණ එටා ප්‍රයෝගු නෙර තාගිදිහි හැවෙ. තබේ ජ්‍රේඛන නොවූ මුද්‍රා වා අනුරූප කාරණේ මූල සාක්ෂී ඉපස්ථිත හැතේ අපාරාග හෙලේ අවශ්‍ය මූල සාක්ෂී වා ප්‍රතිනිධි සාක්ෂී ඉපස්ථිත න්‍යායපරායන හැවෙ, තබේහි ග්‍රහණයෝග්‍ය හැවෙ.

ආ. මිත්‍යා සාක්ෂි ග්‍රහණයෝග්‍ය නය. මිත්‍යා සාක්ෂි දෙවෝයා ක්‍රිඩා ගුනාහ. ආශ්‍රාහ තා'අලාර බාණි:

﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾

"තොමරා මුත්‍රිප්‍රජාර අපවිත්‍රතා බර්ජන කරෝ අවශ්‍ය මිත්‍යා කතා පරිහාර කරෝ / "[සුරා හැංස් : ៣០]
නාඩි මුද්‍රා බලනේ:

﴿أَلَا أَنْتُمْ بِأَكْثَرِ الْكَبَائِرِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: إِلَيْشَرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكَبِّراً فَقَالَ أَلَا وَقُولُ الزُّورِ، قَالَ: قَمَّا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّىٰ قُلْنَا: لَيْلَةُ سَكَتَ

"ଆමි කි තොමාදේර ස්වංචෝ බද්ධ පාපේර බ්‍යාපාරේ සතර්ක කරව නා! තූන සාහාරියා බලනේ: අවශ්‍යහි හේ ආශ්‍රාහර රස්ලු! තිනි මුද්‍රා බලනේ: ආශ්‍රාහර සාත්‍ය සිරක කරා, පිතා-මාතාර අවශ්‍ය හෝයා. නාඩි මුද්‍රා තූන දියෙ බසා තූන තූන තිනි බලනේ, සාවධාන! මිත්‍යා සාක්ෂි! (රාඩි) බලනේ: නාඩි මුද්‍රා අහි කතාටි ප්‍රූනරාංශිත කරතේහි තාකලනේ! ආමරා බල්‍යිලාම, යදි තිනි ඥාමනේන!"¹⁰³⁸

ආ. සාක්ෂි දෙවෝයා න්‍යාය ග්‍රහණ කරා පායෙය නේහි. තබේ යදි සාක්ෂි දෙවෝයා ස්වානේ හේංටේ යෙතේ අක්ෂම හැවෙ තාහළේ පරිවහන බාබද තාංචා ග්‍රහණ කරතේ පාරේ.

ආ. යේ බ්‍යාපාරේ සාක්ෂි දෙවෝ හැඳු, තාර විභින්නතාය සාක්ෂීගේ ස්වද්‍යාය විභින්නතා හැවෙ. බ්‍යාඩිචාර වා සම්කාමිතාර ක්ෂේත්‍ර තාරජන ප්‍රූනරා සාක්ෂීගේ කම ග්‍රහණයෝග්‍ය නය. ආශ්‍රාහ තා'අලා බාණි:

﴿وَلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَزْبَعَةٍ شَهَدَاءَ﴾

"තාරා ୪ ජ්‍යෙ සාක්ෂී ඉපස්ථිත කරල නා කෙන?" [සුරා නුර් : ୧୩]

චුරි වා අපවාදේර මතො අන්‍යාන්‍ය හද්, අනුරූපභාබේ යා සම්පාද නය වා යා දාරා සම්පාද උදෙශ්‍ය නය අවශ්‍ය ඇඟිල්ඩා යේ ක්ෂේත්‍ර සාධාරණත ප්‍රූනරා බේෂි අවගත හැවෙ; යෙමන විබාහ, තාලාක, රජයී, යිහාර, ව්‍යුනාමා, ප්‍රතිනිධිත්ව, අසීයත වා අනුරූප විශයෘග්‍ලො සාවයුත් හෝයා ක්ෂේත්‍ර දුහිජන ප්‍රූනරා සාක්ෂීගේ ග්‍රහණයෝග්‍ය, මහිලාර සාක්ෂී ග්‍රහණයෝග්‍ය හැවෙ නා. ආශ්‍රාහ තා'අලා තාලාකේ රජයීගේ ක්ෂේත්‍ර බලනේ:

﴿وَأَشْهُدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْنِّي﴾

"තොමාදේර මධ්‍යේ යාරා න්‍යායපරායන තාදේරකේ සාක්ෂී රාත්‍යේ / "[සුරා තාලාක : ୨]

এর উপরই পূর্বে উল্লিখিত সবকিছু কিয়াস করা হবে। কেননা তা সম্পদ নয় এবং এর দ্বারা সম্পদ উদ্দেশ্য নয়। তাই তা শাস্তির মতো।

আর এই দলীলের ভিত্তিতেই সম্পদ ও যা দ্বারা সম্পদ উদ্দেশ্য, যেমন ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া, নির্দিষ্ট মেয়াদের ক্রয়-বিক্রয়, ঝণ, বন্ধক, আমানত ও অনুরূপ আর্থিক চুক্তির ক্ষেত্রে দুজন পুরুষের সাক্ষ্য বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالٍ كُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمْنَ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهِيدَاتِ﴾

“তোমাদের মধ্যে দুইজন পুরুষ সাক্ষীকে সাক্ষী করবে; যদি দুইজন পুরুষ না পাওয়া যায়, তাহলে সাক্ষীগণের মধ্যে তোমরা একজন পুরুষ ও দুইজন নারী মনোনীত করবে।” [সূরা বাক্সারাহ : ২৮২]

সম্পদ এবং যার মাধ্যমে সম্পদ উদ্দেশ্য করা হয় এমন ক্ষেত্রে একজন পুরুষের সাক্ষ্য এবং বাদীর শপথ গ্রহণ করা হবে। নারী এর ফয়সালা এমনই ছিল। পক্ষান্তরে যে সকল বিষয় সাধারণত পুরুষের পক্ষে জানা স্তুত নয়; যেমন নারীর গোপন দোষগঠিত, বন্ধ্যাত্ম, কুমারিত্ব, জন্মস্তুত, স্তন্যপান, সত্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর চিকিৎসার করা ইত্যাদি বিষয় সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শুধুমাত্র নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে এবং একে একজন ন্যায়নিষ্ঠ নারীই যথেষ্ট।

যদি কেউ স্বচ্ছল থাকার পর দারিদ্র্যাত্মক হয়ে যাওয়ার দাবি করে, তবে তার সমর্থনে তিনজন পুরুষের সাক্ষ্য শর্তারোপ করা হয়েছে। কুবীসাহ বিন মাখারিক এর হাদীসে যাদের জন্য ভিক্ষা করা বৈধ তাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহর রসূল বলেন:

وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَاجَ مِنْ قَوْمِهِ: لَفَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةً

“কোনো ব্যক্তি এমন অভাবী হয়েছে যে, তার বংশের তিনজন জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোক সাক্ষ্য দেয় যে, “সত্যিই অমুক অভাবে পড়েছে।”^{১০৩৯}

৯. সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে ‘আমি এই মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি’ বা ‘আমি সরেজমিনে উপস্থিত ছিলাম’- বা এই ধরনের শব্দ বলা শর্ত নয়। বরং কেউ যদি বলে, “আমি এমনটি দেখেছি” বা “আমি শুনেছি” অথবা এজাতীয় কিছু যদি বলে, তবে সেটাই যথেষ্ট হবে। কারণ নারী থেকে এরকম নির্ধারিত কোনো শব্দ শর্তারোপ করার বিষয়ে কোনো বর্ণনা আসেনি।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই সংক্ষিপ্ত কিতাব একত্রিত করাকে সহজ করে দিয়েছেন। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন একে সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কবুল করেন এবং এর মাধ্যমে তার মুমিন বান্দাদেরকে উপকৃত করেন।

وَآخِر دُعْوَانَا أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

সর্বোপরি সকল প্রশংসা মহান রক্ষুল আলামীনের জন্য।
সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নাবী ﷺ এর প্রতি;
তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীর প্রতি।

ଆମ ଭାଷାରେ
ପ୍ରକାଶନ

ବହୁ ସମ୍ପଦକେ

১. কুরআনুল কারীম ও সুন্নাহ নাববীর আলোকে ইবাদাত ও মুআমালাত সংক্রান্ত প্রায় সকল ফিকহী বিধিবিধানকে সন্নিবেশ করা হয়েছে।
 ২. ত্রুটিমৃত্য ও সুস্পষ্ট বর্ণনাভঙ্গি। জটিলতা ও দীর্ঘায়ীতমৃত্য। শিরোনামের অধীনে সুস্থ মাসআলা অনুধাবনযোগ্য সহজ পদ্ধতিতে উপস্থাপন।
 ৩. ফিকহী মতপার্থক্যের আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে দলীলের ভিত্তিতে সকল মাসআলা একত্রিত করা হয়েছে।
 ৪. দীনের ব্যাপারে সর্বসাধারণের অঙ্গতা, তাকুলীদ ও অসহায়ত দূর করে, জ্ঞানের আলোয় উভাসিত করতে সাবলীল ভাষায় প্রতিটি মাসআলার উল্লেখ।
 ৫. অনুবাদের ক্ষেত্রে সহজ ও প্রচলিত বাংলা শব্দকে প্রাধান্য দিয়ে প্রাঞ্জল করা হয়েছে। পাঠকদের নিকট উপস্থাপনের পূর্বেই একদল ছাত্র অংশগ্রহণে বইটির সহজতা ও সাবলীলতার জরিপ সম্পাদন করা হয়েছে।
 ৬. বইটির সংকলনে ছিলেন মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ ও প্রায়বৃন্দ ও ভাষ্যতর সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন বিশেষজ্ঞ ও মাদানী ওলামায়ে কিবারাম।
 ৭. সর্বোপরি জনসাধারণের উপযোগী ভাষায় ইসলামী বিধিবিধান উপস্থাপন করা হয়েছে; এর মাধ্যমে অহীর আলোয় জীবন পরিচালনা করা সুস্থ হবে ইনশা-আল্লাহ।

ଆମ ଆଡ଼ିଶିନ୍

ଶ୍ରୀ କାନ୍ତି

৭৯/ক/৩, উত্তর শাহীবাড়ী, জমিদারী ভবন, ঢাকা-১২০৪

01712 549956 01841 549956 01842 828472

✉ atpbd04@gmail.com ☰ /ATP.BD